# আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

# রচনাবলী

# আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

পঞ্চদশ খণ্ড

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
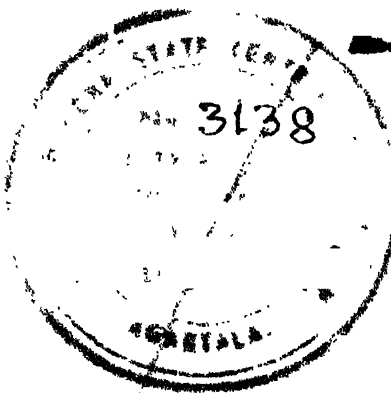


মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

—দু'শ পঞ্চাশ টাকা—

সম্পাদনা
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
সর্বাণী মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন—অমিয় ভট্টাচার্য
মুদ্রণ—স্ট্যাণ্ডার্ড প্রিন্টিং প্রেস



ASUTOSH MUKHOPADHYAY RACHANAVALI. VOL-XV
An anthology of collection of complete works of Asutosh Mukherjee Vol. XV. Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd. 10 Shyama Charan Dey Street, Calcutta-700 073.

Price Rs 250/-

ISBN : 81-7293-6594

শব্দগ্রন্থন : লেজার ইম্প্রেশনস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও এসসি অফসেট, ৩০/২বি হরমোহন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৭০০ ০৮৫ হইতে সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

## সূচীপত্র

# ভূমিকা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় গত শতাব্দীর অর্ধেক অংশ জুড়ে লেখার জগতে রাজত্ব করেছেন। অবশ্যই এ্যাকাডেমিক উচ্চতার শিরোপা নিয়ে নয়। কথাশিল্প ও ছায়াশিল্প দুয়ের মেলবন্ধন ঘটিয়ে লেখন-বৃত্তির সাফল্যচূড়ায় যাঁরা জাগতিকভাবে পৌঁচেছেন, আশুবাবুর নাম সেই তালিকার উপর দিকেই রয়েছে।

শিল্পের গূঢ়তায় উপন্যাসকে যাচাই করার একটা পদ্ধতি ঐতিহাসিকদের হাতে রয়েছে। তাঁদের নিক্তিতে ব্যক্তিস্বরূপ ও সমাজস্বরূপের অন্তর্ভেদ, রীতি-প্যাটার্নের নিরীক্ষা সমধিক গুরুত্বে মর্যাদা পায়। কিন্তু ইতিহাসের কালচিহ্ন সন্ধানের এই সতর্ক প্রহরার বাইরে উপভোগ-লিপ্সু পাঠকের দল ভীড় করে থাকে। এঁদেরই উপভোগ-সন্ধানী মনের প্রত্যাশা মিটিয়ে প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে কেউ কেউ বেস্ট সেলার হয়ে ওঠেন। শব্দটির পিছনে ব্যবসায়িক অর্থনীতির অঙ্ক কষা আছে ঠিকই। কিন্তু মধ্যমানের পাঠককুল যে জীবন্ত অস্তিত্বের ব্যাপার। এঁরা জীবনের উদ্বেল ঘটনাধারায় নিয়ত ভাসতে চান, যান্ত্রিক জীবনে উত্তেজনার খোরাক চান, আশুবাবু এদেরই খাদ্য-পরিবেশক। শরৎচন্দ্র-তারাশঙ্করের পর চলচ্চিত্রায়িত উপন্যাস-সংখ্যার হিসাবে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম বোধহয় তৃতীয় স্থানেই পাওয়া যাবে। চলচ্চিত্রের জগতে যাঁরা সফল ব্যবসায়িক ফিল্ম বানাতে চান তাঁরা তো মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্টের প্রকৃতি ভালই বোঝেন।

গত শতাব্দীর উত্তরভাগে প্রায় চার দশক ধরে রাজনৈতিক চিত্রবদলকে সামনে রেখে সমাজের গতি নির্ধারণ প্রসঙ্গে ঘোর তর্ক-বিতর্কের জটলা, তোলপাড় করা সমাজ পরিস্থিতির মধ্যে বসে আশুবাবুকে কালাহত শিল্পী বলে কখনও মনে হয়নি, তাঁর নিরুদ্বিগ্ন লেখনীতে অস্থিরতার ছায়া পড়েনি। আসলে, চারের দশক থেকে একশ্রেণীর মধ্যবিত্তের গল্পকার আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, যাঁরা মধ্যবিত্তের শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতাকে সামনে রেখেই তাদের সম্পর্কগুলিকে ধরতে চাইছিলেন। সামাজিক উত্তলিতার মধ্যেও একটা শ্রেণীর অন্তর্ভেদ কার্য একেবারে বিফলে যায়নি। মধ্যবিত্ত মানুষ কি করতে পারেন, কতদূর পর্যন্ত তাঁদের প্রত্যাশা-প্রতিজ্ঞা অগ্রসর হয়ে থমকে যায়, অবক্ষয়িত মূল্যের ভস্মস্তূপের মধ্যে বসেও সাবেকী নীতিজ্ঞানের তাঁরা কিভাবে পাহারা দেন, এই সব চিত্র পাঠকের কাছে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আশুবাবুর লেখায় মধ্যবিত্ত নাগরিকতার সেই চরিত্রোদ্‌ঘাটন আছে। ভীরু, সন্ত্রস্ত, সংকুচিত ও আত্মরক্ষাপরায়ণ মধ্যবিত্ত যাঁরা সত্তরের উত্তাল করা দিনগুলিতে প্রাণ বাঁচিয়ে নিত্য ঘরে ফিরতে পেরে স্বস্তি বোধ করছিলেন, তাঁদের পাঠকশ্রেণী তো বেঁচেছিলেন! না হলে একঝাঁক মধ্যবিত্ত জীবনরূপকার কি করে সদর্পে লেখনী চালনা করে গেলেন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসের কাহিনী-পরিকল্পনা, রচনাশৈলী মধ্যবিত্তের অনুযায়ী করেই গড়া। মনস্তাত্ত্বিকতার ক্ষুরধার বিশ্লেষণের চেয়ে ঘটনাপ্রবাহের প্রবলতা সহজেই অনুভূত হয় তাঁর রচনায়। মধ্যবিত্তের দাম্পত্যের চিড়ধরা পরিবর্তনের ছবি তাঁর লেখনীতে সহজেই উঠে আসে। অবাস্তব কল্পনা, স্বপ্নাভিলাসকে ঘিরে তার উন্মাদনাও আশুবাবুর রচনায় সহজলভ্য। দারিদ্র্য এবং চরম অসহায়তা থেকে উঠে আসা উদ্যোগী পুরুষের প্রতি সম্ভ্রম জাগানোও তাঁর রচনাশৈলীর এক অংশ। মার খাওয়া মধ্যবিত্ত যে

এ ধরনের ঘটনাতেই উত্তেজনা পায়। মধ্যবিত্তের স্বপ্ন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ব্যাধি, অবাস্তব কল্পনা ইত্যাদিকে ঘিরেই এই খণ্ডের গল্পায়োজন। কখনও আটপৌরে ছকে, কখনও চটকদার সংঘাতে এ খণ্ডের সাতটি উপন্যাস সম্ভাবিত হয়েছে।

## ১. আমি সে ও সখা

১৩৩৮ সালে প্রকাশিত। ত্রি-চারিত্রিক উপন্যাস। পরিচ্ছেদ—ছয়। সখাই এ উপন্যাসের প্রকৃত নিয়ন্তা। পারিবারিক বন্ধুত্ব কিভাবে বাইরে থেকে দাম্পত্যে প্রেরণা জোগায়, তাকে উদ্বেজিত ও উত্তেজিত করে তোলে তারই ছকের উপর এ উপন্যাসের আখ্যান-বুনট তৈরী হয়েছে। কাজেই কাহিনী-পরিকল্পনার মধ্যে কিছু অভিনবত্ব তো আছেই। আখ্যান-প্রকল্পে গৃহস্থ প্রশান্তের অবস্থান neutral বা নিরপেক্ষ। প্রশান্ত-জায়া চন্দ্রাণী recipient বা গ্রাহিকাশক্তি। চন্দ্রাণী-সুধীরের ভাবগত আদান-প্রদানেই তৈরী হয়েছে কাহিনী-জট! অথবা কোন জট বা গ্রন্থি আদৌ এ গল্পে নেই। আপাত-জটিল বাহ্যতার ভিতরে একটা সরলরৈখিক গতিক্রম চোখে পড়বে।

কেন্দ্রবিন্দু কে চন্দ্রাণী না সুধীর এ নিয়ে তর্ক উঠতেই পারে। গঠন দেখে প্রথমতঃ মনে হবে সুধীর চরিত্রোপাখ্যান, কিন্তু কার্যত চন্দ্রাণীর আত্ম-কণ্ডুয়নে তার মনস্তাত্ত্বিক ছবিটিই উপন্যাসকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। লক্ষ্য যদি হয় চন্দ্রাণী, তবে উপলক্ষ্য সুধীরই। আর প্রশান্ত কি? একটা neutral সংযোগগ্রন্থি মাত্র, অনেকটা ফিউজ তারের মত তার কার্যধারা। তারই মিডিয়ামে পজিটিভ ও নেগেটিভের শক্তিসঞ্চালন চলছে।

আচ্ছা, উপন্যাসটাকে যদি love and Passion-এরই এক মুখবদল কাহিনী বলি! আত্মিক অভিপ্রায়ে হয়তো কেন নিশ্চিতভাবে তাই-ই। এক প্রাণশক্তিময় পৌরুষের চৌম্বক অপ্রতিরোধ্যতার কাছে সমর্পণেচ্ছু বাসনা-বিবশ নারীর তর্পণ, এই ব্যাখ্যার মণিহার্নি চমক তো এ উপন্যাসের ছত্রে ছত্রেই খুঁজে পাওয়া যায়। সুরেশ-অচলার সম্পর্কের কথা পাঠকের স্মরণে আসতে পারে। চন্দ্রাণীর আসঙ্গ-লিপ্সা সুধীরকে ঘিরে নানান অছিলায় যে পরিক্রমা করে তার ইঙ্গিত না বোঝার মত অপৌরুষেয়তা সুধীরের মধ্যে একেবারেই নেই। আশুতোষবাবু সস্তা ছকের ব্যভিচারী প্রেমের সমাধান চান নি বলেই চন্দ্রাণী-সুধীর সম্পর্কে কিছু বৈচিত্র্যের সন্ধান পেয়ে কৃতার্থ হলেন পাঠক। লেখিকা বলেই কি চন্দ্রাণী নিজেকে আত্মসংযমের ঘেরাটোপে অযথা বেঁধে রেখে যন্ত্রণা পেলো? নাকি প্রশান্ত রায়ের ভালোমানুষি ও সততা চন্দ্রাণীকে স্খলনের পথে যেতে দিল না! অথবা বন্ধুতার পরমপ্রেয় আদর্শকে ব্যক্তিলোভে বিনষ্ট না করে দেওয়ার ইচ্ছাই তার আত্মালুপ্তিতে পিছুটান এনে দিল! পাঠক পরিণামে অনেক কিছুই প্রত্যক্ষ করলেন। নার্সিংহোমের চরম সংকটের দিনে প্রশান্ত সুধীর-চন্দ্রাণী সম্পর্কে যে সন্দেহ আরোপ করল, তাতে স্বাভাবিক পৌরুষের রং লাগায় চন্দ্রাণীর প্রতীক্ষমাণ নারীত্বের উল্লসিত হওয়ারই কথা ছিল। কিন্তু বন্ধুত্রাণে সুধীরের ভাবমহিমা আরও উপরে উঠে যাওয়ায় চন্দ্রাণীর পথ বদলের দরকার হল না। জেলে সাক্ষাৎকারের মুহূর্তে চন্দ্রাণীর বাঁধভাঙা আবেগে তৃপ্ত সুধীর স্নান করল ঠিকই, কিন্তু তাকে গৃহছাড়া উল্লাসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল না। একে কি বলবেন পাঠকসমাজ। মহত্ত্বের দামে অর্জিত এক অনবদ্য refusal! পৌরুষের কঠিন নির্মোকে প্রত্যাঘাত পাওয়া নারীত্বকে গৃহব্রতে ফিরিয়ে দেওয়ার এই মান সন্দিপীয় (ঘরে

বাইরে) উল্লাস থেকে নিশ্চয়ই পৃথক হতে পারল। পাঠক স্বস্তি পেলেন না আহত হলেন বলা কঠিন। শুধু অবাকচোখে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম এই, প্রায় রজনীরই স্টাইলে আত্মজের মধ্যে 'সুবীর' নামান্তরে সুধীরকে বহাল রাখতে চাইলো চন্দ্রাণী। সুধীর তো তিন বছর শাস্তিভোগের পরই সখার ভূমিকাতেই ফেরার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তাহলে কি চন্দ্রাণী দীর্ঘদিনের আত্মক্ষয়ী মধুরিমাকে চাক্ষুষ দৃষ্টান্তে ধরে রেখে আবারও নিশ্চিত অবস্থানে দাঁড়িয়ে পাঠকের কাছে প্রমাণ দিতে চাইল সে পূর্বে এবং পরিণামে কার্যত সুধীর-সেবিকা!

আর একটা প্রসঙ্গের দিকে দৃষ্টি ফেরাই। আশুতোষবাবু বন্ধুত্বের যে আদর্শ মডেল হাজির করতে চাইলেন তার দৃষ্টান্ত বোধ হয় কোটিতে এক। কিছুটা utopian মেজাজে এ ছবি আঁকা। সুধীরের সখ্যতায় কৃতজ্ঞতার বাঁধন আছে অবশ্যই, আবার বন্ধু-পত্নীর আলগা প্রশ্রয়ের ফাঁকে চোরা আস্বাদ নেওয়ার বাড়তি ঝোঁকও আছে। লেখিকার একতরফা তর্পণে সে অনেক বড়র আকার নিয়েই ধরা দিয়েছে। আর প্রশান্ত রায়। পৌরুষের স্বভাবজ বিকাশকে কণ্ঠরুদ্ধ করে সুধীরকে যত উঁচুতে তুলতে চাইল, তার সবটাই utopia, নয় কি? চন্দ্রাণীর মুখ আগাগোড়াই অন্যদিকে ঘোরানো ছিল বলেই দাম্পত্যে তার দর উঠল না। আশুবাবুর এই বৃত্তান্ত বাংলা উপন্যাসের সযত্ন ঐতিহ্যেরই আর এক লালনক্রিয়া বলা যায়। মহেন্দ্র-বিহারী, গোরা-বিনয়, সচিশ-শ্রীবিলাসেরা মহিম-সুরেশের আঙিনা ডিঙিয়ে প্রশান্ত-সুধীরে এসে পৌচেছে একথা তো বলাই যায়।

ছোট একটা প্রশ্ন দিয়ে শেষ করি। ভূপতি-চারুর দাম্পত্যে পুরুষের ঔদাসীন্যে যে ফাঁক তৈরী হয়েছিল, অমল প্রবিষ্ট হয়েছিল তারই ছিদ্রপথে। প্রশান্তের যৌন-অনীহা একই ভাবে গড়ে দিয়েছিল চন্দ্রাণী-সুধীরের চোরা আসঙ্গকে। সে আসঙ্গ বুকধোয়া অশ্রুজলে যে বিস্ফোরণ ঘটালো প্রায় অন্তিম মুহূর্তে, চন্দ্রাণীর সন্তানময় মাতৃত্বে প্রত্যাবৃত্ত সুধীর সে ফাঁকটুকু সত্যই তিন বছর পরে ফিরে পাবে তো? না তারও জন্য এক ঠাণ্ডা refusal প্রতীক্ষা করছে? এ সমাধান পাঠকের দপ্তরে প্রেরণ করে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক।

## ২. যার যেথা ঘর

'যার যেথা ঘর' শতকরা একশো ভাগ মেয়েলী সেন্টিমেন্টের গল্প। 'মেয়েদের জীবনে একটা ঘর দরকার'—এই পোড়খাওয়া বোধের উপর দাঁড়িয়ে আছে এ উপন্যাস। আত্মজার গর্বে যা হতে চেয়েছিল আরতি তা হতে না পারার জন্য তার ক্ষোভ রয়েছে এমনটা পরিণামে একেবারেই মনে হল না। সুতরাং আত্মলোপের বিধান মেনেই স্বামীকে আবিষ্কার করে পরম নির্ভরতায় ব্রততীর মতই স্বস্তির সন্ধান পেয়েছে সে। এই কৃতার্থ নায়িকাকে দেখে মনে হয়েছে, এ আখ্যানের প্রকৃত দিকনির্দেশিকা হল 'সবার সেথা ঘর'। গল্প থেকে সোজা সড়ক ধরে এই শাশ্বত আখ্যান-বিন্দুতে পরিণাম লাভ করেছে উপন্যাস।

এক ফিল্মী মেজাজে এ উপন্যাসের ছক তৈরী হয়েছে। নাটকীয় বিপ্রতীপতায় ভাল মন্দ হয়েছে, মন্দ উদ্ভাসে-আবিষ্কারে অনন্য ভালত্বে পৌঁছে গিয়েছে। যে মনতোষ আরতিকে আত্ম-আবিষ্কারের পথ দেখিয়েছিল তার ছদ্ম নির্মোক ভেঙেছে, সূক্ষ্ম কালচারের ছিটেফোঁটা ছিল না যে স্থূল পশুত্বপরায়ণ সুনন্দের মধ্যে সে মালিন্য ধুয়ে ঝকঝকে মহত্ত্বে উঠে এসেছে, বৌদি অবস্থান বদলে হয়ে উঠেছে মাতৃতুল্যা। এ সবই

ঘটেছে অবলীলাক্রমে। আরতির আত্মদাহ চন্দ্রাণীর মতো সত্তার গভীর অংশে কাঁটার মতো বিঁধে নেই। ঔপন্যাসিক মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্রণা থেকে তাকে রেহাই দিয়েছেন। উজ্জ্বল 'কনফেশনে' ভুলের দাহকৃত্য সেরে সাংসারিক চক্রপথে তার প্রত্যাবর্তনকে প্রায় দৃষ্টান্ত-স্বরূপ করে তুলেছেন আশুবাবু।

দ্বিতীয় উপন্যাসটির পরিকল্পনা ও রীতিপ্রকরণ অনেকটা প্রথমের কাছাকাছি। দু-ক্ষেত্রের নায়িকাই লেখিকা। প্রথম ক্ষেত্রে পেশাদার লেখিকার চোখ উপন্যাসের আখ্যানাংশের উপর তটস্থ হয়ে জেগে রয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের 'টানেল' ধরে যেতে যেতে ব্যক্তি চন্দ্রাণী আত্মজীবনকেই গল্পের উপাদান করার ধন্দের মধ্যে থেকেছে। এই দ্বন্দ্বের সুরাহা তার জীবনে হয়নি বলেই ধারণা। আর আরতি লেখিকা হয়ে উঠতে গিয়ে জীবনকেই খুইয়ে ফেলতে গিয়ে সতর্ক হিসেবীপনায় পুনরাবৃত্ত হয়েছে জীবনেরই চক্রপথে। স্ববিরোধ ও প্রত্যাঘাতী অবস্থান থেকে সরে এসে সামঞ্জস্যে এবং আপোসে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে চলার সংকল্পে তার লেখার পুনরায়োজন লক্ষ্য করার মতো। বর্তমান ও অতীতের মধ্যে গতাগতি দুই লেখারই প্যাটার্ন গড়ে দিয়েছে। যে অংশে পশ্চাদউদ্ভাসী পন্থায় অতীতকথন চলেছে সেখানে গল্পের আধিপত্য নজরে আসে, কাকতালীয় যোগসাজস সেখানে দৃষ্টি এড়ায় না। আখ্যানের পরিসীমায় বর্তমানে না পৌছানো পর্যন্ত একটা হাঁসফাসানি কেমন যেন চেপে বসে বুকের ওপর। পরে স্বভাব-ধর্মে পারম্পর্যে স্বস্তি আসে পাঠকের মনে।

গার্হস্থ্য উপন্যাসের বেশি অন্য কোন বৈশিষ্ট্য 'যার যেথা ঘরে'র প্রাপ্য নয়। বিপরীত প্রকৃতিধর্মের সংঘাত স্বামী-স্ত্রীকে ঠেলে নিয়ে যায় বিচ্ছেদদশা পর্যন্ত। সংবোধিত চেতনা এক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পর্যাবসানে পৌঁছে দিয়েছে কাহিনীকে। অনেকটা দর্পচূর্ণের মতই রকমফের নিয়ে প্রতিভাত হয়েছে উপন্যাসের কাহিনী। বিরূপতা এবং প্রতিবাদের প্রতিজ্ঞায় শুরু হয়েছিল আরতির দাম্পত্য। স্বামীকে গ্রহণের চেয়ে প্রত্যাখ্যানের অহং তাকে ঠেলে নিয়ে চলছিল এক আত্মক্ষয়ী নেশায়। অবশেষে প্রত্যাহত আবেগ থেকে জন্ম নিল সম্বিৎ। আরতি যেহেতু মুখ ফিরিয়েছিল, তাই বিচূর্ণ অহমিকার ভস্মস্তূপ থেকে আলো হাতে উঠে আসার দায় ছিল তারই। এটাই সংসারের বিধি। ঔপন্যাসিক আশুতোষ সনাতনত্বের রূপরেখা নিয়েই আখ্যান গড়তে নেমেছিলেন একথাই বোধ হয় ঠিক। না হলে আরতি-ধূপ থেকে এত গন্ধ ছড়ালো কি করে!

### ৩. দিনকাল

১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয় 'দিনকাল' উপন্যাস। পূর্বের দুটি উপন্যাসের মতো চরিত্রের জবানিতে লেখা নয়। লেখকের বলা কাহিনীর মতোই এখানে ঘটনার ভিড় বেশি। বিশ্লেষণের দায় কম বলেই আখ্যানের অভিনবত্বের সুযোগ অধিক। আর পাঁচটা বাংলা গল্পের মতোই সাংসারিক দিনপঞ্জীর ওপর আলো ফেলা হয়েছে। এখানে যেন ফিল্ম হওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছে এ কাহিনী।

নিম্নবিত্ত ঘরের দারিদ্র্য সওয়া মেয়ে দূর্বা বোসের ঘোর লাগা চোখে উচ্চ অভিজাতের বিস্ময়সিক্ত কাহিনীই হল দিনকাল, শিরোনামের প্রত্যাশামাফিক কালের বৃত্তান্ত প্রায় নেই বললেই চলে। ব্যবসায়ী সরকার পরিবারের সাজানো ঠাটের ভিতরে বিষাক্ত ক্ষত কিভাবে লুকিয়ে রয়েছে তৃতীয় পক্ষ দূর্বা তার কৌতূহল আর অভিজ্ঞতা দিয়ে তা উদঘাটন করে

এনেছে। সরকারবাড়ির বড় ছেলে ডাক্তার হয়েও ডিভোর্সি জীবনে সস্তা পর্নোগ্রাফির নেশায় আচ্ছন্ন, ছোট ছেলে বিষাক্ত রোগের ছোবলে এখন-তখন হয়ে রয়েছে। বড় মেয়ের আপাত সংযমের ছদ্মবেশ সরালে অসংযমের চোরা হাতছানি দেখা যাচ্ছে, ছোট মেয়ে উন্মাদ প্রেমানন্দে সমকামিতার মকসো করছে। বাড়ির গৃহকর্তা নিখিল সরকার অর্থসঞ্চয়ে মগ্ন। মিসেস সরকার গাম্ভীর্যের ঘেরাটোপে নির্বাসিতা থেকেই বাইরের সোসাইটিতে মুক্তিস্নান করে আসেন। কুকুর হুইস্কি আর পুরানো দাসী সুমতি সবকিছুর সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘুণধরা আভিজাত্যের এই হল আপাত চমকপ্রদ কাহিনী।

কাহিনীর সূচনায় নিম্নমধ্যবিত্তের আর এক আটপৌরে আখ্যান রয়েছে। দূর্বা বোস যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। এ বাড়ির ছেলে বিপ্লবী আন্দোলনে শহিদ হয়, মদ্যপ বাপ মনোব্যথায় আরাম খোঁজে উন্মত্ত নেশায়। দুই মেয়ের ঘৃণার মধ্যেও সে বেপরোয়া। মদ্যপ বাপের সঙ্গী অনায়াসেই ছোট মেয়েটির যৌবন ঠোকরায়। এরই মধ্যে বড়ো মেয়ে দূর্বা চাকরি আর আকাশ খোঁজে। এই পরিবারের অকিঞ্চিৎকর অস্তিত্বের চারপাশে বেষ্টনীর মতো জড়িয়ে থাকে এক বৃদ্ধ মাস্টারের রঙ্গসন্ধানী মন। পাঠক দাদু-নাতনির মধ্যে আদি রসাত্মক সচল বাঙালি ঠাট্টার একটা নিত্য অভিনয় দেখতে পাবেন এখানে। হয়তো দূর্বা বোসের সৎ জীবনসংগ্রামের একটা জলজ্যান্ত গ্যারান্টি আর প্রতিরক্ষার জন্যেই এ কাহিনীর আয়োজন। রণিত দত্ত এক প্রতিশ্রুতিবান আদর্শ যুবক হয়ে দূর্বা বোসের নারীমনে শিহরণ তোলার জন্যই সারাক্ষণ ভূমিকা পালন করে গেছে।

'দিনকাল' উপন্যাসের এই কাহিনী-পরিকল্পনার মধ্যে কোন পরস্পরচ্ছেদী অথবা সংঘাতমূলক সম্পর্কের ইঙ্গিত নেই। এককথায় এ লেখার প্লট সরলরৈখিক। দূর্বা বোসকে ঘিরেই সমস্ত আখ্যান তৈরী হয়েছে। যদিও এ গল্পের কেন্দ্রভূমে চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে তাকে দেখা যায়নি। তবু মনে হবে, তাকে অভিজ্ঞতা দানের জন্যই সরকারবাড়ির ঘটনাগুলো পর্যায়ক্রমে ঘটে চলেছে, তার যৌবনকে সঞ্চালিত করার জন্যই রণিতের আবির্ভাব। বিজুর প্রসঙ্গ মধ্যবিত্ত রোমান্টিক সেন্টিমেন্টের দিকেই উঁচিয়ে রয়েছে। তার অসুখকে নিয়ে এক বিষণ্ণ স্বাদুতার জাল বিছানো হয়েছে সহজ নিয়মে। বিজুর বাঁচা না-বাঁচার পাল্লা দেওয়া উৎকণ্ঠার মধ্যে এক চরম মুহূর্তে আশাবাদী জিজ্ঞাসায় শেষ পর্যন্ত থমকে দাঁড়িয়ে গেছে উপন্যাস। বিজু বাঁচুক এই প্রার্থনাই যেন 'দিনকাল' উপন্যাসের অসমাপ্ত পরিণতির শেষ ভবিতব্য।

## ৪. সেই অবেলায়

নাট্যরসে ভরা একটি ঝকঝকে উপন্যাস 'সেই অবেলায়' (১৯৩৩-র এপ্রিলে প্রকাশিত)। রক্ষণশীল মূল্যবোধ আর নব্য জীবনাবেগের মধ্যে আকর্ষণীয় লড়াই দ্বন্দ্ব সংঘাতময় প্লটকে সর্বক্ষণ প্রাণবন্ত করে রেখেছে। অন্তরপুর আর বহির্জাগতিকতা দুয়ের মেলবন্ধন ঘটিয়েছে এই উপন্যাস। উৎকণ্ঠা আর কৌতূহলে পাঠককে সারাক্ষণ মগ্ন করে রাখতে পারে 'সেই অবেলায়'। কালের অমোঘ পরিবর্তন অতীতের সুখ-সঞ্চয়কে কিভাবে তছনছ করে দিতে পারে নামী কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার অনুপম মজুমদারের সংসার-বৃত্তান্তে তা ব্যক্ত হয়েছে। বিলাতফেরত মিলন মজুমদারের দিল্লীর মাটিতে পদার্পণ মুহূর্ত থেকেই এর পটোত্তলন। কাকা-কাকীর সংসারে সাবেক ছন্দটিকে সর্বক্ষণ হাতড়ে বেড়ালো

মিলন। অথচ পরিবর্তনের নায়ক হয়ে উঠল সেই। বসের মেয়ে এলাকে নিয়ে তার কেরিয়ার গড়ার স্বপ্নবিলাসটান ধরিয়ে দিল সম্পর্কের শিকড়ে। অনুপম-মিনতির স্নেহরসে পুত্রাধিক মর্যাদায় মানুষ মিলন উঠতে পারল না প্রত্যাশার চূড়ায়। জোড়াতালি দিয়েও ভরিয়ে তোলা গেল না সম্পর্কের ফাঁককে। কালই বোধ হয় হরণ করে নিল সেই সম্ভাবনাকে।

উচ্চ ডিগ্রীধারী বিলাতী ইঞ্জিনিয়ারের খোলা চোখের সামনে আশুতোষ মেলে ধরলেন বিজনেস জগতের অন্তররহস্য। বীভারস কোম্পানীর ছ-আনা দশ-আনার শেয়ারী টানাহেঁচড়ার মধ্যে পক্ষপাতিত্বের সংশয়ে দোল খেতে লাগল মিলন মজুমদার। চৌখস রাজা মোদীর মুঠোর মধ্যে পড়ে কাকা অনুপম মজুমদারের সঙ্গে বিপ্রতীপ মেরুতে দাঁড়াতে বাধ্য হল মিলন। আবার সম্পর্ক-জটিলতার মধ্যে পড়ে নিরন্তর দগ্ধও হল সে। আশুবাবু মিলনকে নায়কের অবস্থানে বসিয়ে একই সঙ্গে তিনটি বৃত্তকে চাখতে চাইলেন। তিন বোনকে নিয়ে গড়ে ওঠা অতীতের রঙ্গভূমি কাকুর সংসার, এলার সূত্র ধরে হেমরাজ মোদী আর অমিতার সূত্র ধরে রাজা মোদীর কিম্বদন্তীময় উপাখ্যান। এই তিনের inter-action নিয়েই নাট্য-উৎকণ্ঠায় সচকিত হয়ে রয়েছে উপন্যাস।

অমিতা পূর্বাবধিই এ উপন্যাসের সঞ্চালিকা শক্তি। গল্পের ফোকাস গোড়া থেকেই তার উপরে রয়েছে। সুদর্শন সিং-এর সঙ্গে তার জীবন গড়ার ইচ্ছাকে বাবা কুশলী চালে নস্যাৎ করার পর থেকেই এক আত্মহননী আধুনিকতায় অমিতা নিজেকে স্বেচ্ছাবন্দী করে ফেলেছিল। সেই সময় থেকেই বাপ-মায়ের সঙ্গে তার নিরবচ্ছিন্ন অসহযোগ। এই অসহযোগ পালটা প্রতিহিংসার চেহারা নিয়েছিল পারিবারিক পছন্দ কুশল বোসের প্রত্যাখ্যান ও প্রস্থান পর্বে। এরকম ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ-চমকানি নিয়ে মেয়েটি আকর্ষণীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে উপন্যাসে। বিশেষ করে মিলনের সঙ্গে চলাফেরায় তার বিগত চাঞ্চল্য-দীপ্তি মাঝে মাঝে নির্লিপ্তির নির্মোক খসানোয় পাঠক বার বার উৎসাহী হয়ে পড়েছেন। আরও একটা কথা। আখ্যানমোচনে বারবার ইঙ্গিতের মতো উঠে এসেছে মিলন-অমিতার খোলামেলা সাহচর্যের কথা। অতীতের সঞ্চয় আর বর্তমানের সচলতা মিলে এই আসঙ্গের অন্তর্ভেদের জন্য একটা অস্থিরতা তিরতির করে বেড়ায় পাঠকের মনে। এই যুগ্ম উপভোগের মনস্তাত্ত্বিক পর্দাটি একবারও সরাননি আশুবাবু। হতে পারে এক্ষেত্রে উৎকণ্ঠা জাগিয়ে রাখাটাই তাঁর প্ল্যান।

আর একটি উৎকণ্ঠার পর্দা সারাক্ষণ ঝুলিয়ে রাখা হল স্ত্রী-হত্যাকারী ও অনাচারী রাজা মোদীর উপরে। হেমরাজের মতে যে একই সঙ্গে আনপ্রেডিক্টেবল ও ব্রিলিয়ান্ট। বিজনেস কিং হেমরাজ মোদী শত্রুতা সত্ত্বেও যাকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর একমাত্র যোগ্য উত্তরাধিকারী ভাবেন, তার ওজন না বোঝার কোন কারণ নেই। অমিতার মতো বুদ্ধিদীপ্ত মেয়ের নির্ভরতা যে অর্জন করে তার দামই বা কম কিসে। এরই মধ্যে প্রতিটি কর্মধারায় রাজা মোদীর মিটিমিটি হাসি এক অনাবিষ্কৃত আখ্যানের দিকে আমাদের টানতেই থাকে। এই সংশয়গত টানাপোড়েনের জের চলে নাট্যমতে একেবারে অন্তিম দশা পর্যন্ত। দোর্দণ্ডপ্রতাপ জ্যাঠার অস্তিত্বে অবিশ্বাস্যভাবে টাল ধরিয়ে যে চূড়ান্ত মুহূর্তে বাধ্য ছেলেটির মতো প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ায়, তাকে এককথায় 'হিরো' ছাড়া আর কি-ই বা বলা যায়! আশুবাবু একচালে বাজিমাৎ করেছেন শেষকালে। এহেন রাজা মোদীর চালিকাশক্তির আসনে অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করেছে অমিতা। বাপের সঙ্গে শত্রুতার ক্রূর

আনন্দে উল্লাসসুখ পেত যে মেয়েটি, সেই বিজয়িনীর মতোই দীপ্তিময়ী হয়ে উঠল। বাবার প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ দিয়ে তাকে স্বস্তি ফেলার অবকাশ দিল মেয়েটি। সঙ্গে সঙ্গে রাজা মোদীকে কিম্বদন্তীময় অপবাদের চক্র থেকে বার করে এনে পরিচ্ছন্ন মানবিকতায় দাঁড় করিয়ে পাঠককে হতভম্ব করে দিল সে। এরপরই বিজয়িনীর মতোই অবলীলাক্রমে তার নিঃশব্দ প্রস্থান একেবারে ড্রামাটিক। জেদী মেয়েটি সবার নাক ঘষে প্রমাণ করে দিয়ে গেল অভিভাবকদের অননুমোদন সত্ত্বেও তার পাত্র নির্বাচন একেবারে নির্ভুল। এর পর পাঠক হয়তো পূর্বপর্বের অভিমানী বিক্রিয়ার জন্য তাকে শতাংশে অপরাধী করতে আর সাহস পাবেন না। বরং এক চমকপ্রদ চঞ্চলতার ঘূর্ণাবেগ ধাঁধিয়ে দেবে তাঁদের মন আর মেজাজকে। মধ্যবিত্ত আটপৌরে কাহিনীর একঘেয়ে মকসো যে করেননি আশুবাবু এটাই বাঁচোয়া!

## ৫. মেঘের মিনার

'মেঘের মিনার' উপন্যাসটি সালে প্রকাশিত। এক পুরুষকারের ট্র্যাজেডি এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু। ভাগ্যহীন শুভ্রেন্দু নন্দী জীবনের মাঝপথে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ থেকে বাঁক নিয়ে অকস্মাৎ ডানাভাঙা পাখির মতো মুখথুবড়ে পড়েছিল: যার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার কথা ভাগ্যের পরিহাসে সে হয়েছিল মোটর মেকানিক। শুভ্রেন্দুর একমাত্র সম্বল তার পুরুষকার। রফি আহমেদের হাতেগড়া চোস্ত মেকানিক উদ্যোগী পুরুষের মতোই এক গ্যারেজের মালিক হয়েছিল। সেই উত্থানপর্বের পর শুধুই এগোনোর ইতিহাস। কালক্রমে শ'খানেক কর্মচারীর অন্নদাতা নাগুী অটো হাউসের একচ্ছত্র মালিক শুভ্রেন্দু নন্দী। প্রতিষ্ঠার মধ্যলগ্নে এই মানুষটির সঙ্গে পাঠকের পরিচয়। অক্লান্ত শ্রমনিষ্ঠ, দক্ষ প্রশাসক, মানুষ চেনার জহুরী, সদাসতর্ক সপ্রতিভ মানুষটির ব্যবসা পরিচালনার ভঙ্গিমার সঙ্গে ক্রমেই পরিচিত হওয়ার অবকাশ পান পাঠক। এরপরই ধস নামে বর্তমানে। বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে দুষ্ট ব্রণের মতোই জড়িয়ে থাকে যেসব সমস্যা, মালিক-শ্রমিকে অনিবার্য বিরোধের সেই ভবিতব্য থেকে রেহাই পায় না নাগুী অটো হাউস। সংঘাতের কূট জালের মধ্যে প্রবেশ করে বৃত্তান্ত। শ্রমিক-নেতার পদচ্যুতি, একটানা শ্রমিক অসন্তোষ, পরে অসন্তুষ্ট শ্রমিকের একাংশের ক্রোধবহ্নিতে কারখানা ভস্মীভূত হয়। শুভ্রেন্দু নন্দী ভাগ্যচক্রের আবর্তনে আবার পথে এসে দাঁড়ায়। নিরুদ্দিষ্ট নায়ক তার জীবনভোর কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এক ট্র্যাজিক দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে যায়। পুরুষকারের এই বিপর্যয় দশার চালচিত্রই হল 'মেঘের মিনার'। সত্যিই মেঘের মিনারের মতো এখানে পুঞ্জীভূত আয়োজন, আবার তারই চরিত্রধর্ম অনুসারে তা ক্ষণস্থায়ী-ও। আর মিনারের সৃষ্টিকলায় সৌন্দর্যের যে হাতছানি থাকে, শুভ্রেন্দুর ব্যক্তিত্বে তার আকর্ষণীয়তাও বর্তমান।

শুভ্রেন্দুর ভায়োলিন তার জীবনরাগিণীরই যথাযথ প্রতীক। দুর্ভাগ্য তাকে যে পথে নামিয়েছিল, তারই ধূলিকণা থেকে তার সুরসৃষ্টির মন্ত্র আহরণ। এক ভিখারী তার শিক্ষাগুরু। নিঃসঙ্গ একক যাত্রাপথের বিষণ্ণতা এই তারের যন্ত্রে ভাষা পেলে শুভ্রেন্দুর অতীত-বর্তমান-ব্যাপ্ত রাগিণীটিকে ঠিক চেনা যায়। ভায়োলিনের তার যখন শিল্পের যাদুস্পর্শে সম্মোহন ছড়ায় তখন অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের বার্তা শোনা যায়। একটি নয়, দুটি নারী পর্যায়ক্রমে বশ্যতা মেনে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে, আত্মসমর্পিতা নারীর নিবেদনে বন্দিত হয় পৌরুষ। সুমিত্রা বোস এই অভিসারের টানেই শুভ্রেন্দুর জীবন-

সঙ্গিনী হয়। শুভ্রেন্দু ও ভায়োলিন এইভাবেই কৃতার্থতার যুগল বিগ্রহ হয়ে ওঠে।

শুভ্রেন্দু-সুমিত্রা অধ্যায় এ উপন্যাসের আর এক আকর্ষণীয় অংশ। সাপুড়ের বাঁশী যেভাবে নাগিনীকে অবলীলাক্রমে হেলায়-দোলায়, তেমনি ভায়োলিনের আকুলকরা সুরতরঙ্গ এক অভিসারিণীর অমোঘ সংকেত হয়ে দাঁড়ায়, শিল্পের সম্মোহনে আকর্ষিতা নায়িকা বলিষ্ঠ পুরুষের আলিঙ্গনে নিজেকে সঁপে মনে করে শিল্পের ক্রোড়েই বুঝিবা সে আশ্রয় পেল। কিন্তু জীবনের বিপ্রতীপ টান বড়োই বেদনাদায়ক। শিল্পীর সৌম্য অস্তিত্ব যখন মেকানিকের তেল-কালি-মাখা চেহারায় ধাক্কা খায়, তখন সুমিত্রা বোসের অভিজাত মনের শৈল্পিক সূক্ষ্মতা মার খায়। আর এই বিড়ম্বনার গর্ভে তলিয়ে যায় শুভ্রেন্দুর দাম্পত্য। নারীর অধিকারস্পৃহার কাছে, অভিভাবক-পরায়ণতার কাছে ব্যক্তিত্বে নত হতে না পারার মাশুল দিতে হয় শুভ্রেন্দুকে নানাভাবে। প্রত্যাহতা সুমিত্রা ক্রোধে-ঈর্ষায় নৃশংস হয়ে উঠে শুভ্রেন্দুর প্রতিষ্ঠার মূলে কুঠারাঘাত হানে। শুভ্রেন্দুরই বিশ্বস্ত মেকানিককে হাত করে শ্রম-বিরোধের উত্তাপ ছড়িয়ে পরিশেষে প্ররোচনায় নাণ্ডী অটো হাউসে আগুন লাগিয়ে দেয় সুমিত্রা বোস। এক বিষকন্যার দীর্ঘশ্বাসে নীল হয়ে যায় শুভ্রেন্দু।

## ৬. বাসকশয়ন

সবচেয়ে জটিল প্লটের উপন্যাস 'বাসকশয়ন'। এর প্রকাশকাল জানুয়ারি, ১৯৭৮। উপন্যাসটি মনস্তাত্ত্বিক-ও। হয়তো মনোরোগীর বৃত্তান্ত বলেই ডাঃ অমল চক্রবর্তীর হাতে উৎসর্গ করা হয়েছে। দারিদ্র্য ও নিরাশ্রয়তার অভিশাপ মাথায় নিয়ে এ গল্পেরও মুখ্য চরিত্র অধ্যবসায় আর শ্রমের গুণে উত্থিত হয়েছে সমৃদ্ধিলোকে। এই খণ্ডের অন্যান্য উপন্যাসের মতো জয়ন্ত বোসেরও বিহার বাণিজ্যজগতে। নিখুঁত শিক্ষানবিসী থেকে শুভ্রেন্দু নন্দী আর জয়ন্ত বোস দুজনেই সাফল্যের চাবিকাঠি হাতে পেয়েছে। তবে এ গল্পের পরিকল্পনা পৃথক। দ্বৈত চরিত্র-সংঘাতে লিপ্ত জয়ন্ত বোসের পরিণাম ট্র্যাজেডিতে নয়, সংশয়-উত্তীর্ণ মিলনে।

বাসকশয়নের বৈচিত্র্যের আয়োজন বড় কম নয়। প্রতি পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী জিতেন বোসের জীবনে করিতকর্মের দৃষ্টান্ত সর্বত্র। ব্যবসার ক্ষুরধার জগতে স্বচ্ছন্দ বিহারের মেজাজ তার প্রতিটি আচরণ ও অভিব্যক্তিতে এমনই নিয়ন্ত্রণের ছাঁদ এনে দিয়েছে যার কারণে প্রতিটি 'মুড' ও অভিপ্রায়কে আত্মশাসনে রেখে সে যথেচ্ছভাবে ঘোরাতে পারে। তার স্ত্রী যশোধরার ধাতুতেও প্রায় একই উপাদান। শিক্ষাগত যোগ্যতায় জৌলুসহীন মধ্যমানে থেকেও চিত্ত শাসনের পারদর্শিতায় সে স্বামী জিতেনের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিনী। এই দুই ব্যক্তিত্বের আন্তরসংঘাতের কলার নামই 'বাসকশয়ন'। এই সংঘাতের ছটায় পাঠকের চোখ ধাঁধাতে বাধ্য।

জটিল প্লটের নিয়মানুসারেই সাব-প্লটগুলির শায়ক মূল বৃত্তান্তের দিকেই উদ্যত। এজন্যই গল্পে বাঁক অনেকগুলি, পরস্পরচ্ছেদিতায় আখ্যান সবসময়ে সচকিত উত্তপ্ত থেকেছে। বাসকশয়নের প্লট-বিন্যাসে রহস্যগল্পের ভঙ্গিমাও লক্ষ্য করার মতো। নাট্য-উৎকণ্ঠাকে এক মুখে জাগিয়ে রেখে অন্তিমের পটোত্তলনে দিকবদলের ফলে বিস্ময় ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। ঘটনার যোগসাজসে যশোধরার নীরব আত্মদানে যখন ছলনা-পরায়ণতার মোটিভ প্রায় পরিষ্কার, জিতেন বোসের উদ্যত অভিযোগে তার 'ছেনালীপনা' যখন প্রায় প্রমাণিত সত্য, তখনই অতীতের যবনিকা তুলে যশোধরা হারানো সূত্রগুলি

(missing Link) জুড়ে যে সত্যের মূর্তি গড়েছে, তাতে প্রায় ভিলেন হতে যাওয়া নায়িকা উজ্জ্বল ভাবমূর্তিতে অকস্মাৎ প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। দ্বন্দ্ব-নিরসনের এই 'তুরুপ তাস' পদ্ধতি রহস্য-রোমাঞ্চের আবেশ তৈরী করে দিয়েছে উপন্যাসে।

জিতেন বোসের প্রবল পৌরুষের আকর্ষণীয় শক্তির কাছে পরাহত হয়ে যৌন-দস্যুবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে বসেছে লীলা, অদিতি, যশোধরা, তন্দ্রা, কমল ইত্যাদি নারীর দল। এরা হয় সন্তানলালসায়, অথবা আন-ম্যাচ স্বামীর সঙ্গ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভের প্রত্যাশায়, নচেৎ প্রথম কৌমার্য পীড়নের যৌন-উত্তেজনায় জিতেন বোসের লক্ষ্যপথের শিকার। এদের ভূমিকা থেকে জীবনপ্রবাহের একটা ব্যাখ্যা হয়তো পাওয়া যায়। প্রকৃতিধর্মে নিপীড়িতা হওয়ার প্রস্তুত মানসিকতা এইভাবেই প্রবল পুরুষের কাছে নারীকে যৌনাবনত হতে শেখায়। স্থূল হলেও একথা সত্য। জিতেন বোসের লুণ্ঠনবৃত্তির পথে যে প্রবল প্যাশনের ছবি আশুতোষবাবু পর্যায়ক্রমে এঁকেছেন, এমন উন্মুক্ত বাসনাবহ্নির ছবি আশুবাবুর 'বাসকশয়ন' ছাড়া অন্য কোথাও বেশি নেই, অন্তত এই খণ্ডে তো বিরল-ই। সে হিসাবে উপন্যাসটি সত্যই সার্থকনামা। মন্মথের মন্থিত শয্যা থেকে অবশেষে প্রণয়-অমৃতের জন্ম হল, এই দিকদর্শনের কাব্যিকতা এক অন্য তাৎপর্য বয়ে আনে উপন্যাসটির জন্য।

অবশ্য জিতেন বোসের এই আগ্রাসী ক্ষুধা স্বভাবলাম্পট্য হয়ে কখনো ধরা দিল না ঔপন্যাসিকেরই আর এক পরিকল্পনার গুণে। এক গোপন মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধির লক্ষণ হিসাবে তার যৌন ভাবাবেগকে দেখার পরামর্শ দিয়েছেন আশুবাবু। ছয়বছরের ছেলের মানসিক গঠনপথে এক দুর্ঘটনার প্রবল চাপ নেমে এসেছিল। মায়ের গুপ্ত ব্যভিচারের অভিযোগ ওঠা ও পরিণামে তার উদ্বন্ধনে মৃত্যুর ঘটনায় দিকভ্রান্ত জিতু ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল আশ্রয় ছেড়ে। এর পর তার উত্থানমুখী জীবনপরিক্রমায় অভিশপ্ত ছায়ার মতো তার সঙ্গী হয়ে উঠেছে ঐ ঘটনায় প্রতিক্রিয়াজাত ক্রোধ ও নৃশংসতার এক গুপ্ত ইচ্ছাবৃত্তি। এরই তাড়নায় তার যৌনাচারের বিকৃত দশা, উন্মাদ গ্রাসে নারীদেহকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলার এক প্রবল দস্যুবৃত্তি। কমল গুপ্তের আসঙ্গে ঘুমন্ত অপদেবতার আত্মপ্রকাশ প্রথম পাঠকের নজরে পড়ল। তার আবেগলীলা ব্যভিচারলীলা, যশোধরার কৌমার্যের ওপর আচমকা হামলার অভিজ্ঞতার এই অসুস্থ বিকারলক্ষণের কোন অর্থবহ ইঙ্গিত ছিল না। পরে বধূরূপা যশোধরার উপর হঠাৎ হঠাৎ যৌন-নিপীড়নের ঘটনায় কোন এক ছায়ারূপী অস্তিত্বের অনুমান পাওয়া গেল। কমল গুপ্ত এসে অবশেষে উদঘাটিত করে দিয়ে গেল এক মনোরোগীর লুকানো ইতিহাসকে। রাঙা-মায়ের ঘৃণিত বিতাড়নের লজ্জা মোচনের জন্যই জিতুর মায়ের আত্মহনন, এই জ্বালা ধরানো অনুভূতির কুশলী উদগিরণের কাহিনীটি কমল গুপ্তকে ঘিরে যে অবয়ব পেল, তা যেন চিকিৎসাশাস্ত্রের এক দলিল বিশেষ। রাঙামায়ের মেয়েকে ধরে এই জ্বালা মেটানোর কাহিনী যেন কুমু-মধুসূদন বিরোধেরই এক রূপান্তরিত প্রক্ষেপ।

'বাসকশয়ন'-এর শক্তিদায়িনী পরিণামের একটি চমকপ্রদ রূপ রয়েছে। শুধু সাদামাটা কমেডি-প্ল্যানের জন্য নয়। ঐ অংশে যে মোচড় আছে, প্রতাপান্বিত পুরুষকারের সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তির (যশোধরা) কাছে হার মানার ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে ক্ষুধা-বাসনার ঊর্ধ্বে প্রতীক্ষমাণ প্রেমনিষ্ঠার জয়ী হওয়ার সত্যটি প্রত্যক্ষ করা গেছে। তন্দ্রাকে শিকারবৃত্তি থেকে বাঁচানো এবং একই সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত পুরুষকে গ্লানি

থেকে বাঁচানোর প্রতিজ্ঞায় কুমারী ধারার আত্মবলিদানের ঘটনা সত্যই আমাদের চমৎকৃত করে। নিজের যৌবন উন্মোচন করে সেদিন দর্পিত দস্যুটিকে শান্ত করার যে উদ্যোগ শুরু হয়েছিল, দাম্পত্যের রুটিন ক্রিয়ায় তারই ধারানুগমন চলেছে। আপাতদৃষ্টিতে যাকে সহিষ্ণুতা এবং নারীর আত্ম-শিহরণে জেগে ওঠা বলে বার বার মনে হয়েছিল, তা যে নিষ্ঠাবান প্রেমেরই প্রহরাবৃত্তি এই আবিষ্কার জয়ন্ত বোসের সঙ্গে পাঠককেও হতবাক করে দেয়। পরে প্রণয় প্রতিমার বুকে মাথা রেখে রোগক্লান্ত পুরুষের বাসনামন্থন পর্ব শান্তিলাভ করে, এ চিত্রের সত্যই একটা মনোরম দিক আছে। ব্যাঙ্কব্যালান্সের গ্যারান্টি নয়, জমি হস্তান্তরের দলিলনামা নয়, বন্দিত পুরুষকারকে নিজের অধিকারে স্থিত রাখার সুখেই যশোধরার নারীত্বের চরিতার্থতালাভ বোধহয় জীবনের শাশ্বত বাণীরই রেখাচিত্র। 'বাসকশয়ন' তাই দ্বন্দ্বময়তারই এক পূর্ণ আলেখ্য, আরম্ভ ও শেষ উভয় ক্ষেত্রেই।

## ৭. চাঁদের কাছাকাছি

'চাঁদের কাছাকাছি' এক ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস। অসম্ভব সম্পাতন এ গ্রন্থের সর্বঅঙ্গে মাখানো। গল্পের ঝোঁকে এমন অনেক মুহূর্ত এখানে জড়ো হয়েছে যার সঙ্গে জীবন বাস্তবতার সম্পর্ক একেবারেই ক্ষীণ। তবু কল্পনার হাতছানি ধরে এ গল্পের চারপাশে আরেকের আবেদন জোরালো হয়ে উঠেছে। যেমনটি হলে ভাল হত তাকে ঘিরেই ঔচিত্যের এমন একটা মিনার তৈরী হয় তার সৃষ্টিতে আমরা চমৎকৃত না হয়ে পারিনি। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংঘাত, কুটিলতা ফেলে এক খোলা আকাশের তলায় দাঁড়াতে পেরে আপনা থেকে আবেশে চোখ মুদে আসে।

এ গল্পের ঐন্দ্রজালিক ড. চন্দ্রনাথ মুখার্জি। ইনিই চাঁদ বা চান্দা। একে ছোঁয়া যায়, কিন্তু ধরা যায় না একেবারেই, সম্পর্কজালে বন্দী করা তো একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। সেরা ছাত্র, তুখোড় অধ্যাপক, বছরে পাঁচ-ছটা সংস্করণ হওয়া টেক্সট-বই রচয়িতা চাঁদ মুখার্জির নিজস্ব এক জগৎ আছে, স্বার্থলেশহীন উৎফুল্লতা এবং তৃপ্তি যেখানকার সারকথা। আমাদের জটিল পৃথিবীর প্রতিযোগিতা, যান্ত্রিক অভিনয়ের ধারা যার কাছে ম্লান হয়ে যায়। অথচ এই পৃথিবীর যন্ত্রণাতেই তিনি নীলকণ্ঠ। বোধ হয় এজন্যই শুধু ঔচিত্য দিয়ে তিনি সংসারের এক মনোলোক নিজের মতো করে গড়ে নিয়েছেন। সেই উচ্চভূমিতে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে হয়েছে এই আমরাই এক মেন্টাল অ্যাসাইলামের স্থায়ী বাসিন্দা। গল্পটির মজাই এইখানে। পরম মমতায় সবার জন্য তৃপ্তির পরিবেশ গড়ে দিয়ে এক মনোরোগী আমাদের মানসিক অসুস্থতাকেই আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলেন। স্বোপার্জিত ৭৫ হাজার টাকা বণ্টন করে দিয়ে মাত্র ২০০ টাকার রাহাখরচা সঙ্গে নিয়ে সবাইকে হতভম্ব করে দিয়ে এই ফেরেস্তা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছেও কারও চাঁদের জমি কেনা হয়ে উঠল না। গল্পটি এই বিন্দুতে গিয়ে যখন আটকে যায় তখন তার সূত্র ধরে ত্রিশঙ্কুর মতো আমাদের ঝোলা ছাড়া গতি থাকে না।

চাঁদ মুখার্জির প্রায় অপার্থিব অলৌকিক অস্তিত্বকে ঘিরে যারা হাজির হয়, যেন তাদের আসাটাই ছিল অপ্রত্যাশিত। মন্ত্রী, ব্যবসাদার, উঠতি লেখক, বিলাতগমন-প্রত্যাশিনী মহিলা, যমদূতের মতো দুই রোবট মস্তান এদের নিয়েই চাঁদের সন্নিকটবর্তী সংসার। লৌকিক সংস্কারবশে এরা চাঁদ মুখার্জীকে দস্যু বানায়, আবার মুঠোমুঠো অর্থ ও তৃপ্তি বিলানোয় তাঁকেই ফেরেস্তা বলে মনে করে। প্রাক্তন পূর্ণমন্ত্রীর সংসাররাজ্যে তাঁর আবাহন-

অভ্যর্থনার ঘটা দেখে আমরাই নিঃশব্দে হাসি, ভাবি কত সহজ কারণেই স্বার্থবশীভূত আমরা সংসারে কত মনোরম বস্তুই না বানাই, আবার নির্দয়ের মতো আছাড় মেরে ভেঙে ফেলি। গল্প বোধ হয় একথাও জানান দেয়, তাঁর আচরণ থেকে বিকীরিত প্রতিভাছটায় মন্ত্রমুগ্ধ হতে পারাটাই সম্ভবত স্বভাবে হীনম্মন্য মানুষগুলির প্রকৃত ভবিতব্য। গল্প পড়তে পড়তে মনে হয়, আশুতোষবাবু হয়তো একখানা পূর্ণাঙ্গ রূপকই আমাদের উপহার দিয়েছেন। যার দর্পণে আমাদের দীনতা, নগ্ন লোভ ও স্বার্থপরতার মুখগুলিই দেখা যায়। সত্যশরণ দ্য মিনিস্টার, ধর্মেন্দ্র চৌধুরী, কল্পনা রায়, স্বপ্না, রঞ্জন, রাণী, এরা কত যে খাটো হয়ে যায় তার ইয়ত্তা নেই।

'চাঁদের কাছাকাছি' হলেও হতে পারতো এক কিশোর রহস্যোপন্যাস (আধা)। কারণ অসংলগ্ন ও অস্বাভাবিক আচরণের যে মোড়কে এখানকার ঘটনাগুলো বাঁধা আছে তার পরতে পরতে উদগ্র কৌতূহল ও রহস্য-অ্যাডভেঞ্চারের আকর্ষণ বাসা বেঁধে রয়েছে। এলাহাবাদ স্টেশনের ক্যান্টিন হলে ধর্মেন্দ্র চৌধুরীর পাশবিক খাদ্যায়োজন সাজিয়ে বসে থাকা এবং নকল দাঁত খোঁজার হুটোপুটি থেকে এর সূচনা, এরপর চান্দার ট্রেন ফেল করে বেদম হাসি এবং ট্রেনযাত্রী ধর্মেন্দ্র চৌধুরীকে উপর্যুপরি চাহিদায় নাস্তানাবুদ করা, অথচ চরিত্রধর্মের টানে মহেন্দ্রবাবুর চান্দার চরিত্রগুণে আবিষ্ট হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি ঘটনায় ভাল-মন্দ মেশানো নানান কৌতূহল অচেনা আগন্তুকের চারপাশে জমতেই থাকে। এরই মলধনে চাঁদ মুখার্জি অনেক উদ্ভট আচরণ প্রকাশ করার লাইসেন্স পেয়ে যান। চাকলাদার অ্যান্ড সন্স—এই প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চন্দ্রনাথবাবুর জবরদস্তিতে একটা লাভ হয় পাঠকের। উটকো লোকটির পাণ্ডিত্যের উপরে একটা জোরালো আলো এসে পড়ে। এখান থেকেই অন্ধকার ও ধোঁয়াশার পটোত্তলন শুরু। তবে এই কৌতূহল আর উৎকণ্ঠা জাগিয়ে রাখার জন্য একটা কৌশলও করেন ঔপন্যাসিক। শেষ পর্যন্ত গল্পের পাত্র-পাত্রীবা চাঁদ মুখার্জির আচরণগত অসংলগ্নতার কারণ নির্ণয় করল এক পণ্ডিত দার্শনিকের খামখেয়ালিপনা দিয়ে। কিন্তু পাঠক ছাড়া এঁরা কেউ একবারের জন্যও চান্দার মনোরোগের সন্ধান পেল না। চান্দার কয়েকবারের উন্মনামুহূর্তের চিন্তাসূত্র বিজ্ঞাপিত হল সেই পাঠকেরই কাছে, বাকীদের কাছে তা ঘেরাটোপেই আটকা পড়ে রইল।

আরও একটি কথা। এ উপন্যাসের শেষ প্রতিবেদন নূতন প্রজন্মের কাছেই। সুখ এবং স্বস্তির কাঙাল মানুষগুলির হাতে প্রাপ্তির রসদ পৌঁছে দিয়েও চাঁদ মুখার্জির নাটকীয় প্রস্থানের পূর্বে জীবনের বীজমন্ত্রটি বিশেষ করে উচ্চারিত হল স্বপ্না-রঞ্জনের কাছে। কারণ তাঁর ভয়, এই করুণাপ্রত্যাশী অসহায় মানুষগুলো আবার অজান্তে অসুখের ফাঁদে পা দিয়ে বসবে। রঞ্জনকে সম্ভাষণ করে চাঁদের উপদেশ—'আর তুমিও কখনও তোমার কোন বন্ধুর সঙ্গে ওর বেশি আলাপ করিয়ে দেবে না, মনে থাকবে?' মেন্টাল হসপিটালের স্থায়ী রোগী ড. মুখার্জি কি আত্মযন্ত্রণার ক্ষতকে এইভাবেই ভুলতে চাইলেন? আরও মুখার্জিরা যাতে প্রস্তুত না হয়, তারই জন্য কি এই সতর্কবাণী?

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যক্ষ,
বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

# আমি সে ও সখা

উৎসর্গ

তুলসীকান্তি দে বিশ্বাস

প্রিয়বরেষু

কোথায় যেন পড়েছিলাম বা কোথায় যেন শুনেছিলাম কথাটা ঠিক মনে নেই। প্রেরণা আর দ্বিধার এক নৌকোয় ঠাঁই হয় না। একটা আর একটার সহচর বা সহচরী নয় কখনো।

কথাটা আমার মনে আছে কারণ এই সত্যটা আমি বিশ্বাস করতে চেয়েছি, অনেক সময় ওটা আঁকড়ে ধরতে চেয়েছি। ওই সত্যের ওপর নির্ভর করে অনেক বাধা অনেক বিঘ্ন উত্তীর্ণ হতে চেষ্টা করেছি, অনেক সংশয় অনেক সংকোচের ওপর ছড়ি উঁচিয়ে সত্তা উপলব্ধির রসদ খুঁজেছি।

কিন্তু আসলে মেয়েটা আমি দুর্বল। যে সবল, সর্ব রকমের প্রেরণার স্রোতে সে অনায়াসে গা ভাসাতে পারে। তার কোনো সবল উক্তি বা প্রবচনের নির্ভর দরকার হয় না। আমার মনের তলায় একটার সঙ্গে আর একটার বিরোধ লেগেই আছে। সমস্ত রকম প্রেরণার সামনেই একটা না একটা দ্বিধার প্রাচীর মাথা উঁচিয়েই আছে। আমাকে সেটা লঙ্ঘন করতে হয়, প্রাণপণ চেষ্টায় সে অবরোধ ডিঙোতে হয়। সেটুকু পারার মধ্যে এক ধরনের আত্মপ্রসাদ আছে বটে। কিন্তু তার শ্রান্তি আর ক্লান্তিও আছেই।

কায়িক শ্রমের অবসাদ ভালো করে স্নান করলে কাটে। ভালো করে মাথা আঁচড়ে, নিপুণ হাতে অল্প-স্বল্প প্রসাধন বিন্যাস করে. কপালে জ্বল-জ্বলে ছোট সিঁদুরের টিপ পরে সিঁথিতে রক্তিম শিখার আঁচড় কাটার পর ভেতর-বার সবই ঝরঝরে দেখায়। কিন্তু অবসাদের বাসা যে-মেয়ের বুকের তলায় সে কি করবে? নির্ভেজাল সাদাটে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানোর প্রেরণায় যে-মেয়ের ভিতরে ভিতরে উদ্দীপনার কাঁপন ধরে অথচ এই অবরোধের প্রাচীরটাতে ক্রমাগত মাথা ঠুকতে হয়, তার সঙ্গে যুঝতে হয়—সে কি করবে? সেই ক্ষত তার শ্রান্তি আর অবসাদ সে মুছবে কেমন করে?

না মুছুক. ঢাকা পড়ে। চাপা পড়ে।

গরমের দিনে আমি কম করে চার বার স্নান করি, আর ঘুরে ফিরে কতবার করে যে কানে চোখে মুখে জল দিই তার হিসেব নেই। শীতের দিনেও দু'বার চান করিই। ঠাণ্ডা-জল গরম-জল দু' রকমেরই অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে। দুটো আলাদা আলাদা কল খুললেই হল, চাইলে ঠাণ্ডা জল পড়বে, চাইলে গরম জল। শুধু এই কেন, ঝকঝকে তকতকে এই ছোট বাড়িটুকুর মধ্যে আরামের আরো অজস্র ব্যবস্থা অজস্র উপকরণ রয়েছে। যা নেই তা এ-বাড়ির মালিকের মাথায়ও নেই। নইলে থাকত, থাকবে। এই সেদিন রচনাবলী ওলটাচ্ছিলাম, অদূরে বসে আমার মালিক নিবিষ্ট মনে তার নার্সিং হোম সম্প্রসারণের ছক দেখছিল। ...কি বললাম? আমার মালিক? নিজেই বললাম, নিজেই স্বীকার করলাম অথচ ভিতর থেকে একটা অসহিষ্ণুতা ঠেলে উঠতে চাইল কেন?...তবু মালিক বই কি। এ-কথা সে মুখে বলে না, আচরণে ব্যবহারে মালিকানা খাটায় না, আমার মুখের কথা খসলে অন্তরঙ্গ খুশির প্রলেপে সেটা হুকুমের মতো করে শিরোধার্য করে। তবু আমি কে? আমি কি? আমি তার সজীব একখানা আদরের সামগ্রী, সংরক্ষণের সামগ্রী, আরামের সামগ্রী। কথাগুলো অত্যন্ত স্থূল আর শ্রুতিকটু জানি। মনের কথার রূপ দেবার মতো ভাষার দখল আমার কিছুটা আছে। কিন্তু কথাটা যদি নির্মম সত্য হয় অলঙ্কারে সাজালে তার ধার খোয়া যায়।

যাক, রচনাবলীর কবিতাটাতে চোখ আটকে যেতে দুটো পঙক্তি জোরেই পড়লাম, 'তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা, এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও

রণসজ্জা।' এটুকুই পড়ে অদূরের মানুষটার দিকে চুপচাপ চেয়ে রইলাম।

সেই নীরবতাটুকুই তন্ময়তা ভঙ্গের কারণ সম্ভবত। ফিরে তাকালো।

বাঃ, চমৎকার কথাগুলো তো!

কি চমৎকার?

ওই যে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা—এর মধ্যে যাকে বলে স্ট্রাগল-এর একটা বলিষ্ঠ আর সম্মানের দিক আছে, তাই না?

আমি মাথা নাড়লাম। তাই। মনে মনে ভাবলাম কবিগুরুর এইখানেই বাহাদুরি। তাঁর ভাণ্ডার থেকে যে যার মনের মতো রসদ সংগ্রহ করে নিতে পারে।

কোন কথা থেকে কোন কথায় এসে গেলাম। আমার লেখার সমালোচকরাও মাঝে মাঝে এই জন্যে হুল ফোটাতে ছাড়েন না। লেখেন, আমার মতি চঞ্চল, একটা কথা বলতে গিয়ে বক্তব্য ছেড়ে পাঁচদিকে ছোটাছুটি করি। বার বার চান করা আর চোখে মুখে জল দেবার কথা বলছিলাম। আমার কর্তার ধারণা শীতের দিনের সন্ধ্যার স্নানটা অন্তত আমি গরম জলে সারি। কিন্তু হাড়ে-হাড়ে ঠকঠক কাঁপুনি ধরলেও বেশির ভাগই আমি গায়ের ওপর ঠাণ্ডা জলের শাওয়ার খুলে দিই। তখন যন্ত্রণা হতে থাকে। পরে ভালো লাগে। মাঝে মাঝে নিজেরই অবাক লাগে, শরীরটা আমার কোন ধাতুতে গড়া? কোনোদিন ঠাণ্ডা বা সর্দি লাগার নাম নেই। ভিতরটা সর্বদা কেমন তপ্ত আর খরখরে। যত বার কানে মুখে চোখে জল দিই ততবার ভালো করে মুখ মোছার পর আর কিছু না হোক একটু পাউডার অন্তত বুলিয়ে নিই।

কিন্তু কেন? কেন এ-রকম করি আমি?

নিজেকে ঝরঝরে তাজা দেখাবার লোভে? কারো চোখের প্রসাদ পাই বলে? না ভিতরের ওই ক্ষত ওই অবসাদ ওই শ্রান্তি চাপা দিতে চাই বলে, ঢেকে রাখতে চাই বলে?

টেলিফোন বেজে উঠল। উঠলাম। কার ফোন অনুমান করতে পারি। কি বলবে তাও। ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল। বেলা দেড়টা...

হ্যাঁ, বলো।

কি আশ্চর্য, আমিই ফোন করছি তুমি বুঝলে কি করে?

হাসতে ইচ্ছে করছিল কিনা জানি না। তবু ওদিকের কান জুড়নোর মতো করেই হাসলাম।—বলো তো কি করে?

কি জানি, তুমি যাকে বলে ওয়ান্ডারফুল। কি করছিলে, লেখা থেকে উঠিয়ে আনলাম না তো?

বেলা দেড়টা, খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ, এখন লেখা! আমি কি তোমার মতো ডাক্তার যে নাওয়া-খাওয়া জ্ঞান নেই! না এসে টেলিফোন করছ মতলবখানা কি?

সত্যি বড় আটকে গেলাম। লক্ষ্মীটি আর অপেক্ষা না করে খেয়ে নিও।

তুমি?

আমার ফিরতে সেই সন্ধ্যা। তবে আমার খাওয়া তোমার থেকে ভালোই হবে নিশ্চিন্ত থাকো, সুধীর বড় হোটেল থেকে টেলিফোনে খাবার আনাচ্ছে, আমি সেই ফাঁকে তোমাকে ধরেছি।

হ্যাঁ, কথা শুনলে একটা স্পর্শের মতই লাগে বইকি। হেসেই জবাব দিলাম, খুব ধরেছ। সুধীরকে বোলো, এই নিয়ে এ-মাসে চারদিন হল, এরপর আমি ওর চুলের ঝুঁটি ধরব।

ও-দিক থেকে আরো জোরালো হাসি ভেসে এলো। সেই লোভে সুধীর না আমাকে উপোস করিয়ে রাখে, চুলের ঝুঁটি তো আর দূর থেকে ধরা যায় না।

ছকে বাঁধা রসিকতা। আমার দিক থেকেও ছকে বাঁধা হাসি আর ভ্রূকুটি।—দেব দুজনের মাথা ঠুকে!

সুধীর দত্ত। তার যোগ্য দোসর, যোগ্য সহচর। দুজনে মিলে সার্থক সফল জীবনের সিঁড়ি তৈরি করে চলেছে। সেটা শেষ পর্যন্ত কত উঁচু হবে কোথায় গিয়ে থামবে সে-সম্বন্ধে নিজেদেরও স্পষ্ট ধারণা নেই। সুধীর আমার নির্লজ্জ স্তাবক। সকলের সামনে ওর সেই চোখ-কান-কাটা স্তুতি শুরু হলে আমাকে পালাবার পথ খুঁজতে হয়।

এই যে সুধীর এসে গেছে, দেব ওকে?

না, রক্ষে করো। নিজেরা না হয় হোটেলের ভালো-ভালো খাবার আনিয়েছ, এই খিদের মুখে আমার রসিকতা শোনার সময় নেই।...তুমি আটকে গেলে কি জন্যে, অপরেশন-টপারেশন কিছু?

...না, সেই এক্সটেনশন প্ল্যান নিয়ে বসেছি...আড়াইটেয় এনজিনিয়ার কনট্রাক্টর আসবে, সুধীরটা তাই ছাড়ল না।

বাবা, এক্সটেনশন একেবারে সন্ধ্যে পর্যন্ত চলবে?

এই দেখো, আমার কাজটা তোমার কাছে কাজই নয়, আর নিজে যখন এক একসময় সমস্ত রাত জেগে লেখো?

তুমি একটি মিথ্যেবাদী! আমি রাতে লিখতে বসলে তুমি কি করো?

আবার হাসি। চিৎপাত হয়ে শুয়ে পাখার হাওয়া খাই, আর ফোঁসফোঁস নিঃশ্বাস ছাড়ি—আর কি করব!

বেইমান।

শোনো, ছেড়ো না। দরকারী চিঠিপত্র কিছু এসেছে?

তার চিঠিও আমাকে খুলতে হয়, পড়তে হয়, দরকার বুঝে সামনে এগিয়ে দিতে হয়। ব্যস্ত মানুষ, সময় কম। এই সাহায্যটুকুর জন্যও কৃতজ্ঞ।—দুটো এসেছে। একটা তোমার, একটা আমার। তোমার নামের খামে চিঠির সঙ্গে চেক একটা...অজিত গুপ্ত না কার।

হ্যাঁ, কত টাকার চেক?

বারো শ' পঁচাত্তর।

ঠিক আছে। তোমাকে কে লিখল?

জানি না, বে-নামী চিঠি।

কি সর্বনাশ! প্রোপোজ-টপোজ করেনি তো?

এই সময়ে, ঠিক এই মুহূর্তে আমার সহজতায় চিড় খাবার উপক্রম। টেলিফোনের ওধারের মানুষ আমার মুখ দেখতে পাচ্ছে না, চোখ দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু গলার স্বর পালটালে আর জবাবের সুর পালটালেই আমার অনেকটা দেখতে পাবে, অনেকখানি

বুঝে নিতে পারবে। সেই উদগ্র ইচ্ছেটাই ভিতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তাকে দেখাতে ইচ্ছে করছে, বোঝাতে ইচ্ছে করছে। কোন্ মেয়ে চিঠি লিখেছে আর কি লিখেছে সেটা বলে দেবার জন্য একটা বিদ্রোহ যেন টেলিফোনের মুখটার ওপর এসে ভেঙে পড়তে চাইছে। ওদিকে যার হাতে টেলিফোন, বলার পরেও আমি তার মুখ দেখতে পাব না—কিন্তু ব্যতিক্রমটুকু সেই মুহূর্তে আঁচ করে নিতে পারব।...বলব, কোন মেয়ের চিঠি? বলব, কি লিখেছে? তারপর...তারপর আবার কি, আমি লেখিকা, গল্প লিখি, গল্প বানাই...হেসে উঠে ভণিতা করতে পারি, দেখো কেমন জোরালো একখানা গল্পের ছক কেটেছি—তুমি তো আঁতকেই উঠেছিলে। কিন্তু না, হাতের এই একটিমাত্র অস্ত্রের ধার বোকার মতো এক্ষুনি আমি খুইয়ে বসব না। এখনো আমার অনেক অনেক জানতে বাকি, বুঝতে বাকি। তবু, গোলাপের কাঁটার মতো রসিকতার সামান্য একটু আঁচড় ছুঁইয়ে যাবার লোভ সামলানো গেল না। হেসেই জবাব দিলাম।

—না, কোনো মেয়ের চিঠি। আমাকে দরদী লেখিকা বলে জানে, তাই আমার কাছে তোমার নামে নালিশ করেছে।

সে কি! কি লিখেছে?

লিখেছে তোমার বাইরের ব্যবহার যে-রকম মোলায়েম সুন্দর, ভিতরের স্বভাব-চরিত্র সে-রকম নয়। সেই সঙ্গে আস্ত একটি কসাইও বলেছে।

বা, বা! কি ভাগ্য—কোথা থেকে এসেছে চিঠিটা, ছাপ দেখেছ?

...কি জবাব দেব? কোথা থেকে এসেছে বলব? খামসুদ্ধ চিঠিটা ওই আমার সামনেই পড়ে আছে। কোথা থেকে এসেছে বলার জন্য ওটা একবার উল্টে দেখারও দরকার নেই। কিন্তু সত্য চাপা দিতে হলে অন্য কোনো জায়গার নাম করা দরকার। নইলে রসিকতার কাঁটা আর গোলাপের কাঁটা মনে হবে না। জবাব দিলাম, বে-নামী চিঠি কি কেউ ঠিকানা-পত্তর দিয়ে লেখে! খাম উল্টেপাল্টে দেখেছি। হুগলি মনে হল...

ও-ধার থেকে হালকা হাসি ভেসে এলো।—বুঝেছি, দিন কয়েক আগে ওদিকের একটা সিজারিয়ান কেস ডিসচার্জ হয়েছিল, কেমন কাঁটার মুকুট পরে বসে আছি দেখো ...ভালো রসদ পেয়েছ, একটা গল্প লিখে ফেলো।

তোমাকে নিয়ে?

কেন, আমি বুঝি একটা গল্পেও জায়গা পাবার যোগ্য নই? তাহলে সুধীরকে নিয়ে লেখো—এই সুধীর, ডাকছে তোকে—

এই! না, না, ডাকছি না!

ও-দিকের রিসিভারের ততক্ষণে হাত বদল হয়ে গেছে। সুধীর দত্তরই মোটা ভারী গলা শোনা গেল।—নিশ্চয় ডাকছ, আমি সেই ডাক শুনতে পেয়েছি, এখন অস্বীকার করলে কি হবে—ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক সূয্যি ঠাকুরকে ডেকে বসে কুন্তী ঠাকরোনের কি হাল হয়েছিল জান তো? কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে জোরে চুমুর শব্দ একটা।

অভদ্র অসভ্য কোথাকারের!

ও-দিকের সমস্বরে হাসির শব্দ জোরালো হয়ে ওঠার আগে ঝপ করে টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম।

না, সুধীরের কথায় বা ওর এই সব স্থূল রসিকতায় এখন আর আমার কান গরম হয় না, মুখ লাল হয় না (মুখ লাল না হবার আরো কারণ, গায়ের রং আমার তেমন ফর্সা নয়)। ভেবে দেখেছি ওর ওপর সত্যিকারের রাগও কখনো হয়নি। ও একটা বেপরোয়া ডাকাত বিশেষ। সর্বনাশ করার হিম্মত রাখে কিন্তু সেই সঙ্গে একটা ধ্বংস-বিমুখ হৃদয়ও ওর ভিতরে কোথাও লুকিয়ে আছে বোধহয়। যে-কাজ সকলের কাছে একান্ত গর্হিত, সে-কাজও সুধীর দত্ত এমন অনায়াসে করে বসতে পারে যে তার ধাক্কায় নীতির বিচারে বসতেও সময় লাগবে। আর, তারপর বিচারে বসলে ওই লোকটার যোগ্য শাস্তি যদি ফাঁসিও হয় তবু ওই ঠোঁটের ডগায় হাসি-ছোঁয়া জোরালো মূর্তির দিকে চেয়ে রায় ঘোষণা করতে বিচারককে হিমসিম খেতে হবে। সে-বিচারক কোনো মহিলা হলে কথাই নেই, বে-কসুর খালাস।

মাস কতক আগের একটি ঘটনা বলি। সে-রাতটার কথা মনে হলে এখনো সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে! সুধীর দত্তর সেই অবিশ্বাস্য বে-পরোয়া অপরাধের কোনো বিচারক ছিল না। ছিল না কারণ, ঘর-সুদ্ধ মেয়ে-পুরুষের সেই বিমূঢ়তার অবসানে কারো-কারো চোখে আসামী যদি ধরা পড়েও থাকে (পড়েছিল নিশ্চয়, আমার চোখে অন্তত পড়েছিল) সেটা মুখ ফুটে বলা দূরের কথা—চোখের আচরণেও কেউ প্রকাশ করতে ভরসা পায়নি।

পরে আমার কাছে ও অপরাধ স্বীকার করেছে। জেরার ফলে ঘটনার যে চিত্রটা চোখে ভেসেছে, আমার গায়ে কাঁটা-কাঁটা দিয়ে উঠেছে। রাগে ভয়ে বিস্ময়ে আমারই মাথার মধ্যে বুঝি কি একটা ঘটে গেছল। আমার ঘরের মানুষ অদূরের সোফায় বসে অল্প অল্প হাসছিল আর মুগ্ধ বিস্ময়ে বন্ধুটিকে দেখছিল। আমার কাণ্ড দেখে সে-ও হকচকিয়ে গেল।

হঠাৎ ঝুঁকে দু'হাতে খাবলা দিয়ে আমি সুধীরের ঝাঁকড়া চুলের মুঠি ধরে যতখানি জোরে সম্ভব ঝাঁকিয়েছিলাম বার-কতক, তারপর সেই অবস্থাতেই ওকে নিজের দিকে টেনে বলে উঠেছিলাম, তুমি ক্ষমা চাইবে কিনা বলো—

কার কাছে?

মিসেস বোসের কাছে!

কি মুশকিল, তুমি তো আর মিসেস বোস নও, চুলের মুঠি ধরে আমার মাথাটা নিজের হাঁটুর দিকে টানছ কেন?

ওরই জন্যে ভয়ে আর উত্তেজনায় আমার কাণ্ডজ্ঞান বিলুপ্ত যেন। চুলের মুঠো-ধরা দুই হাতের জোরে ওর মাথাটা আরো টেনে নামাতে চেষ্টা করে বলে উঠেছিলাম, আমাকেই মৈত্রেয়ী বোস বলে ভাবো, আমার পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চাওয়াটা আগে রপ্ত করো।

জোরে বড় একটা হাসে না। গলার স্বর এমন পুরুষ্টু গম্ভীর যে একটু শব্দ করে হাসলেই গুরু-গুরু রেশ বাজে। সেই লোক গলা ছেড়ে হা-হা শব্দে হেসে উঠল। আর তার ফলে আমার চুলের মুঠো-ধরা হাত আপনিই যেন অবশ শিথিল হয়ে এসেছিল।

সেই ফাঁকে নিজের মাথাটা উদ্ধার করল ও। তারপর হাসতে হাসতেই অদূরের বিস্ফারিত বন্ধুর দিকে তাকালো।—তোর বউয়ের আসলে মৈত্রেয়ী বোসের ওপর হিংসে

হয়েছে, বুঝলি? আমার দিকে ফিরে মিটিমিটি হাসতে লাগল।—তোমাকে মৈত্রেয়ী বোস ভাবার আগে সেই অপরাধটাও করে নিই তাহলে?

হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে ছুঁড়ে মারার জন্যে অ্যাশপটটাই হাতে তুলে নিয়েছিলাম। তারপর ঠক করে আবার ওটা নামিয়ে রেখে উঠে নিজেই পালিয়েছিলাম।

সেই ঘটনা বা অঘটনের চিত্রটি সুসম্পূর্ণ করতে হলে তার আগে থেকে একটু বিস্তার প্রয়োজন। অন্যথায় আমি কেনই বা অমন ক্ষেপে গেছলাম আর কেনই বা সুধীর দত্তর ওই শেষ কথা শুনে নিজেই ছুটে পালিয়েছিলাম, সেটা স্পষ্ট হবে না।

নাম-জাদা হার্ট স্পেশালিস্ট ডক্টর অমল বোসের স্ত্রী মৈত্রেয়ী বোস। লোকে বলে ডক্টর বোসের টাকার খাঁই একটু বেশি, কিন্তু সাদাসিধে ভালো-মানুষ কোনো সন্দেহ নেই। মাথা-জোড়া টাক, মোটার দিক ঘেঁষা খাটো গড়ন, বছর সাতচল্লিশ হবে বয়স—কোনোরকম দেমাক নেই, সাজ-পোশাকেরও আড়ম্বর নেই। তাঁরই দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মৈত্রেয়ী বোস। প্রথম পক্ষ একটি মাত্র মেয়ে রেখে আট বছর আগে চোখ বুজেছেন। মেয়ের তখন ছ'মাস মাত্র বয়েস। মৈত্রেয়ী বোস বছর বারো ছোট হবেন স্বামীর থেকে। অর্থাৎ তাঁর বয়স এখন পঁয়ত্রিশ। সেই বয়েসটা তিরিশের নীচে দেখানোর একটু সংগোপন প্রয়াস শুধু আমাদের মেয়েদের চোখেই ধরা পড়ে। মহিলা উচ্চশিক্ষিতা, ছ'মাসের জন্য বিলেত গেছলেন কিসের ডিপ্লোমা আনতে। কোনো লোকের সঙ্গে দশ মিনিটের আলাপের পরেই কথা বা দৃষ্টান্তের ছলে তাঁর বিলেত ঘুরে আসার খবরটা প্রকাশ পেয়ে যায়। কলেজের মাস্টারী করতেন। কপালগুণে এবং যোগাযোগের ফলে আজ মস্ত ডাক্তারের ঘরণী।

...কপালগুণই আসল, নইলে যোগাযোগের ব্যাপারটা মামুলি। সুধীরের ধারণা, কোনো অবিবাহিতা মেয়ের আর কোনো অবিবাহিত বা বউ-মরা ছেলের মাথায় যদি কন্দর্প-শরের ক্ষত চাপা থাকে—অনিবার্য যোগাযোগ তাহলে জলে স্থলে শূন্যে বা শ্মশানে যে কোনো জায়গায় ঘটে থাকে। আর সেই ছেলে বা মেয়ের বয়েস যদি খানিকটা ভাঁটার দিকে গড়িয়ে থাকে, তাহলে তো একজন আর একজনকে দেখা-মাত্র চুম্বকের মতো টেনে নেবে। অমল বোস আর মৈত্রেয়ীর বেলায় তাই নাকি হয়েছিল। অমল বোসের সবে তখন ঘর খালি, আর বিলেত-ফেরত কলেজের মাস্টার মৈত্রেয়ী সরকার ঘর খুঁজছেন। সেই শুভক্ষণে বনের পাখি আর খাঁচার পাখি কাছাকাছি। মৈত্রেয়ীর আরো তিনটে ছোট বোন আছে, তাদের আগেই বিয়ে হয়ে গেছল। তার মধ্যে সব থেকে ছোট বোনের সব থেকে ভালো বিয়ে হয়েছিল। সেই ভদ্রলোক ডাক্তার অমল বোসের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। ভদ্রলোক, অর্থাৎ মৈত্রেয়ীর ছোট ভগ্নিপতির ফলাও রাবারের ব্যবসা। সেটা আরো বড় করে তোলার তাগিদে হামেশাই তাঁকে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হত। ভদ্রলোক দিন কতকের জন্য সেবারে গেছলেন আন্দামানে। সেই সাময়িক নির্বাসনের সুতো ধরে এ-মিলনের গ্রন্থি। সময় বুঝে ছোট বোন অসুস্থ হলেন, অমল বোস এলেন তাঁর হৃদয়-যন্ত্র পরীক্ষা করতে, বোনের তদারকে মৈত্রেয়ী সেখানে সশরীরে উপস্থিত তখন। তারপর (সুধীরের অনুমান অনুযায়ী) পরস্পরকে দেখে পরস্পরের মুগ্ধ হতে সাত দিনও লাগেনি। কারণ, ডক্টর অমল বোস মৈত্রেয়ীর বিলেত ঘুরে আসার খবর নিশ্চয় প্রথম দিনেই পেয়েছেন, আর মৈত্রেয়ীর দিক থেকে ভদ্রলোকের স্ত্রীবিয়োগের

খবর আর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স আঁচ করতে ক'দিন লাগতে পারে? মোট কথা ওই সাত দিনের শেষের মাথায় না ডাকতেই ভদ্রলোক রোগিণী দেখতে এসেছেন আর ভদ্রমহিলা সে-রকম জরুরী প্রয়োজন ছাড়াই নিজে ভদ্রলোকের বাড়ি গেছেন রোগিণীর সমাচার জানাতে। সুধীর হলপ করে বলেছিল, শেষের এই মিলনান্তক খবরটা কোনো প্রগলভ মুহূর্তে তাঁদের পরিবেশন করেছেন অমল বোসের অন্তরঙ্গ বন্ধু মেডিসিন-বিশারদ ডক্টর রথীন খাসনবিশ। মোট কথা এক রোগিণীর হৃদয়সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে অচিরে ওঁদের পাকাপোক্ত হৃদয়-বন্ধন (সুধীর বলেছিল, হৃদয়-উদ্বন্ধন)। মৈত্রেয়ী বোসেরও স্বামীর মতই ছোট-খাটো গড়ন, তবে মোটা নয় একটুও, রোগা না বলে বড় জোর ছিপছিপে বলা যেতে পারে। মুখশ্রী মন্দ নয়, শিক্ষা আর বুদ্ধির ছাপের দরুন বেশ সুশ্রীই দেখায়। সুধীর দত্ত অবশ্য বলে, ওই শ্রীটুকু বিয়ের পরের আমদানী—ওর মতে সুখের ঘরে রূপ খোলে, যেমন আমি, ছিলাম একটা পেত্নীর মতো, আর এখন নাকি লোকে আড়-চোখে দুই একবার চেয়ে চেয়ে দেখেও—আব মাঝে-মধ্যে নাকি ওর চোখেও লোভ উঁকিঝুঁকি দেয়।

মৈত্রেয়ী বোসের প্রসঙ্গ উঠলেই সুধীর যাচ্ছেতাই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তার কারণ, সুধীর নিজেও জানত সে ওই মহিলার দু'চক্ষের বিষ। এক ঘর লোকের সামনেও এক-এক সময় ভালো মুখ করে বিলেতের গল্প শুনতে চায়, চায়েলড স্পেশালিস্ট হিসেবে মহিলার প্রথম সন্তানটিকে তার হাতে ছেড়ে দেবার বায়না ধরে। মৈত্রেয়ী বোস নিঃসন্তান। আট বছরেও যখন সন্তান হয়নি, আর হবে কেউ আশাও করে না, সে জন্য তাঁর কোনোরকম খেদ আছে বলে কেউ ভাবে না। তিনি নিজেই বলেন, ও-সব ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পেলে বাঁচা যায়। আমার ঘরের মানুষ, অর্থাৎ প্রশান্ত রায় গাইনোকলজির মোটামুটি নামী ডাক্তার। বিলেতের ছাপও আছে। বছর তিনেক আগে মৈত্রেয়ী বোসের ঘরে চুপিচুপি একবার তার ডাক পড়েছিল। সে খবর এক আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। আমার স্বামীর মতে মৈত্রেয়ীর ছেলে-পুলে না হওয়ার মতো বিশেষ কোনো কারণ নেই। তার সন্দেহটা বরং ডক্টর বোসের ওপরে গিয়ে পড়েছিল। আমি বাধা দিয়ে বলেছিলাম, কিন্তু ডক্টর বোসের তো আগের পক্ষের মেয়ে আছে?

পরেও গণ্ডগোল হতে পারে, তাঁকে আর কে পরীক্ষা করছে। পরে হেসে টিপ্পনী কেটেছিল, কে জানে কার মেয়ে, তোমাদের তো আর ধরা-ছোঁয়ার উপায় নেই।

এই ডাক্তারগুলোর স্বভাব যেমন, মুখও তেমনি। সুধীরের সঙ্গদোষেই মুখ আরো খারাপ হয়েছে।

যাই হোক, আমার ধারণা, মৈত্রেয়ী বোস মুখে যাই-ই বলুন, ভিতরে ভিতরে সন্তানের বাসনা একটু আছেই। অবশ্য জোর গলায় বলতেও পারি না। স্বামীর আগের পক্ষের ওই আট সাড়ে-আট বছরের মেয়েটাকেও তো নিজের কাছে না রেখে দার্জিলিংয়ের কনভেন্ট-এ রেখে পড়াচ্ছেন। ওঁদের যখন বিয়ে হয় মেয়েটার তখন বছরখানেক বয়স শুনেছি। শিক্ষিত মার্জিতরুচি মহিলার এ-হেন অসহায় সপত্নী কন্যার ওপর কোনোরকম বিতৃষ্ণা থাকা সম্ভব নয়। ছিলও না। হয়তো বা সত্যিই ঝামেলা পোহাবার মেজাজ নয় তাঁর।

দু'বছর আগে দুই বন্ধুতে মিলে সত্যিই যখন নার্সিং হোমের পত্তন ঘটিয়ে ছাড়ল, সেই শুভারম্ভের দিনে কলকাতার সমস্ত বড় ডাক্তারদের সেখানে সস্ত্রীক পদার্পণ

ঘটেছিল। সেদিনও এই সুধীরকে নিয়ে আমি কম বিড়ম্বনার মধ্যে পড়িনি। হৈ-চৈ আনন্দের মধ্যে ও এসে মৈত্রেয়ীর সামনে দাঁড়াল, ঘটা করে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালো, তারপর সবিনয়ে একটা আর্জি পেশ করল যেন। বলল, ম্যাডাম, নার্সিং হোম রেডি, চায়েলড্ স্পেশ্যালিস্ট তো তার আগে থেকেই রেডি—এখন আপনি অনুগ্রহ করে এগিয়ে এলেই হয়।

কাছাকাছি যারা ছিল তারা হেসে উঠেছিল। মৈত্রেয়ী বোসও হাসতে পারলে সংকট কিছু থাকত না। কিন্তু তাঁর থমথমে মুখ। পরে সকলের অগোচরে আমাকে বলেছেন, অপমান করার জন্য ডেকেছ এখানে?

অনেক সাধ্যসাধনা করেও তারপর ওঁকে এক পেয়ালা চা পর্যন্ত খাওয়াতে পারিনি। ডক্টর বোস ঘুরে ঘুরে কেবিনগুলো দেখছিলেন। একটু আগের প্রহসনটা তাঁর অগোচর। ভদ্রলোক কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের দোহাই দিয়ে তাঁকে যেন বগলদাবা করে নিয়েই স্ত্রী প্রস্থান করেছেন।

এর পরে অবশ্য সুধীরকে নিয়ে পড়েছিলাম আমি। আমার রাগই হয়েছিল। কিন্তু যার ওপর রাগ তার গণ্ডারের চামড়া।

আমি কত সময় রাগ করে বলি, ভদ্রমহিলা তোমাদের থেকে বয়সেও বড় সে-খেয়াল আছে?

গম্ভীর মুখে সুধীর মনে মনে হিসেব কষে। আমি তখনই বুঝতে পারি এর পর ও কি বলবে। বলবে, দেড় বছরের বড়, আমার সাড়ে তেত্রিশ, প্রশান্তর তেত্রিশ বছর সাত মাস, কিন্তু তাতে কি, ইচ্ছে করলে আমি ওকে নার্সিং হোমে টেনে আনতে পারিনে ভেবেছ? দেড় বছরের বড় তাতে কি?

একদিন ওই জবাব দিয়েছিল। হাতে আমার সেদিন কি একটা ছিল, জোরে ছুঁড়ে মেরে রণে ভঙ্গ দিয়েছিলাম। তারপর থেকে মৈত্রেয়ীর প্রসঙ্গে ওকে বয়সের হিসেব করতে দেখলে আমাকে পালাতেই হয়।

মাঝে মাঝে আমার অবাকও লাগে। চটুল চপল স্বভাব বটে লোকটার, আমাকে বাদ দিলে অন্য সব ডাক্তারের অল্প-বয়সী স্ত্রীদের ছেড়ে মৈত্রেয়ীর পিছনেই বা ও এভাবে লেগে আছে কেন! আমার সঙ্গে যে লাগে সেটা ভিন্ন ব্যাপার। আর কারো কথা জানি না, আমার মনে অন্তত এতটুকু দাগ পড়ে না। কিন্তু ওই মহিলা বয়সেই শুধু দেড় বছরের বড় নয় এদের থেকে, কোনোরকম স্থূল রসিকতা তাঁর দু'চক্ষের বিষ। আর এই জন্যেই সুধীর দত্তর নাম শুনতে পারে না পর্যন্ত। অথচ তাঁকে দেখলেই শয়তানী যেন মাথায় চড়ে বসে ওর।

তাঁর স্বামী ডক্টর বোসকে অল্পবয়সী ডাক্তাররা সকলেই পছন্দ করে। অতবড় হার্ট স্পেশালিস্ট, উপার্জনও প্রচুর। কিন্তু জুনিয়ার নামী ডাক্তারদের সঙ্গে সম-বয়সীর মতো মিশুক ব্যবহার তাঁর। তাদের তিনি দাদা। তাদের স্ত্রীদেরও। সুধীর যত বাচালই হোক, ওই ভদ্রলোককে অসম্মান করতে দেখিনি কখনো। কিন্তু তাঁর এই স্ত্রী-টি যেন সর্বদাই ওর বেপরোয়া রসিকতার একটা বড় শিকার।

ঘটা করে বড় নিঃশ্বাস ফেলে সুধীর একদিন বলেছিল, ভদ্রলোক দুনিয়ার মেয়ে-পুরুষের বুক চষে বেড়াচ্ছেন—কেবল নিজের স্ত্রী-টির ছাড়া—কপালে দুঃখ আছে।

হার্ট স্পেশালিস্ট, অতএব মেয়ে-পুরুষের বুক চষে বেড়াচ্ছেন। মুখের ভাষাও স্বভাবের মতই চাঁছা-ছোলা। জিজ্ঞাসা করলাম, কি রকম?

কি রকম আবার কি, নিজের বউয়ের বুকের খবর রাখেন? রাখলে অতল রহস্যের মধ্যে পড়ে খাবি খেতেন।

ওর ভাষাতেই জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর বউয়ের বুকের খবর তুমি রাখো কি করে?

এই গোছের কথা বলেও তৃপ্তি শুনেও তৃপ্তি যেন। বন্ধুর দিকে ফিরে একবার চোখ নাচিয়ে তারিফ করে নিল, অর্থাৎ, দলে ভিড়ছে। তারপর সাদা মুখ করে জবাব দিল, আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি হলাম গিয়ে যাকে বলে অনুভব জ্ঞানী।

মৈত্রেয়ী বোসকে মনে মনে আমিও যে খুব সুচক্ষে দেখতাম তা নয়। সেও ওই দস্যিটা অর্থাৎ সুধীরের জন্যেই। নইলে আমার আঠাশ চলছে এখন, মহিলা কম করে সাত বছরের বড় আমার থেকে। তাঁর সঙ্গে আমার কোনো রকমের রেষারেষি থাকার কথা নয়। কিন্তু অত বড় ডাক্তারের বউ হয়েও তাঁর ভিতরকার মাস্টারটি অবসর নেয়নি এখনো। কোনো ব্যাপারে একটু বাড়াবাড়ি দেখলেই তাঁর নীতির কড়া চক্ষু সেদিকে যেন একখানা ছুরি উঁচিয়ে ধাওয়া করবে। সুধীরের সঙ্গে আমার এতটা মাখামাখি তাঁর চক্ষুশূল। তাঁর বিবেচনায় সুধীর দত্ত একটা স্কাউনড্রেল। আমার স্বামী তাঁর স্বামীটির প্রিয়পাত্র এবং স্নেহের পাত্র। অতএব আমার ভালো-মন্দ নিয়েও তাঁর মাথা ঘামানোর অধিকার আছে! সেই অধিকারের জোরে আমার আর সুধীরের সম্পর্কে অনেকের কাছে মাঝে-মধ্যে দুই একটা বেফাঁস উক্তিও করে থাকেন। বলা বাহুল্য, অতিরঞ্জিত আকারে সে-সব আবার আমাদের কানে আসে। শুনলে মনে হবে আমার জন্য মৈত্রেয়ী বোসের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই।

...বন্ধুর বউ নিয়ে ভেগে পড়া নাকি সভ্য মানুষের অমোঘ এবং আদিমতম প্রবৃত্তি। প্রশ্রয় পেলে শতকরা নব্বুইটি ক্ষেত্রে আগুন জ্বলেই থাকে। মৈত্রেয়ীর মন্তব্য, প্রশান্তটা বোকা, আর আমি ভালো মেয়ে সুধীরের মতো একটা স্কাউনড্রেলের খপ্পরে পড়ে কবে না ভেসে যাই।

ভেসে যাই বা না যাই, এ-রকম নীতির বচন শুনতে কার ভালো লাগে? আর সুধীরও এই জন্যেই তাঁর সামনে একবার আমাকে পেলেই হল। এমন কাণ্ড শুরু করবে যে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। সত্যি সত্যি রেগে গিয়ে ওর মাথায় আর পিঠে দুই এক ঘা বসিয়েও দিয়েছি—কিন্তু ওর যেন তখন উন্মাদ দশা।

যে ঘটনাটা বলতে যাচ্ছি, তার মাস দেড়েক আগে ডক্টর রথীন খাসনবিশের বাড়িতে একটা বড় পার্টি ছিল। রথীন খাসনবিশ অমল বোসের সম-বয়সী। জেনারেল ফিজিশিয়ান হিসেবে তাঁর নামডাক আর পসার হার্ট স্পেশালিস্ট অমল বোসের থেকে কম নয়। ওই ভদ্রলোক আবার একটু বেশি রসিক আর এলেমদার মানুষ। এমনি ডিনার হোক বা বুফে ডিনার হোক, তাঁর বাড়িতে পার্টি হলে রঙিন জল অর্থাৎ ড্রিংকস-এর ঢালা ব্যবস্থা থাকবেই। মহিলারা সকলেই সফ্‌ট ড্রিংক-এর খদ্দের, কিন্তু কি কারণে জানি না, তাঁর বাড়ির পার্টিতে উপস্থিত থাকার আগ্রহ তাদেরও কম নয়।

সুধীরের ভয়ে আমি প্রথমে যাবই না ঘোষণা করেছিলাম। সঙ্কল্প টিকবে না তাও ভালোই জানতাম। সময় হলে টেনে হিঁচড়ে ও আমাকে ঠিক গাড়িতে নিয়ে তুলবে।

অতএব সন্ধ্যার পর থেকে ওর ওপর আমার হম্বি-তম্বি চলেছিল। এতটুকু বে-চাল দেখলে আমি সোজা বাড়ি চলে আসব বলে অনেকবার শাসিয়েছি। ও নিঃশব্দে সিগারেট টেনেছে আর দার্শনিকের চোখে আমাকে দেখেছে। শেষে যেন বিরক্ত হয়েই বন্ধুর উদ্দেশে বলেছে, তোর বউটার বারোটা বেজে গেছে, বেচালের লোভে আমাকে সেই থেকে কি-রকম উসকে চলেছে দেখেছিস?

থতমত খেয়ে আমি হেসে ফেলেছিলাম। সত্যি সেই থেকে ওকে এক-তরফাই শাসন করে চলেছি আমি।

গাড়িতে উঠে নিজের কর্তার উদ্দেশে ঘাড় ফিরিয়ে (ঘাড় ফিরিয়ে কারণ আমি সামনে সুধীরের পাশে বসেছি, সুধীর চালক, তারই ফিয়েটটাতে চলেছি, কর্তা পিছনের আসনে) ভ্রূকুটি করেছি, মনের আনন্দে খুশিমতো ছাইভস্ম গেলো তো ভালো হবে না, একবারের বেশি দু'বার গেলাস হাতে নিতে দেখলে রাত্তিরে ঘরে ঢুকতে দেব না বলে দিলাম।

এদিক থেকে গম্ভীর মুখে সুধীর জিজ্ঞাসা করল, আমি যদি একবারও গেলাস হাতে না নিই?

জবাবে আমি ওর হাঁটুতে কষে একটা চিমটি বসাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু প্যান্টের ওপর দিয়ে কত আর জোরে লাগবে। তেমনি গম্ভীর মনোযোগে গাড়ি চালাতে চালাতে ও মন্তব্য করল, মধুর মধুর!

বিপাক আর কাকে বলে! খাশনবিশের বাড়ির দোরে গাড়ি থামতেই দেখি সামনের গাড়ি থেকে নামছেন অমল বোস আর মৈত্রেয়ী বোস। সুধীরের গাড়িতে সুধীরের পাশে আমাকে দেখে মৈত্রেয়ী বোসের তেরছা চোখ আর একটু তেরছা হল। গম্ভীর মুখে কয়েক পা এগিয়ে গেল সে। দাদা অর্থাৎ অমল বোস অবশ্য আমাদের হাসিমুখে আপ্যায়ন জানালেন। সুধীরকে বললেন, এই যে, তুমি না হলে পার্টি জমে!

খাশনবিশ থাকেন তিনতলার মস্ত ফ্ল্যাটে। সকলে একসঙ্গে লিফট-এর দিকে এগোলাম। আর সেই ফাঁকে শেষবারের মতো চোখ রাঙিয়ে রাখলাম। অর্থাৎ বেচাল দেখলে রক্ষে রাখব না।

বহুক্ষণ পর্যন্ত শান্তশিষ্ট হয়েই বসেছিল সুধীর। তাতেও অস্বস্তি আমার। মাথার মধ্যে কিছু একটা মতলব ঘুরপাক খেতে থাকলে ওই রকম ভালো মানুষের মুখ দেখি। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে যেতে আমার সন্দেহ কমে আসতে লাগল। ওকে চুপচাপ দেখে অনেকে উসকে দিতে চেষ্টা করেছে, বলেছে, এমন নিরামিষ মুখ কেন হে? কেউ বা আমাকেই জিজ্ঞাসা করেছে, সুধীরের এ-রকম অফ-মুড দেখছি, কি ব্যাপার?

আসর বসেছিল সামনের মস্ত হলঘরে। চারদিক জুড়ে সোফাসেটি-ডিভান পাতা। মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটাতে নরম গালচে বিছানো। সেখানে একটা সেন্টার টেবিলে স্তূপীকৃত শৌখিন ফুল। যেদিকে সুধীর বসে তার উল্টোদিকের কোণাকুণি অমল বোস আর মৈত্রেয়ী বোস বসেছেন। মেয়েদের হাতে সফট ড্রিংক-এর গেলাস, পুরুষদের হাতে অন্য জিনিস। মেয়েরা বেশির ভাগ কথাবার্তার ফাঁকে-ফাঁকে সকৌতুকে চারদিক দেখে নিচ্ছে। পুরুষদের হাতে ওই গেলাসগুলো থাকার দরুন ভিতরে ভিতরে অনেকে মজার খোরাক খুঁজছে।

সুধীর কত বার গেলাস বদল করেছে আমি ঠিক খেয়াল করিনি। যতবার চোখে পড়েছে ওর গেলাস মাঝামাঝি ভরতি দেখেছি। ও সিগারেট টানছে আর দার্শনিকের মতো মাঝে মাঝে ঘরের ছাদ দেখছে।

আমি এক-একবার উঠে মিসেস খাশনবিশ অর্থাৎ দীপালী খাশনবিশকে একটু-আধটু সাহায্য করার চেষ্টায় ভিতরের ঘরে যাচ্ছিলাম। তিনি এক-একবার অতিথি সম্বর্ধনায় আসছেন, বসে দু'চার মিনিট কথা বলছেন আবার উঠে বুফের তদারকে যাচ্ছেন।

ডিনারের ডাক পড়তে আধঘণ্টাখানেক বাকি তখনো। দীপালী খাশনবিশের সঙ্গে আমি ওদিকের ঘর থেকে ভারী পরদা ঠেলে গালচে পেরিয়ে নিজের সোফার দিকে এগোতেই ও-ধারের সোফা থেকে হঠাৎ সুধীর উঠে দাঁড়াল।

দাঁড়াও!

পরিবেশের সঙ্গে বেমানান হুকুমের মতই গুরু-গম্ভীর শোনালো প্রায়। আমি হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। সকলের জোড়া-জোড়া চোখ আমাদের দিকে।

লম্বা পা ফেলে গালচের ওপর দিয়ে এগিয়ে এসে সুধীর সোজা আমার হাত ধরল। তেমনি গম্ভীর মুখেই ফুলের টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেলো। আমি হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে চাপা তর্জন করে উঠলাম, আঃ কি হচ্ছে!

ওর ভ্রূক্ষেপও নেই। শক্ত হাতে হাত ধরে আছে, অন্য হাতে বড়সড় একটা ফুল তুলে নিয়ে আমার মাথায় গুঁজে দিল, তেমনি আর একটা ফুল নিজের বুকের বোতামে। তারপর সভাজনদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল—লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, এখানে অনেকেই বলছেন অনুষ্ঠান সে-রকম জম-জমাট হয়ে উঠছে না। সো উই উইল গিভ ইউ সামথিং—আমি এবং আপনাদের প্রিয় লেখিকা মিসেস চন্দ্রাণী রায় একটা নাচ দেখাব—এ পারফেক্ট ড্রইংরুম ড্যান্স, এতদিন এ নাচের একমাত্র দর্শক ছিলেন মিসেস রায়ের হাসব্যান্ড ডক্টর প্রশান্ত রায়—আজ আপনারাও দেখবেন, আশা করি ভালো লাগবে।

আমি রেগে গিয়ে হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে একটু জোরেই বলে উঠলাম, ছাড়ো, ভালো হবে না বলছি, ইয়ারকির আর জায়গা পাও না!

কিন্তু তার আগেই অনেকের সোৎসাহ কলরবে আমার গলা ডুবে গেল। আমার অনিচ্ছা ভেবেই তারা আরো চেঁচামেচি করতে লাগল, প্লীজ, মিসেস রায়, আমাদের বঞ্চিত করবেন না—ইটস সচ এ সারপ্রাইজ—

হাতটা শক্ত মুঠোতে ধরা, আমার দিকে চেয়ে অমায়িক হেসে সুধীর বলল, লজ্জা কি, এত কষ্ট করে শিখলাম শুধু নিজেরা নাচব আর ওই একজন দেখবে বলে!

ওর দ্বিতীয় হাতটা অনায়াসে আমার কাঁধের ওপর উঠে এলো। কথা না বাড়িয়ে এবার নাচ শুরু করলেই হয় যেন।

রাগ আর লজ্জায় আমার ঘেমে ওঠার দাখিল। সেই মুহূর্তের মধ্যেই দুজনের দিকে চোখ গেছে আমার। একজন ওর প্রাণের বন্ধু—সেও নির্লজ্জের মতো হাসছে, আর একজন মৈত্রেয়ী বোস। তাঁর বিস্ফারিত কঠিন দুটো চোখ আমার মুখের সঙ্গে আটকে আছে যেন। শেষবারের মতো জোরেই ঝাকুনি দিয়ে হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে আর সেই সঙ্গে দাঁত কড়মড় করে অস্ফুট স্বরে বললাম, ছাড়ো বলছি, ভালো হবে না, অভদ্র ইতর কোথাকার—

ছাড়ানো গেল না, অন্য হাতটাও থাবার মতো আমার কাঁধে চেপে বসে আছে। ওই একটু টানা-হেঁচড়ার ফলে দৃশ্যটা আরো বেশি উপভোগ্য ঠেকছে অনেকের চোখেই।

লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, আপনাদের প্রিয় লেখিকার এত লোকের সামনে নাচতে আপত্তি। রেগে গিয়ে সাহিত্যিকের ভাষা ভুলে আপনাদের কানের অগোচরে তিনি আমাকে অভদ্র বলেছেন, ইতর বলেছেন। এ-পর্যন্ত আমি মাত্র চার গেলাস উড়িয়েছি—এই অবস্থায় উল্টে রাগের মাথায় আমি যদি বে-চাল কিছু করে বসি সেটা আমার দোষ হবে না ড্রিংক-এর দোষ হবে?

হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল একটা। রসিকতায় উচ্ছল হয়ে উঠল অনেক মেয়েরা পর্যন্ত। মেয়ে-পুরুষের সমবেত কলরব শোনা গেল, আপনার কিচ্ছু দোষ হবে না—সব দোষ ড্রিংক-এর ঘাড়ে গিয়ে পড়বে। চন্দ্রাণী রায় নাচতে রাজী না হলে ওই গালাগালের জবাবে আপনারও রাগ করার রাইট আছে। ইত্যাদি—

এই পর্যায়ে সুধীর ইচ্ছে করেই হাতের মুঠো ঢিলে করেছিল বোধহয়। এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আমি সোফায় এসে ধুপ করে বসে পড়লাম। হাঁপ ধরে গেছে। ভিতরে ভিতরে ঘামছিও। তরল কলরবে হলঘর মুখরিত তখনো। আমি কারো দিকে ভালো করে তাকাতে পারছি না। অন্য লোকের সঙ্গে ঘরের মানুষটারও হাসি দেখে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। ওদিকে সুধীর সোফায় ফিরে গিয়ে আগের মতই গম্ভীর মুখে গেলাস তুলে নিয়েছে।

ও যে একটা গেলাসও শেষ করেনি তাতে আর আমার একটুও সন্দেহ ছিল না।

এরপর তিন চার দিন আর সুধীরের দেখা নেই। কেন বুঝতেই পারছি। আক্কেল দেবার জন্য আমিও চুপ মেরে আছি। একবারও ডাকিনি। তার বন্ধু হেসে হেসে আমাকে একটু নরম করতে চেষ্টা করছে, তোমার ভয়ে আর এ-দিক মাড়াচ্ছে না, বুঝলে? রোজই জিজ্ঞাসা করে বাড়ির ওয়েদার কেমন। একবার ডাকো না টেলিফোনে—

মুখের দিকে চেয়ে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে ভরসা পায়নি। বন্ধুর হয়ে সাফাইও গেয়েছে, মৈত্রেয়ী বোসের জন্যেই ওর মাথায় এই দুষ্টুমি চেপেছিল, তুমি সোফা ছেড়ে উঠলে বা একটু নড়লে-চড়লেও সে নাকি দূর থেকে শ্যেনদৃষ্টিতে সুধীরকে পাহারা দিচ্ছিল—দেখছিল ওর চোখ তোমার দিকে কিনা—

চার দিন বাদে মনে মনে আমিই হাল ছাড়লাম। ওই দস্যিকে চার দিন না দেখা চার যুগ না দেখার সামিল। ও যেন দক্ষিণের ঝড়ো বাতাস। দরজা বন্ধ করলে গুমোট। খুললে বিস্রস্ত হবার ভয়ে ধড়ফড়। তবু সামলে-সুমলে থাকার দায় নিয়ে দরজা খোলা না রেখে উপায় নেই।

মাসের মধ্যে প্রায় বিশ দিন দু' বেলা এখানে আহার বরাদ্দ তার। সে সময়েই বেশি খারাপ লেগেছে কটা দিন। এক একদিন কি যে কাণ্ড করে ঠিক নেই। মুখ ফিরিয়ে হয়ত বেয়ারাকে কিছু বলছি, ফিরে দেখি আমার ডিসের ভালো ভালো কিছু খাবার উধাও। কোনোদিন বা ডিসসুদ্ধ উধাও।

একদিন খাওয়া ফেলে টেলিফোন ধরতে গিয়ে ফিরে এসে দেখি, সুধীরও খাওয়া ভুলে গভীর মনোযোগে আমার নতুন লেখার খাতাটা পড়ছে। আর আমার স্বামীটি তেমনি গম্ভীর মনোযোগে ডিসের খাবার নাড়াচাড়া করছে। সুধীরের হাতে আমার লেখার খাতা

দেখলেই ভয় ধরে—টীকা টিপ্পনী কেটে অস্থির করে ছাড়ে। এ লেখাটা সবে শুরু করেছি, তিরিশ পাতাও এগোয়নি—এরই মধ্যে এত মন দেবার মতো ও কি রস পেল বুঝলাম না। ধমকের সুরে বলেছিলাম, আবার এটা টেনে বার করেছ?

জবাব না দিয়ে এবং খাওয়া ভুলে তেমনি পড়তেই থাকল। এদিক থেকে তার বন্ধু বলল, তোমার এ লেখাটা অদ্ভুত ভালো হয়েছে ও বলছিল—

লেখক বা লেখিকা মাত্রে নিজের লেখা সম্পর্কে দুর্বলতা একটু আছেই। আমার অন্তত আছে। ভালো বললে ভালো লাগে। মন্দ বললে খারাপ লাগে, অনেক সময় রাগ পর্যন্ত হয়। সুধীরের কথা আমি ধর্তব্যের মধ্যেই আনি না, কারণ প্রশংসার কোটিং মাখিয়ে সে-ই আমার লেখার সব থেকে বেশি নিন্দে করে। সেই লোক অবিমিশ্র ভালো বলছে শুনে কৌতূহল হল। ঝুঁকে দেখতে গেলাম, কোন্ জায়গায় পড়ছে।

ও খাতাটা নিয়ে চেয়ারে ঠেস দিতে দিতে গম্ভীর মুখে বলল, ডিস্টার্ব করো না, সত্যি ভালো লাগছে।

আধ মিনিটের মধ্যে মুখ তুলে বন্ধুর দিকে তাকালো।—শুনবি?

সে ভালো মুখ করে মাথা নাড়ল। আমি বাধা দিতে চেষ্টা করলাম, আগে খেয়ে নাও তো—

মনে মনে নিজেরও আশা এ বইটা ভালোই উৎরোবে।

দাঁড়াও। গড়গড় করে পড়ে চলল। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার দুই চক্ষু কপালে।

...'আমি চন্দ্রাণী। চাঁদের মতই আমার বুকে কলঙ্ক আঁকা। কিন্তু তা সত্ত্বেও চাঁদকে তোমরা দু'চোখ ভরে দেখো। কিন্তু চন্দ্রাণীর কলঙ্ক গোপন। কারণ সেটা দেখলে তোমরা মুখ ফেরাবে—কু-কথায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে। তাই আমার কলঙ্ক গোপন। কিন্তু এই গোপনতার ব্যথা অষ্ট-প্রহর আমার বুকে বাজছে। কেন, কেন আমি গোপনতার খাঁচায় আটকা পড়ে থাকব? কেন আমি মুক্ত বিহঙ্গের মতো নিজেকে মেলে ছড়িয়ে দিতে পারব না? বসন্ত মধ্যাহ্নে বিরহকাতর কোকিলের মতো আমি যখন প্রিয়কে ডেকে বেড়াই তখন আমার এক রূপ, বনের বাঘিনী হয়ে প্রিয়কে যখন ডাকি তখন আর এক রূপ, আবার চন্দ্রাণী হয়ে যখন চকোরকে ভোলাতে চাই—সেও আমারই এক ভিন্ন রূপ। আমার এই ভিন্ন ভিন্ন রূপের ভিন্ন প্রেমিকদের দেখলেই তোমরা আমার মধ্যে কলঙ্কের ছড়াছড়ি দেখবে। কিন্তু আমি কি করব? আমি যখন কোকিল তখন কি বনের বাঘকে ডাকব, না যখন বাঘিনী তখনো চকোরের মতো চাঁদের দিকে তাকাবো? কিন্তু এই গোপনতার ব্যথা অসহ্য, তাই আজ আমি সমস্ত লাজ-লজ্জা বিসর্জন দিয়ে চন্দ্রাণীর কলঙ্ক-কথা শোনাতে বসেছি।'

ওয়ান্ডারফুল!

খাতাটা শব্দ করে টেবিলের ওপর ফেলে খাবার ডিসটা সামনে টেনে নিল। আমি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম খানিক। এক মেয়ের জবানবন্দীর অনেকটা ওই সুরেই এ-লেখাটা আরম্ভ করেছিলাম বটে, আমার কতগুলো শব্দ-বন্ধও উল্টে-পাল্টে তুলে নিয়েছে, কিন্তু ওই লেখার বা ওই গোছের বিষয়ের ধার-কাছ দিয়েও আমি যাইনি। আমার লেখা নয় জানি, কিন্তু মাথা থেকে বানিয়ে ও-রকম গড়গড় করে পড়ে গেল কি করে!

খাতাটা টেনে নিয়ে খুললাম। তারপর চক্ষু আরো স্থির আমার। গোটা গোটা অক্ষরে

এক পাতা ভরতি ওই লেখাই বটে। একটা আলগা পাতায় ওই সব ছাইভস্ম লিখে আমার লেখার পরে আঠা দিয়ে জুড়ে রেখেছে।

রাগ করে সেদিন খাতাটা জোরেই ওর মুখের ওপর ছুঁড়ে মেরেছিলাম। কিন্তু পরে ওর ওই লেখাটা যত্ন করেই রেখে দিয়েছি, ছিঁড়ে ফেলতে গিয়েও ছিঁড়িনি।

এলে এই রকমই প্রতিটি মুহূর্ত ভরাট করে রাখে যেন। সেই লোক পর পর চার দিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকলে কেমন লাগে? তার ওপর যে পেটুক—পেট ভরে খাচ্ছে-দাচ্ছে কিনা তাই বা কে জানে!

টেলিফোন করব ভাবছিলাম। ওদিকে বিকেলের দিকে নার্সিং হোমে বেরুবার আগে নিজেই বলল, দেখি আজ যদি সুধীরটাকে ধরে আনতে পারি—ওর আবার উল্টো গোঁ, তুমি না ডাকা পর্যন্ত আসবেই না।

আমি বললাম, ওকে বোলো এরপর আর ওর মাথার একটা চুলও আস্ত থাকবে না।

প্রকারান্তরে ডাকাই হল। সত্যি কথা বলতে কি, এখন যতবার ওই পার্টির ব্যাপারটা মনে পড়ছে, রাগের বদলে বরং হাসিই পাচ্ছে আমার।

কিন্তু সেই বিকেলেই হাসির ওপর যেন কালি ঢেলে দিয়ে গেল মিসেস দীপালী খাশনবিশ। আসেন না বড়, হঠাৎ গাড়ি নিয়ে সেই বিকেলেই হাজির। পার্টির পরদিনই টেলিফোন করেছিলেন, বলেছিলেন, অনেক মজার মজার কথা আছে—মৈত্রেয়ী বোসের সে-কি রাগ তোমার ওপর, দেখা হলে বলব'খন।

তাঁকে দেখেই বুঝলাম মজার কথা বলার তাগিদে এসেছেন। মৈত্রেয়ী বোসের সঙ্গে দীপালী খাশনবিশের বাইরে ভাব খুব—কিন্তু ভিতরের রেষারেষির খবর সকলেই জানে। দীপালী খাশনবিশ এম. এ., বি. টি, মৈত্রেয়ী বোস এম. এ., কিন্তু সঙ্গে বিলেতের ডিপ্লোমা। প্রাক-বিবাহ জীবনে দীপালী ছিলেন ইস্কুলের মাস্টার, আর মৈত্রেয়ী বোস কলেজের। এখন দুজনেরই বড় অবস্থা, তবু তার মধ্যেই জেনারেল ফিজিসিয়ান হিসেবে ডক্টর খাসনবিশের পসার একটু বেশি এ-কথা যদি কেউ আভাসেও ব্যক্ত করে স্ত্রীর মুখখানা অমল বোস সেদিন থমথমে দেখবেনই। আবার স্পেশালিস্ট হিসেবে অমল বোসের তুলনা নেই এ-কথা শুনলে দীপালী খাশনবিশ তাঁর ভদ্রলোককে বরাদ্দের বাড়তি দুই একটা মুখ-ঝামটা দিয়ে থাকেন শুনেছি। অবশ্য এই সবই আবার সুধীরের উক্তি।

দীপালী খাশনবিশ ঘরে পা দিয়েই বললেন, বেশিক্ষণ বসার উপায় নেই, এদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন একবার নেমে গেলেন, বাড়ি পৌঁছেই তাঁর প্রভুটির কাছে গাড়ি পাঠাতে হবে। কিন্তু উঠলেন ঘড়ি ধরে পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে। তার মধ্যে একদফা কফি আর দু-দফা পান খেলেন। আমার নতুন লেখা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিলেন। আর আসল প্রসঙ্গের দিকে আমি ঘেঁষছি না দেখে বার কয়েক উসখুস করে শেষে নিজেই তুললেন কথাটা।—আচ্ছা, সুধীরের সঙ্গে কি সত্যিই তুমি বাড়িতে নাচো নাকি?

আমি হাসি মুখেই চেয়ে রইলাম খানিক, তারপর ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কি মনে হয়?

আমার তো একটুও বিশ্বাস হয় না, সুধীরটা রাজ্যের ফাজিল কে আর না জানে—কিন্তু মিসেস বোস সকলকে ওই কথা বলে বেড়াচ্ছেন, নিশ্চয় নাচে ওরা। সেদিন

তোমার মুখ দেখেই নাকি বুঝেছেন ধরা পড়ে গেছ—ওঁর ভদ্রলোক হার্ট স্পেশালিস্ট উনি তো তাঁর ওপর দিয়ে মুখ স্পেশালিস্ট। মদের ঝোঁকে কেউ নাকি কখখনো মিথ্যে কথা বলে না, মিসেস বোসের বিশ্বাস সুধীর মদের ঝোঁকে গোপন ব্যাপারটা ফাঁস করে দিয়েছে আর সেই জন্যেই তোমার সেদিন ওইরকম ধড়ফড় অবস্থা। তাঁর মতে তুমি সেয়ানা মেয়ে কিন্তু প্রশান্ত হল যাকে বলে পয়লা নম্বরের আহাম্মক—তুমি তাকে চোখে ঠুলি পরিয়ে চালাচ্ছ।

আমি হাসতেই চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার রাগ হচ্ছিল। যিনি বলছেন, যার সম্পর্কে বলছেন আর যার জন্যে বলছেন, সক্কলের ওপর।

বসে বসে আরো শুনতে হল। মিসেস বোস নাকি ওই একই কথা অনেককে বলেছেন, কিন্তু বাড়িতে সুধীরের সঙ্গে আমি নাচি এ এক উনি ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস করেনি। তাইতে তাঁর আরো রাগ। বলেছেন, সত্যি না হলে ও-রকম ইতরমোর জবাবে চাবুক এনে চন্দ্রাণীর দু'ঘা বসিয়ে দেবার কথা—সে যার বাড়ি হোক, তিনি নিজে হলে অন্তত তাই করতেন। তার বদলে আমি কিনা ধরা-পড়া আসামীর মতো কাঁপতে লাগলাম!

চার দিন বাদে সুধীর আমার কোন্ মেজাজের মুখে এসে পড়ল সেটা সহজ অনুমান সাপেক্ষ। চুল বাঁচাবার জন্য সেদিন আবার ঘটা করে মাথায় একটা রাবারের সুইমিং ক্যাপ পরে এসেছিল।

কিছুতে আমাকে হাসতে বা রাগাতে না পেরে শেষে বলল, তোমার রাগ এখনো পড়েনি তো আশ্বাস দিয়ে ডাকলে কেন?

আমি বললাম, পড়েছিল। মিসেস খাশনবিশ বিকেলে এসে সেটা আবার চড়িয়ে দিয়ে গেছেন। ওরা দুজনেই উৎসুক। কি তিনি বলে গেছেন তার আদ্যোপান্ত বললাম। বিশেষ করে চাবুকের কথাটা বার কয়েক জোর দিয়ে বললাম—তিনি হলে কি করতেন আর আমি কি করেছি।

আমার ঘরের লোক এ-সব কথা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবার মানুষ। কিন্তু আমার মেজাজ বুঝেই চুপ করে থাকল। তাতেও আমার রাগ হতে লাগল। নিজের বউ সম্পর্কেও পুরুষ মানুষ অমন কানে তুলো গুঁজে আর পিঠে কুলো বেঁধে চললে কার সবসময় ভালো লাগে?

সুধীর মিটি মিটি হাসছিল।—এই ব্যাপার।...তা তাঁর ঘরে চাবুক-টাবুক আছে কিনা তুমি খবর রাখো?

জবাব না দিয়ে আমি তপ্ত চোখে তাকালাম ওর দিকে। সুধীর আবার বলল, আচ্ছা, তুমি এবারকার মতো আমাকে ক্ষমা করে ফেলো—আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি মৈত্রেয়ী বোসের চাবুকের জোর আমি যাচাই করব।

এরপর মাস দেড়েক কেটে গেছে। ওই ব্যাপারটা ততদিনে প্রায় ভুলেও গেছি। এর মধ্যে হঠাৎ আবার একটা অপ্রত্যাশিত নিমন্ত্রণের ব্যাপার ঘটে গেল। অপ্রত্যাশিত কারণ, নিমন্ত্রণটা ডক্টর অমল বোসের বাড়িতে। উপলক্ষ্য তাঁদের বিয়ের নবম বার্ষিকীতে পদার্পণ। আমি অবাক এই জন্যে যে এর আগে আটবার করে তাঁদের বিয়ের দিন কেটে গেছে কেউ খবরও রাখে না। হঠাৎ এ-বারে এত ঘটা কেন!

কেন, পরে শুনলাম। ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা দুজনেরই একটু হাতটান দেখে

অনেকেই তাঁদের ছেঁকে ধরার মতো একটা সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল—কি করে ভালো-রকম কিছু টাকা খসানো যেতে পারে। কে একজন খবর বার করেছে ওমুক দিন ওঁদের বিয়ের দিন। ব্যস, বিয়ের দিনই সই। স্নেহভাজন ডাক্তাররা সব দল বেঁধে ওঁদের বাড়ি গিয়ে হাজির। এবারে ঘটা করে উৎসব করতে হবে এবং খাওয়াতে হবে, ছাড়ন-ছোড়ন নেই।

অগত্যা কর্তা-গিন্নী খুশিমুখে রাজী। খরচের মধ্যে একবার নেমে পড়ে আর তাঁরা কার্পণ্য করলেন না। অন্তরঙ্গ সকলকেই আমন্ত্রণ জানালেন। আর এক ড্রিংক বাদে খাওয়া-দাওয়ারও প্রচুর ব্যবস্থা করলেন।

সুধীরের নেমন্তন্ন হবে কি হবে না, আমার সন্দেহ ছিল। কিন্তু স্ত্রীর মনোভাব যেমনই হোক, ডক্টর বোস তাকে না ডেকে পারেন কি করে। ওর নেমন্তন্ন হয়েছে শোনামাত্র আমি বেঁকে বসলাম, যাব না, কিছুতেই যাব না।

সুধীরই হাসিমুখে তোয়াজ তোষামোদ করল আমাকে। বলল, তোমরা নিজেদের গাড়িতে যেও, আমি আলাদা যাব, আর কথা দিচ্ছি সেখানে গিয়ে তোমাকে চিনতেও পারব না। তাছাড়া তুমি না গেলে মৈত্রেয়ী বোস ধরেই নেবে তার ভয়ে গেলে না।

কথাটা সত্যি। তাকে কেয়ার করি না এটুকু বোঝাবার জন্যেও যাওয়া দরকার।

এই উৎসবেও হৈ-চৈ মন্দ হল না। খাওয়া-দাওয়ার পর আবার এক-প্রস্থ হালকা জটলা শুরু হল। কারো কারো প্রস্তাব বছরের এই দিনের উৎসবটা এবার থেকে পাকাপোক্ত হোক।

ডক্টর এবং মিসেস বোস দুজনেই হাসছেন, তাঁরা কথা দিতে রাজী নন। খাবার আগে পর্যন্ত আমি সারাক্ষণ সুধীরের দিকে চোখ রেখেছিলাম, মৈত্রেয়ী বোসের চাবুকের জোর যাচাই করবে বলেছিল, কি আবার করে বসে আমার সেই শংকা। কিন্তু শুরু থেকে খাওয়া-দাওয়ার পরে পর্যন্ত ওকে একধারে একেবারে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে আমি অনেকটাই নিশ্চিন্ত। অনেকেই তাকে তার নিজস্ব ফর্ম-এ আনতে চেষ্টা করে হার মেনে সরে গেছে।

আমি উঠে পড়ার মতলবে ঘরের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টায় ছিলাম। সে মশগুল হয়ে আর এক ডাক্তারকে তার নার্সিং হোম এক্সটেনশনের প্ল্যান বুঝিয়ে তারিফ পাবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ একসঙ্গে দোতলার সমস্ত আলো টুপ করে নিভে গেল। দিনের মতো আলো ঝলমল করছিল, সব একসঙ্গে নিভে যেতে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার।

দুই এক মুহূর্তের জন্য হতচকিত অবস্থা সকলের। তারপরেই হালকা হৈ-চৈ চেঁচামেচি। একজন রসিক ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠল, লেডিজ সাবধান! ডক্টর বোস বেয়ারাদের উদ্দেশে হাঁক পাড়তে লাগলেন। তাদের হুজুর-হুজুর শোনা গেল, কিন্তু মুখ দেখা যাচ্ছে না। আমার একবার মনে হল কোনো মেয়ে-গলার অস্ফুট কাতরোক্তি কানে এলো যেন একটু, তারপর আর কিছু ঠাওর করা গেল না। এ-দিক ও-দিকে ঘন অন্ধকার, সমস্বরে অনেকেই কথা কইছে, কি হতে পারে, কি করা যায় ইত্যাদি। ডক্টর বোসের গলাই বেশি শোনা যাচ্ছে, তিনি অন্ধকারেই ছোটাছুটি করে চাকর-বাকরের উদ্দেশে নির্দেশ ছুঁড়ছেন।

ঠিক পাঁচ মিনিট বাদে একসঙ্গে সব ক'টা আলো জ্বলে উঠল আবার। সঙ্গে সঙ্গে

গলা দিয়ে শব্দ বার করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সকলে। ডক্টর বোসের আধবয়সী পুরনো চাকর এসে জানালো, কি করে যেন মেন সুইচটা বন্ধ হয়ে গেছল—

ডক্টর বোস ধমকে উঠলেন, মেন সুইচ আবার বন্ধ হবে কি করে, নিশ্চয় তোদের কোনো উজবুকের কাণ্ড।

এদিক থেকে একজন বলে উঠল, মিসেস বোস গেলেন কোথায়?

তাই তো! অনেকেরই হালকা বিস্ময়, অন্ধকারের মধ্যে মিসেস বোস আবার গা-ঢাকা দিলেন কখন!

কোনোরকম ষষ্ঠ চেতনার ব্যাপার কিনা জানি না, চকিতে আমি সুধীরের সোফার দিকে তাকালাম। তারপর নিশ্চিন্ত অবশ্য। সে তেমনি সোফায় গা-ছেড়ে বসে আছে —চোখে ঝিমুনির ভাব একটু।

ডক্টর বোস সেই আধ-বয়সী চাকরকে হুকম করলেন, মেমসাহেব কোথায় গেলেন দ্যাখ, এঁরা সব যাবেন এখন—

একটু বাদে মেমসাহেব এলেন। তাঁর দিকে চেয়ে হঠাৎ বিমূঢ় সকলে। এই ক'টা মিনিটের মধ্যে তাঁর ভিতরে বাইরে বিষম কিছু বিপর্যয় ঘটে গেছে যেন। পরনের সেই বেশ-বাসই একটু যেন বিস্রস্ত। চাউনি অস্বাভাবিক। মুখখানা লাল, হঠাৎ বেশি ব্লাড-প্রেসার চড়লে যেমন হয়।

একটু ঘাবড়ে গিয়ে ডক্টর বোস জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় গেছলে?

আত্মস্থ নন যেন তখনো। জবাব না দিয়ে কয়েকজন ডাক্তারের মুখের ওপর দিয়ে তাঁর দৃষ্টিটা গিয়ে স্থির হল ওই কোণের দিকের সোফার ওপর যেখানে ঢুলু-ঢুলু চোখে সুধীর দত্ত বসে। হাতের ওপর গাল রেখে সুধীর হাই তুলছে।

সেই কয়েক পলকের মধ্যে অনেকেরই মনে হল যা-ই ঘটে থাক তার সঙ্গে ওই এক লোকের যোগ আছে। আমার অন্তত মনে হল, আর এক অজানা আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা গুর-গুর করতে লাগল।

ডক্টর খাশনবিশ এগিয়ে এলেন, কি হল মিসেস বোস, খারাপ লাগছে কিছু?

মৈত্রেয়ী বোস চমকে আত্মস্থ হলেন যেন। দেখলেন তাঁর ওপর জোড়া-জোড়া চোখ। সামলে নিতে চেষ্টা করলেন, হ্যাঁ, মাথাটা কি রকম ঘুরছে, দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে, আপনারা কিছু মনে করবেন না।

দু'হাত একবার কপালের দিকে তুলেই দ্রুত ভিতরে চলে গেলেন তিনি।

ঘর ভরতি পুরুষদের মধ্যে মোটামুটি নামী ডাক্তার সকলেই। তাদের উদ্বেগ স্বাভাবিক এবং কি হতে পারে তা নিয়ে চিন্তা করাও স্বাভাবিক। ডক্টর বোসের কাছে কেউ ব্লাডপ্রেসারের খোঁজ নিলেন, কেউ বা ব্লাড সুগারের। কেউ গরমের ওপর দোষ চাপালেন, কেউ বা সকাল থেকে অত্যধিক পরিশ্রমের ওপর। তারপর দু'মিনিটের মধ্যে ডক্টর বোসকে স্ত্রীর কাছে ঠেলে পাঠিয়ে সকলে বিদায় নিলেন। কিন্তু তলায় তলায় একটা দুর্বোধ্য খটকা অনেকের মনেই লেগে থাকল। বিদায় নিয়ে অনেকেই সুধীরের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকিয়েছেন—সব থেকে বেশি আমি। কিন্তু সে কোন ফাঁকে নেমে চলে গেছে।

ফেরার সময় প্রশান্ত (ঠাট্টা-বিদ্রূপের সময় ভিন্ন নাম নিয়ে আমি ডাকি না, কিন্তু

নাম না করে লিখতে অসুবিধে—কতবার আর ঘরের লোক, ঘরের মানুষ করে বলব?) অবাক মুখ করে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার বলো তো, আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না—মহিলা সুধীরের দিকে অমন গেলবার মতো করে তাকালোই বা কেন?

এই কথাই আমিও ভাবছিলাম। আর বারবার সুধীরের সেই কথা মনে পড়ছিল, বলেছিল, তোমাকে কথা দিচ্ছি মৈত্রেয়ী বোসের চাবুকের জোর আমি দেখব। বললাম, সুধীরের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত কিছু বোঝা যাবে না।

আশা করেছিলাম গিয়ে দেখব সে আমাদের ওখানেই বসে আছে। নেই। খানিক বাদে ওর ফ্ল্যাটে ফোন করলাম। টেলিফোন বেজেই গেল, কেউ ধরল না। আমার কেমন মনে হল কোনো বারেটারে বসে মদ গিলছে। এক-এক সময় ওই রকম করে, দেদার মদ গেলে। ঠিক কোন্ মানসিক অবস্থার সময়, সেটা আজও ধরতে পারিনি।

পরের দেড় ঘণ্টার মধ্যে আরো তিনবার ফোন করলাম। এনগেজ সিগন্যাল। অর্থাৎ রিসিভার নামিয়ে রেখেছে। এত রাতে এক আমরা ছাড়া অতক্ষণ ধরে ওর সঙ্গে কথা বলার মতো আর কেউ নেই।

পরদিনটা রবিবার। সমস্ত দিন নিপাত্তা। শুনলাম নার্সিং হোমেও যায়নি। সকালে প্রশান্ত ডক্টর বোসের বাড়িতে ফোন করেছিল। মিসেস বোসের সঙ্গে কথা হয়েছে। বলেছেন, গরমে আর সমস্ত দিনের পরিশ্রমে মাথাটা হঠাৎ প্রচণ্ড ঘুরে গেছল, এখন সম্পূর্ণ ভালো আছেন। সকলকে ও-ভাবে অপ্রস্তুত করার জন্য লজ্জাও পাচ্ছেন বললেন। ইতিমধ্যে আরো অনেকে নাকি ফোন করে খবর নিয়েছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, বুঝলে কিছু?

না, বেশ স্বাভাবিক কথাবার্তাই তো।

সুধীর হাজির সেই সন্ধ্যার পর। চিরাচরিত হাসি-হাসি মুখ। যেন কিছুই হয়নি, কিছুই জানে না। জিজ্ঞাসা করল, কি খবর সব—

দোতলার বসার ঘরের সেটিতে বসল ধুপ করে। হাত দেড়েক ফারাকে ওই সেটিতেই আমিও বসলাম। পাশের সোফায় প্রশান্ত।

কি ব্যাপার? অবাক যেন একটু, এমন গা ঘেঁষে বসলে, নাচবে-টাচবে নাকি আমার সঙ্গে?

দেব এক থাপ্পড়। সমস্ত দিন কোথায় ছিলে?

ওয়জ জস্ট লোফিং—যত্রতত্র ঘুরে-ঘুরে একটা ভবঘুরে ভাব আনার চেষ্টা করছিলাম।

কাল রাতে কোথায় ছিলে?

কেন, ঘরেই তো! পাঁচ পেগ মেরে এসে তোমার টেলিফোনের ফ্যাচফ্যাচানির ভয়ে রিসিভার নামিয়ে রেখে একঘুমে রাত কাবার।

মুখের দিকে চেয়ে রইলাম খানিক। ওর ভেতর দেখতে চেষ্টা করছিলাম হয়ত। সুধীর বন্ধুর দিকে ফিরে [illegible] করে উঠল, শ্রীমতী এ-রকম কটাক্ষ-বাণে বিদ্ধ করলে তোকে আমি [illegible] দিন [illegible] বসে দিচ

বন্ধু পরিহাসের সুরে জবাব দিল, আমি তো পথে বসেই আছি।

ও-সবে কান না দিয়ে আমি চেয়েই আছি তেমনি। কাল ডক্টর বোসের বাড়ির মেন সুইচ অফ করেছিল কে, তুমি?

জবাব না দিয়ে হাসতে লাগল। সকালে মৈত্রেয়ী বোসের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হবার পর তার বন্ধুর কৌতূহল আর বিশেষ ছিল না। এবারে সে-ও নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসল।

আমি আবার বললাম, মেন সুইচ অফ্ করার পর কি হল?

কি আর হবে, মৈত্রেয়ী বোসের চাবুকের জোর দেখলাম একটু।

কি করে?

বেড়াল যেমন ইঁদুর মুখে নেয়, সেই রকম তাঁকে দু'হাতে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে।

তিনি চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন?

যাচ্ছিলেন, পারেননি।

কেন যেন আমার সমস্ত গা সিরসির করছিল, তবু জিজ্ঞাসা করেই ফেললাম, তুমি আটকালে কি করে?

দুটো বাড়তি হাত যখন নেই তখন আর কি করে আটকানো যায় বলো—দাঁত দিয়ে ঠোঁট দিয়ে মুখ দিয়ে।

উত্তেজনায় পাশের লোকের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর দাখিল। আমারও সামলাতে সময় লাগল। সুধীর হাসছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর?

তারপর সোজা শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে ধুপ করে গদিঅলা বিছানায় আছড়ে ফেললাম তাঁকে। বেরিয়ে আসার সময় দরজার ল্যাচটা টেনে দিয়ে এলাম।...আলো জ্বলতে দরজা-ধাক্কা শুনে চাকরবাকর কেউ খুলে দিয়ে থাকবে।

দুজনেই আমরা স্তব্ধ খানিকক্ষণ। তারপর ওই কাণ্ড করেছিলাম। হঠাৎ ঝুঁকে দু'হাতে খাবলা দিয়ে ওর চুলের মুঠি ধরে মাথাটা সবলে নিজের হাঁটুর কাছে টেনে এনে ক্ষমা চাওয়ার কথা বলেছিলাম।

এ-ই সুধীর দত্ত।

আমার স্বামী-রত্নটির মনে মনে ধারণা, সে কায়া আর বন্ধুটি তার ছায়া। সেই রকমই দেখে আসছে অনেকে। আমিও।

কিন্তু মানুষটা ডাকাত না আধা-পাগল না আর কিছু অনেক সময়েই আমি ভেবে পাই না।

## দুই

সাধারণ গল্পের একজন নায়ক থাকে, একজন নায়িকা থাকে। আমার এ গল্প সাধারণ কিনা জানি না। কিন্তু নায়কটি অসাধারণ। যে-মানুষটা ডাকাত না আধ-পাগল না আর কিছু অনেক সময়েই আমি ভেবে পাই না।—নায়ক ওই একজন। সুধীর দত্ত।

কিন্তু নায়কের সন্ধান পাওয়া মাত্র আপনারা খুব স্বাভাবিকভাবেই নায়িকার খোঁজ করবেন। এইখানেই বিড়ম্বনা। না, তবু আপনাদের হতাশ করব না। নায়িকাও আছে একজন। তার জন্য নায়িকার সংজ্ঞা-বদলের প্রশ্ন ওঠে উঠুক। নায়ক যেমন অসাধারণ,

দুর্দম বেপরোয়া—নায়িকাটি ঠিক ততখানিই সাধারণ। নায়কের পাশে প্রায় নিষ্প্রভ। কিন্তু নায়ক তাকে নিষ্প্রভ হতে দেয়নি। শুনেছি সূর্যের দাক্ষিণ্যের আলোয় চন্দ্রের জীবন। এই নায়িকার জীবনেও এক সূর্য জ্বলছে। এই নায়িকা চন্দ্র নয়, চন্দ্রাণী।

আমি। চন্দ্রাণী রায়। পরস্ত্রী। বন্ধুর স্ত্রী।

আপনারা চমকে উঠবেন জানি।...ওমনি সত্তা-নিঙড়নো আর দুমড়নো চমক খেয়েই এ-কাহিনীর আমি নায়িকা। এই জন্যেই বলছিলাম. নায়িকার সংজ্ঞা-বদলের প্রশ্ন ওঠে উঠুক।

ঠাট্টা করে সুধীর প্রায়ই বলত, নাম যদি করতে চাও আমাকে নিয়ে একটা গল্প লেখো দেখি। সব জলো, সব জলো—বাঁচতে চাও তো আমাকে ধরো।

কি কথাই বলেছিল! কলম নিয়ে বসেও সে-কথাই মনে পড়ছে, আর চোখের সামনে বার বার ঝাপসা দেখছি সব। নামের চিন্তা আর করি না। কিন্তু বাঁচার কথা ভাবি। ওকে ধরেই বেঁচে আছি। শুধু আমি কেন, আমার স্বামীও আজ ওকে আঁকড়ে ধরেই বেঁচে আছে। মুখে সে-কথা বলে না কখনো। কিন্তু আমি বুঝতে পারি। এখন আমার বয়েস বত্রিশ ছাড়িয়ে তেত্রিশে গড়িয়েছে। মফঃস্বল শহরে থাকে। প্রশান্ত রায় এখানকার বহু সাধারণ মানুষের হৃদয় মন জয় করে বসেছে এই ক'বছরের মধ্যেই। সরল গরীব মানুষেরা দীনবন্ধু বলে ওকে। ও হাসে আমার দিকে চেয়ে, আমি হাসি ওর দিকে চেয়ে। সূর্যের আলোর দাক্ষিণ্যে চাঁদ হাসে আর চন্দ্রাণী হাসে।

...আমাদের একটা ছেলে আছে বছর আড়াইয়ের। হাসিখুশির জ্যান্ত ডেলা একখানা। ওর হাসির মধ্যে আঁতি-পাতি করে আমি সুধীরের হাসি খুঁজি। মনে মনে অনেক সময় বলি, ওরে তুই সুধীর হ', সুধীর হ'—তোর কাছে তোর এই মা আর কিচ্ছু চাইবে না।

নাঃ, চোখে কি যেন ছাই হয়েছে আজ। কেবলই ঝাপসা দেখছি।...এ কাহিনী যখন লিখছি সুধীর দত্ত আমার ধারে-কাছে নেই। অবশ্য খুব দূরে যে আছে তাও না। কলকাতায় গিয়ে সরকারী দপ্তরে একটু লেখালেখি করলেই ওর দেখা পেতে পারি। কিন্তু কলকাতা ছাড়ার পর সে-চেষ্টা আর করিনি। কেন করব? ওকে তো চোখ বুজলেই কাছে দেখতে পাই। চোখ চেয়েও পাই। তাছাড়া আর বছর দুইয়ের মধ্যে ও তো আসবেই এখানে। না এসে যাবে কোথায়? মাঝখান থেকে ছোটাছুটি করে আমি সময় নষ্ট করি কেন? সে-সময়টা বরং ওর যোগ্য নায়িকা হতে চেষ্টা করলে সার্থক।

...আমি বলতাম, তোমাকে নিয়ে গল্প লিখব মানে নায়ক তুমি?

মাথা নেড়ে জবাব দিত, তোমার হাতে পড়লে কি হবে জানি না —সামলাতে পারো যদি তুমি নিজেই উতরে যাবে।

চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করতাম, আর নায়িকা?

তুমি ছাড়া আর কে? একটু উইক চরিত্র হয়ে গেল বটে, তবে লেখক-লেখিকার হাতে না পড়লে বাস্তবের কোন নায়িকা আর স্ট্রং বলো! তারপর চিন্তাচ্ছন্নের মতো দু'চোখ পিটপিট করে একবার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে নিয়ে তারপর আবার আমার দিকে ফিরে বলেছিল, আধুনিক গল্পের রীতি অনুযায়ী নায়কের সঙ্গে নায়িকার একটা লটঘট বাঁধাবার খুব যদি লোভ হয় তো সাবধানে বাঁধিও—এ বেচারার না আবার নিজের বুকে স্টেথসকোপ বসাতে হয়।

হাসি পাচ্ছিল। কথাগুলো যেন সদ্য সামনে বসে বলছে। আর আমি সামনে বসে শুনছি। কিন্তু সেই মুহূর্তে বুকের ভিতরে ধড়ফড় করে উঠল কেমন। আমারই ভিতর থেকে কি যেন সব কথা ঠেলে উঠছে। কান পাতলে শোনা যাবে, এমন।...শোনা যাচ্ছে।

...সুধীর, তোমার নায়িকার সমস্ত সর্বনাশ তোমারই হাতে দুলছিল। তোমার সেই দিশেহারা নায়িকার চোখে যখন ধ্বংসের আগুন জ্বলছিল, সেই চোখে যে একই সঙ্গে ওই সর্বনাশের আগুনও জ্বলে উঠেছিল সে আর তোমার থেকে ভালো কে জানে? তোমার হাতের একটা আঙুলের ইশারায়, চোখের সামান্য একটু ইঙ্গিতে তোমার এই উইক নায়িকা জাহান্নমের বন্যায় কোন রসাতলে ভেসে যেতে পারত সেই বা তোমার থেকে ভালো আর কে জানত?

কিন্তু সুধীর, তুমি কি মানুষ?

তুমি ডাকাত না পাগল না আর কিছু?

ওই কলকাতার শহরেই দশ বছরের একটা মা-বাপ-মরা দুরন্ত ছেলে তার থেকেও বারো বছরের বড় এক দাদার কাছে এক-এক সময় হাড়-ভাঙা ঠ্যাঙানি খেত। সে এমন মার যে তার বর্ণনা শুনেও মাথা ঝিম ঝিম করত আমার।

সে-বর্ণনা শুনেছিলাম বিয়ের পরে। তার বন্ধুর মুখ থেকে। এখানে বলে রাখি, যে-রকম যোগাযোগ তাতে বিয়েটা আমার সেই হাড়-ভাঙা মার-খাওয়া ছেলেটার সঙ্গেই হতে পারত। হয়নি কেন, সেটা বিয়ের আগে খানিকটা বুঝেছিলাম। বিয়ের পরে সবটাই বুঝেছি।

সেই দুরন্ত দুর্দান্ত ছেলেটার নামই সুধীর। সুধীর দত্ত। ও নিজেই কত সময় হেসে বলেছে, এই নামটাই আমার জীবনের সব থেকে বড় পরিহাস, বুঝলে। এমন সুধীর আর দশ-বিশটা থাকলে বাংলা দেশটাকে একবার দেখে নিতাম।

ওর বাবা ছিলেন স্কুল মাস্টার। প্রশান্তকে বাড়িতেও পড়াতেন। প্রশান্তর বাবার থেকে বয়সে অনেকটাই বড় ছিলেন ওর বাবা। দরিদ্রের প্রায় অচল সংসার। ভদ্রলোকের ছয় মেয়ে দুই ছেলে। প্রথম দুই মেয়ের পর বড় ছেলে, তারপর চার মেয়ের পরে আবার এই বেশি বয়সের ছোট ছেলে। এ ছাড়াও তাঁর ঘরে বিধবা মা আর বিধবা বোন। তারও আবার তিনটি ছেলেমেয়ে।

ছয় থেকে আট এই দুটো বছর কাছাকাছি বাড়িতে কলকাতায় কাটিয়েছে প্রশান্ত আর সুধীর। কাছাকাছি বাড়ি বটে, কিন্তু অবস্থার দিক থেকে বিরাট ফারাক। আলো বাতাস ঢোকে না এমন গলির মধ্যে তিনখানা ঘরের জীর্ণদশা বসত-বাড়ি সুধীরদের। তার ঠাকুরদার আমলের সে-বাড়ি সংস্কারের অভাবে সামান্য ঝড়জলেও মাথার ওপর ভেঙে পড়তে পারে এমন দশা। আর, ঠিক সেই গলির বাইরেই বড় রাস্তার ওপর বিশাল দোতলা ভাড়াটে দালান প্রশান্তদের। তার বাবা বড় সরকারী অফিসার—ওই পর্যায়ের অফিসারদের জন্য ওই বাড়িও সরকারের দখলে।

প্রশান্ত তার বাবার একমাত্র সন্তান। ছেলেবেলা থেকেই ওর প্রতি তিনি সচেতন ছিলেন। তাছাড়া ছোট ছেলেদের প্রতি বিশেষ ভাবে চোখ রাখাটা তাঁর পেশাগত ব্যাপারও

ছিল। প্রশান্তকে যে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল সেখানকার এক মাস্টার সামনের গলিতে থাকেন শুনে আর তাঁর সম্পর্কে গোপনে একটু খবরাখবর নিয়ে খুশি হয়ে সেই ভদ্রলোককে তিনি ভালো মাইনেয় বাড়িতে বহাল করেছিলেন।

সেই দুটো বছর সুধীরও তার বাপের স্কুলে ফ্রি পড়ত। প্রশান্তর বয়সী, তার সঙ্গেই পড়ত। পড়ত বটে, কিন্তু ওই ছেলের প্রতি কখনো একটু বাড়তি মনোযোগ দেবার অবকাশ পেতেন না ওর বাবা। তাই প্রশান্তকে পড়াবার সময় নিজের ছেলেকেও প্রায়ই সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন। যদি পড়ানো শুনেও ছেলেটা কিছু শিখতে পারে। অবশ্য তার জন্যেও ভদ্রলোক প্রশান্তর বাবার অনুমতি নিয়েছিলেন। সত্যিকারের উদার মানুষ ছিলেন প্রশান্তর বাবা। শোনামাত্র বাপের সমস্যা বুঝে বলেছিলেন, ছি ছি, এ আবার একটা জিজ্ঞাসা করার কথা—নিশ্চয় নিয়ে আসবেন।

কিন্তু বাপের সঙ্গে সুধীর আসত অন্য লোভে। খাবার লোভে। সন্ধ্যায় এলে প্রশান্তর মা সুধীরের বাবার জন্য চা পাঠাতেন আর সুধীরের জন্যেও কিছু না কিছু খাবার পাঠাতেন। দিন কয়েক না যেতে সুধীর প্রশান্তকে স্কুলে বলে দিল, তোর মাকে বলিস আমাকে আর একটু বেশি করে খাবার দিতে, স্কুল থেকে গিয়ে দু'মুটো মুড়ি ছাড়া আর কিছু খেতে পাই না, বেজায় খিদে পায়—আর খবদ্দার, আমি বেশি করে খাবার দিতে বলেছি, বাবাকে বলবি না!

ওই বয়সেই সুধীর পাড়ার আর স্কুলের সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে মারামারিতে ওস্তাদ হয়ে উঠেছিল। সেই জন্যে অন্য ছেলেরা ওকে সমীহ করত একটু। রাস্তায় ডাংগুলি আর মার্বেল খেলত। যাদের সঙ্গে খেলত তাদের সঙ্গে মারামারিটাও নৈমিত্তিক উপসংহার ছিল। একবার ডাংগুলির ডাণ্ডার ঘায়ে এক ছেলের তো মাথা ফাটিয়ে বসেছিল। তাই নিয়ে বাড়িতে ওর সে-কি নির্যাতন। প্রশান্তকেও খেলার জন্য ডাকত ও। কিন্তু রাস্তায় খেলার ব্যাপারে তার বাবার কড়া নিষেধ, তাই ইচ্ছে থাকলেও সে খেলতে আসতে পারত না। ঝগড়াঝাঁটি সুধীর প্রশান্তর সঙ্গেও করত, কিন্তু রাগ হলেও তার গায়ে হাত তুলত না। ওই বয়সেই ছেলেটা জানত, প্রশান্তর বাবা ওর বাবাকে মাস গেলে অনেক টাকা দেয়। আর বিকেলের খিদের জ্বালাটাও সন্ধ্যায় ওদের বাড়িতে গেলে তবে ঠাণ্ডা হয়।

...স্কুলে পাশাপাশি বসা নিয়ে দুই বন্ধুতে একবার মতান্তর হয়েছিল। সুধীরের দাবি প্রশান্তকে তার পাশে বসতেই হবে, প্রশান্তর গোঁ সে কিছুতে বসবে না। কারণ বসলে সুধীর ওকে জ্বালাতন করে, মাস্টারমশায় ক্লাসে থাকার সময়েও নানারকম খুনসুটি করে। ধরা পড়লে দুজনকেই বকুনি খেতে হয়, দাঁড়িয়ে থাকতেও হয়। অতএব সে আর তার পাশে জীবনে বসবে না।

ছেলেদের মধ্যে সুধীরের রাগকে একমাত্র প্রশান্তই কেয়ার করে না। ওদের কড়া অঙ্কের মাস্টারের ক্লাস ছিল সেদিন। বাড়ির টাস্ক না আনলে শাস্তি পেতেই হবে, কোনো অজুহাতের ধার ধারেন না তিনি। বাচ্চা ছেলেগুলো যমের মতো ভয় করে তাঁকে। টিফিনের পরে ক্লাসে এসেই তিনি টাস্ক দেখতে চাইলেন। প্রশান্ত তার খাতা বার করতে গিয়ে হাঁ। ডেস্কে খাতা নেই। অঙ্কের মাস্টার রেগে আগুন। খাতা খোঁজাটা মিথ্যে ভণিতা বলে ধরে নিলেন তিনি। গর্জন করে ওকে বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়ে দিলেন।

সেই আট বছর বয়সেই ক্লাসের সেরা ছেলে প্রশান্ত। পড়ার জন্যে কোনোদিন কোনো টিচারের কাছে শাস্তি খেতে হয়নি। মুখ লাল করে বেঞ্চির ওপর দাঁড়ালো, চোখে জল আসার উপক্রম। আগুন চোখে সে ঘাড় ফিরিয়ে সুধীরের দিকে তাকালো। কিন্তু সুধীর তখন ভালো ছেলের মতো নিজের অঙ্কের খাতার দিকে চেয়ে আছে।

ঘণ্টা শেষ হতে আর অঙ্কের মাস্টার চলে যেতেই প্রশান্ত এক লাফে বেঞ্চি থেকে নেমে এসে সুধীরের সামনে এসে চেঁচিয়ে উঠল, তুই আমার অঙ্কের খাতা দিবি কি না? তোকে আমি মজা দেখাচ্ছি, দাঁড়া, খাতা চোর কোথাকার!

প্রশান্ত রাগে কাঁপছে, রক্তবর্ণ মুখ। কিন্তু সুধীর ভেবাচাকা তার রাগ দেখে বা তম্বি শুনে নয়। খাতা ও নিয়েছে জেনেও প্রশান্ত অঙ্কের মাস্টারকে বলে দিল না কেন সেটাই ওর বিস্ময়ের কারণ। ও ভেবেছিল এক ফাঁকে যে-ভাবে খাতাটা চুরি করেছিল, অঙ্কের ক্লাস শেষ হলে তেমনি আর এক ফাঁকে খাতাটা জায়গামতো রেখে দেবে—তারপর স্বীকার না করলেই হল, কে জব্দ করেছে মনে মনে বুঝলেও প্রশান্ত কিছু বলতে পারবে না। ভবিষ্যতের ভয়ে আপনা থেকেই তখন আবার সুড়সুড় করে ওর পাশে এসে বসবে।

রাগের মাথায় প্রশান্ত ওর বইপত্র ফেলে ছড়িয়ে নিজের খাতা উদ্ধার করে নিয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতেই চলে গেল। আবারও বলে গেল চুরির মজা দেখাবে। অন্য ছেলেরা হতভম্ব একেবারে।

ছুটির পর প্রশান্ত ওর সঙ্গে কথা বলবেই না। কিন্তু সুধীর ওর সঙ্গ ছাড়ল না। ওর ছোট্ট বুকের তলায় অদ্ভুত মোচড় পড়েছে। ও বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, আমি খাতা নিয়েছি জেনেও তুই অঙ্কের সারকে বলে দিলি না কেন?

প্রশান্ত খেকিয়ে উঠল, বললে মেরে তোকে আধমরা করত, আর একবার তোকে কি করেছিল মনে নেই বেহায়া কোথাকারের! তোকে আমি ছাড়ব ভেবেছিস, আমি বাবাকে বলব—

বিমর্ষ মুখে সুধীর চুপচাপ খানিক তার সঙ্গে চলল। তারপর বলল, দাঁড়া একটু—

ঝুঁকে মাটি থেকে বড়সড় একটা পাথর তুলে প্রশান্তর হাতে দিতে গেল।—ধর এটা...

—কেন? প্রশান্তর রাগ একটুও ঠাণ্ডা হয়নি।

—ধর না। পাথরটা হাতে গুঁজে দিল।—আমাকে তুই যত জোরে খুশি মার, য-ত জোরে পারিস, যেখানে ইচ্ছে মার. মার না—

পাথর হাতে প্রশান্ত ওর দিকে চেয়ে রইল।

ও বলল, তোর বাবা জানলে আমার বাবাকে বলবে, বাবা খুব কষে মারবে আমাকে তার জন্যে কিছু না, কিন্তু পড়ার সময় আর কখনো আমাকে তোদের বাড়ি নিয়ে যাবে না, সন্ধ্যে হতে না হতে তখন সেই আগের মতো কলের জল খেয়ে পেট ভরাতে হবে—।

কিন্তু প্রশান্তর রাগ পড়েনি তবু, বাবার কাছে বলেছে। তারও তো বয়স সবে আট তখন। বাবার কাছে প্রশান্ত সুধীরের পরের কথাগুলোও বলেছে সেই সঙ্গে। পেশাগতভাবে প্রশান্তর বাবা কিশোর মনস্তত্ত্ব নিয়ে অনুশীলন করে থাকেন। ছেলে মাস্টারের কাছে নালিশ করেনি শুনে খুশি হয়েছেন, তাঁকেও কিছু না বললে হয়তো

আরো খুশি হতেন। ছেলেকে আরো একটু পরীক্ষা করার সুযোগ ছাড়লেন না তিনি। বললেন, ঠিক আছে, ও-রকম ছেলেকে আর বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

বাবার এই উক্তি ছেলের ঠিক যেন পছন্দ হল না। কিন্তু স্কুলের হেনস্থার রাগ আছে তখন পর্যন্ত। বিকেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল, নীচের রাস্তায় এসে সুধীর আধা ইশারায় জিজ্ঞাসা করল, বাড়িতে বলেছিস?

প্রশান্ত ওপর থেকে মাথা নাড়ল। বলেছে। ব্যস সেখানেই সম্পর্ক শেষ। সুধীর হনহন করে চলে গেল। সন্ধ্যায় বাবার সঙ্গে পড়তে এলো না। রাতে বাবার হাতে মার খাবার জন্য প্রস্তুতই ছিল, কিন্তু ও-বাড়ি থেকে ঘুরে এসেও বাবা কিছুই বলল না দেখে অবাক একটু। ওদিকে রাতে খেতে বসে প্রশান্তরও মন খারাপ, আর একজন বোধহয় সন্ধ্যা থেকে কলের জল গিলেছে। পরদিন স্কুলেও কথা নেই। বাড়ি ফিরে বাবার অনুমতি নিয়ে প্রশান্ত সুধীরকে ডেকে বলল, বাবা তোর বাবাকে কিছু বলবে না, তোকে আসতে বলেছে।

দাঁত কড়মড় করে সুধীর জবাব দিয়েছে, যাব না যা, আমি কি ভিকিরি?

সেই থেকে দুটো শিশুর পাকাপোক্ত বিচ্ছেদ। বাপের ভয়েই সুধীর প্রশান্তকে কিছু বলতে পারে না, নইলে মজা বুঝিয়ে ছাড়ত। ওদিকে অপমান বোধে প্রশান্তও গোঁ ভরে ওকে বিষম উপেক্ষা করতে লাগল। সুধীরের বাবা সুধীরকে দুই একদিন কানমলা আর চড়চাপাটি দিয়েও ও-বাড়িতে পড়ানোর সময় ছেলের টিকির নাগাল পাননি। অভাবের দায়ে যাঁরা একাধিক টিউশনি করেন, নিজের ছেলের সম্পর্কে তাঁরা প্রায়শই আশাহত।

মাস দেড়েকের মধ্যে প্রশান্তর বাবা হঠাৎ বদলি হয়ে গেলেন। ওরা চলে গেল। শেষ পর্যন্ত আড়িই থেকে গেল সেই রাগে। সুধীর শূন্য বাড়িটার দিকে চেয়ে জিভ ভেঙচাল দিনকতক।

দারিদ্র্যের হাড়-ভাঙা খাটুনির চোটেই সুধীরের বাবা অকালে মারা গেলেন। সব থেকে বড় দুটো বোনের বিয়ে হয়েছে মাত্র। বাকি সব দাদার ঘাড়ে। বাবা মারা যাবার এক বছরের মধ্যেই মা চোখ বুজেছেন। মাঝি-মাল্লাশূন্য নৌকোর মতো ওদের সংসারটা ভেসে চলেছিল। খাওয়ার ব্যবস্থা নেই, পড়ার ব্যবস্থা নেই। ওর দাদার মাথায় সর্বদা তখন আগুন জ্বলত। সামান্য দোষেও ছোট ভাইবোনগুলোকে ধরলে আধ-মড়া করে ছাড়ত।

ওই বয়সেই দাদা তিন তিনটে টিউশনি করত সকাল-বিকেলে। মাস্টারদের হাতে পায়ে ধরে বিনে পয়সায় নিজের কলেজের পড়া চালাতো। সুধীরের পিসী এক বাড়িতে রান্নার কাজ করত।

আট থেকে দশ, এই দুটো বছর সুধীররা কতদিন দু'বেলা খেতে পেয়েছে হাতে গুনতে পারত। তবে একটা জিনিস, সুধীরের মতো অমন অপর্যাপ্ত আর কেউ খায়নি। সেটা হল মার। দিদিদের হাতে মার, পিসীর হাতে মার, আর দাদার হাতের তো কথাই নেই। ওর দাদার যেন মারের নেশা চাপত এক-এক সময়। তখন কেউ ওকে জোর করে ছিনিয়ে না নিয়ে গেলে সেই মারের চোটে কোনো সময় মুখে রক্ত উঠেই মরে যেতে পারত। দশ বছরের সেই ছেলে দুনিয়ায় সব থেকে বেশি ঘৃণা করত তার দাদাকে। কত সময়ে ভাবত, বাবা-মায়ের মতো কোনো মন্ত্রবলে দাদাও যদি হুট করে মরে যেত, তার থেকে ভালো বোধ করি আর কিছু হয় না।

মার খাবার মতো সমস্ত গুণাবলীই অবশ্য অর্জন করেছিল সুধীর। সমস্ত দিন রাস্তায় রাস্তায় টো-টো করে ঘুরে বেড়াতো। বাপের স্কুল থেকে নাম কাটা গেছে। করপোরেশনের ফ্রী স্কুলে ওর নামটাই শুধু লেখা ছিল। আর সেও বেশিদিন থাকেনি। প্রথম কারণ, বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্কুল-মুখো বড় একটা যেত না। দ্বিতীয় কারণ, স্কুলের ছেলেদের খাতা পেনসিল বই ফাঁক পেলেই চুরি করে বসত।

মাস্টারমশাইরা একাধিক বার ওর দাদার কাছে লিখিত নালিশ পাঠিয়েছে। শেষে তাড়িয়ে দিয়েছে। ভাইকে শোধরানোর একটাই ওষুধ জানত ওর দাদা। মার। সেই ওষুধ সে নির্দয়ভাবে প্রয়োগও করত। কিন্তু ফল কিছু হত না। দুষ্টুমি আর গোঁয়ারতুমি ব্যাধির মতই পেয়ে বসেছিল ওকে। মাস্টারদের নালিশ এলেই দাদা ওকে ধরে বেদম ঠেঙাতো আর নাম কাটা যাবার পর ঠেঙিয়ে তো প্রায় মেরেই ফেলেছিল। তারপর ঘাড় ধরে রাস্তায় বার করে দিয়েছিল।

দশ বছরের ছেলেটার সঙ্গে বাড়ির তখন এক বেলা খাওয়ার সম্পর্ক। সেও দাদা বাড়ি না থাকলে। বিকেলের খাওয়া আর রাতের খাওয়া ও তখন মাঝে মাঝে নিজেই সংগ্রহ করতে পারত। ওই দশ বছর বয়সেই গোকুলের আড্ডায় মেশার সুযোগ পেয়েছিল। গোকুল পাড়ার নামজাদা গুণ্ডা। বে-পাড়ায় খুন-জখম রাহাজানির সুনাম ছিল তার। অল্পবয়সী ভদ্রচেহারার একটা ছেলে থাকলে অনেক রকমের সুবিধে। সুধীর ওর ফাই-ফরমাইশ খাটত। হুকুম-মতো ঘুরে ঘুরে কিছু কিছু খবর সংগ্রহ করে দিত। সে সব খবর পেয়ে গোকুলের কি লাভ সঠিক বুঝত না। কিন্তু লাভ যে কিছু হয় সেটা অনুমান করতে পারত। মেজাজ ভালো থাকলে গোকুলই ওকে মাঝ মাঝে খাবারের ভাগ দিত, দু'চার আনা পয়সাও দিত সময় সময়। ওই বয়সেই গুণধর গোকুলের আধ-খাওয়া বিড়ির শেষটুকু হাতে পেলে কৃতার্থ বোধ করত নিজেকে।

পাড়ার কাছাকাছি এক বাড়িতে একবার বড় রকমের একটা চুরি হয়ে গেল। পাঁচ সাত হাজার টাকার গয়না চুরি! সেই চুরির খবর সুধীরও জানত, কিন্তু কে যে চুরি করেছে ঠিক-ঠিক জানে না। শুধু এইটুকু জানে ওই বাড়িতে বাচ্চা ছেলের চাকরির খোঁজে গোকুল তাকে দু'তিনদিন পাঠিয়েছিল, সোজা ভিতরে ঢুকে গিয়ে বাড়ির গিন্নীর কাছে মিছিমিছি চাকরির বায়না ধরতে বলেছিল। তারপর কোন ঘরের কোনদিকে ক'টা দরজা, কোন দিকে দোতলার সিঁড়ি, কোন ঘরে গিন্নী থাকে এ-সব তার কাছ থেকে খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছিল। আর এটুকুর বদলেই পেট ভরে ওকে রসগোল্লা খাইয়েছিল সেদিন।

চুরির দু'দিন বাদে গোকুল তিন-চারজন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে তার আড্ডায় বসে আনন্দ করে চপ কাটলেট গিলছিল। সুধীরও ছিল সেখানে, গোগ্রাসে চপ কাটলেট খাচ্ছিল সে-ও। হঠাৎ বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ। দরজা খুলে চক্ষুস্থির সকলের। পুলিসে ঘর ঘিরে ফেলেছে।

ওদের সঙ্গে সুধীরকেও থানায় নিয়ে গেল তারা। ঘন্টা দুই বাদে সুধীর হাঁ করে দেখে যে-বাড়িতে চুরি হয়েছে, অর্থাৎ যে-বাড়ির গৃহিণীর কাছে সে চাকরির আবদার করতে গেছল তিনিও থানায় হাজির। তিনি ওকে দেখেই চিনলেন আর দাঁত কড়মড় করে ওর শয়তানীর কথা বলতে লাগলেন। তারপর পিঠে পুলিসের দু-একটা রুলের বাড়ি পড়তেই ও গলগল করে বলে দিল কেন গেছল, কার নির্দেশে গেছল।

এরপর পুলিস ওর দাদাকে থানায় টেনে এনেছে। দাদা তো হাঁ প্রথম। তারপর পুলিসের হাত থেকেই ওকে ছিনিয়ে এনে শেষ করে দেয় আর কি! পুলিসের লোকই তখন দাদার হাত থেকে রক্ষা করেছে ওকে।

কি কাণ্ড যে হল তারপর ক'দিন ধরে ঠিক নেই। রোজ একটা বন্ধ গাড়িতে ঢুকিয়ে যেখানে নিয়ে যাওয়া হত ওদের তার নাম নাকি কোর্ট। শুনল সেখানে অপরাধীর বিচার হয়, সাজা হয়। দাদাকেও রোজ দেখত সেখানে। বিচারে গোকুলদের কয়েক বছর করে জেল হয়ে গেল। সুধীরের বয়েস মাত্র দশ, মৃত স্কুল মাস্টারের ছেলে আর কুসঙ্গে এই প্রথম অপরাধ—এই সব বিবেচনায় খুব ধমক-ধামক দিয়ে আবার দাদার হাতেই সঁপে দেওয়া হল ওকে।

সুধীরের তখন বদ্ধ ধারণা দাদা ওকে বাড়ি নিয়ে গিয়েই দা দিয়ে দু'খানা করে কেটে ফেলবে। প্রাণে বাঁচার তাড়নায় দাদার হাত ছাড়িয়ে দু'বার ট্রাম থেকে লাফিয়ে পালাতে চেষ্টা করেও পারেনি। দাদা বাড়ি নিয়ে এলো ওকে। এনে একটা ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিল।

তারপর টানা বারো ঘণ্টা বন্ধ ঘরে দশ বছরের ছেলেটার শুধু মৃত্যুর প্রতীক্ষা। কিন্তু দাদা সেদিন আর এলোই না। দিদিরা তালা খুলে খাবার দিয়ে আবার তালা বন্ধ করে চলে গেল।

পরদিন আরো হতভম্ব সে। বেশ সকাল-সকাল তাকে চান করানো হল। তারপর খেতে দেওয়া হল। পাশে দাদাও খাচ্ছে গম্ভীর মুখে বসে। খাওয়া-দাওয়ার পর একটা পুঁটলি হাতে করে ওকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলো আবার।

বিস্ময়ের শেষ নেই দশ বছরের ছেলেটার। দাদা তাকে নিয়ে ট্রেনের টিকিট কেটে একটা গাড়িতে চেপে বসল। বিস্ময়ের সঙ্গে ভয়ও কম নয়। দাদা কি তাহলে ওকে দূরের কোনো বন-জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে কেটে-কুটে ফেলে দিয়ে আসবে?

বিকেলের দিকে যে স্টেশনে নামা হল তার নাম বহরমপুর। দাদা একে-ওকে কি-সব জিজ্ঞাসা করে করে এক বাড়িতে এসে উঠল। তারপরেই সুধীর অবাক হয়ে দেখে দাদা তাকে এনে হাজির করেছে প্রশান্তর বাবার কাছে—দু'বছর আগে যিনি বদলী হয়ে পাড়া ছেড়ে চলে গেছলেন। প্রশান্তকেও দেখল সেখানে।

হঠাৎ ওকে দেখে প্রশান্ত খুশিতে আটখানা। আর সুধীর হতভম্ব। দু'বছর আগের অভিমান এক মুহূর্তে শেষ।

ঘরের মধ্যে ঘণ্টা দুই ধরে দাদার সঙ্গে প্রশান্তর বাবার কি কথা হল জানে না। দুজনে একসঙ্গে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো যখন, প্রশান্তর বাবা সুধীরের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছেন আর সুধীরের দাদা কাঁদছে।

তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে দাদা আর একবারও ওর দিকে ফিরে না তাকিয়ে সোজা চলে গেল। প্রশান্তর বাবা ওর কাছে এসে মাথাটা একবার নেড়ে দিয়ে বললেন, খুব দুষ্টু হয়ে গেছিস বুঝি? আমার কাছে ভালো হয়ে থাকবি তো?

সুধীর অবাক তখনো। জীবনে এমন মিষ্টি হাসি ও আর বুঝি দেখেনি।

পরে সবই আস্তে আস্তে বুঝেছে। প্রশান্তর বাবা এখানকার বোরস্টাল সুপারিনটেনডেন্ট। অর্থাৎ অপ্রাপ্তবয়স্ক দুরন্ত অপরাধী ছেলেদের যে জেলে আটকে রেখে

তাদের মতিগতি ফেরানো হয়—তার খোদ কর্তা। সুধীর প্রথমে ভেবেছিল ওকেও ওই সব ছেলেদের সঙ্গেই রাখা হবে। পরে নিশ্চিন্ত হয়েছে, প্রশান্তই জানিয়েছে ও একসঙ্গে এই বাড়িতেই থাকবে। মনের আনন্দে বন্ধুর কাছে ভিতরের গোপন কথাও ফাঁস করে দিয়েছে। ওর মা নাকি আপত্তি করেছিলেন, বলেছিলেন বোরস্টালে পাঠিয়ে দিতে, তা না হলে তাঁদের নিজের ছেলেও নাকি খারাপ হয়ে যেতে পারে। আর তখন ওর বাবা নাকি হেসে বলেছেন, আমার থেকেও একটা বাচ্চা ছেলের শক্তির ওপর তোমার বেশি বিশ্বাস দেখি।

ব্যস, মা চুপ।

ছেলেদের সেই জেলখানা এরপর সুধীর কত দেখেছে ঠিক নেই। তাদের সঙ্গে হৈ-চৈ করেছে, খেলা-ধুলোও করেছে। আর কেন যেন সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছিল ওদের। স্বভাব-দোষে স্কুলে বা খেলার সময়ে কখনো বেশি দুষ্টুমি করে ফেললে প্রশান্তর বাবা হেসে হেসেই বলতেন, ফের ও-রকম করলে কিন্তু ওই ছেলেগুলোর ওখানে পাঠিয়ে দেব তোকে।

কিন্তু আশ্চর্য একটা দিনের জন্যেও গায়ে হাত তোলেননি তিনি। প্রায়ই নিজের ছেলেকে আর ওকে নিয়ে গল্প করতে বসতেন পৃথিবীর কত সব দুরন্ত ছেলে পরে কত ভালো ভালো কাজ করেছে—সেই সব সত্যি গল্প। বোরস্টালের কত বয়ে-যাওয়া ছেলে স্বভাব শুধরে কত বড় হয়েছে সেই সব গল্প।

সুধীর কান পেতে শুনত, বিশ্বাস করবে কি করবে না ভেবে পেত না।

সেই সব গল্পের ফসল যে ফলেছিল সেটা আর কেউ না হোক প্রশান্তর বাবা অন্তত অনুভব করেছিলেন।...একবার এক দুর্দান্ত ছেলের আবির্ভাব ঘটেছিল বোরস্টালে। তার নাম বাবু। বয়েস মাত্র চৌদ্দ। অর্থাৎ সুধীরদের থেকে এক বছরের মাত্র বড়। কিন্তু ওই বয়সেই বাবু অনেকবার পুলিসকে সুদ্ধু ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে। বস্তিতে থাকত। ন'বছর বয়সে মা মারা যেতে বাপ আবার বিয়ে করে তিন মাসের মধ্যে ওকে হাড়ভাঙা পিটুনি দিয়ে রাস্তায় বার করে দিয়েছিল। তারপর কু-সঙ্গে মিশে দেখতে দেখতে সে ওস্তাদ ছেলে বনে গেছে। তের বছর বয়সেই এক সাঙ্ঘাতিক দলের প্রথম সারির সাগরেদ সে। সুধীর ওর নিজের মুখেই শুনেছে, তার দল ডাকাতি করেছে, মানুষ খুন করেছে, মেয়ে চুরি করেছে, আরো কত কি বীরত্বের কাজ করেছে। দলের সর্দারের বুদ্ধির দোষে ধরা পড়ে দলকে দল জেলে পচছে এখন—আর বয়স কম বলে তাকে এখানে আনা হয়েছে। সর্দারের বুদ্ধির দোষটা কি শুনে সুধীর অবাক। একটা মেয়েকে নিয়ে সর্দারের সঙ্গে দলের দ্বিতীয় মাতব্বরের প্রায় খুনোখুনি ব্যাপার। সেই লোকটাই পুলিসকে খবর দিয়ে দল সুদ্ধু ধরিয়ে দিয়েছে। বাবুর মতে সর্দার জেল থেকে বেরিয়েই প্রথমে সেই লোকটাকে খুন করবে, তারপর ওই মেয়েটাকে। সেই সঙ্গে বাবু সুধীরকে একটু জ্ঞানও দিয়েছে, বলেছে, কোনো কিছুতে মেয়ে ভিড়লেই সর্বনাশ, বুঝলি!

সুধীর বুঝত না, কিন্তু বাবু ওকে কেমন করে যেন বশ করেছিল। তার স্বাস্থ্য দেখে মুগ্ধ, সাহসের কথা-বার্তা শুনেও। প্রশান্তর বাবার নিষেধ সত্ত্বেও ওই দুর্দান্ত ছেলেটার প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ অনুভব করত। বড় সাহেবের বাড়িতে থাকে বলে সকলের সঙ্গেই অবাধে মেলামেশার সুযোগ ছিল তার। বাবুকে ও নিজের গল্পও করেছে, কোথা

থেকে কি-ভাবে এখানে এসেছে সেই গল্প। বড় সাহেবের বাড়ির এই ছেলেটার সঙ্গে ভাবের সুযোগ নিতে ছাড়েনি বাবু। সুধীর সঙ্গে থাকলে বোরস্টালের অনেক নিয়মকানুন ফাঁকি দেবার সুযোগ মিলত। একসঙ্গে পালাবার নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে ওর মাথাটা আবার বিগড়ে দিতে চেষ্টা করতে লাগল সে। বাঁধা-ধরা এই খাঁচার জীবনকে ধিক্কার দিয়ে থুথু ছিটাতো সে। তার বদলে দুজনে মিলে কত স্বাধীন আর কত দুর্ধর্ষ হয়ে উঠতে পারে সেই সব সম্ভাবনার কথা বলত। সুধীর তাকে ভালোর দিকে ফেরাতে চেষ্টা করত, কিন্তু এক-একসময় ওর মনে এই খাঁচার জীবন থেকে পালাবার লোভ চিকিয়ে উঠত। বাবু ওকে বোঝাতো, ওরও খাঁচার জীবন, ভালো হওয়ার আফিম খাইয়ে ওকে বশ করে রাখা হয়েছে। তাছাড়া অন্যের দয়ায় মানুষ—একথা সকলে চিরকাল বলবে। যারা মানুষ করছে তারাও বলবে।

সুধীরকে আধা-আধি বশ করার পর এক বিকেলের দিকে বাবু ওকে নিয়ে পালালো। বড় সাহেবের বাড়ির ছেলের সঙ্গে যাচ্ছে, কেউ একটুও সন্দেহ করল না। ওদিকে সুধীরও ঠিক বুঝতে পারেনি চিরকালের মতো পালাচ্ছে তারা। ভেবেছিল, এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টার জন্য যেমন এক-একদিন এদিক-সেদিক চলে যায় তারা, তেমনি যাচ্ছে।

...টানা পাঁচ ছ' মাইল চলে আসার পর সুধীরের সন্দেহ হতে বার বার শুধালো কোথায় যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু বাবুর মুখ তখন ধারালো গম্ভীর। চলেছে জঙ্গলের ধার ধরে, কখনো বা জঙ্গলের ভিতব দিয়ে। বাবু এতক্ষণ ওকে বুঝিয়েছে, আজ এমন একটা অ্যাডভেঞ্চার হবে যা জীবনে ভোলবার নয়। কি অ্যাডভেঞ্চার সুধীর ক্রমশ যেন তার আভাস পাচ্ছে। সেটা যেন বাবুর চোখে মুখে ফুটে উঠছে।

বাড়ি ফেরার জন্য বার কয়েক তাগিদ দেবার পর বাবু ওকে জঙ্গলের ধারে একটা ভাঙা দেয়ালের ও-ধারে টেনে নিয়ে গিয়ে কোমর থেকে ছোট চকচকে ছোরা বার করল একটা। তার চোখমুখও ওই ছোরার মতই ভয়ানক হয়ে উঠল।—আর ফেরার নাম করবি. না এখানেই তোকে শেষ করব, বল?

সুধীর বোবা হঠাৎ।

ধাক্কা দিয়ে ওকে মাটিতে ফেলে বাবু ওর বুকের ওপর চেপে বসল। তারপর ছোরাটা উঁচিয়ে ধরল, আর ফেরার নাম করবি কিনা বল শিগগির!

সুধীর সভয়ে মাথা নাড়ল। করবে না।

পাশে বসে বাবু ওকে টেনে তুলল। আদর করে দুটো ঝাঁকানি দিয়ে বলল, আমরা ওদের খাঁচা থেকে পালিয়ে এলাম বুঝছিস না! সন্ধ্যে হয়ে এলো আর আমাদের পায় কে?...তোতে আমাতে দল গড়ব, একদিন সেই দলে আরো কত মরদ আসবে দেখিস, আমাদের বন্দুক থাকবে, রিভলবার থাকবে—বিলেতি ছবির মতো ব্যাঙ্ক ডাকাতি করব —ঘরে পাঁজা পাঁজা নোট থাকবে—তার বদলে কিনা এই দয়ার জীবন! ছোঃ, তুই মরদ না?

হ্যাঁ, সুধীরের মাথায় প্রলোভন আবার দানা পাকিয়েছে। বীরত্বের স্বপ্ন দেখারই বয়স সেটা—সম্ভব অসম্ভবের বিচার মাথায় আসে না। তাছাড়া শিশু অবস্থা থেকেই দুজনে ওই বিপথের রোমাঞ্চ জেনেছে। বাবু অবশ্য আরো ঢের বেশি জেনেছে।

এরপর অন্ধকারে দুজনে আরো পাঁচ ছ মাইল পথ ভেঙেছে। সমস্ত পথ বাবু

সুধীরকে ভবিষ্যতের উদ্দীপনা জুগিয়েছে। তারপর হাত বাড়িয়েছে, তোর কাছে কি আছে, দে—

অ্যাডভেঞ্চারের জন্য যে কটা টাকা সম্ভব বাবু ওকে সঙ্গে নিতে বলেছিল। সুধীরের সম্বল মাত্র দু'টাকা সঙ্গে নিয়েছিল। পকেট থেকে টাকা দুটো বার করে তার হাতে দিল। মাত্র দুটো টাকা দেখে হাসিমুখেই ওকে একটা অশ্লীল গালাগাল দিয়ে বাবু বলল, ঠিক্ আছে, টাকা আমরা ঠিক যোগাড় করে নেব, আমি কি করতে পারি সকাল হলে দেখিস—

একটা দোকান থেকে কিছু গুড়মুড়ি কিনে খেয়ে আবার চলল তারা।

কিন্তু সুধীরের ততক্ষণে বিপরীত চিন্তা আর অনুশোচনা শুরু হয়েছে। ক্রমে সেই চিন্তা আর অনুশোচনা বাড়তেই থাকল। প্রশান্তর বাবার মুখে শোনা সেই সব ছেলের মুখগুলো চোখের সামনে ভাসতে লাগল, অল্প বয়সে যারা ওদের মতই ঘৃণ্য শয়তান ছিল, কিন্তু পরে যারা আদর্শ মানুষ হয়ে উঠেছে। তারা যেন সব একসঙ্গে ছি-ছি করতে লাগল ওকে।...তাছাড়া মেসোমশায়...প্রশান্তর বাবা কি ভাবছে? মা কি ভাবছে? প্রশান্ত কি ভাবছে। তাদের বিশ্বাসের উপর এতবড় বেইমানি করবে? মেসোমশায়ের মাথা হেঁট করে দেবে? সকলে বলবে এই বেইমানকে আশ্রয় আর প্রশ্রয় দিয়েছিল বলে এমনটা ঘটল। আর ও যদি একলা কোনোরকমে বাবুর খপ্পর থেকে বেরিয়ে ফিরে যেতেও পারে, তবু সকলে বলবে ওর জন্যেই বাবু পালাতে পারল, ওর জন্যেই বাবুকে আর ভালোর দিকে ফেরানো গেল না। একলা ও ফিরবে কি করে? মেসোমশাইকে মাসিমাকে প্রশান্তকে মুখ দেখাবে কি করে?

মাথায় আগুন জ্বলতে থাকল একসময়। থমকে দাঁড়াল।

বাবুও থামল।—কি?

যাব না। ফিরে চল।

সঙ্গে সঙ্গে ছোরায় হাত পড়ল।—কি বললি, আবার বল তো?

সুধীরও প্রস্তুতই ছিল। লাফিয়ে দু'হাতে জাপটে ধরল তাকে। —আমিও যাব না, তোকেও যেতে দেব না, মেসোমশাইয়ের পা ধরে আমরা ক্ষমা চাইব—

আর বলার অবকাশ পেল না। অন্ধকার রাস্তায় দুজনের জাপটা-জাপটি শুরু হল। সুধীর প্রাণপণে ওকে আঁকড়ে ধরে চিৎকার করে লোক ডাকতে থাকল।

...তারপর আর মনে নেই। ছোরাটা বুক ঘেঁষে কাঁধের দিকে বসে গেছে। এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় চারদিক কালো হয়ে যাচ্ছে। তবু বাবুকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চেষ্টা করছে, আর চিৎকার করছে।

...তারপর আর কিছু মনে নেই।

চোখ মেলে দেখে দিনের আলো। অচেনা একটা ঘরে লোহার খাটের ধপধপে বিছানায় শুয়ে আছে। সামনে ঝুঁকে আছে প্রশান্তর বাবা...মেসোমশায়। তার পাশে মাসিমা আর প্রশান্ত। শুকনো উতলা মুখ তাদের।

একটু বাদেই সুধীর বুঝেছে সে হাসপাতালে শুয়ে আছে। কিন্তু ও স্বপ্ন দেখছে কি ঠিক দেখছে বুঝে উঠছে না। স্বপ্ন নয়। বুকে কাঁধে ব্যান্ডেজ বাঁধা। আর ভয়ানক যন্ত্রণা। তবু প্রথম কথা জিজ্ঞাসা করেছিল, বাবু কোথায়?

মেসোমশায় গম্ভীর মুখে জবাব দিয়েছেন, সেও জায়গা-মতো আছে।...শিক্ষা হয়েছে? আর কখনো এমন করবি?

যন্ত্রণায় নয়, ওই কথা শুনেই চোখে জল এসেছিল সুধীরের। মাথা নেড়েছে, আর করবে না।

পরে শুনেছে, জাপটা-জাপটির সময় ওর চিৎকার শুনে কয়েকজন লোক ছুটে এসে ওদের দুজনকেই ধরেছে। একটা গাড়ি যোগাড় করে সুধীরকে হাসপাতালে আর বাবুকে থানায় দিয়েছে। থানার লোকও তখন চারদিকে বেরিয়েছিল ওদের খুঁজতে।

ও একটু ভালো হয়ে উঠতে মেসোমশায় অ্যাডভেঞ্চারের ব্যাপারটা আগাগোড়া শুনেছেন। শোনার পর যা বলেছিলেন, লজ্জায় সুধীর কুঁকড়ে গেছল। কিন্তু বিস্ময়েরও সীমা পরিসীমা ছিল না তার। তিনি বলেছিলেন, তুই একটা ছেলের মতো ছেলে হবি আমি বলে দিলাম।

সুধীর তুমি যে কি, তুমি যে কি হয়েছ সে আর তিনি কতটুকু দেখেছেন, কতটুকু জেনেছেন?

প্রশান্ত আর সুধীর ছায়া আর কায়া। একসঙ্গে খায় একসঙ্গে শোয় একসঙ্গে খেলে একসঙ্গে পড়ে। স্কুলের পরীক্ষার ফল প্রশান্তর বরাবরই সুধীরের থেকে ভালো হয়। তুলনামূলকভাবে সুধীরের ফলও চমকপ্রদই বটে। কিন্তু বরাবর প্রশান্তর কিছু নীচে থাকত সে। প্রশান্তর বাবা বলতেন, তোর এখনো বাঁদরামী যায়নি, একটু চেষ্টা করলেই তুই ওর থেকে ঢের ভালো রেজাল্ট করতে পারিস।

এ-কথা বলার কারণ আছে। ওই রকম একটা দুরন্ত ছেলে যে প্রশান্তর নীচে পড়বে না বলে গোঁ ধরে একটা বছর বাড়িতে মাস্টারের কাছে পড়ে পরের বছর ঠিক প্রশান্তর একই ক্লাসে গিয়ে ভর্তি হতে পেরেছিল, ভদ্রলোকের কাছে সেটাই প্রচণ্ড বিস্ময় আর আশার ব্যাপার। কিন্তু তারপর দৈবাৎ যদি কোনো পরীক্ষায় সুধীর বন্ধুর থেকে ভালো রেজাল্ট করে বসল তো নিজেই অপ্রস্তুত যেন। বলত, তুই ভালো করে পড়িসনি, এবারে ভালো করে পড়।

তিন বছর বাদে সুধীরকে এক ছুটিতে প্রথম দাদার কাছে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন প্রশান্তর বাবা। দিন কুড়ি ছিল দাদার কাছে। দাদা তখন একটুও শাসন করত না, বরং সাধ্যমত যত্ন করত। কিন্তু সেই পুরনো পরিবেশে সুধীরের যেন হাঁপ ধরত, দম বন্ধ হয়ে আসত। মনে মনে দিন গুনত কবে ছুটি ফুরোবে, কবে যাবে এখান থেকে।

এরপর একটা ব্যাপার সুধীর লক্ষ্য করত। কোনো বড় ছুটি এলেই প্রশান্তর বাবা ওকে এক-রকম জোর করেই কলকাতায় দাদার অভাবের সংসারে দিনকতক থেকে আসার জন্য পাঠিয়ে দিতেন। প্রশান্ত বা তার মা আপত্তি করলেও সেটা টিকত না।

বেশ ভালোভাবেই হায়ার সেকেন্ডারি পাস করল দুজনে। প্রশান্তর ফল অবশ্য ওর থেকে অনেক ওপরের দিকে। নিজের জন্য আফসোস নেই সুধীরের, বন্ধুর ফল আরো ভালো হল না কেন সেই খেদ।

প্রশান্তর বাবা ওকে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রশান্ত তো ডাক্তারি পড়বে বলছে, তুই কি পড়বি?

সুধীর নিরুত্তর। ওর হয়ে প্রশান্তই জবাব দিল, দুজনেই ডাক্তারি পড়বে, অনেক আগেই দুজনার দরখাস্ত করা সারা।

প্রশান্তর বাবার খরচা চালাতে একটুও আপত্তি নেই। এই ছেলেটা তখন নিজের ছেলের থেকে কম নয় তাঁর কাছে। কেবল ওই ছেলে ডাক্তারিতে সীট পাবে কিনা সেই সংশয়। নিজের যেটুকু প্রতিপত্তি ছিল এই ছেলের জন্যে খাটালেন। নিজের ছেলের রেজাল্টের জোরেই সীট পাবে। বন্ধুর সঙ্গে কলকাতায় এসে প্রশান্তও তার জন্য বাপের নির্দেশ-মতো আদাজল খেয়ে চেষ্টায় লেগে গেল। সে-ক'দিন সুধীরের দাদার কাছেই ছিল। দাদা তখন মার্চেন্ট অফিসের কেরানী। ভগ্ন স্বাস্থ্য। ওদের সেই দারিদ্র্য দেখে প্রশান্ত মনে মনে স্তব্ধ। তবু তো ওদের সংসার তখন আগের থেকে কিছুটা হাল্কা হয়েছে। সুধীরের ওপরের চার বোনের মধ্যে দুই বোন তখন নিখোঁজ। কোথায় আছে—আছে কি নেই কেউ জানে না। সেই সঙ্গে পিসীর এক মেয়েও নি-পাত্তা।

রাত্রিতে বন্ধুর কাছে সব বলে সুধীর হেসে হেসে বলেছিল, এর পরেও তুই আমাকে ডাক্তার বানাবি? তার ঢের আগে দাদাটা তো মরে ভূত হয়ে যাবে!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই ডাক্তারিতেই ভর্তি হতে হয়েছে। প্রশান্তর এক কথা, হয় দুজনে পড়বে নয়তো কেউ পড়বে না। বাবার কাছ থেকে টাকা এনে প্রশান্ত অনেক সময় গোপনে সুধীরের দাদার কাছে দিয়ে এসেছে। কিন্তু গোপন থাকেনি। সুধীর হেসে হেসেই বলেছে, দারিদ্র্যের দশ হাঁ।—তুই কোন হাঁয়ের খিদে মেটাবি রে?

এদের সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ আগ্রায়।

আমার মাঝে মাঝে ভাবতে অবাক লাগে একটা মেয়ের প্রতি একটা ছেলের অথবা ছেলের প্রতি একটা মেয়ের হঠাৎ আকর্ষণের জন্য কি বিশেষ কোনো যোগাযোগের দরকার হয়ই? আমার বিশ্বাস দরকার হয় না, যদি পরস্পরের মন জানাজানির অবকাশ থাকে। কিন্তু সে-রকম যোগাযোগ ঘটলে সেই বিলম্বিত অবকাশ অনেকটা সংক্ষেপ করে আনা যায় বোধহয়। পরস্পরের মন দেখা, মন বোঝাটাই আসল ব্যাপার। ঘটনার আয়নায় সেটাই অনেক সময় খুব সহজে দেখা যায়, বোঝা যায়।

এই কারণেই লেখক-লেখিকাদের কিছু একটা অনুকূল বা প্রতিকূল ঘটনা ঘটিয়ে ফেলার দিকে এত ঝোঁক। এরই মধ্যে মাসিক সাপ্তাহিকের কত গল্পে নায়ক নায়িকাকে কাছাকাছি আনার জন্য বা সাময়িকভাবে দূরে ঠেলে দেবার জন্যে নিজেই আমি কত রকমের ঘটনার আশ্রয় নিয়েছি ঠিক নেই। সেই নিজের জীবনেই এমন একটা ঘটনা ঘটল যা না ঘটলে কোনো লেখক বা লেখিকার সেটা কল্পনা করা সম্ভব নয়। বাস্তব অনেক সময় গল্পের থেকেও বিস্ময়কর বটে।

আর আমার বেলায় আরো বিচিত্র ব্যাপার এই যে সেই ঘটনার আয়নায় আমাকে মন দেখতে হল জানতে হল বুঝতে হল আর একজনের। ঘটনার যে প্রত্যক্ষ উপলক্ষ তার নয়।

তখন আমার বয়েস কুড়ি। সেবারে বাংলা অনার্স-এ বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছি। মেয়েরা আজকাল সাধারণত উনিশ বছরে বি. এ. পরীক্ষা দেয়। সেই জন্যে আমার মনে একটু খেদ ছিল। কিন্তু আমার দাদামশায় বলতেন, একটু পাকা বয়সে যে-রস টানবি সেটা জমজমাট হবে, বুঝলি রে কুড়ির বুড়ি!

তা সেই কুড়ি বছর বয়সেই নিজেকে আমি বেশ একজন নাম-করা মেয়ে ভাবতুম। শুধু আমি কেন, আমার বাড়ির মানুষেরা ভাবত, পাড়ার ছেলেমেয়েরা ভাবত, কলেজের মেয়েরা তো বটেই, অনেক টিচারও তাই ভাবত। আর মনে মনে জানি অনেক মুখ-চেনা ছেলেরও ঈর্ষা আর সম্ভ্রমের পাত্রী আমি।

আমার দাদামশাই ছিলেন নামকরা কবি। তিনি বড় চাকরি করতেন, কিন্তু চাকরির থেকে তাঁর কবিখ্যাতি ঢের বেশি ছিল। আমার বাবা তেমনি নামজাদা সাংবাদিক। এই দুজনের স্নেহ আর সহায়তায় আমি খানিকটা অকাল-পক্ক হবার সুযোগ পেয়েছিলাম। প্রথম হাতে-খড়ি দাদুর কাছে। দশ বছর বয়সে দিব্বি ছড়া-কবিতা লিখে ফেলতাম। দাদুর কল্যাণে বারো বছর বয়সেই সেই সব ছড়া-কবিতা ছোটদের কাগজে ছাপা হতে লাগল। চোদ্দ বছরের মধ্যে সেই সব কাগজে কবিতা ছেড়ে গল্পও ছাপা হয়েছে। সতের বছর বয়সে বড়দের মাসিক সাপ্তাহিকে আমার কবিতা ছাপা শুরু হয়েছে (এর পিছনে দাদু আর বাবার পরোক্ষ সুপারিশের জোর ছিল সেটা আমি স্বীকার করতে নারাজ)। কিন্তু কবিতার থেকে গল্প লেখার দিকে আমার ঝোঁক বেশি। দাদুর ইচ্ছে আমি কবিতাই লিখে যাই, কিন্তু আমি লিখতে চাই গল্প। দাদু বলেছিলেন, হায়ার সেকেন্ডারিতে ভালো রেজাল্ট করলে কবিতার বই ছাপিয়ে দেবেন। বাবার মতে না হোক, দাদুর বিবেচনায় ভালো রেজাল্টই করেছিলাম। দাদু কবিতার বই ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে আমার মন ওঠেনি। আঠার বছর বয়সে এক মস্ত সাপ্তাহিকে একটা বড় গল্প ছাপা হতে আমার সে-উল্লাস দেখে কে! তার ফলে অপেক্ষাকৃত ছোট কাগজগুলিতে মাথা গলানো অনেক সহজ হয়ে গেল। ওই একটা বছরের মধ্যে লেখাপড়া বিসর্জন দিয়ে কত গল্প যে লিখে ফেললাম ঠিক নেই।

এর এক বছর বাদে, অর্থাৎ বয়েস যখন উনিশ তখন তো আমি পাকা-পোক্ত লেখিকা। দাদুর টাকায় আমার প্রথম উপন্যাস প্রকাশের আলোয় এসে জ্বলজ্বল করছে তখন। নিজেদের টাকায় ছাপা হয়েছে সে অপ্রিয় সত্যটা বন্ধু-বান্ধবের কাছে গোপন। বই খুললেই মস্ত প্রকাশকের নাম—অতএব ওই সত্যটা কে আর জানছে! বাবা নামী সাংবাদিক, তাঁর অগোচরে নিজে একটু তদবির-তদারক করতে ছোট-বড় সমস্ত কাগজে আশাতিরিক্ত ভালো সমালোচনা বেরুলো বইয়ের। মাত্র উনিশ বছর বয়সে বাংলা দেশের কোন মেয়ের ভাগ্য এমন প্রসন্ন? ওই বই বেরুনোর পর রেডিওতে গল্প পড়ার সুযোগ পেয়েছি, আর বর্তমানে মাঝারি গোছের এক মাসিকপত্রে বেশ বড়সড় একটা ধারাবাহিক উপন্যাস লিখছি। পরীক্ষার জ্বালাতনের মধ্যে পড়ে যাব জানতুম বলেই আগে থেকে খেটেখুটে ওটা শেষ করে রেখেছিলাম। ধারাবাহিকের মেয়াদ ফুরোলেই ওটাও বই আকারে বার করার ব্যবস্থা হয়ে আছে। এবারে আর দাদুর পকেট থেকে গচ্চা যাবে না। প্রচারের জোরে আর কিছুটা ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি খাটানোর ফলে প্রথম বইটা মন্দ কাটল না দেখে ওই নামী প্রকাশকই এটা এবারে নিজেরা ছাপতে রাজী হয়েছেন। তাছাড়া, ধারাবাহিক ছাপা হচ্ছে সেটাও তাঁদের কাছে একটা বাড়তি আকর্ষণ।

বি. এ-তে ভালো অনার্স পেলেও এম. এ. পড়ব কি পড়ব না সে চিন্তা আমার মাথায় নেই তখন। আমি আঁতি-পাতি করে তখন আর একটা জমজমাট উপন্যাসের

প্লট হাতড়ে বেড়াচ্ছি। আর ওই বয়সে তরুণ-তরুণী মহলে মাথা এতটা উঁচু হয়ে ওঠার সৌভাগ্যে নিজেই নিজেকে একখানা জিনিয়াস ভাবছি।

আমার ভাবনার সঙ্গে দাদুর ভাবনা অনেকখানি মিলত। দাদুর তুলনায় বাবা বরং একেবারে কাঠখোট্টা গোছের লোক। দাদু বলতেন, এই তো সবে শুরু রে, এরই মধ্যে যেমন তেড়ে-ফুঁড়ে এগিয়ে চলেছিস তোকে রোখেই বা কে, সামলায়ই বা কে!

সামলাবার কথা ভাবি না, দাদু যদি আর ক'টা বছর বেঁচে থাকে তো রুখবার কেউ নেই তাতে আমি নিঃসংশয় প্রায়।

দাদু আরো বলতেন, এমন রত্ন যে শেষ-পর্যন্ত কোন বাঁদরের গলায় ঝুলবে ভেবে তো চোখে এখন থেকে ঘুম নেই আমার।

আমিও তেমনি জবাব দিতাম, আপাতত তোমার গলাতেই ঝুলি না—বুড়ির বুড়োর গলায় দুলতে কত লোভ তুমি জানো না।

দাদু আমাকে ছোট থেকেই বুড়ি বলে ডাকতেন। এ-সব রসের কথায় দাদু আনন্দও পেতেন খুব। চোখ পাকিয়ে বলতেন, হ্যাঁ রে ছুঁড়ি—কচিকাঁচা ছেলেগুলো এসে যখন ঘুরঘুর করে বুড়ি তখন খুকী হয়ে ঢল ঢল করে, আমি দেখি না ভাবিস?

মিথ্যে নয়। সবে বি.এ. পরীক্ষা দিয়েছি। এর মধ্যে লেখিকা হয়ে বসার ফলে আমার বেশ কিছু স্তাবকও জুটে গেছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমার মন্দ লাগে না। তার মধ্যে দুই একটা ছেলে আবার কি আশা নিয়ে ফাঁক পেলেই আনাগোনা করত, লেখিকার তাও বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়। দাদু না থাকলে মায়ের গম্ভীর মুখ আর গোল চোখ দেখেই বাড়ি ছেড়ে পালাত তারা। মায়ের ধারণা দাদু আমাকে একটু বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছে। আর এই বয়সে অত যে ভালোবাসা-বাসির গল্প উপন্যাস লিখি মায়ের মতে সেটাও খুব ভালো কথা নয়।

ওই বয়সে আমার মনের তলায় কোনো পুরুষের মুখ উঁকিঝুঁকি দেয়নি এ-কথা বললে মিথ্যে বলা হবে। দিত। প্রায়ই দিত। কিন্তু সে পুরুষের মুখ আমি নিজেই তৈরি করতাম। ফলে সে-মুখের হামেশাই রকমফের হত। কারণ সেই মানুষকে আমি বাস্তবে কখনো দেখিনি। বাইরের নয়, পৌরুষেব রূপ দিয়ে নিজেই আমি সেই মুখ গড়তাম। আমার অনেক লেখার উপাদান থেকে পুরুষের গুণাবলী সংগ্রহ করা এক একটা মূর্তি। ...না, গড়তাম না, আপনা থেকেই এক একটা মূর্তি আকার নিত। বাস্তবে তার সাক্ষাৎ মিলবে কি করে। না মেলার জন্য বিন্দুমাত্র খেদও ছিল না। নিজেকে এক একটা কল্পনার সামনে দাঁড় করিয়ে ভাবতে ভালো লাগত। ভাবতাম। ভেবে খানিক কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতাম। তারপর নিজেই থামতাম। মনে মনে নিজের দিকে চেয়ে ভ্রূকুটি করতাম। ব্যস, ফুরিয়ে গেল।

তবু তেড়ে-ফুঁড়ে একজন অন্তত সামনে আসতে চেষ্টা করেছিল। কল্পনায় নয়, বাস্তবের একজন। নতুন বয়সকালের সেই ধাক্কায় আমি একটু বিভ্রান্তও হয়েছিলাম সত্যি কথা।...ছেলেটার নাম অনুপম। আমার তখন বি. এ. পরীক্ষার মাস ছয় মাত্র বাকী। অনুপম য়ুনিভার্সিটিতে সিক্সথ ইয়ারে পড়ে। বিষয় বাংলা। বি.এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। মাসিক সাপ্তাহিকে তার দুই একটা কবিতা আমার চোখে পড়েছিল।

বিকেলের দিকে একদিন দাদু বললেন, তোর কাছে আবার কে একজন এলো দ্যাখ,

নাম বলল অনুপম মজুমদার, তোর সঙ্গে দেখা করতে চায়, আমার তো ওই শুনলেই আবার বুক ধড়ফড় করে—

বলা বাহুল্য, অনুপম মজুমদার নামে কেউ তখন আমার মাথার মধ্যে নেই। নীচে এসে দেখি বাইরের ঘরে আমার থেকেও একহাত লম্বা (আমি বেশ লম্বাই) একটি ছেলে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগে দেয়ালের ছবি দেখছে।

ঘুরে দাঁড়াল। দুই এক পলক চুপচাপ দেখল আমাকে। এই স্মার্টনেসটুকুই বৈচিত্র্য বলতে হবে। কারণ যে ছেলেরা তখন পর্যন্ত ধারে কাছে ঘেঁষতে চায় তারা মুখের দিকে সোজাসুজি বড় একটা তাকাতে পারে না।

আপনি চন্দ্রাণী?

এই প্রশ্নও গতানুগতিকতার ব্যতিক্রম। সঙ্গে দেবী বা পদবী যুক্ত হলে কানে লাগত না। মাথা নাড়লাম।

বসুন। আপনার একটু সময় নষ্ট করতে এলাম, কিছু মনে করবেন না।

মুখোমুখি বসলাম দুজনে। অনুপম মজুমদার গড়গড় করে নিজের পরিচয় দিল। তার হাতে কাগজে মোড়া বই একখানা, সেটা টেবিলের ওপর রেখে বলল, আমি কবিতা লিখি কারণ অন্য রচনা কোনো মাসিক সাপ্তাহিক ছাপতে চায় না, দু'দশ লাইন কবিতার জায়গা দিয়ে দাক্ষিণ্য দেখানো সম্পাদকদের কাছে সহজ।...যাক, আমাদের ছেলেমহলে আপনার কথা খুব হয়, আগে আর আপনার কোনো লেখা পড়িনি—এই বইটাই প্রথম পড়লাম।

টেবিলের ওপর কাগজে মোড়া বইটা দেখিয়ে দিল সে। আমি সেটার দিকে তারপর তার মুখের দিকে তাকালাম।

অনুপম মজুমদার বলে গেল, বইটা যত্ন করেই পড়েছি...ভাব প্রকাশে বা কনস্ট্রাকশনে যে-সব জায়গায় ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে মনে হয়েছে দাগ দিয়েছি। আপনার বক্তব্য আমার ভালো লেগেছে—কিন্তু ছাপার অক্ষরে ওই ত্রুটিও থাকা উচিত নয়। আমরা চান্স পাই না, আপনি পাচ্ছেন, আপনার ভাগ্য, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেন তার জন্যে ঈর্ষা নেই—বরং খুশি মনেই আলাপ করতে এলাম—

বলার ধরনে বাঁকাচোরা কিছু নেই। আমি অবাক হচ্ছিলাম আবার অস্বস্তিও বোধ করছিলাম। সাহিত্য প্রসঙ্গে এক তরফা আরো কিছু কথা বিস্তার করার পর বইটা আবার ফেরত নিতে আসবে জানিয়ে চলে গেল।

বইটা টেনে নিয়ে দু'চারটে পাতা ওলটাতেই আমার চক্ষু স্থির। পেন্সিলের গোল গোল দাগে ছাপার অক্ষরগুলো কণ্টকিত। পাশে ক্ষুদে অক্ষরে মন্তব্য। ছাপার ভুল, বানান ভুল, উপমার অসামঞ্জস্য, বাণী-বন্ধের অসংগতি ইত্যাদি যে কত তার চোখে ধরা পড়েছে, গুণে শেষ করা যাবে না।

প্রথম অনুভূতিতে রাগই হয়ে গেল। বইটা টেবিলের ওপরেই ছুঁড়ে ফেললাম। কিন্তু যাবার সময় হাতে করে আবার সেটা নিয়ে যেতেও হল। দু'দিন ধরে তারপর পাল্টা জবাব দেবার জন্যেই সেই ত্রুটি-বিচ্যুতি-ধরা দাগ আর মন্তব্যগুলো বিচার বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করলাম। এই করতে গিয়েই যেন নিজের জোরের দিকটা কমে আসতে লাগল। সত্য অস্বীকার করব কি করে, ত্রুটিগুলো যে ত্রুটিই নিজের কাছেই সেটা স্পষ্ট হয়ে

উঠতে লাগল। আগাগোড়া বইটা খুঁটিয়ে পড়েই যে ত্রুটিগুলো বার করা হয়েছে তাতে কোনো ভুল নেই। আর, আরো দু'তিন দিন যেতে নিজেরই মনে হতে লাগল, পরের সংস্করণে (সংস্করণ যদি হয়) এই দাগগুলোর দিকে লক্ষ্য করে যদি বইটা ঝাড়ামোছা করা যায় তাহলে সত্যিই অনেক ঝকঝকে হবে।

অনুপম মজুমদারের পরের আবির্ভাব এক ছুটির দিনে। মুখখানা কমনীয়, কিন্তু হাসিটা ঠোঁটের বাইরে খুব বেশি ছড়ায় না। জিজ্ঞাসা করল, আমার ওপর নিশ্চয় খুব রেগে আছেন?

আমি সহজভাবেই সত্যি কথা বললাম, প্রথমে রেগে গেছলাম, পরে দেখলাম আপনি উপকারই করেছেন, আর তার জন্যে আপনার পরিশ্রমও কম করতে হয়নি।

—তা ঠিক। অম্লান বদনে স্বীকার করল।—প্রথমে আমারও হিংসেই হয়েছিল, বুঝলেন, আমরা সুযোগই পাব না, আর দাদুর জোরে বাবার জোরে আর পয়সার জোরে কেউ সস্তায় নাম কিনে বেরিয়ে যাবে, তার ওপর কাগজের ওই চোখ-কান-কাটা প্রশংসা—তাই বই নিয়ে লেগে গেলাম। কিন্তু শেষ করে মনে হল যত ত্রুটিই থাক, আপনি সুন্দরই তো কিছু করতে চেয়েছেন, তাকে ছোট করে নিজে ছোট হই কেন। ব্যস, কাগজে না লিখে সোজা আপনার কাছে চলে এলাম মাস্টারি করতে।

আমি হাসিমুখে জবাব দিলাম, ভালোই করেছেন। ও বইটা আমার কাছে থাক, আমি আপনাকে আর একখানা বই দিচ্ছি—

জবাব দিল, কিছু দরকার নেই, ওই বইটা আমারই, আমিই কিনেছিলাম—

হ্যাঁ, বৈশিষ্ট্য যে কিছু আছে অস্বীকার করার উপায় নেই। নিজে বই দিতে চাইলাম. বললে লিখেও দিতাম নিশ্চয়, তার বদলে অনায়াসে নিজের কেনা বই ফেলে গেল।

সেই থেকে যোগাযোগ। অল্পদিনের মধ্যে সেই যোগাযোগ পুষ্টও হতে লাগল। পুরুষের গুণাবলীর কিছু কিছু আভাস আমি তার মধ্যে পেতে শুরু করলাম। বাড়ির লোকে তার আনাগোনা লক্ষ্য করতে লাগল। দাদু তো বিশেষ করেই করল। মাঝে মাঝে আমার কলেজে হাজিরা দিত, আমাকেও মাঝে মাঝে তার য়ুনিভার্সিটির রাস্তায় তলব করত। গোড়ায় গোড়ায় দুজনে কফি হাউসে যেতাম, শেষের দিকে কোনো নিরিবিলি দিকে।

অনুপম মজুমদারকে আমার ভালো লাগত অস্বীকার করব না। আমাদের সেই প্রীতির পরমায়ু তিন মাস। আমি কোনো অবধারিত পরিণামের দিকে এগোচ্ছি কিনা প্রায়ই ভাবতাম। মা বেশ স্পষ্ট ভাবেই আমাকে আগলে রাখতে চেষ্টা করতেন, বাড়িতে ফিরতে দেরি হলে জেরা করতেন, উপদেশ দিতেন। কিন্তু সে-সব আমি উপেক্ষা করতাম। কারণ নিজের বুদ্ধি আর বিবেচনা তখন কারো থেকে অপরিণত ভাবতে পারতাম না।

...মায়ের জেরা বা উপদেশের দরুন নয়, অনুপম মজুমদারের সম্পর্কে কি একটা অজ্ঞাত সংশয় আমার নিজের মনেই দানা বেঁধে উঠছিল। তার সঙ্গ আমার ভালো লাগত কারণ তার সঙ্গে দু'ঘণ্টা কাটালে লেখার অনেক রকম রসদ পেতাম। অবচেতন মনের অনেক রহস্য যেন সে গড়গড় করে বলে যেত, যা থেকে কিছু ছোট গল্প লেখার আইডিয়া আমার মাথায় এসেছিল। অথচ ছোলেটাকে প্রায়ই অস্থির মনে হত, মনের তলায় কিছু যেন একটা ক্ষোভ পুষছে। আর মাঝে মাঝে তার তাকানোটাও কি-রকম অস্বাভাবিক আর ধার ধার লাগত।

...মাঝে কয়েকমাস দেখা হল না। আমার বি. এ. পরীক্ষা তার এম. এ পরীক্ষা। আমি আশা করেছিলাম, পরীক্ষার ব্যাপারে তার কিছু সাহায্য পাব। বি.এ-তে ফার্স্ট ক্লাস, তার সাহায্যের মূল্য সকলেই স্বীকার করবে। তাছাড়া সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। কিন্তু একেবারে নিপাত্তা।

কলেজের পরীক্ষাটাকে আমি জীবনের কোনোদিন খুব একটা বড় জিনিস বলে ধরে নিইনি—চিঠি লিখেও যখন জবাব পেলাম না, গোঁ-ভরে আমি নিজেই প্রস্তুত হতে লাগলাম। তারপর হঠাৎ একদিন একটা চিঠি পেয়ে ভিতরটা দুমড়ে মুচড়ে গেল। আমার চিঠির উত্তরে চিঠি লিখেছে অনুপমের কাকা। বক্তব্য, অনুপম সম্প্রতি এক মানসিক চিকিৎসালয়ে আছে, অবস্থা রীতিমত খারাপের দিকে। সে আর তার একটি বোন তাদের মায়ের বংশগত রোগে ভুগছে।

...অনুপমের কাকা স্পষ্ট করে কেন আমাকে সেটা লিখেছিলেন অনুমান করতে পারি। সেই চিঠি পড়ে মনটা যে কত খারাপ হয়েছিল নিজেই শুধু জানি। চিঠিটা দাদুকে শুধু দেখিয়েছিলাম।

দুদিন বাদে দাদু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ছেলেটাকে তুই পছন্দ করেছিলি?

মাথা নেড়ে সায় দিয়েছি।

দাদু আবার জিজ্ঞাসা করলেন, পছন্দ মানে বিয়ে করবি ঠিক করেছিলি?

উল্টো মাথা নেড়েছি।—না, সেরকম কিছু ঠিক করিনি।

দাদু বলেছেন, আচ্ছা, ধরে নে তার কিছু হয়নি, সে যেমন ছিল তেমনি আছে —বি. এ. পাশের পর তাকে বিয়ে করতিস কিনা?

জবাব দিইনি। তবে ভাবতে চেষ্টা করেছি। এই চেষ্টা করতে গিয়েই ছেলেটার জন্য দুঃখ সত্ত্বেও নিজেকে আমি অনেকখানি বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে পেরেছি। জীবনের পুরুষ হিসাবে এই মুখ আমার কাছে খুব একটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। উল্টে মনে হয়েছে, অসুখ-বিসুখ না হলেও হৃদ্যতার পরিণাম বিয়ে পর্যন্ত গড়াত না।

অথচ, অনুপম মজুমদারের জন্য অনেকদিন আমার ভিতরটা বিষণ্ন হয়েছিল এও সত্যি কথা।

বি. এ. পরীক্ষার পর আমাদের কলেজের টিচার সুধাদির সঙ্গে আমরা তিন বন্ধু বেড়াতে বেরিয়ে পড়েছিলাম। সুধাদি বয়সে কম করে বরো বছরের বড় আমাদের থেকে। কিন্তু সব মেয়ের সঙ্গেই সম-বয়সীর মতো ব্যবহার তার। আমি সাহিত্যিক হয়ে বসেছি বলে আমার সঙ্গে আবার সব থেকে বেশি খাতির। চারজন মেয়েছেলের এ-ভাবে বেড়াতে বেরিয়ে পড়ার ব্যাপারে এক মা ছাড়া আর কারো আপত্তি হয়নি। এ পর্যন্ত দাদুর সঙ্গে আর বাবা-মায়ের সঙ্গে বহু জায়গায় আমি ঘুরেছি, কিন্তু স্বাধীন ভাবে বেরুনো সেই প্রথম।

বেরুবার আগেও দাদু ঠাট্টা করেছিলেন, দেখিস রে বুড়ি, এ-বয়সে বুড়োকে পথে বসাস না।

আমিও ফিরে ঠাট্টা করেছিলাম, তোমার ভয়টা কিসের, বাঁদরের?

আশ্চর্য কাণ্ড। এ-রকম কৌতুককর যোগাযোগও জীবনে ঘটে? বাঁদরের খপ্পরেই পড়েছিলাম আমি—বাঁদর বলতে সত্যি-সত্যিই গদ্যাকারের বাঁদরের দঙ্গল।

সুধাদি আর আমরা তিন বন্ধু—আমি, রমা আর বীণা বিকেলের আগেই ইতমৎউদল্লায় ঢুকেছিলাম। বিশাল চত্বরের মধ্যে ইতিহাসের স্মৃতিসৌধ। চেয়ে চেয়ে দেখার মতই পাথরের জালির কাজ। সে সব দেখার পর বেড়াতে বেড়াতে আমরা বাগানের রাস্তা ধরে চলে এসেছিলাম যমুনার দিকে। লোকজন নেই বললেই চলে। কিছু দূরে দুটি ছেলে শুধু বেড়াচ্ছে দেখেছি। না দেখি না দেখি করে মাঝে-মাঝে তারা সব কিছুর সঙ্গে আমাদেরও দেখে নিচ্ছে। ছেলে দুটোর একজন যে বেশ হাসি-খুশি ফুর্তিবাজ চাউনি দেখলেই বোঝা যায়।

আমাদের মধ্যে রমাই ফাজিল সব থেকে বেশি। সুধাদির কান বাঁচিয়ে ও বলল, এখানে তাজমহল, এখানে ইতমৎউদল্লা, এখানে আরো কত কি, সত্যি ভাই আগ্রায় এসেও প্রেমে না পড়ার কোনো মানে হয় না।

ছেলে দুটোকে একবার ইশারায় দেখিয়ে তেমনি ফিসফিস করে আমি জবাব দিলাম, পড় গে যা না, ওই তো যাচ্ছে—

রমা জবাব দিল, উঁহু, আমার মতো পেত্নীর দিকে কোনো ভূতেও ফিরে তাকাবে না—তোর পরিচয় পেলে বরং জিভের জল টসটসিয়ে উঠবে।

একটু বাদে ছদ্ম-গম্ভীর মুখে রমা আবার বলল, আমাদের তিনজনের কারো প্রেমে পড়াটা একেবারের গতানুগতিক ব্যাপার—সব থেকে ভালো হত সুধাদিকে প্রেমে পড়াতে পারলে। কিন্তু তার বয়সের তুলনায় ছোঁড়া দুটো যে আবার বেজায় পুঁচকে।

আমাদের হাসি সামলানো দায়। সুধাদি বার দুই এর মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের লক্ষ্য করেছে। এবারের হাসি সামলাবার চেষ্টা দেখে ভুরু কুঁচকে ফিরেই দাঁড়ালো।—আমাকে ফাঁকি দিয়ে কি রসিকতা হচ্ছে সেই থেকে? বল শিগগির, শুনব—

আমতা-আমতা করে রমা জবাব দিল, না সুধাদি, চন্দ্রাণী সাহিত্যিক তো, তাই এখানে এসে ওর অনেক কথা মনে হচ্ছিল—

কি মনে হচ্ছিল?

আমার সশংক ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে ও জবাব দিল, এই, ইয়ে—বলছিল, আগ্রার বাতাসে প্রেম-টেম ছড়ানো--

অপ্রস্তুত হয়ে সুধাদিও হেসেই ফেলল।—দেব ধরে এক-একটা থাপ্পড়!

হাসি সামলাবার চেষ্টায় আমার আর বীণার প্রাণান্তকর অবস্থা।

ঠিক সেই সময় ওই অকল্পিত ঘটনা।

আমাদের গজ তিরিশেক দূরে রাস্তা জুড়ে উল্টো দিক থেকে আসছে গোটা পাঁচেক বাঁদর। সেদিকে চোখ পড়তেই বীণা বলে উঠল, ও মা-গো, ওঁরা আবার রাস্তা ধরে আসছেন কেন—কিছু করবে না তো!

একটু খেয়াল করলে অনেক দূরের সেই গেটের দিক থেকে একটা চেঁচামেচির মতো শুনতে পেতাম। কিন্তু বাঁদরগুলোকে ভালো মুখ করে এগোতে দেখে সেদিকে চোখ কান গেল না। আমি বললাম, সোজা এগিয়ে চল, কাছাকাছি হলেই ওঁরা সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দেবেন—

দশ-পনের পা এগোতেই আচমকা দিশেহারা ত্রাস আমাদের। হঠাৎ বাঁদরগুলো আমাকে আর বীণাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে তেড়ে এলো। সুধাদি আর রমা খানিকটা

ছুটে রেহাই পেল, আর আর্তনাদ শুরু করে দিল। আমাকে ছেঁকে ধরেছে একসঙ্গে তিনটে বাঁদর। আঁচড়ে কামড়ে দিতে চেষ্টা করছে। আমি দিশেহারা ত্রাসে পালাতে চেষ্টা করছি। কামড়াতে না পারলেও নখের আঁচড় লাগছে। আমার শাড়িটা এমন কি শায়াটাও ছিঁড়ে ফালা-ফালা। সে-কি রাগ আর খকখক শব্দ ওগুলোর—মূর্তিমান যম যেন তিন-তিনটে —আতঙ্কে সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে—প্রাণ বাঁচানোর সে কি মর্মান্তিক চেষ্টা আমার।

চোখের সামনে রাজ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। হঠাৎ সব থেকে বড় বাঁদরটা কি একটা আঘাত খেয়ে ছিটকে সরে গেল, আর কে যেন হাত ধরে দু'হাত টেনে নিলো আমায়। আমি তাকে আঁকড়ে ধরতে গেলাম। সেই ছেলে দুটোর একজন। বীণার দিকের দ্বিতীয় ছেলেটার বাধা পেয়ে ক্ষিপ্ত আক্রোশে ওই দুটো বাঁদরও আমার দিকের তিনটের সঙ্গে যোগ দিল। ছেলেটার দিক থেকে আমাকে ছাড়িয়ে নেবার সে-কি বীভৎস দুর্জয় পণ ওদের। সেই সময় ওই দ্বিতীয় ছেলেটাও এদিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাঁদরগুলো একটু দূরে দাঁড়িয়ে গজরাতে লাগল। ততক্ষণে লাঠি-সোঁটা নিয়ে হৈ-হৈ করতে করতে লোক ছুটে আসছে।

বাঁদরগুলো পালালো।

আমার তখনো নাড়ি ছাড়ার অবস্থা। ভয়ে ত্রাসে ঠক-ঠক করে কাঁপছি। ছেলেটার বাহু আঁকড়ে ধরেছিলাম, এবারে বসে পড়লাম। চোখের সামনে রাজ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে সুধাদি বীণা আর রমা তিনজনে মিলে ধরাধরি করে আমাকে টেনে তুলল। মাথাটা তখনো ঝিম-ঝিম করছে। পরনের শাড়িটার যে-অবস্থা অন্য সময় হলে লজ্জায় মরে যাবার কথা। কিন্তু ও-সব লক্ষ্য করার মতও স্নায়ুর দখল হারিয়েছি।

ধরাধরি করে আমাকে টাঙ্গায় তোলা হল। সেখান থেকে হোটেলে। ছেলে দুটোর আমাকে সোজা হাসপাতালে নিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কোথায় লেগেছে না লেগেছে সুধাদি টাঙ্গাতে উঠে বসেই ভালো করে দেখে নিয়েছিল। শাড়ি শায়ার ভিতর দিয়ে তেমন কিছু লাগেনি। পায়ের দুই এক জায়গায় ছড়ে গেছে। আসলে সেই বীভৎস টানাটানির ফলে আমার প্রাণান্ত দশা। শাড়িটার যা অবস্থা হাসপাতালে যাই কি করে! হোটেলেই একজন ডাক্তার ‑‑নার অনুরোধ জানিয়ে সুধাদি আমাদের নিয়ে হোটেলে ফিরল।

নিজেদের ঘরে শয্যা নিয়ে ততক্ষণে খানিকটা সুস্থ হয়েছি। তবু যতবার মনে পড়ছে ব্যাপারটা ততবার শিউরে উঠছি। কিছুই প্রায় হয়নি বটে, কিন্তু কি যে হতে পারত ওই ছেলে দুটো না থাকলে ভাবা যায় না। সুধাদিও বারবার সেই কথাই বলছিল। পরে হাসি চেপে মন্তব্যও করেছে, তোকে যে ছেলেটা বাঁচালো সেও ওই বাঁদরগুলোর থেকে কম যায় না, বড় বাঁদরটাকে তো ফুটবলের মতো লাথি মেরে সরাচ্ছিল।

রমা ততক্ষণে মুখ টিপে হাসার অবস্থায় এসেছে। আর আমারও স্বাভাবিক লজ্জা সঙ্কোচ ফিরে এসেছে। সুধাদি সর‍‍েই রমার মুখ খুলবে বুঝতে পারছি।

ডাক্তার সঙ্গে করে ছেলে দুটি ঘরে ঢুকতে সুধাদি বলল, পায়ের দু'চার জায়গায় ছড়ে গেছে, এ ছাড়া আর কিছু হয়নি—ডেটল ঘষে দিয়েছি।

যে ছেলেটা বীণার দিক থেকে পরে আমার সাহায্যে এসেছিল, সে বলল, বাঁদরের আঁচড় বিষিয়ে উঠতে পারে, ইনজেকশন দিতে হবে।

ডাক্তারও পরীক্ষা করে সেই মতই সমর্থন করল এবং বিতিকিচ্ছিরি ইনজেকশন দিয়ে ছাড়ল। সেই পেল্লায় ইনজেকশনের এত যন্ত্রণা যে এই ছেলে দুটোর মাতব্বরির জন্যেই উল্টে রাগ হল আমার। ডাক্তারের আর কি, তার তো ইনজেকশন দিতে পারলেই বাড়তি পয়সা।

ডাক্তার তার কাজ সেরে বিদায় হবার পর সুধাদি খুব স্বাভাবিক সৌজন্যেই ছেলে দুটোকে আপ্যায়ন জানালো, বসুন, চা খেয়ে যান—আপনারা না থাকলে আজ প্রাণ নিয়ে ফেরা দায় হত।

যে ছেলেটা আমার দিকের হিরো সে তৎক্ষণাৎ জাঁকিয়ে বসে সঙ্গীকে বলল, বোস প্রশান্ত, চায়ের তেষ্টা পেয়েছে বটে। তারপর সুধাদির দিকে চেয়ে হেসে বলল, ওই বাঁদরগুলো কি করে জানবে আমরা তাদের থেকে কম যাই না।

সকলেই হাসতে লাগল। সে আবার বলল, আমার নাম সুধীর—সুধীর দত্ত, আর ইনি প্রশান্ত রায়—আমার ফ্রেন্ড ফিলসফার অ্যান্ড গাইড। আমরা দুজনেই একেবারে হবু-হবু ডাক্তার—এবারে ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছি—দিয়ে বাঁদরের দেশে অর্থাৎ আমাদের জাতভাইয়ের দেশে বেড়াতে এসেছি।

সকলের আর একপ্রস্থ হাসির ফাঁকে আমার হঠাৎ দাদুর কথা মনে পড়ে গেল।

সুধাদি নিজের পরিচয় দিল, ওমুক কলেজের মাস্টার—এরা ছাত্রী, তিনজনেই বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছে। তার কথা একরকম কেড়ে নিয়ে রমা হড়বড় করে আমার বাড়তি পরিচয়টা বেশ সাড়ম্বরেই বিস্তার করে ফেলল। শেষ হতে সুধীর দত্ত সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে বার কয়েক নিরীক্ষণ করল আমাকে, তারপর সঙ্গীর দিকে ফিরে বলল, আর চা খেয়ে কাজ নেই, পালাই চল—

বলার ধরনে খারাপ লাগার বদলে উল্টে আরো হাসির উদ্রেক করল। সুধাদি মাস্টার মানুষ, এরই মধ্যে আপনি থেকে অনায়াসে 'তুমি'তে পাড়ি দিল। রমাকে চায়ের ব্যবস্থা করতে বলে তার দিকে ফিরল, তোমরা বয়সে অনেক ছোট, তুমি বলছি কিছু মনে করো না—পালাবে কেন?

বিড়ম্বিত মুখ করে সুধীর দত্ত জবাব দিল, আমি যে ওঁর লেখা কিছুই পড়িনি।

প্রশান্ত রায় বলল, আমি পড়েছি। আমার উপন্যাসখানার নামও করল। ভাবলাম এবারে একটু প্রশস্তিও করবে বোধহয়। তা অবশ্য করল না। সুধীর দত্ত নালিশের ভঙ্গিতে তাকালো আমার দিকে। দেখলেন, বিশ্বাসঘাতক আর কাকে বলে!

ইনজেকশনের দরুন আমাকে তখনো শুইয়ে রাখা হয়েছে। এই দুটো লোকের চোখের ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকতে অস্বস্তি লাগছিল।

সকলের চা জলখাবার উদরস্থ হবার ফাঁকে কথা-বার্তার ধারা আরো একটু অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। সুধাদি বলল, কিন্তু কি কাণ্ড, দেখার জায়গায় এমন বাঁদরের উৎপাত, কত সময় কত মেয়ে তো সাংঘাতিক বিপদে পড়তে পারে। এর কোনো ব্যবস্থা থাকা উচিত—

প্রশান্ত রায় বলল, এই উৎপাত হালে শুরু হয়েছে। এখানকার কোন এক রিসার্চ ইনসটিটিউটের জন্য হালে ওদিক থেকে একটা বাঁদর ধরা হয়েছিল শুনলাম—তারপর থেকে এইরকম হচ্ছে—ঢ্যারা পিটিয়ে ক'দিন নাকি লোককে সাবধানও করা হয়েছে।

পলকা গাম্ভীর্যে সুধীর দত্ত আমার দিকে তাকালো।—সোজা ব্যাপারটা বুঝলেন না? যে বাঁদরটিকে ধরা হয়েছে তিনি ওই জাঁদরেল বাঁদরটিরই মহিলা হবেন, মানুষ তাঁকে ধরে নিয়ে গেছেন বলে প্রতিহিংসায় মানুষ মহিলাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁর শূন্যস্থান পূরণের সঙ্কল্প—নইলে বেছে বেছে শুধু মহিলাদেরই আক্রমণ করবে কেন!

সেই দিনই বুঝেছিলাম লোকটা যেমন বাচাল তেমনি দুর্মুখ।

পরদিনও তারা আমার খবর নিতে এলো, আর সানন্দে চা-জলখাবার খেয়ে গেল। তারা চলে যেতে রমা ঘোষণা করল, আমাদের চা-জলখাবারের খরচা বেশ বেড়ে গেল মনে হচ্ছে, যে-কদিন আছি এখানে রোজ একবার করে অন্তত ওঁরা আসবেনই।

সুধাদি বলেছে, তুই তো কম অকৃতজ্ঞ নোস, চা-জলখাবারের বাড়তি খরচা না হয় আমিই দেব—সেদিন ওরা না থাকলে কি হত!

সে সরে যেতে রমা আমার দিকে চোখ পাকালো, শুধু চা-জলখাবারে কৃতজ্ঞতার শেষ! তারপর হেসে সারা, সত্যি বলছি আমার এখন মনে হচ্ছে আগ্রার বাতাসে প্রেম ছড়ানো। সেদিন তুই যেভাবে জাপটে-মাপটে ধরেছিলি লোকটাকে, তার তো বারোটা বেজেই গেছে, তোরও না জানি ভিতরে ভিতরে কি কাণ্ড হয়ে গেছে। ওই হতভাগা বাঁদরটা যদি আমাকে ধরত তাহলে সত্যি বলছি এই রূপ নিয়েই উৎরে যেতে চেষ্টা করতাম—বলতাম, হে নাথ, ওইভাবে জাপটে ধরার ফলে হৃদয় মন প্রাণ সব সমর্পণ করে বসেছি, এখন তুমি রাখো তো রাখো, নইলে যমুনার জলে এ প্রাণ বিসর্জন দেওয়া ছাড়া গতি নেই—তা না, ওই বাঁদর পামরও বেছে বেছে ধরে বসল তোকেই। ও ব্যাটারও চোখ আছে—

রমা কলেজের থিয়েটারের নামকরা শিল্পী। আমি আর বীণা হেসে সারা।

রমা যা-ই বলুক, রূপসী আমাকে কেউ বলবে না। আমার গায়ের রং খুব ফর্সা নয়। তাছাড়া নাক মুখ চোখও গল্প-উপন্যাসের নায়িকাদের ধারে-কাছে নয়। তবে সুশ্রীও বলে থাকে সকলে। ভালো স্বাস্থ্য, পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি মাথায়, আর দাদুর মতে আমার নাক ঠোঁট সঙ্কল্পব্যঞ্জক, চোখে গভীর বুদ্ধির ছাপ আছে—আর সব মিলিয়ে তাঁর চোখে আমি রসোগোল্লার মতো মিষ্টি। তাছাড়া আমি এটুকু অনুভব করতে পারি মেয়েদের রূপের সঙ্গে কতগুলো আনুষঙ্গিক ব্যাপারের যোগ আছে। সে-দিক থেকে শুধু রমা কেন, অনেক মেয়ের চোখেই আমার ভাগ্যটা অনুকূল। ভালো স্বাস্থ্য কোনো শিক্ষিতা সুশ্রী সপ্রতিভ মেয়ে যদি এই বয়সে এমন তেড়েফুঁড়ে সাহিত্যিক হয়ে বসে, তাহলে রূপের বাজারে সে প্রায় রূপসী বলেই চলে যেতে পারে। তার আকর্ষণটা যে অন্তত সেই গোছের হয়ে দাঁড়ায় মুখে কখনো প্রকাশ না করলেও মন দিয়ে সেটুকু অন্তত বুঝতে পারি।

সেদিন অনেক বার করে দেখা তাজমহলে বেড়াচ্ছিলাম আমরা। সন্ধ্যা সবে পার হয়েছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত। পিছনের দিকের বিশাল চত্বরে অন্ধকার জমাট বাঁধছে। চত্বরের শেষ মাথায় ও-ধারের কার্নিশে ঝুঁকে নীচের শুকনো যমুনা দেখছিলাম। জায়গাটা নির্জন হয়ে গেছে দেখে সুধাদি যাবার তাড়া দিচ্ছিল। আমরা শুনেও শুনছি না।

পাঁজরে একটা বড়রকমের খোঁচা খেয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। খোঁচাটা মেরেছে রমা। দেখি আবছা অন্ধকারে হাসিমুখে দুই মূর্তি এগিয়ে আসছে।

কাছে এসে সুধীর দত্ত বলে উঠল, কি কাণ্ড, আপনারা এ-সময়ে এখানে!

সুধাদি হাত পনের দূরে ছিল, সেই সুযোগে রমা ফস করে বলে বসল, কেন, বড্ড বেশি খুঁজতে হয়েছে আপনাদের?

তা না, তবে আর হাওয়া না খেয়ে অনুগ্রহ করে ফেরার রাস্তা দেখুন।

এই কথা আর এই মাতব্বরি আমার একটুও ভালো লাগল না। সুধাদিকে কাছে এগিয়ে আসতে দেখেও বললাম, আপনাদের তাড়া থাকে তো যান না, আমাদের কোনো তাড়া নেই।

প্রশান্ত রায় হেসে সঙ্গীর উক্তি নরম করতে চাইল। বলল, ওর কথা হল এই নির্জনে মেয়েদের এখানে একলা-একলা ঘোরা-ফেরা করাটা ঠিক নয়—শুনেছি বহুকাল আগে একদল ডাকাত নাকি এ-রকম সুযোগের ফিকিরেই থাকত। গয়না-পত্র কেড়ে নিয়ে ওই নীচের যমুনায় ফেলে দিলেই তো হল, জোয়ারে কোথায় ভেসে যাবে ঠিক নেই। আগে আগে এ-বকম নাকি অনেক হয়েছে—তার থেকে খারাপ ব্যাপারও ঘটেছে।

শোনা-মাত্র আমাদের গা ছমছম করে উঠল। অন্ধকারেই নীচের দিকে তাকালাম একবার।

সুধীর দত্ত বলল, আমরা যাই তাহলে, আপনারা হাওয়া খান!

সুধাদি বলে উঠলেন, দাড়াও বাপুরা, এতবড় চত্বর একলা পেরুতেও ভয় করছে এখন—সেই কখন থেকে মেয়েগুলোকে বলছি চল চল, আমার কথা কানে তোলে ওরা!

অতএব মুখ বুজেই চত্বর পেরিয়ে নেমে এলাম। মনে মনে রাগও হচ্ছিল। তাজমহলের আঙিনা পার হয়েই ওদের জব্দ করাব জন্য বললাম, একটা টাঙ্গা ধরো, আর হাঁটতে ভালো লাগছে না।

এত কাছে হোটেল, তবু টাঙ্গা ডাকতে বলছি শুনে সুধাদি অবাক একটু। কিন্তু এত সাহস ওই সুধীর দত্তর যে হাসি-হাসি মুখ করে ফস করে বলে বসল, হাঁটলে কিন্তু মাথা বেশ ঠাণ্ডা থাকে।

হোটেলের ঘরে ঢুকতে না ঢুকতে সুধীর দত্ত সহজ দাবীর সুরে সুধাদিকে বলল, বেশ ভালো করে চা বানাবার অর্ডার দিন দিদি, আর সঙ্গে কিছু খাবার-টাবার হলে ভালো হয়। অনেক হেঁটে আজ বেজায় পরিশ্রম হয়ে গেছে—

যেন পরিশ্রম বেশি হলে ওদের তাজা করে তোলার দায় আমাদেরই। সুধাদি হাসি মুখে হুকুম তামিল করতে গেলেন। যত সাহসী মাস্টারই হোন সুধাদি, সঙ্গী হিসেবে এই ছেলে দুটোকে সহায় ভাবতে শুরু করেছেন। বীণা আর রমাও যে ওদের বেশ পছন্দ করছে বোঝা যায়। কলকাতায় বাঁধা-ধরা দিন-যাপনের মধ্যে বাইরের এই মেলামেশায় একটু বৈচিত্র্যের স্বাদ আছেই। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমিও যে ওদের অপছন্দ করছি এমন কথা বলতে পারব না · কিন্তু ইতমৎউদল্লার ওই বাঁদরগুলোর শিকার হবার ফলে অর্থাৎ আমার সেই বিতিকিচ্ছিরি হেনস্থার সুযোগেই যে ওরা এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছে, তাতেই আমার আপত্তি। আমার সেই অসহায় অবস্থাটা ওরা না দেখলে হয়ত এমনটা হত না। বাঁদরের শিকার বীণাও হয়েছিল কিন্তু বরাতজোরে ও যেন টুপ করে সেই প্রহসনের বাইরে দাঁড়িয়ে গেল। আমার চাপা অসহিষ্ণুতার আড়ালে মনস্তত্ত্বগত কারণও ছিল কিছু। ওই বয়সেই গল্প লিখিয়ে মেয়ে আমি, বুঝব না কেন? ছেলে দুটোর চোখ যে সকলকে ছেড়ে আমার দিকে সেটা আমি অনায়াসে অনুভব

করতাম। রমা তো ফাঁক পেলেই ঠাট্টা করে, হিংসা হিংসা—হিংসেয় আমি আর বীণা একেবারে জ্বলে পুড়ে গেলাম—কিন্তু ওই দু'দুটো ছোঁড়া তোকে নিয়ে করবে কি, দ্রৌপদীর দিন কি আর আছে যে পাঁচজনকে পাবে, একটা তো আমাদের দিকে ফিরলেও পারে। আমার আর সুধাদির দিকে না-হয় বাঁদরগুলোও ফিরে তাকায়নি, কিন্তু বীণার তো একটু ভাগ পাবার অধিকার আছে।

এই ঠাট্টার ছাপ তখন পর্যন্ত আমার মনের ওপর পড়েনি সেটা ঠিক। উল্টে মনে হয়েছে, ইতমৎউদল্লার ওই হতভাগা বাঁদরগুলো অমন প্রাণান্তকর সংকটে ফেলেছিল বলে পরে অন্তত কেউ যদি ভিতরে ভিতরে প্রচুর খুশি হয়ে থাকে তো ওই ছেলে দুটো হয়েছে। সেই বয়সের ওই দুর্বল চিন্তাটাই এক এক সময় ওদের সামনে ক্ষোভের আকার নিত। মনে হত, দুজনের মধ্যে সুধীর দত্ত অন্তত যে মুখের ওপর ফটফট কথা বলে, সুযোগ পেলে একটু যে ঠাট্টাটাট্টাও করে—সেটা ওই কারণে। আমাকে সংকট থেকে উদ্ধার করতে পেরেছে বলে।

সুধাদি ঘর থেকে বেরুতেই সুধীর দত্ত আমার দিকে ঘুরে বসল। আমাদের ওপর আপনার হঠাৎ অমন...কি বলে, রাগ-ভাব কেন?

শোনামাত্র আমার রাগই হয়ে গেল। কিন্তু কিছু বলার আগেই রমাটা তড়বড় করে ইন্ধন যোগালো, রাগ-ভাব যে কি করে বুঝলেন?

সুধীর দত্ত জবাব দিল, বারে বা, সেটুকু বুঝতে আবার কোনো ছেলের অসুবিধে হয় নাকি! প্রথম কথা, উনি ধরে নিয়েছেন আমরা ভয় দেখিয়ে আপনাদের তাজমহল থেকে বার করে আনলাম, দ্বিতীয়, আমাদের কাটান দেবার জন্য উনি এই পাঁচ মিনিটের পথ টাঙ্গায় আসতে চাইলেন. এর পরেও বুঝব না আমরা কি এত মুখখু!

ভিতরে তেতে উঠলেও বোকার মতো সেটা প্রকাশ করার পাত্রী নই আমি। হেসেই ঠেস দিলাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনাদের কাটান দেওয়া গেলই না—

এক গাল হেসে সুধীর দত্ত জবাব দিল, সেটাই বাঁদরের দাদা এই হনুমানের এইটা মস্ত গুণ, জ্ঞান-বয়স থেকে চোখ-কান কেটে বসে আছি—আমার এই বন্ধুর বরং ভদ্রলোকের মতো একটু-আধটু চক্ষুলজ্জা আছে, আপনাদের এখানে আসার কথা বললেই বলে, কি ভাববে, থাক্—

বীণা আর রমা হেসে উঠেছে। আর ভিতরে ভিতরে আমার আরো বেশি রাগ হয়েছে। তখন কি লোকটার চরিত্র জানি!

সুধাদি ঘরে ঢুকতে সুধীর দত্ত একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল তাকে। বলল, বসুন দিদি—। তারপর তেমনি হাসিখুশি মুখে আবার আমার দিকে ফিরল।—আপনি সত্যিই ভেবেছেন আমরা মিছিমিছি ভয় দেখিয়ে আপনাদের তাজমহল থেকে বার করে আনলাম, ঠিক কি না?

আমি তেমনি হাসতে চেষ্টা করেই জবাব দিলাম, ঠিক কিনা বেশ তো জানেন দেখছি।

গম্ভীর মুখে লোকটা তার বন্ধুর দিকে তাকালো, এই কাল রাতে যে গল্পটা বলেছিলি সেটা আর একবার শুনিয়ে দে তো—

প্রশান্ত রায় বলল, সেটা তো গল্প—

তা হোক, তুই বল্ না, গল্প কি একেবারে ভুঁইফোঁড় হয় নাকি, সত্যের মালমশলা তার মধ্যে থাকে না!

রমা আর বীণা আগ্রহ দেখালো, কি গল্প, শুনবো। সুধাদিরও শোনার কৌতূহল।

চা জলখাবার উদরস্থ করার ফাঁকে প্রশান্ত রায় গল্পটা বলল। সত্যি কথা বলতে কি কান পেতে শোনার মতই গল্প, আর গায়ে কাঁটা দেবার মতও। বহুযুগ আগের তাজমহলের এক গাইডের জীবনকল্পনার ওপর গল্প।...দুর্ধর্ষ মানুষ ছিল সেই লোকটা, মানুষ খুন করাটা জল-ভাত ব্যাপার ছিল তার কাছে। তার বউয়ের রূপ ছিল। সেই রূপসী বউকে লোকটা ভালোবাসত। কিন্তু বউ তাকে ঘৃণা করত। একদিন ফাঁক মতো একবছরের মেয়ে নিয়ে সে অন্য লোকের সঙ্গে পালিয়ে গেল। মেয়েটা ছিল সেই শয়তান লোকটার চোখের মণি। সেই থেকে অকারণে খুন করে চলল লোকটা। বিবাহিত কোনো রূপসী মেয়ে তাজমহলে এলে ছলে কৌশলে স্বামীসহ তাকে রাত পর্যন্ত আটকে রাখতে চেষ্টা করত। তারপর নির্জনে ওই পিছনের দিকটায় এনে মেরে ওপর থেকে যমুনায় ফেলে দিত। সকালের মধ্যে কচ্ছপ তাদের কোথায় টেনে নিয়ে যেত ঠিক নেই। বছর কয়েক ধরে এ-রকম যে কত জোড়া মেয়ে পুরুষ সে খুন করেছে হিসেব নেই। শেষে বয়স হতে ওই খুনের নেশা তার কেটে গেছল।

প্রায় বিশ বছর বাদে এক নববিবাহিত দম্পতীকে দেখে হঠাৎ আবার কেন যেন সেই খুনের আগুন মাথায় জ্বলে উঠল। বড় ঘরের সেই মেয়েটাকে দেখে বউয়ের তাজা মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল। ওই মুখ সে এ-যাবৎ ভোলেনি। অনেক রকমে ভুলিয়ে ওই দম্পতীকে রাত পর্যন্ত আটকে রাখল। তারপর ভয়াবহ ভাবে তাদের খুন করল—খুন করার আগে তার মনে হল নিজের সেই বউকেই খুন করছে—ত্রাসে বিস্ফারিত মেয়েটাকে তা বুঝিয়েও দিল।

এরপর কাগজে কাগজে নিখোঁজ দম্পতীর খোঁজ পড়ে গেল। আর তাই থেকেই প্রায় বৃদ্ধ ওই দুর্ধর্ষ লোকটা জানল সে তার নিজের মেয়ে-জামাইকেই হত্যা করেছে। গল্পের নাম তাজমহল।

গল্পের নিছক সার এইটুকু। কিন্তু প্রশান্ত রায় যে-ভাবে বলল, সকলেরই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল।

একটু বাদে সুধীর দত্ত গম্ভীর চালে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, এখন কি মনে হয়, তাজমহলের এই পিছনের চত্বরের অমন নিরিবিলিতে আপনাদের হাওয়া না খেতে দেওয়া অন্যায় হয়েছে?

আমার মাথায়ও তক্ষুনি একটু দুষ্টু বুদ্ধি চাপল। মানুষের দুর্বলতার শাশ্বত দিকটা ধরেই টান দেবার ইচ্ছে জাগল। তাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে এবং জবাব না দিয়ে প্রশান্ত রায়ের দিকে তাকিয়ে গলায় প্রশংসা ঢেলে বললাম, আপনি তো খুব পড়েন...আর বলেনও ভারী সুন্দর!

কিন্তু আমার উদ্দেশ্য অনেকটাই ব্যর্থ। কারণ শোনার সঙ্গে সঙ্গে ওই সুধীর দত্তই প্রাণখোলা উচ্ছ্বাসে বলে উঠল, ও একখানি আসল রত্ন বুঝলেন, আমার মতো হাঁক-ডাক সর্বস্ব মেকী নয়—সেই স্কুল থেকে এই ডাক্তার হওয়া পর্যন্ত আমরা কোনোদিন ওর নাগাল পেলাম না, আবার গল্প লেখা ধরলে আপনার মতো সাহিত্যিকরাও হয়তো

ওর শিষ্য হয়ে বসত। সস্নেহে বন্ধুর দিকে তাকালো সুধীর দত্ত, তুই-ই আমাকে পথে বসালি—

আমরা দিল্লী হয়ে কলকাতা ফিরলাম। ওরা দুই বন্ধুতেও তাই। আগ্রা থেকে দিল্লী কতটুকু আর পথ, তাই আগ্রায় যে বেড়াতে যায় তার দিল্লীর প্রোগ্রামও থাকেই। কিন্তু আমার কেবলই মনে হত ওরা যেন ইচ্ছে করেই আমাদের সঙ্গ নিয়েছে। দিল্লীতে বেড়াবার সময় আমরা চারজন ট্যাক্সি নিতাম, ওরা স্কুটার। দেখা হতই, কারণ কবে কোথায় কি বেড়ানোর প্রোগ্রাম আমাদের ওরা সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেই জেনে নিত। অন্য দর্শকরা ভাবত আমাদের ছ'জনেরই দল একটা। দুই একদিন হোটেলে এসেও আড্ডা জমিয়েছে। আমিও মিশেছি, কিন্তু সেই সঙ্গে লেখিকাসুলভ দূরত্ব বজায় রেখেও চলেছি।

একসঙ্গেই কলকাতায় ফেরার দিন ঠিক হয়েছে। ওরাই চেষ্টা-চরিত্র করে আমাদের রিজারভেশনের ব্যবস্থা করেছে। রমা চুপি চুপি ঠাট্টা করেছে, আমি যে ভেবেছিলাম আগ্রায় বাঁদর তাড়াতে গিয়ে যে যাকে ধরেছিল, শেষ পর্যন্ত সে-ই তাকে ধরবে—অর্থাৎ সুধীর দত্ত তোকে আর প্রশান্ত রায় বীণাকে, কিন্তু তা আর হলই না, দুজনারই তোর দিকে চোখ! একটা গল্প লিখে ফেল্ না—

নায়িকার নাম বদলে ওদের নিয়ে একটা গল্প লেখার বাসনা আমার মনেও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। একটা প্ল্যানও মাথায় এসেছে। আগ্রার কথা বা বাঁদরের কথা লেখা যাবে না, তাহলে পড়ামাত্র ধরে ফেলবে (আমার ধারণা আমার সব লেখাই এখন থেকে রেষারেষি করে পড়বে ওরা)। নায়িকাকে লেখিকা করলেও চলবে না। ডাক্তার বা স্কুলের বা কলেজের মাস্টার করা যেতে পারে। সেই নায়িকাকে বাইরের কোনো পরিবেশে জুতসই রকমের সংকটের মধ্যে ফেলতে হবে। সংকটত্রাণের ভূমিকা নেবে উপস্থিত দুই বন্ধুর মধ্যে একজন। তার পরের আলাপ পরিচয় মেলামেশার পর সকলে ধরেই নেবে ওই ত্রাতার ভূমিকা যার নায়িকার পুরুষ সে-ই হবে। এরপর কাহিনীতে একটা মোক্ষম কিছু মোচড় আনতে হবে। পরিণামে ত্রাতা নয়, নায়িকার জীবনবাস্তবে বা যৌবনবাস্তবে নায়িকার দোসর হয়ে বসবে দ্বিতীয় মানুষটি, অর্থাৎ বন্ধুটি।

তখন কি ছাই একবারও কল্পনা করতে পেরেছি নিজের ভবিতব্যের সাদাসাপটা ছকটাই দেখছি আমি! গল্পের থেকেও বাস্তব অভিনব, ও-বয়সে সে-জ্ঞান আমার ছিল না।

কলকাতায় ফিরেই দাদুকে সবিস্তারে বাঁদরের ঘটনাটা বলেছিলাম। ভূমিকায় রসিকতা করেছিলাম, আমাকে নিয়ে আগ্রায় বাঁদরের সঙ্গে হনুমানের খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেল—

সেই খণ্ডযুদ্ধের বিবরণ শুনে দাদুর দুই চক্ষু বিস্ফারিত প্রথম। পরে হেসে বাঁচে না। তারপর জিজ্ঞাসা করল, দুজনের মধ্যে তুই কাকে বরণ করলি? তাছাড়া তোকে নিয়ে ওদের মধ্যে আবার বালী-সুগ্রীবের ব্যাপার হয়ে যাবে না তো?

সে-রকম আশংকা আমার মনের তলায় যে ছিল না তা নয়। দাদুর ভাষায় বরণ না করলেও ওই সুধীর দত্তকে আমার মোটামুটি ভালোই লেগেছিল। লোকটা বাচাল বটে কিন্তু সেই বাচালতার মধ্যেও এক ধরনের পুরুষের ধার আছে। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেন এই ভালো লাগা মানে প্রেমে পড়া নয়। তখন পর্যন্ত আমার ভিতর থেকে অনুপম

মজুমদারের ছাপটা একেবারে মুছে যায়নি। পুরুষের এক ধরনের ধার আমি তার মধ্যেও দেখেছিলাম। প্রায়ই মনে হত সেটা ব্যর্থতার দরুণ। তাই তার ব্যর্থতার প্রতি আমার সহানুভূতি ছিল। য়ুনিভার্সিটিতে পড়তেই সেই ছেলে ভাবত, তার মধ্যে বড় হবার স্ফুলিঙ্গ ছিল, সেটা আলো হয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারল না। ওর বংশের ধারা জানি না তখনো তাই মনে হত ওই ব্যর্থতার যন্ত্রণা ঘুচলে ওই লোক অন্য মানুষ হয়ে উঠবে।

কিন্তু সুধীর দত্তর পুরুষকারের ধার একেবারে ভিন্ন জাতের। তার মধ্যে ব্যর্থতার যন্ত্রণা নেই কিছুমাত্র। ওই অল্প দিনের হৃদ্যতায় মনে হয়েছে, সর্ব ব্যাপারে একটা প্রবল বেগে চলার ধাত তার। আচরণ দেখলে মনে হবে কোনো প্রত্যাশার বালাই নেই তার মধ্যে। এই আচরণ মেকী কিনা তখন পর্যন্ত সেই সন্দেহ আমার পুরোমাত্রায় ছিল। সংশয় মেশানো এই কৌতূহলের নাম যে প্রেম নয়, তার কারণ, বন্ধুর প্রায় বিপরীত স্বভাবের মানুষ প্রশান্ত রায়কেও আমার খারাপ লাগেনি। লেখা-পড়ায় সে যে একটি উজ্জ্বল রত্ন-বিশেষ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সুধীর দত্ত সেটা অনেকবার শুনিয়েছে। সুধীরের তুলনায় ওই লোক স্বল্পভাষী, কিন্তু চোখে মুখে সপ্রতিভ বুদ্ধির ছাপ। দিল্লীতে রমার ঠাট্টার জবাবে বীণা বলেছিল, তা আমার ভাই চন্দ্রাণীর দস্যি হনুমানের থেকে আমার রক্ষাকর্তা এই ঠাণ্ডা মানুষটাকেই বেশি ভালো লেগেছে সত্যি কথা।

গোড়ায় গোড়ায় ছুটির দিনে দুই বন্ধু একসঙ্গেই বাড়িতে আসত। কবিতা পড়ুক না পড়ুক দাদুর নাম সকলেই জানে—তার সঙ্গে আলাপ করতে আসবে এ-প্রস্তাব তারা দিল্লীতেই দিয়ে রেখেছিল।

তাদের আনাগোনা বাড়তে পাড়ার যে ছেলেদের আমার প্রতি একটু সপ্রেম নজর ছিল, তারা সচকিত হয়ে উঠল। বাড়িতে বিয়ের যুগ্যি মেয়ে থাকলে তার বাপ-মায়ের ছেলে-যাচাইয়ের চোখ থাকেই। সে-যাচাইয়ে সুধীর দত্ত অনেকটাই পিছনে পড়ে গেল। প্রশান্ত রায়ের বাবা পদস্থ সরকারী অফিসার ছিলেন, সম্প্রতি রিটায়ার করে বহরমপুরেই বাড়ি করেছেন। তাঁর একটিমাত্র ছেলে, আর মেয়েও নেই, এমন কি শাশুড়ীও নেই, অতএব এমন ঘরে যে মেয়ে যাবে সে যে সুখে থাকবে তাতে আর সন্দেহ কি। অন্যদিকে সুধীর দত্ত ওই বাড়িতেই খেয়ে-পরে মানুষ। সে-গল্প সুধীর দাদুর কাছে নিজেই করেছে।

অস্বীকার করব না, এই স্বাভাবিক যাচাইয়ের ধরনটা আমি খুব সুচক্ষে দেখিনি। ...এই সময় ছোট একটা ঘটনা ঘটল, আর সেই ছোট ঘটনার আয়নায় সুধীরকে যেন আর একটু স্পষ্ট করে দেখতে পেলাম। এক শৌখিন অ্যামেচার পার্টি আমার উপন্যাসখানার নাট্যরূপ দিয়েছে। ছুটির দিনে শহরের এক নামকরা মঞ্চে সেই নাটকের অভিনয় হবে। সকাল থেকেই আমার ভিতরে ভিতরে একটা রোমাঞ্চ চলেছে। বাড়ি থেকে শুধু দাদু যাবে। বাবা-মা এ-সবের ধার ধারে না। আর সুধীর দত্ত আর প্রশান্ত রায় যাবে। খুশিতে ভরপুর হয়েই আমি ওদের দুজনকে নেমন্তন্ন করেছিলাম। নিজের চোখে আমার কদর দেখুক, মনের তলায় এই লোভও ছিল অস্বীকার করব না।

থিয়েটার শুরু হয়ে গেল। আমার এক পাশে দাদু বসে, অন্য পাশের দুটো সীটই খালি। ওদের দুজনের দেখা নেই। আমি উসখুস করছি টের পেয়ে দাদু চাপা গলায় রসিকতা করল, আমাকে এ-ভাবে অপমান করবি তো উঠে চলে যাব বলে দিলাম, ওরা নেই তাতে কি, আমি তো আছি।

জবাবে আমি দাদুর হাঁটুতে জোরেই চিমটি কাটলাম একটা।

এর একটু বাদেই অন্ধকার হাতড়ে দুই মূর্তি হাজির। প্রশান্ত রায় আমার পাশে বসল, তার পাশে সুধীর দত্ত। এবারে নিঃশব্দে দাদু একটা চিমটি কাটল আমাকে। প্রশান্ত রায় ফিসফিস করে বলল, একটু দেরি হয়ে গেল, রাস্তায় আটকে গেলাম—

বলতে ইচ্ছে করছিল, কলকাতার রাস্তায় আটকে যাওয়াটা স্বাভাবিক, সে-কথা চিন্তা করে একটু আগেই বেরুনো উচিত ছিল।

কিন্তু কিছু না বলে মঞ্চের দিকে মনোযোগ দিলাম। বললে নিজের লেখা গল্পের প্রতি বেশি দরদ দেখানো হবে।

প্রথম অঙ্কের পর আলো জ্বলতে দাদু হাসিমুখে সামনের দিকে ঝুঁকল।—কি ভায়ারা, এত দেরি কেন, সময়ে এলে নাটক জমে না বুঝি?

দাদু আর বাবা-মায়েরও যে প্রশান্ত রায়ের ওপরেই চোখ বেশি সেটা আমি অনুভব করতে পারি। নইলে দাদু যত রসিক মানুষই হোক, দাদু এমন লাগাম ছাড়া ঠাট্টা বাইরের লোকের সঙ্গে অন্তত করে না।

প্রশান্ত রায় একবার আমার মুখখানা দেখে নিয়ে দাদুর কথার জবাব দিল। বলল, একটা হাঙ্গামায় পড়ে গেলাম, যে বাসে আসছিলাম সেটাতেই অ্যাকসিডেন্ট—কোথা থেকে একটা রাস্তার ছেলে এসে হুড়মুড় করে বাসটার তলায় চাপা পড়ল। সেই হৈ-চৈ থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে তবে আসা—

—ও মা! আমার গলা দিয়ে অস্ফুট শব্দ বেরুলো একটা।

উতলা মুখ করে দাদু বলল, দেখো কাণ্ড, ছেলেটা বাঁচবে?

—আমার মনে হল বাঁচবে, সুধীর বলছে বাঁচবে না।

আমি তার পাশ দিয়ে সুধীরের দিকে তাকালাম। দেখি, চুপচাপ সাদা পরদার দিকে চেয়ে বসে আছে সে। মনে হল ভাবছে কিছু। এই মুখভাব কৃত্রিম কি অকৃত্রিম বুঝতে চেষ্টা করলাম। বোঝা গেল না।

পরের অঙ্ক শুরু হল এবং যথাসময়ে শেষ হল। চার অঙ্কের বই। এবারে আলো জ্বলতে প্রশান্ত রায় অবাক একটু। তার পাশে সুধীর দত্ত নেই, আসন খালি। প্রথমে ভাবলাম বাইরে গেছে। পরের অঙ্ক শুরু হতেও এলো না যখন আমিও অবাক। প্রশান্ত রায় বার বার বাইরের দিকে তাকাতে লাগল, অনেকেই সময়ে ফেরে না বলে বার বার দরজা খোলা হচ্ছে। তারপর বলল, পাশ থেকে কখন উঠে গেছে টেরই পাইনি।

কে জানে কেন, আমার সত্যিকারের রাগ হচ্ছিল। বলতে ইচ্ছে করছিল, টের পাবেন কি করে, নাটক বাদে বাড়তি মনোযোগটুকু তো আমার দিকে। কিন্তু রাগ আসলে হচ্ছে সুধীর দত্তর ওপর। ঠাণ্ডা চাপা গলায় বললাম, ভালো লাগছে না তাই পালিয়েছেন হয়ত—

পাশ থেকে মৃদু জবাব এলো, তা নয় বোধ হয়...ঠিক হাসপাতালে ধাওয়া করেছে মনে হচ্ছে।

হাসপাতালে!

ওই যেখানে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে তার কাছেই যে হাসপাতাল আছে সেখানেই গেছে মনে হচ্ছে। আসার সময়ই বলছিল, চল যাই—

এই কথা শোনার পরেও রাগ করব তেমন অমানুষ মেয়ে নই। বরং ভয়ানক কৌতূহল হল। বললাম, ভদ্রলোকের ভিতরটা খুব নরম বুঝি?

পাশ থেকে চাপা জবাবের সঙ্গে হাসির আভাস একটু।—ঠিক উল্টো, আমার থেকেও ডবল শক্ত, ওই রকমই খেয়াল ওর।

জবাবটা একটুও ভালো লাগল না। নিজের সঙ্গে তুলনা করাটাও না। একজন রাস্তা থেকেই হাসপাতালে চলে যেতে চেয়েছে, এখানে এসেও চলেই গেছে। আর একজন নিশ্চিন্ত মনে বসে নাটক দেখছে, অথচ মুখে বলছে তার থেকেও ডবল শক্ত ভেতরটা।

...কিন্তু মিথ্যে যে বলেনি সেটা আমি ঢের ঢের পরে অনুভব করতে পেরেছি।

দু'দিন বাদে যখন দুজনেই আবার এলো, আমি ছদ্মকোপে সুধীর দত্তর ওপর চড়াও হলাম।—নাটক ভাল লাগেনি সরাসরি বললেই হত, চুপিচুপি পালালেন কেন?

চুপিচুপি কি রকম?

অন্ধকারে কাউকে না বলে চলে গেলেন, চুপিচুপি না তো কি?

ও...। হাসতে লাগল।—ব্যাপার কি জানেন, থিয়েটারের কিছুই দেখতে পারছিলাম না। চোখের সামনে থেঁতলানো ছেলেটাকে শুধু দেখছিলাম। আর ভাবছিলাম, বাঁচবে না মরবে। আমি ওকে মারছিলাম, আর আমার ভিতরের ডাক্তার বলছিল চেষ্টা করলে বাঁচতেও পারে। প্রশান্তও তাই বলেছিল। শেষে আমার ভিতরের ডাক্তার-এ আর আমাতে লড়াই লেগে গেল। আমি যত বলছি মরবে ডাক্তার ততো বলছে বাঁচবে। শেষে চলেই গেলাম হাসপাতালে।

এ-রকম অদ্ভুত জবাব আর শুনিনি। জিজ্ঞাসা করলাম, বাঁচল না মরল?

হেসেই জবাব দিল বাঁচল, কিন্তু আমার হাত থাকলে ঠিক মেরে ফেলতুম।

আমি হাঁ।—এ আবার কি কথা!

খাঁটি কথা। একটা পা ভেঙেছে, দুটো হাত ভেঙেছে, বুকের দুটো রিব ভেঙেছে, বাঁচিয়ে কষ্ট দেওয়ার কোনো মানে হয়!

অবাক হয়ে আমি ওর মুখখানা দেখছিলাম। প্রশান্ত রায় বলেছিল তার থেকে ওর ভিতরটা ডবল শক্ত। কিন্তু তখনো কঠিনের আড়াল থেকে একখানা নরম মনই আবিষ্কারের চেষ্টায় ছিলাম আমি।

বাড়িতে প্রশান্ত রায়কে নিয়ে দাদুর সঙ্গে বাবা-মায়ের কথাবার্তা এগোচ্ছে। ডাক্তারীর শেষ পরীক্ষায় সকলকে টপকে গোলড্ মেডেল পেয়েছে সে-সুখবর বাড়ির লোকে অনেক আগেই পেয়েছে। এখন শোনা যাচ্ছে, আরো বড় ডাক্তার হবার জন্য শিগগিরই সমুদ্র পাড়ি দেবে। অতএব এ-রকম একটা যোগ্য ছেলে যখন সেধে এগিয়ে এসেছে, সুযোগ হাত-ছাড়া হতে দেওয়া উচিত নয়।

অথচ দুজনের মধ্যে কার প্রতি আমার আগ্রহ বেশি সেটা স্পষ্ট করে কেউ বুঝতে পারছে না বলেই অস্বস্তি তাদের। হাব-ভাবে তারা আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করছে, প্রশান্ত রায়ের মতো ছেলে হয় না।

এরপর এক আধদিন প্রশান্ত রায় একলাই এলো। আমার মনে হত সে-যেন যোগ্যতার দাবি নিয়েই আসছে। দ্বিতীয় দিনেও তাকে একলা দেখে জিজ্ঞেস করলাম, একলা যে, সুধীরবাবুর কি হল?

প্রশান্ত রায় হেসেই জবাব দিল, ওর নাম সুধীর হলেও মতি খুব ধীর নয়—ডাকলাম এলো না।

আমার কেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল না জানি না। সেদিন আমার কথাবার্তা বা আচরণ থেকে প্রশান্তর মনে কোনোরকম খটকা লেগেছিল কিনা বলতে পারব না।

পরদিনও একলাই এলো প্রশান্ত রায়। হাব-ভাব গম্ভীর একটু। দাদু খানিক গল্প করে উঠে গেল। অন্তরঙ্গ আলাপের সুযোগ দিয়ে গেল, চাউনিতে সেটা স্পষ্ট করে আমাকে বোঝাতে ছাড়ল না। মা ভিতর থেকে চা-জলখাবার পাঠালো। থালা ভরতি জলখাবার। ভিতরটা আমার অকারণেই কেমন তেতে উঠতে থাকল। যতটা সম্ভব সহজ মুখ করে বললাম, আজও সুধীরবাবুকে ডাকলেন, এলো না?

সোজাসুজি মুখ তুলে তাকালো আমার দিকে। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির মতো একটু। মাথা নেড়ে জবাব দিল, ঠিক তাই, আর সেইজন্যেই আমি চলে এলাম—

ঠিক এই জবাব দেবে আর এ-রকম করে বলবে আশা করিনি। প্রশান্ত চায়ের পেয়ালা তুলে নিল, খাবারের থালা স্পর্শও করল না। পেয়ালায় গোটাকতক চুমুক দিয়ে আমার দিকে তাকালো আবার। আরো একটু গম্ভীর মনে হল। তারপর যে কথা বলল, একেবারে অপ্রত্যাশিত।

—দেখুন, সুধীরের যা স্বভাব, ও নিজের মুখে আপনাকে কোনোদিন কিছু বলবে আমার মনে হয় না।...এদিকে আমি বোধহয় আর খুব বেশিদিন থাকছি না এখানে। ...আপনার মন আমি যদি ঠিক বুঝে থাকি, ওকে আমি যে করে হোক রাজী করাতে পারব। আমি না পারলেও বাবাকে দিয়ে পারব। আর তারপর আপনাব দাদু আর বাবা মাকে বলে বাকি ব্যবস্থাও করে যেতে পারব। এখন আপনি যদি সঙ্কোচ ছেড়ে মতামতটা জানান সুবিধে হয়।

আচমকা অঁথৈ জলে পড়ে হাবুডুবু খাবার দাখিল আমার। আয়নায় না দেখেও নিজের মুখের অবস্থা বুঝতে পারছি। আরো খারাপ লাগছে এই ভেবে যে এই লোক বন্ধুকে বাতিল করে নিজে সামনে এগিয়ে আসতে চায় ধরে নিয়েছিলাম বলে। আমার ওই মনোভাব এই ছেলে বুঝতে পেরেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই জন্যেই মুখ গম্ভীর। সেই সঙ্গে ওই মুখের দিকে চেয়ে আর একটা সত্যও মুহূর্তের মধ্যে উদঘাটিত হয়ে গেল যেন।...সামনে যে বসে আছে,আমার প্রতি তার দুর্বলতা আছে। কিন্তু আমি কি চাই সেটা বিবেচনা করেই নিজেকে ছেঁটে দিয়ে বন্ধুর জন্যে ফয়সালা করতে এসেছে। সেইজন্যেই শুকনো মুখ।

বিব্রত অবস্থাটা কাটিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রাগই হয়ে গেল আমার। মুখের ওপর স্পষ্ট বলে দিল, নিজে থেকে সুধীর দত্ত কোনোদিন এগিয়ে আসবে না, অর্থাৎ আমার মতো মেয়ের জন্য ওই লোকের তাপ উত্তাপ আশা করা বৃথা। অতএব তাকে ধরে বেঁধে রাজী করাতে হবে, দরকার হলে প্রশান্তর বাবার সাহায্য নিতে হবে—যেন সুধীর দত্তকে বিয়ে করার জন্য আমিই পাগল হয়ে উঠেছি।

একটু নীরস সুরেই জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার বন্ধুর স্বভাব জেনেও তার জন্য আপনি এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন কেন?

জবাব দিল, আপনি আমাদের বাড়ি আসুন এটা চাই বলে।

—কে চায়, আপনি না আপনার বন্ধু?

—আমিই চাই।

—আপনাদের বাড়ি আর আপনার বন্ধুর বাড়ি এক?

—একের থেকেও বেশি।...আপনাকে আমি নিশ্চিন্ত করতে পারি, আপনি অযোগ্য লোকের হাতে পড়বেন না, ওর স্বভাব যেমনই হোক, ওর মতো মানুষ হয় না।

এই লোকের মুখে প্রশংসাটা কেন যেন অদ্ভুত ভালো লাগল। এই প্রথম আমি অনুভব করলাম ভিতরে ভিতরে এই মানুষটিও উদার। আবহাওয়া তরল করার জন্য কি কি-জন্য জানি না, হেসেই বললাম, কিন্তু সুধীরবাবু তো ফাঁক পেলেই বলেন, আপনার মতো বিদ্বান বুদ্ধিমান মানুষ দুটি হয় না। আপনি গোলড্ মেডেল পেয়েছেন জানিয়ে বলেছিলেন, তার বেশি নেই তো কি পাবে, হীরের মেডেল থাকলে তাও পেত।

হাসল একটু। হাসিটা কেমন বিমর্ষ ঠেকল আমার চোখে। জবাব দিল, ও নিজেও মন্দ ছেড়ে দস্তুরমতো ভালো পাস করেছে—আমার বরাবরই সন্দেহ হয় আমার জন্যেই ও ইচ্ছে করে আরো ভালো করে না—আমার বদলে ও প্রথম হলে আনন্দের বদলে ওর যন্ত্রণা হত।

...হ্যাঁ, সেইদিন এই মানুষকে, এই প্রশান্ত রায়কেও শ্রদ্ধার চোখে দেখেছিলাম আমি। সেদিন স্পষ্ট করে তাকে কিছু জবাব দিতে পারিনি। দেওয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু সেই দিন থেকে কয়েকটা দিনের জন্য আমি যে নিজেকে নিয়েই একটা দো-টানার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম, অস্বীকার করব না।

এরপর...

দু'সপ্তাহ একজনেরও দেখা নেই। তারপর একদিন সহাস্যবদন সুধীরচন্দ্র একা হাজির।

আমি অবশ্য তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, প্রশান্তবাবুর খবর কি?

জবাব দিল, আপাতত বিলেত যাবার চেষ্টায় ব্যস্ত। খুব ভালো রেজাল্ট করেছে তো—ওর বাবারও ইচ্ছে একটা বাড়তি ছাপ নিয়ে আসুক।

আমি বললাম, রেজাল্ট তো আপনারও ভালই হয়েছে শুনেছি, আপনি যাচ্ছেন না?

দু'চোখ কপালে তুলে ফেলল, সর্বনাশ, এ-কথা কখনো ওই পাগলটার সামনে জিজ্ঞাসা করবেন না যেন, একা কিছুতেই যেতে রাজী নয় বলে মেসোমশায় শেষে আমারও খরচ দিতে স্বীকার—অতি কষ্টে ওকে বাগে এনেছি, মাসিমা বেঁচে নেই, মেসোমশায়ের স্বাস্থ্য খারাপ, কাছাকাছি একজনের থাকা দরকার—এই সব বলে-টলে।

কেন?

ও অবাক একটু, কেন আবার কি, ওরা ভালোবাসে বলে আমি কি তার মাশুল নিতেই থাকব নাকি!

সেদিনই খোলাখুলি এক অদ্ভুত প্রস্তাব করে বসেছিল সে। বলেছিল, অভয় দেন তো একটা কথা বলি—

আমার বুকের ভিতরে হঠাৎ ধুকপুক করে উঠেছিল কেমন। জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়েছিলাম।

—ও বেচারাকে আর কষ্ট দিচ্ছেন কেন? মেসোমশায়ের খুব ইচ্ছে বিলেত যাবার আগে বিয়ে করে যাক, এদিকে আপনি ওকে ঘায়েল করে বসে আছেন, ও-দিকে আপনার দাদুর মুখে শুনেছি এম. এ. পাশ করার আগে আপনি নাকি বিয়ে নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজী নন। তা বেচারা কি তাহলে বিলেতে গিয়ে আপনার কথা ভেবে ভেবে ফেল মারবে।

নিজের অগোচরে আমার দু'চোখ ওই মুখের ওপর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল কিনা জানি না।

প্রশান্ত রায়ের সঙ্গে কথা বলে সেদিন এটুকু অন্তত বুঝেছিলাম, এদের দুই বন্ধুর মধ্যে ঈর্ষার জায়গা নেই। সেটা ভালো লেগেছিল। কিন্তু সেদিনের কথা-বার্তার কিছুই এই লোকের কানে ওঠেনি এটা বিশ্বাস হচ্ছিল না। মুখের দিকে চেয়েছিলাম।

কোনোরকম অনুক্ত অনুভূতির লেশমাত্র দেখিনি। কি-যেন হয়েছিল আমারও। ও যেমন মুখে আসে বলতে পারে, আমিই বা পারব না কেন? হেসেই বললাম, দুজনার মধ্যে আমি কার দিকে ঝুঁকব তা নিয়ে বাড়িতে একটু-আধটু গবেষণা চলছে—

জোরে বড় হাসে না, কিন্তু এ-কথা শোনামাত্র অট্টহাসি একেবারে। তারপর যা বলে বসল আরো চমৎকার। সেই প্রথম তুমি করে বলল আমাকে।

—আমার মনে হয় ওই বোকাটার মাথায়ও ওই রকম কিছু একটা সন্দেহ ঢুকেছে। নইলে বার বার ও আমাকে তোমার কাছে ঠেলতে চায় কেন। সেদিন আবার বলছিল, আমি বিলেত থেকে ঘুরে আসার পর নিজের বিয়ের কথা ভাবব, তুই আগেই বিয়েটা করে ফেল, নইলে বাবার খুব অসুবিধে। তাছাড়া তোর যা চরিত্র, আমি না থাকলে কখন কি করে ফেলবি ঠিক নেই।. আমি সত্যের ধান্ধায় থাকি বলে ওর আসল সমস্যাটা বুঝতেই পারিনি। হাসিমাখা দু'চোখ আমার মুখের ওপর রাখল।—শোনো ম্যাডাম, ও যখন তোমাকে পছন্দ করেছে তখন ও বললে ওর হয়ে আমি প্রেম পর্যন্ত করে দিতে পারি, তুমি রাজী না হলে মুখ চাপা দিয়ে তোমাকে সেই আগের দিনের মতো গায়েব করে ফেলতে পারি—কিন্তু বিয়েটা শেষ পর্যন্ত ও-ই করবে। তারপর বন্ধু যে ওর তুলনায় কত বড় সেই ফিরিস্তি দিয়েছে।

আমি চুপচাপ মুখের দিকে চেয়েছিলাম শুধু।

এর দিন পাঁচ ছয় বাদে নীচে দাদুর ঘরে ডাক পড়ল হঠাৎ। এসে দেখি সেখানে বাবাও বসে এবং আর একজন অপরিচিত ভদ্রলোক। তাঁকে দেখামাত্র আমার মন বলল, ইনি প্রশান্তর বাবা।

দাদু ডাকলেন, আয়, একে প্রণাম কর—

প্রণাম করতে ভদ্রলোক আমাকে কাছে টেনে নিলেন। বলে উঠলেন, বাঃ খাসা মা দেখি আমার—ছেলে-দুটোর পছন্দ আছে বলতে হবে। হেসে উঠলেন, দাদুর দিকে ফিরে বললেন, সুধীরের কথাবার্তা তো জানেন, চিঠিতে আমাকে সে-কি তাড়া—মেসোমশায় ছেলের বিয়ে দিতে চান তো শিগগির এসে বুক করুন—নইলে ফসকে যাবে।

সকলেই হেসে উঠলেন। আমারও খারাপ লাগছিল না। দাদু মন্তব্য করলেন, সুধীরও খাশা ছেলে—

ভদ্রলোকের দ্বিগুণ উচ্ছ্বাস, আর বলতে, কোন্ ছাইয়ের গাদায় কি রত্ন পড়েছিল, শুনবেন'খন পরে।

পবে শুনেছি। পবে বলতে বিযেব পবে। ওই লোকটাব জন্য সত্যিকাবেব মমতা বোধ কবেছি। আব একটা ব্যাপাব আমাব ভালো লেগেছিল। পবস্পবেব প্রতি দুই বন্ধুব টান এমন যে ওদেব মধ্যে এক এক সময নিজেকেই বাডতি মনে হত।

সময সময প্রশান্তকে আমিই উসকে দিযেছি। বলেছি, বড হবাব জন্যে বন্ধুকেও সঙ্গে নাও না, বাবাকে দেখাব জন্য আমি তো আছি।

ফলে আব একদফা তর্কাতর্কি হযেছিল। সুধীব বাজী হযনি। বন্ধুকে বলেছে, তোব বউ এখানে এম এ পডতে পডতে বহবমপুবে গিযে খুব শ্বশুবেব সেবা কববে। তাবপব. আমাব দিকে ফিবে চোখ পাকিযেছে, ওকে বিলেত পাঠিযে দিযে একটা দেডটা বছব কষে তোমাব সঙ্গে প্রেম কবব তাতেও বাদ সাধতে চাও?

এদেব কথা বার্তাব ধবন এমন যে লাজ-লজ্জাব বালাই আমাব দিনকযেকেব মধ্যেই কেটে গেছল। চোখ পাকিযে ঠোঁট-কাটাব মতো জবাব দিযেছি, কষে প্রেম কবাব চান্স তো বিযেব আগেই পেযেছিলে, এখন এত সাধ কেন?

সুধীব জবাব দিযেছে এই বুদ্ধি নিযে তুমি গল্প উপন্যাস লেখো। তখন প্রেম কবলে তুমি যে বডশিখানাব মতো আমায গলায আটকাতে না তাব কোনো গ্যাবান্টি ছিল? এখন তোমাব কপালে আব সিঁথিতে কলঙ্কেব দাগ পডেছে—এখন নিশ্চিন্তে প্রেম কবা যেতে পাবে।

প্রশান্ত সায দিযেছে, ও-দেশেব মেযেবাও শুনেছি বিযেব পবেই বেশিব ভাগ প্রেম প্র্যাকটিস কবে। তুই-ই ওকে তালিম দে, আব ও-দিকে আমিও একটা জুটিযে নেব'খন।

শোনামাত্র সুধীব গম্ভীব। বযোজ্যেষ্ঠেব অনুশাসনেব চোখে তাকিযেছে বন্ধুব দিকে। গলাব স্ববও সেই বকম।—তুই কি নিজেকে আমাব মতো ভাবিস? প্রেম-প্র্যাকটিস কবতে গিযে ধপাস কবে পা পিছলে পডলে তোকে বক্ষা কববে কে? তখন ও-পাবে তুমি বাধে এপাবে আমি, মাঝে সমুদ্র বহে বে—ওই কবে শেষে আমাব ঘাডে এই সেকেন্ডহ্যান্ড মাল চাপাবি। তাব থেকে সঙ্গে একটা গীতা নিযে যাস—

তখন থেকেই সুধীব দত্তব গাযে আমাব হাত ওঠা শুরু হযেছিল।

কিন্তু সুধীব দত্তব সংযমেব সেই নজিবও আমি দেখেছি। হ্যা, তখন ববং আমাবই বুকেব তলায ধুকপুকুনি। প্রশান্ত বিলেত যাবাব পব একমাত্র ছুটিছাটায আমি শ্বশুবেব কাছে বহবমপুব যেতাম। শ্বশুবমশাই সেই বকমই ব্যবস্থা কবেছিলেন। বলেছিলেন, আগে এম এ পাসটা কবে নাও তাবপব শ্বশুবেব সেবা হবে।

যখন যেতাম সুধীবেব সঙ্গেই যেতাম, ওব সঙ্গেই ফিবে আসতাম। প্র্যাকটিস জমানোব উদ্দেশ্যে সুধীর তখন বড একটা ওষুধেব দোকানে বসছে। কিন্তু প্র্যাকটিস জমানোব ব্যাপাবে ওব ভিতবে কোনোবকম তাগিদ ছিল বলে মনে হত না। ফাঁক পেলেই এসে আড্ডা দিত। বলত, বন্ধুব দাযিত্ব পালন কবছি। আমাব চেষ্টায তুমি যদি এম. এ. পবীক্ষায ফেল মারতে পাবো, বিলেতে সবাব আগে আমি এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম পাঠাবো।

সম্ভব হলে ওকেও আমি আমার সঙ্গে এইখানে অর্থাৎ বাপের বাড়িতে রেখে দিতাম। বিলেতের প্রায় প্রত্যেক চিঠিতে আবেদন থাকত, সুধীরের দিকে লক্ষ্য রেখো, আমরা ছাড়া এই দুনিয়ায় ওর আর কেউ নেই।

আমি চিঠির সেই জায়গাটুকু শুধু ওকে দেখাতাম। ও সবটা দেখার জন্য কাড়াকাড়ি করত। ওকে পরীক্ষা করার জন্য ইচ্ছে করেই একদিন কাড়াকাড়িতে হার মেনেছিলাম। —পড়বে তো পড়ো, কি বয়ে গেল।

পড়েনি। ফেরত দিয়েছে। বলেছে, কাজ নেই পড়ে, আমি ব্রহ্মচারী মানুষ, এ-সব করে শেষে চরিত্রখানা যাক আর কি—

ঘনিষ্ঠ মেলামেশাও যে এমন অমলিন আনন্দের হতে পারে, আমার ধারণা ছিল না। সকলে সেটা কোন চোখে দেখে আমার সংশয় ছিল। এমন কি আমার বাড়িতেও। মা সেকেলে ধাঁচের মানুষ, মাঝে মাঝেই আমাকে সামলাতে চেষ্টা করত, বিয়ে-থা হয়েছে, এখন আর এত হুটোপুটি মানায় না।

আমি বলতে পারতুম না, হুটোপুটিটা তো মা বিয়ের পরেই শুরু হয়েছে।

বহরমপুরে গেলেও দুজনে এক একদিন অনেক দূরে দূরে চলে যেতাম। শ্বশুর দেবতুল্য মানুষ, তাঁর চোখে বিসদৃশ কিছু ঠেকত না। নিজের দুটো হাতের মধ্যে সুধীরকেই ও ভদ্রলোক ডান হাত ভাবতেন। কিন্তু আশপাশের বাড়ির মেয়ে বউদের চোখে মুখে বক্র কটাক্ষ আর কৌতুক দেখতাম। এ রকম মেলামেশাটা সকলে হয়ত সহজ বা স্বাভাবিক ভাবতে পারত না। দুটো বাড়ি পরের এক বাড়ির বয়স্কা ভদ্রমহিলা প্রায়ই সন্দিগ্ধ চোখে আমাদের বেরুতে দেখতেন। সুধীরকে সে-কথা বলতে সেদিন হাসল শুধু, কিছুই বলল না। পরদিন যে কাণ্ড করে বসল, আমার সঙিন অবস্থা। বেরুতেই দেখি ভদ্রমহিলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে, অপ্রসন্ন দু'চোখ আমাদেরই ওপর।

সুধীর তাঁকে না দেখার ভান করে খপ করে আমার একটা হাত ধরে কাঁধে প্রায় কাঁধ ঠেকিয়ে হাঁটতে লাগল। আমার সব চাপা তর্জন ব্যর্থ, ও হাতও ছাড়ল না, সরলও না। ভদ্রমহিলা চোখের আড়াল হতে তবে স্বস্তি।

...বেড়াতে বেড়াতে এক একদিন দূরে গাঁয়ের দিকে চলে যেতাম। একদিন লক্ষ্য করলাম, মাটির ঘরের কয়েকটি মেয়ে বউ বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখছে আমাদের। গম্ভীর মুখে সুধীর টিপ্পনী কাটল, আমাদের ওরা ভারী সুখী দম্পতী ভাবছে।

আমি রাগ দেখিয়ে জবাব দিলাম, ছাই ভাবছে, তোমাকে আমার দারোয়ান ভাবছে—

ও আমার দিকে তাকালো একবার। তারপর কথা নেই বার্তা নেই সোজা ওই মেয়ে বউদের দিকে এগিয়ে চলল। আমি তর্জন করে উঠলাম, ভালো হবে না বলছি!

কে কার কথা শোনে! এগিয়ে গিয়ে বলল, এক গেলাস জল দেবেন?

সচকিত হয়ে দুটো মেয়ে জল আনতে ছুটল। সুধীর আমার দিকে ঘুরে ডাকল, এসো না, লজ্জা কি—

ওর ভয়েই পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম আমি। জল এলো দু' গেলাস, একটা রেকাবিতে কিছু নাড়ু। মেয়েরা আমাকে বলল, ভিতরে আসুন না, বসে জল খান—

সুধীর জবাব দিল, না আর বসব না, অনেকটা হেঁটে হাপিয়ে গেছি। জলের গেলাস নিয়ে দুটো নাড়ু চিবুতে চিবুতে আমাকে বলল, জল খাবে না?

আমি মাথা নাড়লাম, অর্থাৎ আমার তেষ্টা পায়নি। ওদের মধ্যে বয়স্কা রমণীটি অন্তরঙ্গ সুরে জিজ্ঞাসা করল, এদিকে বেড়াতে এসেছ বুঝি?

সুধীর জবাব দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, কলকাতায় থাকি তো, তাই এই নিরিবিলিতে বেড়াতে খুব ভাল লাগে।

বয়স্কা রমণীটি বলল, আর একদিনও দূর থেকে তোমাদের বেড়াতে দেখেছিলাম...নতুন বিয়ে হয়েছে বুঝি?

আমার মুখের অবস্থা আমি জানি না। সুধীর অম্লানবদনে জবাব দিল, ওঁর নতুন বিয়ে হয়েছে, বিয়ের পরেই আমার বন্ধু মানে ওঁর স্বামী বিলেত চলে গেল, তাই আমিই নিয়ে বেড়াই-টেরাই—

মুহূর্তের মধ্যে বিমূঢ় মূর্তি সকলের। আমি পালাবার জন্যেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললাম। পরে সুধীরকে শাসালাম, আর কোনোদিন যদি তোমার সঙ্গে বেরিয়েছি—

সুধীর ফোঁড়ন দিল, ওদের ধারণাটা ভেঙে দিলাম বলে তোমার এত রাগ!

ও এই রকমই নাজেহাল করত আমাকে। কলকাতায় ফিরে দু'দিন ওকে না দেখলে হাঁপ ধরে যেত। ছুটির দিনে টেলিফোনে তলব পাঠাতাম, ও রাতের আগে ছাড়া পেত না। কলকাতায়ও এক এক দিন এদিক সেদিক বেরিয়ে পড়তাম আমরা।

...এরই ফলে প্রাণান্তকর সঙ্কট একবার।

কলকাতার আবহাওয়া ভালো নয়। এদিকে-সেদিকে একটা আধটা খুন-জখম লেগে আছে। রাজনীতির নেতারা গদীতে বসতে না বসতে একে অন্যের ওপর কাদা ছুঁড়তে লেগেছে। এই হাওয়ার পরোয়া না করে যে আমরা কোথায় কোথায় চলে যাই—সেটা মায়ের অন্তত একটুও পছন্দ নয়। কিন্তু তার উপদেশ আমি তেমন কানে তুলি না। আমার কেমন ধারণা, সুধীর সঙ্গে থাকলে সকলেই নির্ভয় হতে পারে।

এখানে মনের কথা বলে নিই দুই একটা। পাঠক ভাবতে পারেন, স্বামীর অনুপস্থিতিতে বুঝি মন দেওয়া নেওয়ার খেলা চলেছে আমার। কিন্তু আমি হলপ করে বলতে পারি তা নয়। সুধীরকে অত কাছে পেয়েছিলাম বলেই তার বন্ধু দূরে থেকেও আমার ভারী কাছে কাছেই ছিল। সুধীর যখন তার বন্ধুর উঁচু মনের কথা বলত, আমার ভিতরটা আনন্দে ভরে যেত। বিয়ের আগে দুজনের মধ্যে সুধীরের দিকেই আমার আগে চোখ গেছল সত্যি কথা, কিন্তু নিজেকে আমি এই একজনের চোখে কোনোদিন বাতিল ভাবিনি। তার জন্যে আমার এতটুকু রাগ বা অভিমান ছিল না। উল্টে মনে হত, যা হয়েছে সেটাই স্বাভাবিক আর সেটাই ভালো!

...তবু চক্ষুলজ্জা ছেড়েই বলছি, মানুষের সততা সংযম এ-সবের চূড়ান্ত পরীক্ষা নির্ভর করে পরিবেশের ওপর। পরিবেশের স্বাভাবিক গণ্ডির মধ্যে আত্মশাসনের চেতনাটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু আকস্মিক কোনো পরিস্থিতিতে সে গণ্ডিটা একেবারে ভেঙে গেলে পুরুষের অভ্যস্ত সংযমের বাঁধে ফাটল ধরতেও পারে। রমণী তখন যত অসহায়ই বোধ করুক, তাকে প্রতিরোধ করতে পারে কিনা আমি জানি না।

সে-রকম পরিস্থিতিতেই পড়েছিলাম আমি। সুধীরের দিক থেকে সংযমের সেটা চূড়ান্ত নজিরই বটে। কিন্তু আমি লেখিকা, বিপরীত কল্পনাও মাথায় আসে।...সেই বিতিকিচ্ছিরি পরিস্থিতিতে ওর সংযমে ফাটল ধরা একেবারে অস্বাভাবিক ছিল না।...যদি সেই রকমই হত...যদি এগিয়ে আসত...যদি হাত বাড়াত, আমি কি করতাম?

আমি জানি না কি করতাম।

সেই ছুটির দিনে বাসে-বাসে আমরা অনেক দূরে চলে গেছলাম। কলকাতা ছাড়িয়ে বহু দূরের এক গাঁয়ের দিকে। শেষে বাস ছেড়ে একটা সাইকেল রিকশায় মাইল তিনেক পথ এসেছিলাম। তখনো সুধীরের হাসি-ঠাট্টার লাগাম ছিল না। বলেছিল, চলে এসো, আর হাঁটতে পারি না, কে আর দেখছে আমাদের। তার পরই দুঃখ করেছিল, আ-হা, একটা ফটো তুলে যদি বিলেতে পাঠাতে পারতাম!

সন্ধ্যা যখন হয়-হয় তখন ফেরার তাড়া আবার। বাড়ি ফিরতে কত রাত হয়ে যাবে ঠিক নেই। কিন্তু রিকশায় উঠতেই একটা দুঃসংবাদ শুনলাম, কলকাতায় কি কারণে ভয়ানক হামলা হয়েছে, পুলিস গুলি চালিয়েছে, তিন-চারটে লোক মরেছে, বাস মিলবে কিনা ঠিক নেই।

বাস স্টপে এসে দেখি বাসের চিহ্নও নেই। দু'ঘণ্টা আগেই নাকি বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। আরো দু'আড়াই মাইল পথ ভাঙলে গ্রামের ছোট স্টেশন। কিন্তু বাসের খবর নিতে এসে জানা গেল ট্রেনও নেই, হামলার দরুন সব বন্ধ। এখন আমরা করি কি, গাঁয়ের স্টেশনের যে বহর, ঘরে তালা লটকে মাস্টারবাবু এতক্ষণে গা-ঢাকা দিয়েছে হয়ত। আশপাশে জন-মানব নেই, সেখানকার খোলা মাটিতে রাত কাটানো এই দিন-কালে অন্তত নিরাপদ নয়।

অনির্দিষ্টের মতো রাত পর্যন্ত হাঁটলাম দুজনে। একটা দোকানে কিছু খেয়ে নিলাম। সেই দোকানঅলার শরণাপন্ন হওয়া যায় কিনা ভাবছিলাম, আমাকে বসিয়ে রেখে সুধীর উঠে গেল। ফিরল প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে। আমার মনের অবস্থা তখন আরো কাহিল। যাই হোক, সুধীর ফিরতে হাঁপ ফেলে বাঁচলাম।

ও ডাকল, এসো, একটা ব্যবস্থা হয়েছে।

রাস্তায় পা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যবস্থা?

কলকাতার এক বাবুর বাগানবাড়ির বাইরের ঘরে।

অস্বস্তি চেপে হালকা করেই জিজ্ঞাসা করলাম, বাবু বা বাবুনীরা কেউ নেই?

না, তারা কলকাতায় থাকে, মালী পাহারাদার, দশ টাকা খসিয়ে তবে তার মন পাওয়া গেছে।

চারদিকে দেয়াল ঘেরা অনেকটা জমির ভিতরে দালান। ফটক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলাম আমরা। মালী বাইরের ঘর খুলে দিল। ঘরে ইলেকট্রিক আছে। আলোটা জ্বেলেই মালীটা সোজা আমার দিকে ঘুরে তাকালো। আমার কপালে আর সিঁথিতে সিঁদুর দেখেই তার কিছু একটা চাপা সংশয় গেল যেন। কিন্তু আমার অস্বস্তি বাড়তেই থাকল।...বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে এই বিপদে পড়েছে মালীকে এ-কথা নিশ্চয় বলা হয়নি। কি বলা হয়েছে অনুমান করে আমার কানের দু'পাশ গরম হয়ে উঠছে।

কিন্তু বাইরেটা ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে কি-রকম। শীতের শেষের দিক সেটা। আমার গায়ে ছোট একটা গরম চাদর জড়ানো, সন্ধ্যার মধ্যে ফিরব ধরে নিয়ে গরম জামা আনিনি। তখন থেকেই শীত বোধটা আমার কম। কিন্তু মনে হচ্ছে ঠাণ্ডাটা যেন হাড়ের দিকে ধাওয়া করছে। অবশ্য বাইরে খোলামেলা জায়গায় শহরের তুলনায় শীত এমনিতেই বেশি।

নির্দেশ মতো এক কুঁজো জল রেখে মালী প্রস্থান করল। যাবার আগে বলে গেল, দিন-কাল ভালো না, দরজা বন্ধ রাখা হয় যেন।

মালী চলে যেতে সুধীর ঘরের চারদিক পর্যবেক্ষণ করে নিল একবার, তারপর চোখ দুটো আমার মুখের ওপর এসে থমকালো।—কি গো, ভয় করছে?

আমি হাসতে চেষ্টা করে জবাব দিলাম, ভয়ের কি আছে, তবু তো একটা জায়গা পাওয়া গেল...কিন্তু বাড়িতে ভয়ানক ভাবছে।

—তা অবশ্যই। আরো দু'তিন ঘণ্টা চলে গেলে তোমার মায়ের সন্দেহ হতে পারে আমি তোমাকে ইলোপ করেছি। যাক, এক রাতের সংসার কি করে গোছানো যায় ভাবো এখন।

চেষ্টা সত্ত্বেও সহজ হতে পারছি না আমি। বাইরের খোলা দরজা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে, সুধীর প্রথমেই সেটা বন্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে আমার অস্বস্তি দ্বিগুণ বেড়ে গেল। আমার শোয়ার কোনো অসুবিধে নেই, একটা ডিভান রয়েছে, সোফায় কুশন রয়েছে। দুটো কুশন তুলে নিয়ে সুধীর ডিভানের ওপর ফেলে দিয়ে বলল, মহারানীর শয্যা প্রস্তুত, এখন সমস্যা এই বান্দাকে নিয়ে।

ঘরে বড় টেবিল নেই, কতগুলো সোফার মাঝে কেবল ছোট গোল সেন্টার টেবিল একটা। একটা সেটিও নেই। একটা সোফায় বসে পড়ে সুধীর বলল, আমার কপালে বসা-নিদ্রা।

আমি ডিভানে আশ্রয় নিয়ে গল্প শুরু করে দিলাম। সমস্ত রাতই গল্প করে কাটিয়ে দেবার বাসনা। বাবা-মা-দাদুর সঙ্গে মফঃস্বলের এক আত্মীয়ের বিয়েবাড়িতে গিয়ে কি ফ্যাসাদে পড়েছিলাম সেই গল্প বললাম। মেয়েদের আলাদা আলাদা করে আর ছেলেদের সব একটা হলঘরে শুতে দেওয়া হয়েছিল। ঘরে ইলেকট্রিক লাইট ছিল না। গল্প করতে করতে এক সময় তো সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু আমার চোখে আর ঘুম আসে না। ঝিঁঝির ডাকে কান ঝালাপালা, থেকে থেকে শেয়াল ডেকে উঠছে, ঘরের মধ্যেও মাঝে মাঝে খুট-খুট শব্দ। যত ঘুমুতে চেষ্টা করছি, ততো ভয় বাড়ছে। শেষে রাগ করে চোখ তাকালাম। ঘুমুবই না ঠিক করলুম। যেই তাকানো, ওমনি শরীরের সমস্ত রক্ত যেন জল। জানলার কাছে একজোড়া চোখ জ্বলজ্বল করছে, আমার দিকেই ঘুরল সেই জ্বলন্ত চোখজোড়া। আর কিচ্ছু দেখা যায় না, শুধু দুটো জ্বলন্ত চোখ।

ভয়ে বুকের ভিতরটা ঠকঠক করে কাঁপছে আমার। অথচ হাত পা নাড়তেও পারছি না। শেষে প্রাণপণ চেষ্টায় হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠে মাকে জড়িয়ে ধরলাম। অনেকেই জেগে গেল। কিন্তু জানলায় তখন চোখ দুটো আর নেই। চোখের কথা কেউ বিশ্বাসই করল না, সকলেই ভাবল আমি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছি।

পরদিন সকালে আবার আতকে উঠতে হল একটা নিকষ কালো বিড়াল দেখে। এমন বিদঘুটে কালো বিড়াল আমি আর দেখিনি। তক্ষুনি বুঝলাম রাতে জানলায় আমি কার জ্বলন্ত চোখ দেখেছিলাম।

সুধীর সাদা মুখ করে জিজ্ঞাসা করল, জানলা কটাও বন্ধ করে দেব নাকি?

আমি সদম্ভে বললাম, সে ভয়ের দিন চলে গেছে।

সুধীর তবু বলল, এখানে ভয়-টয় পেও না বাপু, জড়িয়ে-টড়িয়ে ধরলে শেষে ফ্যাসাদে পড়ে যাব।

এ-রকম কেন, এর থেকেও ঢের বেশি লাগাম-ছাড়া ঠাট্টা ও হামেশাই করে থাকে।

এই প্রথম মনে হল, আজ অন্তত এ-রকম ঠাট্টা-তামাসা করাটা উচিত নয়।

কথায় কথায় নিজের ছেলেবেলার গল্প টেনে আনলাম। ওর ছেলেবেলার শোনা গল্পও খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আবার নতুন করে শুনলাম। শেষে একসময় কথা যেন ফুরিয়েই গেল। ও-দিকে শীত বাড়ছে। গুটিসুটি মেরে ছোট চাদরটাই জড়িয়ে নিলাম। তাছাড়া মশার উপদ্রব।

সমস্ত দিনের ঘোরাঘুরিতে খুবই ক্লান্ত হয়েছিলাম। দুজনেই চুপ করে যেতে সেই অস্বস্তিটা আবার বাড়তে লাগল। বাড়িতে এতক্ষণে কি কাণ্ড না জানি হচ্ছে! তবে কলকাতার অবস্থা সে-রকম খারাপ যখন, সকলেই ধরে নেবে আমরা আটকে গেছি কোথাও। চাদরের ফাঁক দিয়ে সুধীরের দিকে তাকালাম। সোফায় মাথা রেখে শরীর এলিয়ে বসে আছে। চোখ চেয়ে আছে কি বুজে আছে বোঝা যাচ্ছে না।

ঘরে আলো জ্বলছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার অস্বস্তি যেন বাড়ছেই—বাড়ছেই। মনে মনে বার বার প্রতিজ্ঞা করছি, জীবনে আর এ-ভাবে বেরুবো না। নিজের একটা ত্রুটি অসামান্য মনে হল হঠাৎ।...সাগর-পারে যে লোকটা পড়ে আছে, তার কথা তার গল্প টেনে আনতে পারলে ভালো হত। কেন মনে হল জানি না। অথচ তার প্রসঙ্গ ওঠেইনি বলতে গেলে। এই ত্রুটি যেন আমাকে আরো বেশি অস্বস্তির দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল।

চাদর মুড়ি দিয়ে শেষে উঠে বসলাম। বসেই থাকলাম অনেকক্ষণ। কিন্তু তারপর তাও পারা গেল না। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে যাচ্ছে।

...রাত কত জানি না। ঘুমিয়ে ছিলাম কিনা তাও জানি না। হঠাৎ মনে হল আমি হাত-পা নাড়তে পারছি না। আমাকে কেউ আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরেছে। বুকের ওপর প্রচণ্ড চাপ। ঘরটাও ঘুটঘুটি অন্ধকার। আমি প্রাণপণে ছাড়াতে চেষ্টা করছি নিজেকে, চিৎকার করে উঠতে চেষ্টা করছি—কিন্তু কেউ যেন অমোঘ অব্যর্থ গ্রাসের আওতায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। আমার চেতনা বিলুপ্ত হবার উপক্রম।

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। ঘরে আলো জ্বলছে তেমনি। আমার গায়ে জড়ানো সুধীরের গরম কোটটা। ভয়ে ঠকঠক করে ভিতরটা কাঁপছে তখনো। কপালে গলায় ঘাম জমেছে। তীক্ষ্ণ চোখে সামনের দিকে তাকালাম।

শুধু শার্ট গায়ে শীতে গুটিসুটি মেরে সুধীর সোফার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে।

বাইরে মুরগি ডেকে উঠল কোথায়। জানলা দিয়ে তাকিয়ে আমি আরো অবাক। ভোর হয়ে এসেছে। রাতের অন্ধকারের চার ভাগের তিন ভাগ মুছে গেছে।

কোটটা হাতে করে আমি উঠলাম। পায়ে পায়ে সুধীরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ওই ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে এমন একটা কুৎসিত স্বপ্ন দেখলাম বলে নিজের ওপরই রাগ হচ্ছে। কোটটা বেশ সন্তর্পণে আবার ওর গায়ের ওপর ছড়িয়ে দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে ও সোজা হয়ে বসল। চোখ রগড়ে প্রথমে আমার দিকে পরে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো। বলে উঠল, যাক বাবা, রাত কাবার, আর আমি কক্ষনো তোমাকে নিয়ে কোথাও বেরুচ্ছি না।

এখন আমার হাসিই পাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কেন, আমি আবার কি করলাম?

—কি করলাম! হাঁদা পেয়েছ আমাকে—সমস্ত রাত ভয়ে সেঁধিয়ে ছিলে আমি বুঝতে

পারি না। দাঁড়াও, মালী ব্যাটাকে তুলে একটু চায়ের যোগাড় করতে পারি কি না দেখে আসি, বাড়ি গিয়ে তোমার মায়ের সামনে আমি দাঁড়াচ্ছি না বলে দিলাম—

শুধু শার্ট গায়েই চলে গেল। আমি সেদিকে চেয়ে রইলাম। ওই স্বপ্ন দেখার জন্য নিজের গালে কষে একটা চড় বসাতে ইচ্ছে করছিল আমার।

প্রশান্ত একাই রওনা হয়ে গেছল বটে, কিন্তু ওপরঅলার ইচ্ছে অন্য রকম। ছ'মাসের মধ্যে হঠাৎ স্ট্রোকে শ্বশুরমশাই চোখ বুজলেন। খবর পেয়েই ছেলে ছুটে চলে আসতে চাইল। এদিক থেকে সুধীর বাধা দিল, লিখল, ছেলের কাজ তো আমি করেই ফেলেছি, এখন এসে কি করবি?

সে বিলেত যাবার আগেই শ্বশুরমশাই তাঁর নগদ টাকা-পয়সা সব আমার আর ছেলের নামে ব্যাঙ্কে চালান দিয়েছিলেন। এরপর বিলেত থেকে প্রশান্তর ঘনঘন তাগিদ আসতে লাগল বন্ধুর কাছে, আর তো বাবাকে দেখার কিছু নেই, শিগগির চলে আয়। আমাকেও লিখেছে, প্লেনের টিকিট কেটে ওকে পত্রপাঠ রওনা করে দাও। শেষে হুমকি, অত দিনের মধ্যে সুধীর না এলে এদিক থেকে আমি ফেরার টিকিট কাটছি।

সুধীরকে আমি একরকম ঠেলেই পাঠিয়েছি।

ও চলে যাবার পর আমি যেন একটা ক্লান্তিকর ছুটির মধ্যে দিন কাটাতে লাগলাম। সব একঘেয়ে লাগে, সবেতে অবসাদ। একে একে অনেকগুলো দিন কেটেছে, মাস কেটেছে। বছর ঘুরেছে। আমি যথাসময়ে এম. এ পাশ করেছি। ফলে ছুটির বোঝা যেন আরো বেড়েছে। এক-একসময় ব্যাঙ্কের টাকার হিসেব করেছি ঘরে বসে। মনের তলায় একটা লোভ উঁকিঝুঁকি দিয়েছে। মজুত তহবিল ভেঙে আমিও সাগর পাড়ি দিয়ে ওদের সঙ্গে মিলতে পারি। কিন্তু ওরা না লিখলে আমি যাই কি করে। দুজনে মনের আনন্দে আছে, লিখবে কেন।

নিজেরই আবার একসময় হাস্যকর মনে হয়েছে ইচ্ছেটা। আমি বাংলায় এম. এ., সেখানে গিয়ে কি করব। একটা স্কুল মাস্টারিও জুটবে না। তাছাড়া ওরা ফিরে এলে অনেক কাঁচা টাকার দরকার হবে হয়ত।

প্রশান্তর চিঠি নিয়মিত আসে। সব চিঠিতেই সুধীরের খবর থাকে। লেখে, ওটার স্বভাব-চরিত্র আর বদলালো না, সেই এক রকমই আছে। সুধীরের পৌঁছনো সংবাদের চিঠিতে লিখেছিল, দুর্যোগের মধ্যে বেড়াতে বেরিয়ে বাইরে তোমাদের এক রাতের সংসার পাতার গল্প শুনলাম। সুধীর বলে, তুমি নাকি ভয়ে সেঁধিয়ে গেছলে—কি কাণ্ড, সুধীরকেও ভয় তোমার!

চিঠিটা ভালো লেগেছিল। ঠাট্টা করে প্রশান্তকে জবাব দিয়েছিলাম, তুমি উদার বটে।

প্রশান্ত লেখে, ফিরে গিয়ে তোমার অন্তত ভালো ভালো পাঁচখানা ছাপা বই দেখতে চাই—লেখায় ফাঁকি দেবে না, খবরদার।

চিঠি মাঝে মাঝে সুধীরও লেখে। লোকটা লিপি রচনায় তেমন পটু নয়। কিন্তু পড়লে হাসি পায়, মনে হয় সামনে বসে কথা বলছে। সেবারে লিখল, এতদিনে এখানে সকলে জেনে গেছে আমি তোমার কর্তার জবরদস্ত বড়ি-গার্ড। তুমি কিছু ভেবো না, আর কটা দিন বিরহ তাপ ভোগ করে নাও, ওকে আমি পরীক্ষা পাশের চূড়োয় চরিয়ে এখানকার

নীলনয়নাদের বুকে হাতুড়ি ঠুকে কলা দেখিয়ে তোমার আঁচলের তলায় পৌঁছে দেব।

আমি লিখলাম, বডি-গার্ডও পরীক্ষা-পাশ না করে এলে আমি তার মুখ দেখব ভেবো না।

বছর খানেক বাদে প্রশান্তর এক চিঠি পেয়ে আমার চক্ষু স্থির। লম্বা চিঠি। রসিয়ে লেখা সেই চিঠির প্রধান সংবাদ, সুধীর হাসপাতালের এক ওয়ার্ডেন ক্লীনারের প্রেমে পড়েছে। ওর জন্যে এখন সে ভয়ানক চিন্তায় আছে। সেদিন নাকি অল্প-স্বল্প ড্রিঙ্ক করে তাকে বলেছে, তুই চন্দ্রাণী-স্বর্গে বিচরণ করগে যা, আমি অ্যাঞ্জেলাকে নিয়ে রসাতলে যাত্রা করব, কেউ ঠেকাতে পারবে না।

চিঠির কতটা সত্যি কতটা কৌতুক আমি ঠিক বুঝে উঠলাম না। সুধীরকে লিখলাম শেষে কিনা মেথরানী—এই কপালে লেখা ছিল তোমার! জবাবে ও গুরুগম্ভীর চিঠি লিখল একখানা। যথা, চিঠি পেয়ে আমার ওপর ওর ভক্তিশ্রদ্ধা চটে গেছে। অথচ আমার কাছ থেকেই সবার আগে সদয় সায় মিলবে আশা করেছিল। সে-মেয়ে আর যাই হোক রানী তো শেষ পর্যন্ত—চন্দ্রাণীর মধ্যেও যুক্তাক্ষরজনিত ভেজাল আছে কিন্তু মেথরানী ভেজালবর্জিত। আর লিখেছে, লেখিকা হয়েও তোমার এমন বুর্জোয়া মেনটালিটি! নীচের পর্যায়ের মানুষদের নিয়ে বড় বড় কথা লেখো অথচ ভিতরখানা এই রকম! তোমার এই চিঠি আমি রেখে দিলাম, আমাদের দেশে যদি দিন আসে কখনো, এই চিঠি তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করব।

প্রশান্তর পরের চিঠিতে আরো বিশদ করে সমাচার এবং শেষ ফলাফল জানা গেল। লিখেছে, সুধীরের পাগলাটে স্বভাবের জন্যেই ওয়ার্ডেন ক্লীনার অ্যাঞ্জেলার ওকে ভালো লেগেছিল। তার ওপর সুধীর ওর আগের পক্ষের ছেলেটার যত্ন করে চিকিৎসা করেছে। ফলে মেয়েটা ওকে ভয়ানক খাতির করা শুরু করল। আর সুধীরও চোখ কান বুজে সেই খাতির গিলতে লাগল। এদিকে একটা লোক অ্যাঞ্জেলাকে পছন্দ করত, কাজের উপলক্ষে সে বিদেশে গেছল। যাবার আগে কথা দিয়েছিল ফিরে এসে সে অ্যাঞ্জেলার দ্বিতীয় স্বামী হয়ে বসবে। কিন্তু ফিরে আসবে কি আসবে না, অ্যাঞ্জেলার মনে সেই সন্দেহ ছিল, আর দুর্ভাবনাও ছিল। সেটা জানতে পেরে সুধীর তাকে আশ্বাস দিয়েছিল, না এলো তো বয়ে গেল, আমি তো আছি।

কিন্তু সেই লোকটা এসেছে। অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে তার অনুরাগপর্ব এখন জমজমাট। খুশি হয়ে সুধীর ওদের দুজনকেই সেদিন একটা পার্টি দিয়েছে।

সাতাশ মাস বাদে একসঙ্গে ফিরেছে দুজনে। সোয়া বছরের মধ্যে গাইনোকোলজির এম. আর. সি. ও. জি. পাস করে প্রশান্ত সেখানকার এক হাসপাতালে হাত পাকিয়েছে। আর ইতিমধ্যে সুধীরও এম. আর. সি. ও. জি. এবং সেই সঙ্গে শিশু চিকিৎসা সংক্রান্ত সব থেকে বড় ছাপ ডি. সি. এইচ. সংগ্রহ করেছে।

ফিরে এসেই সুধীরের তম্বি, তোমাদের পয়সায় গিয়ে তোমার হাসব্যান্ড-এর থেকেও বেশি বিদ্বান হয়ে ফিরেছি, বুঝলে?

আশ্চর্য, আমাদের এত সাধ্যসাধনা সত্ত্বেও এবারে কিন্তু ও আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করল, আলাদা চেম্বার করল। বলল, এক বাড়িতে দু'দুটো দিগ্গজ ডাক্তার থাকলে পসার জমবে

না। তাছাড়া এবারে তোমার হাজব্যান্ডের সঙ্গে আমার কমপিটিশন।

কিন্তু কমপিটিশন না ছাই! মেয়েদের দিক ছেড়ে ও চায়েলড স্পেশালিস্ট হয়েই বসল। অবশ্য দরকার হলেই প্রশান্তকে সে এদিকেও সাহায্য করত।

সত্যিকারের আনন্দের মধ্যেই কেটেছিল দুটো বছর। নিজেদের পসার বাড়ানোর ঝোঁকের ফাঁকে ফাঁকে আমার লেখার শ্রীবৃদ্ধি আর খ্যাতিবৃদ্ধির দিকেও চোখ ছিল দুজনারই। প্র্যাকটিস ভালোই জমে উঠেছে, পয়সার অভাব নেই, প্রচার আর খ্যাতি দুই-ই সহজলভ্য হয়েছে। আমার এক-একটা বই বেরুলে দুজনেই পড়ত সবার আগে। ঘরের লোকের প্রশংসা সহজেই অনুভব করতে পারতাম। কিন্তু সোজাসুজি প্রশংসা সুধীর কমই করত। উল্টে টিপ্পনীই বেশি কাটত, বলত, বড় বেশি স্বপ্নালু ব্যাপার সব, দুই একটা মাটির মানুষের কথা লেখো দেখি।

আমি চোখ পাকাতাম, আমার এরা কিসের মানুষ?

ও জবাব দিত, সন্দেশের খোশা ফেলে খাওয়া মানুষ।

আমার ধারণা, ছেলেবেলার সেই অপরিসীম দারিদ্র্যের ক্ষতটা ওর মনের তলায় থেকেই গেছে। রোগে ভুগে ওর দাদা অনেক আগেই মারা গেছে। শুনেছি বাড়ির অন্য সকলের মুখ দেখে না, কিন্তু মাস গেলে মোটা টাকা পাঠায় সেখানে।

এদিকে পসার যত বাড়তে লাগল আমার মনের তলায় একটা অস্বস্তির ছায়া ততো যেন বড় হয়ে উঠতে লাগল। প্রায়ই মনে হত যে-মানুষটা বাইরে গেছল ঠিক সে-মানুষ যেন ফেরেনি। সুধীর বাইরে থেকে অন্তত একরকমই আছে। কিন্তু ঘরের লোক যে বদলেছে সেটা একটু একটু করে টের পাওয়া যাচ্ছে। তার ভিতরে ভিতরে বড় হবার নেশা ভালোমতো দানা পাকিয়ে উঠেছে। সেটা মন্দ কিছু নয়, কিন্তু নেশার আকার নিলে সবই মাঝে মাঝে অস্বস্তিকর ঠেকে।

বড় হবার নেশাই বটে। অনেক বড় হওয়া চাই, অঢেল টাকার মুখ দেখা চাই। ওদিকের পসার বাড়ছে, সময় কমছে। আমারও কি-রকম যেন লেখা কমছে, অবকাশ বাড়ছে। আলস্যও বাড়ছে, সেই সঙ্গে তলায় তলায় অস্বস্তিও বাড়ছে।

অথচ ফাঁক পেলে সুধীরই মদ খায় দেখি। প্রশান্ত সৌজন্য রক্ষার্থে একটু-আধটু খায়। তাতেও আমার চোখরাঙানিকে সমীহ করে। সুধীর নিজেই বলে, বিলেতের সেই যে মেম-মেয়ের প্রেমে পড়েছিল—সেখান থেকে বাতিল হয়ে মদ ধরেছে। তা নিয়ে ওকে আমি কম গঞ্জনা দিইনি। অথচ মনে মনে আমার কেমন যেন ভয় ওকে নিয়ে নয়, প্রশান্তকে নিয়ে। কিন্তু মুখ ফুটে সে-ভয় প্রকাশ করিনি কখনো।

প্রায় দু-বছর হল দু-বন্ধুতে মিলে জাঁক-জমক করে মস্ত নার্সিং হোম খুলেছে। আর তখনই যেন বড় হওয়ার নেশাটা সময় সময় আমার চোখে বেশি বড় হয়ে উঠেছে।

নার্সিং হোমের ব্যবস্থা-পত্র আদব-কায়দার জাঁক-জমক আছে। সপ্তাহে কম করে দু'দিন আমাকে সেখানে যেতে হয়। রোগিণীদের ফুলের তোড়া দিতে হয়। যারা আসে এখানে নার্সিং হোমের প্রশংসায় তারা পঞ্চমুখ। কিন্তু আসে যারা, তারা প্রায় সকলেই বিশেষ অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে বউ। সুধীর তার নিজস্ব চেম্বারে শুধু চায়েলড্ স্পেশালিস্ট। কিন্তু নার্সিং হোম-এ সে চায়েলড স্পেশালিস্ট আর গাইনোকোলজিস্ট দুই-ই।

টাকা আসছে। আসছেই আসছেই। থোকে এক এক সময় এত টাকাও আসে যে

আমার অবাক লাগে। আর সেই সঙ্গে অস্বস্তিও বাড়ে। ওই নার্সিং হোমের চার্জ বেশি জানি। ব্যবস্থাপত্র যা, সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু এক-এক পেসেন্টের কাছ থেকে পাঁচ সাত দশ বারো হাজার টাকা পর্যন্ত আসে। জিজ্ঞাসা করলে বলে বড় অপারেশন ছিল। কিন্তু কত বড় আমি ভেবে পাই না। সুধীরকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, ও-সব কিসে কি টাকা-পয়সা আসছে বা যাচ্ছে আমি খবরও রাখি না, সে সব তোমার হাজব্যান্ড-এর হেড-এক, আমাকে যা ভাগ দেয় আমি নির্লজ্জের মতো নিয়ে পকেটে পুরি।

লক্ষ্য করেছি, তাকে ভাগ অবশ্য কম দেয় না।

## তিন

টেলিফোনটা ছেড়ে দিয়েই মনে হল অধঃপাতের পথে যাত্রা শুরু হয়েছে আমারও। এইমাত্র টেলিফোনে প্রশান্তকে যা বললাম আমি, সেটা সত্যি নয়। বলেছি, বার শ' টাকার একটা চেক এসেছে আর একটা বেনামী চিঠি এসেছে হুগলী না কোথা থেকে।...বেনামী চিঠির কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওর গলার স্বরে একটু উদ্বেগ কানে ঠেকেছিল আমার। বলেছি, বেনামী চিঠিতে লিখেছে, তোমার বাইরের ব্যবহার যে-রকম মোলায়েম সুন্দর, ভিতরের স্বভাব-চরিত্র সে-রকম নয়। আর বলেছি, সেই সঙ্গে তোমাকে আস্ত একটি কসাইও বলেছে।

এই মিথ্যের জবাবে প্রশান্তরও মিথ্যে বলতে একটুও বাধেনি। চিঠি কোথা থেকে এসেছে শুনেই বলে ফেলল, দিন কয়েক আগে ও-দিকের একটা সিজারিয়ান কেস ডিসচার্জ হয়েছিল। তারপর ঠাট্টার সুরে বলেছিল, কেমন কাঁটার মুকুট পরে বসেছি দেখো...ভালো রসদ পেয়েছ, একটা গল্প লিখে ফেলো।

হ্যাঁ, চেকও এসেছে, চিঠিও এসেছে। চেক নিয়ে আমি এক মুহূর্তও মাথা ঘামাইনি। চিঠি হুগলী থেকে আসেনি, কলকাতা থেকেই এসেছে। আর বেনামীতে আসেনি স্ব-নামেই এসেছে।

লিখেছে শ্রীলেখা চ্যাটার্জী। এই নার্সিং হোমেরই স্মার্ট আর মোটামুটি রূপসী সেক্রেটারী। বয়সে আমার থেকে বছর তিনেক ছোট হবে, অর্থাৎ বছর চব্বিশ বয়েস মেয়েটার। নার্সিং হোমের প্রায় শুরু থেকেই আছে বলতে গেলে। মেট্রন নার্স আর সেক্রেটারী নেবার ব্যাপারে দুই বন্ধুরই একটা বিশেষ দৃষ্টি আছে লক্ষ্য করেছিলাম। সুধীর হেসেই বলেছিল, শুধু কোয়ালিফিকেশন থাকলেই চলবে না, চেহারা-পত্রেরও কিছু চটক চাই আমাদের, বুঝলে?

তখন ঠাট্টা করেছিলাম, চটক তোমার দরকার হতে পারে, সে-রকম মনে ধরলে শেষ পর্যন্ত তোমার ঘরে এনে তুলতে পারবে, ওর কি দরকার?

মনের বাসনাটা তোমাকে তাহলে বলেই ফেলি, চটক দেখে যদি আমার মুণ্ডু ঘোরে তাহলে ফুরিয়েই গেল আর যদি ওর মুণ্ডু ঘোরে তখন আমি অনায়াসে তোমাকে নিয়ে সটকান দিতে পারব, সেটা তখন খুব একটা নীতিবিরুদ্ধ হবে না।

আমি ওর মাথায় জোরেই একটা থাপ্পড় বসিয়েছিলাম। আমিও হেসেছি ওরাও হেসেছে। তাছাড়া মনে কোনো দাগ পড়বে কি, ওকে আমার থেকে বেশি আর কে

চেনে? হেসেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু তোমাদের কারবার তো সব মেয়েছেলে আর শিশুর সঙ্গে—চটকদার মেয়ে দিয়ে কি হবে?

সুধীর তক্ষুনি জবাব দিয়েছে, অন্য জুনিয়র অ্যাসিসট্যান্টদের মেজাজ ভালো থাকবে, আমাদের মেজাজ ভালো থাকবে, তাছাড়া মেয়ে পেসেন্টরা কেউ পুরুষ-বিহীন আসে না বড়—তাদের মন ভরবে, চোখ তৃপ্ত হবে, ফলে নিজেদের কেস ছেড়ে আত্মীয়-স্বজনের কেসও এখানে ঠেলে পাঠাবে।

ওদের উদ্দেশ্য আমি জানি। আসল কথা, ওরা যাকে বলে একটা মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়—বাইরে যেমন দেখেছে। বেছে বেছে কোয়ালিফিকেশনের সঙ্গে মোটামুটি সুশ্রী মেয়ে দেখেই নিয়েছে। কিন্তু চটক বলতে ওই একজনেরই। ওদের সেক্রেটারী শ্রীলেখা চ্যাটার্জীর।

মেয়েটাকে প্রথম দিন দেখেই কেমন চেনা মুখ মনে হয়েছিল আমার। সুধীর পরিচয় করিয়ে দিতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনার মুখখানা চেনা-চেনা লাগছে—দেখেছি কোথাও?

শ্রীলেখা মিষ্টি হেসে জবাব দিয়েছিল, আপনি বলতে হবে না, তুমি বলুন। আপনি আমাকে দেখেছেন কিনা বলতে পারব না. আপনাকে আমি অনেক দেখেছি।

—কোথায় বলো তো?

—অনেক মিটিং-এ, ফাংশানে...আপনাকে না চেনে কে।

মেয়েটার কথা-বার্তায় বেশ খুশি হয়েছিলাম সেদিন। তার পরেও ভালো লেগেছে। আমি গেলেই হাসি মুখে কাছে এসেছে, মিসেস রায় না বলে দিদি বলে ডেকেছে গোড়া থেকেই। তাই শুনে আবার দুই বন্ধুতে বাড়িতে হাসাহাসি করেছে আর মন্তব্য করেছে, মেয়েটা ঝানু বটে। গোড়ায় গোড়ায় ভাবতাম কোথায় দেখেছি মেয়েটাকে। পরের হৃদ্যতায় আর সে-চিন্তা মাথায় আসত না।

চিঠি এই শ্রীলেখার।

এতবড় চিঠি দেখে প্রথমে অবাক হয়েছিলাম। কে লিখল আগেই নামটা দেখে নিয়ে আরো অবাক। চিঠি পড়তে পড়তে আমার সর্বাঙ্গ সিরসির করেছে।

খেতে বসে চিঠিটা আবার খুললাম। বাড়ি ফেরার আগেই এটা পুড়িয়ে ফেলতে হবে, বা একটা কিছু করতে হবে। চিঠিটা দ্বিতীয় দফা পড়তে খাওয়ার কথা মনেও থাকল না।

চন্দ্রাণীদি,

প্রথম দিন আমাকে দেখেই আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মুখ চেনা লাগছে, কোথায় যেন দেখেছি...মনে আছে? আমি বরাবর স্মার্ট মেয়ে, অবস্থাগুণে আগের থেকেও ঢের বেশি স্মার্ট হয়েছি। তাই কোথায় দেখেছেন আপনি আজও জানেন না।

আপনি যে বছর কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে বেরিয়ে গেলেন, সেই বছর আমি স্কুল ছেড়ে ওই কলেজে ঢুকি। মাত্র মাস কয়েকের জন্য আপনি আমাকে ওই কলেজে দেখেছেন। আমি স্মার্ট মেয়ে, অনেকের চোখে রূপসীও, তাই হয়ত আপনিও আমাকে লক্ষ্য করেছিলেন। নইলে, কলেজে আপনার তখন যা নাম-ডাক নীচু ক্লাসের মেয়েরা আপনার কাছে ঘেঁষতে পেত না। দূর থেকে আপনাকে দেখত আর কত যে ভক্তি শ্রদ্ধা করত সে-শুধু তারাই জানে।

আপনি কলেজ ছেড়ে য়ুনিভার্সিটিতে ঢোকার ছ'মাসের মধ্যে কলেজের একটি মেয়েকে নিয়ে কাগজে-কাগজে এক কেলেংকারীর খবর ফলাও করে ছাপা হয়েছিল, মনে আছে?...পয়সাঅলা এক অবাঙালী ব্যবসায়ীর ছেলে ষড়যন্ত্র করে কলেজের এক রূপসী মেয়েকে কিডন্যাপ করে কোথায় নিয়ে চলে গেছে কেউ জানে না। বাঙালী ছেলেরা তখন ক্ষেপে গিয়ে অবাঙালী ছেলেদের ওপর চড়াও হচ্ছিল। সে ধরা পড়তে কাগজে আবার ফলাও করে কোর্ট-নিউজ বেরুলো, সেই মেয়ে স্বীকার করেছে, কেউ ষড়যন্ত্র করে তাকে অপহরণ করে নি, মেয়েটি নিজে স্বেচ্ছায় তার সঙ্গে চলে গেছল।

আমি সেই মেয়ে শ্রীলেখা চ্যাটার্জী।

কোথায় দেখেছেন জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও আমি গোপন করেছি, কারণ কলেজের নাম আর আমার নাম এক হলে বাকিটুকু আপনার মনে পড়ত।

আমার বাবা স্বল্পবিত্তের মানুষ ছিল। ভয় পেয়ে ওই ছেলেটি কাপুরুষের মতো আমায় ত্যাগ করার পর ঘরেও আমার জায়গা হয়নি। তারপর দুটো বছর আমার কি ভাবে কেটেছে আমিই জানি। পুরুষের বাসনা নিম্নগামী হলে সে-কি বীভৎস তাও জানি। শেষ পর্যন্ত আমার আশ্রয়দাতা উত্তরপ্রদেশের এক প্রৌঢ় শিক্ষিত অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক। তার কাছে থেকেই আমি বি. এ. পাস করি। তখন আমার সন্তান-সম্ভাবনা, কিন্তু সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক, যার শিক্ষা ছিল, দয়া-মায়াও ছিল—নিজের এই দুর্বলতাটুকু জানাজানির ভয়ে সে নিষ্ঠুর। আমি স্মার্ট মেয়ে হলেও আসলে এমন বোকা যে আমি তার কাছ থেকে স্ত্রীর স্বীকৃতি আশা করেছিলাম আর মা হতে চেয়েছিলাম। না, সে-সন্তানকে ভূমিষ্ঠ হতে দেওয়া হয়নি—অনেক টাকার বিনিময়ে সেখানকার এক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সব সম্ভাবনা নির্মূল করেছে।

সেই থেকে আবার আমি আমার ডিগ্রী আর স্মার্টনেসের ওপর নির্ভর করে জীবিকার সন্ধানে নেমেছি। কাজ পেয়েছি, আরো ভালোর সন্ধান পেলেই সেটা ছেড়ে নতুন কাজে ঢুকেছি। আপনাদের নার্সিং হোমে আমি পাঁচ শ' টাকা মাইনে পাই, আরো বড় জায়গায় সাড়ে সাত শ' টাকার চুক্তিতে এই মাসের শেষে আমি এখানকার কাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আপনার স্বামী ডক্টর রায় মাইনে বাড়ানোর আভাসও দিয়েছেন, কিন্তু আমি এখন পর্যন্ত রাজী হইনি।

...তিনি আমাকে রাখতে চান, কারণ আমি তাঁর বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছি। মাঝে মাঝে এমন রাস্তায় চলতে হয় তাঁকে যার দরুন তাঁর বিশ্বস্ত মেট্রন আর সেক্রেটারী দরকার।

কেন যাবার আগে আপনাকে এ চিঠি লিখছি আপনি বুঝতে পারছেন কিনা জানি না। এই দু'বছরে আমি আপনাকে আগের থেকেও কত বেশি ভক্তি করি শ্রদ্ধা করি আপনি জানেন না। ভালও বাসি। আপনার সমস্ত লেখা আমি পড়ি, আর দেখি আপনার ভিতরটা কত সুন্দর, কত স্নিগ্ধ। আপনার রুচি-বোধের সঙ্গে কোনো কালো জিনিসের আপোস নেই। আপনার সমৃদ্ধি কামনা করি, কিন্তু কোনো কালো রাস্তা ধরে সেটা এলে আমার জ্বালা ধরে, অসহ্য ঠেকে। আপনি দেখছেন অজস্র-ধারে টাকা আসছে, কিন্তু তার সবটাই সাদা রাস্তা ধরে আসছে না সে-খবর আপনি রাখেন? এখানে বেশির ভাগই মা হতে আসে, কিন্তু পুরুষের বাসনার চিহ্ন মুছে দেবার দায়ে মা না হতেও যে আসে অনেকে—সে-খবর রাখেন? এ ছাড়াও আমার কাছে আরো অনেক অভিযোগের নজির

আছে, যা শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। জুনিয়র ডাক্তারদের দু-একজন আমাকে তাদের প্রিয়পাত্রী ভাবে, নিজেরাও আমার চোখে প্রিয় হতে চায়। এই দুর্বলতার ফাঁকে আমি কিছু কিছু খবর সংগ্রহ করে থাকি। সে-সবের বিস্তৃত ফিরিস্তি থাক, আমার শুধু অনুরোধ, আপনার ভেতর-বার সুন্দর বলেই ডক্টর রায়কে আপনি সুন্দরের দিকে টেনে আনতে চেষ্টা করুন। নইলে আপনার ভবিষ্যৎ ভেবেও আমার ভয় হয় কেন জানি না। আমার ভেতরে আগুন জ্বলছেই, আমি স্মার্ট মেয়ে বলেই সে-আগুন কেউ দেখবে না। কিন্তু আপনি? আপনি তো পলকা স্মার্ট নয় আমার মতো!

—শ্রীলেখা চ্যাটার্জী

খাওয়া ফেলে আমি উঠে পড়েছি এক সময়। চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলব কিনা ভেবেছি বার কয়েক। পরে কি ভেবে ট্রাঙ্কে রেখে দিয়েছি।

শ্রীলেখার চিঠির প্রতিটি বর্ণ আমি বিশ্বাস করেছি। কেন করেছি আমি জানি না। অনেক দিনের একটা দুর্বোধ্য অস্বস্তি আজ একেবারে স্পষ্ট হয়ে আমাকে চারদিক থেকে ছেঁকে ধরেছে। ভিতরটা সেই থেকে চিনচিন করে জ্বলছে। জ্বলছেই। ঘরে আর টেকাই গেল না। বেরিয়ে পড়লাম।

রাস্তায় নেমে ট্যাক্সি ধরলাম একটা। শ্রীলেখার বাড়ি চিনি না। ফ্ল্যাটের নম্বর জানা আছে। ঘড়িতে সময় দেখলাম। আরো ঘণ্টা দুই পরে তার ডিউটি। সকালে সাতটা থেকে এগারোটা আর বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা তার নার্সিং হোমে হাজিরার সময়।

আমি গিয়ে হাজির হব, শ্রীলেখা কল্পনা করতে পারেনি। বড় জোর তাকে ডেকে পাঠাব ভেবেছিল হয়ত। আমাকে দেখেই থতমত খেল একপ্রস্থ।—কি আশ্চর্য, আপনি?

—খুব আশ্চর্য বলছ?

—না...ভিতরে এসে বসুন।

ভিতরে এলাম। সাজানো-গোছানো একজনের ঘর। চেয়ারে বসলাম। ও শয্যায়। বললাম, আমাকে ভালোবাসো, ভক্তি-শ্রদ্ধা করো সে-জন্যেই চিঠিটা লিখেছ না কি আমি এত ভালো আছি দেখে ভিতরে ভিতরে কিছু যন্ত্রণাও আছে?

শ্রীলেখা গম্ভীর তক্ষুনি। এই মুখ দেখেই বোঝা যায় মেয়েটা কাউকে পরোয়া করে না বড় একটা। ফিরে জিজ্ঞাসা করল, যন্ত্রণা মানে হিংসে?

চোখে চোখ রেখে আমি মাথা নাড়লাম। অর্থাৎ তাই কিনা আমার জিজ্ঞাস্য।

আপনি প্রমাণ চান?

তেমনি চেয়ে থেকে আমি মাথা নাড়লাম। অর্থাৎ চাই।

মেয়েটা এমনিতেই ছটফটে একটু। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে আমার চারদিকে চক্কর খেল একপ্রস্থ। তারপর সামনে দাঁড়াল। বলল দুই একজন ডাক্তারকে ডাকতে পারি, কিন্তু আপনার সামনে তারা হয়ত স্বীকার করবে না, কারণ তারাও বড় হবার স্বপ্ন দেখে। দুই একজন মেয়ের ঠিকানা দিতে পারি, কিন্তু যে-ব্যাপার গোপন করার জন্য তাদের পুরুষেরা হাজার হাজার টাকা খরচ করে তারা আপনার কাছে সত্য স্বীকার করবে না। যাক, আপনি যখন হিংসে ভাবতে পেরেছেন তখন আমার আর কিছু বলার নেই, আপনাকে যেটুকু জানাবার জন্য আমার ভিতরটা অস্থির হয়েছিল আপনাকে জানিয়েছি, আপনি বিশ্বাস করুন বা না করুন আমার কিছু যায় আসে না।

—তোমার অনেক যায় আসে। আমার গলার স্বর উঁচু নয়, কিন্তু কঠিন।—আমি অবিশ্বাস করলে নিজের হাতে নিজের নাম দিয়ে যে-চিঠি লিখেছ সেটা কোর্টে যাবে। প্রমাণ যে করতে পারবে না সে তুমি নিজেই বললে। মানহানির মামলায় তোমার সাড়ে সাত শ' টাকা মাইনের নতুন চাকরিই শুধু হাওয়ায় ভেসে যাবে না, তোমার ভবিষ্যৎ তার থেকেও অন্ধকার হবে বোধহয়।

শ্রীলেখা থমকে মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। শয্যায় বসল আবার। স্তব্ধ চাউনি। তারপরেই ঝলসে উঠল যেন। বলল, ঠিক আছে, কোর্টে গিয়ে কেস করুন তাহলে, আমি খারাপ মেয়ে আবার না-হয় খানিকটা তলিয়ে যাব। কিন্তু আপনার স্বামী তাঁর সুনামের নার্সিং হোম নিয়ে এই নাড়া-চাড়া বরদাস্ত করবেন বলে আমার মনে হয় না। আপনি চেষ্টা করুন—

আবার খানিক চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে গলার সুর পাল্টালাম আমি। বললাম, আমি সে চেষ্টা করব বলে আসিনি, তোমার সব কথা আমি বিশ্বাস করেছি বলেই এসেছি, তোমার ভিতরে এখনো আগুন জ্বলছে বিশ্বাস করেছি বলেই এসেছি, আর সেই আগুনে পুড়ে-পুড়ে তোমার ভিতরটা সোনা হয়ে গেছে ভাবতে পেরেছি বলে এসেছি।

বিপরীত বিস্ময়ে শ্রীলেখা বিমূঢ় হঠাৎ। চেয়ে আছে। একটা উদগত অনুভূতি চাপতে চেষ্টা করে মাথা ঝাঁকালো। তারপর অস্ফুট স্বরে বলল, না না, আমি খুব খারাপ, আমার ভিতরে কত যন্ত্রণা জানেন না।

যন্ত্রণা থাকলে কেউ খারাপ হয় না। তোমার ওপর রাগ হয়েছিল, আমার মধ্যেও যন্ত্রণা ঢুকিয়ে দিয়ে তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে চাও বলে।

কি বলতে চাই সঠিক ঠাওর করতে পারল না। চুপচাপ একটু ভেবে বললাম, আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো, আজ থেকে আমি তোমার সত্যিকারের দিদি।...আমার অবাক হবার মতো তোমার কাছে আরো অভিযোগের নজির আছে লিখেছ—সেগুলো কি?

আরো খানিক চেয়ে রইল। বিশ্বাস করল আমাকে। ওর ভিতরটা এত শূন্য যে বিশ্বাস করে আঁকড়ে ধরতেই চায় কাউকে। একে একে যে-সব কথা বলল শুনে আমি স্তব্ধ। অবশ্য, ও নিজে ডাক্তার বা মেট্রন নয়, তাই হলপ করে বলতে পারবে না—কিন্তু ওখানে থেকে আভাসে ইঙ্গিতে যেটুকু বুঝেছে তা অবিশ্বাসও করেনি।

...এক পয়সাঅলা পেসেন্টের কেস জানে, যার পঞ্চাশ টাকার ইনজেকশনে অসুখ সেরে যেতে পারত বলে কানাঘুষা শুনেছে, কিন্তু টিউমার বলে তাকে দু'হাজার টাকার অপারেশনের ধাক্কায় ফেলা হয়েছে। পয়সা আছে বুঝলে তিন দিনের কেস দশ দিনে ফয়েসলা হয় বলে তার বিশ্বাস। এমন কথাও শুনেছে, সিজারিয়ান দরকার নেই, অন্তত অপেক্ষা করে দেখা চলত—কিন্তু নির্দ্বিধায় অপারেশন করে মোটা টাকা রোজগার হয়ে থাকে। এক পেসেন্টের ক্যানসার সন্দেহ করা হয়েছিল, একুশ দিন তাকে আটকে রাখার পর ত্রাসে প্রায় পাগল হয়ে দেড় হাজার টাকার ওপর বিল মিটিয়ে সেই পেসেন্ট অন্যত্র গিয়ে বড় ডাক্তার দিয়ে নিজেকে পরীক্ষা করিয়েছে। তারপর রীতিমতো গালাগাল করে নার্সিং হোমে চিঠি দিয়েছে। সেক্রেটারী হিসেবে সে-চিঠি আমি খুলে পড়েছি। ডক্টর রায় সেটা পড়ে ছিঁড়ে ফেলেছেন, হেসে বলেছেন, যত সব পাগলের কাণ্ড, আমরা তো

সন্দেহ করেছিলাম—ক্যানসার হয়েইছে সে-কথা তো বলিনি।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর ওর সঙ্গে আরো একটু অন্তরঙ্গ হবার আশায় বললাম, এক পেয়ালা চা খাওয়াতে পারো?

ব্যস্ত হয়ে শ্রীলেখা সেখানেই চা করতে বসল। ফলে আমি ভাবার অবকাশ পেলাম একটু।

তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, এ-রকম যে হচ্ছে ডক্টর সুধীর দত্তও জানেন তো?

ডক্টর দত্তর কথা ছেড়ে দিন, তিনি এক অদ্ভুত মানুষ—কোনো কিছুতেই তিনি সে-ভাবে মাথা দেন না, দিলেও ডক্টর রায়ের ওপর দিয়ে কিছুই ভাবতে চান না।

অদ্ভুত মানুষ বলতে তুমি ভালো বলছ না খারাপ বলছ?

ভালো। খুব ভালো।...গরিব পেসেন্টও তো এক-আধজন এসে পড়ে। এই তো সেদিন এক পেসেন্ট এসেছিল যার সিজারিয়ান দরকার—অথচ টাকার জোগাড় নেই। কত টাকা লাগবে জানিয়ে ডক্টর রায় বাইরের কলে বেরিয়ে গেছলেন—মেট্রন এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করল কি হবে, কেস খারাপের দিকে গড়াচ্ছে। ডক্টর দত্ত তখন এসে পড়তে তাঁকে জানালাম। কেস দেখেই তিনি অপারেশন করলেন। আমি টাকার কথা বলতে হেসে ঠাট্টা করলেন, আমার শেয়ার থেকে কেটে নিও।

ভিতরটা আমার চিনচিন করতে লাগল। চায়ের পেয়ালা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে শ্রীলেখা আবার বলল, আসলে ব্যাপার কি জানেন, ওই ভদ্রলোকও যে দুই একটা অন্যায় অপারেশন করেন না এমন নয়, যা তাঁকে করতে বলা হল করে দিয়ে খালাস, কোনোরকম ন্যায় অন্যায়ের ভাবনা চিন্তাই নেই তাঁর। এমনই হয়েছে এখন উনি খারাপ কিছু করে বসলেও খারাপ কেউ ভাবে না।

চা খেতে খেতে চিন্তাচ্ছন্নের মতো কাটালাম খানিক। কিন্তু কিছুই ভাবছিলাম না। নিজেকেই ঠাণ্ডা করতে চাইছিলাম।—তুমি নোটিস দিয়েছ?

মুখে জানিয়েছি।...ডক্টর রায় আপত্তি করছেন, মাইনে বাড়াবার কথা বলছেন—

কত বাড়ায় দেখো, বাদবাকিটা তুমি আমার কাছ থেকে নিও, মোট কথা ওই সাড়ে সাতশই পাবে তুমি, তার থেকে বেশিও দিতে পারি—কিন্তু এখান থেকে যাওয়ার চিন্তা তোমাকে ছাড়তে হবে।

না চন্দ্রাণীদি, না—আমি শুধু টাকার জন্যেই যাচ্ছি না, আমার মাথাই কেমন হয়ে গেছে, কেউ গণ্ডগোলের রাস্তায় চলেছে মনে হলেই কি রকম অসহ্য লাগে—ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু আমাকে এই যন্ত্রণার মধ্যে রেখে তুমি পালিয়ে যাবে? তাহলে জানালে কেন? আমাকে যদি তুমি একটুও ভালোবাসো তাহলে যাবার কথা আর মুখেও আনবে না...এরপর তোমাকেই আমার সব থেকে বেশি দরকার। তুমি চলে যেতে চাইলে তোমাকে আমি শত্রু ছাড়া আর কিছু ভাবব না।

দ্বিধায় পড়ে শ্রীলেখা জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু আমি থেকে আপনার কি কাজে লাগব?

অনেক—অনেক কাজে লাগবে, তুমি না থাকলে আমি অন্ধকার দেখব। কিন্তু সে-সব পরের কথা। আজই তুমি ডক্টর রায়ের সঙ্গে মাইনে সম্পর্কে বোঝাপড়া করে নাও, তাহলে কেউ জানবে না আমি তোমাকে জোর করে আটকেছি। সুধীর দত্তও না। তারপর

টাকা যদি আরো বেশি চাও তো আমি দেব—কিন্তু কারো কিছু জানার দরকার নেই। এরপর যখন দরকার হবে তোমার সঙ্গে আমি এখানেই দেখা করব।

ওকে আর ভাবনা চিন্তার অবকাশ না দিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম।

## চার

তিন মাস হল আমি একটা মুখোশ পরে কাটাচ্ছি।

সহজতার মুখোশ। স্বাভাবিকতার মুখোশ। এর একটা যন্ত্রণা আছে যা ভেতরটা কুরে খায়। আমি যদি রাগারাগি চেঁচামেচি করতে পারতাম তাহলে হয়ত এর থেকে সুস্থ থাকা যেত।

আমার কথামতো শ্রীলেখা থেকে গেছে। তার সাত শ' টাকা মাইনে ঠিক হয়েছে। ঘাটতির বাকি পঞ্চাশ টাকা আমি দিতে চেয়েছিলাম সে নেয়নি। ও আমার দূত। খবর যোগাচ্ছে আমাকে। এতে ওর এত উৎসাহ, এত চাপা উদ্দীপনা যে মনে হয় ওকে আগের মাইনেয় নামিয়ে আনলেও ও শুধু এই সংগোপন দায়িত্বটুকু পালন করার জন্যেই থেকে যাবে। গোড়ায় গোড়ায় আমি গেছি ওর ওখানে। ফাক বুঝে ও আমাকে টেলিফোন করত, একবার দেখা হলে ভালো হয়। আমি যেতাম। কিন্তু ওর এই দেখা করার তাগিদটা ঘন ঘন হয়ে উঠতে আমার হাঁপ ধরার দাখিল। এরপর আমি ওকে সময় দিতাম, এই সময় এসো।

খবর থাকলে সেটা জানার ঝোঁক আমারও কম নয়। কিন্তু যে কাজের জন্য আমি লাগিয়েছি ওকে সেটা যে আমার দিক থেকে কত মর্মান্তিক ও বোধহয় কল্পনাও করতে পারত না। অতি তুচ্ছ ব্যতিক্রমও ওর কাছে তুচ্ছ নয়। শ্রীলেখা যা বলতে আসে আমার কাছে সেটা কতখানি অবাঞ্ছিত তা নিয়ে ও মাথা ঘামায় না। তাই অনেক সময় আমার মনে হয় ও তিলকে তাল করছে না তো?

ও যে-সব খবর দেয় আমি একটা নোটবইয়ে লিখে রাখি। মাজারি সাইজের একটা নোটবইয়ের আধাআধি ভরাট হয়ে গেল। কবে কোন পেসেন্টকে কি সংশয়জনিতভাবে চিকিৎসা করা হয়েছে, কত টাকা নেওয়া হয়েছে, নার্সিং হোমের তহবিলে কোন্ কোন্ খাতে মোটা অঙ্কের টাকা আসছে, কখন কি বিসদৃশ খবর শ্রীলেখার কানে এসেছে, স্ত্রীর অগোচরে এবং স্বামীর প্ররোচনায় কোন্ মহিলার দ্বিতীয় বা তৃতীয় সন্তান লাভের সম্ভাবনা নির্মূল করা হয়েছে—এ-সব তারিখ দিয়ে দিয়ে আমার সেই খাতায় লেখা আছে।

আমার ক্লান্তি ধরে আসছিল। এ-সব দিয়ে আমি কি করব জানি না। ঘরের লোকের দিকে আমি তীক্ষ্ণ নজর রেখেছি। তেমন কিছু ব্যতিক্রম আমার চোখে পড়ে না। নার্সিং হোমের সম্প্রসারণ নিয়ে একটু বেশি ব্যস্ত। নতুন একটা ব্লক প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অপারেশন থিয়েটার ঢেলে সাজানো হচ্ছে। লেবার বা স্ত্রী-রোগ সংক্রান্ত পেসেন্ট ছাড়াও বাইরের সার্জন ইচ্ছে করলে এখানে কেস এনে এবং রেখে অপারেশন করতে পারবে।

ওদের ব্যস্ততা দেখে মাঝে মাঝে আমি আগের মতই ঠাট্টা করি। সেদিন বললাম, নার্সিং হোম নার্সিং হোম করে অস্থির দেখি সর্বদা—ঘর বলে কিছু নেই?

প্রশান্ত বলল, তুমি কুঁড়ে হয়ে গেছ—লেখা কমিয়েছ কেন?

জবাব দিলাম, সুধীর বলে আমার লেখার বিষয়বস্তু হাওয়ায় ভাসে, তাই বাস্তব বস্তু খুঁজে বেড়াচ্ছি।...নার্সিং হোম নিয়ে লিখলে কেমন হয়?

সত্যি কিনা জানি না, আমার মনে হল প্রশান্ত যেন সচকিত একটু।—সে তো আরো অবাস্তব হবে, নার্সিং হোম সম্পর্কে তুমি জানো কি?

সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ভিতরে আমিও যেন নাড়াচাড়া খেলাম একপ্রস্থ। ভিতর দেখার উদগ্র তাড়না একটা। কিন্তু তার ওপর দিয়ে সহজতার প্রলেপ ছড়ানো যে কত শক্ত, আমিই জানি। আমি চাই গলার স্বরেও কৌতুক ঝরুক। বললাম, এমন দু'দুটো নার্সিং হোম বিশারদ আমার হাতের মুঠোয়, আমার জানতে কতক্ষণ লাগবে? রসদ তোমরা যোগাবে—

সুধীর সিগারেট টানছিল, হাসছিল মিটিমিটি আর শুনছিল। এবারে ওর যেন উৎসাহ দেখা গেল। বলে উঠল, এবারে লেখার ছিঁচকাঁদুনি ছেড়ে বুদ্ধিমতীর মতো কিছু ভাবতে শুরু করেছ দেখা যাচ্ছে। ওয়ান্ডারফুল হবে—তুমি লেখো, আমি মেটিরিয়াল সাপ্লাই করব। ... কিন্তু আমরা কত সময় কত রকমের কাণ্ড করি জানলে যে তোমার আবার নরম স্নায়ুতে ঘা পড়বে!

আমি আকাশ থেকে পড়লাম যেন, সে-রকম কাণ্ডও আবার করো নাকি তোমরা!

—আলবত করি। পয়সা ছড়ানো দেখলে কেউ না কেউ ঘরে তুলবেই—যে না তোলে সে বোকা।

—তাহলে আমি ধাক্কা খাব কেন?

ঠিক এই জায়গাতেই প্রশান্ত বাধা দিল। বন্ধুর উদ্দেশে আধাবিরক্তির সুরে বলল, কি বাজে বকিস ঠিক নেই। আমার দিকে ফিরল, সাদাসিধে ভাবেই বলল, তুমি যদি ডাক্তার-লেখিকা হতে তাহলে বলতাম লেখো—মাঝখান থেকে লোক হাসাবে, আমার মনে হয় যা নিয়েই লেখো তার ভেতরে ঢোকা চাই।

উৎসাহের অভাব নেই যেন আমার, অবুঝপনারও নয়। সাগ্রহে প্রস্তাব করলাম, কেন, আমি যদি কিছুদিন তোমাদের নার্সিং হোমেই থাকি—ভিতরে ঢুকতে পারব না? আমি তো আর ডাক্তারী শাস্ত্র লিখতে যাচ্ছি না—

—মাথা খারাপ নাকি! যুক্তির দিকে না গিয়ে প্রশান্ত সোজাসুজি প্রস্তাবটা নাকচ করে দিল।

ছদ্ম-গাম্ভীর্যে সুধীর বলল, তুমি লিখবে বলে আমরা আমাদের ট্রেড সিক্রেট ফাঁস করতে রাজী নই।

ভিতরে ভিতরে আঁচড় পড়ছে। তার জ্বালা আছে, যন্ত্রণা আছে। প্রকাশ নেই! আমার নোটবইয়ে যা-সব লেখা আছে সেগুলো আমি লেখার কাজে খাটাব, এমন চিন্তা আগে কখনো মাথায় আসেনি। কিন্তু মনের তলায় এখন সেই লোভই যেন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। তখনকার মতো সেটা বাতিল করেছি।

আমাদের বিয়ে হয়েছে আজ ছ' বছর। এর মধ্যে একটু-আধটু মান-অভিমানের ব্যাপার কখনো ঘটেনি এমন নয়। কিন্তু সে-সব এত তুচ্ছ যে মনের ওপর এতটুকু দাগ কাটেনি কখনো। কিন্তু আবার একটা সামান্য ঘটনায় মানুষটা সেদিন হঠাৎই যেন আমার সম্পর্কে সজাগ একটু।

ঠিক যা আমি চাইনি।

আমার পরিচিত লেখকদের কারো স্ত্রীদের স্বাস্থ্যগত ব্যাপারে কোনোরকম সমস্যা উপস্থিত হলে তারা সোজাসুজি আমাকে টেলিফোন করেন, তারপর নির্দেশমতো স্ত্রীকে নিয়ে বাড়িতে বা নার্সিং হোমে দেখিয়ে যান। অস্বীকার করব না, কোনোরকম ফী-র আশা না রেখেই প্রশান্ত যত্ন করে দেখে, ভেবেচিন্তে পরামর্শ দেয়। কেউ কেউ ফী দিতে এলে হাসি মুখে সে পাল্টা অনুযোগ করেই ফী দেবার ইচ্ছে বাতিল করে দেয়।

সেদিন এক লেখক ভদ্রলোক অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে একবার বাড়িতে এসেছিল। ভদ্রলোক ওরই বয়সী, আর তার স্ত্রীটি আমার থেকে কিছু ছোট হবে। লেখকদের মধ্যে ইদানীং এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার একটু বেশি খাতির হয়েছিল, কারণ তাঁর লেখার মধ্যে বলিষ্ঠ হৃদয়ের খবর মেলে। তাঁর শেষের দুখানা বই পড়ে আমি নিজে থেকে চিঠি লিখে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম, এবং সস্ত্রীক বাড়িতে ডেকে চা খাইয়েছিলাম।

সম্প্রতি স্ত্রীটিকে নিয়ে তাঁর একটু সমস্যা দেখা দিয়েছে। তিন বছর আগে অর্থাৎ স্ত্রীর যখন তেইশ বছর বয়স, ছেলে হতে গিয়ে মহিলা ভয়ানক কষ্ট পেয়েছিল। তখন বাইরে ছিল, সেখানকার হাসপাতালের ব্যবস্থাও ভালো ছিল না। মেয়ে হয়েছিল, ফরসেপের আঘাতে হোক বা যে কারণেই হোক, বাঁচেনি। তিন বছর বাদে আবার তার সন্তান-সম্ভাবনা। অবশ্য তার ঢের দেরি এখনো। কিন্তু মহিলা এখন থেকেই কেমন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। প্রথম বারের সেই যাতনা আর অঘটন ভুলতে পারেনি। উল্টো-পাল্টা কথা বলে, তার সবটাই ভয়-মেশানো। এবারে যা হবার হয়ে গেলে পরে আর ছেলে-পুলের লোভ নেই—তাও ঘোষণা করেছে, এবং একই সঙ্গে অপারেশন রুখে সেই সম্ভাবনা বাতিল রুখে দেবার বায়না ধরেছে, ইত্যাদি।

এসব আলোচনায় আমার সামনে বসে থাকাটা সংকোচের ব্যাপার। যে কোনো অছিলায় উঠে যেতে পারতাম। কিন্তু তা না গিয়ে বসেই ছিলাম। একে লেখিকা, তার ওপর ডাক্তারের বউ, পরিচিত জনের এই গোছের সমস্যার আলোচনায় উপস্থিত থাকা যেন জল-ভাত ব্যাপার আমার কাছে, উল্টে সতীর্থ লেখকের সমস্যা সহানুভূতি সহকারে শোনাটাই যেন স্বাভাবিক।

কিন্তু আমার বিশেষ লক্ষ্য ঘরের লোকের দিকে কেন, নিজেও সঠিক জানি না হয়ত তখনো।

চেয়ে চেয়ে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসককেই দেখছি আমি। তার কথা শুনছি। একটু চুপ করে থেকে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করল, আপনাদের বিয়ে হয়েছে কতদিন?

—তা অনেকদিন হবে, ওর তখন বছর আঠের বয়েস।

—আপনার স্ত্রীর সেই প্রথম সন্তান হয়েছিল তেইশ বছর বয়সে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কেন?

একেবারে চাঁছাছোলা প্রশ্ন। লেখক ভদ্রলোক হঠাৎ যেন বিব্রত একটু। কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। বলল, তেইশ বছর তো খুব একটা বেশি নয়...

—বেশি নয়, কিন্তু খুব কমও নয়। কারো কারো ক্ষেত্রে বেশিই বলব। একটা জিনিস কি জানেন, এ-সব জটিলতা আগে এতটা ছিল না। ষোল সতের আঠেরয় যাদের

ছেলেপুলে হয়ে যায়, তাদের বেলায় দেখবেন সব থেকে কম ঝামেলা। আর মনের দিক থেকেও তারা অনেক সবল থাকে।...যাক, ওই দুর্ঘটনার তিন বছর বাদে আবার এই সন্তান-সম্ভাবনা বলছেন, এই লম্বা গ্যাপটাও বোধ হয় আপনাদেরই ইচ্ছাকৃত?

ভদ্রলোকের অপরাধী মুখ। জবাব দিয়ে উঠতে পারল না। আমি প্রশান্তর দিকে চেয়ে আছি। তার চাউনিতে অভিযোগ, অভিজ্ঞতা-ঠাসা মুখ। বলল, খুব অন্যায় করেন, প্রত্যেক বিষয়েরই একটা সায়েন্স আছে, সেটা না জেনে আপনারা নিজেরাই ডিসিশান নিয়ে বসেন...

এরপর পেসেন্ট সম্পর্কে নির্দেশ আর তাকে নার্সিং হোমে দেখাবার তারিখ দিতে ভদ্রলোক বিদায় নিল।

আমি প্রশান্তর দিকে চেয়ে আছি। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যে তাতে আমারও সন্দেহ নেই।

সে-ও আমার দিকে ফিরল।—কি?

অর্থাৎ আমার চাউনিতেই এমন কিছু ছিল যার জন্য এই প্রশ্ন।

—না...। আয়নায় না দেখলেও জানি আমি হাসছিলাম অল্প অল্প।—এ ভদ্রলোকের সঙ্গে তুমি একটু ব্যবসাই করলে বোধহয়?

সে অবাকই একটু।—কি রকম?

—সতেরয় বিয়ে করে সকলেরই যদি তেইশে ছেলেপুলে হয়, আর তারপরেও যদি তিন বছর কাটিয়ে দেয় তাহলে তোমাদের ব্যবসার অসুবিধে না?

—কি যে বলো ঠিক নেই। বিরক্ত একটু।—আমি যা বলেছি তার সঙ্গে ব্যবসার কোনো সম্পর্ক নেই।

আরো বেশি হাসছিলাম বোধহয়।—একেবারে নেই বলছ?

—কি ব্যাপার বলো দেখি...হঠাৎ তোমার এরকম সন্দেহ হল কেন?

হাসি মিলিয়ে যেতে লাগল, মুখের ওপর থেকে চোখ সরানো গেল না। বললাম, প্রথম সন্তান আসার ব্যাপারে তেইশ বছর বয়েসটাই বেশি মনে হয়েছে তোমার, আর অঘটনের পর আরো তিন বছর কাটিয়ে দেওয়া তোমার মতে প্রায় অপরাধ। কিন্তু তোমার চোখের সামনে কারো বয়েস সাতাশ পার হতে চলল, তার ভালো মন্দ ভাবার তাহলে সময় হয়নি তোমার?

মুখের দিকে চেয়ে এবারে আমার সত্যিই হাসি পাবার কথা। আচমকা শুকনো মাটিতে আছাড় খেয়ে উঠল যেন। কিন্তু হাসি দূরে থাক, ভিতরটা কেমন খরখরে হয়ে উঠেছে আমার।

—কি কাণ্ড! হতভম্ব যেন।—একেই বলে উপন্যাস-লিখিয়ে মেয়ে। হাসার চেষ্টা। —তুমি নিজেই তো বলেছিলে ও-সব এখন না!

—যখন বলেছিলাম তখন আমার বয়েস একুশ আর তুমি বিলেত যাচ্ছ—ফিরে আসার পরেও কয়েকটা বছর কেটেছে, তার মধ্যে তুমি মস্ত ডাক্তার হয়েছ, কিন্তু এই ভালো মন্দের দিকটা তুমি আমাকে একবারও বলোনি।

কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও ওই ফাঁপরে-পড়া মূর্তি আমি ঠিকই লক্ষ্য করেছি। তার পরেই হেসে উঠল। লোকটাকে নির্বোধ বলবে কে? বলল, ডোন্ট বি সেন্টিমেন্টাল

চন্দ্রা—ভালো-মন্দটা নির্ভর করে ব্যক্তিগত টেম্পারামেন্টের ওপর—তাছাড়া তোমার মতো সকলের হাতের মুঠোয় বড় ডাক্তার আছে? ওই ভদ্রলোককে যা বলেছি সেটা ডাক্তারী শাস্ত্রের কথা, কিন্তু দিনকাল যা পড়েছে চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশের আগে তো মেয়েদের বিয়েই হয় না, চল্লিশের ওপর ফার্স্ট ডেলিভারি কেস কত আছে নার্সিং হোমের রেকর্ডটা উল্টে দেখে এসো—

প্রাণপণ চেষ্টায় আমিও সহজ হতে চেষ্টা করছি এবারে। জবাব দিলাম, আমার দায় পড়েছে!

ও কাছে এগিয়ে এলো। খুব কাছে ঝুঁকে দাঁড়াল। ঠোঁটের ডগায় হাসি টিপটিপ করছে। বলল, তোমার ইচ্ছেটা যখন বোঝা গেল, গ্যারন্টি দিচ্ছি অঘটন কিছু ঘটবে না।

ধাক্কা মেরে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।—ছাই বুঝেছ, আমিও তর্কশাস্ত্র অনুযায়ী তর্ক করলাম, ওই ভদ্রলোককে যে তুমি খাঁটি কথা বলো নি ঘুরিয়ে সেটা নিজেই স্বীকার করলে।

ঘর ছেড়ে দ্রুত প্রস্থান করলাম।

লজ্জা লজ্জা লজ্জা। আমারই মাথায় যেন অস্বাভাবিক কিছু ভর করেছে। ওই প্রসঙ্গ যতবার মনে পড়েছে ততবার নিজের ওপর রাগ হয়েছে। অথচ এও ঠিক, জলের মাছকে হ্যাঁচকা টানে টেনে তোলার মতই ঘরের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারটিকে ধড়ফড় করে উঠতে দেখেছি আমি।

সন্ধ্যার পর আমার অবস্থা আরো শোচনীয়। বন্ধুকে নিয়ে প্রশান্ত ঘরে ফিরেছে। সুধীরের মুখের দিকে চেয়েই মাথা কাটা যাবার দাখিল আমার। তার হাসি-হাসি চোখের দুষ্টুমি দেখেই বুঝেছি সকালের কথা ফাঁস হয়ে গেছে। যত বন্ধুই হোক এ কেউ বলে দিতে পারে! ভিতরে ভিতরে সত্যিই বিষম ক্রুদ্ধ আমি।

সুধীর সোফায় গা ছেড়ে বসেই হাঁক দিল, কফি—

কফি না আসা পর্যন্ত দুজনের কেউ ফষ্টি-নষ্টির ধার দিয়ে গেল না। প্রশান্ত ছদ্ম মনোযোগে চিঠি-পত্র কি আছে দেখতে লাগল। আর ঘরের ছাদটা যেন গবেষণার বস্তু সুধীরের।

কফি আসতে গম্ভীর মনোযোগে তাতে দু'চারটা চুমুক দেবার পর সুধীর তাকাল আমার দিকে।—তোমার সঙ্গে আমি এক মত, তোমার স্বামী-রত্নটি একটি নির্ভেজাল রাসকেল—

আমি সকোপে জবাব দিলাম, তোমরা দুজনেই।

—আমি! আমিও? আমি তোমার কি উপকার করতে পারতাম!

সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাসি দুজনের। আমার কানের ডগা পর্যন্ত তপ্ত। উঠে পালাতে গেলাম। সুধীর পথ আগলালো।—বোসো।

সরোষে দ্বিতীয় হাসি মুখখানার দিকে তাকিয়ে নিলাম একবার। তারপর বলে উঠলাম, তোমার বন্ধু যদি ভেবে থাকে অন্যের ভালোমন্দ নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখে আমার হিংসে হয়েছে তাহলে খুব ভুল করেছে। তোমরা যে কতখানি পেশাদার হয়ে উঠেছ সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছিলাম। সরো—

ওর গা ঠেলেই আমি বেরিয়ে এলাম।

রাত্রির আপোসের চেষ্টাটা আরো অসহ্য। যতবার কাছে আসতে চেষ্টা করেছে, বিরক্তিতে ঠেলে সরিয়েছি। শেষে ও বলেছে, কি আশ্চর্য, সুধীরকে তো শুধু বলেছি, তার জন্যে তোমার এত রাগ কেন!

তপ্ত জবাব দিলাম, সব কিছুরই একটা সীমা আছে, বুঝলে?

—আমি জানতাম ওই একজনের বেলায় নেই। যাক, আমার ভয়ানক অন্যায় হয়েছে।

এবারে একরকম জোর করেই সবলে জড়িয়ে ধরল আমাকে।

—ছাড়ো।

—কেন?

—যা তুমি বুঝেছ সেটা আপাতত মিথ্যে।

—আপাতত মানে কি, সাতাশ সাঁইতিরিশের দিকে গড়াবে?

রাগ হচ্ছে। কিন্তু রাগ মানেই হার। ভ্রূকুটি করে তাকালাম।—গড়ালেও তোমার হুঁশ ফিরত কিনা সেটাই যাচাই করে দেখতে গেছলাম।

—ফিরত।

—ঠিক আছে। তাহলে আরো এক আধ বছর সবুর করো। একটা বড় জিনিসে হাত দিতে যাচ্ছি, এর মধ্যে কোনো রকম গণ্ডগোল বরদাস্ত হবে না।

—কি বড় জিনিস?

সঙ্গে সঙ্গে নোটবইয়ের লেখাগুলো আর তার ফ্ল্যাপে গোঁজা শ্রীলেখার সেই চিঠিটা চোখের সামনে এই প্রথম যেন আকার নিতে থাকল। তা সত্ত্বেও এটা কোনো রকম বড় জিনিস ভাবা যাচ্ছে না। পলকা রাগে আবার ঠেলে সরাতে চেষ্টা করলাম, সরো—তোমার কাছে বড় জিনিস তো শুধু ওই নার্সিং হোম—

ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছি শুই কি। আদরে সোহাগে আমাকে অস্থির করে তোলার আগ্রহ।

ঠিক এই সময় সুধীরকে নিয়ে আবার এক বিভ্রাট। সে এমন এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার যেন দিনকতকের জন্য আমারই আহার নিদ্রা ঘুচে যাবার দাখিল। সে ক'টা দিনের জন্যে শ্রীলেখার দেওয়া খবরাখবরেও আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। উল্টে আমার ভিতরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আর সন্দেহ কয়েকটা দিনের জন্য মুক্তি পেয়ে বেঁচেছিল।

বিভ্রাটের প্রহসন কবে থেকে কি ভাবে দানা পাকাচ্ছিল প্রশান্তও জানে না, আমিও না। সেদিন প্রশান্ত এসে বলল, প্রায়ই আজকাল বোস সাহেবের বাড়িতে সুধীরের ডাক পড়ছে কেন বুঝতে পারছি না।

বোস সাহেব মানে হার্ট-স্পেশালিস্ট অমল বোসের বাড়িতে। সেই ব্যাপারের পর থেকে সুধীরের সঙ্গে মৈত্রেয়ী বোসের অন্তত মুখ দেখাদেখি বন্ধ। তাই কথাটা শুনে কৌতূহল হল। পরদিন সুধীরকে জিজ্ঞাসা করতে ও হাসতে লাগল। বলল, আমি লোক ভালো সেটা বুঝে তাঁরা যদি আমাকে ডাকাডাকি করেন তো না গিয়ে কি করব?

জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি লোক ভালো এটা মৈত্রেয়ী বোসও বুঝেছেন?

—বুঝতে চেষ্টা করছেন। এখন মাঝে মাঝে মহিলার সন্দেহ হচ্ছে তোমার পাল্লায় পড়েই হয়ত আমি বিগড়েছি, মেয়েদের নিয়ে ইয়ে-টিয়ে করার ব্যাপারে তুমিই হয়ত আমার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছ, মানে বে-পরোয়া করে তুলেছ। তোমার সম্পর্কে আর তোমার লেখা-টেখা সম্পর্কে যা বলেন শুনে আমার কান জুড়িয়ে যায়।...ওই হিংসুকটা তোমার কানে কি লাগিয়েছে শুনি?

প্রশান্ত প্রতিবাদ করল, আমি শুধু টোপটা ফেলেছি, আর কিছু বলিনি।

আমিও তার পক্ষ নিয়েই চোখ রাঙালাম, হিংসা কেন, মৈত্রেয়ী বোসের খাতির পাচ্ছ বলে?

—না তো কি, আমার বদলে যদি ওর ডাক পড়ত, গলদ চোখে পড়ত কিছু?

ডাক পড়ার তাৎপর্যও শুনলাম। মৈত্রেয়ী বোস যে এলাকায় থাকেন সেখানকার অভিজাত মহিলারা বিলিতি কায়দায় একটা চায়েলড সেন্টার খুলেছেন। চায়েলড সেন্টার বলতে প্রথম শ্রেণীর কিন্ডারগার্টেনের থেকেও উঁচু দরের কিছু। ফ্রী সার্ভিস অর্থাৎ বিনে পয়সায় শিশু নারায়ণ আর নারায়ণীদের সেবা। প্রতিষ্ঠান চালু হয়েছে ডোনারদের টাকায়। অভিজাত মেয়েরা নিজেদের চেষ্টায় (এবং বলা বাহুল্য স্বামীদেব সহায়তায়) রুই কাতলা গোছের অনেক বড় বড় ডোনার সংগ্রহ করেছেন। এ ব্যাপারে মৈত্রেয়ী বোস সহৃদয়ার মতই এগিয়ে এসেছেন। মাসে নাম-মাত্র (?) ভাড়ায় নিজের মস্ত বাড়ির একতলাটা ছেড়ে দিয়েছেন। সামনে পিছনে মস্ত লন—এর থেকে ভালো আস্তানা আর কোথায় মিলবে?

নতুন সংস্থার প্রধান পরিচালিকাও মৈত্রেয়ী বোস। একে বিলেত ফেরত, তার ওপর এককালে কলেজের ছাত্রী ঠেঙিয়ে অভ্যস্ত—তাঁর থেকে যোগ্য আর কে আছে? সকলের ধরা-ধরিতে পড়ে তিনি দায়িত্ব না নিয়ে পারেননি। রোজ দুপুরে মায়েরা সব দু'ঘণ্টার জন্য ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেখানে সমবেত হন। শিশুদের তো বটেই, মায়েদেরও সময় ভালো কাটে।

এ হেন সংস্থায় শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ একজন চিকিৎসক না থাকলেই নয়। সপ্তাহে দু'দিন অন্তত ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হওয়া দরকার। এদিক থেকে (যত রাগই থাক) মৈত্রেয়ী বোস নিরপেক্ষ পরিচালিকা। তাঁর বিবেচনায় এ ব্যাপারে যোগ্যতম ব্যক্তি সুধীর দত্ত এটা স্বীকার করেই তাকে ডেকে নেওয়া হয়েছে। সুধীরের ধারণা এই কারণেই প্রশান্তর হিংসা।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, শিশুরা তো আসে শুনলাম দুপুরে, তোমার রাত্তিরে ডাক পড়ে কেন?

ও জবাব দিল, পরামর্শের জন্যে, দুপুরে পরামর্শের ফুরসত মেলে, না জমে?

এর দিন কয়েক বাদে সুধীর নিখোঁজ হঠাৎ। পর পর পাঁচ ছ'দিন দেখা নেই ওর। প্রশান্তও ভেবে পেল না কি হতে পারে। সম্ভব অসম্ভব সর্বত্র খোঁজ নিল। ডক্টর বোসের ওখানে খবর নেওয়া হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে প্রশান্ত জানালো সেখান থেকেই তো উল্টে ওর খোঁজে টেলিফোন আসছে। আজ আমার সঙ্গেই মিসেস বোসের টেলিফোনে কথা হল, বেশ রাগ-রাগ ভাব। বললেন, কতগুলো বাচ্চার স্বাস্থ্যের ভার নিয়ে এরকম

দায়িত্বজ্ঞানশূন্যের মতো হুট করে কোথাও চলে যাওয়ার কি মানে হয়! এ-সব লোকের লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া উচিত।

সত্যিকারের দুর্ভাবনার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলাম। সাত দিনের মাথায় নার্সিং হোম থেকে ফিরে হাসি-হাসি মুখে প্রশান্ত জানালো, সুধীর ফিরেছে।

আমি উদগ্রীব মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় গেছল?

—ও বলে হরিদ্বারে, আমার ধারণা কলকাতাতেই কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে ছিল।

কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে ভুল নেই, কিন্তু আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না।—ও এলো না যে বড়?

মিটি মিটি হেসে প্রশান্ত জবাব দিল, তোমার জেরার পাল্লায় পড়তে চায় না বোধ হয়।

—তুমি হাসছ কেন, কি হয়েছে বলতে পারছ না?

প্রশান্তর মুখেও এবারে কাব্য ঝরল, আমার দিকে চেয়ে টেনে টেনে বলল, রমণীর মন কে বা জানে...! আমার মনে হয় প্রণয়ঘটিত ব্যাপার, আর তার সঙ্গে শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বোস জড়িত।

আমি তাজ্জব। শোনার পরেও বিশ্বাস হল না। তক্ষুনি মনে হল মহিলা ওদের থেকেও কম করে দু'বছরের বড়। কিন্তু একবার সে কথা তুলতে সুধীর কি জবাব দিয়েছিল মনে পড়তে তা আর বললাম না। অসহিষ্ণু আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে বলো না?

—কিচ্ছু জানি না। জিজ্ঞাসা করতে বলল, প্রাণের দায়ে পালিয়েছিলাম, শেষে বাঁচার একটা আসুরিক রাস্তা বার করে ফিরে এসেছি।...নার্সিং হোমে কাজের চাপ ছিল, পরে কথা কইব ভেবেছিলাম, হাত খালি হতে দেখি পালিয়েছে।

তক্ষুনি সুধীরের ফ্ল্যাটে টেলিফোন করলাম আমি। ও-দিক থেকে রিসিভার তুলেই সুধীর জবাব দিল, আমি নেই।

—তুমি এখুনি আসবে কিনা?

—না। মেয়েদের আর আমি বিশ্বাস করি না।

—ভালো হবে না বলছি! আসবে কিনা?

—না। অত কৌতূহল ভালো নয়, সেটা দমন করে সংযম শিক্ষা করো।

—সংযম বার করছি, আমিই যাচ্ছি তাহলে!

—তার মানে আমার সংযম বিনাশের জন্য তুমি আসছ! স্বাগত, স্বাগত, বিশ্বামিত্রর থেকেও আমি ভাগ্যবান। ও ছোঁড়াটার হাতে একটা মোয়া-টোয়া কিছু দিয়ে এসো।

টেলিফোন আছড়ে ফেলতে গিয়েও সামলে নিলাম। শেষে তর্জনের মতো করে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি আসছ না তাহলে?

এবারে ও বলল, রাত্রিতে আসব'খন, শ্রীমতীর ত্রাসে ক'রাত ভালো ঘুম হয়নি, দিনের বেলাতেই তিন পেগ চড়িয়ে এখন টেনে ঘুম দেবার তোড়জোড় করছি।

ও টেলিফোন ছাড়ার আগেই তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলাম, শ্রীমতীর ত্রাসে মানে?

—মানে শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বোসের ত্রাসে, তুমি আমার আদরের প্রেয়সী বলে তোমাকে বললাম, কিন্তু বাইরে যদি ফাঁস হয় তো এই বল্লভকে তোমারও হারাতে হবে বলে দিলাম।

ফোন ছেড়ে দিল।

রাতে দুই বন্ধুতে একসঙ্গেই এলো। দুজনেই গম্ভীর। এই গাম্ভীর্য কত পলকা এক নজর তাকিয়েই বোঝা গেল। গম্ভীর আমিও। কোনো কথা না তুলে আগে রাতের খাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেললাম। কিন্তু সমস্তক্ষণই আমার হাসি পাচ্ছিল। ভিতরের যাতনায় অনেক দিন মন খুলে হাসতে পারিনি। মনের সে গুমোটও কেটে গেছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর ওকে নিয়ে পড়লাম। মুখখানা এমন যেন বধ্যভূমিতে এসে হাজির হয়েছে। প্রশান্তই প্রসঙ্গের অবতারণার চেষ্টায় এগোলো। বলল, মিসেস বোস কড়া রকমের প্রপোজ করেছিল—

—তুমি থামো! সুধীরের দিকে ফিরলাম, বলো—

খানিকক্ষণের ফষ্টি-নষ্টির পরে সার ব্যাপারটা আমার মগজে বসে যেতে লাগল।

...এত চায়েলড় স্পেশালিস্ট থাকতে মৈত্রেয়ী বোসের চায়েলড় সেন্টারে সুধীরের ডাক পড়তে ওর মনে খটকা লেগেছিল। মৈত্রেয়ী বোসের হাব-ভাব-আচরণ গম্ভীর। সুধীরকে বলেছেন, পাঁচজনের স্বার্থে যাকে ডাকা উচিত তাকেই ডেকেছেন—এর মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু সুধীর নিঃসংশয় ব্যক্তিগত সম্পর্কটাই সব। সেটা যাচাইয়ের লোভে সাগ্রহেই সংস্থার শিশুস্বাস্থ্যের ভার নিয়েছিল। কটা দিন যেতে সন্ধ্যার পর পরামর্শের জন্য বাড়িতে ডাক পড়তে লাগল। পরামর্শটা যে অজুহাত মাত্র সেটা বুঝতে দু'দিন লাগেনি। মিসেস বোস ভালো রকম খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। তাঁর হাব-ভাব-আচরণ একটু বেশি মার্জিত আর সংযত। কথা কম বলেন, গম্ভীর চোখে মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

সপ্তাহ তিনেক এইভাবে চলেছে, তারপর সুধীর দত্ত একদিন খোলাখুলি বলেছে, হঠাৎ আপনার এত স্নেহের কি করে যোগ্য হয়ে উঠলাম বুঝতে পারছি না—

অপলক চোখে মৈত্রেয়ী বোস মুখের দিকে বেশ খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে জবাব দিলেন, সেই এক পার্টির রাতে তুমি আমার যা করেছ, বোঝা উচিত। তুমি আমার শান্তি নষ্ট করেছ, ঘর নষ্ট করেছ—

সুধীরের বরাতজোরে এই সময়ে ডক্টর বোস বাইরে থেকে রোগী দেখে ফিরলেন। যাবার আগে তাঁর অগোচরে মৈত্রেয়ী বলে দিলেন, কাল এসো—

সুধীর বাতাস সাঁতরে তার ফ্ল্যাটে চলে এলো। এই মহিলার ওপর তার দীর্ঘকালের জাতক্রোধ একটা। যখন সুধীরের বয়স মাত্র আঠের উনিশ, তখন থেকে। (সেই রাগের হেতু তখন পর্যন্ত আমার বা প্রশান্তরও অজ্ঞাত)। সে একটা প্রতিশোধের আনন্দ নিয়েই ঘরে ফিরল। পরদিন গেল না, তার পরদিনও না। টেলিফোন আসবে জানা কথাই। এলো। সুধীর জবাব দিল, জরুরী কেস-এ পর পর দু'দিন ধরে আটকে আছে। সেই সন্ধ্যায় যেতে চেষ্টা করবে।

বলা বাহুল্য, গেল না। তারপর দিন বিকেলে ফ্ল্যাটে এসেই হাঁ। মৈত্রয়ী বোস বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছেন।

বললেন, তোমাকে আমি এই গোছের কাপুরুষ ভাবিনি। তারপর কঠিন মুখ করে জিজ্ঞাসা করেছেন, একটা কথার খোলাখুলি জবাব দাও, চন্দ্রাণী রায়কে কতটা ভালোবাসো?

সুধীর জবাব দিয়েছে, খু-উ-ব।

—তাকে তুমি কোনোদিন পাবে আশা করো?

সুধীর বোকা মুখ করে বলেছে, তাকে তো পেয়েই আছি।

মৈত্রেয়ী বোসের ঠাণ্ডা গলায় যেন আগুন ঝরেছে।—আমি কি বলছি তুমি ভালই বুঝতে পারছ। ঠিক ঠিক জবাব দাও।

এবারে ঠিক জবাবই দিয়েছে সুধীর। আর সেই প্রথম তুমি করে বলেছে মৈত্রেয়ীকে। —না, তুমি যে-ভাবে বলছ সে রকম করে পাওয়ার আশা কোনোদিনই নেই।

—তাহলে সেদিক থেকে তোমার চোখ ফেরাতে হবে। 'তুমি' শুনে তাঁর ঠোঁটের ফাঁকে সেই প্রথম হাসি উঁকিঝুঁকি দিয়েছে। আদেশের সুরে বলেছেন, তুমি আর আমি বাইরে কোথাও চলে যাব সেই ব্যবস্থা করো—বাইরে মানে একেবারে বিদেশে। টাকা-কড়ি আমার কিছু আছে, তুমিও যা পারো সংগ্রহ করো—বাইরে তুমি ডাক্তারী করবে, আমিও কিছু করতে পারব, সেজন্যে ভাবনা নেই। মুখের দিকে খানিক থমকে চেয়ে আবার বলেছেন, পার্টির সেই রাতে তুমি যা করেছ, তারপর থেকে নিজের বিবেক ঠিক রেখে আমার পক্ষে বোসের ঘর করা সম্ভব হচ্ছে না। তোমাকে যা বললাম অনেক ভেবে মন স্থির করেই বলেছি।

সুধীরের তখন বিগলিত মুখ। কিন্তু ভিতরে ঢিপ-ঢিপ। সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করবে বলে কোনোপ্রকারে তাঁকে বিদায় করল। যাবার আগে (সুধীরের ধারণা) মৈত্রেয়ী বোস আশা করেছিলেন, পার্টির সেই গর্হিত কাজটি সুধীর আবার করবে। কিন্তু ওর তখন খুশির এমনই তুরীয় অবস্থা যে সে-সব যেন আর খেয়ালই ছিল না।

মৈত্রেয়ী বোস চলে যেতে আধ ঘণ্টার মধ্যে সুটকেস গুছিয়ে ঘরে তালা লটকে সুধীর দত্ত নিখোঁজ। দেওঘরের নিরিবিলিতে কাটিয়েছে কটা দিন। কিন্তু এভাবে গা-ঢাকা দিয়ে কি আর সুরাহা হবে? শেষে মরীয়া হয়েই চলে এসেছে। এসে মৈত্রেয়ী বোসকে টেলিফোন করেছে। স্পষ্ট করে বলেছে, এ জীবনটা তাঁকে পূজনীয় মাস্টারমশায়ের অর্থাৎ ডক্টর বোসের স্ত্রী হয়েই কাটিয়ে দিতে হবে, এছাড়া আর কোনো পথ নেই। সে চায়েলড সেন্টারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে দিচ্ছে। এর পর ওকে নিয়ে টানাটানি করলে লোক জানাজানি হবে শুধু, আর লোকের হাসির খোরাক জোগানো হবে, তার বেশি আর কিছু ফল হবে না। পার্টির সেই এক রাতের গর্হিত আচরণের জন্য সে ক্ষমা চেয়েছে আর বলেছে, এক পুরনো প্রতিশোধের তাড়নায় সে ওই কাজ করেছে, প্রতিশোধটা কোন ছেলেমানুষি ঘটনাপ্রসূত তাও বলেছে।

ওধার থেকে মৈত্রেয়ী বোস নির্বাক শ্রোতা।

সুধীর দত্ত টেলিফোন রেখে দিয়েছে।

...নির্বাক শ্রোতা আমরা দুজনও। অর্থাৎ আমি আর প্রশান্ত। আমি ওকেই দেখছি, চোখে পলক পড়ে না।

সুধীর হেসে বলল, হাঁ করে চেয়ে আছ কি, মৈত্রেয়ী বোসের খুব সম্ভব এখনো বিশ্বাস, তোমার আশা ছাড়তে পারিনি বলেই আমি ওকে ত্যাগ করলাম।

এসব কথা এমন কান-সওয়া আমার যে কানে ঢোকেও না ভালো করে। যে কৌতূহল এতক্ষণ ধরে আমার মনের তলায় ঘুর-ঘুর করছিল সেই প্রসঙ্গে এলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, মৈত্রেয়ীর ওপর তোমার পুরনো রাগ আর প্রতিশোধের কথা বললে, ওঁর বিয়ের আগেও কি তোমাদের জানাশোনা ছিল নাকি?

—উনি চিনতেন না, আমি ওঁকে চিনতাম।

—কি রকম?

আমার মতো প্রশান্তও অবাক একটু। তার অন্তত জানার কথা, কিন্তু জানে না।

হাসি-হাসি মুখেই সুধীর বলে গেল, আমাদের বাড়ির কাছেই ছিল ওঁর বাপের বাড়ি। আমাদের তুলনায় ঢের বড় অবস্থা। বাবা মৈত্রেয়ীকে পড়াতেন। তিনি চোখ বোজার পর চেষ্টা-চরিত্র করে দাদা সে টিউশনটা পেয়েছিল। আমি যখন স্কুলে উঁচু ক্লাসে পড়ি তখন লম্বা ছুটি পড়লেই প্রশান্তর বাবা আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিতেন। তখনই বোনেদের মুখে শুনেছিলাম, দাদা তার ছাত্রীর প্রেমে পড়েছে। আড়ালে গরিবের ঘোড়া রোগ নিয়ে তারা হাসাহাসি করত।...আমরা যখন কলকাতায় ডাক্তারী পড়ি, সে-সময় দাদার আশা একটু বেড়েছিল, বোকার মতো স্বপ্ন দেখছিল, মৈত্রেয়ী বড় রকমের একটা আত্মত্যাগ করবে, দাদার জীবনে এসে দাদাকে জীবন-যুদ্ধে জয়ী করে তুলবে। ফলে ও-বাড়ি থেকে দাদাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া হয়েছিল।...এর মাস নয়েক বাদে দাদা যখন মারা যায়, তার দিনকতক আগে নিজেই আমাকে ব্যাপারটা বলেছিল।...নিজের নির্বুদ্ধিতার কথা বলে দাদা হাসতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু দু'চোখে জল টলটল করছিল। দাদাকে কোনোদিন আমি ভালো চোখে না দেখলেও সেই থেকে আমারও একটা ছেলেমানুষি আক্রোশ ছিল মৈত্রেয়ীর ওপর।...আর দেখাশুনা না হলে অবশ্য ভুলেই যেতাম।

প্রশান্ত অবাক।—কই, আমাকে তো কোনোদিন কিছু বলিসনি?

জবাব না দিয়ে সুধীর হাসছিল। সেই প্রথম আমার কেমন মনে হল, যত বড় ডাক্তারই হোক ও এখন, আর যে মেজাজেই থাকুক সর্বদা, পিছনের একটা স্মৃতির ক্ষত ওর মধ্যে থেকেই গেছে।

## পাঁচ

হঠাৎই আমার মাথায় চাপল সুধীরের এবারে একটা বিয়ে দেওয়া দরকার। ধরে বেঁধে বিয়ে না দিলে ও সেদিকে মাথাই গলাবে না। এত বয়েস হয়ে গেল, রোজগারও অঢেল, বিয়ে আর কবে করবে? তাছাড়া শ্বশুরমশাই বেঁচে থাকলে ওকে নিশ্চয় এভাবে চলতে দিতেন না, তিনি নেই যখন দায়িত্ব তো আমাদেরই।

রাতের নিরিবিলিতে কথাটা তুললাম। কিন্তু এদিকে সেরকম একটা উৎসাহ দেখলাম না। ও-পাশ ফিরে ঘুমুবার তোড়জোড় করে প্রশান্ত জবাব দিল, আমরা বললেই ও বিয়ে করতে গেল আর কি—!

জবাবটা নয়, এই গোছের নিস্পৃহতা আমার ভালো লাগল না। যদি নার্সিং হোম সম্পর্কে কোনো কথা তুলতাম, বা যদি বলতাম, ওমুক বিদেশের জার্নালে অমুক আইডিয়াল নার্সিং হোম সম্পর্কে এটা লেখা পড়লাম।—শোয়া ছেড়ে উঠেই বসত হয়ত, আর আলো জ্বেলে তক্ষুনি জার্নালের খোঁজ করত।

আমি খোঁচা দিতে ছাড়লাম না, সে করুক বা না করুক আমরা বলছি না কেন?

ও-পাশ ফিরে উত্তর দিল, আমার ও-সব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আছে!...তাছাড়া নার্সিং হোম যে-ভাবে বাড়ছে এখন, ওরও আপাতত অন্য দিকে মন না গেলেই ভালো—

সামান্য কথা। হয়ত বন্ধুর সামনেই ও-কথা বলতে পারত। কিন্তু আমার তাইতেই রাগ হয়ে গেল। কেবলই মনে হতে লাগল এরকম স্বার্থপরের মতো কথা আর বুঝি হয় না।

পরদিন সুধীর আসতে বেশ জোর দিয়ে নিজেই তুললাম কথাটা। বললাম, অনেক কাল নেচে কাটিয়েছ, আর না, এবারে বিয়ে করতে হবে। নিজে না পারো আমি মেয়ে দেখে দিচ্ছি।

দুই চক্ষু কপালে তুলে সুধীর বন্ধুর দিকে তাকালো।—কি ব্যাপার রে?

প্রশান্ত হেসেই জবাব দিল, কাল আমাকে বলছিল, তোর স্বভাবচরিত্র নিয়ে কিছু সন্দেহ-টন্দেহ হয়েছে বোধহয়।

সুধীর বলল, স্বভাব-চরিত্র আবার নতুন করে কি খারাপ হল!

ঠাট্টায় কান না দিয়ে আমি ওর দিকেই চোখ রেখে বললাম, তোমার বন্ধু তো নার্সিং হোম নিয়ে এত ব্যস্ত যে এসব দিকে মন দেবার সময়ই নেই, তাই তোমাকেই জিজ্ঞাসা করছি, তুমি বিয়ে করবে কি করবে না?

পলকা গাম্ভীর্যে আমার চোখে চোখ রেখে সুধীর জিজ্ঞাসা করল, আমি বিয়ে না করলে তোমার কিছু অসুবিধে হচ্ছে?

—হ্যাঁ হচ্ছে।

—তাহলে লাগিয়ে দাও।

প্রশান্ত অল্প অল্প হাসছিল। এবারে বলল, তুই এক কাজ কর সুধীর, আমাদের সেক্রেটারী শ্রীলেখা চ্যাটার্জী তোকে বেশ ভক্তিশ্রদ্ধা করে দেখি, বিয়ের অফারটা তাকেই না হয় দিয়ে ফেল, বেশ ঝকঝকে মেয়ে—

সুধীর কিছু বলার আগেই আমি বোকার মতো ঝাঝিয়ে উঠলাম, না, ও-সব সেক্রেটারী-টেক্রেটারী চলবে না—

অবশ্য এটুকুতে ওদের মনে কোনোরকম খটকা লাগার কথা নয়। লাগলও না। সুধীর পাল্টা আক্রমণের সুযোগ পেল।—তবে কি-রকম চলবে, সাহিত্যিক মেয়ে?

প্রশান্ত চপল গাম্ভীর্যে সায় দিল, বোধহয়। তুই নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস, ওর পছন্দের ওপর যখন নির্ভর, তোর কপালে শিগগির বিয়ে জুটছে না।

অর্থাৎ সুধীরের জন্য কোনো মেয়ে আমার সহজে পছন্দ হবার নয়। জোর দিয়ে বললাম, জোটে কিনা দেখো, শিগগিরই আমি কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি।

হা-হা শব্দে হেসে উঠেই যেন সুধীর আমার সঙ্কল্পটা বাতিল করে দিয়েছে।

আরো কিছু ঠাট্টা ইয়ারকির পর বলেছে, আমাকে নিয়ে তোমার মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই ম্যাডাম, বুঝলে—লেখিকা হিসেবে তোমার লোকচরিত্র ঠাওর করতে পারার কথা, আই অ্যাম নট এ ম্যারিইং ম্যান—

কথাগুলো আমার ভালো লাগেনি। অথচ মনে হয়েছে, এ ধরনের কথা যেন একমাত্র ওর মুখেই সাজে।

ভিতরটা দিনকে দিন এমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে কেন জানি না। আর তার তলায় কি এক অস্বস্তি থিতিয়ে আছে। মন দিয়ে সত্যি ভালো কিছু লেখার কথা ভেবেছি। কিন্তু কাগজ-কলম নিয়ে বসতেও ইচ্ছে করে না। প্রায় অকারণেই ভিতরটা কি রকম সজাগ সর্বদা।

দুপুরে সেদিন শ্রীলেখার টেলিফোন আবার। ওর টেলিফোন মানেই খবর কিছু। যা সব থেকে বেশি অবাঞ্ছিত মনে হয় এখন। ওকে যেন মানুষের আচরণের তলা খুঁড়ে কীট বার করার কাজে লাগানো হয়েছে। এক ধরনের হিংস্র উদ্দীপনা নিয়ে ও তাই করে চলেছে। সেই সব কীট এখন পর্যন্ত শুধু আমাকেই দংশাচ্ছে। আর, কীট খুঁজে না পেলেও সর্বদাই কীটের ছায়া দেখে শ্রীলেখা। এ কাজ থেকে এখন ওকে বিরত করা যায় কি করে মাঝে মাঝে এ চিন্তাও মাথায় আসে।

—হ্যাঁ, বলো।

—আজ আপনার সঙ্গে দেখা না হলেই নয়, খুব—খ্-উ-ব জরুরী।

—এসো।

—না, আজ আমি যাব না, আপনি আসুন আমার ওখানে। বলতে সময় লাগবে, একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটতে চলেছে, আপনি একটু সময় নিয়ে আসুন, সুধীরবাবু আসছেন এদিকে, আমি ছাড়লুম—

ছেড়ে দিল। নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছে আমার। শ্রীলেখা এখন অনায়াসে ওর ওখানে যেতে বলে আমাকে। বলবে না কেন, প্রশ্রয় তো আমিই দিয়েছি।

তক্ষুনি ঠিক করে ফেললাম যাব না। থাক ওর জরুরী কথা। কিন্তু বেলা যত বাড়তে থাকল ভিতরে ততো অস্বস্তি।...কি বলবে শ্রীলেখা, সাংঘাতিক ব্যাপার কি ঘটে থাকতে পারে? এ এমনই ব্যাপার যার মধ্যে একবার নেমে দাঁড়ালে চট করে ফেরা শক্ত। অস্বস্তি অশান্তির আকার নিতে থাকল। শেষে বেরিয়ে পড়লাম।

এক নেশাগ্রস্ত লোকের কথা পড়েছিলাম। বার বার প্রতিজ্ঞা করত নেশা আর করবে না। এই নিয়ে নিজের সঙ্গে মর্মান্তিকভাবে যুঝত। কিন্তু অভ্যাসের তাড়না শেষে যাতনার আকার নিত যখন, হাল ছেড়ে নেশায় বসে যেত। তখন দ্বিগুণ আনন্দ আর উৎসাহে নেশা করত। একবার ছেলের সঙ্কটজনক অসুখের দরুন দিন-কতক নেশায় ছেদ পড়েছিল। যাতনা শুরু হলেই সে বিবেকের চাবুক কশাতো। শেষে এক রাতে ছেলের জন্য দরকারী ওষুধ আনতে গিয়ে নেশায় বসে গেল। ফিরল যখন ছেলে নেই।

সেই থেকে তার নেশা ছুটে গেল।

আমারও ভিতরে ভিতরে একটা হারাবার আতঙ্ক কেন?

শ্রীলেখা আগ্রহ আর উত্তেজনায় যে সমাচার শোনালো—আমিও স্তব্ধ খানিক। গল্পের সেই নেশাগ্রস্ত মানুষের মতই আমারও শুভ অশুভের চিন্তা ঘুচে গেল।

নার্সিং হোমে গতকাল সন্ধ্যায় এক নতুন পেশেন্ট এসেছে। তার নাম অনিমা দাস। সুন্দরী নয়, কিন্তু বেশ সুশ্রী মেয়ে। বয়েস একুশ বাইশ। তার কোনো রোগ নেই। সুস্থ তাজা মেয়ে। ছেলেপুলে হবার ব্যাপার নয় কিছু। এসেছে তার উল্টো উদ্দেশ্য নিয়ে। ছেলেপুলে যাতে কোনোদিন না হয়, আগে-ভাগে সেই ব্যবস্থা করতে।

শুনে আমি থ। জিজ্ঞাসা করলাম, রোগ নেই বা অপারেশন দরকার নেই তুমি জানলে কি করে?

—জেনেছি। ডক্টর রায় প্রথমে রাজী হননি। শেষে রাজী হয়েছেন।

সেই মেয়ের সঙ্গে শ্রীলেখার একটা সকালের মধ্যেই খুব ভাব হয়ে গেছে নাকি। শ্রীলেখার গোড়া থেকে কেমন সন্দেহ হয়েছিল, তাই সেধে ভাব করেছে। আজও কেউ এই গোছের কোনো অন্যায় ব্যবস্থার জন্য এলে ওর ভিতরে ভিতরে জ্বালা-পোড়া শুরু হয়। পুরুষের অবিচারে তার যে সন্তান আলোর মুখ দেখল না, তার কান্না শোনে, (শ্রীলেখা এখন তার মনের কথা আমার কাছে কিছুই গোপন করে না। কথাপ্রসঙ্গে নিজের অনেক কথাও বলে ফেলে।) মেয়েটার সঙ্গে ভাব হতে তার সন্দেহ আরো দানা পাকিয়ে উঠেছে। মোটামুটি লেখাপড়া জানা হলেও অনিমা দাস মেয়েটা একেবারে সরল। ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, এ ধরনের অপারেশনে ভয়ের কিছু আছে কিনা। শ্রীলেখা আশ্বাস দিয়েছে কিছুমাত্র না। পুরুষের প্রতি শ্রীলেখার আক্রোশটা বিকৃতির আকার নিয়েছে কিনা আমি জানি না। অনিমা দাসের বিশ্বাস অর্জন আর মনের কথা টেনে বার করার আগ্রহে লজ্জার মাথা খেয়ে ও নিজে থেকেই তাকে জানিয়েছে, এই গোছের একটা অপারেশন তারও হয়ে গেছে—দিব্বি সুস্থ সবলই তো আছে তার পরেও।

শোনার পর মেয়েটা গলগল করে মনের কথা বলেছে তাকে। এখন মস্ত গাড়ি হাঁকিয়ে যে লোকটা স্বামী পরিচয় দিয়ে অনিমা দাসকে এখানে রেখে গেছে—সে ওর সত্যিই স্বামী কিনা শ্রীলেখার তাতে ঘোর সন্দেহ, কারণ অনিমা দাসের স্বপ্ন সে সিনেমার নায়িকা হবে। কলেজে পড়তে বাপ-মায়ের অমতে ও শৌখিন দলে অনেক থিয়েটার করেছে। তাতে খুব নামও হয়েছিল। ওই থেকেই শ্রীদাসের সঙ্গে তার পরিচয়। শ্রীদাস পয়সাঅলা মানুষ, পরপর খানকয়েক ছবি করবেন। অনিমারা ছিল ব্রাহ্মণ, বাবা-মায়ের সমস্ত রকমের বাধা উপেক্ষা করেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে শ্রীদাসকে বিয়ে করেছে (যদিও ভদ্রলোক বয়সে ওর থেকে অনেক বড়)। একটা ছবিতে ইতিমধ্যে ছোটখাট কাজ করেছে। তার স্বামীই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সে-ছবি দু-এক মাসের মধ্যেই বাজারে আসবে। অনিমার নাকি সত্যিকারের ফোটোজেনিক চেহারা—অর্থাৎ আসল চেহারা থেকেও ছবিতে ওর মুখ ঢের ভালো আসে। এখন আসল সমস্যা দাঁড়িয়েছে ঘরের ব্যাপার নিয়ে অর্থাৎ সন্তান সম্ভাবনার ঝামেলা নিয়ে। একবার গণ্ডগোলে পড়ে অনেক রকমের ওষুধ-পত্র খেয়ে বেঁচে গেছে। সত্যিকারের বড় শিল্পী হতে হলে ওদের মতে এই ঝামেলা এড়াতেই হবে। গোটা দুই ছেলেপুলে হলেই তো চেহারা-পত্র সব গেল। তাছাড়া সংসার আর শিল্পসাধনা দুটো একসঙ্গে হয় না। এই শিল্পজীবন সার্থক না হলে অনিমার জীবন বৃথা। তাই স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে ঝামেলা একেবারে শেষই করে দিতে এসেছে।

এখন শ্রীলেখার ধারণা, ধারণা কেন, বদ্ধ বিশ্বাস ওই লোকের সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে-থা কিছুই হয়নি—বাজারে কি সিঁদুর কিনতে পাওয়া যায় না? আসলে ভাঁওতায় ভুলে এই পয়সাঅলা লোকের সঙ্গে পালিয়েছে, আর এ-ভাবে নিজের সর্বনাশ করতে চলেছে। স্বামী-স্ত্রী হলে হোটেলের সুইটে থাকে কেন দুজনে?

সব শোনার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্তব্ধ আমি। বলা বাহুল্য, শ্রীলেখার প্রতিটি কথা আমার বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, অপারেশন কবে?

—আজ শনিবার, কতগুলো চেকিংটেকিং হয়ে গেল। কাল রবিবার তো হবেই না —পরশু তরশু নাগাদ হতে পারে।

কি করব আমি, কি করতে পারি জানি না। ভিতরটা শুধু অশান্ত, ভয়ানক অশান্ত। রাত্রিতে ঘরের লোককে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছি—কোনো কারণে এতটুকু উদ্বেগ দেখিনি।

এই কারণেই ভিতরে আমার আরো যন্ত্রণা।

এখনো প্রায় রবিবারেই আমি নার্সিং হোমে যাই। বিলেতি কায়দামতো পেশেন্টদের ফুল দিই। তাদের সঙ্গে গল্প করি। মোটামুটি নামী লেখিকা আমি। শ্রীলেখার মুখে আমার পরিচয় শুনে তারা খুশি হয়।

এই রবিবার অর্থাৎ পরদিনও গেলাম। কিন্তু ফুল নিয়ে সেদিন শুধু একটিমাত্র কেবিনেই ঢুকলাম আমি। প্রায় দেড়ঘণ্টা ধরে হাসিমুখে বসে বসে শুধু অনিমার সঙ্গেই গল্প করলাম। শুধু ছবির জগৎ ছাড়া আর কোনো বিষয়ে কথা হয়নি, তবু আমারও বদ্ধ বিশ্বাস, শ্রীলেখা যা বলেছে সব সত্যি।

অতক্ষণ ধরে একটা ঘরে একজনের সঙ্গে গল্প করতে দেখে আমার ঘরের মানুষ কি ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করছিল? অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ এই কেবিনে এসে ঢুকেছিল কি এমনি? অন্তরঙ্গ আলাপচারী দেখে গলার স্বরে কি একটু উৎকণ্ঠার আভাস ছিল? সঠিক বলতে পারব না, কিন্তু আমার মনে হয়েছে ছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল, ইনি পরিচিত নাকি?

আমি হেসেই জবাব দিতে পেরেছি, পরিচয় যাকে বলে সেটা আজ হল, কিন্তু এঁকে আমি আগে দেখেছি, তাই আজ দেখেই চেনা-চেনা লাগছিল। ইনি একজন শিল্পী জানো তো?

আমি মিছে কথা বলি না। মিথ্যাচারকে ঘৃণা করি। কিন্তু অম্লানবদনেই কথাগুলো বলে ফেলতে পারলাম।

প্রশান্ত মাথা নাড়ল। অর্থাৎ জানে। কিন্তু আমি কোথায় দেখলাম বা কি করে জানলাম সেটাই বোধহয় তার বিস্ময়। তবু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আর এখানকার কর্ণধার হিসেবে বেশি কৌতূহল দেখানো সাজে না তার। গম্ভীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

বললাম, মাস কয়েক আগে আমরা দু-তিনজন সাহিত্যিক একদিন স্টুডিও দেখতে গেছলাম। সেদিন এঁর কি একটা ছবির শ্যুটিং চলছিল। এখানে এঁকে দেখে ঠিক পরিচয় বার করে ফেলেছি।... শিগগিরই দুটো বড় ছবিতে নায়িকার রোলে দেখব ওঁকে...জানো!

সামান্য হেসে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তৎপরতায় চলে গেল।

রাত্রিতে দুই বন্ধুকে এ ব্যাপারে একেবারে নির্বিকার দেখে আমার অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। বার বার মনে হতে লাগল, ব্যাপারটা কি এমনি জলভাত এদের কাছে যে এ নিয়ে এতটুকু তাপ উত্তাপ পর্যন্ত নেই!...এরকম কাজ তা হলে আরো কত করছে এরা?

শেষে আমিই বললাম, তোমাদের ওই নতুন পেশেন্ট অনিমা দাসের ব্যাপারখানা কি? আলাপ করে মনে হল যেন কোনোদিন ছেলেপুলে যাতে না হয় সেই ব্যবস্থা করতে এসেছে?

সুধীর বলে উঠল, এই খেয়েছে, তুমি আবার এর মধ্যে মাথা গলাতে গেছ!

আমার ভিতরটা থমথমে হয়েই ছিল। বাইরেও তার আঁচ লাগল। দু'চোখ প্রশান্তর মুখের ওপর স্থির।—কাল অনিমা দাসের কি অপারেশন হতে যাচ্ছে?

মুখ দেখেই বোঝা গেল এ আলোচনা মনঃপূত নয় খুব। নির্লিপ্ত সুরে প্রশান্ত জবাব দিল, তুমি যা ভেবেছ তাই, মেয়েটার মাথায় ঢুকেছে ছেলেপুলে হতে থাকলে জীবনে আর বড় আর্টিস্ট হওয়া হবে না—ওর স্বামী বেচারা অতিষ্ঠ হয়ে শেষে অপারেশনে মত দিয়েছে।

কঠিন সুরে আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, ওর স্বামী সত্যি কথা বলেছে তুমি জানলে কি করে?

বিরক্ত মুখে জবাব দিল, সত্যি না হলে দুজনে একসঙ্গে এই উদ্দেশ্য নিয়ে আসবে কেন?

—সত্যি হলেও আইনত তোমরা একাজ করতে পারো?

—মেডিক্যাল গ্রাউন্ডে পারি।

—এটা মেডিক্যাল গ্রাউন্ড?

সুধীর দত্তর ফুর্তি উপছে উঠল। সে বলে উঠল, ব্রেভো! প্রশান্ত চল, সব ছেড়েছুড়ে আমরা কোথাও গিয়ে একটা আশ্রম খুলে বসি!

রাগত মুখে আমি শাসিয়েই উঠলাম, ইয়ারকি নয়, আমি বলে দিলাম এরকম জঘন্য কাজ তোমরা করতে পারবে না!

তার পরেই স্তব্ধ আমি। প্রশান্তর এই গোছের রাগও আর দেখিনি, এ রকম কর্কশ কণ্ঠস্বরও আর শুনিনি। সে বলে উঠল, মাথা খারাপ হয়েছে তোমার? রোগী ভর্তি করেছি, টাকা নিয়েছি—এসব বাজে চিন্তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে কে বলেছে? এ-রকম বেশি বেশি বোঝো যদি আর তোমার নার্সিং হোমে গিয়ে দরকার নেই।

ব্যাপারটা এমন তপ্ত হয়ে উঠছে দেখেই সুধীর দত্ত হাসিমুখে সামাল দিতে চেষ্টা করল। বলল, তোমার সাহিত্যের বাইরের দুনিয়াটা অন্য রকম ম্যাডাম। অপারেশন আমরা না করলেও কলকাতায় এক ঝুড়ি নার্সিং হোম আছে যারা করে দেবে—মাঝখান থেকে একটা মোটা টাকাই লোকসান আমাদের। ঠিক আছে এত যখন আপত্তি তোমার, ওই পাপ কাজ অর্থাৎ অপরেশনটা না হয় আমিই করে দেব—আমি নীলকণ্ঠ, পাপ-পুণ্যের ধার ধারি না।

ওর কথায় কান না দিয়ে নির্বাক দু'চোখ মেলে তখনো আমি প্রশান্তকেই দেখছিলাম।

পরদিন শ্রীলেখাই জানালো, অনিমা দাসের অপারেশন হয়ে গেছে। সে অপারেশন সুধীর দত্ত করলেও কেন যেন আমার সমস্ত অভিযোগ ঘরের লোকের বিরুদ্ধেই। কেবলই মনে হয়েছে, কোথায় যেন আমার অনেকখানি খোয়া গেছে।

সেই থেকে ওই নোটবইটা আঁকড়ে ধরেছি আমি। ওটার পাতা ভরাট হয়ে উঠছে। আপোসশূন্য একটা সঙ্কল্প মনের তলায় দানা বেঁধে উঠছে। আমি লিখব। এমন একটা চিত্র আঁকব যা দেখে ওরা দুজনেই চমকে উঠবে, বিশেষ করে ঘরের একজন আঁতকে উঠবে। আর, সেই থেকে আমি ভিতরে এক রকম বাইরে আর এক রকম। বাইরের চন্দ্রাণী রায় অনেকটা আগের মতই সহজ সপ্রতিভ। ভিতরের চন্দ্রাণী তীক্ষ্ণ সজাগ সচেতন।

এই ভিতরটা নিয়ে আমি ক্ষত-বিক্ষতও। বাইরে হাসছি। ভিতরে জ্বলছি।

## ছয়

পরের তিন মাস শ্রীলেখা আমার আরো অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। এখন আর ওর খবরাখবর অবাঞ্ছিত ভাবি না। আমি লেখিকা। আমার কর্তব্য আছে। সেই কর্তব্যের সঙ্গে কোনো আপোস আর করতে চাই না।

...চাই না বটে, কিন্তু বুকের তলায় যে লাগে সেটা অস্বীকার করব কি করে? শ্রীলেখা বোধ হয় সেটা বুঝতে পারে। পারে বলেই ও আমার স্নায়ু টেনে রাখতে চেষ্টা করে। ওই অনিমা দাস সম্পর্কেই এমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে শুনলে ভিতরটা খচখচ করে ওঠে। বলেছে, মেয়েটা চালাক নয়, অন্তত আমি যে রকম ছিলাম সে রকম নয়। ওর সামনের দিনগুলি তুমি দেখতে পাচ্ছ চন্দ্রাণীদি?...যে লোক ওকে এ পথে টেনে এনেছে সে তাকে ছিবড়ের মতো একদিন ছুঁড়ে ফেলে দেবে। দেবেই। বড় আর্টিস্ট ও কোনোদিন হবে না। তখন ও নীচের দিকে নামতে শুরু করবে। তারপর ঠিক দেখবে একদিন রাস্তায় এসে দাঁড়াবে—সন্ধ্যায় মুখে স্নো-পাউডার মেখে আর তপতপে সাজ-পোশাক পরে যে-কোনো শিকার ধরার আশায় রাস্তার মোড়ে বা ট্রাম বাসের স্টপে দাঁড়িয়ে থাকবে। এ রকম আমি অনেক সুশ্রী মেয়েকেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি— তুমি দেখোনি? দেখতে চাও?...ঠিক ওই রকম করেই ধাপে ধাপে ওরা নেমে আসে, অনিমা দাসেরও নেমে আসার রাস্তাটা ওই নার্সিং হোম থেকেই পরিষ্কার হয়ে গেছে।

শুনে আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল। আমি তর্ক করেছি। বলেছি, এ রাস্তা যে-কোনো নার্সিং হোম থেকেই পরিষ্কার হতে পারত, তাছাড়া যে মেয়ে ওখানে এসে দাঁড়াবেই তুমি ভাবছ, তার ছেলেপুলে আসার যন্ত্রণাটা তো আরো পাঁচ গুণ বেশি হত। ওই অবস্থায় মা হলে ছেলেপুলেকে হয়ত গলা টিপে মারত অনিমা দাস।

তর্ক করেছি বটে। কিন্তু দেয়ালের দিকে মুখ করে তর্ক করার সামিল। আমার ঘরের লোক যে এক দুশ্চরিত্রের বাসনার ইন্ধন যুগিয়ে নিজের পকেট টাকায় ভরাট করেছে সেটা মিথ্যে হবে কেমন করে? তার বদলে সে যদি ছড়ি উঁচিয়ে গর্জন করে উঠত?

সেদিনও নিজের ঘরে আমাকে ডেকে নিয়ে চাপা আগ্রহ আর উত্তেজনা সত্ত্বেও শ্রীলেখা বিড়ম্বিত মুখে যে খবরটা দিল, শুনে আমারই কেমন অবিশ্বাস্য ঠেকল কানে।

সত্যিকারের এক রূপসী পেশেন্টের যাতায়াত শুরু হয়েছে নার্সিং হোমে। অ-বাঙালী মেয়ে। নাম ললিতা সরদেশাই। বম্বের মেয়ে। টগবগ করে কথা বলে আর সুন্দর হাসে। বছর চব্বিশ পঁচিশ হবে বয়েস। শ্রীলেখার ভাষায় মেয়েটা যেমন সুন্দর দেখতে তার স্বামীটা আবার তেমনি হোঁৎকা কুৎসিত। মোটা-সোটা বেঁটে-খাটো। অমন মেয়ের সঙ্গে এমন লোকের বিয়ে হতে পারে ভাবাই যায় না। লোকটা মস্ত ব্যবসায়ী আর মস্ত বড়লোক বলেই বিয়েটা হয়েছে হয়ত।

মেয়েটা অর্থাৎ ললিতা সরদেশাই হাসপাতালে ভর্তি হয়নি এখনো। প্রথম দিন তার স্বামী সঙ্গে করে দেখিয়ে নিয়ে গেছল। এখন একলাই আসে প্রায়ই। দেখিয়ে যায়। অনেক রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার আছে। পরে খুব সম্ভব নার্সিং হোমে ভর্তি হবে। তারও

আপাতদৃষ্টিতে রোগ কিছু নেই। কিন্তু বিয়ের পাঁচ বছরের মধ্যে ছেলেপুলে হল না। তার স্বামীর স্টেটমেন্ট, স্ত্রীটি নাকি সন্তানের জন্য পাগল। আগেও অন্য ডাক্তার দেখানো হয়েছে। নামডাক শুনে এবারে এই নার্সিং হোমের ডাক্তারদের শরণাপন্ন হয়েছে।

খুব ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে তাকে। ডি. সি. আই. কেস। অর্থাৎ একটা ছোট-খাট অপারেশনের পরে ছেলেপুলে হতে আর বাধা থাকবে না। মিস্টার সরদেশাইকে অবশ্য ছোট-খাট অপারেশন বলা হয়নি। ওই সব লোকের কাছে অপারেশন মানেই মস্ত ব্যাপার কিছু। ভদ্রালোক কিছুতে স্ত্রীকে নার্সিং হোমে রাখতে রাজী নয়, তার ইচ্ছে, যত টাকা খরচা হোক, স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে অপারেশন হোক।

এ পর্যন্ত সমাচার শোনানোর পরেই বিব্রত মুখ শ্রীলেখার। কিন্তু ওর মানসিক অবস্থা আবার এমন যে যত অপ্রিয় হোক শেষ পর্যন্ত না বলে পারবে না।

বলল। ইদানীং এই দুই ডাক্তারের সঙ্গেই খুব ভাব ললিতা সরদেশাইয়ের। গোড়ায় গোড়ায় ভাবটা খুব বেশি ছিল ডক্টর রায়ের সঙ্গেই। যখন তখন এসে তার ঘরে ঢুকত, অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা কয়ে গল্প-সল্প করে ঘর থেকে বেরুতো, যখন-তখন কল দিয়ে তাকে বাড়িতে ডেকে পাঠাতো। কিন্তু দিন কয়েক ধরে দেখছি, মেয়েটা ডক্টর দত্তর কাছে বেশি আসছে, আর প্রায়ই তাকে বাড়িতে কল দিচ্ছে। শ্রীলেখার ধারণা, এই জন্যে ডক্টর রায় ডক্টর দত্তর ওপর ভিতরে ভিতরে অসন্তুষ্ট একটু।

শোনা মাত্র রাগে দু'কান ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল আমার। অপলক চোখে শ্রীলেখার দিকে চেয়ে রইলাম খানিক।

ঠিক তক্ষুনি কেন যেন বন্ধুর উদ্দেশে প্রশান্তর একটা ঠাট্টা আমার মনে পড়ল। বলেছিল, আমাদের সেক্রেটারী শ্রীলেখা চ্যাটার্জী তোকে বেশ ভক্তি-শ্রদ্ধা করে দেখি, বিয়ের অফারটা তাকেই না হয় দিয়ে ফেল।

শোনামাত্র সম্ভব অসম্ভব চিন্তা করার আগেই ভিতরটা বিমুখ হয়ে উঠেছিল আমার। শ্রীলেখার ভক্তি-শ্রদ্ধা করার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাইনি, তার জীবনের অতীত অধ্যায় জানা ছিল বলেই ওই ঠাট্টার প্রসঙ্গও আমি বরদাস্ত করিনি। চেয়ে আছি ওর দিকে। মগজে চিন্তার দ্রুত ছাপ পড়ছে একটা। মনে হল, ওর বিকৃত মন আর চোখ দিয়ে ডক্টর রায়ের সঙ্গে ও ললিতা সরদেশাইয়ের বেশি ভাব দেখেছে যতদিন, ততদিন ও চুপ করে থেকে মজা দেখেছে আর ছুরি শানিয়েছে। সময় হলে নির্দ্বিধায় সেই অস্ত্র সে আমার হাতে তুলে দেবার প্রতীক্ষায় থেকেছে।...কিন্তু এখন ওই ললিতা মেয়েটার সঙ্গে সুধীরের বেশি ঘনিষ্ঠতা কল্পনা করেই ও আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারেনি। দুজনকেই জড়িয়ে ওর মনের বিষ উগড়ে দেবার জন্য আমাকে ডেকেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তা আসল সমস্যাটা কি, ওই মেয়েটা ডক্টর দত্তর কাছে বেশি আসছে আর তাঁকে বাড়িতে কল্ দিচ্ছে সেটা, না ডক্টর রায় ডক্টর দত্তর ওপর ভিতরে ভিতরে অসন্তুষ্ট—সেটা?

আমার মুখের দিকে চেয়ে হোক বা ঠাণ্ডা হাবভাব দেখে হোক, শ্রীলেখা থতমত খেল একটু। তারপর নিজের উদ্দীপনার জোরেই যেন আমার অবিশ্বাসের ভাবটা দূর করে দিতে চাইল।—ডক্টর দত্তকে তো আপনি চেনেন, পদ্ম-পাতায় জল, তার জন্যে কে ভাবছে!...কিন্তু একটা মেয়েকে নিয়ে দুজনের মধ্যে মন কষাকষি শুরু হলে তো

নার্সিং হোমের হয়েই গেল—এই বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপারটা কারো কারো চোখে পড়েছে পর্যন্ত!

বন্ধুর ব্যাপারে প্রশান্তর বুকভরা উদারতা আমার যে আজকের দেখা নয় শ্রীলেখা সেটা জানবে কি করে। তপ্ত কঠিন সুরেই বললাম, স্পর্ধার একটা সীমা আছে শ্রীলেখা। এরপর কোনো খবর দেবার জন্য আর তুমি আমাকে এভাবে ডেকো না। আর, ভালো চাও তো নিজের চিকিৎসা করাও।

বাড়ি ফেরার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত অস্থিরতা কাটেনি। কান দুটো একেবারে যেন জ্বালিয়ে দিয়েছে শ্রীলেখা। এতটা বাড়াবাড়ি করার ফলেই মনে হল, ও যেন আমাকেও বিকৃত করে তুলছিল। উঠে আসার সময় ওর সেই স্তব্ধ মুখ লক্ষ্য করেছি। সব থেকে আপনার জন যাকে ভাবত, তার কাছ থেকে এ-রকম আঘাত যেন সহ্যের অতীত।

কিন্তু আশ্চর্য, ক'টা দিন না যেতে ঘরের লোককে কেমন যেন একটু অশান্ত, অসহিষ্ণু মনে হয়েছে আমার। আর সুধীরের আসার মধ্যেও মাঝে মাঝে ছেদ পড়ছে। জিজ্ঞাসা করলে প্রশান্ত জবাব এড়িয়ে যায় মনে হয়, অন্যমনস্কের মতো ভাবেও বোধহয় কিছু।

আমার ভিতরটা সত্যিই বিষিয়ে দেয়নি তো শ্রীলেখা, বিকৃত করে দেয়নি তো? মনের ওপর আঁচড় পড়ছে কেন? আগেও তো একেবারে দিন-মাস ধরে নিয়মিত আসত না সুধীর। এক আধদিন ছেদ পড়ে যেতই। আসে যখন, তখন তো এতটুকু ব্যতিক্রম দেখি না ওর মধ্যে। তেমনি হাসিখুশি, তেমনি বে-পরোয়া আচরণ। মাথায় সে-রকম কিছু চাপলে এখনো আমার বেণী ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে আসে—খেতে বসে কতরকম কাণ্ড করে। কিন্তু আমার ভিতরে আঁচড় পড়ছে প্রশান্তকে লক্ষ্য করে। সে-যেন বন্ধুর এ-সব দুরন্তপনা ঠিক আগের মতো উপভোগ করে উঠতে পারে না। কোথায় যেন একটা কৃত্রিমতা দানা বেঁধে উঠছে।

যে চিন্তা ভেতর থেকে ঝেঁটিয়ে দূর করতে চাই সেটাই ক্রমে পেয়ে বসতে থাকল আমাকে। রূপসী রমণীর কারণে বন্ধু-বিচ্ছেদ তো সামান্য ব্যাপার, দুনিয়ায় তার থেকে অনেক বড় আগুন জ্বলেছে, অনেক বড় বড় সর্বনাশ হয়ে গেছে। সে-রকম কিছু নয় তো? শ্রীলেখার ওপর আমি অবিচার করিনি তো?

তক্ষুনি সে-চিন্তা সমূলে বাতিল করতে চেয়েছি। বাতিল করেছি। শ্রীলেখার বিকৃতি আমাকেও পেয়ে বসেছে ভেবেছি।

পরপর দু'দিন সুধীর নি-পাত্তা হঠাৎ। আর ঘরের লোক আরো গম্ভীর। স্থির থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে বসলাম, সুধীরের ব্যাপার কি বলো তো...কি-রকম যেন বদলেছে একটু?

ও সাগ্রহে তাকালো আমার দিকে।—তুমিও লক্ষ্য করেছ?

একটা অগোচরের অনুভূতি বুকের ওপর যেন শব্দ হয়ে বাজতে থাকল। মাথা নাড়লাম। লক্ষ্য করেছি।

একটু ভেবে ও বলল, ওর জন্যে আমি একটু দুশ্চিন্তায় পড়েছি...মাথার তো ঠিক নেই, কি থেকে কি হয়ে বসে। সেবারে তুমি ওর বিয়ের কথা বলেছিলে, আমি কান দিইনি। এখন দেখছি তুমি ঠিকই বলেছিলে...ওর বিয়ে করা উচিত।

হালকা বোধ করতে চেষ্টা করলাম। আমারই বিকৃতি ছাড়া আর কি। বন্ধু যে ওর কতখানি হৃদয়-জোড়া সে কি আমার জানতে বাকি? এ বন্ধুত্ব আজকের নয়, দু' যুগেরও ওপরের। যদি কিছু হয়েও থাকে, সেটা বন্ধুর জন্য বন্ধুর দুশ্চিন্তা ছাড়া আর কি হতে পারে?

সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে বলো তো, কোনো মেয়েটেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে নাকি?

মাথা নাড়ল। তাই। পরে বলল, একটি বিবাহিতা মেয়ে—স্বামী মস্ত ইনফ্লুয়েনসিয়াল লোক, বিপদে না পড়ে—

শোনা-মাত্র ভিতর থেকে একটা অবিশ্বাস ঠেলে উঠতে চাইল। এ যেন হতে পারে না।

তার মুখেই শুনলাম সব। হ্যাঁ, ললিতা সরদেশাইকে কেন্দ্র করেই একটা নতুন পরিস্থিতির সূচনা। মেয়েটা শুধু রূপসী নয়, বুদ্ধিমতীও। সে সন্তান চায়। তার চিকিৎসার ব্যাপারে দুই বন্ধুর মধ্যে একটা মতবিরোধ হয়েছে। প্রশান্তর ধারণা, অপারেশন হলেই ছেলেপুলে হবে। সুধীরের মত, তা নয়, গলদ যা-কিছু ললিতা সরদেশাইয়ের স্বামীর। সে জন্যেই ছেলেপুলে হচ্ছে না। ললিতার যেটুকু দোষ, সে-রকম অনেক মেয়েরই থাকে, আর তাতেও ছেলেপুলে হয়।

দুই বন্ধুর মত-বিরোধটা বড় কথা নয়। দুজনের যে কারুরই ভুল হতে পারে। কিন্তু আসল মুশকিল হল, সুধীর তার নিজের মতটা ললিতাকে জানিয়ে বসেছে, আর ললিতা সেটাই ধ্রুব সত্য ধরে নিয়েছে। এমনিতেই মেয়েটা তার নিজের স্বামীকে খুব একটা পছন্দ করে না। অবশ্য পছন্দ করার মতো লোকও নয়। ইদানীং সুধীরের সঙ্গে মেয়েটার যে-রকম মাখামাখি শুরু হয়েছে, প্রশান্ত সেই কারণেই চিন্তিত। বলল, ওর মেলামেশার ধরন তো জানো, ও-রকম বে-পারোয়া লোকের দিকেই অনেক মেয়ে ঝোঁকে। ...যাক, এ নিয়ে তুমি সুধীরকে কিছু বোলো না যেন।

বন্ধুর প্রতি যে-টান দেখেছি দুশ্চিন্তা স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্য, মানুষটা সুধীর দত্ত বলেই কি এই শোনার পরেও উতলা বোধ করছি না আমি? এটা কি আমার স্বার্থপরতা, নাকি ওই জোরালো বে-পরোয়া লোকটার প্রতি কোনোরকম অন্ধ বিশ্বাস?

দুশ্চিন্তার ভাগ আমাকে দিতে পেরে প্রশান্ত কিছুটা হালকা হতে পেরেছে মনে হল।

এরপর সুধীরকে খানিকটা সময় একলা পাবার সুযোগ খুঁজছিলাম আমি। দিন তিনেক বাদে সুযোগ মিলল। সন্ধ্যার দিকে সুধীর নার্সিং হোম থেকে টেলিফোনে জানালো, প্রশান্তর ফিরতে রাত হবে, একটা জরুরী কেস দেখতে তাকে হঠাৎ ব্যারাকপুর ছুটতে হয়েছে। খবরটা আমাকে জানাতে বলে সে বেরিয়ে গেছে।

এটা নতুন কিছু নয়। মাসের মধ্যে দু'চারবার এরকম হয়ই। শুনে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তা তোমার কাজটা কি—চলে এসো না।

ওদিক থেকে ও হেসে ঠাট্টা করল, বন্ধু কাছাকাছি নেই এই ফাঁকে বন্ধু-পত্নীর কাছে যাব বলছ?

—হ্যাঁ, এই ফাঁকে মুখ দেখতে না পেলে আর কোনোদিন মুখ দেখব না বলে দিলাম। পাল্টা ঠাট্টা করে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

আধ-ঘন্টা বাদে সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ শোনা গেল। হালকা শিস দিতে দিতে ওপরে আসছে। আমিও এগিয়ে এসে প্রস্তুত হয়ে অর্থাৎ ভ্রূকুটি করে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখেই ও বলে উঠল, প্রতীক্ষার এ আবার কি নতুন রূপ!

আমি চুপচাপ চেয়েই রইলাম। ও দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করল, উপরে উঠব না পালাব?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, পালাবার ছুতো খুঁজছ তাহলে?

বাকি সিঁড়ি ক'টা টপকে উঠে এলো।—কি রকম?

—ডেকে কোনো আনন্দে ব্যাঘাত ঘটালাম?

ও একই সুরে আবার জিজ্ঞাসা করল, কি রকম?

—ঘরে এসো। বসার ঘরে চলে এলাম। একটা সেটিতে বসলাম। ও সামনের সোফায়।—চা না কফি?

—কিছু না। আসার ঠিক আগে শ্রীলেখা আদর করে এক পেয়ালা কফি খাইয়ে দিল।

—মেয়েদের আদর-টাদর আজকাল বেশ ভালো লাগছে তাহলে?

—বরাবরই তো লাগে!

মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে আমি ঝপ করে বলে বসলাম, এক মেয়ের প্রেমে পড়ে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছ শুনলাম?

জবাবে বড় বড় চোখ করে চেয়ে রইল খানিক। তারপর ছদ্মত্রাসে জিজ্ঞাসা করল, ধরা পড়ে গেছি?

আমি মাথা নাড়লাম।—একটি বিবাহিতা মেয়ে...ঠিক বলছি?

এবারে ও মাথা নাড়ল, অর্থাৎ ঠিক। তারপর তেমনি উতলা মুখ করেই হড়বড় করে বলে গেল, তার বয়েস সাতাশ, দেখতে শুনতে মন্দ নয়, নাম চন্দ্রাণী রায়—ক'বছর ধরেই তো ওই এক মেয়ের প্রেমে মজে আছি...হঠাৎ ধরা পড়লাম কি করে?

অপরাধ-প্রবণ মুখ যদি এই হয় তো আমার লেখিকা হওয়া মিথ্যে। বললাম, দেব দুই থাপ্পড়, ললিতা সরদেশাইয়ের খবর আমরা রাখি না, কেমন?

চেয়ে আছে। চেয়েই আছে। কৌতুকে দু'চোখ চকচক করছে মনে হল। ছদ্মকোপে আমিও চেয়ে আছি।

—খবর যারা রাখে তাদের একজন তো তুমি বুঝলাম, আমরা বলতে আর কে?

আমি থমকালাম একটু, তারপর ঝাঁঝিয়ে বললাম, সে খোঁজে দরকার কি, সত্যি কিনা বলো।

হাসতে লাগল।—সত্যি। বুঝলাম, গাধাটা তোমার কাছে লাগিয়েছে তাহলে!

—এই! গাধা শুনে ধমকে উঠতে গিয়েও হেসে ফেললাম।—খবরদার, ওকে কিছু বোলো না যেন, বারবার তোমাকে ঘাঁটাতে নিষেধ করেছে।

হাসতে লাগল।—তা তো করবেই, নইলে একটু মুশকিল যে!

—তার মানে?

—না, কিছু না। সব ঠিক শুনেছ।

—দেখো, ভালো হবে না, কি বলছিলে?

সিগারেট ধরাবার ফাঁকে হাসছে মিটিমিটি।—সাধে মেয়েছেলে বলে, কোনো কিছুর গন্ধ পেলেই হল!

বে-ফাঁস কিছু বলতে গিয়েও এখন সামলে নেবার চেষ্টা করছে তাতে আমার একটুও সন্দেহ নেই।—তুমি বলবে কিনা?

ভিতরে ভিতরে কি-যেন অস্বস্তি আমার। এই লোকের মুখেও বিড়ম্বনার আভাস দেখছি?

হাসছে। সিগারেট টানছে। তবু সেই রকমই মনে হচ্ছে কেন আমার? একটু বাদে বলল, দেখো, ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কতখানি, ঠিক-ঠিক বুঝতে পারো?

অনেক কালের একটা সুপ্ত আবেগ ঠেলে উঠতে চাইল যেন। আমার থেকে বেশি বুঝতে কে পারে? সম্পর্কটা ততোখানি গভীর না হলে আমার পরিচয় মিসেস রায় না হয়ে মিসেস দত্তও হতে পারত যে, নিজের কাছে সেটা স্বীকার করলে খুব অপরাধ হবে কি?

জবাব দিলাম, বোধহয় পারি, বলে যাও।

—কিন্তু তা সত্ত্বেও যে বচন তুমি শুনতে চাইছ সেটা ওর কাছে গোপন থাকবে?

অস্বস্তি বাড়ছেই। চোখ পাকালাম, কি, নিজের স্বামীর কাছে কথা লুকোতে বলছ?

—তা হলে থাক।

আপোসের চেষ্টা করলাম, আচ্ছা, আগে শুনি কি কথা, পরে বিবেচনা করব।

—তোমার ঘাবড়াবার মতো কোনো কথা নয়, তবু বিবেচনাটা আগে না করলে আমার মুখ সেলাই।

নিজের তাগিদেই হার মানলাম।—আচ্ছা, করলাম বিবেচনা, কাউকে বলব না, বলো কি বলবে।

হাসছে তার পরেও। এই হাসিটাই কেমন অদ্ভুত লাগছে আমার। মজার কিছুই মাথায় ঘুরছে যেন।

—শুনে প্রথমেই যেন চমকে উঠো না, আমার ধারণা ললিতা সরদেশাই এমন মেয়ে যে ইচ্ছে করলে অনেক সবল পুরুষেরই মুণ্ডু ঘুরিয়ে ছেড়ে দিতে পারে। তোমার কর্তাটিকে আমি তেমন সবল পুরুষ ভাবি না, আমার মতো একটা হতভাগার জন্যেই ওর কত দরদ দেখ না, সেই ছেলেবেলা থেকে। পাছে ও ওই মেয়ের খপ্পরে পড়ে তাই বলতে গেলে তোমার মুখ চেয়ে খানিকটা ঘটা করেই ওই মেয়ের চোখ আমি ওর দিক থেকে নিজের দিকে ফিরিয়েছি।

শুনছি। আসলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুধীরকে লক্ষ্য করছি আমি। কিছু গোপন করছে কিনা বোঝার তাড়না। জিজ্ঞাসা করলাম, খপ্পরে পড়ার লক্ষণ দেখেছিলে তাহলে?

—এই গেল যা, সিরিয়াস হয়ে উঠলে যে! না, লক্ষণ একটুও দেখি নি। ও বলেছিল অপারেশন দরকার, আমি বলেছিলাম দরকার নেই। এ ভুলটা অবশ্য ওর করার কথা নয়...হয়ত পরে শুধরে নিত। আমি যা বলেছি ললিতা সরদেশাই বরাবরই তাই বিশ্বাস করত। সেই বিশ্বাসের ঝোঁকে সে তোমার ভালো মানুষ স্বামীটির কাঁধে চাপবে সে-রকম কোনো সুযোগই আমি সেই মেয়েকে দিতে চাইনি। তোমার স্বামী রত্নটি নির্দোষ এবং নিষ্কলঙ্ক।

—তা তোমারই বা মতলব কি, মেয়েটাকে সাহায্য করবে?

—আ-হা, সে-ভাগ্য কি হবে, বড় খাসা মেয়ে। সাহায্যের আশা দিয়ে সে-মেয়েকে

কাল বম্বেতে রওনা করে দিয়েছি। সেখানেও ওর স্বামীর ব্যবসা আছে—ও জানে ফাঁক খুঁজে আমিও শিগগিরই বম্বে যাচ্ছি, তারপর প্রেম জমতে আর বাধা কোথায়?

—যাচ্ছ?

মুখখানা বিমর্ষ করে জবাব দিল, ওই যে অসুবিধের কথা বললাম তোমাকে, ভিতরে ভিতরে আমি এক মেয়েরই প্রেমে মজে আছি তার নাম চন্দ্রাণী রায়। বিশ্বাসঘাতকতা করি কি করে...

মুখে ও যে কথাই বলুক, ওকে আমি চিনি—এতটা ওর প্রাণের বন্ধুও চেনে কিনা আমার সন্দেহ আছে। ললিতা সরদেশাই যে-রকম মেয়েই হোক, এই একজনের মাথা ইচ্ছে করলেই সে ঘোরাতে পারবে না সেটা আমি অন্তত বিশ্বাস করি।

কিন্তু একটা চিন-চিন জ্বালা অনুভব করছি অন্য কারণে। আমার স্বামী এই লোকের থেকে অনেক দুর্বল সে-কারণেও নয়। বন্ধুর সম্পর্কে যত হলপ করেই বলুক শ্রীলেখার ইঙ্গিত আমি ভুলতে পারছি না। কেবলই মনে হচ্ছে ওর ওপর আমি অবিচার করেছি। তাছাড়া ক'টা দিন আমি স্বচক্ষে যে ব্যতিক্রম দেখেছি সেটা ভুলবো কি করে? ক'টা দিন চঞ্চল দেখেছি প্রশান্তকে, অন্যমনস্ক দেখেছি। কেন? কেন? বন্ধুর জন্য দুশ্চিন্তায়...? দুশ্চিন্তা হতে পারে, কিন্তু ক্ষোভ কি একটুকুও ছিল না? শুধুই দুশ্চিন্তা হলে বন্ধুত্বের দাবীতে এ-কথা সে চেঁচিয়ে বলত, আর আমাকেও এ-প্রসঙ্গ তুলতে নিষেধ করত না!

হাসতেই চেষ্টা করছি, কিন্তু কি একটা কঠিন তাপ গা বেয়ে মুখের দিকে উঠে আসছে।

খানিক বাদে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করল সুধীর। তোমার মতিগতি কি রকম যেন লাগছে আজকাল! লেখা-টেখা ছেড়েই দিলে নাকি?

বললাম, না, লিখতে যাচ্ছি শিগগিরই কিছু, কিন্তু সে-লেখা তোমার পছন্দ হবে না।

দু'চোখ কপালে তুলে ফেলল।—সে কি! নার্সিং হোম নিয়ে?

জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলাম।

—কি কাণ্ড! কোনো রকম গণ্ডগোলের ব্যাপার কিছু শুনেছ-টুনেছ নাকি?

বলে ফেললাম, না শোনার কি, খুব সাদা রাস্তায় চলেছ তোমরা?

ও ভাবল, সেই অনিমা দাসের ঘটনায় এখনো আমি তেতে আছি। হা-হা শব্দে হেসে উঠল। বলল, এ-দেশের লেখক-লেখিকারা সবাই তোমার মতো সেন্টিমেন্টাল নাকি? বাস্তবে কত কি অনায়াসে ঘটে যাচ্ছে সব জানলে তো পাগল হয়ে যাবে দেখি!

এবারেও জবাব দিলাম না। মনে হল এতক্ষণের চিন-চিন জ্বালাটা যেন সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে।

## সাত

অদূর ভবিষ্যতে কিছু একটা ঘটতে পারে এজন্যে মনে মনে হয়ত কিছুটা প্রস্তুত ছিলাম আমি। এমনও মনে হত, ঘটেই যদি কিছু, আমিই হয়ত বা তার উপলক্ষ হব। কিন্তু সেটা যত মর্মান্তিকই হোক, কোনোরকম ধ্বংসের চিন্তার ঠাঁই আমার মনের ত্রি-সীমানাতেও ছিল না।

কিন্তু দুটো মাস না যেতে তাসের ঘরের মতই আমার সবকিছু এমন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পারে এ কে কল্পনা করেছিল? না, যা ঘটে গেল কেউ তার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তার প্রথম পর্বে আমি শুধু নির্বাক বোবা দ্রষ্টা। পরের অধ্যায়ে অবশ্য ধ্বংসের আগুনই আমার মাথায় জ্বলে উঠেছিল।

প্রথম ঘণ্টাখানেক পর্যন্ত কিছুই ঠাওর করে উঠতে পারিনি। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল, রাত তখন আটটাও নয়। স্বাভাবিকভাবেই—লোকটা উঠে টেলিফোন ধরল। সাড়া ছিল। আচমকা কালীবর্ণ মুখ তারপর। মনে হল, মানুষটা কাঁপছে থরথর করে। গলা দিয়ে অস্ফুট স্বর নির্গত হল, কি ভয়ানক কথা!

টেলিফোন ছেড়েই তাড়াতাড়ি আবার নম্বর ডায়েল করতে লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে?

জবাব দিল না। বিবর্ণ মুখ। উদগ্রীব প্রতীক্ষা। তারপরেই বিরক্ত হয়ে শব্দ করে রিসিভারটা নামাল। সঙ্গে সঙ্গে আবার তুলে নিল। নতুন নম্বর ডায়েল করতে লাগল। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, হয়েছে কি?

কানে ঢুকলই না।

—হ্যালো? হ্যাঁ, আমি...ডক্টর দত্ত কোথায়?...না, বাড়িতে ফোন করেছি, সেখানে নেই।...কোথায় কেউ জানে না?

রিসিভার রেখে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এমন অস্থির বিপন্ন মূর্তি আর বুঝি দেখিনি। এগিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালাম।—এত বার করে জিজ্ঞেস করছি কি হয়েছে, জবাব দিচ্ছ না কেন?

থমকে দাঁড়াল। মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপরেই আক্রোশে ফেটে পড়ল যেন, কি শুনতে চাও? সর্বনাশ হয়েছে, কেউ সর্বনাশ করেছে, আমি যাব, নার্সিং হোম যাবে, আমার জেল হবে, বুঝলে?

একটা আচমকা আঘাতে আমি বিমূঢ়। ঠিক শুনছি কিনা জানি না, ঠিক দেখছি কিনা জানি না। সর্বাঙ্গ সিরসির করছে।

হঠাৎ কাছে এগিয়ে এলো লোকটা। খুব কাছে। দুটো হাত আমার দুই কাঁধের ওপর উঠে এলো। হাত দুটো কাঁপছে টের পাচ্ছি. তবু থাবার মতো আঁকড়ে ধরতে চাইল। চাউনিটা যেন আমার মুখ ভেদ করে ভিতরে গিয়ে ঢুকতে চাইছে।—সুধীর তোমাকে এর মধ্যে কিছু বলেছে? তার হাব-ভাব থেকে কখনো কিছু আঁচ করতে পেরেছ?

নির্বোধ বিস্ময়ে আমি শুধু চেয়েই আছি তার দিকে।

—চুপ করে আছ কেন?...ও, তোমার তো আবার আমার থেকেও ওর ওপর বেশি টান—সেদিন আমাকে সাবধান করছিল আমাদের শিক্ষা দেবার মতো করে কিছু লেখার জন্য তুমি মাল-মশলা সংগ্রহ করছো বোধহয়।..সে মাল-মশলা তোমাকে কে যোগান দিচ্ছে, সুধীরই বোধ হয়?

আমারও গা-পা কাঁপছে। মাথাটা হঠাৎ ঝিমঝিম করে উঠল। ত্রাসে লোকটা পাগল হয়ে গেল কিনা বুঝতে পারছি না। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছি। চেয়ে আছি।

—বুঝতে পারছি, এখন একটু একটু সবই বুঝতে পারছি—বুঝলে? অব্যক্ত ক্ষোভে গলার স্বর প্রায় কুৎসিত ঠেকছে। চাউনিও। ললিতা সরদেশাইয়ের মতো মেয়েকেও

হাতের মুঠোয় পেয়ে দূর করে দিল কার টানে বুঝতে পারছি। আমি চলে গেলে আর আমার জেল হলে কার লাভ তাও বুঝতে পারছি!

চাপা আর্তনাদের মতো শোনালো শেষের কথা ক'টা। আমার কাঁধ ছেড়ে দিয়ে সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, নীচে নেমে যাচ্ছে। একটু বাদে মোটর স্টার্টের শব্দও কানে এলো।

আমি নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে তেমনি।

কতক্ষণ কেটেছে জানি না। হয়ত মিনিট দু'চার মাত্র। সম্বিত ফিরতে প্রথমেই টেলিফোনের দিকে ছুটে গেলাম। রিসিভার তুলে নম্বর ডায়েল করলাম। রিং হচ্ছে, কারো সাড়া নেই। প্রতিটা মুহূর্ত বুকের ওপর হাতুড়ির ঘা মেরে চলেছে।

সুধীর ফ্ল্যাটে নেই তাহলে। এবারে নার্সিং হোমে ফোন করলাম। মেট্রন সাড়া দিল। সুধীরের খোঁজ করতে জানালো, সন্ধ্যের পর ডক্টর রায় আর ডক্টর দত্ত একসঙ্গে নার্সিং হোম থেকে বেরিয়েছিলেন। তার আধ-ঘন্টা তিন কোয়ার্টার পরে সেক্রেটারী হয়ত ডক্টর দত্তকে ফোন করছিল, কারণ তার খানিক বাদে ডক্টর দত্ত আবার এসে মিস শ্রীলেখা চ্যাটার্জীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেছেন।

আমি নির্বাক একটু। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, আমার মনে হচ্ছে বড় রকমের কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে, কি হয়েছে আপনি জানেন?

ওদিক থেকে ঠাণ্ডা গলায় পাল্টা প্রশ্ন, আমি টেলিফোনে ডক্টর রায়কে জানিয়েছি, তিনি কিছু বলেননি?

থমকালাম একটু। তারপর জবাব দিলাম, না, তিনি তক্ষুনি ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেছেন।...কি হয়েছে?

একটু বাদে মেট্রনের দ্বিধান্বিত উত্তর এলো। খুব খারাপ খবর। আজ বেলা তিনটেয় একটা অপারেশন ছিল...পেশেন্ট অপারেশন টেবিলেই মারা যায়। বেলা চারটে নাগাদ ডেড-বডি ডিসচার্জ করা হয়। সন্ধ্যার পর বার্নিং ঘাটে নিয়ে যাওয়া হতে সেখানকার কর্তৃপক্ষ ডেড-বডি আটকে দিয়েছে। তারা সন্দেহজনক রিপোর্ট পেয়েছে। সেই ডেড-বডি এখন পুলিসের মারফত পোস্টমর্টেমে চলে গেছে।

পা দুটো থরথর করে কাঁপছে আমারও। মাথাটা ঘুরছে কেমন। তবু সংযত স্বরেই জিজ্ঞাসা করলাম, কি অপারেশন হয়েছিল, লেবার কেস?

—মাপ করবেন, আমি এ সম্পর্কে আর কিছু বলতে পারব না।

ফোন রেখে দিল।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বাদে ঝনঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠতে হুঁশ ফিরল যেন। ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলে নিলাম। সাড়া দিতেই কানে যেন গলানো শিসে ঢুকল একপ্রস্থ।

ও-দিক থেকে শ্রীলেখা চ্যাটার্জীর গলা। কথার মধ্যে হাসি ঝরছে বোঝা যাচ্ছে। চন্দ্রাণীদি? আমি শ্রীলেখা। টেলিফোন করতে বারণ করেছিলেন, আর আমাকে ছেঁটে দিয়েছিলেন...তবু এই দুঃসময়ে না ডেকে পারলাম না।...বড় দুঃখের কথা, শুনেছেন তো সব?

এদিক থেকে প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সংবরণ করছি আমি। কিছুই শুনিনি, তুমি বলো।...

...শোনেননি? কি আশ্চর্য! সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেছে যে! বিকেলে একটা অপারেশন হয়ে গেছে নার্সিং হোমে। ছ'মাস চলছিল মেয়েটার, ভদ্রঘরের শিক্ষিতা মেয়ে, দেখতেও ভালো, পঁচিশ ছাব্বিশ হবে বয়েস...বিয়ে হয়নি, অনেক বড় বড় রুই-কাতলার সঙ্গে দহরম-মহরম ছিল তার, ডক্টর রায় প্রথমে অপারেশন করতে চান নি...কিন্তু থোক ষোল হাজার টাকার টোপ না গিলেই বা পারে ক'জন? তাছাড়া অভ্যাস তো আছেই, টাকার অঙ্ক বাড়লে গড়রাজীর মোচড় উল্টোয়। কিন্তু আফসোসের কথা, মুশকিল-আসান হল না, মেয়েটা অজ্ঞান অবস্থায় টেবিলেই মরে বসল...আরো কি গণ্ডগোল ছিল কে জানে, তাছাড়া অ্যাডভান্সড স্টেজের এতবড় ধকল...কিন্তু সব থেকে আশ্চর্য, ঠিকঠাক মতো ডেথ্ সার্টিফিকেট দেখেও বার্নিং ঘাটের ডাক্তার ডেড-বডি আটকে দিল...আর অত কাটা-ছেঁড়াসুদ্ধ ধরা পড়ে গেল। এখন কি যে হবে...

হ্যাঁ, এই রকমই কিছু অনুমান করেছিলাম বটে। দুর্যোগ সম্পর্কে সব সংশয় ঘুচে যেতে আশ্চর্যরকম ঠাণ্ডা সংযত আমি।

—বার্নিং ঘাটে খবরটা তুমিই জানিয়েছিলে তাহলে?

ওদিক থেকে হাসির শব্দ একটু।—খুব অন্যায় করেছি বলছেন? এ-ঘটনাও আপনার ওই নোটবইয়ে জমা থাকলেই খুব শিক্ষা হত বুঝি?

—না, এই ভালো হয়েছে। তুমি খুব ভালো কাজ করেছ। ডক্টর দত্ত কোথায়?

—সুধীর? আমার কাছেই তো ছিল এতক্ষণ। ও, হি ইজ ওয়ান্ডারফুল। সেও স্বীকার করেছে আমি অন্যায় কিছু করিনি, সে চলে যেতে মনে হল আপনার সঙ্গে একটু কথা বলি। হ্যালো—

আর সাড়া না দিয়ে টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম।

বসে আছি। প্রতীক্ষা করছি। প্রশান্ত, না প্রশান্ত নয়, সুধীর আসবে। এসে কি বলবে জানি না। কিন্তু শ্রীলেখার ওখান থেকে ও এখানেই আসবে জানি। শ্রীলেখা আজ ডক্টর দত্ত বলল না, সুধীর বলল।

এলো।

আমি শোবার ঘরের খাটে বসেছিলাম, সুধীর দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। চেয়ে দেখল একটু। আমিও দেখলাম ওকে। এতবড় একটা ঝড় বয়ে গেছে মুখ দেখলে এখনো বোঝা যায় না। ঠোঁটের ডগায় যেন হাসি আটকে আছে।

কিছু না বলে ফিরে গেল। আমি ভাবলাম বসার ঘরে গিয়ে বসল। একটু বাদে উঠে এসে দেখলাম বসার ঘরে নেই। আমার লেখার ঘরে পায়চারি করছে, টেবিলের আর বইয়ের তাকের এটা-ওটা নাড়া-চাড়া করছে।

পিছন ফিরে আমাকে দেখে হাসল একটু। বলল, এমন দিনেও আমাকে সাহিত্য চর্চায় পেয়ে বসেছে, তাই এ-ঘরে ঢুকে পড়লাম। বেশ ভালো করে এক কাপ চা খাওয়াও দেখি।

আমি দেখছি ওকে। ওই মুখ খুঁড়ে খুঁড়ে দেখতে চাইছি। বললাম, সন্ধ্যা থেকে পাগলের মতো খুঁজছিল তোমাকে—সব জেনেও সরে ছিলে কেন?

—আর বলো কেন, যাকে বলে প্রেমে—পোড়া কপাল আমার। এখন আবার শ্রীলেখা দেবী কাঁধে ভর করার জন্যে ক্ষেপে উঠেছেন—তাকে একটু সামলে-সুমলে এলাম। নাও, চা আনো—

—চা শ্রীলেখা দেবী খাওয়ায়নি।

—খাইয়েছে, তবু সে কি আর তোমার হাতের মতো মিষ্টি?

আমি অপলক চোখে দেখছি ওকে। মাথার মধ্যে তেমন কিছু হতে না থাকলে আমার খেয়াল করার কথা, বইয়ের তাকগুলো একটু খুঁটিয়ে দেখছে ও। এই ঘরেও সাময়িক বিশ্রামের মতো ছোটখাটো একটা শয্যা বিছানো। তার সামনেই ড্রেসিং টেবিল।

সেই বিছানায় গিয়ে বসল। বালিশটা টেনে নিয়ে কনুইয়ের তলায় চেপে এদিক-ওদিক তাকাল। আমার মাথায় আগুন জ্বলতে না থাকলে তখনো এই হাব-ভাব দেখে খটকা লাগতে পারত।

বললাম, এত বড় ব্যাপারের পরেও তোমাকে এমন নিশ্চিন্ত দেখছি কেন? অপারেশনটা তুমি নিজের হাতে করোনি বলে? তুমি একেবারে পার পাবে ভেবেছ? শ্রীলেখা চ্যাটার্জী সাক্ষ্য দিয়ে রক্ষা করবে তোমাকে?

জবাব দিল না। শুধু চেয়ে রইল খানিক। তারপর হঠাৎ উঠে ড্রেসিং টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়াল। আয়নার পাশের খুপরি ড্রয়ারটা খুলল। ওতে নীচের বড় ড্রয়ারের চাবি। চাবিটা হাতে নিল। একটা চাবি বেছে বড় ড্রয়ারে লাগাতে আমার সব স্নায়ু একসঙ্গে যেন ঝনঝন করে উঠে জানিয়ে দিল, ও কেন এ-ঘরে ঢুকেছে, চায়ের অছিলায় কেন আমাকে এ-ঘর থেকে সরাতে চেয়েছে—ও কি খুঁজছে!

আমার সেই নোটবইটা ওর চাই। শ্রীলেখার কাছে শুনেছে ওতে এমন সব তথ্য আছে যা ওই নার্সিং হোমের পক্ষে বিপদজনক। সেই মুহূর্তে আমার মনে হল নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যেই শুধু ও এটা খুঁজছে—ওর সম্পর্কেও অভিযোগ আছে কিনা দেখে নেবার জন্য।

ড্রয়ারটা টেনে খোলার আগেই ছুটে এসে সজোরে ধাক্কা মেরে সরালাম ওকে। নোটবইটা আমি হাতে পাবার আগেই ধস্তাধস্তি শুরু হল। ড্রয়ারটা খুলতে না পেরে এক প্রবল হ্যাঁচকা টানে আমাকে কাছে টেনে এনেই গালের ওপর আচমকা প্রচণ্ড চড় একটা। সঙ্গে সঙ্গে চোখে অন্ধকার দেখলাম আমি। সেই অবস্থায় আমাকে টেনে এনে ধুপ করে বিছানার ওপর ফেলল। ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলে নোটবইটা হাতে নিয়ে একবার ভিতরটা দেখে নিল। তারপর ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

আমি নির্বাক দ্রষ্টা। বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত যেন। একটু বাদে ড্রয়ারখোলা ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালাম। যন্ত্রের মতো ড্রয়ারটা ঠেলে বন্ধ করলাম। আয়নায় নিজের দিকে চোখ পড়ল। গালের ওপর পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গেছে।

টেলিফোন।

নার্সিং হোমের মেট্রন। উতলা স্বরে জানালো, একটু আগে পুলিসের লোক এসে ডক্টর রায়কে থানায় নিয়ে গেল। ডক্টর রায় যেন তাদের অপেক্ষাতেই নার্সিং হোমে বসেছিলেন।

পরদিনের খবরের কাগজের প্রথম পাতায় রোমহর্ষক মর্মান্তিক ঘটনার খবর ছাপা হল ছোট বড় নানান হরফে। মাঝখানে পশু-পুরুষের লোভের বলি যে মেয়েটা, তার ছবি। একটি সুশ্রী মেয়ে ঘুমিয়ে আছে যেন।

অনেক বড় বড় তথাকথিত পয়সাঅলা পদস্থ ভদ্রলোক এই ব্যভিচারের সঙ্গে জড়িত আছে, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত। সময়ে খবর দেবার জন্য নার্সিং হোমের সেক্রেটারী শ্রীলেখা চ্যাটার্জীর ভূয়সী প্রশংসা। আত্মরক্ষার চেষ্টায় শেষ নৃশংসতার নজির হিসেবে নামী নার্সিং হোমের বিলেত-ফেরত ডাক্তারকে বহু হাজার টাকার টোপ গেলানোর বিবরণ। কি নৃশংসভাবে শেষ সময়ে হত্যা করা হয়েছে ফুলের মতো একটা মেয়েকে তার অনুমান-সূচক গবেষণা।

সম্পাদকীয়তেও এই সংবাদ এবং তীক্ষ্ণ কশাঘাত। ওই নৃশংস মানুষদের লোক-চক্ষে এবং আদালতে টেনে আনার হুমকি, অসাধু ডাক্তারকে চরম শাস্তি দেবার দাবি।

টেলিফোন এলো গোটা দুই তিন। শুভার্থী ডাক্তারদের আক্ষেপ, সস্নেহ উপদেশ। আমি নির্বাক।

সকাল পেরুলো। দুপুরও কাটতে চলল। আমি বসেই আছি চুপচাপ। আমার কি করণীয় আছে আমি জানি না। থানায় ফোন করে খবর নিইনি। কোনো উকিল ব্যারিস্টারের কাছে গিয়ে পরামর্শও চাইনি। বারবার কেবল একটা কথাই মনে হচ্ছিল। এই শহর ছেড়ে সভ্যতার এই আলো বাতাস ছেড়ে এমন কোথাও যাওয়া যায় সেখানে কোনো চেনা মুখের সঙ্গে এ-জীবনে আর দেখা হবে না।...আছে এমন জায়গা?

বিষম চমকে উঠলাম। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ও কে? শাড়ির আভাস দেখলাম। আমি মুখ তুলতে সরে দাঁড়াল। ধড়মড় করে উঠে এগিয়ে এলাম।

—তুমি!

নিজের চোখকে বিশ্বাস করব কিনা জানি না। সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীলেখা চ্যাটার্জী। বিবর্ণ পাণ্ডুর আতঙ্কগ্রস্ত মুখ তার। একদিনের মধ্যে এ-রকম পরিবর্তন কল্পনা করা শক্ত। কি এক অস্বাভাবিক ভয় যেন ওর দু'চোখে জমাট বেঁধে আছে। প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, ডক্টর সুধীর দত্ত এখানে নেই তো?

আমি মাথা নাড়লাম। নেই।

একটু ভরসা পেয়ে সামান্য এগিয়ে এলো। বলল, আমি আপনার সব থেকে বেশি ক্ষতি করেছি...কাল যখন ওই মেয়েটার অপারেশন চলছিল, আমি তখন পাগল হয়ে গেছলাম, কেবল মনে হচ্ছিল সেই—সেই একবারের মতো ওরা আমাকেই কাটছে আবার। এমন জঘন্য কাজ করেছে বলে ডক্টর রায়কে আমি এখনো ঘৃণা করি...কিন্তু আপনাকে আমি ভালোবাসি চন্দ্রাণীদি, তাই সাবধান করতে এলাম, আপনিও পালিয়ে যান এখান থেকে, ডক্টর দত্তর কাছ থেকে দূরে চলে যান, সে সাংঘাতিক লোক, সে শয়তান!

আমার প্রথম থেকেই মনে হয়েছে ও অপ্রকৃতিস্থ। বললাম, ঘরে এসে বসবে?

—না না! আমি এক্ষুনি যাব, ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে, ওতে আমার বেডিং আর স্যুটকেস আছে। ডক্টর দত্ত আমাকে খুন করতে গিয়েও দয়া করেছে, বলেছে, আজকের মধ্যেই কলকাতা ছেড়ে চলে না গেলে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না, আর পুলিস যদি সাক্ষী দেবার জন্য আমাকে খুঁজে পায় তাহলে পরে আর আমার মৃতদেহ কোথাও খুঁজে পাবে না। নিখোঁজ হবার জন্য আমাকে সে অনেক টাকা দিয়েছে—নগদ দশ হাজার টাকা। আমি চলে যাচ্ছি, এ-জীবনে আর আপনার সঙ্গে দেখা হবে না। কিন্তু

যাবার আগে আপনাকে আমি সাবধান করে যেতে এসেছি। আমি বরাবর জানি ডক্টর দত্ত আপনাকে পছন্দ করে—এখন সে হয়ত আপনাকে হাতের মুঠোয় পুরতে চাইবে—সময় থাকতে আপনিও পালান চন্দ্রণীদি।

কথা শেষ করেই ও সিঁড়ি দিয়ে নীচে ছুটল।

আমি হতভম্ব খানিকক্ষণ। মাথার মধ্যে কি-রকম যেন জট পাকিয়ে গেছে। পরিষ্কার করে কিছুই ভাবতে পারছি না। নিজের অগোচরে একটা হাত গালের ওপর উঠে এলো...সুধীরের আঘাতের দাগ মিলিয়েছে হয়ত, অনুভূতিটা আছে।

কিছুই ভাবতে পারছি না বটে। তবু মন বলছে এখনো কিছু ঘটতে বাকি। কিছু একটা ঘটবে। ঘটবেই।

ঘটল।

সন্ধ্যার পর নিঃশব্দ পায়ে যে লোকটা ওপরে উঠে এলো, তাকে আমি আশা করিনি। প্রশান্ত। আমার স্বামী ডক্টর প্রশান্ত রায়।

একদিনে কালী-বর্ণ মুখ। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। দুই চোখ গর্তে। কাল সমস্ত রাত ঘুমোয়নি দেখেই বোঝা যাচ্ছ। খাওয়াও জোটেনি হয়ত।

মুহূর্তের মধ্যে কি যে হল আমার জানি না। কাছে এগিয়ে এলাম। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম। গলার স্বরও নরম নয়।

—তুমি! তোমাকে ছেড়ে দিল?

জবাব দিল না। মাথা নাড়ল শুধু। শূন্য দৃষ্টি। একটু বাদে বিড়বিড় করে বলল, সুধীর কি কাণ্ড করেছে আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না...ওরা আমাকে ছেড়ে দিল...ভুলের জন্য ক্ষমা চাইল...তুমি কিছু জানো না?

আমি কোনো কথাই বলতে পারছি না। চেয়ে আছি শুধু। কি এক অজ্ঞাত আশংকায় শরীরটা আমার নতুন করে কাঁপছে আবার।

নিজের ঘরে চলে এলাম। প্রশান্ত বসার ঘরে একটা সোফায় গা ছেড়ে দিয়ে নির্জীবের মতো পড়ে আছে। আমার ও-ঘরে যেতে ইচ্ছে করছে না।

ছটফটানি বাড়ছেই। আর থাকা গেল না। বসার ঘরে এলাম। যা বললাম, নিজের কানেই রুক্ষ ঠেকল।—উঠে সুধীরকে টেলিফোন করে জানতে চেষ্টা করবে কি হয়েছে?

উঠল। শরীরটাকে টেনে টেনে টেলিফোনের দিকে চলল। এই মূর্তি দেখে আমার মায়া হবার কথা। কিন্তু হচ্ছে না।

একটু বাদেই ফিরে এলো। মাথা নাড়ল। অর্থাৎ ধরা গেল না।

আরো আধ-ঘন্টা গেল। কি ভেবে হঠাৎ আমিই টেলিফোনের রিসিভার তুললাম। নার্সিং হোমের নম্বর ডায়েল করলাম। মেট্রনের গলা। তাকে খবর জিজ্ঞাসা করতে সে জানালো, ডক্টর দত্ত এখানেই ছিল বিকেল প্রায় ছ'টা পর্যন্ত। এখান থেকে পুলিস এসে তাকে নিয়ে গেছে, ওই অপারেশনের রেকর্ডপত্রও সব নিয়ে গেছে। শেষে গলা খাটো করে বলল, আপনি এখানে এলে কিছু বলতে পারি, টেলিফোনে বলার অসুবিধে আছে।

টেলিফোন রেখে নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম খানিক। শরীরের রক্ত মাথার দিকে উঠছে।...এই সুধীরই না গত সন্ধ্যায় আমার গালে প্রচণ্ড চড় মেরে, আমাকে ঠেলে এনে বিছানায় ফেলে ড্রেসিং টেবিলের বড় ড্রয়ার থেকে আমার সেই নোটবই নিয়ে

চলে গেছে? তবু এ-রকম লাগছে কেন আমার? তার অমঙ্গলের আশংকায় বুক দুরুদুরু করছে কেন?

শোবার ঘরে ছুটলাম হঠাৎ। দু'তিন মিনিটের মধ্যে পরনের শাড়িটা বদলে নীচে নেমে এলাম। সোজা রাস্তায়। একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে বসলাম।

ফিরলাম প্রায় দেড় ঘণ্টা বাদে। পা অবশ। সর্বাঙ্গ অবশ। মাথায় শুধু আগুন জ্বলছে। চোখও জ্বলছে কিনা জানি না। দোতলায় উঠে এসে ওই ড্রইং রুমেই ঢুকলাম আবার। প্রশান্ত তেমনি সোফায় গা এলিয়ে বসে আছে।

—শোনো!

ও চমকে উঠল। তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল অসহায় চোখ মেলে। কিন্তু আমার মধ্যে তখন মায়া-মমতার লেশমাত্র নেই।

—সুধীরের সব খবর আমি এইমাত্র জেনে এলাম। তুমি জানতে চাও?

ও তেমনি চেয়ে আছে। আমার বিশ্বাস অনুমানও করতে পারছে আমি কি বলব।

বলে গেলাম, বেলা চারটের আগে থেকে সে নার্সিং হোমে ছিল । তার আগে শ্রীলেখাকে ভয় দেখিয়ে কলকাতা থেকে তাড়িয়েছে। নার্সিং হোমে গিয়ে পিছনের তারিখ দিয়ে অপারেশন ফর্ম-এ নিজের নাম সই করেছে, চার্টে আর রেকর্ডেও নিজের নাম সই করেছে—তোমাব সই-এ অফিসিয়াল যা কাগজ-পত্র ছিল সব পুড়িয়েছে। শেষে পুলিসের বড়কর্তাদের টেলিফোনে জানিয়েছে সমস্ত অপরাধ তার— তুমি তাকে বাঁচাবার জন্যেই সত্য স্বীকার করছ না। আর বলেছে, তার আগে ওর কথায় বিশ্বাস করে তুমি ডেথ সার্টিফিকেট সই করেছ। বলেছে, টাকার লোভে ওই পেশেন্ট সুধীরই অ্যাডমিট করেছে, তুমি কিছুই জানতে না। প্রমাণস্বরূপ পুলিস খোঁজ করলেই তার সুইট সার্চ করলে বাক্সের তলায় পার্টির দেওয়া ষোল হাজার টাকা পাবে। কিন্তু বন্ধুর উদারতা দেখে সে সত্য স্বীকার না করে পারছে না, তোমাকে ছেড়ে দিতে অনুনয় করে নিজে সব প্রাপ্য শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছে।...নিজের ঘর বন্ধ করেই সে টেলিফোনে পুলিসের সঙ্গে এসব কথা বলেছে। কিন্তু মেট্রনের সন্দেহ হতে সে তার ঘরের সাব-লাইনের রিসিভার তুলে এ-সব কথা শুনেছে। পরে সুধীর মেট্রনকে আর নার্সকে ডেকে শাসিয়েছে, পুলিস কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাদের বলতে হবে অপারেশনের আগে তাদের বিদায় করা হয়েছিল। এ-ছাড়া একটি বে-ফাঁস কথা বললে তাদেরও এই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত করা হবে, কেউ রেহাই পাবে না।...পুলিস তাদের কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। কাগজ-পত্র দেখে আর তার ঘরে ষোল হাজার টাকা পেয়ে সবই বিশ্বাস করেছে। তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে।

স্তব্ধ নির্বাক মুহূর্ত কয়েকটা। আমি তীব্র তীক্ষ্ণ চোখে দেখছি তাকে। একটা নিষ্প্রাণ মূর্তি দেখছি।

—এখন তুমি কি করবে? এরকম মুখ করে আছ কেন? মুক্তি পেয়েছ, আনন্দ হচ্ছে না?

পরদিন সকালের কাগজে বড় বড় হরফে বড় খবর আবার। আসল আসামীর

আত্মসমর্পণের সংবাদ। তার ঘৃণ্য কারসাজির খবর। সেই সঙ্গে বন্ধুকে বাঁচানোর চেষ্টায় ডক্টর প্রশান্ত রায়ের আচরণের সাধুবাদ এবং মৃদু ভর্ৎসনা।

বিচারে পাঁচ বছর জেল হয়ে গেল সুধীর দত্তর। ডাক্তারীর লাইসেন্স আর ডিগ্রীও বাজেয়াপ্ত করা হল।

এতদিনের মধ্যে প্রশান্তর সঙ্গে আমার দশটা কথা হয়েছে কিনা সন্দেহ। তা সত্ত্বেও সাধ্যমত চেষ্টা করেছি আমরা সুধীরের হয়ে। কিন্তু খুব একটা চেষ্টার পথ সে-ই রাখেনি। সমস্ত অপরাধ স্বীকার করলে চেষ্টার আর থাকে কি? এর মধ্যে থানায় ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য কত আকূতি করেছি আমি। কিন্তু ও-ই দেখা করতে রাজী হয়নি।

শাস্তি ঘোষণার পরদিন দেখা করার অনুমতি পেলাম। নার্সিং হোম সংক্রান্ত জরুরী কিছু জেনে নেওয়ার প্রয়োজনে এই সাক্ষাৎকারের অনুমতি মিলেছে—তার অবর্তমানে নার্সিং হোমের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দায়িত্ব আমার—এ কথা লেখা হয়েছিল।

বেরুবার মুখে প্রশান্তকে সামনে পেলাম। বললাম, সুধীরের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি...ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তো কিছু ঠিক করতে হবে...এ-ভাবে আর ক'দিন চলতে পারে।

পিছনের দিকে না চেয়েই নেমে এসে গাড়িতে উঠেছি।

আমি বিশিষ্ট মহিলা। সাক্ষাৎকারের জন্য আলাদা একটা ছোট ঘরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ভেবেছিলাম শক্ত থাকব। কঠিন হয়ে থাকব। কিন্তু ও এসে সামনে দাঁড়ানোমাত্র বুকের ভিতরটা যেন ডুকরে কেঁদে উঠল। অতি কষ্টে সংবরণ করতে চেষ্টা করছি নিজেকে। ও সামনে দাঁড়িয়ে। মুখে সেই দুষ্টু দুষ্টু হাসি।

বললাম, তুমি বলতে এঁরা তোমাকে আঁস্তাকুড় থেকে কুড়িয়ে জীবন দিয়েছে। ...এতদিনে সেই ঋণ শোধ করলে?

ও হাসিমুখে মাথা ঝাঁকালো। তাই।

—বেশ করেছ। কিন্তু আমার কারো কাছে কোনো ঋণ ছিল না? এরপর আমি কি করব?

—একথা বলছ কেন?

—বলব না? তুমি...তুমি কি ভেবেছ আমাকে? বলতে বলতে স্থানকাল ভুলে এগিয়ে এসে পাগলের মতই দু'হাতে আঁকড়ে জড়িয়ে ধরলাম ওকে। বলে উঠলাম, বেশ, বলব না, কিচ্ছু বলব না, দূরে কোথাও গিয়ে পাঁচ বছর আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব—তারপর পৃথিবী-সুদ্ধু মানুষ তোমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকলেও আমি তোমাকে এমনি করে ধরে থাকব—আর কোনো দিন চোখের আড়াল করব না!

আমি কাঁদছি। কিন্তু ওর মুখে বেদনার ছায়া দেখছি কেন? ও আর হাসছে না কেন?

আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। জিজ্ঞাসা করল, তুমি আমাকে ভালোবাসো?

—বাসি বাসি, কত ভালোবাসি আমি নিজেও এতদিন জানতুম না সুধীর। তোমার জন্যে আমি আজ সব করতে পারি, তোমার জন্য আমি মরতেও পারি।

—ঠিক?

মুখের দিকে চেয়ে থমকালাম আমি। ও বলল, আমাকে যদি ভালোবেসে থাকো

আর আমাকে যদি চিনে থাকো, আমার একটি কথারও নড়চড় করো না। পাঁচ বছর বাদে আমি তোমাদের দুজনের সংসারে ফিরে আসতে চাই, এখানে থেকো না, প্রশান্তকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাও, আজ ওর থেকে বড় দুঃখী আর বোধহয় কেউ না।

—না না! সুধীর!

—শোনো। যে মুহূর্তে তুমি আমার বন্ধুকে ছাড়বে, জেনে রেখো সেই মুহূর্তে তুমি আমাকেও ছেড়েছ।

—সুধীর!

—আমি যা বলছি তাই শেষ কথা। ওর বুকের ভেতরটা কত বড় আমিই জানি। সেই জন্যেই বলছিলাম, ওর থেকে বড় দুঃখী আর কেউ না। ওর এই দুঃখকে তুমিও যদি অসম্মান করো, তাহলে আর বাকি থাকল কি? আমি তোমাকে বলছি ও আমার থেকে একটুও ছোট নয়...এই যুগের লোভ আমাদের খেয়েছে, ও উপলক্ষ মাত্র। আর এই যুগের লোভটা এমনি যে তোমার মতো মেয়েও সেটা ঠেকাতে পারল না, তুমি ওকে ছাড়ার কথা বলছ? তুমি থাকতে ও এ-রকম হতে পারল, তোমার দায় নেই? তোমার দোষ নেই?

আমি নির্বাক, স্তব্ধ।

ও হাসছে আবার। বলল, কথা দিচ্ছি পাঁচ বছর বাদে তোমাদের কাছেই ফিরে যাব। কিন্তু এ-রকম ঘরে নয়, দুষ্টু হাসি উপচে পড়ছে এবার, আরো ভরাট ঘরে—একটা অন্তত ছেলে বা মেয়ে না থাকলে সেটা কি ঘর?

আমি চেয়েই আছি ওর মুখের দিকে। আর ও হাসছে। বলল, আমার বিশ্বাস, তুমি পাশে থাকলে তোমার স্বামী রত্নটি এবারে পুড়ে পুড়েই সোনা হয়ে যাবে।

## আট

সোনা হয়েছে।

লজ্জার মাথা খেয়ে স্বীকার করছি সোনাই হয়েছে।

বেলা দেড়টা বেজে গেল প্রশান্তর এখনো দেখা নেই। এই রকমই অনিয়ম করে চলেছে। ধমকালে বলে রোগীরা ছাড়ে না...কি করব। কত রোগা হয়ে গেছে আমিই জানি।

বেজায় খিদে পেয়েছে আমার। তাই ছেলেটার সঙ্গেই খেলায় মেতেছি। ওকে নেড়েচেড়ে খুনসুটি করছি। ও এক-একবার হাসছে খিল খিল করে।

শেষে একবার ধাক্কা দিয়ে বললাম, না, তোর নাম সুধীর রাখব না, কলকাতার সেই পাগলটা এসে শুনলে ঠাট্টার চোটে আমাকে অস্থির করে মারবে—তার থেকে তুই সুবীর—কাছাকাছি হল।

পায়ের শব্দে ফিরে তাকালাম। বাবু আসছেন এতক্ষণে ঘেমে নেয়ে। বড় ব্যাগটা পাশে রেখে বসল ধুপ করে। আমি উঠে পাখাটা জোরে চালিয়ে দিলাম। তারপর বসে পায়ের জুতো খুলে দিতে লাগলাম।

আগে রোজ এই নিয়ে রাগারাগি হত। কিছুতে জুতোয় হাত দিতে দেবে না। শেষে

হার মেনে হাল ছেড়েছে। এখন মনে মনে যে খুশিই হয় বুঝতে পারি।

জুতো জোড়া সরিয়ে রেখে হাত ধুয়ে এসে দেখি, মানুষটার অন্যমনস্ক দু'চোখ দেওয়ালের ক্যালেন্ডারের দিকে। বড়সড় একটা নিঃশ্বাসও কানে এলো।

আমি বললাম, ও কি?

অপ্রস্তুত একটু। হাসতে চেষ্টা করল।—না...ভাবছিলাম ওই পাগলটার আসতে এখনো দেড় বছর দেরি।

আমি ধমকের সুরে বলে উঠলাম, তুমি ওঠো তো এখন, প্যান্টফ্যান্ট ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে নাও, আমার খিদে পেয়ে গেছে। তারপর নরম করে বললাম, দেড়টা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে...।

# যার যেথা ঘর

উৎসর্গ

শ্রীসুকমল ঘোষ

অগ্রজভাজনেষু

আমি যা হতে পারতুম তা হইনি। কাহিনী বলুন, গল্প বলুন, এটুকুই সব। এটুকুই শেষ।

শুরুতেই এই শেষের আঁচড় বর্ণশূন্য লাগার কথা। বর্ণ মানে যদি রঙের চটক হয়, তাহলে তাই লাগবে। কিন্তু, মুখ দেখাবার আগে যে সূর্যটা শ্লেট-রঙা পুবের আকাশের পরতে পরতে লালের পিচকিরি ছোটায়, আর বিদায়ের পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিমের আকাশে নরম আবির ছড়িয়ে রাখে—রঙ বলতে সেটুকুই যদি বেশি মনে ধরে, তাহলে বর্ণশূন্য নাও লাগতে পারে।

...আমি যা হতে পারতুম তাতে রঙের চটক আছে। আর, তা না হওয়ার মধ্যে রঙের প্রসাদ আছে।

কিন্তু সূর্যের কি শুধু রং নিয়ে কারবার? শুধু রং ছড়ানো কাজ? সে জ্বলে না? দপ্কায় না? জ্বলুনি যখন মধ্যগগনে, তার আলোও তখন অসহ্য লাগে না?

জ্বলে। দপ্কায়। অসহ্য লাগে। কিন্তু একমাত্র সে-ই সব কালো সব অন্ধকার চেটেপুটে খায়।

মেয়েদের জীবনে একটি সূর্য দরকার। একজন সূর্য দরকার। যে রঙ ছড়াতে জানে, জ্বলতে জানে, দপ্কাতে জানে। কালো দূর করতে জানে। দরকার যে, তার নজির আমি। আমি যা হতে পারতুম তা হইনি।

কি হতে পারতুম, আমি আর তা ভাবতে পারি না, ভাবতে চাই না। ভাবতে গেলে আমার সর্ব্ব অঙ্গে কাঁটা দেয়। আমার কাহিনী বলুন, গল্প বলুন, এটুকুই সব। এটুকুই শেষ।

তবু এটুকুই জনে-জনের কাছে ঘোষণা করার একটা তাগিদ প্রায়ই অনুভব করি। বিশেষ করে সেই মেয়েদের কাছে যারা আমারই মত ভুলের বীজ বুনে খাঁটি ফসল আশা করে।

আগে আমার চিত্রটা একটু স্পষ্ট হোক। আমার নাম আরতি। আরতি বসু। আগে মিত্র ছিলাম, পরে বসু হয়েছি। বসু-মিত্রের যোগটা আত্মীয়-পরিজনেরা নানা জনে নানা চোখে দেখেছে। সে-কথা থাক। আমার বয়েস এখন তেত্রিশ। এ-বয়েসটা এখন খুব বেশি লাগে না। পাঁচ বছর আগেও ওটা তিরিশের দিকে গড়াচ্ছে দেখে মেজাজ খারাপ হত। সেই গড়ানোটা অপরের চোখে স্পষ্ট না হয়ে উঠতে দেবার সঙ্গোপন আর সক্রিয় তাগিদও একটু ছিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্থূল আত্মদর্শনে আর সুচারু প্রসাধনে আমার অনেক সময় কেটে যেত। কিন্তু এখন একজনের কাছে অন্তত 'বুড়ী হয়ে গেলাম আর কেন' গোছের কথা বলতে বাধে না।

সেই একজন আমার ঘরের লোক। নাম সুনন্দ বসু। তার বয়েস চল্লিশ। আমার থেকে সাত বছরের বড়। বড় হলেও আগে অনেকের সামনেই দিব্বি নাম ধরে ডাকতে পারতুম। এই ডাকার মধ্যে আধুনিকতার গর্ববোধটুকু স্পষ্ট হয়ে উঠত। আর একজনের সেটা পছন্দ হত কি হত না, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর অবকাশ ছিল না। কিন্তু এখন আর নাম ধরে ডাকতে পারি না। আর, এই না-পারার মধ্যেও যে বেশ একটু আনন্দ আছে সেটুকু যারা অনুভব করতে পারে তারাই জানে।

বউয়ের নিজের মুখে বয়সের কথা শুনলে আর পাঁচ জন স্বামী-ভদ্রলোক কি বলে, কি জবাব দেয়?

ছদ্ম কোপে চোখ রাঙায়, নয় তো নিজেকে ঢের বেশি বুড়ো বলে জাহির করে।

কিন্তু আমার ভদ্রলোক কিছুই করে না। একটু ভারী দুই ঠোঁটের কোণে সামান্য কৌতুক ঝিলিক দেয়, আর সাদামাটা চোখের দৃষ্টিটা আমার দিকে আর একটু মনোযোগী হয়। তাইতেই একটা অস্বস্তিকর লজ্জায় আমার কান গরম হয়। মুখও লাল হবার কথা, কিন্তু আমি তেমন ফর্সা নই। ওই কৌতুক আর ওই মনোযোগ পুরুষেরই বটে।

শাস্ত্র-টাস্ত্র পড়িনি। আমার ঠাকুমার দৌলতে শাস্ত্রোক্তি কিছু শোনা আছে। কথায় কথায় তার শাস্ত্রবচন আমাদের কখনো কৌতুকের খোরাক যোগাতো, কখনো বা কানের পরদা বিদ্ধ করত। ঠাকুমা বুড়ী বলত, পুরুষ একজনই। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তিনি বিনা আর পুরুষ নেই। আমার তখন চোদ্দ বছর বয়েস হলেও বেশ পাকাপোক্ত মেয়ে আমি। ঠাকুরদার বড় ছবিটা দেখিয়ে চোখ রাঙাতাম, বলতাম, ওই বুড়োটাও যদি মেয়ে, তোমার সংসারের এত ডালা-পালা গজালো কি করে?

ঠাকুমা হাসত। হাসিটা ভারি তৃপ্তির হাসি মনে হত আমার। ঠাকুমার পাঁচ ছেলে পাঁচ মেয়ে। বলত, কৃষ্ণের অংশ তাই কিছুটা পুরুষই বলতে হবে। ঠাকুমার রসনা এক-এক সময় বেশ রসিয়েও উঠত। বলত, গেছে হাড় জুড়িয়েছে, নইলে বাড়ি ভরতি তোদের মত ডবকা ছুঁড়ীগুলোকে কি আস্ত রাখত! ওই কেষ্ট ঠাকুরের স্বভাবচরিত্তির তো আমার জানতে কিছু বাকি নেই।

এও যে এক ধরনের অনুরাগের কথা সে আমরা খুব ভালোই জানি। অনেক দিনের কথা, এখনো মনে আছে ঠাকুরদা চোখ বুজতে ঠাকুমা তিন দিন অজ্ঞান হয়ে ছিল।

নিরক্ষরা ঠাকুমার শাস্ত্রবচন এখন আমার মাঝে মাঝে মনে পড়ে। মাঝে মাঝে কেন, প্রায়ই মনে পড়ে। মনে হয়....দুনিয়ায় পুরুষ কি সত্যিই খুব বেশি আছে? আর, সব মেয়ের জীবনেই কি সেই পুরুষ আসে?

যা বলছিলাম, আমার বয়সের প্রসঙ্গে লোকটার পুরু ঠোঁটের ফাঁকে কৌতুকের আভাস আর চোখের দৃষ্টিতে মনোযোগ দেখেই যে অস্বস্তিকর লজ্জায় আড়াল খুঁজি আমি তাই নয়। তক্ষুনি সেই ঠোঁটকাটা ডাক্তারের কথা মনে পড়ে যায়। কি লজ্জা, কি লজ্জা! মনে পড়লে এখনো ঘেমে উঠি। ব্যাপারটা বলি।

কাজ নেই কর্ম নেই ইদানীং বড় বিচ্ছিরি লাগত আমার। মনে হত সংসারের যে চাকাগুলো কাদায় পড়ে গেছে সেগুলো আবার টেনে তোলার তাড়নায় একলা একটা মানুষ দিনরাত হিমশিম খাচ্ছে—তার পাশে আমি যেন বড় বে-খাপ্পা রকমের বেকার। শুধু তাই নয় সংসারের ওই চাকাগুলো কাদায় পড়ে যাবার মধ্যে আমারও বেশ খানিকটা বিকৃতি ছিলই। আমার ধারণা বর্তমানের এই পরিস্থিতি সবটাই সেই কারণে। আর একজন এখন সে-কথা স্বীকার করুক না করুক, এই সত্যটার দিক থেকে আমি একেবারে চোখ ফিরিয়ে থাকতে পারিনে। হয়ত এ-সব কারণেই মাঝে মাঝে একটা বিষণ্ণ ভার আমার মধ্যে চেপে বসছিল। তখন কিছু ভলো লাগে না, মাথা ধরে। এক-একসময় মনে হয়, খুব নিরিবিলিতে সক্কলের অলক্ষ্যে বসে একটু কাঁদতে পারলে বেশ হত।

কিন্তু মনের এই ইচ্ছে তো কারো কাছে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিনি কখনো। তবু জানল কি করে? রোজ ফিরতে যেখানে রাত হয়, সেদিন সন্ধ্যার অনেক আগেই বাড়ি ফিরল মানুষটা। বলল, এক জায়গায় যাব, রেডি হয়ে নাও।

আমি মনে মনে একটু অবাক হলাম, কিন্তু কোথায় যেতে হবে নিজে থেকে বলল না যখন আমিও কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। আমার ব্যবহারের এই পরিবর্তন নিজের কাছেই প্রায় বিস্ময়কর। কিন্তু এ পরিবর্তন আপনিই এসেছে, চেষ্টা করতে হয়নি। আগে হলে পাঁচ বার জেরা করতাম, সঙ্গে নিয়ে বেরুবার উদ্দেশ্য পছন্দ না হলে তক্ষুনি বাতিল করে দিতাম। আর তার মধ্যেও বিরক্ত আর বিতৃষ্ণার ঝাঁঝই বেশি থাকত।...আর আগে হলে ওই লোক ঠিক এভাবে বলতও না।

শুধু জিজ্ঞেস করলাম, আমি একা না ওরাও রেডি হবে?

ওরা বলতে আমার দুই মেয়ে রুমু ঝুমু। রুমুর বয়েস দশ, ঝুমুর সাত। আমার এক-একসময় মনে হয় এরই মধ্যে ওরাও বাপের স্বভাব পাচ্ছে। আগে এ-কথা মনে হলে রাগে গা রি-রি করত।...এখন আবার সেই ঠাকুমার কথাই মনে পড়ে। ঠাকুমা বলত, পিতৃ-ধারার কন্যা সুখী। ঠাকুমা তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।

হাতের কাগজ-পত্র রাখতে রাখতে জবাব দিল, না, ওরা বাড়িতেই থাক।

খাবার-টাবার দিয়ে আমার কাপড় বদলে আসতে একটু দেরি হচ্ছে দেখেও বিরক্তি বোধ হয়। এখন এ-বিরক্তি দেখতে আমার মজাই লাগে। হাতে কাজ থাকলে কারো বিরক্তি-টিরক্তির ধার ধারি না, ফাক পেলে আমিও তা বেশ জোর দিয়েই বুঝিয়ে দিই। আশ্চর্য, জোর যে আমার আগের থেকে ঢের ঢের বেড়েছে তাতে আমার নিজেরও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। শাড়ি বদলাতে দেখে মেয়েরা দৌড়ে এসেছিল।—মা বেরুচ্ছ?

—হ্যাঁ।

—আমরা?

—তোমরা বাড়িতেই থাকবে। কোন কাজ-টাজ আছে বোধহয় তাই যাচ্ছি।

ব্যস ওরা ওতেই ঠাণ্ডা। একবারও জিজ্ঞেস করল না কি কাজ, কোথায় কাজ, বা কখন ফিরব। দশ বছরের রুমু এরই মধ্যে বেশ পাকা মেয়ে হয়ে উঠেছে। এগিয়ে এসে হাঁটু মুড়ে বসে আমার শাড়ির পিছনটা টান-টোন করে দিল।

বাড়ির সামনেই ট্রাম। ট্রামের অপেক্ষায় দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিছুদিন আগেও আমাদের ভালো গাড়ি ছিল একটা। এখন নেই। গাড়ি না থাকাটা একসময় নিজের দুটো পা না থাকার মতই ভাবতুম আমি। গাড়ি গেল মানে মান-সম্ভ্রম গেল ভাবতুম। কিন্তু নিজের দুটো পায়ের ওপরই ভরসা করতে এখন বেশ লাগে। ভরসা করার মত তেমন সুযোগ সুবিধে পাইনে বলে এখন মাঝে মাঝে ওই পাশের লোকের ওপর রাগ হয় আমার। সে দিব্বি পারে ভরসা করতে। আর আমার বেলায় ট্যাক্সি করতে চায়। বকেঝকে এই চাওয়াটা বাতিল করা গেছে।

ট্রামে পাশাপাশি বসে বেশ খানিকটা যাবার পর জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কোথায় যাচ্ছি?

আমার সেই ডাক্তার বন্ধুর ওখানে।

সেই ডাক্তার বন্ধু অর্থাৎ রণেন দত্ত। গাইনকোলজির মস্ত ডাক্তার এখন। মস্ত অবস্থা। নিজের গাড়ি নিজের বাড়ি নিজের নার্সিং হোম। শোনা মাত্র ভিতরে ভিতরে আমি কেমন

সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম একটু। দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুর অবস্থার এখন অনেক ফারাক বলে নয়। ওই ডাক্তারের ওপর আমি ভয়ানক বিরূপ ছিলাম একসময়। বিরূপ তখন আমার ঘরের লোকের সংস্পর্শের সকলের ওপরেই ছিলাম। তার মধ্যে ওই ডাক্তারের ওপর আরো বেশি রাগ ছিল, তার কারণ, বছর কয়েক আগে ভদ্রলোকের বিয়ে উপলক্ষেই এক মর্মান্তিক মানসিক বিপর্যয় ঘটে গেছল আমার। শুধু আমার কেন, এই পাশের মানুষেরও।

...সে ঘটনা না ঘটলে আমার দ্বিতীয় মেয়ে ঝুমু এই পৃথিবীর আলোর মুখ দেখত কিনা জানি না।

দেখত না ভাবলেও যন্ত্রণায় আমার গা সিরসির করে এখন। বড় মেয়ে রুমু যে শোনায়, আমার থেকে ঝুমুকেই তুমি বেশি ভালোবাস—সত্যিই ও কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব দেখে কিনা আমি জানি না। যাক, এ-সব পরের প্রসঙ্গ। ওই ডাক্তারকে যে আমি সুনজরে দেখতাম না সেটা সেই ভদ্রলোকও জানে। রুমু যখন হয় তখন আমি বাপের বাড়িতে। ঝুমুর বেলায় নিজের বাড়িতে এই ডাক্তারের ডাক পড়েছিল। আমাকে না জানিয়েই তাকে ডাকা হয়েছিল। দেখেশুনে আর উপদেশ দিয়ে সে চলে যেতেই আমি ফুঁসে উঠে বলেছিলাম, এ ডাক্তারের হাতে আমি থাকব না, আর, ফের বাড়িতে আমাকে দেখতে আসবে তাও চাই না।

সুনন্দ (লিখতে যখন বসেছি নাম না নিয়ে আর করব কি?) পাল্টা প্রশ্ন করেছিল, কেন? বিলেতফেরত ডাক্তার...

এ-কথা শুনে কি রাগ যে হয়েছিল আমিই জানি। কেন সেটা তার থেকে ভালো আর কে জানত? দু'চোখে ওই নির্লিপ্ত মুখ ঝলসে দিয়ে বলেছিলাম, আমার খুশি, আবার কেন কি? ফের ওকে ডাকলে তুমি অপমান হবে।

ডাকেনি। অন্য ডাক্তার এসেছিল, অন্য নার্সিং হোমে ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু অনেক দিন খবর না পেয়ে ওই রণেন দত্ত নিজে থেকেই এসে উপস্থিত একদিন। খানিকটা ভারী মাস তখন, আমি আড়ালেই ছিলাম। তা না হলেও আড়ালেই থাকতাম। কিন্তু কান সজাগ ছিল। বন্ধুর উদ্দেশে তাকে বলতে শুনলাম, খবর-বার্তা নেই কি ব্যাপার?

এদিকের ঠাণ্ডা জবাব কান এলো, খবর দেবার উপায় নেই, তোর হাতে থাকতে চায় না। অন্য ডাক্তার দেখছে, অন্য নার্সিং হোমে ব্যবস্থা হয়েছে।

—বলিস কি! এ হতভাগা কি দোষ করল? আচ্ছা, ডাক তো তোর বউকে।

—থাক, ডাকলে নাও আসতে পারে।

—সে কি রে! একটু আধটু মাথা বিগড়েছে নাকি তোর বউয়ের?

—একটু আধটু নয়, অনেকখানি।...অনেক দিন বিগড়েছে।

এই উক্তি কানে যাবার পর আমি কি আর আমাতে ছিলাম? আমি সটান পাশের ঘরে ঢুকে গেছলাম, ভদ্রলোকের মুখোমুখি বসেছিলাম। ঘরের লোক না হোক আমাকে ওভাবে ঢুকতে দেখে বা বসতে দেখে তার ডাক্তার বন্ধু বিলক্ষণ সচকিত হয়েছিল। আমি চাপা ঝাঁঝে বলেছিলাম, মাথা বিগড়োলে তার সম্পর্কে সঠিক করে কিছু বলা যায় না, না ডাকলেও এসে হাজির হতে পারে। শুনুন, আপনার বন্ধুর টাকা-কড়ি আছে —আর, আপনি বিলেত-ফেরত হলেও নতুন বিশেষজ্ঞ, তার ওপর বন্ধু বলে টাকা-কড়ি

নেবেন না, এ-অবস্থায় ঠিকমত যত্ন আত্তি করবেন কিনা কে জানে—এই সব সাত-পাঁচ ভেবেই উনি ডাক্তার বদল করেছেন।

শুনে ভদ্রলোক যেমন অবাক তেমন বিব্রত। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু এতবড় মিথ্যাচারের পরেও সেদিন এই একজনের গম্ভীর মুখে একটা আঁচড় পড়তে দেখিনি। ভদ্রলোক চলে যাবার পর শুধু বলেছিল, ও আমাকে অনেককাল চেনে, তুমি আসার আগে আমি ওকে যা বলেছি সেটাই সত্যি ভেবে গেল।

—কি ভেবে গেল, পাগল ভেবে গেল?

—অনেকটা।

শুনে আমি কি করেছিলাম? চেঁচামেচি করে পাগলের মতই আমি ঘরের ছাদ নামিয়ে দিতে চেয়েছিলাম।

সেই ডাক্তারের কাছেই চলেছি শুনেও সঙ্কোচ সামলে নিলাম।।—হঠাৎ সেখানে?

—অনেক কাল দেখা হয় না, চলোই না।

আমাদের দেখে ডাক্তার রণেন দত্ত একটুও অবাক হল না, খুশীমুখে অভ্যর্থনা জানালো। মনে হল, আমরা আসছি সেটা টেলিফোনে তাকে জানিয়ে রাখা হয়েছিল। ঘরে রোগিণী ছিল না, ধপধপে সাদা পোশাকের দুই একজন নার্স এক-আধবার এসে এটা ওটা জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছিল।

অন্তরঙ্গ কুশল বিনিময়ের পর চা এলো। আমার কেমন ধারণা হল, অনেক কাল দেখা-সাক্ষাৎ না হলেও আমাদের সব খবরই ভদ্রলোক রাখে। একটু বাদে এখানে আসার উদ্দেশ্য বোঝার পর আমি অবাক। ডাক্তার আমার শরীরের খোঁজখবর নিতে লাগল। কখন কি খাই, হজম হয় কিনা, সকাল-দুপুর-বিকেল-রাত্রির কখন কি করি, কখন ভালো লাগে কখন খারাপ লাগে, মাথাটাথা ধরে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। উঠে কাছে এসে একবার চোখের পাতা টেনে দেখল, আঙুলের ডগা টিপে রক্তের লালচে আভা পরীক্ষা করল। জিভও দেখাতে বলল।

আমি হেসে ফেলে তাও দেখালাম। বললাম, আসলে আমার ভেঙচি কাটতে ইচ্ছে করছে। কি ব্যাপার বলুন তো, আমি রোগী নাকি?

হাসিমুখে ডাক্তার জবাব দিল, কোনো রোগ লুকিয়ে আছে কিনা আমার বন্ধুর সেই দুশ্চিন্তা। প্রায়ই মন খারাপ করেন শুনলাম, ঠিকমত খান-দান না, মাথা ধরে—অন্য ঘরে যাবেন, না এখানে বসেই কি হয় না হয় খোলাখুলি বলবেন?

আমি সকোপে একবার পাশের লোকের দিকে তাকালাম। ভাজা মাছখানা উল্টে খেতে জানে না এমন মুখ। জবাব দিলাম, কোথাও যেতে হবে না, এখানে বসেই আগে আপনার বন্ধুর মাথাটা পরীক্ষা করুন।

ডাক্তার হাসতে লাগল। কিন্তু ওদিকে নির্বিকার মুখ। তার বন্ধুর দিকে চেয়েই সে বলে বসল, আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, ও একলা বসে কাঁদে পর্যন্ত, এক-একদিন মুখ-চোখ কেমন ফোলা ফোলা দেখি।

সত্যই রাগ হচ্ছিল আমার, সেই সঙ্গে লজ্জায় মাথাও কাটা যাচ্ছিল। বললাম, ঘুমুলেও তো চোখ মুখ ফোলে, খামোকা কাঁদতে যাব কেন?

জবাব দিল না। আমার দিকে তাকালও না। বন্ধুকে বলল, ঘুম কেমন হয় জিজ্ঞেস কর দেখি।

ডাক্তার হাসছে মুখ টিপে।

আমি ঝাঁঝিয়ে উঠলাম, দিন-রাত শুয়ে বসে ঘুম হবে কি করে?

ডাক্তার নয়, পাশ থেকেই আলতো প্রশ্ন হল, তাহলে চোখ মুখ ফোলা থাকবে কেন?

—দেখো, ভালো হবে না বলছি! তুমি এ-ভাবে জব্দ করার জন্যে আমাকে ধরে এনেছ এখানে?

—জব্দ! এবারে সত্যিকারের বিস্ময়।

—না তো কি? তাকে থামিয়ে দিয়ে ডাক্তারের দিকে ফিরলাম। ঘরের লোক যদি প্রাণের বন্ধুর কাছে খোলাখুলি যা নয় তাই বলতে পারে আমারই বা অত লজ্জা কিসের। বললাম, আসল ব্যাপার কি জানেন, দিন-রাত খাটতে খাটতে একটা লোক কালি হয়ে গেল, আর আমি শুয়ে বসে কাটাচ্ছি, কোনো কাজ নেই—ভালো লাগবে কেন? আপনার বন্ধুকে বললে বলে, মেয়েদের চাকরিও অত সস্তা নয় আজকাল, আসলে কিছু করতে দেবার মতলব নেই। আপনি দিন দেখি একটা ব্যবস্থা করে, আর কিছু না পারেন তো আপনার এখানেই কিছু কাজে লাগিয়ে দিন।

ডাক্তার তার হাতের কাছের পেপার ওয়েটটা নাড়াচাড়া করতে করতে মৃদু হেসে বলল, যদি শোনেন তো আর একটা ভালো ব্যবস্থা দিতে পারি।

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাস করলাম, কি ব্যবস্থা?

...আর একটা ছেলেপুলে এলে কেমন হয়?

কি নির্লজ্জ ঠোঁট-কাটা রে বাবা! ঝলকে ঝলকে রক্ত মুখের দিকে উঠে আসছে নিজেই টের পাচ্ছি। ওদিকের ভালোমানুষ মুখ খুলল আবার। নিরীহ প্রতিবাদ করল যেন, তা কি করে হয়, অনেক বয়েস হয়ে গেছে যে।

—কার, তোর বউয়ের?

মাথা নাড়ল।

—কত?

—তেত্রিশ বলে তো।

ডাক্তার ঠোঁট উল্টে জবাব দিল, ও আবার একটা বয়েস নাকি, আমার রেজিস্ট্রিটা এনে দেখ কত মেয়ের চল্লিশের পরে প্রথম ছেলেপুলে হচ্ছে। তাছাড়া, আমার দিকে আর এক পলক তাকিয়ে নিয়ে আবার বলল, তাছাড়া তোর বউয়ের বয়েস তেত্রিশ মানতে হলে ঠিকুজি কুষ্ঠি বার করতে হবে।

আমি রাগব না হাসব? কিছুই না করে আমি শুধু পালাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলাম। আসার আগে গলা-খাটো করে ডাক্তার আবার বলল, আমি কিন্তু ইয়ারকি করিনি, আমার প্রস্তাবটা একটু বিবেচনা করে দেখবেন।

জবাব না দিয়ে সিঁড়ি ধরে আমি আগে আগে নেমে এসেছিলাম। এই লাইনের ডাক্তারগুলো এই রকমই নির্লজ্জ ঠোঁট-কাটা হয় বটে।

রাগ করে ট্রামেও আর একটি কথা বলিনি।...শুধুই কি রাগ করে? এই যে এত কাজের মধ্যেও আমার নীরব যাতনা আর ছটফটানি লক্ষ্য করেছে, অসুখ ভেবে দুশ্চিন্তায়

তার ডাক্তার বন্ধুর কাছে টেনে এনেছে, তার ফলে রাগ দেখানো যেতে পারে, সত্যিকারের রাগ হবে কেমন করে?

কিন্তু সেই থেকে আমার বয়সের কথা উঠলে এই লোকের পুরু ঠোঁটের ডগায় কৌতুক আর আমার প্রতি দু'চোখের বাড়তি মনোযোগ দেখলে একঝাপটা অস্বস্তিকর লজ্জায় আমি সামনে থেকে পালাবার ফাঁক খুঁজি।

দিন দুই মানুষটাকে একটু চিন্তিত দেখলাম। তারপর হঠাৎই প্রস্তাব এলো, তুমি এক কাজ করো না, সময় যদি না-ই কাটে আবার লেখা ধরো না?

আমি অবাক। মাথার ওপর যার এমন অনিশ্চয়তার বোঝা, সে এখনো এই এক ব্যাপার নিয়েই ভাবছে। ছাইয়ের হাসিই এলো মুখে। বললাম, লেখারই সময় পড়েছে বটে, তা কি লিখব কবিতা?

বলল, কবিতা গল্প যা ভালো লাগে তাই লিখবে।...ছাপার মত হয় তো চেষ্টাচরিত্র করে ছেপে ফেলা যাবে।

কি লোকের মুখে কি কথা! বিশ্বাস করুন এই সামান্য ক'টা কথার ধকল সামলাতে আমার রীতিমত বেগ পেতে হয়েছে। এক অপরিমিত সুখ বুঝি ভিতরের কোন ব্যথার দরজা দিয়ে দু'চোখের কোণে ঠেলে উঠতে চেয়েছে। আমি শুধু চেয়ে চেয়ে তাকে দেখেছি। প্রাণভরে দেখতেই ইচ্ছে করছিল। পাছে নাটকের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় সেই ভয়ে রাগ দেখিয়েছি।—তুমি তোমার চোখ দুটো এবার থেকে আমার দিক ছেড়ে অন্য দিকে একটু ফেরাবে?

রসিকতাও জানে। আপাতত ওই দু'চোখ বেশ করে আমার মুখের ওপরেই আটকালো। বলল, আর কার দিকে তাকাতে পারি তুমিই একটু খুঁজে পেতে দাও না, নিজে চেষ্টা করতে গেলে মারধোর খাবার ভয় আছে।

—ঠাট্টা নয়। বলা নেই কওয়া নেই হুট করে সেদিন ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির হলে, আর এখনো সেই চিন্তাই করছ বসে? মুখ খোলার ফলে সত্যিকারের রাগ কি অভিমান জানি না, একটা কিছু পেয়ে বসতে লাগল আমাকে।—আমার যত গণ্ডগোল তোমাকে নিয়ে বুঝলে? তোমার এত ঝামেলা আর এত দুশ্চিন্তার কোন্ ভাগটা আমাকে দাও?

চেয়ে রইল একটু। তারপর দুটো হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিল, এই দুটো হাত দেখেছ?

জবাব দিলাম না। জানি এমন কিছু বলবে যাতে আমার মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। বলল, এই একটা হাত আর একটা হাতকে তফাত মনে করে না। আমি তোমাকে সেই রকমই ভাবি। তুমিও ভাবতে চেষ্টা করো তোমার একটা হাত কাজ করছে আর ঝামেলা পোহাচ্ছে আর অন্য হাতটা সাহায্যের জন্য সর্বদা এগিয়ে আছে। তা ছাড়া আমার দুশ্চিন্তা তো কিছু নেই, আমি তো জানি সব আবার ঠিক হয়ে যাবে।

আমি চুপ। ঠিক এইরকম সংশয়শূন্য জোরের কথা শুনলেই আমার ভয় ধরে। আমি মেয়েটা সবল নই অত। উল্টে কত যে দুর্বল সেটা পাশে পাশে থেকে এখন প্রতিমুহূর্তে অনুভব করি। দুর্বল যে সেটা সেই ছেলেবেলা থেকেই জানতুম। আর

জানতুম, এই দুনিয়ায় দুর্বলের ঠাঁই নেই কোথাও। তাই অনেক কাল পর্যন্ত একটা খোলস আশ্রয় করে ছিলাম—দম্ভ দেমাক আর সবলার খোলস। সেটা দেখে লোকের চোখ ঠিকরোতো, তারা ভুলত। তাদের দোষ দেব কি, ওই নকল সাজে আমি নিজেও ভুলে ছিলাম। তার খেসারত দিয়েছি, দিচ্ছি। সেই খোলস, সেই নকল সাজ খসে গেছে। নিজের সেই রিক্ত মূর্তি দেখে নিজেই হাহাকার করেছি। আমার দুর্বলতার ফাটল ধরে অনেকদিনের অনেক সঞ্চয় অনেক সম্পদ আর অনেক বিশ্বাস যেন আলো-বাতাসশূন্য একটা গহ্বরে মিলিয়ে গেছে।

গেছে। কিন্তু তার বদলে কিছু কি পাইনি? পেয়েছি। না পেলে আজ আমি দু'পায়ের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকতাম কি করে? বাঁচতুম কোন্ আশায়? যা গেছে তার মূল্যটা বড় হয়ে উঠেছে সব যাবার পরেই। যখন ছিল তখন সে মূল্যবোধ ছিল না। আর, যা পেয়েছি তখন তার মূল্য কানাকড়িও নয়। এখন সেটুকুই সব, সেটুকুই নির্ভর, সেটুকুই আশ্রয়। এতবড় হারানো আর এমনি পাওয়া দু'দিকে রেখে ওজন করলে কোন্ দিকটা ভারী হবে সে আমি নিজের বুকের তলা থেকে অনুভব করতে পারি। অনেক দিনের দেখা, অনেক দিনের জানা, অনেক দিনের পাওয়া একটা মানুষকে আমি নতুন করে দেখেছি, নতুন করে জেনেছি, নতুন করে পেয়েছি। নতুন করে আবিষ্কারও করেছি। কিন্তু সত্যের অপলাপ করব না, এমন একরোখা গোঁয়ার মানুষও আমি জীবনে আর দেখিনি। একদিন এটাকে আমি অশিক্ষা আর অশালীনতা ভেবেই দুর্বহ বিতৃষ্ণায় জ্বলতুম। কিন্তু এখন এটুকুই আমার বড় গর্বের জিনিস। আর ভয়েরও।

এমন নিঃসংশয়ে কেন বলে সব আবার ঠিক হয়ে যাবে? বস্তু-বৈভব যদি সেভাবে আবার ফিরে নাও আসে তাহলে কি এমন ক্ষতি? সে-জন্যে যে আর আমার এতটুকু দুশ্চিন্তা নেই সেকি সে জানে না? জানবে না কেন, চরম সংকটের সেই সব দিনের কোনো এক গভীর রাতে ওই চওড়া বুকে মুখ গুঁজে, এক অসহ্য আনন্দের জোয়ারে ভেঙে গুঁড়িয়ে একাকার হয়ে গিয়ে ওই কথাটাই তো তাকে বলেছিলাম। বলেছিলাম, তুমি যে-ভাবে বলছ, সেভাবে আবার সব ঠিক না হলেও আর কিছু যায় আসে না। আমার এই তেত্রিশের জীবনের সব থেকে বড় উপলব্ধি তো এটুকুই।

...তবু এত জোর দিয়ে এমন কথা বলে কেন? সব আবার আগের মত হবেই এ কথা কেন? যদি না হয়? এই গোঁয়ার মানুষ তো আপস জানে না, যদি না হয়, তখন? নির্মম আক্রোশে তখন যদি নিজেকেই আঘাত করে, নিজেকেই ভাঙে?

ঠাকুমা গো, তুমি লেখা-পড়া জানো না, তোমার বিদ্যেবুদ্ধি নেই, কিন্তু মুখে তোমার আলো হাসত সর্বক্ষণ—সেই তুমি বলতে তোমার ছেলের ঘরের সব নাতনিদের মধ্যে এই মেয়েটা উমার তপস্যা করে এসেছে, শিবের ঘরে যাবে ঠিক—বিয়ের পরেও এই নিয়ে তোমার আত্মার উদ্দেশে কত কটূক্তি করেছি ঠিক নেই—এখন তো স্বর্গে বসে সব দেখছ আর হাসছ তুমি—তোমার আশীর্বাদ বুকে আঁকড়ে আছি, কিন্তু আমার ভয়টা শুধু ভয়ই তো? তার বেশি কিছু নয় তো?

কতক্ষণ চুপচাপ ছিলাম দুজনেই জানি না। দরজার বাইরে লাঠির ঠুক ঠুক আওয়াজ। ও-ই দরজার দিকে ছিল, ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিয়ে হেসে বলল, ওই আসছে বুড়ো, উপদেশ কাকে বলে বুঝিয়ে ছাড়বে'খন।

বেঁচে গেলাম যেন আমি। কারণ বুকের তলার ঢেউটা চোখের দিকে ঠেলে উঠছিলই। যিনি এলেন তিনি দাসমশাই। আমাদের নীচের তলার এক ঘরের ভাড়াটে। দোতলার এই তিনটে ঘর ছাড়া বাড়ির সবটাতেই ভাগে ভাগে ভাড়াটে বসানো হয়েছে এখন। কিন্তু দাসমশাই সকলের পুরনো সর্বপ্রথম ভাড়াটে। যখন বাড়ির কোনো অংশের ভাড়া দেবার কোনো প্রশ্নই ছিল না, তখনকার। ঘরের এই গোঁয়ার লোকের প্রশ্রয়ে বাইরের এক-জোড়া উটকো বুড়োবুড়ি ছ'বছর আগে নীচের তলায় একটা ঘর দখল করে বসতে আমার মাথায় আগুন জ্বলেছিল। এতে সমাজের পরিচিত মানুষদের কাছে আমার মান-সম্ভ্রম যেন কয়েক ধাপ নেমে গেছল। আর তারপর নানা কারণে সেই আক্রোশ ভুলতে আমার কম সময় লাগেনি। কিন্তু এও পরের বৃত্তান্ত।

লাঠি ভর করে ভুবন দাস চৌকাঠ পেরিয়ে ভিতরে এসে দাঁড়ালেন। ততক্ষণে আমার শাড়ির আঁচল মাথায় উঠেছে। আগে উঠত না, এখন ওঠে। আমাদের দুজনকে এক ঘরে দেখেই একগাল হাসি। কেন এসেছেন তাই ভুলে গেলেন বোধ হয়। এমন একখানা আস্ত হাসি আমি বোধহয় কম দেখেছি। ( আগে তো ওই হাসিই আমার চক্ষুশূল ছিল—বুড়োবুড়ি দুজনেরই। দাসমশাই খুশীমুখে বললেন, দুজনেই একসঙ্গে আছ দেখছি, তাহলে আমি যাই।

আমি লজ্জা পেলেও আমার সামনের লোক সিরিয়াস। বলল, যাবেন কেন, আমাদের দুজনের মধ্যে আপনি কাকে একলা পেতে চেয়েছিলেন—আমাকে নিশ্চয়?

বুড়ো তক্ষুনি মাথা দোলালো।—না তো, বউমাকে...

—ও। গম্ভীর।—তাহলে আপনি তাকে নিয়েই থাকুন, আমি বরং যাই।

—না বাবা না! দাসমশাই ব্যস্ত হয়ে বাধা দিলেন। তারপরেই সেই হাসি। বললেন, দুজনের মধ্যে তৃতীয় জন নাক গলালেই গণ্ডগোল, বুঝলে বাবা? বড় অসময়ে এলাম দেখছি, আমি যাই।

আমার ভ্রূকুটির নিষেধ সত্ত্বেও বাবাটি আর এক দফা তাকে নিয়ে পড়ল। আপনি এলে কি আর গণ্ডগোল, আপনি ঠিকমত চোখে দেখেন, না কানে শোনেন?

আশি বছরের বুড়োর রসের উৎসে নাড়া পড়ল যেন একপ্রস্থ। আর জলবৃত্তের মত সেই খুশীটা যেন বড় হয়ে স্থবির দেহটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে দন্তহীন মুখ-গহ্বরে আশ্রয় নিতে লাগল। সেই খুশীর জোয়ারে নিজেই বিহ্বল খানিক। তারপর টেনে টেনে বললেন, আসল দেখার আর আসল শোনার যেটুকু তার সবই দেখিরে বাবা, সবই শুনি। বাজে জিনিস দেখে আর বাজে জিনিস শুনে চোখ কান নষ্ট করে কি হবে? ঝুলনে রাধা-কেষ্ট দোলে যখন তখন ঠিক দেখি আর কুঞ্জতলে মুরলী আর রাধার পায়ে নূপুর বেজে ওঠে যখন, তাও ঠিক শুনি।

—ও। সঙ্গে সঙ্গে ওদিকের কোমরে দু'হাত' আবারও আলটাবে ঠিক জানি। ইশারায় আমি চেষ্টা করছি যাতে চুপ করে থাকে। কিন্তু কার কথা কে শোনে। বলল, তা ঘরে ঢুকে পড়ে কি দেখলেন আর কি শুনলেন? রাধা-কেষ্ট ঝুলনে দুলছে, আর কুঞ্জতলে মুরলী আর রাধার পায়ে নূপুর বাজছে?

—আঃ! গলা দিয়ে আমার অস্ফুট একটা স্বরই বেরিয়ে গেল।

আর তাইতেই জোরে হেসে উঠেও দাসমশাই থেমে গেলেন। ছদ্ম রাগের সুরে

বললেন, তুই ছোঁড়া বড় ডেঁপো হয়েছিস—দেখিস না মা-জননী আমার লজ্জা পাচ্ছে!...আমি যাই গো মা, নইলে এই বিট্‌লে থামবে না...কিছুকাল ধরে তোমাদের দেখে আমার চোখ জুড়োয় মন জুড়োয় সব জুড়োয়...

বলতে বলতে আবার দরজার দিকে ফেরার উদ্যোগ করলেন তিনি। এদিক থেকে আবারও বাধা পড়ল, জিজ্ঞেস করল, কিন্তু আমাকে সন্দেহের মধ্যে রেখে যাচ্ছেন কেন, মা-জননীকে একলা পেতে চেয়েছিলেন কেন বললেন না তো?

—ভুলে গেছি। ভুবন দাস ফিরলেন আবার। নিষ্প্রভ দুটো ঘোলাটে চোখ আমার দিকে তুলে বললেন, হ্যাঁ গো মা, রাত কত হয়ে গেল আমাকে চারটে খেতে দিলে না এখনো! গিন্নি জানতে পেলে তো তোমাকে বকে ঝকে একশেষ করবে—

গিন্নি বলতে দাসমশায়ের স্ত্রী-ই বটে, কিন্তু বছর দুই হতে চলল তিনি স্বর্গে গেছেন। আমরা ভেবেছিলাম বার্ধক্যের এই নিঃসঙ্গতা দাসমশাইও আর বেশিদিন সহ্য করতে পারবেন না, তাঁরও সময় ঘনিয়ে এলো বলে। কিন্তু কদিনের মধ্যেই আবার প্রায় আগের মতই তাজা হয়ে উঠলেন তিনি। শুধু তাই নয়, আগের মতই আবার তাঁর ঘরে এক তরফা হাসি, গল্প, কখনো বা রাগ-বিরাগের কণ্ঠস্বর শোনা যেতে লাগল। ভুবন দাসের বিশ্বাস তাঁর গিন্নি তাঁকে ছেড়ে যাননি, যেতে পারেন না। তিনি আসেন, হাসেন, গল্প করেন, কখনো বা দুজনার একটু-আধটু রাগা-রাগিও হয়ে যায়। দাসমশাই বলেন, কাছাকাছি বাপের বাড়ির মতই কোনো জায়গায় আছেন তাঁর গিন্নি। সেখানে বেশ আনন্দে থাকলেও বুড়োটার একটু আধটু খবর না নিয়ে আর পারেন কি করে? রোজই আসেন, গল্প-সল্প করেন, সাধ্য-সাধনা করলেও আর তিনি এখানে এসে থাকতে রাজী নন, একটানা ষাট বছর তিনি এই লোকের ঘর করেছেন, আর কত? আর তাঁর দ্বারা কিছু হবে-টবে না। ভাবনা নেই চিন্তা নেই, বাপের বাড়িতে তোফা আরামে আছেন তাঁর মায়ের কাছে। সময় হলে বুড়োই যেন তাঁর কাছে যায়।

অগত্যা কি আর করা যাবে, সময়ের অপেক্ষায় আছেন ভুবন দাস। সময় হলেই শ্বশুরবাড়ি যাবেন তিনিও। এক-একসময় রসিকতাও করেন, বলেন, ও-সব শ্বশুরবাড়ি-টাড়ি আমি একদম পছন্দ করতাম না, বুঝলে গো মা, ষাট বছরের মধ্যে ষাট দিনও যেতে দিইনি, নানা ছলে ভুলিয়ে রেখে দিতাম। ফাঁকি দিয়ে পালালই যখন কি আর করা যাবে, এখন আমারও শ্বশুরবাড়ির ওপর টান হয়েছে, যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ও মাগী কি সহজে নেবে আমাকে, বললেই হি-হি করে হাসে, বলে রোসো, আমাকে ছাড়া কেমন লাগে টের পেয়ে নাও একটু, তারপর যাবে—

গোড়ায় গোড়ায় আমার ভয় হত মানুষটা পাগলই হয়ে গেলেন বুঝি। ডাক্তার দেখানো হয়েছিল। ডাক্তারের সঙ্গেও মানুষটা বউয়ের গল্পে জমে গেলেন। তারপর ডাক্তার উঠে দাঁড়াতে হাসিমুখেই বিছানার তলা থেকে দুটো তেল-চিটে দশ টাকার নোট বার করে তার হাতে গুঁজে দিলেন।—নাও বাবা নাও, সঙ্কোচ কিসের, তোমার তো বউ ছেলেপুলে আছে, আমিও বুড়ীর যক্ষের ধন যতটা পারি হাল্কা করে যাই। তাছাড়া ঋণ রাখতে নেই, ঋণ রেখে কি আবার এখানে মজতে আসব! তার ওপর কিনা ডাক্তারের কাছে ঋণ! সর্বনাশ!

মানুষটা যখন যাবেন অঋণী হয়েই যাবেন সে আমাদের চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না। উল্টে আমাদেরই বোধহয় ঋণে আবদ্ধ করে যাবেন। মাস-কাবার হতে না হতে ওর পকেটে ঘরভাড়ার টাকা আর খাবার খরচা গুঁজে দিয়ে যাবেন। তাঁর গিন্নি চোখ বোজার পর থেকে আমাদের হেঁসেলেই তাঁর খাবার ব্যবস্থা। টাকা নিতে না চাইলে তখনো ওমনি করে ঋণের কথা বলেন। ওদিকে না চাইতে ইদানীং রুমু-ঝুমুর সব শখের যোগানদারীও তাদের এই দাস দাদুই করে আসছেন।

বাইরে এসে ডাক্তার অবাক মুখ করে বলেছেন, অদ্ভুত লোক এ যুগেও দুই-একজন আছেন দেখি—যেমন আছেন তেমনি থাকতে দিন, তা না হলেই বরং পাগল হয়ে যাবেন।

সত্যি কথা বলতে কি, দাসগিন্নি সত্যিই দাসমশাইকে ছেড়ে গেছেন কিনা এখন আমার নিজেরই মাঝে মাঝে সেই সন্দেহ হয়। তাঁর বন্ধ ঘরে যখন একতরফা কথাবার্তা চলে, আমি সাহস করে সে দরজা ঠেলে ঢুকতে পারি না।

এত রাত অবধি খাবার দিইনি শুনে আমার সামনের লোকও ঈষৎ বিস্ময়ে আমার দিকে তাকালো। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আমার ঠিক সময়ের হিসেব আছে, সময় হলেই আপনার ঘরে গিয়ে দিয়ে আসব—মা আমাকে একটুও বকবেন না, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে যান।

—তাই বুঝি? আচ্ছা, সময় হলেই দিও তাহলে। আমি নীচে গিয়ে বসি।

ঠুক ঠুক করে ফিরে চললেন আবার। আমি তাঁকেই দেখছিলাম, প্রশ্ন কানে এলো, এখন পর্যন্ত ওঁকে খেতে দাওনি?

ফিরে তাকালাম।—কি মনে হয়, দিইনি?

দিয়েছি যে সেটা তক্ষুনি বুঝল। তবু বললাম, কি করব বলো, ডায়াবেটিসের রোগী, খিদে পায় বোধহয়, তাই ভুল হয়ে যায়। কিন্তু ডাক্তার যে বেশি দিতে বারণ করে, এরপর আর একটু দুধ ছাড়া আর তো কিছু দিতে পারব না।

দাসমশায় ঘরে ঢোকার আগের হওয়ার মধ্যে আর ফিরতে চাইনে বলেই বাড়তি কথা বলছিলাম। কিন্তু ফিরতে হল। একটু চুপ করে থেকে সে বলল, আমার আরজির কি হল?

—কিসের আরজি?

—ওই যে, আবার লেখার কথা বলছিলেম।

—তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ঘরের পয়সা খরচ করে ও-সব ছাইভস্ম ছাপবে?

—সে আমি বুঝব, তোমার তাতে কি? এগিয়ে এলো। গলা খাটো করে বলল, কথা না শুনলে বাণেন ডাক্তার যা ব্যবস্থা দিয়েছে তাই হবে কিন্তু!

—ধেৎ!

পালাব বুঝেই খপ করে হাত ধরে ফেলল। বলল, বিশ্বাস করো আমার সত্যি ভারি ইচ্ছে আবার তুমি লেখা ধরো, খুব ইচ্ছে, এবার তোমার সত্যি নামডাক হোক।

বুকের তলার সেই ঢেউ আবার টের পাচ্ছি। তবু ভ্রূকুটি করলাম, আবার স্তাবক জুটুক, কেমন?

—জুটুক। কথা দিচ্ছি, এবারে তোমার স্তাবকদের আমি মাথায় তুলে নাচব।

—আর তারা যদি আমাকে মাথায় তুলে নাচতে চায়?

—ঠিক ঠিক মাথায়ই যদি তোলে তাহলে আপত্তি করব না।

মুখের এতটুকু লাগাম যদি থাকত! আমি হেসে ফেললাম। কিন্তু সেই সঙ্গে চোখের কোণ দুটো বড় বেশি সিরসির করছে। আমার মুখের ওপর যে দুটো চোখ ঝুঁকে আছে সে দুটো সরলে বাঁচতুম। কিন্তু সরবে না জানি। বলল, আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছ না?

ওই দুটো চোখে চোখ রেখেই মাথা নাড়লাম। পারছি।

খুশীর জোয়ার এলো যেন, আনন্দে লাফিয়ে উঠল। আর তক্ষুনি ছেলেমানুষের মত দুষ্টুমিও করে উঠল একটা। সচকিত হয়ে আমি হাত ছাড়িয়ে পালাতে চেষ্টা করলাম। মাঝের দরজাটা খোলা, ও-ঘরে আলো জ্বলছে—রুমু ঝুমু শোয়নি এখনো।

খানিক বাদে নীচে নেমে দাসমশাইকে দুধ খাইয়ে শুইয়ে দিয়ে ওপরে এসে দেখলাম হিসেব-পত্র নিয়ে বসে গেছে। এ তন্ময়তা চট করে ভাঙবে না এখন। লঘু পা ফেলে মেয়েদের কাছে এলাম। তারাও শুয়ে পড়েছে। বড় আলোটা নিভিয়ে সবুজ আলো জ্বেলে দিয়ে দু'ঘরের মাঝামাঝি এসে দাঁড়ালাম আবার। ঢিমে সবুজ আলোয় দাঁড়িয়ে ও-মুখখানা দেখতে যেন আরো বেশি ভালো লাগছে। কাজের এই তন্ময়তাটুকু বুঝি দু'চোখ ভরে দেখার মত। ভোর না হতে উদয়াস্ত পরিশ্রম চলবে আবার। কিন্তু বেশিক্ষণ এ-ভাবে দাঁড়িয়ে দেখতে ভয়, যেমন করে হোক টের পাবেই, আর মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটবে।

সন্তর্পণে ওই ঘরের ভিতর দিয়েই সিঁড়ির দিকের অন্ধকার বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। আবারও খানিক ওই মুখই দেখলাম।...এই মানুষ নিজের মুখে আবার আমাকে লেখার কথা বলছে। লেখায় আমার নামডাক হোক এ-কথা নিজের মুখে বলেছে। আমি হাসব, না কাঁদব?...বাইরের ঘরে বসে এক কবিতা-সাপ্তাহিকের নতুন সম্পাদকের প্রশংসার উচ্ছ্বাসে ভাসছিলাম আমি। নিজের ভিতরে তখন এত অশান্তি আমার যে সেই গুমটের মধ্যে ওইটুকুই এক-ঝলক দক্ষিণের বাতাসের মত লাগত। ঘন্টাখানেক ধরে সেই বাতাসই বইছিল। ছোট মেয়ে ঝুমুর খাবার সময় পেরিয়ে গেছে—খিদের জ্বালায় ও ছটফট করছে বা কাঁদছে কিনা তাও খেয়াল নেই। আপ্যায়নে বিগলিত অল্পবয়সী সম্পাদক চলে যেতে দোতলায় এসে দেখি, এই মানুষ আমার শেষ-ছাপা কবিতার বইটা দুখানা করে ছিঁড়ে নিয়ে তাই জ্বালিয়ে মেয়ের দুধ গরম করছে।

আমি কি করেছিলাম সে-প্রসঙ্গ এটা নয়। আমি শুধু ভাবছি, এই লোকই আবার আমাকে লেখার জন্য অনুনয় করছে, লিখে নাম-ডাক হোক আমার চাইছে।...মাঝের এই ক'টা বছর কি সত্যি নয়? সে-কি একটা দুঃস্বপ্ন?

কোনো ছোট পরিসরের মধ্যে নিজেকে যেন আর ধরে রাখা যাচ্ছিল না। ছাদে চলে এলাম। এখানে আলোছায়ার মিতালি। মাথার ওপর তারা-ভরা আকাশ। ওরা যেন কৌতুক-ভরে আমাকেই লক্ষ্য করছে।

লিখতে তো পারি।

বলতে গেলে চোদ্দ থেকে উনত্রিশ—এই একটানা পনের ষোলটা বছর এই নেশার ঘোর কোনো নেশার থেকে কম ছিল না। স্কুলে লিখেছি, কলেজে লিখেছি। সে-সব

লেখা নিয়ে মেয়েদের থেকে ছেলেরাই বেশি হৈ-চৈ করেছে। আর কলেজ থেকে বেরিয়ে আসার পরেও ছাই-ভস্ম যা-ই লিখেছি, তাতেও আমার চেনা-মহলে অন্তত নিন্দার থেকে প্রশংসাই বেশি হয়েছে। বলা বাহুল্য, সেও একরকম পুরুষের মহলই। একান্ত শুভার্থীজনের আনুকূল্যে বিয়ের আগেই আমার একখানা কবিতার বই আর একখানা গল্পের বই ছাপা হয়ে গেছল। বিয়ের পরে আরো একটা কবিতার বই এবং একখানা গল্পের বই। সে-সবের এক-তৃতীয়াংশে উপহারে নিঃশেষ হয়েছে। তবু স্বভাবতই তখন লেখার ক্ষেত্র বিস্তৃত করার দিকে ঝোঁক আমার। একটু সুযোগ আর সহানুভূতি পেলে সেটা যে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে, সে-বিশ্বাস প্রায় বদ্ধমূল।

...সব আশা সব আকাঙ্ক্ষা, সকল বিশ্বাস আর সকল নির্ভরতা ভেঙে গুঁড়িয়ে তচনচ হয়ে স্রোতের মুখে কুটোর মত ভেসে গেছে। উৎসাহ আর উদ্দীপনা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

গেছে যে, সেটা অভিশাপ না আশীর্বাদ?

ওই ভস্মস্তূপই যে জীবনের শেষ কথা নয় সে আর আজ আমার থেকে ভালো কে জানে?

তাই, এই রাতে লেখার জন্য এমন অদ্ভুত নির্ভেজাল তাগিদ পাওয়ার পর থেকে থেকে কেবলই মনে হচ্ছে, লিখতে পারি। আগে কখনো পারিনি, পারতুম না। আজ পারি।

কিন্তু সে-লেখা সাহিত্য হবে না প্রায়শ্চিত্ত হবে?

...ভাবছি। শক্তি সংগ্রহ করতে চেষ্টা করছি।...সাহিত্য কি জীবন ছাড়া? জীবনে আলো আছে অন্ধকার আছে, সুন্দর আছে, কুৎসিত আছে। সেই আলো-অন্ধকার সুন্দর-কুৎসিতের ভিতর থেকেই যদি জীবন-সোনা ঝালিয়ে নিতে পেরে থাকি—নাম তার যাই হোক, সে-বারতা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া যাবে না কেন?

একটা আলগা লজ্জা আর সঙ্কোচ চারদিক থেকে ছেঁকে ধরছে। লেখার এই চেষ্টাটা নিজেকে অনাবৃত করে দেবার মতই যেন। তবু ভেতর থেকে কে বলছে, এই লজ্জা আর সঙ্কোচও ঝেড়ে ফেলে দেওয়া অসম্ভব নয় একেবারে। কারণ, আমি যা হতে পারতুম, তা হইনি।

আমার কাহিনী বলুন, গল্প বলুন, এটুকুই সব। এটুকুই শেষ।

## দুই

আমি রূপসী নই।

বোনেদের মধ্যে আমারই গায়ের রং মাজা। তিন বোন আমরা। আমাদের ওপরে দাদা। দাদার নাম চঞ্চল। নামের সঙ্গে স্বভাবের মিল। স্বভাব দেখেই ঠাকুমা ওই নাম রেখেছিল শুনেছি।

সকলের বড় হলেও ছেলেবেলা থেকেই দাদাকে আমরা ছেলেমানুষ ভাবতুম। বাবা বলত ওর জ্ঞান-গম্যি কোনোকালে হবে না। বাবার কথার ঝুড়ি ঝুড়ি নজির আমরা অনেক কাল ধরে দেখে আসছি।

ভাই বোনেদের মধ্যে দাদার সঙ্গে আমারই সব থেকে কম বনত। তার প্রথম কারণ বাড়ির আদর। বড় ছেলে আর একমাত্র ছেলে বলে ঠাকুমার কাছে, আর আমার ধারণা ভিতরে ভিতরে বাবার কাছেও তার একটু বেশি আদর ছিলই। আর সবার ছোট বলে, আর আমার মাত্র ছ'বছর বয়সে মা চোখ বুজেছে বলে, আমারও একটু বাড়তি আদরই ছিল। এই আদরে আদরে ঠোকাঠুকি লাগত। বিশেষ করে দাদার প্রতি ঠাকুমার কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব দেখলে আমার অসহ্য হত। দ্বিতীয় কারণ, দাদাও সুদর্শন। রাগ হলে বা একটু বিগড়লেই দাদার মুখ দিয়ে বিকৃত সম্ভাষণ বেরুতো। কালী, কেলি—

কালী বলার মত কালো নই আমি। বরং দাদা আর দিদিরাই অনাবশ্যক রকমের এইসব বলত।

ফরসা আমার চোখে। ওরা না থাকলে দিব্বি ফর্সা বলেই চলে যেতে পারতুম আমি। অতএব দাদা ওইরকম বললে রাগে আমার কালীর মতই জিব বেরিয়ে পড়ত।

রাগ করে বাবা অনেক সময়ে বলত, ওই ছোট মেয়েটার যা বুদ্ধি আছে তোর তাও নেই। বলে রাখি বুদ্ধির খ্যাতি আমার ছেলেবেলা থেকেই ছিল। রাগে দাদার হাত নিশপিশ করত। বাবা কাছে না থাকলে মাথায় গাঁট্টা মেরে বলত, দেখি কেমন বুদ্ধি আছে! নয়ত বলত, ওই বুদ্ধিই তো গা দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে, নইলে এমন বর্ণ হবে কেন!

মোটকথা, ছেলেবেলা থেকেই দাদাকে দু'চক্ষে দেখতে পারতুম না আমি।

একটু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দাদার বাইরের চঞ্চলতার থেকেও ভেতরের চঞ্চলতা বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। নিজের জ্ঞানবুদ্ধির ওপর প্রগাঢ় আস্থা। সর্বব্যাপারে নিজের মাথা খাটাতে চাইত। তার ফল যখন আশাপ্রদ হত না, তখন সকলের ওপব রাগ।

আরো একটা বড় দোষ দাদার—যার যা কিছু মনে ধরত, তাই তার চাই। কেউ একটা ভালো কিছু করলে তার থেকেও চমকপ্রদ কিছু করা চাই। তার এই সব চাওয়ার ধকল সামলাতে হত ঠাকুমাকে। আমাদের সচেতন জীবনে মা-অনুপস্থিত। ঠাকুমাই সব। আরো চার-চারটে ছেলে আছে তাঁর। কিন্তু মা নেই বলে ঠাকুমাই এ বাড়ির গৃহিণী।

বাবার বিরক্তি থেকে ঠাকুমা দাদাকে সর্বদাই আড়াল করত বটে, কিন্তু এক একসময় নিজে রেগে যেত। গজগজ করত, কেবল চাই চাই চাই, অন্যের যা ভালো সব তোর চাই—এরপর কারো সুন্দর বউ দেখলে বলে বসবি ওটাও তোর চাই!

কিন্তু এও ছেলেবেলা থেকেই আমরা জানি, দাদার মাথা যদি কেউ বিগড়ে দিয়ে থাকে, সেও ওই ঠাকুমা-বুড়ীর কাজ। দাদা এমন এক-একটা কাণ্ড করত যে বাবা শুনলে আর রক্ষে রাখবে না। তখন দাদার জন্য আমাদেরই ভয় হত। স্কুলের এক পরীক্ষার আগে অনেক মাথা খাটিয়ে আর রাত জেগে 'টুকলিফাইং ববিন' (নামটা দাদারই দেওয়া) তৈরি করেছিল। ছোট্ট কাঠের ববিনে ফিতের মত জড়ানো পাতলা কাগজে সর্ববিষয়ের সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর লেখা। পরীক্ষা-ঘরে সেই বস্তুটিই হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেল। নাম-করা স্কুল। তার হেডমাস্টারও তেমনি কড়া। দাদাকে বার করে দিয়ে তক্ষুনি বাবাকে কড়া চিঠি পাঠালেন, তোমার ছেলেকে আর এ স্কুলে রাখা হবে না।

সেই চিঠি ঠাকুমার হাতে পড়তে রক্ষা। পিওন মারফত চিঠি পাঠানো হয়েছিল। দিদি সে-চিঠি নিয়ে বাবার হাতে দেবার আগেই দাদা সে-চিঠি ছিনিয়ে নিল। তারপর ঠাকুমা ছাড়া আর গতি কি? বাবার বদলে ঠাকুমা নিজে স্কুলে গিয়ে হেডমাস্টারের সঙ্গে

দেখা করল। তারপর দাদা শুধু সে-বছর ফেল করেই খালাস পেল। আর কিছু হল না।

আমার দিদি ভারতী একটু ভালো-মানুষ গোছের। সেই কারণেই লোকের চোখে ওর রূপের ছটা অত ঠিকরতো না। তার ওপর সুখী গোছের একটু বেশি মোটা-সোটা। সেদিক থেকে রূপসী বলা চলে ছোড়দি অদিতি। যেমন ফর্সা তেমনি ধারালো চেহারা। মাথায় বুদ্ধির প্যাঁচও বেশ খেলে। নিজেকে নিখুঁত রূপসীই ভাবত সে, কিন্তু মনে মনে এও জানত, খুঁত একটু আছেই। দিদি যেমন একটু বেশি মোটা, ও তেমনি একটু বেশি রোগা। ঢেপসি মোটা হওয়ার থেকে রোগা হওয়া যে ঢের ভালো সে-কথা ও সর্বদাই সকলের মুখের ওপর ঘোষণা করত।

সবার ছোট আমি আরতি।

দাদা বলত কেলি, আর দিদিরা পরামর্শ দিত সর্বদা দুধের সর মেখে মেখে বসে থাক্ মুখে, আর অত হুটোপুটি করিস না—গায়ের রং আরো বেশি কালো হয় তাতে।

সত্যি কথা বলতে কি, গায়ের রং দিদিদের মত না হওয়াতে মনে মনে বেশ একটু খেদ ছিল আমার। অথচ দুরন্তপনা বা হুটোপুটি করার আনন্দে মেতে থাকতুম যখন, দিদিদের উপদেশ একটুও মনে থাকত না।

কিন্তু ছেলেবেলা থেকে আমি এমন কতগুলো ব্যাপার দেখেছি যাতে রূপ সম্পর্কে আমার বিচার বিশ্লেষণ ক্রমশ অন্যভাবে দানা বেঁধেছে। আমার ধারণা মেয়েদের যথার্থ রূপ সব থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে পুরুষের চোখের আয়নায়। সেই সঙ্গে মেয়েদের চোখও একেবারে ফেলনা নয়।

দাদা যেমন বড় স্কুলে পড়ে, আমরাও তেমনি নামকরা ইংরেজি মিশনারি স্কুলে পড়ি। স্কুলের বেশির ভাগ সমবয়সী মেয়ে আমাকে সমীহ করত, তার কারণ আমার পেটানো স্বাস্থ্য। অনেককেই ধরে দু'চারটে ঝাকুনি-টাকুনি দিতে পারতুম। ছোড়দির দু'হাত শক্ত করে চেপে ধরলে ও নড়তে চড়তে পারত না। রেগে গেলে দিদিরা বলত, ঠাকুমা আদর করে ওকে বেশি-বেশি দুধ-ঘি খাইয়ে ধিঙ্গি করে তুলেছে। আমারই সম্পর্কে স্কুলের দুই টিচারের আলোচনা আমার মনে গেঁথে আছে। স্ব-কর্ণে শুনিনি। সুখবরটা জানিয়েছিল আমাদের ক্লাসের রঞ্জনা। ওই দুটি টিচারের একজন তার দিদি, আর অন্যজন আমাদের রাশভারী ক্লাস-টিচার। আলোচনাটা হয়েছিল রঞ্জনাদের বাড়ি বসেই। ছোট বোন যে আবার দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে-কথা গিলেছে কেউ জানেও না।

ক্লাস সেভেন থেকে ক্লাস এইটে ওঠার কথা তখন। রেজাল্ট বেরোয়নি, প্রমোশন আসন্ন। রঞ্জনার দিদি অন্য টিচারকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তার ক্লাসে কে ফার্স্ট হল। সেই টিচার আমার নাম করল। কিন্তু আনন্দের সমাচার এটুকুও নয়। ফার্স্ট যে আমি হব প্রায় জানতুমই। শুনে রঞ্জনার দিদি বলেছিল, মেয়েটার অনেক গুণ তো, আর চেহারাখানাও কি মিষ্টি—একমাথা চুল।

আমাদের রাশভারী ক্লাসটিচার নাকি সেই কথার পিঠে যোগ দিল, চোখ দুটোও চমৎকার, বড় বড় দুটো চোখ মেলে যখন এদিক থেকে ওদিকে তাকায় আমি লক্ষ্য করি—মনে হয় কত কি দেখে মেয়েটা তার ঠিক নেই।

রঞ্জনার ধারণা, ওকে সেদিন আমি পেট পুরে খাইয়েছিলাম আগেভাগে পরীক্ষার রেজাল্ট বলে দেবার দরুনই। আসল কারণটা শুধু আমিই জানি।

ক্রমে গায়ের রং যে মাজা সেই খেদ আমার ঘুচে গেছে। এমন কি এও মনে হয়েছে আমি যা, সে-ই ঠিক। দিদিদের মত অমন ধপধপে ফর্সা হলেই যেন বেমানান হত। কিন্তু মনের এ-কথা আমি কখনো প্রকাশ করিনি। নানা অনুভূতির মধ্য দিয়ে এই দুর্বলতাটুকু বেশ একটা বিশ্বাসের দিকে গড়াচ্ছিল।

ছোড়দি অদিতি মাত্র দেড় বছরের বড় আমার থেকে। আর দিদি ভারতী সাড়ে তিন চার বছরের। আমার যখন তেরো, ছোড়দির তখন সাড়ে চোদ্দ, আর দিদির সাড়ে ষোলো। পিঠোপিঠি এই তিন বোন একসঙ্গে স্কুলে যেতাম, ফেরার সময় একসঙ্গেই বাড়ির গাড়িতে ফিরতাম। এই যাওয়া-আসার সময় পারিপার্শ্বিকের দিকে আমাদের চোখ থাকত না বললে সত্যের অপলাপ হবে। সব থেকে বেশি চোখ থাকত ছোড়দির। আমাদের মধ্যে বাহ্যত পাকা সে-ই সব থেকে বেশি। বাহ্যত বললাম কারণ, আর একটু বয়েস হবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মত চৌকস আর বুদ্ধিমতী আমি ওদের একজনকেও ভাবতুম না। তবে বাইরের সজীব দ্রষ্টব্যের দিকে আমার চোখ খুলে দেবার ব্যাপারে ছোড়দিই যে গুরু তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বিকেলের দিকে সামনের পার্কে অথবা দোকান থেকে নিজেদের জিনিস কেনা-কাটার ব্যাপারেও তিন বোন একসঙ্গে বেরোতাম। তখনো আমি আর ছোড়দি ফ্রক পরতাম, দিদিই শুধু শাড়ি ধরেছিল। শখ করে ছোড়দি প্রায়ই দিদির শাড়ি পরত, আর বলত, ঠাকুমা কিছুতেই বোঝে না যে আমার আর ফ্রক পরার বয়েস নেই। ছোড়দির আর ফ্রক পরার বয়েস নেই সেটা আমিও একবাক্যে স্বীকার করতাম। কারণ ফ্রক-পরা ছাড়লে ওর ভালো ভালো ফ্রকগুলো সব আমার হবে। কিন্তু ও যখন ফ্রক-পরা ছাড়ল, ওর ফ্রকের কোনোটাই তখন আমার গায়ে হয় না।

সেকথা থাক। তিন বোন একসঙ্গে বাইরে বেরুবার সময় ছোড়দি অনেক ব্যাপারে আমার চোখ খুলে দিয়েছিল। শুধু আমার কেন, দিদিরও।

বাড়ি থেকে বেরুলে পাড়ার আর বে-পাড়ার জোড়া-জোড়া চোখ যে আমাদের দিকে ধাওয়া করবেই এ-ব্যাপারটা আমি প্রায় স্বতঃসিদ্ধই ধরে নিয়েছিলাম। পনের থেকে সাতাশের মধ্যে সেই সব চোখের মালিকদের বয়েস। ছোড়দি প্রায়ই বলত দিদিকে, সব তাকাচ্ছে দেখ, যেন ধরে ধরে গিলবে আমাদের সব!

দিদি দেখত। হেসে মাথা নেড়ে সায় দিত। চোখ দিয়ে গেলা কাকে বলে আমি তখন সবে একটু-আধটু বুঝতে শিখেছি। অতএব ওই সব গেলার চোখ আমার দিকেও ধাওয়া করেছে কিনা তা না লক্ষ্য করে পারতুম না। ছোড়দি প্রায়ই হাসি চেপে ধমকে উঠত, এইটুকু মেয়ে তুই আবার দেখছিস কি? খবরদার আমাদের কথায় কান দিবি না!

ছোড়দি যে মাত্র দেড়-বছরের বড় আমার থেকে সে-কথা ও নিজে তো সর্বদাই ভুলত, দিদিরও মনে থাকত না। এমন কি, দিদি এক একসময় প্রায় বড়র মতই দেখত এই ছোড়দিটিকে।

তেরো না পেরুতে হঠাৎ একসময় ছোড়দির আবার আমার সঙ্গেই বেশি ভাব হয়ে গেল। তার কারণ একটি ছেলে। ছেলেটার নাম রমেশ ভার্গব। বাঙালী নয়। ইউ. পি'র ছেলে। আমাদের স্কুলের পাশের মিশনারি বোর্ডিংয়ের ছেলে। সেবারেই সিনিয়র কেমব্রিজ

পরীক্ষা দিয়ে লায়েক হয়েছে। বড়জোর বছর সতের হবে বয়স।

তার সঙ্গে ছোড়দির খাতির কি করে হয়ে গেল আমার জানা নেই। ছেলেটাকে মাঝে মাঝে আমাদের স্কুলের গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতাম মনে পড়ে। তা ছুটির আগে আর পরে গেটের বাইরে অমন কত ছেলেই তো দাঁড়িয়ে থাকে।

দিদির একদিন সামান্য জ্বর-ভাব হয়েছিল। জ্বর নিয়ে স্কুলে গেলে কত খারাপ হতে পারে ছোড়দি ঠাকুমাকে বুঝিয়ে দিদির স্কুলে যাওয়া বন্ধ করল। তাছাড়া কি কারণে সেদিন আগেই স্কুল ছুটি হবার কথা। বাড়ির গাড়ি আসতে ছুটির পরে ছোড়দি আমার সঙ্গে এলো না। কোন টিচারের কাছে তাকে ঘণ্টা দুই-তিন পড়তে হবে—তারপর অন্য মেয়ের গাড়িতে বাড়ি ফিরবে।

কিন্তু বিকেল সাড়ে চারটে না বাজতে বাড়ি থেকে তিনটে বড় রাস্তা পেরিয়ে দশ মিনিটের পথ ঠেঙিয়ে একলা পার্কে আসতে পারি সেদিন সেটা ছোড়দির হিসেবের মধ্যে ছিল না। আসলে আমিও বাড়ির লোকের চোখে ধুলো দিয়েই এসেছি। সেখানে পুকুরের ধারে একটা ছেলের পাশে ছোড়দিকে বসে বাদামভাজা খেতে দেখে আমি হাঁ। কিছু বিবেচনা না করেই তাদের সামনে হাজির আমি। প্রথমে ছোড়দি বিষম থমমত খেল। সচকিত হয়ে দেখল আমার সঙ্গে আর কেউ আছে কিনা। তারপর আমি একলা এসেছি শুনে ভয়ানক রেগে গেল। বাড়িতে বলে দেবে বলে শাসালো।

ওর পাশের ছেলেটা সকৌতুকে আমাকে দেখছিল।

যাই হোক, একটু বাদেই ছোড়দি আমার সঙ্গে আপস করল। আমাকে ওদের পাশে বসিয়ে বাদামভাজা খেতে দিল। ছেলেটার সঙ্গে পরিচয়ও করিয়ে দিল। বলল, ব্রিলিয়েন্ট ছেলে, ওর সঙ্গে ইংরেজীতে আলাপ করে আমি ইংরেজী রপ্ত করছি—বড় হয়ে বিলেত যাব জানিসই তো—বলতে কইতে না পারলে সেখানে গিয়ে তো বোকা বনে যাব। ইজ'ন্ট দ্যাট ভার্গব?

মাথা নেড়ে ভার্গব খাঁটি বাংলায় জবাব দিল, সত্যি কথা। ছেলেমানুষ ভেবে অন্তরঙ্গ হেসে আমার কাঁধে একখানা হাত রেখে জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি?

সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দির ভ্রূকুটির ইশারায় ঘায়েল হয়ে বিব্রত মুখে ভাষা বদলাল, আর দুই ঘাড় দুলিয়ে বলল, দ্যাটস ট্রু, ইউ ডিসক'স ইন ইংলিশ, হোয়াটস ইওর নেম প্লীজ?

কাঁধে হাত রাখতেই আমার রাগ হয়েছে, গম্ভীর মুখে জবাব দিলাম, মাই নেম ইজ আরতি—ইউ আর এ মিথ্যুক ছেলে, ইউ নো বেঙ্গলি!

ছেলেটা জোরেই হেসে উঠল এবার। সেই ফাঁকে আমি কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে দিলাম। আর তার পর ছোড়দি আমাকে বেশ খাতিরই করতে লাগল। আমি কত ভালো মেয়ে রমেশ ভার্গবকে সেটা অনেকভাবে বলল।

পার্ক থেকে উঠে রমেশ আমাদের একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেল। তিনজনে মনের আনন্দে খেলাম। বাড়ির পথে ছোড়দির সঙ্গে আমার কড়ার হল, সে আমার কথা কাউকে বলবে না, আর আমিও রমেশের কথা ঘুণাক্ষরে কাউকে বলব না। তাছাড়া রমেশ সত্যি খুব ভালো ছেলে, পড়াশোনার ব্যাপারে তার কাছ থেকে অনেক সাহায্য পাওয়া যাবে।

সাহায্য যে ঘোড়ার ডিম পাওয়া যাবে সেটুকু বোঝার মত বুদ্ধি আমার আছে। আর আমার একলা পার্কের আসার থেকেও তার দোষটা যে ঢের বেশি তাও আমার

বুঝতে বাকি নেই। তবু ভালো মেয়ের মত ছোড়দির সঙ্গে আপস করতেও আমার আপত্তি নেই।

এর পরেই দেখতে দেখতে ছোড়দির সঙ্গে আমার ভাব জমে গেল। তার কারণ শিগ্গীরই রমেশ ভার্গব আর ছোড়দির মধ্যে আমি পোস্ট-গার্ল-এর ভূমিকা নিলাম। পার্কেই বেশিরভাগ ওদের চিঠি চালাচালি হতে লাগল। দিদির বা বাড়ির চাকরের চোখে ধুলো দিয়ে ছোটাছুটির ফাঁকে আমি তীর্থের কাকের মত বসা রমেশের সামনে ছোড়দির চিঠি ফেলে দিতাম, আবার তেমনি করে জবাবও নিয়ে আসতাম। কোনো-কোনোদিন একলাই চিঠি নিয়ে পার্কে যেতাম। চিঠি খুলব না বা পড়ব না তিন সত্যি কেটে দিব্বি করতে হত। ওরা কি অত লেখা-লেখি করে দেখতে খুব ইচ্ছে হত। কিন্তু তিন-সত্যির ভয়ে পারতুম না।

ইতিমধ্যে চোখ আরো একটু খোলার মত কিছু রসদ পেলাম আমি। আমাদের বাড়ির উল্টোদিকে একটা ভাঙা একতলা পুরনো বাড়ি। তাকালেও চোখ অখুশী হত এমন বাড়ি। এক হাড়জিরজিরে বুড়ো সে-বাড়ির দাওয়ায় বসে তামাক খায় দেখি। তার বড় ছেলের বউয়ের সঙ্গে ঠাকুমার ভাব-সাব আছে দেখি। মাঝে মাঝে আসে ঠাকুমার কাছে। চার পাঁচটা রোগা-রোগা ছেলেপুলে বউটার। ভালো করে খেতে পরতে পায় না বোঝাই যায়।

ওটা বোস-বাড়ি। ও-বাড়ির একটা ছেলেকে প্রায়ই এ-বাড়ির দিকে চেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। বিশেষ করে বুড়োমত লোকটা যখন দাওয়ায় থাকে না তখন। তারই ছোট ছেলে এই জন? বড় ছেলের সঙ্গে বয়সের অনেক তফাত।

মুখোমুখি বাড়িতে বাস, তাই ওদের নাম-ধাম সকলেরই জানি প্রায়। আমাদের অবস্থা ভালো বলে হোক বা যে কারণেই হোক এ-বাড়ির সকলকেই বেশ শ্রদ্ধার চোখে দেখত ওরা। আর আমরা কিছুটা নির্লিপ্ত করুণার চোখে।

যে ছেলেটার কথা বলছি তার নাম সুনন্দ বোস। বয়েস তখন সবে উনিশ ছাড়িয়েছে। এখন কলেজে ঢুকেছে বোধহয়। অভাবী বাড়িতে এই ছেলেটারই দিব্বি পুষ্ট স্বাস্থ্য। চুপচাপ এ-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার অনেক আগে থেকেই তাকে আমরা জানি, চিনি। যখন হাফ প্যান্ট পরে হাঁ করে গাড়ি চেপে আমাদের যেতে আসতে দেখত তখন থেকে। এখন ধুতি পরে, আর মাঝে মাঝে লম্বা মোটা ট্রাউজার পরেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। আরো অনেক ছোট বয়েস থেকেই ছেলেটাকে আমরা সুচক্ষে দেখি না, তার কারণ, পাড়ার সম-বয়সী ছেলেদের সঙ্গে কত যে তাকে মারামারি করতে দেখেছি তার ঠিক নেই। আর ছোটলোকের মত সেই রাস্তার মারামারিতে বেশির ভাগ সময়ই ওর প্রতিপক্ষ ঘায়েল হত বলে আমি অন্তত ওর ওপর সদয় ছিলাম না। তার ওপর ওই পুরু ঠোঁট আর ছোট চোখ দেখেই আমার ভালো লাগত না। গায়ের রঙও প্রায় কালোই।

সেদিন স্কুলে যাবার সময় গাড়িতে উঠেই ছোড়দি বলল, সুনন্দটা আজকাল কেমন হ্যাংলার মত ড্যাবড্যাব করে আমাদের বাড়ির দিকে চেয়ে থাকে দেখেছিস? উক্তিটা দিদির উদ্দেশে।

ফলে দিদি আর আমি দুজনেই গাড়ি থেকে ও-বাড়ির দিকে ঘাড় ফেরালাম। চোখাচোখি হল শুধু আমার সঙ্গেই। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে ওকে অনেক সময়েই

দেখি, চোখাচোখিও হয় হয়ত, কিন্তু ড্যাবড্যাব করে হ্যাংলার মত চেয়ে থাকার তাৎপর্য নিয়ে কখনো দেখিনি।

দিদি বলল ছোড়দিকে, আমার থেকে একটু আধটু বড় হবে বয়সে, তাহলে বোঝা গেল, তোকেই দেখে, তোর জন্যেই হ্যাংলার মত দাঁড়ায়।

ছোড়দি ওমনি ফোঁস করে উঠল, ইঃ, অত সাহস হবে না, আমাকে ভালো করেই চেনে—মুখ ভোঁতা করে দেব না একদিন! তার পরেই হেসে আমাকে একটা কনুইয়ের গুতো দিয়ে বলল, অরুকে দেখে না তো রে দিদি! যে হাবাগোবা মেয়ে, নির্ভয়ে হয়ত ওর জন্যেই দাঁড়িয়ে থাকে।

আমার রাগ হয়ে গেল। একটা ছেলে আমাকে দেখুক তাতে খুব আপত্তি নেই। তা বলে ওই রকম বাড়ির ওইরকম একটা ধুমসো ছেলে! আমি বলে উঠলাম, কক্ষনো না।

দিদি আর ছোড়দি একসঙ্গে হেসে উঠল। তাই শুনে আমাদের অবাঙালী ড্রাইভার পর্যন্ত একদফা ঘাড় ফেরালো।

তারপর যেতে আসতে পর-পর দুটো দিন ইচ্ছে থাক আর না থাক, সামনের বাড়ির দিকে আমার চোখ গেলই। আর চোখাচোখিও হল। বিরক্ত হয়ে আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। দুদিনই ছোড়দির হাসি আর কথা শুনে আমার কানের পরদা জ্বলে গেছে। ছোড়দি বিস্ময়ে আর পুলকে বলে উঠেছে, হ্যাঁরে দিদি, সুনন্দ খুদে চোখে ড্যাবড্যাব করে অরুর দিকেই চেয়ে থাকে, লক্ষ্য করেছিস?

তার ওপর দিদির কথায় আমার পিত্তি যেন আরো জ্বলে গেল। সায় দিয়ে হাসিমুখে মন্তব্য করল, যেমন হোঁৎকা চেহারা, তোদের দুজনের মধ্যে অরুকেই বেশি হৃষ্টপুষ্ট দেখেছে, তাই ওকেই পছন্দ বোধহয়।

আমি রেগে গিয়ে জবাব দিলাম, হৃষ্টপুষ্ট ছেড়ে তুমি তো ঢেপসি একটি, তাহলে তোমাকে পছন্দ নয় কেন?

দিদি ওমনি শাসনের সুরে বলল, অরু, আমি তোমার থেকে অনেক বড়, ঠাকুমাকে বলে দেব।

এর পরেই আমি তিন-চারদিনের জ্বরে পড়ে গেলাম। স্কুল বন্ধ, সেদিন বিকেলে বাইরে থেকে ফিরেই আমার ঘরে এসে ছোড়দি আর দিদির সে-কি হাসি! ছোড়দি তো হাসতে হাসতে আমার জ্বরো বিছানাতেই গড়িয়ে পড়ল। শেষে হাসি সামলে চোখ পাকাতে চেষ্টা করে বলে উঠল, বলেছিলাম কিনা সুনন্দ বোস তোকে দেখার আশাতেই ভিজে বেড়ালটির মত ওমনি করে দাঁড়িয়ে থাকে? আজ একেবারে ফয়সালাই হয়ে গেল।

আমি হকচকিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি করে?

আবার একপ্রস্থ হাসির দমক। ছোড়দি দিদিকে ঠেলে দিল, বল না!

শেষে দুজনেই ভাগে-সাগে যা বলল তার সার মর্ম: মাথার তেল কিনতে বেরিয়েছিল ওরা দুজনে, ফেরার সময় সামনের ওই মোড়ের মাথায় সুনন্দ ওদের ধরেছে। জিজ্ঞেস করেছে, আরতির কি হয়েছে?

দিদিরা এত অবাক হয়েছিল যে, চট করে জবাব দিতে পারেনি। তারপর ছোড়দিই জিজ্ঞেস করেছে, কেন?

সুনন্দ বলেছে, ক'দিন তোমাদের সঙ্গে স্কুলে যেতে দেখছি না, তাই ভাবছিলাম অসুখ-টসুখ হয়েছে কিনা।

ছোড়দি বলেছে, অসুখ হয়েছে। খুব অসুখ। খুব জ্বর। ইচ্ছে করলে বাড়ি এসে দেখে যেতে পারে। বলে আবার বেদম হাসতে লাগল।

জ্বর আমার ছেড়েই গেল। কালই ভাত খাব। কিন্তু ওদের হাসি দেখে আর এইসব শুনে আবার জ্বর যেন মাথায় উঠল। তার ওপর ছোড়দি বলল, এখনো বাড়ির সামনে এদিকে চেয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে, উঠে দেখে আয় গে যা না!

এক লাফে আমি উঠে সত্যিই বারান্দায় চলে এলাম। আর সত্যিই দেখলাম মূর্তি এদিকেই চেয়ে আছে বটে। আর তাই দেখে রক্ত এমন মাথায় চড়ল যে আমি একটা কাণ্ডই করে বসলাম। মুখ বিকৃতি করে চার-ছ' আঙুলের মত জিভ বার করে বেশ বড়-সড় একটা ভেঙচি কেটে বসলাম। তারপর দুমদাম পা ফেলে ঘরে চলে এলাম।

এদিকে দিদি আর ছোড়দি আমার রাগ আর কাণ্ড দেখে হাঁ।

দিনকয়েক পরের কথা। আবার স্কুলে যাতায়াত করছি। বাড়ির সামনে এক-আধবার ওই মূর্তি চোখে পড়ছে। সর্বদা নয়। চোখে পড়লেও আমি জোর করেই চোখ ফিরিয়ে থাকি। আমার মেজাজ দেখে দিদি আর ছোড়দিও সামনাসামনি আর কিছু বলে না।

সেদিন স্কুল থেকে ফিরে খেয়ে-দেয়ে একাই বড় রাস্তার দোকানে গেছি। কাগজ ফুরিয়েছে, কাগজ কেনার জন্য। কাগজ কিনে ফেরার সময় সেই মোড়ের মাথায় যেন ভূত দেখে চমকে উঠলাম। সামনেই পথ আগলে দাঁড়িয়ে সুনন্দ। গম্ভীর।

জিজ্ঞাসা করল, সেদিন আমাকে ওভাবে জিভ ভেঙচেছিলে কেন?

সত্যি কথা বলতে কি, প্রথম ধাক্কায় আমার ভয়ানক ভয় ধরেছিল। এই গোঁয়ার ছেলেটার গুণ্ডামি আগে অনেক দেখেছি। ধরে মারধোর করে বসবে কিনা কে জানে। আমি যত হৃষ্ট-পুষ্টই হই, আর বন্ধুদের কাছে গায়ের জোরের যত দাপটই দেখাই, তেরো বছরের মেয়ে উনিশ কুড়ি বছরের একটা ষণ্ডা ছেলের কাছে কি? যে ভাবে সামনে পথ আগলে দাঁড়িয়েছে পাশ কাটিয়ে যে ছুট দেব তারও উপায় নেই। অগত্যা অসহায় চোখে তার দিকেই তাকালাম এবার।

সে আবার জিজ্ঞাসা করল, জিভ ভেঙচেছিলে কেন?

বললাম, কদিন ভাত না খেয়ে সেদিন মেজাজ ভালো ছিল না।

পুরু ঠোঁটে হাসি দেখে আমার ভয় কমে রাগ চড়তে লাগল। সে আবার বলল, তা বলে আমাকে জিভ ভেঙচানো কেন, আমি কি করেছিলাম?

আমার ভয় পেতেও সময় লাগে না আবার রাগতেও সময় লাগে না—এই রকমই স্বভাব আমার। বলে উঠলাম, আমার জ্বর হোক বা যা হোক, কার তাতে কি? দিদিদের জিজ্ঞাসা করার দরকার কি ছিল?

পুরু ঠোঁটের হাসিটা আরো স্পষ্ট। হাসি হাসি চোখ দুটো এখন যেন আরো বিচ্ছিরি।
—সেইজন্যে তোমার রাগ হয়েছিল?

আমি মাথা নাড়লাম কি নাড়লাম না।

—এখন কি হচ্ছে, রাগ হচ্ছে?

আমি জবাব দিলাম না।

—তাহলে আর একবার জিব ভেঙাও দেখি। সত্যি বলছি, আমার খুব ভালো লেগেছিল।

এবারে হনহন করে পাশ কাটিয়ে আমি চলে এলাম। বাড়ির যত কাছে এসেছি, তত মনে হয়েছে, ওর চুলের ঝুঁটি ধরে ঝুলে পড়লেই ঠিক কাজ হত।

ছোড়দি আর দিদি ব্যাপারটা শুনে তাজ্জব একেবারে। ছোড়দি বলল, বলিস কি রে, এ বাড়ির মেয়ের পথ আগলে দাঁড়ায় এত সাহস!

তখনো আমি জানি না, কোনোদিন গল্প লেখার ঝোঁক আসবে আমার। কিন্তু গল্পের মতই কত সময় কত যে উদ্ভট কল্পনা মাথায় আসত আমার ঠিক নেই। সেদিন ছোড়দির কাছেই আমার কল্পনার একটা নিখুঁত প্রমাণ দিয়ে ফেললাম। ছোড়দিই আমাকে জ্বালায় বেশি, তাই ওর ওপরেই রাগ। হঠাৎই ওকে জব্দ করার মতলব মাথায় এসে গেল। বললাম, আসলে ও আমার জন্যে দাঁড়ায় না, আমাকে দেখেও না—তোকেই দেখে, তোর দিকেই তাকায়।

—কি? কি বললি? ছোড়দি মারমুখী ওমনি।—তোকে কে বলল?

দিদিও ভয়ানক উৎসুক। আমি জবাব দিলাম, ও নিজের মুখেই তো বলল। বলল, তোর সঙ্গে ভাব করার খুব ইচ্ছে, তাই ফাঁকতালে আমার অসুখের অজুহাতে তোর সঙ্গে দুটো কথা বলে নিতে এসেছিল।

বিশ্বাস দুজনেই করল। ছোড়দির লাল মুখ তখন দেখবার মত। আমি কি করে যে হাসি সামলে ছিলাম জানি না। রাগে গড়গড় করে ছোড়দি বলল, চাল নেই চুলো নেই, বস্তির মত ঘরে থাকে তার এত শখ! দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা! ওর বউদি আবার আসুক ঠাকুমার কাছে—ঠাকুমার সামনেই বলব সব। সাহস বার করছি!

মিথ্যেয় মিথ্যে বাড়ে।। ঠাকুমার সামনে যদি বলে কিছু তাহলে এই মিথ্যে নিয়েই গণ্ডগোল হতে পারে। ও ছেলে নালিশ স্বীকার তো করবেই না, উল্টে আবার হয়ত ক্যাক করে রাস্তায় ধরবে আমাকে।

তাই সামাল দিতে হল।—খবরদার কিছু বলিস না ছোড়দি, ও এক নম্বরের গুণ্ডা, মারামারি ছাড়া আর কিছু জানে না, বাড়ির লোকের শাসনও মানে না। তুই তো সর্বদা রাস্তায় বেরোস, শেষে মুশকিলে পড়ে যাবি। সত্যি আমাকে খুব ভদ্রভাবে বলেছে, একটুও খারাপ ভাবে বলেনি।

এ-কথায়ও ছোড়দির রাগ পড়ল না তেমন। কিন্তু সুনন্দর বউদি ঠাকুমার কাছে আসার পর ছোড়দিকে তাব ধারে কাছে না যেতে দেখে আমি নিশ্চিন্ত।

এরপর আবার নিয়মিত যেতে আসতে ওই মূর্তি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলেও ছোড়দি আর কিছু বলে না। মুখখানা অতিরিক্ত গম্ভীর করে শুধু তাকায় দুই একবার।

ছোড়দিকে জব্দ করা গেছে বটে, তার মুখ বন্ধ। কিন্তু আমি যে সত্যি কথা বলিনি সে-তো নিজে অন্তত জানি। তাই ওভাবে দাঁড়ানোটা আমারই চক্ষুশূল। অথচ কেউ যদি তার নিজের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে কার কি বলার আছে?

ঠাকুমা একদিন ওদের বাড়ির প্রশংসা করছিল। ও-বাড়িতে এখনো সকাল-সন্ধ্যা কাঁসর ঘণ্টা বাজে, পুরুত নিয়মিত এসে পুজো করে, এসব ঠাকুমার ভারি পছন্দ। আর

আমাদের ঠিক সেই কারণেই অপছন্দ। শুধু ওই ভাঙাচোরা বাড়িটা নয়, বাড়ির মানুষগুলোও যেন সব সেই পুরনো কালের কোনো এক কোণে পড়ে আছে। সে-কথা না বলে ঠাকুমার প্রশংসার জবাবে আমি ফস করে বলে বসলাম, কিন্তু ও-বাড়ির সুনন্দ না ফুনন্দ—সে একটা হাড়বজ্জাত ছেলে!

ঠাকুমা ওমনি পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল, কেন লা, তোর সঙ্গে ভাবসাব করতে চায় নাকি?

আমি জবাব দিলাম, আমার সঙ্গে কেন, তোমার সঙ্গে চায়—ডাকব একদিন?

—তা ডাক দেখি একদিন, দেখে শুনে রাখি, সময় হলে তোদের একটার দিকে চালান করে দেব। একটা তো নয়, তোদের তিনটের জন্য তিন-তিনটে নাগর চাই আমার, তোদের মা হতভাগী আচ্ছা কলে আটকে গেছে আমাকে, ভাবলেও বুক ঠাণ্ডা।

ছোড়দির বয়-ফ্রেন্ড অর্থাৎ রমেশ ভার্গবের সঙ্গে ছোড়দির ভাব ঘুচে গেল একদিন। তার উপলক্ষ্য আমি।

তেরো পেরিয়ে সবে চৌদ্দয় পা দিয়েছি। কিন্তু মনে মনে ধারণা বুদ্ধিটা বয়েসের তুলনায় অনেক বেশি পেকেছে। কিন্তু ছোড়দির সে-ধারণা নেই। সে আগের মতই আমার মারফত চিঠিচাপাটি চালাচ্ছে। আমার হাসিই পায়, দেখা প্রায় রোজই হয়, অথচ চিঠিও লেখা চাই। ওদিকে কলেজে ভর্তি হয়ে রমেশ আগের থেকে বেশি লায়েক হয়েছে। ফড়ফড় করে সিগারেট খায়।

রমেশকে একটাই কারণে আমার যা একটু পছন্দ। একলা দেখা-সাক্ষাৎ হলে ও আমাকে আর একটু বেশি খাতির করে। চিনেবাদাম আর আইসক্রিম তো আছেই, রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে বেশ খাওয়ায়-দাওয়ায়।

সেদিন গিয়ে দেখি রমেশের আর একরকম মুড। জলের ধারে বসে গম্ভীর মুখে সিগারেট টানছে। আমি গিয়ে বললাম, এই নাও তোমার চিঠি, আমার হয়েছে এক ঝকমারি কাজ!

নির্লিপ্ত মুখে হাত বাড়িয়ে চিঠি নিল। খুলে পড়ল না। আগের মত সিগারেট খেতে লাগল।

—পাল্টা চিঠি-পত্র দেবে, না আমি যাব?

—বোসো।

বসলাম। একটু চুপ করে থেকে ও বলল, আজ আমার মনটা ভয়ানক খারাপ আবার ভয়ানক ভালো।

—খারাপ কেন?

—বলার অসুবিধে আছে।

—আর ভালো কেন?

—সেটা বলার আরো অসুবিধে।

—তাহলে তুমি বসে বসে সিগারেট খাও, আমি ছোড়দিকে গিয়ে এই কথাই বলি।

সিগারেটটা জোরে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর করুণ চোখে খানিক চেয়ে রইল আমার দিকে।—না কিছু বলতে হবে না, চলো দুই একটা ফাউল কাটলেট খেয়ে নিই, তারপর কথা হবে।

ছেলেটাকে এই জন্যেই খুব বোকা ভাবি না আমি। আমার কোন জিনিসটা পছন্দ ও বেশ বুঝতে পারে।

রেস্টুরেন্টের এক কোণের ছোট কেবিনে গিয়ে বসলাম আমরা। ডিশে উপাদেয় বস্তু এবং আনুষঙ্গিক রসদ টেবিলে আসার পর রমেশ হঠাৎ উঠে কেবিনের পর্দাটা ভালো করে টেনে দিয়ে আবার মুখোমুখি বসল। বসেই খপ করে ওর ডান হাত দিয়ে আমার বাঁ হাতটা ধরল। তারপর যেন ঘুম-ঘুম চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, খাও।

আমি বললাম, হাত না ছাড়লে কাঁটা-চামচ ধরব কি করে?

ও বলল, হাতে করেই খাও না, বাড়িতে কি কাঁটা-চামচ ব্যবহার করো?

অগত্যা আমি ডান হাতে আর ও বাঁ-হাতে করে খেতে লাগল। আমার বাঁ-হাত ওর ডান হাতে ধরা। আমার কেমন মনে হল সেই হাতে একটু একটু চাপ পড়ছে। আর খুব ঘন-ঘন অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে। ফাউল কাটলেট খাচ্ছে কি স্বপ্ন দেখছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

এমনি করে আমার খাওয়া প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ শেষ। আমার ডিশের দিকে একবার তাকিয়ে খুব মিষ্টি করে জিজ্ঞাসা করল, আর একটা দিতে বলি?

আমি তাড়াতাড়ি মাথা নাড়লাম, আর না। প্রথম কথা, আর এক প্রস্থ ডিশ এলে বাড়িতে ফিরতে দেরি হবে। দ্বিতীয় কথা, আমার একখানা হাতের ওপর ওর এই দখলটা আমার কেমন যেন ভালো লাগছিল না। তৃতীয় কথা, ওর হাব-ভাব আজ ভারি বিচিত্র।

রমেশ জিজ্ঞাসা করল, মন কেন খারাপ শুনবে?

কাটলেট মুখে আমি মাথা নাড়লাম; অর্থাৎ শোনার ইচ্ছে আছে।

ও প্রস্তাব করল, তাহলে আমি উঠে তোমার পাশের চেয়ারটায় বসি?...খুব চুপিচুপি বলব।

কে জানে কেন, তাড়াতাড়ি কাটলেট শেষ করে আমি বাধা দিলাম, না না, ওখান থেকেই আস্তে আস্তে বলো, আমি দিব্বি হাত-পা ছড়িয়ে বসেছি।

এমন চোখে চেয়ে রইল যেন এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়বে।—তুমি কাউকে বলবে না তো?

আমি মাথা নেড়ে আশ্বাস দিলাম, বলব না।

—মিস অদিতিকেও না?

সকরুণ আগ্রহ দেখেই আবারও আশ্বাস দিতে হল, বলব না।

একটু থেমে আমতা আমতা করে ও বলল, আমি আজই টের পেলাম, মিস অদিতিকে আমি ভালোবাসি না। অবশ্য মিস অদিতি খুব ভালো মেয়ে—খু-উ-ব।

ভয়ানক মন খারাপের কারণ বোঝা গেল। আমি খুব একটা চিন্তায় পড়লাম না এজন্যে। বড়জোর ছোড়দিটার কাটলেট খাওয়া বন্ধ হবে, এর থেকে বেশি ক্ষতি আর কি হবে?

ও টেনে টেনে বলল, আর মন খুব ভালো কেন শুনবে?

আমি উৎসুক নেত্রে তাকালাম।

—আমি আজই টের পেলাম আমি আর একটা মেয়েকে ভালোবাসি—ভয়ানক

ভালোবাসি—সি ইজ্ সো লাভলি, আর কি, ফুল অফ্ লাইফ! আমি তাকে এক মিনিটের জন্যও ভুলতে পারছি না।

আমার দু'চোখ তার মুখের ওপর বড় বড় হয়ে বুঝতে চেষ্টা করল, নতুন করে কোন্ মেয়েটা এমন কাটলেটের ভাগ্য করল। বোঝা গেল না। জিজ্ঞাসা করলাম, সেই মেয়ে কে?

জবাবে আমার দিকে খুব ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল, সেই মেয়ে আমার সামনে বসে কাটলেট খাচ্ছে।

প্রথম অনুভূতিতে আমি বিষম খেলাম, কাটলেটের শেষটুকু গলায় আটকালো। দ্বিতীয় অনুভূতিতে হকচকিয়ে গিয়ে খানিক চেয়ে রইলাম। তৃতীয় অনুভূতিতে কাটলেট খাওয়া হাতেই ওর গালে ঠাস করে একটা চড় কষাতে ইচ্ছে করল—কারণ ওর হাতে ধরা।

সব-কিছুর পরে অবস্থাটা বে-গতিক গোছের খারাপ মনে হতে লাগল আমার। আমার বাঁ-হাত ও এত জোরে চেপে ধরে আছে এখন যে আঙুলগুলোর ডগায় রক্ত জমছে। ও আরো ঝুঁকে বলল, এবারে আমি তোমার পাশে গিয়ে বসি?

অজানা ভয়ে আমার ভেতরটা ধড়ফড় করে উঠল।—কেন?

—বোকা মেয়ে, কিচ্ছু বুঝতে পারো না?

আমি দু'চোখ টান করে বুঝতে চেষ্টা করছি। ও এবার কাঁদ-কাঁদ মুখ করে বলে উঠল, তুমি খুশী হওনি? তুমি আমাকে ভালোবাসতে পারবে না?

এখন এই খুপরি থেকে বেরুবার জন্য ব্যস্ত আমি। জবাব দিলাম, সবে তো আজ জানলাম, একটু ভেবে দেখি, কাল পরশুর মধ্যে মাঠে এসে তোমাকে বলব। এক্ষুনি না উঠলে বাড়ি থেকে লোক খুঁজতে বেরুবে। বলেই টেবিলের ঘণ্টাটা বার কয়েক জোরে জোরে বাজিয়ে দিলাম।

বয় আসার আগেই আমার হাতখানা খালাস পেল। বিরস মুখে রমেশ একটা পাঁচটাকার নোট তার দিকে ছুঁড়ে দিল। আমি ততক্ষণে পরদা ঠেলে বাইরে।

আপনারা কেউ ভূত দেখেছেন? না, আমি কোনো প্রেত-আত্মা-টাত্মার কথা বলছি না। পর্দা সরিয়ে পা ফেলামাত্র সশরীরে এক জ্যান্ত ভূত দেখে মুহূর্তের মধ্যে ভয়ে ত্রাসে কাঠ আমি। কেবিনটার মুখোমুখি বসে আমার চোখে সেই মুহূর্তে পৃথিবীর সব থেকে দুর্জন লোক সুনন্দ বোস। সামনে খাওয়া চায়ের পেয়ালা। এদিকেই চেয়ে বসে আছে। যেন আমারই অপেক্ষায় বসে আছে। চোখ থাকলে ঠোঁটের ডগায় একটু হাসিও দেখতে পেতাম হয়তো। কিন্তু আমি সেই মুহূর্তে চোখে সর্ষে ফুল ছাড়া আর কিছু দেখছি না।

সাড় ফিরতে প্রায় দৌড়েই রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এলাম। তার পরেই দেখলাম আমার একদিকে সুনন্দ দাঁড়িয়ে অন্যদিকে রমেশ। তখন কি যে অবস্থা আমার আজ বোঝাতে পারি না। শ্যাম-কূল দুই-ই বিসর্জন দিয়ে কোনো অস্তিত্বশূন্য গহ্বরে সেঁধিয়ে যেতে পারলে বাঁচি।

সুনন্দ জিজ্ঞাসা করল, প্রায় একঘন্টা ধরে এত কি খাচ্ছিলে?

রমেশও এই বিঘ্ন দেখে ঘাবড়েছে একটু, সেটা বুঝতে না দিয়ে তড়বড় করে জিজ্ঞাসা করল, হু ইজ হি?

আমাকে বলতে হল না। বুকটান করে সুনন্দ তারদিকে ঘুরে দাঁড়াল।—ইয়োর ফাদার। পছন্দ হয়?

সঙ্গে সঙ্গে আর এক মূর্তি রমেশের। ঘাড় নেড়ে আর জিভে করে ঠোঁট ঘষে অস্ফুট স্বরে জবাব দিল, ইয়েস, ইউ আর ভেরি গুড! বাই-বাই—

চৌদ্দ বছরের এক অবলা মেয়েকে বাঘের মুখে ফেলে রেখে খরগোশের মতই দ্রুত প্রস্থান করল। পারলে আমিও বাড়ির দিকে ছুটি, কিন্তু পায়ের যেন আর নড়ার শক্তি নেই। এক-পা দু'পা করেই এগোচ্ছি।

কিন্তু নচ্ছার লোকটা সঙ্গে সঙ্গে আসবে জানা কথাই। একটু বাদে বলল, সেই কতক্ষণ ধরে কত কি দেখলাম। পার্কে এসে ছেলেটার হাতে কি গুঁজে দিলে, তারপর কথা-বার্তা, তারপর রেস্টুরেন্টের চপ-কাটলেট—মিত্তির বাড়ির মেয়ের এই কাণ্ড! বাড়ি গিয়েই সব বলে দেব। হাসছে মিটিমিটি।

এর পর মাথা আর কার ঠিক থাকে বলুন? আমার অন্তত ছিল না। জবাব দিলাম, আর আমিও বাড়ি গিয়েই বলব, হ্যাংলার মত বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, মেয়েদের পেছনে পেছনে ঘোরে—

—আমার বাড়ির সামনে আমি দাঁড়াব আর সরকারী রাস্তায় হাঁটব, তাতে কার কি?

আমার সাহস বাড়ছে।—আমার খুশি আমি মাঠে আসব, রেস্টুরেন্টে যাব তাতে কার কি?

—ঠিক আছে, কার কি সেটা বাড়ি গিয়েই টের পাবে।

দুশ্চিন্তায় সত্যি কাহিল অবস্থা আমার। তবু তেজ দেখিয়ে জবাব দিলাম, বাড়িতে আর ঢুকতে হবে না, আমি তার আগেই ঠাকুমাকে বলব।

—আমি নিজে যাব কেন, আমি আমার বউদিকে বলব। বউদি তোমার ঠাকুমাকে সাবধান করে দেবে।

সঙ্গে সঙ্গে আমি।ছিটকে উঠলাম, কেন? কিসের জন্য সাবধান করবে? ছোড়দির চিঠি দেবার জন্য এসেছি, চিঠি পেয়ে লোকটা আমাকে রেস্টুরেন্টে ডেকে নিয়ে এলো—তাতে কি দোষ হয়েছে?

—ও, তোমার ছোড়দির ব্যাপার, তোমার নিজের কিছু নয় তাহলে? এবার গলার স্বর একটু সদয় যেন।

এক নম্বরের ভীতুর মত গোপন কথা ফাঁস করে দিয়ে নিজের ওপরেই প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে।—নিজের ব্যাপার আবার কি?

সে-কথার জবাব না দিয়ে বলল, তোমার ছোড়দির জন্যই বাড়িতে সাবধান করা দরকার—এসব ভালো নয়।

—কেন, আপনি কি ছোড়দির গার্জেন?

—পাড়ার মুখোমুখি বাড়িতে থাকি, একটা কর্তব্য তো আছে।

কর্তব্য-ওলার মুখে ঝামা ঘষে দিতে ইচ্ছে করছিল আমার। কিন্তু এমন নিরুপায় অবস্থায়ও কেউ পড়ে? এটুকু বোঝার বুদ্ধি আমার আছে, লোকটা কর্তব্য ফলালে ছোড়দির কপালে দুর্ভোগ আছে আর আমারও অব্যাহতি নেই।

একটু বাদেই আশ্বাসের সুর এলো।—কিছু বলব না যদি একটা—একটা নয়, যদি দুটো কথা শোনো।

আমি আশান্বিত হয়ে তাকালাম। ও আবার বলল, আর কক্ষনো এ-ভাবে চিঠি-ফিটি নিয়ে আসবে না।

বোকার মত আমি ফস করে বলে বসলাম, আর চিঠি আনার দরকারই হবে না, ছোড়দি আর চিঠি লিখবেও না।

—কেন?

এবারে সামলাবার পালা। ঘটনা উল্টে দিয়ে বললাম, ছোড়দি আর ওকে একটুও পছন্দ করে না।

—চিঠিতে তোমার ছোড়দি সেই কথা লিখেছে?

ঢোঁক গিলে মাথা নাড়লাম, তাই লিখেছে।

—তাই লিখছে জেনেও তুমি রেস্টুরেন্টে ওর সঙ্গে খেতে এলে?

বুঝুন কাণ্ড! যেন আমি আসামী আর উনি একজন জজ-ম্যাজিস্ট্রেট! ইচ্ছে হল বলি, বেশ করেছি। পরমুহূর্তে আবার সামাল দেবার বুদ্ধিই জাগল মাথায়।—চিঠি তো রেস্টুরেন্টে এসে খোলা হয়েছে, আগে কি করে জানব?

—ও। চিঠি পড়ে কি করল, কাঁদল-টাঁদল?

যা মাথায় আসছে তাই বলছি। জবাব দিলাম, না।...খুব মন খারাপ করে কাটলেটের অর্ডার দিল।

লোকটা জোরেই হেসে উঠল এবার। আর তাই শুনে রাগে আমার পিত্তি জ্বলতে থাকল।

হাসি থামিয়ে শেষে বলল, আচ্ছা, এবার দ্বিতীয় কথা শোনো—

অর্থাৎ, বাড়িতে কিছু ফাঁস না করার দ্বিতীয় শর্ত। আমি উদগ্রীব।

—তোমাদের দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে যখনই আমাকে আমাদের বাড়ির সামনে দেখতে পাবে, তখনই কেউ যাতে দেখে না ফেলে এ-ভাবে চট করে আমাকে একবার জিভ ভেঙচাবে—রোজ একবার করে আর বেশ বড় করে। মনে থাকবে?

এ-রকম শর্ত কোনো মানুষ করতে পারে না—অতএব এটা ইয়ার্কির ব্যাপার। আমার যা মনের অবস্থা, পারলে ওর জিভ টেনে ছিঁড়তাম।

আমার মুখের দিকে চেয়েই ছোড়দি কিছু একটা গণ্ডগোলের আঁচ পেল বোধহয়। আসামাত্র আমাকে ছাদে ডেকে নিয়ে গেল।—তোর ফিরতে এত দেরি হল যে?

কে জানে কেন, রাগ আমার ছোড়দির ওপরেও হচ্ছিল। সোজা জবাব দিলাম, আমাকে ফাউল কাটলেট খাবার জন্য ধরে নিয়ে গেল তাই। তোকে আর চিঠি-ফিটি লিখতে হবে না, ওর তোকে আর ভালো লাগে না।

ছোড়দি হকচকিয়ে গেল প্রথম। তারপরেই রাগ।—ফাজলামো করতে হবে না! চিঠির জবাব দিয়েছে?

চিঠি খোলেইনি মোটে। যা বললাম সত্যি কথা, রমেশ বলেছে তোকে ভালো লাগে না, আমাকে ভালো লাগে। রেস্টুরেন্টে সারাক্ষণ আমার একটা হাত চেপে ধরে রেখেছিল, আর আমার পাশে এসে বসতে চেয়েছিল।

দু'চোখ কপালে তুলে ছোড়দি যেন আমাকেই নতুন করে আবিষ্কার করল একদফা। তারপরেই আগুন হয়ে বলে উঠল, পাজী, ছুঁচো, বদমাইশ—এত সাহস ওর! এই বলেছে —এই করেছে? আর এ-সব শুনেও আদেখলের মত তুই কাটলেট গিলতে গেলি?

—আগে তো বলেনি, পরে বলেছে। কিন্তু এর থেকেও অনেক বড় সর্বনাশ হয়ে গেছে, বুঝলি?

দুর্বোধ্য ভয়ে ছোড়দির দু'চোখ আবার আমার মুখের পর থমকালো।

—ও বাড়ির সুনন্দ সব টের পেয়েছে—ওর বউদিকে দিয়ে ঠাকুমার কাছে সব বলে দেবে বলেছে।

ছোড়দির মুখ চুন।—বলিস কি রে! কি করে জানলো?

—মাঠে যখন যাই চুপি চুপি কেউ আমার পিছু নিয়েছে জানব কি করে? রমেশকে তোর চিঠি দিতে দেখেছে, আমাদের রেস্টুরেন্টে খেতে দেখেছে। এত বড় পাজী, ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই রেস্টুরেন্টে এসেছে—আর যেই আমরা বেরিয়েছি ওমনি খ্যাঁক করে ধরেছে!

—কি সর্বনাশ! তারপর, তারপর?

—তারপর আর কি, ওর কথা শুনে আর মারমুখো ভাব দেখে রমেশ পালিয়েছে, আর ও সমস্ত রাস্তা শাসাতে শাসাতে এসেছে—তোর নামে ঠাকুমাকে বলবে।

—তুই বলে দিলি আমার চিঠি, আমি লিখেছি?

—না তো কি, আমার নিজের চিঠি আমি নিজে নিয়ে গেছি বলব?

কাঁদ-কাঁদ মুখ করে ছোড়দি বলল, তাহলে কি হবে—ঠাকুমা জানলে তো ঠিক বাবাকে বলবে!

—আমি এবার আশ্বাস দিলাম, দুটো কাজ করলে বলবে না বলেছে।

—কি কাজ? তুই বললি না কেন করব? কি কাজ, বল না?

—একটা কাজ হল, রমেশকে আর তুই চিঠি লিখবি না।

—ওই রাসকেলটাকে আবার চিঠি লিখব! তুই বলেছিস লিখব না?

—বলেছি।

—আর একটা কি কাজ?

এর জবাবে যা বলেছিলাম সেকি একদিন যে গল্প লিখব তারই নজির?

জবাব দিলাম, যখনি ওর সঙ্গে তোর দেখা হবে, একবার করে আর বেশ বড় করে ওকে তোর জিভ ভেঙাতে হবে।

ছোড়দি তক্ষুনি রেগে উঠেছে।—পাজী নচ্ছার, ইয়ার্কি পেয়েছে!

ঠাকুমার ডাক কানে আসতে কথা তখনকার মত সেখানেই ক্ষান্ত। পরে ভেবে-চিন্তে ছোড়দি একসময় চুপি চুপি বলল, দেখ, আমি ভেঙাতে-টেঙাতে পারব না, তুই ছেলেমানুষ, আমার হয়ে তুই-ই একটু ভেঙিয়ে দিস না?

ওর দুরবস্থা দেখেই হাসি চেপে আমি বলেছিলাম, দেখি।

এর পর সুনন্দ বোসকে ওদের বাড়ির সামনে আরো বেশি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত। আর তখন সত্যি সত্যি রাগের চোটে আমার তাকে ভেঙাতে ইচ্ছে করত।

## তিন

আমার ঠাকুরদা ছিলেন নাম-করা উকিল। খানিক দূরে একই রাস্তার ওপর তিনটে বাড়ি করেছিলেন তিনি। পাঁচ ছেলে তাঁর। তাই আরো দুটো করার ইচ্ছে ছিল। এ ইচ্ছে তাঁর পূরণ হয়নি। তার আগেই তিনি চোখ বুজেছেন।

তখন মেয়েদের ভাগ নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু পাঁচ ছেলের মধ্যেই বা তিনটে বাড়ি ভাগ হবে কেমন করে? আমার বাবাও উকিল। ঠাকুরদার ধারে-কাছেও তাঁর প্রসার নয়। তার ওপর অসময়ে আমার মা গত হওয়াতে রোজগারের দিকে খুব একটা ঝোঁক ছিল না। পড়াশোনা করতেই বেশি ভালোবাসতেন। তবু বাবা আর কাকাদের মধ্যে বাবার রোজগারই কিছু বেশি। আর এই বাড়িটাই সব থেকে বড়।

ঠাকুরমার মত নিয়ে ভাগ-বাঁটোয়ারার একটা সুব্যবস্থাই করেছিলেন বাবা। তিনটে বাড়ির একসঙ্গে দাম ধরা হয়েছিল এক লক্ষ আশি হাজার টাকা। তার পাঁচ ভাগের একভাগ অর্থাৎ ছত্রিশ হাজার টাকা বাবার পাওনা। আর এই বাড়িটার আলাদা দাম ধরা হয়েছিল সত্তর হাজার টাকা। তার থেকে বাবার পাওনা ছত্রিশ হাজার বাদ দিলে থাকল চৌত্রিশ হাজার টাকা। এই টাকা বাকি চার ভাইকে ভাগ করে দিয়ে বাবা গোটা বাড়িটাই নিজের নামে করে নিয়েছেন। বাকি দুটো বাড়ি আর সেই চৌত্রিশ হাজার টাকা আমার চার কাকার ভাগে গেছে। বাবার এই উদার ব্যবস্থায় সকলেই খুশী ছিল।

মায়ের কথা কিছু মনে নেই। ঠাকুরদার মরার চিত্রটা মনে আছে। বাড়িতে সে-কি কান্নাকাটি আর ঠাকুমার সে-কি অবস্থা। সেই থেকে মরার নামেই আমার বড় ভয়। বাড়ির সামনে দিয়ে 'বলো হরি' দিয়ে কাউকে নিয়ে গেলে আমার বড় বিচ্ছিরি লাগত। আর রাতে শুনলে তো কথাই নেই। ঠাকুমাকে দু'হাতে জাপটে ধরে তার বুকের সঙ্গে মিশে শুয়ে থাকতাম।

অল্প বয়সে মাকে হারিয়েছি বলে কিনা জানি না, কারণে অকারণে সেই ছেলেবেলা থেকে আমার ভিতরে কিরকম একটা ভয় মেশানো অনিশ্চয়তার ছায়া পড়ত। কেন বা কি সেটা কিছুই বুঝতাম না। সর্বব্যাপারে এ-রকম হত। সবেতে ভয় বা বিপদ বা শোকের কাল্পনিক প্রতিকূল চিত্রটা আগে মনে আসত।

ছেলেবেলা থেকেই তাই মনে মনে নিজেকে ভীতু বলে জানি। ফলে আমার বাইরের ব্যবহার বা চালচলন এর ঠিক উল্টো। সর্বব্যাপারে এই ভীতু ভাবটা চাপা দেবার চেষ্টা। তাই বাইরের আচরণে যেমন সাহসী, তেমনি মুখরা, তেমনি বেপরোয়া। নিজের দুর্বলতা ঢাকা দেবার জন্য সেই ছেলেবেলা থেকেই আমি একটা বিপরীত খোলস আশ্রয় করে ছিলাম। সকলে সেই খোলসটাকেই দেখত, সেটাকেই বিশ্বাস করত।

এ-ছাড়া ওই বয়েস থেকেই অনেক রকম উদ্ভট কল্পনা আমার মাথায় আসত। কেউ কিছু অন্যায় বা অত্যাচার করেছে শুনলেই মনে মনে আমি ভয়ানক শক্তিমতী হয়ে গিয়ে কল্পনায় তাকে যথাযোগ্য শাস্তি দিতাম। ওই সুনন্দ বোসকে ওই গোছের কত শাস্তি যে দিয়েছি ঠিক নেই। তখন কি জানি ওর সঙ্গেই আমার জীবনের গাঁটছড়া বাঁধা হবে? যাই হোক নিজের কল্পনায় সর্বব্যাপারে আমি মহীয়সী এবং অদ্বিতীয়া।

শুধু এই লেখার মধ্যে কাল্পনিক বিষাদের চিত্রটাও ভালো ফোটাতে পারতুম। স্কুলে

বিদেশ-ভ্রমণ রচনার উপসংহারে লিখেছিলাম, এ ভ্রমণে আমরা হাসিমুখে অভ্যস্ত হতে পারলে চরিত্রের একটা প্রস্তুতির বাঁধুনি আসবে। সেটা সম্বল করে তখন আমরা হয়ত এই ধরাধাম থেকে শেষের অজ্ঞাত বিদেশ-ভ্রমণের পথে পা বাড়াতেও ভয় পাব না। আসলে তো সবই ভ্রমণ—এই পৃথিবীতে আসাটাও, এখান থেকে যাওয়াটাও।

এই গোছের অনেক কিছু মাথায় গজাতো, আর সে-সব লিখেও ফেলতাম। এই করে শুধু স্কুলের মেয়েরা নয়, টিচারদেরও ধারণা হল আমি খুব ভালো বাংলা লিখি, আমার কল্পনাশক্তি প্রখর, আর চিন্তার মধ্যে মৌলিকতা আছে।

কে কি হবে বা হতে চায় তাই নিয়ে লিখতে দেওয়া হয়েছিল একবার। সেই প্রথম আমি বেশ স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছিলাম লেখিকা হবো। তার জন্য কি-রকম গুণাগুণ দরকার, প্রস্তুতি দরকার সে-সম্পর্কেও যা মনে আসে তাই লিখেছিলাম। সেই লেখাটা টিচার নিয়ে গিয়ে আমাদের স্কুল ম্যাগাজিনের ছাত্রী সম্পাদিকার হাতে দিয়েছিলেন। তারপর একদিনের সে বিস্ময় আর পুলকের সীমা নেই। 'ভাবী লেখিকার স্বপ্ন' নাম দিয়ে লেখাটা স্কুল ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছে।

সেই থেকে নিজের কাছে অন্তত আমি লেখিকা হয়েই গেছি। সহপাঠিনীরাও বিশ্বাস করেছে লেখিকা হতে আমার আর বাকি নেই কিছু। সেই লেখাটা পড়ে বাড়ির সকলে খুশী। ঠাকুমা বাবাকেও সেই ছাপা লেখাটা দেখিয়েছে। আনন্দ ছোড়দিরও হয়েছে, আমার কিন্তু মনে হয়েছে সেই সঙ্গে ওর একটু হিংসেও হয়েছে। কারণ এরপর কিছুদিন ওকেও লেখা মক্স করতে দেখেছি। আমাকে বোঝাতে চেয়েছে ইচ্ছে করলে ও এর থেকে ভালো ছাড়া খারাপ লিখবে না।

একটা কথা বলে রাখি। রমেশ ভার্গবের ওপর রাগ অনেক দিন পর্যন্ত যায়নি। সুনন্দ বোসের বাড়িতে সব বলে দেবার ভয়টা কেটে যাবার পর থেকে কারণে অকারণে সেই রাগটা ও আমার ওপর ফলাতো। না, রমেশ ভার্গবকে ও আর দু'চক্ষে দেখতে পারে না, দেখার সুযোগও আর ঘটেনি। কিন্তু আমার জন্যেই যে রমেশ ভার্গব ওকে বাতিল করেছিল—সেই ক্ষোভ ও বোধহয় শিগগির ভুলতে পারেনি।

ওদিকে একটা বছর যেতে না যেতে সুনন্দ বোস যে তার বাড়ির মাথায় কাউকে দেখার বা কারোর সঙ্গে দুটো কথা বলার আশায় তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে তাও বোধহয় ও টের পেয়েছে। তিন বোনের কেউ সত্যি আমরা ওকে সুচক্ষে দেখি না। তবু ছোড়দির ধারণা ওই একটা অতি বাজে লোকের আগ্রহ ক্রমে ওর দিক থেকে আমার দিকে ঘুরেছে। তাই যখন-তখন ঠেস-ঠোস দেয়, উপদেশও দেয়, বলে, খবরদার, ও একটা এক নম্বরের লোফার—ওর দিকে তাকাবিও না, কথাও বলবি না!

ষোল বছর হতে না হতে আমি পুরোদস্তুর লেখিকা হয়ে গেছি। সামনের বার উঁচু ক্লাসে উঠলেই আমি যে ছাত্রী-সম্পাদিকা হব তা স্কুলের জানা কথা। ইতিমধ্যে ছোটদের মাসিক পত্রে আমার অনেক গল্প আর কবিতা ছাপা হয়ে গেছে। মিশনারি স্কুলের প্রিন্সিপাল পর্যন্ত জেনেছেন তাঁর স্কুলের এক ছাত্রী নামজাদা লেখিকা হতে চলেছে। ছোটদের সব কাগজেই আমি লেখা পাঠাতাম। তার মধ্যে কোনও লেখাই ফেরত আসত না এমন নয়। যে লেখাগুলো ফেরত আসত সেগুলির অপরিচিত সম্পাদককে মনে মনে ভস্ম করতাম আমি।

লেখিকা হওয়ার আর একটা জ্বালাও টের পেতাম। সব ছাপা লেখা দুনিয়াসুদ্ধ লোক না পড়লে যেন শান্তি নেই। দু'চক্ষে দেখতে পারি না এমন যে-লোকটা এখনো ফাঁক পেলে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে—মনে মনে চাইতাম সেই সুনন্দ বোস আমার ছাপা গল্প আমার কবিতা পড়ুক। বুঝুক আমি মেয়েটা কোন দরের।

এইখানে আর একটা কথাও বলে রাখি। ঠাকুমা বুড়ির অবিবেচনায় ষোলর আগেই আমাকে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরতে হয়েছে। ঠাকুমার মতে ধিঙ্গি মেয়েকে ফ্রক পরলে বিচ্ছিরি দেখায়। ওই মুখপুড়ী বুড়ী আর যে কথা বলত শুনলে রাগও হত আবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ফ্রক-পরা মূর্তির দিকে চেয়ে লজ্জাও করত। ঠাকুমা বলত, বাড়ন্ত শরীর এখন, ফ্রক পরলে কি বিচ্ছিরি দেখায় আয়নায় দেখিসও না!

আমি খেঁকিয়ে উঠতাম, মেমসাহেবরা তোমার মত বুড়ী হয়েও ফ্রক পরে কি করে?

ঠাকুমা সমান তালে জবাব দিত, তা বলে তোরাও মেমসাহেবদের মত ঠ্যাং দেখিয়ে বেড়াবি! যে দেশের যা—

যাই হোক, আমাকে একটু আগেই শাড়ি ধরতে হয়েছে। ঠাকুমা গজগজ করে বলত, ওই মেজ ছুঁড়ীটা রোগাপটকা বলে ওকে তবু কিছুকাল মানিয়েছে, তোকে মানায় না। আর এই শাড়ি পরতে শুরু করার পর থেকে স্পষ্টই আর একজনের চাউনি-বদল লক্ষ্য করেছি আমি। এর পর থেকে আমাকে দেখলেই প্রথম কিছুদিন অন্তত ওর ছোট ছোট চোখদুটো আগের থেকে অনেক বেশি উৎসুক হয়ে ওঠে, আর পুরু ঠোঁটের ডগায় খুশীর দাগ পড়ে। আর তাই দেখে রাগে শাড়ি ছেড়ে আবার ফ্রক ধরার ইচ্ছে হত আমার।

যে কথা বলছিলাম, লেখিকা হওয়ার এমনই যাতনা যে, মনে মনে চাইতাম ওই চক্ষুশূল সুনন্দ বোসও আমার ছাপা লেখা পড়ুক আর অবাক হোক।

অবাক একদিন আমিই হলাম।

শুনেছি, সে-বছরেই বি-কম না কি পাশ দিয়ে দিগ্‌গজ হয়ে সামনের ভাঙাবাড়ির ঐ ছেলে কোন একটা ব্যাঙ্কে কেরানীগিরিতে ঢুকেছে। মনে হয় ওর বয়েস তখনো বাইশ ছাড়ায়নি, ওই বয়েসেই চাকরিতে ঢুকে হাব-ভাব বেশ একটু ভারিক্কি হয়ে উঠেছে। হঠাৎ এক ছুটির দিনে বাড়ি থেকে বেরিয়েই দেখি গম্ভীর মুখে রকে বসে কি একটা পড়ছে। আমাকে দেখেই মুখ তুলে তাকালো একবার, তারপরেই হাতের বস্তুটা আর একটু তুলে ধরে বেশ মন দিয়ে পড়তে লাগল। আর তক্ষুনি খুশীর বদলে কেন যেন আমার প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল।...লোকটার হাতে ছোটদের একটা রং-চঙে মাসিকপত্র। দিনকয়েক আগে ওই কাগজটা আমার কাছেও এসেছে, কারণ ওতে আমার একটা গল্প ছাপা হয়েছে।

আমি না দেখেও বলে দিতে পারি ওর সামনে কোন পাতাটা খোলা। আর এও বলে দিতে পারি ও কিছুই পড়ছে না, আসলে আমাকে দেখিয়ে মজা করছে।

আমি হন-হন করে এগিয়ে গেলাম। কাছের ওষুধের দোকান থেকে ঠাকুমার জন্য কি একটা ওষুধ আনতে বেরিয়েছিলাম।

—শোনো।

আমি চমকে ঘুরে দাঁড়ালাম। ওই উপদ্রব। হাসছে একটু একটু। বলল, তোমার গল্পটা পড়লাম।

এমনভাবে বলল যেন গল্প পড়ে আমাকে কৃতার্থ করেছে। এই কাগজেই আমার লেখা বেরিয়েছে জানল কি করে ভেবে পেলাম না। কিন্তু তার পরেই যে মন্তব্য করল শোনামাত্র মাথায় ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠতে থাকল। বলল, একেবারে ছেলেমানুষি ব্যাপার, মেয়ের লেখা বলেই ও-রকম কাঁচা লেখা ছাপা হয়েছে।

কাণ্ডজ্ঞান খুইয়ে আমি ঝাঁঝিয়ে উঠলাম, কাঁচা পাকা চিনতে হলে একটু লেখা-পড়া জানার দরকার হয়, হাঁ-করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলেই হয় না।

শাড়ি পরার পর থেকে আমার বাইরের সাহস অন্তত বেশ কয়েক গুণ বেড়ে গেছে।

জবাবে সে মস্ত মাতব্বরের মত হাসতে লাগল। বলল, তুমি রাগ করছ কেন, পাঠক হিসেবে সমালোচনা করব না!...আগের দু'চারটে কবিতা পড়েছি, সে বরং মন্দ লাগেনি।

ও পড়বে জানলে আমি কবিতা লিখতাম না এমন মুখ করে আমি হনহন করে বাড়ির পথে কয়েক পা এগিয়ে গেলাম। তার পরেই মনে পড়ল ঠাকুমার ওষুধ কিনতে বেরিয়েছি। আবার ওই মূর্তির পাশ কাটিয়েই সামনের দিকে এগোতে হল। আর তখন মনে হল গা-জ্বালানো একটা নীরব হাসি আমার সর্বাঙ্গে লেগে আছে।

আমার বয়েস তখন ষোল ছাড়িয়ে সতের চলছে। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছি। তখনো রেজাল্ট বেরোয়নি। সকলের ধারণা ভালোই পাস করব। আমারও এক-একসময় সেই রকমই মনে হচ্ছে। আবার কি জানি কি হয় ভেবে ভিতরে ভিতরে একটু উতলাও বোধ করি। কিন্তু সেটা গোপন।

এই সময়েই পর পর কয়েকটা ঘটনায় আমাদের বাড়ির বাতাস হঠাৎ যেন বদলে গেল। প্রথমে একটা আনন্দের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। দিদি ভারতীর বেশ বড় ঘরে বিয়ে হয়ে গেল। আমাদের পরিবারের সব-থেকে বড় উৎসব। কিন্তু উৎসবের গোড়াতেই ছোট-খাটো একটু নিরানন্দের ব্যাপার হয়ে গেল। আর উৎসবের পরেও তার চাপা একটা অপ্রীতিকর জের চলল।

দিদির বরের নাম অমরেন্দ্র দত্ত। এ-যুগের চাকরির বাজারে কৃতী মানুষ। ভালো স্কলার। আই. এ. এস. পরীক্ষায় মোটামুটি ভালো রেজাল্ট করে অল্প বয়সে বড চাকরিতে ঢুকেছে। এ-রকম জামাই আনার যোগ্য মর্যাদা দিয়ে কাজে এগোবার জন্যে বাবাও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ছেলের বাবার বিচারে সে যোগ্যতা কাকে বলে বাবার ধারণা ছিল না।

সে-ভদ্রলোকের আবার ধারণা তাঁর ছেলের মত এতবড় কৃতী ছেলে এ যুগে আর হয় না। অতএব সেই অনুযায়ী তাঁর প্রত্যাশা। শুধু তাঁর নয়, তাঁর গৃহিণীরও। ঠিকুজিতে রাজ-যোটক মিল হওয়া এবং তিন দাদা দেখাশোনার পর যখন স্থির হল এখানে ছেলের বিয়ে দেওয়া যেতে পারে, তখন ছেলের বাবা প্রথম দাবি জানালেন, দশ হাজার নগদ দিতে হবে, পঁয়ত্রিশ ভরি সোনা।

বাবা বললেন, দেব।

পরের লিস্ট, ছেলের সব থেকে দামী ঘড়ি, হীরের বোতাম, হীরের আঙটি, ফ্রিজ, ফার্নিচার, কাঁচ-বসানো আলমরি, ডাইনিং টেবল্, রেডিওগ্রাম ইত্যাদি।

বাবা বললেন, দেব।

তৃতীয় দফা মেয়েদের লিস্ট। আরো কিছু বাড়তি গয়না, অতখানা বেনারসী, নমস্কারীর অতখানা গরদ আর অতখানা এমনি দামী শাড়ি। সব মিলিয়ে তাও সাড়ে তিন ডজন হবে। এই লিস্টের মধ্যেই কয়েক দফা রূপোর আর স্টেইনলেস বাসনের সেট।

বাবা জানালেন দেওয়া হবে। এই সঙ্গে বাবা আর একটু বেশি মুখ খুললেন। বললেন, আপনারা ফর্দ না পাঠালেও এ-সব দেওয়া হত।

পাকাদেখা হয়ে যাওয়ার পরে প্রস্তাব এলো, আলমারি দুটো হলেই ভালো হয়—একটা ছেলের, একটা মেয়ের। নইলে মস্ত চাকুরে ছেলের অনেক দফা স্যুট-টুট রাখার অসুবিধে। ছেলের বাবার হয়ে যে আত্মীয়টি প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল, বাবা তাকে শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন এখন সে-সব কোথায় রাখা হয়?

যাক, যে এসেছে সে কোনোরকম জবাবদিহি করতে আসেনি। গম্ভীর মুখে বাবা তাকে জানিয়েছেন, আচ্ছা দেওয়া হবে। তার পরেই ঠাকুমার কাছে এসে বলেছেন, এখানে কাজে এগিয়ে ভালো করলাম না।

দাবির ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে গেলেও বোধহয় কারো মনে সে রকম বড় কিছু দাগ পড়ত না। বিয়ের মাত্র সাতদিন আগে শেষ আরজি নিয়ে উপস্থিত ছেলের বড় ভগ্নীপতি। জামাইকে (একমাত্র জামাই) বলে কয়ে দিদির হবু শ্বশুরই পাঠিয়েছেন। সে-ভদ্রলোক মাথা চুলকে জানালো, বক্তব্যটা একটু ডেলিকেট।...ছেলে হঠাৎ মুখ ফুটে একটা ইচ্ছে জানিয়েছে, শ্বশুরমশাই তাই জামাইকে পাঠিয়েছেন। আলমারি দুটো লাগবে না, একটাতেই হবে...তার বদলে ছোট-খাটো একটা গাড়ি যদি দেওয়া হয় ছেলেকে তাহলে সকল সাধ পূর্ণ হয়।

দিদির হবু-শ্বশুরবাড়ি থেকে লোক এসেছে শুনলেই আমরা আড়ালে হুমড়ি খেয়ে পড়তাম। এই আরজি শুনে আমি আর ছোড়দি সভয়ে বাবার দিকে তাকালাম। মাথার ওপর পাখা ঘোরা সত্ত্বেও বাবার কপালে যেন বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে।

খানিক চুপ করে থেকে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তো ভদ্রলোকের একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করেছেন, আপনাকে এ-সব দেওয়া হয়েছে?

ভিতরে ভিতরে বড় রকমের ধৈর্যচ্যুতি না ঘটলে বাবার মুখ দিয়ে এমন কথা বেরোয় না। দিদির হবু-নন্দাইয়ের মুখ কালো। জবাব দিল, আজ্ঞে না, ছেলে দেখে কথাটা তোলা।

বাবা জবাব দিলেন, আমার শক্তি নেই, পারব না।

ভদ্রলোক চলে গেল। সেই বিকেলেই দিদির হবু-শ্বশুরের কাছ থেকে পত্রদূত এলো। চিঠির বক্তব্য, তাঁর জামাইকে মাননীয় অতিথি হিসাবেই গণ্য করা উচিত ছিল। তাকে কি দেওয়া হয়েছে না হয়েছে সে-প্রশ্ন তোলা আদৌ সুরুচির পরিচায়ক হয়নি। যাই হোক, নতুন কুটুম্বিতার মধ্যে তিনি তিক্ততা সৃষ্টি করতে চান না। তাঁর কেবল বক্তব্য, মেয়ের নিতান্ত সুকৃতির ফলেই এমন যোগ্য ছেলের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধন ঘটতে যাচ্ছে। এ-কথা চিন্তা করেও ছেলে যে জিনিসটা মুখ ফুটে চেয়েছে সে-সম্বন্ধে আর এক একবার বিবেচনা করা উচিত।...আর নিতান্তই যদি ছোট-খাটো একটা গাড়ি দেওয়া এখন সম্ভব না হয়, ভবিষ্যতে সম্ভব হবে এমন প্রতিশ্রুতি পেলেও সপুত্র তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন।

দূত বিদায় করে বাবা ঠাকুমাকে এসে বললেন, এ বিয়েতে আর এগিয়ে কাজ নেই।

ঠাকুমা প্রথমে আকাশ থেকে পড়লেন। পরে সব শুনে কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। ও-দিকে লজ্জায় অপমানে দিদিও কাঁদতে লাগল।

বাড়ির বাতাস থমথমে। ছোড়দি দিদির সেই হবু-শ্বশুর ভদ্রলোককে চামার বলে গালাগাল দিতে লাগল। দাদাও যা মুখে আসে তাই বলতে লাগল। আমার কেবল মনে হতে লাগল যদি আমাদের এত টাকা থাকত যে যা-খুশি করা যায়, যা-খুশি কেনা যায় —তাহলে দিয়ে দিয়ে ওই অদেখা বুড়ো ভদ্রলোকের আমি দম বন্ধ করে ছাড়তাম। আবার রাগ যেতে না যেতেই ত্রাস। কেনাকাটা সারা, ব্যবস্থা সারা, এখন কি হবে?

ভেবে-চিন্তে বাবা ঠাণ্ডা মাথাতেই জবাব দিলেন, যোগ্য জামাই আনার আগ্রহে এতখানি সাধ্যর বাইরে তিনি এগিয়েছেন, ধারণা ছিল না। গাড়ি দেবার প্রতিশ্রুতি দিতেও তিনি অসমর্থ। আর ভাবী বৈবাহিকের জামাতা বাবাজী ক্ষুণ্ণ হয়েছেন বলে তিনি অনুতপ্ত। নিজের দীন দশার যাতনায় এমন উক্তি তাঁর মুখ দিয়ে নির্গত হয়ে থাকবে।

আমার ধারণা, গাড়ি যদি বাবা একটা দিতে পারতেন তাহলে ওর ডবল কথা শোনালেও বর বা বরের বাপের গায়ে ফোস্কা পড়ত না। বিয়ে নির্বিঘ্নেই হয়ে গেছে, কিন্তু ঠারে-ঠোরে বিয়ের আসরেই ছেলের বাবা আমার বাবাকে কিছু কথা শুনিয়েছেন। বলেছেন, সবই নিয়তি-নির্বন্ধ, যেখানে যার ঘর ঠিক করা আছে সে সেখানেই যাবে, নইলে এ-রকম একটা ছেলের জন্য দেওয়া-থোয়ার তো কত লোকই ছিল। দান-সামগ্রী যা দেওয়া হয়েছে ভদ্রলোক একটি একটি করে তা মিলিয়ে নিয়েছেন, আর কোথাও ফাঁক বা ফাঁকি আছে কিনা তা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছেন।

জীবনে সেই প্রথম বাস্তব দেখেছি যেন আমি। আক্রোশে এই বাস্তব নিয়ে আমার একটা গল্প লেখার বাসনা ছিল। দিদির কথা ভেবেই আর এগোইনি। শ্বশুরবাড়ি থেকে প্রথমবার ফিরে আসার পরেই দিদির হাব-ভাব আর কথা-বার্তা শুনে আমি আর ছোড়দি আড়ালে হেসেছি। কতবড় যোগ্য ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, দিদি এরই মধ্যে বুঝে ফেলেছে। ওর বর নাকি কখনই আদেখলের মত এটা-চাই ওটা-চাই করেনি। গাড়ির কথা একবার মুখ ফুটে বলেছিল এই মাত্র। বাবার সাধ্য নেই শোনার পর আর একবারও নাকি ও নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি। সব ওর শ্বশুর-শাশুড়ীর কাণ্ড।...তবে, দিদিরও মত, বিয়েব আগে ননদাইকে ও-ভাবে কথা শোনানো বাবার উচিত হয়নি। এই নিয়ে নাকি বাবার সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা হয়েছে ওর শ্বশুরবাড়িতে।

আমাদের ভগ্নীপতি অমরেন্দ্র দত্ত মানুষটা অপছন্দের নয়। একে বিদ্বান, তার ওপর কত বড় চাকরি করে সে-সম্বন্ধে নিজেই একটু বেশি মাত্রায় সচেতন। এ-সবের একটু আলগা জলুস আছেই। গোড়ায় গোড়ায় একটু গম্ভীর থাকত। সেটা বিয়ের আগের অপ্রীতিকর ব্যাপারটার দরুনও হতে পারে। পাওয়া-থোয়ার ব্যাপারে তার কোনো লোভ নেই—দিদি এ-কথা বললেও ছোড়দির কাছে অন্তত সেটা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। কিছুদিন না যেতে মুখ মচকে ছোড়দি আমাকে বলেছে, বড় চাকরি করলে কি হবে, বিষয়বুদ্ধি খুব টনটনে। নতুন বিয়ে হলে শালী-টালী নিয়ে লোকে কত ফুর্তি করে আর খরচা করে—কিন্তু সে-বেলায় হাতের মুঠো একেবারে বন্ধ।

আর, বড় চাকুরে ভগ্নীপতি সম্পর্কে দাদার উক্তি আরো বাঁকা। ভাগ্যিস দিদির কানে যায়নি। দাদা ফস করে বলে বসেছিল, সাড়ে সাতশ টাকা তো মোটে মাইনে এখন,

ভারি বড় চাকরি! ও যদি বড় চাকরি হয় তো লাটসাহেবের হেড খানসামা আরো বড় চাকরি করে!

বাড়ির হাওয়া বদলের দ্বিতীয় ঘটনা এই দাদাকে নিয়ে।

বাবার সঙ্গে আমাদের বাক্যালাপ এমনিতে খুবই কম। সেই বাবা হঠাৎ এক সন্ধ্যায় ঠাকুমার সামনেই গুরুগম্ভীর মুখে দাদাকে ডেকে পাঠাতে আমরা ঈষৎ সচকিত।

দাদার মুখের দিকে চেয়ে বাবা সোজা জিজ্ঞাসা করলেন, ময়দানের দিকে বিকেলে যে মেয়েটির সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে দেখলাম, সে কে?

আচমকা আক্রান্ত হবার ফলে দাদার বিবর্ণ মূর্তি। ওদিকে আমাদেরও যেন আকাশ থেকে পতন। মৃদু কঠিন গলায় বাবা আবার বললেন, শুধু আজ নয় আরো দুদিন দেখেছি। কে মেয়েটি? কি জাত?

ঠোঁটে জিভ ঘষে দাদা জবাব দিল, কায়স্থ।

—তুমি তাকে বিয়ে করবে?

—এখন নয়...পরে।

—তাহলে ঘোরাঘুরিটাও পরে কবলে ভালো হয় না? তুমি কি করো না করো সে জানে?

দাদা সভয়ে মাথা নাড়ল, জানে।

বাবা ঠিক বিশ্বাস করলেন বলে মনে হল না। একটু চুপ করে থেকে বললেন, কি ইচ্ছে না ইচ্ছে ঠাকুমাকে সব বলো, আমি পরে শুনে নেব। এভাবে ঘোরাঘুরি আমি পছন্দ করি না।

ঠাকুমার চোখজোড়া কপালে উঠেছিল এতক্ষণ। ঘরের বাইরে আমাদেরও। হঠাৎ বড়লোক হওয়ার চিন্তা ছাড়া দাদার মাথায় আর কিছু আসে, আমাদেরও ধারণা ছিল না। যদি শুনতাম দাদা একসঙ্গে হাজার খানেক টাকার লটারির টিকিট কিনেছে তাহলে বোধহয় একটুও অবাক হতাম না।

দাদার যে বিয়ের বয়েস হয়ে গেছে বাড়ির মধ্যে সে-কথা একমাত্র ঠাকুমাই বলত। দিদির থেকেও বছর তিনেকের বড়, দাদার বয়েস পঁচিশ হবে। কিন্তু বাড়িসুদ্ধ লোক দাদাকে ছেলমানুষই ভাবত। বাবা চলে যেতে ঠাকুমার রাগ আর বিস্ময় একসঙ্গে ভেঙে পড়ল—পাজী, হতচ্ছাড়া, ডুবে ডুবে এই কাণ্ড তোর? তোকে আজ আমি পাখার ডাঁটি দিয়ে পিটব, আয় এদিকে। ছুঁড়ী দেখতে কেমন?

ঠাকুমাকে দাদা থোড়াই কেয়ার করে।

—ভালো না।

—তাহলে তুই কি দেখে মজলি?

দাদা হেসেই জবাব দিল, আমি মজিনি।

—ও ছুঁড়ী মজেছে এই মাকাল কার্তিক দেখে?

আমাদের ভাইবোনের মধ্যে দাদার চেহারাই সব থেকে ভালো। হেসেই মাথা নাড়ল, তাই।

ঠাকুমা জিজ্ঞেস করল, ঘর কেমন?

—ভালো।

—বয়েস কত?

একটু ভেবে দাদা বলল, একুশ। পরে জেনেছি মেয়ের বয়েস বাইশ ছাড়িয়েছে। দিদির থেকেও একটু বড়। কিন্তু একুশ শুনেই ঠাকুমার অপছন্দ। বলে উঠল, তুই সেদিনের ছোঁড়া, একুশ বছরের মেয়ে নিয়ে তুই করবি কি?

দাদা হাসতে লাগল।

মেয়ের নাম সুরমা। বি. এ. পড়ে। এই প্রথম বছর। ওরা ঠিক করেছে শুনলাম, সুরমা বি. এ. পাস করার পর বিয়ে হবে। ইতিমধ্যে দাদা চেষ্টা করবে চাকরিতে কিছু উন্নতি হয় কিনা। দাদা একটা ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে যাতায়াত করে, কি চাকরি করে বা কত মাইনে পায় আমরা কিছুই জানি না, বাড়ির কেউ জানে না। হাতে পয়সা যা পায় তার অর্ধেকের বেশি বোধহয় খরচ হয় নিত্য নতুন জামা-প্যান্ট তৈরি করতে। তা ছাড়া হেন লটারি নেই যার টিকিট দু'চারখানা করে না কেনে। ওদিকে ছুটির দিনের দুপুরে বাড়ির নীচের ঘর বন্ধ করে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে তাস খেলে। তাতে যে টাকা-পয়সার লেনদেন হয়, তা আমরা দু'বোন অন্তত বেশ জানি। মাথা খাটিয়ে এ পর্যন্ত ব্যবসার নামেরও কিছু টাকা জলাঞ্জলি দিয়েছে সে-খবরও রাখি।

এই দাদা কিনা প্রেম করতেও জানে!

ছোড়দির আগ্রহেই দাদা একদিন তার ভাবী বউ দেখালো আমাদের। তাছাড়া ব্যাপারটা যখন বাবা সুদ্ধ জেনেছে তখন আর অত রাখা-ঢাকার কি আছে? কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, দাদা যেমনই হোক, তার এ-রকম বউ হবে আমরা আশা করিনি। রোগা লম্বা নিতান্ত সাদা-মাটা চেহারা। গায়ের রং আমার থেকেও দু-পোঁচ মাজা। তবে কথা-বার্তা বলার পর আমার কিন্তু খারাপ লাগেনি। বেশ নরম অথচ বুদ্ধিমতী মনে হয়েছে। কিন্তু পরেও ভরসা করে ছোড়দিকে সে-কথা বলতে পারিনি। কারণ, দাদার অসাক্ষাতে ছোড়দি প্রথমেই বলেছে, দাদার মাথা খারাপ হয়েছে, ঠাকুমাকে বলে যে-করে হোক এই বিয়ে বন্ধ করা উচিত। লোকে ছি-ছি করবে।

ছোড়দির এতটা বাড়াবাড়ি আমার ভালো লাগেনি। ঠাকুমাকে অতটা বলেনি অবশ্য। কিন্তু যেটুকু বলেছে তাইতেই এক অদেখা মেয়ের ওপর ঠাকুমার মেজাজ খাপ্পা। রাগে গজগজ করে বলে উঠেছে, রূপ দেখে ও মেয়ে নিজে মজে কি-ভাবে মুণ্ডু ঘুরিয়েছে ছেলেটার ঠিক কি! আভাসে ঠাকুমা বাবাকেও বলেছে, ওই মেয়ে তো দেখতে একটুও ভালো নয় শুনলাম, তুই নিজেও তো দেখেছিস—পছন্দ যদি না হয় তো চঞ্চলকে বল—আরো দুই একটা মেয়ে দেখ শোন।

বাবা নির্লিপ্ত। জবাব দিয়েছেন, হাত পা বেধে কেউ তো আর মেয়েকে জলে ফেলে দেয় না। তোমার নাতির জন্যে ওর থেকে ভালো মেয়ে আসবে না।

এ বিয়ে ঠেকানো যাবে না বোঝাই গেল। জানাজানি হবার পর দাদার অফিস থেকে ফিরতে সন্ধ্যে গড়িয়ে যেতে লাগল। বাবার চোখে আর একবার দু'বার পড়ে গেলে আর একজনের বি. এ. পাস করার আগেই বিয়েটা হয়ে যাবে বলে আমার ধারণা। চোখে না পড়লেও হতে পারে। কারণ দাদা আজকাল দরজা বন্ধ করে ভাবী বউকে এক-আধটা চিঠিও লিখতে শুরু করেছে নিশ্চয়। নইলে ঢোক গিলে হঠাৎ একদিন 'দীর্ঘ নিঃশ্বাস'

আর, আর একদিন 'ঊর্ধ্ব' বানান জিজ্ঞাসা করতে আসবে কেন আমাকে। ফলে ঠাকুমাকে চুপিচুপি একদিন আমিই আশ্বাস দিয়েছিলাম, এমন কিছু খারাপ মেয়ে নয়, কথা-বার্তা বলে আমার তো অন্তত খারাপ লাগেনি—

রাগত মুখে ঠাকুমা জবাব দিয়েছে, কথা-বার্তা ধুয়ে তোরা জল খেগে যা—

আমি মুখরার মত বলেছি, অপরের মেয়ের বেলায় বলতে খুব সুবিধে, আমার বেলায় যদি কেউ এ-রকম বলে তোমার শুনতে কেমন লাগবে শুনি?

ঠাকুমা আরো রেগে গেছে।—তোকে কুৎসিত বলবে কোন্ ড্যাকরা রে? মাথাটা মুড়িয়ে দেব না তার! গায়ের রং ধপধপে সাদা হলেই রূপ খোলে না, বুঝলি? শ্রী থাকা চাই।

জানি, ঠাকুমার চোখে আমার থেকে শ্রীমতী কম মেয়েই। আর এই কারণেই ঠাকুমার চোখের ওপর ছোড়দির এতটুকু আস্থা নেই। ঠাকুমার ঠিকুজি কুষ্ঠি ঘাঁটা বাই ছিল আগেই বলেছি। অনেক বারের বলা-কথার পুনরুক্তি করছে আমার কথার জের ধরে।—তোর থেকে ভালো বিয়ে আর কারো হবে না, আমি জোর গলায় বলে রাখছি। আর-জন্মে তুই উমার তপস্যা করেছিলি। তোর ঠিক শিব জুটবে দেখিস।

অনেক বারের শোনা হলেও শুনতে ভালোই লেগেছিল।

এই সময়েই আর একটা বড় পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিল। সে পরিবর্তন আমার নিজের জগতেরই।

স্কুল ফাইন্যালের রেজাল্ট বেরুল, ঠিক তার আগের সন্ধ্যায় কেউ বুঝি আমার সমস্ত গায়ে জল-বিচুটি ঘষে দিল। পরীক্ষার ফল দেখে আমি তাজ্জব। সেকেন্ড ডিভিশনে পাস করেছি। ছাপার অক্ষরে সেই ঘোষণা দেখেও আমার বিশ্বাস হয়নি। আমারই নামের নীচে লাল দাগ—আর তার পাশে দু-নম্বর দেখেও না। পরে নম্বর আনিয়ে জেনেছি বাংলা ইংরেজি আর সংস্কৃত ছাড়া অন্য বিষয়গুলোতে আমি কোনো রকমে পাস করে গেছি এই পর্যন্ত। বাংলায় অবশ্য খুবই ভালো নম্বর পেয়েছি—য়ুনিভার্সিটিতেই অত নম্বর খুব কম ছেলে মেয়ে পেয়েছে বোধহয়।

যাই হোক, আগে নামের নীচে লাল দাগের কথা বলে নিই।

রেজাল্ট কবে বেরুবে বা বেরুতে পারে সেটা ঠিক আমার মাথায় ছিল না। কিন্তু কারো মাথায় ছিলই। সামনের ওই ভাঙা বাড়ির সুনন্দ বোসের মাথায় অন্তত ছিলই।

রেজাল্ট বেরুবার আগের সন্ধ্যায় সুনন্দর বউদি ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। হাতে একটা পাতলা চটি ছাপা বই। হেসে হেসে ঠাকুমাকে বলল, নাতনির পাসের খবর এনেছি, কি খাওয়াবেন বলুন।

কত বড় ধড়িবাজ ছেলে বুঝুন। এক সন্ধ্যা আগে কি করে ওই ছাপা বই সংগ্রহ করল সেটাই অবাক কাণ্ড। সে-ই যে বউদির হাত দিয়ে বই পাঠিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ফল জানার আগে আমার অতশত ভাবার সময় ছিল না। শঙ্কিতচিত্তে ছাপা বইয়ের পাতা উল্টেছি। তার পরেই চোখে কাঁটা। নামের পাশে ছাপার অক্ষরে দু-নম্বর। আর নামের নীচে লাল পেন্সিলের দাগ!

আমার বদ্ধমূল ধারণা আমাকে জব্দ করার জন্যেই আগেভাগে ওই বই সংগ্রহ করা

হয়েছে। আর আমাকে জব্দ করার জন্যেই দাগ মেরে বউদির মারফত ওটা এ-বাড়িতে পাঠানো হয়েছে। ওই লাল দাগের ভিতর দিয়ে একখানা কালো মুখ আর পুরু ঠোঁটের ব্যঙ্গ হাসি যেন ফুটে বেরুচ্ছে। ঠাকুমাকে সত্যি রসগোল্লা আনিয়ে ওর বউদিকে খাওয়াতে দেখে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। আমি তক্ষুনি সেখান থেকে উঠে এসেছিলাম।

এরপর পরীক্ষকের থেকেও সুনন্দ বোসের ওপরেই আমার রাগ বেশি। ক'দিন ধরে আমি শুধু ওর ওপরেই জ্বলেছি। সে-জ্বলুনি ছোড়দিও টের পেয়েছে। বলেছে, সত্যি, তোর পেছনে আচ্ছা লাগা লেগেছে লোকটা।

ছোড়দির মুখের এই উক্তি প্রায় অশালীন লেগেছে আমার। তবু নিরুপায়।

শিগগিরই মোক্ষম সুযোগ পেলাম একটা। ক'দিনের জন্য আমার আহার নিদ্রা ঘুচে গেল।

সেদিনও সুনন্দ বোসের বউদি বুঝি এসেছিল ঠাকুমার কাছে। ইদানীং তার আসা-যাওয়া একটু বেড়েছে লক্ষ্য করছিলাম। ওদের বাড়ির একজনকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না, সেই রাগে ওই বউদিটি এলেও আমি ঠাকুমার ঘরে থাকি না। কিন্তু সেদিন যোগাযোগ এমনি যে আমার চুলের ঝুঁটি ঠাকুমার হাতের মুঠোয়। ঠাকুমা মাঝে মাঝে তেল ঘষে আমার চুল সংস্কার করতে বসে। সেদিনও তাই বসেছিল।

সুনন্দ বোসের বউদি সেদিন হাসিমুখে তাদের বাড়ির এক কাণ্ড বলল ঠাকুমার কাছে। কাণ্ডটা হাসির নয় আদৌ, বরং ভাবতে গেলে মর্মান্তিক। কাণ্ড শুনে ঠাকুমাই শুধু দুঃখে আহা-আহা করে উঠেছিল।

ব্যাপারটা সাদামাটা ভাবে বললেও এইরকম দাঁড়ায় :

মহিলার বৃদ্ধ শ্বশুর অর্থাৎ সুনন্দ বোসের বাবা প্রায় অথর্ব শয্যাশায়ী এখন। তার ওপর এত লো-প্রেসার যে উঠতে বসতে মাথা ঘোরে। পাড়ার দু'টাকা ফিয়ের ডাক্তারের নির্দেশ মাছ দুধ ঘি ছানা ইত্যাদি খাওয়াতে হবে। তা সংসারের যা অবস্থা, এতসব হয় কি করে। একমাত্র ঠাকুরপো (সুনন্দ বোস) বাড়তি যা ক'টা টাকা ধরে দেয়, বাপের জন্য তাই দিয়ে যেটুকু হয়।

কিন্তু বুড়োর আবার এমনি রোগ যে কিছুই একলা খেতে পারেন না। আর পারবেনই বা কি করে, বড়ছেলের ঘরের চার-পাঁচটা ছোট ছোট নাতি-নাতনি—তাদের চোখের সামনে একলা ভালো জিনিস খাওয়া শক্ত। দাদুর ডাক শুনলেই তারা খাবার লোভে দৌড়ে আসে। তাদের মা (মহিলা স্বয়ং) চেষ্টা করে দাদুর খাওয়ার সময় ছেলেমেয়েদের তফাতে রাখতে, কিন্তু ওদের দাদুর জন্যেই পেরে ওঠে না। দাদুও তাদের না ডেকে পারে না।

কিন্তু এদিকে ভালো পুষ্টির অভাবে বুড়ো শ্বশুরের শরীর দিনকে দিন খারাপ হচ্ছে। সেইজন্যে বুড়োর নিজেরও মন খারাপ, দুশ্চিন্তা · ভালো যেটুকু বরাদ্দ, নাতি-নাতনিদের দিয়ে-থুয়ে তাঁর বরাতে কমই জোটে।

এর ওপর হঠাৎ কদিন ধরে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার ঘটতে লাগল। বিকেলে বুড়োর বরাদ্দ ছানার অর্ধেকটা কে যে কখন চুরি করে খেয়ে যায় মহিলা টের পায় না। ওইটুকু ছানা শ্বশুরের সামনে ধরে দিতে তার মাথা কাটা যায়। এগারো বছরের বড় ছেলে বা ন'বছরের মেয়েটার কাণ্ড ভেবে কদিন তাদের ধরে ঠেঙানো হয়েছে। ওরা স্বীকার করে

না দাদুর ছানা খেয়েছে। ওদের মারতে দেখে শ্বশুর তো একদিন ছানা খেলেই না।

সেদিনই দুপুরে এই কাণ্ড। দু'চোখ সবে লেগে এসেছিল মহিলার। হঠাৎই কেমন মনে হল রান্নাঘরে কেউ শ্বশুরের ছানা চুরি করে খাচ্ছে না তো! ছুটির দিন বলে বড় ছেলে আর মেয়েটাও তো বাড়িতেই। মনে হওয়া মাত্র মহিলা উঠল। ঘরের বাইরে এসেই দেখে রান্নাঘরের দরজা খোলা। সঙ্গে সঙ্গে আবার ভিতরে ঢুকে পেটাবার জন্য পাখাটা তুলে নিয়ে পা টিপে টিপে রান্নাঘরে এসেই হাঁ একেবারে।

গো-গ্রাসে ছানা গিলছেন শ্বশুর নিজেই। তাড়াতাড়ি গেলার তাড়ায় মুখ থেকে বেরিয়েও পড়েছে খানিকটা। একদিকে মহিলা আর ছুটে পালাবার পথ পাচ্ছে না, অন্যদিকে শ্বশুরের ছানা ভরতি মুখ একেবারে চোরের মুখ।

হাসিমুখে কাণ্ডটা বলতে বলতে চোখে জল আসার উপক্রম সুনন্দ বোসের বউদির। বলছিল, এমনই পোড়া অবস্থা মা কি বলব, শিশুগুলোকে না দিয়ে খেতেও পারেন না, আবার পুষ্টির অভাবে বেশিদিন টিকবেন না সেই ত্রাস এমন যে নিজের ছানাই চুরি করে খেতে হয়।

কাণ্ডটা শোনার পর থেকে আমি যেন কি-রকম হয়ে গেছলাম। আক্রোশে আর উদ্দীপনায় তিন দিন পর্যন্ত ভরপুর সারাক্ষণ। রাত জেগে বহুবার কাঁটাছেঁড়া করে সেই প্রথম বড়দের জন্য একটা গল্প লিখেছি আমি। হুবহু ওই ঘটনাটাই গল্পের বিষয়বস্তু। ব্যতিক্রম কেবল বুড়োর দুই ছেলের চরিত্র-বিশ্লেষণে।

আমার গল্পের দুই ছেলের মধ্যে বড় ছেলে সংসারের কাঠামো আর বাপের দেহ-যন্ত্র সচল রাখতে দিনরাতের পরিশ্রমে শরীরের রক্ত জল করে ফেলছে। আর ছোট ছেলে বাবুয়ানা করে ব্যাঙ্কে কেরানীগিরি করতে যায়, আর অবসর সময়ে বাড়ির সামনে হাঁ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে মেয়েদের রূপ দেখে। ওদিকে পুষ্টির অভাবে বুড়ো বাপ ভয়ে ত্রাসে নিজের বরাদ্দ ছানা নিজে চুরি করে খায়।

গল্পটা এক নাম-করা সাপ্তাহিক কাগজেই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এক সপ্তাহের মধ্যেই সে-গল্প ছাপা হয়ে যেতে বিস্ময়ে আনন্দে অস্থির আমি। অতবড় সাপ্তাহিকের সম্পাদক নিজে আমাকে 'পুষ্টি' গল্পের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। লিখেছেন, এমন বাস্তবধর্মী গল্প মেয়েরা কমই লিখতে পারেন। সেই গল্প পড়ে দিদির স্কলার এবং বড় চাকুরে বরও সেই প্রথম আমার লেখার প্রশংসা করেছে।

কিন্তু এত আনন্দের থেকেও আমার আক্রোশ কম নয়। যার জন্য লেখা সে দেখল কিনা। ছোড়দির সঙ্গে পরামর্শ করে একখানা সেই সাপ্তাহিকপত্র কেনা হল। তারপর নিজেদের নামধাম না দিয়ে সেটা সুনন্দ বোসের নামে বুকপোস্ট করে দেওয়া হল।

দুদিন বাদে আশা সফল হল আমার। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েই ওই মূর্তি দেখলাম। চার চোখে মিলন হল। কিন্তু শুভদৃষ্টি নয় সেটা। সুনন্দ বোসের দু'চোখ আমার চোখের ওপর স্থির, ভাবলেশশূন্য। আর আমার দু'চোখ ঘরঘরে আক্রোশে ভরা।

এরপর অবশ্য আমার একটু দুশ্চিন্তা হয়েছে, লোকটা তার বউদিকে গঞ্জনা দেবে কিনা। কারণ, গল্প কার মুখ থেকে শুনেছি সেটা বার করা এমন কিছুই শক্ত নয়। কিন্তু সে দুর্ভাবনা পরদিনই কেটে গেছে। ওর বউদি আগের মত হাসিমুখেই ঠাকুমার সঙ্গে গল্প করে গেছে। গল্পের খবরও রাখে না।

পরদিন। আমি আর ছোড়দি গাড়িতে দিদির ওখানে যাব। গাড়িতে উঠতেই ছোড়দি বেশ জোরে চিমটি কাটল একটা। সামনে চেয়ে দেখি সুনন্দ বোস অফিস থেকে বাড়ি ফিরছে।

আমাদের দেখে রাস্তা ডিঙিয়ে সোজা গাড়ির সামনে চলে এলো। একটু ঝুঁকে আমার দিকে চেয়ে বলল, বই পেয়েছি, গল্পও পড়েছি। ভালো লেগেছে।

ড্রাইভারের দিকে চেয়ে আমি ঝাঁঝিয়ে উঠেছি।—চালাও!

কিন্তু তিন সপ্তাহের মধ্যে যে ব্যাপারটা ঘটল তার জন্যে একটুও প্রস্তুত ছিলাম না। মনে বরং প্রচুর আনন্দ ছিল। পুষ্টি গল্পের দরুন মাত্র তিন দিন আগে কুড়িটি টাকা পেয়েছি। সেই প্রথম উপার্জন আমার। কুড়ি টাকা পাওয়ার আনন্দ কুড়ি হাজারের মত।

হঠাৎ সেদিন বিকেলের দিকে সামনের ভাঙা-বাড়িতে গাড়িঅলা ডাক্তারের আনাগোনা চোখে পড়ল। পরদিনও। ঠাকুমা বলল বুড়োর অবস্থা খারাপ। তার পরদিন বাড়িতে কান্নাকাটি।

সুনন্দ বোসের বাবা মারা গেলেন।

আমি হঠাৎ যেন কি এক বিচ্ছিরি রকমের অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেলাম। কেবলই মনে হতে লাগল এই একটা মৃত্যুর সঙ্গে আমার যেন কি একটা যোগ থেকে গেল। ওরা দেহ তুলে নিয়ে গেল। সকলের সঙ্গে আমি দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়াতে পারলাম না। অন্ধকার ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে দেখলাম। দেহ তোলার আগে উস্কো-খুস্কো মূর্তি সুনন্দ এ-বাড়ির দিকে তাকালো একবার, তা লক্ষ্য করলাম।

দিন সাত আট বাদে ওকে আমাদের বাড়িতে ঢুকতে দেখলাম। এগারো দিনে শ্রাদ্ধ করবে। বাবাকে নেমন্তন্ন করে গেল।

শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যাওয়া পর্যন্তই আমার ভিতর ভিতরে কি একটা অজ্ঞাত অনুশোচনা ছিল। তার পর থেকে আর একদিনও ওই মূর্তিকে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল না। ছোড়দি বলল, তোর গল্পে কাজ হয়েছে। আমিও ভাবলাম তাই হবে।

এর মাসখানেক বাদে কানে এলো সুনন্দর বউদি ঠাকুমার কাছে দুঃখ করছে, তাদের সংসার প্রায় অচল হয়ে উঠেছে। তার দেওরের মতি-গতি কিরকম অবুঝ হয়ে উঠেছে। এই দুর্দিনের বাজারে হঠাৎ অফিসের এক বড় কর্তার সঙ্গে রাগারাগি করে ব্যাঙ্কের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে বসল। ব্যাঙ্কের সেই বড় কর্তা নাকি একটা মোটা বাঁধানো খাতা তার হাতের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। আর তক্ষুনি সেই খাতা তার পায়ের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দেওর সেই যে ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এসেছে আর ও-মুখো হয়নি। দাদা তার হাতে ধরে সাধ্যসাধনা করেছে, তবু না।

আরো কিছুকাল বাদে কানে এসেছে, মহিলার দেওর কোন্ দুই একটা ওষুধের দোকানে অ্যালুমিনিয়মের কৌটো সাপ্লাই করে বেড়াচ্ছে। এর থেকে রোজগার কি হয়, বা কিছু হয় কিনা, কেউ খবর রাখে না। আমরা আর কোনোদিন, এমন কি কোনো ছুটির দিনেও সুনন্দ বোসকে আর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখিনি।

মোট কথা লম্বা পাঁচ বছরের মত আমার জীবন থেকে সুনন্দ বোস নামে এক উপদ্রব মুছে গেছে। আমি আর তার অস্তিত্বের খবরও রাখি না।

## চার

এবারে পাঁচটা বছরের যবনিকা তুলে আবার শুরু করা যেতে পারে।

আমার বয়েস বাইশ। বাংলায় এম. এ. পড়ছি। শুধু পড়ছি না, এই একটা বিষয়ে নিজের চটকদার আসন আমি অনেকের ধরাছোঁয়ার ঊর্ধ্বে তুলে রেখেছি। না, বি. এ-তে ফার্স্টক্লাস পাইনি। এম. এ-তেও পাব এমন আশা রাখি না। অপরে রাখে কিনা জানি না। তবু ফার্স্টক্লাস পাওয়া ছেলে-মেয়েরা আমাকে একটু ঈর্ষার চোখে দেখে।

আমি কবিতা লিখি, গল্প লিখি। সেই সব গল্প আর কবিতা নিয়ে তরুণ মহলে অন্তত আলোচনা হয়। ছেলেরা ছেড়ে অল্প-বয়সী মাস্টারদেরও আমার প্রতি একটু বাড়তি মনোযোগ অনুভব করতে পারি। ছুটির দিনে আমাদের বাড়িতে সাহিত্যের আলোচনাচক্র বসে। এক একদিন সাংস্কৃতিক হৈ-চৈ মন্দ জমে না।

এই পাঁচ বছরে বাড়ির সমাচারে কিছু যোগ-বিয়োগ হয়েছে।

পাঁচ বছরে গোড়ার বছরেই সুরমা আমাদের বউদি হয়ে এ-বাড়িতে পদার্পণ করেছে। সে-বিয়েতে ঘটা খুব একটা হয়নি। বউদির বাবা করজোড়ে আমার বাবার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁকে কি করতে হবে।

বাবা বলেছিলেন, ছেলে যখন পছন্দ করেছে, মেয়েটিকেই শুধু দিতে হবে। আর কিছু করতে হবে না। মেয়ের বাবা হাতে স্বর্গ পেয়েছিলেন।

এই গোছের বিয়ে ঠাকুমার খুব পছন্দ হয়নি। মেয়ের রূপ নেই, সেই সঙ্গে দেওয়া-থোয়াও নেই—এ ভালো লাগবে কেন। বাবা বলেছেন, বি. এ-টা পাস করুক, তারপর হয়ত চাকরি করেই ছেলেকে খাওয়াতে হবে—দেবে আবার কি।

বউ দেখে ঠাকুমার মুখ আরো বিষণ্ণ হয়েছে। আমাদের ভয় ছিল ওই বউকে ঠাকুমা দু'চক্ষে দেখতে পারবে না।

কিন্তু পৃথিবী গুণের বশ। বউদিটির মত এমন নরম আর মিষ্টি মানুষ আমি কম দেখেছি। আর বুদ্ধিমতী যে সে-সম্বন্ধে আমার অন্তত কোনো সন্দেহ নেই। তার রূপ নেই সে জানে। তার বাবার বিত্ত নেই তাও জানে। তাই এ-বিয়ের ফলে আমাদের বাড়ির প্রতিটি লোকের কাছে সে যেন কৃতজ্ঞ। তার বিনিময়ে প্রত্যেককে আপনার করে নেবার চেষ্টা।

প্রতি সন্ধ্যায় ঠাকুমার পা-টিপেই তার মন জয় করে ফেলল সে। ঠাকুমার রান্নাও বউদি নিজের হাতে করবেই। যা-কিছু ভালো হবে, বাবাকে নিঃশব্দে দিয়ে আসবে। সত্যি কথা বলতে কি বাবাকে এত যত্ন-আত্তি আমরা জীবনে কখনো করিনি। এই বউদিকে দেখেই নিজেদের অনেক ত্রুটি চোখে পড়ে।

বছর না ঘুরতে শুধু বাবা আর ঠাকুমা নয় আমরাও তার ওপর কেমন নির্ভরশীল হয়ে পড়লাম। ঠাকুমা তো তাকে চোখে হারায়। বলে, কি করে যে ওই ছোঁড়াটাকে তুই বশ করেছিস এখন বুঝতে পারি। সকলেই তোয়াজের বশ। আর আমি অন্তত বুঝতে পারি ঠাকুমার পরে ওই বউয়ের ওপর সব থেকে খুশী বাবা। বউদিকে ডেকে আভাসে ইঙ্গিতে প্রায়ই বলতেন, ঠিক-ঠিক রোজগারের দিকে দাদার মতি-গতি যাতে একটু ফেরে সেই চেষ্টা করতে।

এ চেষ্টায় বউদি ব্যর্থ হয়েছে তাও ঠিক। হেসে হেসে বউদি আমাদের বলে, ওই এক জায়গাতেই পাত্তা পেলাম না ভাই।

দাদার রোজগারের নেশা আরো বেড়েছে বলেই আমার ধারণা, অপচয়ও আগের থেকে বেড়েছে।

সংসারের ঝামেলা এ-ভাবে কাঁধে নেবার ফলেই বউদির বি. এ. পাস করা আর হল না। অবশ্য পড়াশোনার প্রতি তার তেমন আগ্রহও ছিল না। তার ওপর বছর না ঘুরতে একটা ছেলে হল দাদার। পড়াশুনার চেষ্টাও শিকেয় উঠল। এই চার বছরে দাদার আরো একটা ছেলে আর একটা মেয়ে হয়েছে। বউদি বয়সে আমার থেকে কয়েক বছরের বড় হলেও মুখে যা আসে বলতে আটকায় না। শেষের মেয়েটা হবার পরেই আমি বউদিকে বলেছি, আর নয় বাপু, এবারে ক্ষান্ত দাও।

মুখ টিপে হেসে বউদি জবাব দিয়েছিল, চঞ্চলবাবুকে আর একটু সুস্থির হতে বলো।

দু'বছর আগে ছোড়দি অদিতির বিয়ে হয়ে গেছে।

আমার জগতে বড় রকমের পরিবর্তন যা-কিছু এসেছে, তার পিছনে উৎসাহ উদ্দীপনা প্রেরণা জোগাতো একটি লোক—ছোড়দির বর মনোতোষ চৌধুরী। সর্বতোভাবে এমন একটা সম্পূর্ণ মানুষ আমি আর বুঝি দেখিনি।

না, প্রেম করে বিয়ে হয়নি ছোড়দির। বাবার এক বন্ধুর মারফত যোগাযোগ। বড়দির বিয়েতে বাবা মনে মনে আঘাত পেয়েছিলেন। বড় চাকুরে জামাই আনার লোভ আর তাঁর ছিল না। বাবা বিয়ে দিতে দেরি করছিলেন বলে ছোড়দির মন-মেজাজ ভালো থাকত না। আমরা ঠাট্টা করলে মেজাজ আরো বিগড়ত। শেষে যোগাযোগ যখন হল ছোড়দির মুখে খুশী ধরে না: দেখা গেল, এই জামাই বড় চাকরি না করলেও ঢের বড় বনেদি ঘরের ছেলে, আর ঢের বেশী বিত্তবান।

ছেলে চাকরি করেই না। ব্যবসা করে। কন্ট্রাক্টরি ব্যবসা। কিন্তু এদিকে এম. এ. পাস। তাঁর বাবা ছিলেন দেশের একজন নামকরা কর্মী। তিনি বিগত। ওই ছেলে এখনো দেশের গণ্যমান্য বাণ্ডারীদের বিশেষ স্নেহভাজন। বিয়ের পর ছোড়দির বাড়ি গিয়ে এক-একদিন কত যে আনন্দ নিয়ে ফিরেছি ঠিক নেই। সেখানে এমন সব লোকের সঙ্গে অনায়াসে আলাপ পরিচয় হয়েছে যাঁদের চেহারা এ-যাবৎ কেবল খবরের কাগজের ছবিতেই দেখেছি। তাঁদেরই স্নেহ-ভালোবাসায় ছোড়দির বরের ভাগ্যস্থানে বৃহস্পতি। ধুলোমুঠো ধরলে সোনা হয়।

ছেলের সমস্ত বৃত্তান্ত জানার পর বাবা চট করে এগোতে সাহস করেননি। নিজের সঙ্গতি জানেন। কিন্তু যোগাযোগের ফলে ছেলে নিজে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে এলো ছোড়দিকে দেখতে। কিন্তু ছোড়দিকে দেখবে কি, ছেলেকে দেখে আমাদের চোখ জুড়িয়ে গেল। ছোড়দির এ ভাগ্য হবে কিনা সেই সংশয় জাগল। যেমন ফর্সা, তেমনি সুন্দর স্বাস্থ্য, নাক-মুখ-চোখ যেন শিল্পীর আঁকা। তার থেকেও সুন্দর, মুখের মিষ্টি হাসিটুকু। ঠোঁটের ডগায় সারাক্ষণ যেন ওই হাসি লেগেই আছে।

বেশ সুন্দর ভদ্র পরিবেশের মধ্যেই ছোড়দিকে দেখা হয়ে গেল। মেয়ে দেখার আনুষ্ঠানিক সিরিয়াস ভাবটা ওই ভদ্রলোকই কাটিয়ে দিল। বাবা ইচ্ছে করেই ঘরে নেই, তাই কথাবার্তারও অসুবিধে নেই কিছু। ছোড়দিকে আনার দু'মিনিটের মধ্যেই ভদ্রলোক

ঠাকুমাকে বলল, আমরা মেয়ে দেখতে আসার আগে আপনারা ছেলে দেখতে চান না কেন? একমাত্র এই করলেই ছেলেরা ঠিকঠিক জব্দ হতে পারে।

ঠাকুমা তক্ষুনি জবাব দিল, পরে তো সমস্ত জীবন ধরেই তোমাদের জব্দ হওয়া আছে ভাই, তাই গোড়াকার সুবিধেটা তোমাদেরই দিই।

পরদিনই টেলিফোনে তারা খবর দিল, পছন্দ হয়েছে, কাজে এগনো যেতে পারে।

বাবার শরীর ভেঙে পড়েছিল। প্রায়ই ভোগেন। নিয়মিত কোর্টে যেতে পারেন না। তাই মনোবলও কম। এখানে দাবিদাওয়া কি-রকম হবে কে জানে।

না, দিদির বিয়ের মত এখানে লিস্টধরে দাবি-দাওয়া কেউ করল না। বিয়ের খরচা বাবদ কেবল হাজার পাঁচেক টাকা নগদ নিল তারা। তারপর মেয়ে-জামাইকে বাবা যা দেবেন তার ওপর আর কথা কি।

অতএব আনন্দের সাড়া পড়ে গেল বাড়িতে। কিন্তু কাজে নেমে বাবা হাত-টান করতে পারলেন না। বনেদী ঘরে মেয়ে যাচ্ছে, না চাইলেও বাবা না দিয়ে পারেন কি করে! তাছাড়া দিনকালের দরুন প্রতি জিনিসের দাম বেড়ে গেছে। হতে হতে সেই খরচাই হল। কেবল দিদির বিয়ের তিক্ততাটুকু বাদ গেল।

বিয়ের পরদিন। ছোড়দি শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। উৎসবের ভাঙা হাটে আমরা কলরব করে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ ঠাকুমার ঘরে ঢুকে দেখি বাবা ঠাকুমার বিছানায় শুয়ে আছেন। ঠাকুমা আদর করে ছেলের মাথায় হাত বুলোচ্ছে আর বলছে, তুই কিছু ভাবিস না খোকা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

শরীর বাবার থেকেও ঠাকুমার বেশি খারাপ চলেছে। বয়েসটাই রোগ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু ঠাকুমা সর্বদা সেটা বুঝতে দেয় না। তাই আমাদের বাবাকে নিয়েই চিন্তা বেশি। আমি এগিয়ে গেলাম।—কি হয়েছে, বাবার শরীর খারাপ নাকি?

ঠাকুমা জবাব দিল, না, এখন তোর জন্যে চিন্তা ঢুকেছে মাথায়, বলছে, হাতে তো আর কিছুই থাকল না, অথচ পরের মেয়ের বিয়ে তো এখন দিলেই হয়।

আমার বয়েস তখন উনিশ ছাড়িয়ে কুড়ি চলছে। বাবা সাধারণত গম্ভীর মানুষ। কিন্তু মনে হল বাবা যেন কেমন অসহায় চোখে আমার দিকে চেয়ে আছেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল। বললাম, আমার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না তো বাবা—ছোড়দির কত ভালো বিয়ে হল সে-কথাই চিন্তা করো।

বাবা বললেন, সে-জন্যে নয়, শরীরটাই কেমন ভেঙে যাচ্ছে, কোর্টে আবার আগের মত যাতায়াত করতে পারলে বছর দুইয়ের মধ্যে তোর ব্যবস্থাও আমি করে ফেলতে পারব।

আমি জবাব দিলাম, সুস্থ শরীরে কোর্টে তুমি যাতায়াত করো, তা বলে আমার জন্যে তোমাকে কিছু চিন্তা করতে হবে না।

খুশী হয়ে ঠাকুমা বাবার সামনেই মন্তব্য করল, ও বোধহয় নিজের চিন্তা নিজেই করে রেখেছে। আমি তো তোকে বলে রেখেছি, ও ছুঁড়ীর জন্য তুই কিচ্ছু ভাবিস না —তোর সবকটা মেয়ের থেকে ওর ভালো বিয়ে হবে দেখিস। তোর টাকা থাক আর নাই থাক—

আমি লজ্জা পেয়ে ঠাকুমার উদ্দেশে চোখ রাঙিয়ে চলে এসেছি। কিন্তু বাবার সামনে এই অনেকবারের শোনা কথা অদ্ভুত মিষ্টি লেগেছে।

যত মিষ্টিই লাগুক, ছোড়দির থেকে ভালো বিয়ে কারো হতে পারে, আপাতত আমি ভাবতে পারি না। সার্থক নামও বটে ছোড়দির বরের। নামে মনোতোষ, রূপে মনোতোষ, গুণে মনোতোষ। হাসিখুশী, দিলদরিয়া রসিক মানুষ। তার রসিকতার ছোঁয়ায় দিদির বর বড় চাকুরে অমর দত্তও একটু রসিক হয়ে উঠল। তাকে দেখলেই মনোতোষ চৌধুরী এক-গাল হেসে বলে উঠত, দাদা, তোমরাই ভাগ্যবান—গবু-চন্দ্র রাজার সরকার চালাচ্ছ—পায়ের ধুলো দাও।

সেদিন শুনলাম, আমার দিকে একবার কটাক্ষে চেয়ে অমরদা জবাব দিল, আসল ভাগ্যবান তো ভাই তুমি, এত সহজে রমণীর মন জয় করতে পারো।

কটাক্ষ আমাকে নিয়ে। আর সেটা একেবারে মিথ্যে নয়। হেসে গড়িয়ে ছোড়দি তক্ষুনি আমাকে চোখ রাঙিয়েছে, দুর্নাম রটলে তোকে কিন্তু আমি আস্ত রাখব না!

ঘরে বাইরে মনোতোষ চৌধুরীর সর্বত্রই একটা আদরের নাম আছে। মনতু। ছোড়দির বর এই নামটাই চালু করে সর্বত্র। মনতু, মনতু চৌধুরী। আমাদের বাড়িতেও সে মনতু হয়ে উঠেছে সাতদিন না যেতে। ঠাকুমা আর বাবার আদরের মনতু, বউদির মনতুবাবু, আমার আর দিদির মনতুদা।

ছোড়দির ভ্রূকুটির জবাবে মনতুদা টেনে টেনে পাল্টা শাসালো যেন, আমার প্রিয়-সখীকে আস্ত না রাখলে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকবে মনে করো?

বিয়ের পনেরো দিন না যেতে আমি মনতুদার প্রিয়সখী, আর দিদি 'হার ম্যাজেস্টি'। এরই মধ্যে মনতুদা আমার লেখার ভক্ত। মন দিয়ে লেখা শোনে, পরে নাটকীয় উচ্ছ্বাসে বলে, তুমি একটা জিনিয়াস, চালিয়ে যাও আমি আছি তোমার পিছনে। তুমি সাহিত্য-মধু পরিবেশন করে যাও, আমি আছি তোমার একমাত্র ভক্ত মৌমাছি।

আমি জবাব দিয়েছি, মৌমাছির ভনভন আমার ভালো লাগে না।

—তুমি আমাকে হতাশ করলে প্রিয়সখী, আমি মনতু মৌমাছি ভনভন করি না—গুনগুন করি।

সকোপে ছোড়দিকে দেখাই আমি।—ওই কানে গুনগুন করো গে যাও!

দিদির বরকে 'আপনি' করে বলি, কিন্তু এই ভদ্রলোক 'আপনি' বলাটা নিজেই বাতিল করেছে। নিষেধ করার পর যতবার সেটা লঙ্ঘন করেছি ততবার মনতুদাও আপনি-আজ্ঞে করে জবাব দিয়েছে।

আমার ছদ্মকোপের জবাবে বড় নিঃশ্বাস ফেলে মনতুদা জবাব দিয়েছে, তোমার ছোড়দি তো আছেই, পুরুষ মানুষের যে ফাউয়ের দিকে বড় লোভ প্রিয়সখী। কি বলো দাদা?

দাদা অর্থাৎ অমরদার সমর্থন মেলে, বটেই তো।

আমি হেসে বলে উঠেছি, ও-সব এক-জন আধ-জন ভক্ত নিয়ে আমার চলবে না।

অমরদা রসের যোগান দিতে চেষ্টা করেছে, মনতুর পরে আমিও তো আছি!

এই ভদ্রলোকও দুটো ছেলেমেয়ের বাপ তখন। ফলে মাঝে আরো গম্ভীর হয়ে পড়েছিল। তার পরিহাস অবশ্যই অতটা স্বতঃস্ফূর্ত নয়। তবু ভালো লাগত। মনতুদার দিকে চেয়ে আমি ভাবতাম, কৌতুকোচ্ছল রসিক মানুষের জীবনীশক্তি আছে বটে।

বিয়ের এক মাস না যেতে হঠাৎ এক সন্ধ্যার মজলিশে আমার ওপর চড়াও হল

মনতুদা। সেখানে তখন দিদি বা অমরদা নেই। শুধু আমি ছোড়দি আর বউদি আছি। গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করে বসল আমাদের ভায়ার খবর কি?

দাদার কথা কি কার কথা জিজ্ঞাসা করছে সঠিক বুঝলুম না। দাদাকে ভায়া কখনো বলে না, অসাক্ষাতে 'প্রিন্স' বলে। প্রশ্নের পুনরুক্তি করল আবার।—জিগেস করছি সুনন্দ বোসের খবর কি, রাস্তায় চড়াও-টড়াও করছে আজকাল?

আমি হতভম্ব। গত ক'টা বছরের মধ্যে যে মানুষটার আর অস্তিত্ব নেই আমার কাছে, তাকে নিয়ে পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে ছোড়দি তার বরের কাছে রসের খোরাক জুগিয়েছে! ভালো বিয়ে হওয়ার আনন্দে ছোড়দিটা জ্ঞানগম্যি খুইয়েছে মনে হল। ওদিকে বউদিও অবাক। রাস্তার উল্টোদিকের বাড়ির সুনন্দ বোসের নামটা তার শোনা না থাকার কথা নয়। ও-বাড়ির মহিলাটির সঙ্গে বউদিরই এখন বেশি ভাব। এক-একদিন সমস্ত দুপুর দুজনে গল্প করে কাটায়।

সঠিক না বুঝে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, ওই সামনের বাড়ির সুনন্দ বোস?

মনতুদা ওমনি তাড়া দিল, সে-খোঁজে আপনার কি দরকার ম্যাডাম, প্রিন্সকে আঁচলে বাঁধার পর আপনার কি আর কারো সুখ-দুঃখের খবর নেবার সময় আছে?

আমি হেসেই ছোড়দিকে বললাম, এই একমাসেই তোর সব গল্প এমন ফুরলো যে ওই লোকটাকে টানতে হল? তোর রমেশ ভার্গবের কথা বলা হয়েছে?

ছোড়দি পাল্টা মুখিয়ে উঠল, বল্ না, সেও তো শেষ পর্যন্ত তোরই কথা! বরের দিকে ফিরে সোৎসাহে বলল, জানো, ছেলেবেলায় আমি ভাবতাম একটা ছেলে আমাকে কি পছন্দই না করে—শেষে শুনি আসলে তার চোখ ওর দিকে—রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে খাওয়ায়, হাত ধরে বসে থাকে।

ঘটা করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মনতুদা বলে উঠল, ও-ছোঁড়া আমার থেকে অন্তত চালাক, আমিই শুধু বোকার মত তোমাকে দেখতে এসে তোমাকেই পছন্দ করে গেলাম!

হাসাহাসির পর বউদি আগের প্রসঙ্গে ফিরতে চাইল।—কিন্তু ও বাড়ির সুনন্দ বোস আবার কবে কি করেছে, আমি তো কিছু জানি না?

আমি বললাম, থাক, আর রসে কাজ নেই।

ওদিকে ছোড়দিও যে-কারণেই হোক, এ-প্রসঙ্গ বাতিল করতে চায় না। মন্তব্য করল, তুই যাই বলিস অরু, সুনন্দর এখনো টান নেই তোর ওপর এ আমি বিশ্বাস করি না।

আমি জবাব দিলাম, তোর বোধহয় টানাটানির ওপরেই বিশ্বাস বেড়েছে এখন।

আনন্দে মনতুদা আমার পিঠ চাপড়ে দিল। বলল, একখানা মেয়ে বটে তুমি! তোমার ছোড়দি কি বলে জানো? বলে সুনন্দ বোস আস্ত একটা মোষ, কিন্তু তার চোখদুটো সেই ফ্রক-পরা বয়েস থেকে তোমার প্রিয়সখীর ওপর আটকে আছে। শুনে সেই থেকে চোখে ঘুম নেই আমার, প্রিয়সখী শেষকালে কিনা মোষের খপ্পরে পড়বে!

এই ইয়ারকি আমার কেন যেন ভালো লাগছিল না। ওদিক থেকে বউদি প্রতিবাদ করল, কেন, ছেলেটি তো বেশ ধীর স্থির, ভদ্র, দিনরাত পরিশ্রম করে নাকি, তার বউদি তো দেওয়ের খুব প্রশংসা করে!

—ওয়ান্ডারফুল! বউদির উদ্দেশে মনতুদা দু'হাত জোড় করে ফেলল তক্ষুনি।—

আপনি অভিজ্ঞ ব্যক্তি ম্যাডাম, ওই সুন্দর মোষের চোখদুটো দয়া করে আপনার নিজের দিকে টেনে নিন, প্রিন্সকে আমরা যা হোক বোঝাব'খন—মোষের চোখ যত ঠাণ্ডাই হোক, প্রিয়সখীকে তার সামনে ছেড়ে দিতে পারব না, আপনার আত্মত্যাগ সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

আমরা হেসে উঠলাম।

বউদি তারপর দু'তিন দিন আমাকে আলটালো।—কি হয়েছিল বলো না? আমার কিন্তু ছেলেটাকে সত্যি খারাপ লাগে না।

আমি ঝাঁঝিয়ে উঠেছি, তবে আর কি, মুখ থুবড়ে পড়োগে যাও না!

গত তিন বছরের মধ্যে সর্বসমেত সাত দিনও হয়ত ও-মূর্তি আমার চোখে পড়েনি। পড়লেও সেই চোখ আমার দিকে আটকে থাকেনি। নিজে থেকেই সরে গেছে। আমার ধারণা, সেই এক পুষ্টি গল্প থেকেই তার চেতনার পুষ্টি বেড়েছে। কোন মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেটা টের পেয়েছে।

অ্যালুমিনিয়ামের কৌটো সাপ্লাই করতে করতে নিজেও সেই কৌটো তৈরির ছোট একটা কারখানার মত করেছে—এরকম একটা খবর কবে যেন আমার কানে এসেছিল। তার ওপর প্লেটিংয়ের কাজ করে ওষুধের কারখানায় সাপ্লাই করে। কিন্তু সে খবর শোনার আমার কোনো আগ্রহ ছিল না। ওটা যে কোনো খাঁটি ব্যবসার অন্তর্গত বস্তু, তাও কখনো মনে হয়নি।

গেল বছর সেই প্রথম ওদের একতলা ভাঙা-বাড়ি ঢেলে সংস্কার করতে দেখলাম। ওদের বাড়ির পিছনের দিকে দুটো বস্তিঘর ছিল, সেটা ভেঙে দুটো নতুন ঘর তোলা হল তাও চোখে পড়ল। কথায় কথায় তখন ঠাকুমা একদিন বলল, ছেলেটা এখন দুটো পয়সার মুখ দেখছে বোধহয়, ঘর বাড়ি সারাচ্ছে—আ-হা, ভালো হোক, বড় দুঃখের দিন গেছে ওদের।

আর একটা ব্যাপারও চোখে পড়েছিল। আমার চঞ্চল দাদাটিকে ক্বচিৎ এক-আধ সময় ওই সুনন্দ বোসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা কইতে দেখতাম। কিন্তু দাদা আগে কখনো ওদের কাউকে মানুষ বলেও গণ্য করেনি।

জ্ঞান বয়েস অবধি আমার চোখে এ বাড়িতে সব থেকে বড় শোকের ঘটনা ঠাকুমার বিদায়। ছোড়দির বিয়ের মাস ছয় বাদে হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে ঠাকুমা চোখ বুজল। এ সংসারে আমার চোখে অন্তত একটা যেন বজ্রপাত হয়ে গেল। সেই প্রথম আবার টের পেলাম, আমার ভিতরে সেই অবুঝ ভীতু ছোট মেয়েটা এখনো বাস করছে। তার সকলের বড় আশ্রয়টা যেন খসে গেল। ভয়ে ত্রাসে আমি কাঁপতে লাগলাম। শোকের থেকেও আমার ভয় বেশি। একটা অজ্ঞাত ত্রাস অজ্ঞাত ভয় যেন আমাকে ছেঁকে ধরতে লাগল।

ঠাকুমার সঙ্গে সকলেই শ্মশানে গেল, কেবল আমি ছাড়া। কাঁদতে কাঁদতে দিদি গেল, ছোড়দি গেল, বৌদি গেল। আমি কিছুতে যেতে পারলাম না। ঘরের জানলা ধরে শক্ত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হরিধ্বনি দিয়ে ঠাকুমার খাট কাঁধে তুলে নিতে দেখলাম। আর তখনি দেখলাম,

বাড়ি থেকে খাটের তিন দিকে কাঁধ দিয়েছে দাদা, আর আমার দুই কাকা আর একদিকে ও বাড়ির সুনন্দ। কে তাকে ডেকেছে আমি জানি না। খাট কাঁধে নিয়ে জানলা বরাবর সোজা একবারে আমার দিকে তাকিয়েছিল। আর তক্ষুনি কেন যেন ওর বুড়ো বাবাকে শেষযাত্রায় নিয়ে যাওয়ার সেই দৃশ্যটা আমার চোখে ভেসে উঠেছিল। আর তখনি একবার আমার মনে হয়েছিল, ওর বাবাকে তুলে নিয়ে যাবার সময় ওর ভেতরটা কি আমার মতই এমনি আশ্রয়শূন্য হয়ে গেছল?

বাড়িতে আমি একা। আমার শূন্যতাই যেন আমাকে গ্রাস করছে।

নীচে কড়ানাড়ার শব্দ হতে ছুটে নীচে এসে দরজা খুলে দিলাম। যে কোনো একটা চেনামুখ দেখলেও আমি যেন বাঁচি।

মনতুদা।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এরই মধ্যে ফিরলে যে?

জবাব না দিয়ে তার ড্রাইভারকে বলল শ্মশানে ফিরে যেতে। আমাদের গাড়িও গেছে, আরো গাড়ির দরকার হতে পারে। দরজা বন্ধ করে ওপরে এসে ঠাকুমার ঘরেই বসল। বলল, শোকে অস্থির হয়ে বাড়িতে তুমি একলা বসে আছ, তাই ভালো লাগল না...চলে এলাম। একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, ঠাকুমার সময় হয়েছে ভালোই তো গেলেন। কাল থেকেই লক্ষ্য করছি তোমাকে, শোকে এ-রকম ভেঙে পড়বে কেন?

মনতুদার সামনেই একটা মোড়াতে বসেছিলাম আমি। মুখে একরাশ শাড়ির আঁচল গুঁজে দিয়েও কান্না সামলাতে পারলাম না। মনতুদা চুপ। আমি এই প্রথম অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে বাঁচলাম। মনে হল, এই একজনই আমার শোকে আমার ব্যথা বুঝেছে। তাই শ্মশানে গিয়েও আবার ফিরে এসেছে। আমি কেঁদে হালকা হতে পেরেছি। এই লোকের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

কাকাদের অনুরোধে আমাদেরও এগারো দিনে শ্রাদ্ধের বিধান দিলেন পুরোহিত। ঠাকুমা যেতে বাবা ভেঙে পড়েছেন, তবু শক্ত পায়ে না দাঁড়িয়ে উপায় নেই। বাবা টাকা-পয়সা সব বউদির হাতে দিলেন, আমাকে বললেন, তুই ওকে সাহায্য করিস।

বাবা সকলের বড়, তাছাড়া ঠাকুমা বরাবর এখানে থাকত—তাই কাজ এ-বাড়িতেই হবে জানা কথা।

পূর্ববঙ্গ দেখিনি। আমাদের কোনো এককালে আদি নিবাস নাকি ছিল পূর্ববঙ্গে। এসব ক্রিয়া-কর্মে প্রাচীন সংস্কারই চালু আছে। সেই অনুযায়ী শ্রাদ্ধের আগের দিন শ্মশান-বন্ধুদের চিড়ে দই মিষ্টি দিয়ে ফলার করানোর বিধান। সেইদিনই ও-বাড়ির সুনন্দ বোসের নামটা কানে এলো আবার। সে অনুপস্থিত। ব্যবসার কাজে কোথায় মফঃস্বলে গেছে। আজ আর ফেরার সম্ভাবনা নেই নাকি। বাবা খুঁতখুঁত করতে লাগলেন, ছেলেটা নিজে থেকে যেচে এলো, কাঁধে নিল, শ্মশানেও কত সাহায্য করল, অথচ এই দিনেই বাইরে আটকে পড়ল।

পরদিনও আবার ওই নাম কানে এলো। রাত তখন সাড়ে দশটা। বাইরের নিমন্ত্রিতরা সব খেয়ে দেয়ে চলে গেছে। শুধু জামাই দুজন, কাকা-কাকীমারা আর আমরা বাড়ির ক'জন বাকি। সকলেই শ্রান্ত। কোনোরকমে চারটে খেয়ে শুয়ে পড়তে পারলে বাঁচি।

ইতিমধ্যে দু'বার সামনের বাড়িতে লোক গেছে সুনন্দ বোসের খোঁজে। দু'বারই

বাবার কাছে খবর এসেছে, কারখানা থেকে এখনো ফেরেনি, ফিরতে রোজই রাত হয়। তার দাদা বলে পাঠিয়েছে তার জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই।

তাকে নিয়ে আমরা কেউ মাথা ঘামাইনি। এমন কি খেয়াল না করে নিজেরা টেবিলে বসেও গেছলাম। বাবা হঠাৎ এসে বললেন, ও-বাড়ির ছেলেটিকে তো বাড়িতে ঢুকতে দেখলাম এইমাত্র, কে ডেকে আনবে—

শোনামাত্র বউদি উঠে চলে গেল। আর তক্ষুনি একটা বিরক্তিকর ব্যাপার আমার চোখে পড়ল। হাসি চেপে ছোড়দি মনতুদাকে কি ইশারা করল। আর তার পর মনতুদা ভালোমানুষের মত আমার দিকে চেয়ে রইল।

ছোড়দিটার রসিকতারও আর সময়-টময় নেই।

একটু বাদে বউদি সুনন্দ বোসকে একেবারে সঙ্গে করে ফিরল। আমার উল্টোদিকে খান পাঁচ-ছয় চেয়ার ছেড়ে তাতে বসতে দেওয়া হল। বাবা খুশীমুখে বললেন, তুমি বন্ধুর কাজ করেছ অথচ কাল আসতে পারোনি আর আজও আমার মা-কে ফাঁকি দিচ্ছিলে।

সকলের চোখই ওই দিকে। আমারও। সুনন্দ ঠাণ্ডা মুখে নরম জবাব দিল, না, আজ আমি ঠিকই আসতুম...ঠাকুমাকে আমার অনেক দিন একটা প্রণাম করার ইচ্ছে ছিল, সে-সুযোগ হল না, একেবারে কাঁধে করার সুযোগ পেলাম।...বউদির মুখে শুনতুম, আমরা এত গরীব, তবু উনি আমাদের মানুষ ভাবতেন।

বাবা বিস্মিত নেত্রে চেয়ে রইলেন তার দিকে। বাদবাকি সকলে চুপ হঠাৎ। মনতুদা একটু ঝুঁকে তাকে নিরীক্ষণ করছে। ভিতরে ভিতরে আমি আবার বিরক্ত বোধ করছি। আমার ঠাকুমাকে 'ঠাকুমা' বলাটাও কানে কি-রকম লেগেছে। আর ঘটা করে সভার মধ্যে নিজেদের দারিদ্র্যের কথা টেনে এনে ওই উক্তি করার মধ্যে একটু যেন প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ আছে—আর তার লক্ষ্যও যেন শুধু আমিই। আমি এখানে আছি কি নেই একবার মুখ তুলে চেয়েও দেখেনি। ধারণা, জানে আছি, তাই দেখেনি।

খাওয়া দাওয়ার পর আমি ঘরে আসামাত্র ছোড়দি ছুটে এলো। বলে উঠল, হ্যাঁরে অরু, আজকাল যে দিব্যি চ্যাটাং চ্যাটাং কথা ফুটেছে রে! আর ঠাকুমাকেও দিব্যি ঠাকুমা বলে গেল শুনলি? কি মতলব? তোর সঙ্গে আবার কিছু চলছে-টলছে না তো?

আমি গম্ভীর মুখেই দাবড়ানি দিলাম, এটা তোর রসিকতার সময়? নাকি নিজের অত ভালো বিয়ে হয়েছে বলেই কাণ্ডজ্ঞান খুইয়ে যাকে-তাকে টেনে এনে রসিকতা করিস?

ছোড়দি পালালো।

দিন গড়াতে লাগলো আবার। একটি বৃদ্ধার অভাবে বাড়িটা খাঁ-খাঁ করে। ওদিকে বাবাকে দিনরাতের বেশিরভাগ সময়ই বিছানায় শোয়া দেখি। তাইতে আরো খারাপ লাগে। বাবার মাথায় আবার দুশ্চিন্তা ভর করেছে টের পাই। দুশ্চিন্তা আমারই জন্য। বউদির মুখে শুনেছি শ্রাদ্ধের দরুন কাকারাও কিছু-কিছু টাকা দিয়েছে, কিন্তু বড় খরচটা বাবার ওপর দিয়েই গেছে। দু'দিন আগে নাকি বৌদির কাছে বাবা বলেছেন, এই মেয়েটার জন্য আমার কিছুই থাকল না।

কিছু থাকল না বলে নয়, আমি অসহায় বোধ করেছি বাবাকে এ-ভাবে মুষড়ে পড়তে দেখে। বাড়িতে এক মুহূর্তও ভালো লাগে না। ফাঁক পেলে চলে যাই দিদির

ওখানে, নয়তো মনতুদার ওখানে। মনতুদার ওখানেই বেশি যাই। হাসি আনন্দে ডুবিয়ে মাথা হাল্‌কা করে দিতে তার জুড়ি নেই।

ছ'মাস না যেতে আবার এক বিভ্রাট। হঠাৎ একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরেই শুনি দাদার ইনসিওরেন্সের চাকরি যায়-যায়। অফিসে দাদার নাকি প্রায় হাজার দশেক টাকা দেনা। কোন্ বন্ধুর পাল্লায় পড়ে বড়লোক হবার এক মোক্ষম রাস্তা পেয়ে গেছল দাদা। অফিসের সঙ্গে যুক্ত বাইরের পার্টির এক অন্তরঙ্গ ভদ্রলোকের কাছ থেকে সাড়ে সাত হাজার টাকা ধার করেছিল। শতকরা বারো টাকা সুদ। এছাড়া অফিসের লোকের কাছ থেকেও কিছু টাকা ধার করেছিল। সেই সব টাকা শেয়ার বাজারের সেই অব্যর্থ-লাভের ফাটকায় খাটিয়ে সর্বস্বই লোকসান খেয়েছে। পার্টির সেই অন্তরঙ্গ ভদ্রলোক অনেকদিন অপেক্ষা করে সুদ বা আসল কিছুই না পেয়ে শেষে অফিসের বড়কর্তার কাছে নালিশ করে দিয়েছে। ফাঁক বুঝে তখন অফিসের পাওনাদারেরাও নালিশ করেছে। বড়কর্তা শুনে ক্ষেপে গেছে, দাদাকে ডেকে সাতদিন মাত্র সময় দিয়েছে। এর মধ্যে টাকা দিতে পারে তো ভালো, নয়তো তার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা থেকে ধারশোধ করা হবে। তাছাড়া ফিল্ড ওয়ার্কারের পার্টির লোকের কাছ থেকে টাকা ধার করা ঘোরতর অপরাধ। এই অপরাধে দাদার চাকরি যাওয়াই উচিত। সাতদিনের মধ্যে টাকা ফেরত না দিলে চাকরি যাবেই। দিলে এবারের মত বিবেচনা করা যেতে পারে।

আইনত চাকরি খেতে পারুক বা না পারুক, বড়কর্তার এই হুমকি মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মত যথেষ্ট। তার ওপর ঘেন্নায় একবারে মরে যেতে ইচ্ছে করল যখন শুনতে পেলাম ব্যাপারটা জানাজানি কি করে হল। আর কোনো পথ না পেয়ে দাদা নাকি সুনন্দ বোসকে ধরে পড়েছিল দশ হাজার টাকা ধার দেবার জন্য। সব শুনে সুনন্দ দুদিন সময় নিয়েছে ভেবে দেখার জন্য। তারপর এই দুপুরে সোজা বাবার কাছে এসে হাজির হয়েছে। বিপদের কথা খুলে বাবাকে জানানো নাকি দরকার বোধ করেছে সে, আর বলেছে, বাবার অনুমতি পেলে দশ হাজার টাকা সে দাদাকে দিয়ে দিতে পারে।

বাবা বলেছেন, দিতে হবে না।

বউদির মুখ চুন। বাবার মুখ বিবর্ণ পাংশু। একবেলার মধ্যে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে তাঁর উপর দিয়ে। সব শোনার পর ওই সুনন্দর ওপরেই দপ করে জ্বলে উঠলাম আমি। ভালোমানুষের মত বাবাকেই এসে তার জানানোর দরকার ছিল কি? বৌদিকে জানালেও তো হত। কিছু উদ্দেশ্য আছে বলেই বাবার কাছে এসে কর্তব্য ফলিয়েছে। আর এত সাহস যে মুখ ফুটে বলে গেছে বাবার আপত্তি না হলে দশ হাজার টাকা ধার দিতে পারে?

আমার রাগ বউদির কাছে গোপন ছিল না। পাংশু মুখে বউদি বলেছে, সে ভদ্রলোক উচিত কাজই করেছে।

বাবা নীরবে কি-যে সহ্য করলেন আমি আর বউদিই জানি। পাঁচদিনের মধ্যে আমাদের গাড়িটা আট হাজার টাকায় বিক্রি হয়ে গেল। আরো দু'হাজার টাকা সংগ্রহ করে বাবা বউদির হাতে দিলেন। দাদাকে বললেন, বউমাকে সঙ্গে করে তোমাদের বড়সাহেবের কাছে যাও, সে তার হাতে টাকা দিয়ে আসবে। আগেই টেলিফোনে জানিয়ে দাও যারা যারা টাকা পাবে তারা যেন সময়মত আসে।

তারা চলে যাবার পর বাবা কি-রকম অস্থির হয়ে পড়ল। আমি বাবার কাছে বসে থাকলাম, বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। বাবা হঠাৎ এক সময় বিবর্ণ অথচ উত্তেজিত মুখে বলে উঠলেন, তুই সকলের ছোট, আর ওরা সকলে মিলে তোকেই বঞ্চিত করল, বুঝলি? আমি ওদের দেখাচ্ছি মজা!

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম, বাবা তুমি ও-রকম বোলো না, আমাকে কেউ বঞ্চিত করেনি। আমার জন্য তুমি অত ভাবো কেন, ঠাকুমার কথা বিশ্বাস করো না কেন?

বাবা তখনকার মত চুপ করে রইলেন। দাদা বউদি ফেরামাত্র তাদের ডেকে বললেন, এই বাড়ির অর্ধেক আমি অরুর নামে লিখে দিয়ে যাব—তোমাদের আপত্তি হবে না তো?

বাবার সেই অস্বাভাবিক লাল চোখ দেখে ভয় পেয়ে দাদা ঘর থেকে পালিয়ে বাঁচল। বউদি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বাবাকে শুইয়ে দিয়ে তাঁর গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কেঁদে ফেলল। বলল, তাই দেবেন বাবা, তা না দিলেই বরং অন্যায় হবে।

বাবা ঠাণ্ডা হলেন। অনেকক্ষণ বাদে আস্তে আস্তে বললেন, তুমি তো ভালো, মা. খুব ভালো, কিন্তু কি করবে, সব অদৃষ্ট।

গাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে, ফলে ব্যাপারটা গোপন থাকার কথা নয়। দিদিরা জানল, ভগ্নীপতিরাও জানল। দু'তিন দিনের মধ্যেই মনতুদা এলো। গম্ভীর। সচরাচর তাকে গম্ভীর দেখা যায় না। আমাকে বলল, এরকম একটা ব্যাপার ঘটেছে, মাত্র আট দশ হাজার টাকার জন্য গাড়ি বিক্রি করতে হল, আমরা জানতেও পেলাম না?

বাবা যে ব্যবস্থা করেছেন তার থেকে ভালো ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারত বলে আমি ভাবি না। তবু আপনার জন এই কথা বলবেই। তাছাড়া মনতুদার কাছে আট-দশ হাজার টাকা যে টাকাই নয় সে আমি অন্তত জানি। ছুটির দিনে অনেক সময় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ছোড়দির বাড়ি কাটিয়েছি। গেলে নিজেরও ভালো লাগে, ভদ্রলোকও ছাড়তে চায় না। টাকা কত সহজে রোজগার করে কেউ কেউ, তখন দেখেছি। হাসিমুখে গল্প করতে করতে লোক এসেছে শুনে নীচে নেমে গেছে। আধ-ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসে সাদা কাগজের মত পাঁচ-সাত হাজার টাকা ছোড়দির হাতে দিয়েছে—ওমুক ট্রানজাকশনের টাকা, রেখে দাও। পাঁচ সাত দশ হাজার টাকা হাতে নিয়ে বাক্সের কোণে ফেলে রাখতে ছোড়দিও যেন এরই মধ্যে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কোনো তাপ উত্তাপ নেই। মনতুদা নিজেই নিজেকে যখন-তখন দালাল বলে গাল দেয়। আবার ছোড়দি এক একদিন বেশীরকম জব্দ হলে নিরুপায় মুখ করে তার সামনেই আমাকে বলে, দালালকে বিশ্বাস নেই দেখলি তো, কি দিয়ে যে কি করে বুঝে উঠিনে।

আগে কারো দালালি বা ব্রোকারি পেশা শুনলে সেটা আদৌ সম্মানের ব্যাপার ভাবতুম না। অনেকেই বোধ হয় ভাবে না। নইলে বিয়ের আগে ছোড়দির বর কন্ট্রাক্টরি করে শুনেছিলাম কেন? ভদ্র-ভাষায় এর নামও কন্ট্রাক্টরি বোধহয়। কিন্তু আমার ধারণা ছিল সরকারী বেসরকারী বড় বড় রাস্তা বাড়ি-ঘর বানানোর নামই কন্ট্রাক্টরি।

কিন্তু দালালের এই সুখের ঘরে রূপ আর রূপোর বাসা দেখে আমার ধারণা বদলে গেছে। এম. এ পাস সুপুরুষ রসিক মানুষ অঢেল টাকা রোজগার করে নিজের বুদ্ধির জোরে আর ক্ষমতার জোরে। সে নিজেকে দালাল বললেও সেটা সুন্দর বিশেষণের মতই লাগে।

*মনতুদা এই অনুযোগ করার পর আমার শুধু মনে হয়েছিল, দাদা যদি বোকার মত ওই সুনন্দ বোসের কাছে টাকার জন্যে না গিয়ে মনতুদার কাছে যেত সেও এত খারাপ লাগত না। মনতুদাকেও বলার দরকার হত না, আট দশ হাজার টাকা হয়ত ছোড়দিই তার বাক্স থেকে বার করে দিতে পারত।*

আবার আমি নতুন করে নিজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করছি। ঠাকুমা গত হবার সঙ্গে সঙ্গে যে অজ্ঞাত ভয় আর ত্রাস ভিতরে ভিতরে আমাকে দিশেহারা করে তুলেছিল—তার ওপর একটা দ্বিগুণ শক্তির মুখোশ চড়িয়েছি। তার ফলে আমার চাল-চলন আচরণে এক ধরনের জোরালো ছটা ঠিকরেছে। তাতে নিজেও ভুলেছি, অপরেও ভুলেছে। ভয়ের চাষ করলেই ভয় বাড়ে, আমি চেষ্টা করি তা না করতে।

এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হওয়ার তিন-চার মাসের মধ্যে জীবনে একটা নতুন স্বাদ পেলাম। আর তার সবটুকুই মনতুদার দাক্ষিণ্যে। আনন্দে কৃতজ্ঞতায় আমার চোখে জল আসার দাখিল।

মনতুদা সাহিত্যে এম. এ.—সাহিত্যরসিক। সাহিত্য বা কবিতা নিয়ে তার সঙ্গে বিতর্কটা বেশি জমত। এ পর্যন্ত আমার কয়েকটা গল্প আর কবিতা নিয়ে গেছে আর তার কিছুদিনের মধ্যেই নামকরা কোনো মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রে ছাপার অক্ষরে সেগুলোর আত্মপ্রকাশ দেখেছি। বাবার হঠাৎ অসুখে এক ঘণ্টার মধ্যে বড় ডাক্তার ধরে নিয়ে আসা থেকে শুরু করে সর্বব্যাপারে এমন শক্তিধর মানুষ আমি আর দেখিনি। কিন্তু বড় কাগজে অনায়াসে আমার লেখা ছাপা হওয়ার পর থেকে লোকটার ক্ষমতার যেন কূলকিনারা পাইনি আমি।

মাস দেড়েক আগে মনতুদা আমার কিছু ছাপা কবিতা বগলদাবা করে নিয়ে গেছল। বলেছিল, অবসর সময়ে প্রিয়সখীর কবিতা থেকে বাড়তি কিছু রস আহরণ করা যায় কিনা দেখি। কিন্তু দেড় মাস বাদে এমন রসই আহরণ করল যে দেখে নিজের দুটো চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছি না। আমারই সামনে ছাপা ঝকঝকে কবিতার বই একটা —তার লেখিকা আমি! ছাপা আর অঙ্গসজ্জা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

মনতুদা অবশ্য বলেছে কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়ে প্রকাশকই যত্ন করে ছেপেছে। কিন্তু কি দিয়ে কি হয়েছে সেটা না বোঝার মত নির্বোধ আমি নই। আনন্দে আমার একটা প্রণাম করে ফেলতে ইচ্ছে করছিল মনতুদাকে—কিন্তু সকলের সামনে লজ্জায় সেটা পারিনি। আরো আনন্দ হয়েছে এই দেখে যে বুদ্ধি করে মনতুদা উৎসর্গের পাতায় বাবার নাম লিখে দিয়েছে। বাবা কত যে খুশী হয়েছেন তাও জানি। বইখানা নেড়েচেড়ে বলেছেন, সুন্দর হয়েছে...তোর ঠাকুমা দেখতে পেল না।

বড় বড় প্রায় সব ক'টা কাগজেই এই কবিতার বইয়ের সমালোচনা বেরিয়েছে। সমালোচনা মানে প্রশংসা। এর পিছনেও যে মনতুদার হাত আছে তাও জানি। তবু আনন্দ ধরে না।

মাস পাঁচেক বাদে এই করে আমার একটা ছোট গল্পের বইও ছাপা হয়ে গেল। তবে সেটা আগেরটার মত অমন অগোচরে নয়। আমি নিজেই তার যত্ন করে প্রুফ দেখেছি, আর উৎসর্গের পাতায় জোর করেই মনতুদার নাম লিখেছি। তার আগে তাকে বলেছি, তোমার টাকাগুলো এ-ভাবে নষ্ট করছ কেন?

জবাবে মনতুদা বলেছে, দালালের সঙ্গে লোকসানের ভাদ্দর-বউ সম্পর্ক- লোকসানই যে হবে তোমাকে কে বলল?

এই বই সম্পর্কেও কাগজে সদয় সমালোচনা ছাপা হয়েছে। বিশেষ করে সেই 'পুষ্টি' গল্পটার প্রশংসা তো অনেকেই করেছে।

ফিফথ ইয়ারে পড়া মেয়ের দু'দুখানা বই ছাপা হয়ে গেছে—এমন মেয়ে আর মাটির ওপর দিয়ে হাঁটে কতক্ষণ? আমার জীবনে যেন ভরা ফাল্গুনের মৌসুম চলেছে তখন।

ও-দিকে মনতুদার বাড়ির উৎসব আর বাইরের পার্টি-টার্টিতেও আমার একটা স্থান হয়ে গেছে। আর অন্তরঙ্গ অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছে। মনতুদা দরাজ হেসে বলে, আমার পার্টি আমার উৎসব মানেই আমার বউ থাকবে আর আমার শালী থাকবে। বউ ছাড়া যদিও চলে শালী ছাড়া একদম অচল আমি। ছোড়দি বলে, আমাকে না দেখলে নাকি ওর বন্ধুরা ওকে জিজ্ঞাসা করে, আপনার শালী কোথায়? আর না গেলে ছোড়দিই অনেক সময় গাড়ি হাঁকিয়ে এসে আমাকে ধরে নিয়ে যায়—ধমকে বলে তুই না গেলে আসর জমে না, চল!

মোট-কথা দিব্বি আনন্দেই দিন কাটছিল আমার।

এরই মধ্যে একদিন একটা দৃশ্য চোখে কাঁটার মত বিঁধল আমার। উল্টোদিকের একতলা দালানের সামনে ছোট একটা মরিস গাড়ি থামল। তার পরেই অবাক হয়ে দেখলাম তার চালক সুনন্দ বোস। গাড়ি থেকে টক করে নেমে কোনো দিকে না তাকিয়ে ভিতরে চলে গেল।

লোকটার তাহলে এরই মধ্যে গাড়ি কেনার মুরোদ হয়েছে! সেকেন্ডহ্যান্ড হলেও গাড়িটা চকচকেই। এখন মনে হল ও-বাড়ির ছেলেগুলোর জামা-কাপড় আজকাল একটু ফিটফাটই দেখি বটে। আর এক-আধসময় সুনন্দ বোসের পরনে ভালো ট্রাউজার আর গায়ে টেরিলিন দেখেছি। কিন্তু এরই মধ্যে গাড়ি কেনা আর সে গাড়ি নিজে ড্রাইভ করার সম্ভাবনা কল্পনা করিনি। আমাদের গাড়ি বেচে দেওয়া আর নাকের ডগায় এই একজনের গাড়ি কেনাটা ভিতরে কোথায় খচ খচ করছিল বলেই বোধহয় মনে হল, এটা বাহাদুরি ছাড়া আর কিছু নয়—পয়সা তো অ্যালুমিনিয়াম কৌটো বিক্রির—গাড়ি দেখাচ্ছে!

ঠিক সেই সময় বউদি পাশে এসে দাঁড়াতে ঝাঁঝালো হেসে বললাম, গাড়ি দেখছি।

বউদি অবাক।—ও মা, গাড়ি তো দু'মাস আগে কিনেছে ভদ্রলোক, তুমি এতদিনে দেখলে! এরই মধ্যে নিজেও দিব্বি ড্রাইভিং শিখে নিয়েছে, এখন নিজেই চালায়।

অত বিস্তার শুনতে চাইনি। কিন্তু বউদি কি ভেবে হঠাৎ আবার বলল, ওর বউদির মুখে শুনেছি ছেলেটা একরোখা আর জেদী বলেই চট করে এত উন্নতি করেছে—ওদের সংসারের চেহারা বদলে দিয়েছে।...আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে ভদ্রলোককে, বেশ খাতিরও হয়ে গেছে।

শোনামাত্র মনে হল বউদির মনে আরো কিছু কথা আছে, এটা তারই ভূমিকা। দপ করেই রাগ হয়ে গেল আমার। বলে ফেললাম, তিন ছেলেপুলের মা হবার পরে আর খাতির জমিয়ে কিছু লাভ হবে?

থতমত খেয়ে বউদি তক্ষুনি প্রস্থান করল। বয়সে বড় হলেও ইদানীং আমাকে ভয়ই করে একটু।

## পাঁচ

ওপরওয়ালা নতুন জাল-বিস্তারে মগ্ন হয়েছেন সেটা কখনো বুঝিনি।

বিপর্যয়ের ধাক্কায় হকচকিয়ে গেছলাম। য়ুনিভার্সিটি থেকে একটু বেলায় ফিরে বাড়ির রাস্তার মোড় ঘুরেই দেখি, আমাদের দোরগোড়ায় দু'দুটো অচেনা গাড়ি দাঁড়িয়ে। আর বাড়িতে পা দিয়েই হতচকিত।

...বাবা চোখ বুজে শুয়ে আছেন। দুজন ডাক্তার গভীর মনোনিবেশে তাঁকে পরীক্ষা করছেন। অদূরে মুখ চুন করে দাদা বউদি দাঁড়িয়ে। তাদের পাশে সুনন্দ বোস।

আমি এসে বোবা একেবারে।

বাবাকে পরীক্ষা করার পর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলেন ডাক্তার দুটি। বুঝলাম, করোনারি স্ট্রোক হয়েছে বাবার। তবে ডাক্তারদের মতে মাইলড্ অ্যাটাক। এ অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া যাবে না, তার দরকারও নেই। বাড়িতেই খুব সাবধানে রাখতে হবে। সুনন্দ বোসের দিকে চেয়েই ব্যবস্থাপত্র বুঝিয়ে দিলেন তাঁরা। আমরাই যেন বাইরের লোক।

ওই লোকের সঙ্গেই ডাক্তাররা চলে গেলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে সুনন্দ বোস এক-গাদা ওষুধ-পত্র নিয়ে সোজা আবার দোতলায় উঠে এলো। দাদা বউদিকে সেগুলি বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেল।

ইতিমধ্যে একটু সুস্থির হয়ে ঘটনা শুনেছি। বিকেলের দিকে বাবা বেশিরকম অস্থির হয়ে পড়তে বউদি প্রথমে দাদাকে ফোন করেছিল। পায়নি। তারপর মনতুদার বাড়িতে ফোন করে জেনেছে ছোড়দি বা মনতুদা কেউ বাড়িতে নেই। অমরদার ফোন নম্বর জানার জন্যে বাবার ঘরে এসে দেখে বাবা অজ্ঞানের মত হয়ে গেছে। দিশেহারা বউদি কি করবে ঠিক করে উঠতে পারছিল না, হঠাৎ দেখে ও-বাড়ির সামনে সুনন্দর গাড়ি দাঁড়িয়ে। ছুটে গিয়ে তাকেই ধরে এনেছে। তারপর যা করার ছোটাছুটি করে সুনন্দই করেছে।

সন্ধ্যের আগে বাড়ি ভরপুর। দিদি অমরদা ছোড়দি মনতুদা কাকারা কাকীমারা খুড়তুতো ভাইবোনেরা অনেকেই চলে এসেছে। যে দুজন ডাক্তার এসে বাবাকে দেখে গেছেন, তাঁরা বড় ডাক্তারই যখন—পরামর্শ করে তাঁদের হাতেই বাবাকে রাখা স্থির হল। কেবল মনতুদা একটু খুঁতখুঁত করতে লাগল। বড় ডাক্তার হলেও সব থেকে বড় ডাক্তার তো নয়।

রাত আটটা সাড়ে আটটা তখন। আত্মীয়-পরিজনেরা অনেকেই আছে তখনো। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে এগিয়ে এলাম। উঠে আসছে সুনন্দ বোস। আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল।

—কেমন?

বললাম, ভালোই।

নেমে চলে গেল।

অসময়ে উপকার করেছে, এ-রকম উপকারের দরুন কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু নির্ভেজাল কৃতজ্ঞ বোধ করছিলাম কিনা সন্দেহ আছে।

লোকজন চলে যেতেই বউদিকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওই যে ডাক্তার এলো ওষুধ-পত্র এলো—তুমি টাকা দিয়েছ?

সঙ্কুচিত মুখে বউদি জবাব দিল, মাসকাবারে দেব ভেবেছি ভাই...এখন তো হাতে তেমন নেই।

শুনে আমার গা জ্বলে গেল। কিন্তু ও বেচারীই বা করবে কি! আমি সোজা নিজের ঘরে এসে ট্রাঙ্ক খুললাম। ঠাকুমার দেওয়া আর এমনিতে জমানো নিয়ে ট্রাঙ্কে আমার হাজারখানেক টাকা আছে। সে-সব নিয়ে বউদির হাতে দিলাম।— সব কাল দিয়ে দেবে, এক পয়সা ফেলে রাখবে না।

আরো লাগবে হয়ত। বাবার বাক্সে আমার নামে একটা পাসবই আছে। ঠাকুমা মারা যাবার পর সেটা হয়েছে। যতদূর জানি ওতে হাজার চারেক টাকা জমেছে এখন। বাবার হাতে কখনো টাকা এলেই যেমন করে হোক তার থেকে কিছু বাঁচিয়ে ওতে রাখেন। নিজের শরীর খারাপ, তাই টাকাটা জমা দেবার জন্য প্রায় প্রত্যেক বারই টাকা আর পাসবই সুদ্ধু আমাকে ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেন। ফিরে এলে প্রতিবারই বলেন. ওটা তোর কাছেই থাক না।

আমি রাখি না।

মনে মনে ঠিক করলাম দুই-একদিনের মধ্যেই ওটা বাবার বাক্স থেকে বার করে নিয়ে চিকিৎসার খরচ চালাব।

তার দরকার হল না। দিনকয়েকের মধ্যেই বাবা অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। আর তার কার্ডিওগ্রাফ থেকে শুরু করে যা-কিছু হৈ-চৈ করাব সবই মনতুদা করল। আমার সেই হাজার টাকা থেকে তাকে টাকা দিতে গিয়ে বউদি মনতুদা আর ছোড়দি দুজনেরই ধমক খেয়ে মরল।

গত সাতদিনের মধ্যে রোজই সুনন্দ বোস একবার করে অন্তত বাবার খবর নিতে এসেছে। বাবার শোবার ঘরেই বসেছে। বাবা তার সঙ্গে আস্তে আস্তে গল্প করেছেন। অসময়ে সে কত উপকার করেছে সেই কথা বলেছেন। বউদিকে ডেকে একদিন তাকে এক পেয়ালা চাও করে দিতে বলেছেন। অবশ্য চায়ের জন্য সে বসে থাকেনি। না-না করে তার আগেই উঠে চলে গেছে।

কিন্তু এ ক'দিন কৃতজ্ঞতার বদলে আমার দুর্বোধ্য অসহিষ্ণুতাই প্রবল হয়ে উঠছিল কেন? এই হৃদ্যতা অভিসন্ধিশূন্য ভাবতে পারছিলাম না কেন?

সেদিন সকালের দিকে ঘরে ঢুকেই দেখি ওই মূর্তি বসে। সঙ্গে সঙ্গে কি যেন হল আমার। বাবাকে বললাম, আজ কিন্তু সকাল থেকে অনেকের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছ।

সকালের মধ্যে দু'দফা বাবার উকিল বন্ধুরা এসেছিলেন ঠিকই। বাবা বাধা দেবার আগেই সুনন্দ উঠে দাঁড়াল। বাবাকে বলল, বেশি কথা বলা ঠিক নয় কিন্তু। আমার দিকে ফিরল, আমি কথা বলতে দিইনি—আমিই বলছিলাম, উনি শুনছিলেন।

চলে গেল।

তারপরেই বাবার উক্তি কানে এলো, চমৎকার ছেলেটা। অহঙ্কার নেই, দেমাক নেই, অথচ নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়েছে।...আর বেশ স্পষ্টভাষীও।

বাবার মুখে হঠাৎ এই প্রশংসা শুনে আমার মনে কি কোনো অনাগত আশঙ্কার ছায়া পড়েছিল?

জানি না।

জাল বোনার কৌতুকে ওপরওয়ালা এরপর আর একটু তৎপর হয়েছেন।

মাস দেড়েক পরের কথা। য়ুনিভার্সিটি বন্ধ ছিল। সকাল থেকে কি একটা গণ্ডগোলের কথা কানে আসছে। স্কুলের মাস্টাররা সব স্ট্রাইক করেছে, ছেলেরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। দুপুরের দিকে সব দল বেঁধে রাইটার্স-বিলডিং চড়াও করবে নাকি।

কলকাতায় একটা না একটা এই গোছের ঝামেলা লেগেই আছে। এ-সব নিয়ে আমি অন্তত মাথা ঘামাই না। বেলা তখন একটা। দুপুরে ঘুমনো অভ্যাস নেই, একটা গল্প-টল্প লেখা যায় কিনা ভাবছিলাম।

এমন সময় টেলিফোন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার বারান্দার মুখেই টেলিফোন। বাবার ঘুম ভাঙার ভয়ে দৌড়ে এসে রিসিভার তুলে নিলাম। মনে মনে যা আশা করেছিলাম, তাই। হয় ছোড়দি নয় মনতুদা। ছুটির দিনে আমার বাড়ি বসে থাকাটা যেন ওদের চক্ষুঃশূল। তলব আসবেই।

মনতুদার গলা। বক্তব্য মেট্রোর টিকিট কাটা হয়ে গেছে, ঠিক সময়ে বেরিয়ে পড়া চাই।

বাবার অসুখের দরুন অনেকদিন এ-পাট বন্ধ ছিল। খুশীই হলাম। কিন্তু পরক্ষণে গণ্ডগোলের কথা মনে পড়ল। বললাম, ট্রাম-বাস তো ঠিকমত চলছে না শুনলাম, যাব কি করে?

ওদিক থেকে প্রত্যাশিত উত্তর এলো। মনতুদা বলল, আচ্ছা ঠিক সময়ে আমার গাড়ি যাবে, রেডি থেকো।

মনতুদাদের দুটো গাড়ি এখন। ছোড়দির কাছে শুনেছি ওটা দাঁও-এ কেনা গেছে, একটা গাড়িতে বড় অসুবিধে।

একটু বাদে তৈরী হয়ে নিলাম। বাইরে গাড়ির সাড়া পেয়ে বউদিকে ঠেলে তুলে দিয়ে গাড়িতে এসে বসলাম। আমার ছোড়দির বাড়ি যাওয়া বা তাদের সঙ্গে সিনেমায় যাওয়া বউদির কাছে নতুন কিছু নয়।

গাড়িতে উঠেই দেখি ও-বাড়ির জানলার সামনে সুনন্দ দাঁড়িয়ে। দুপুরে বড় একটা বাড়িতে দেখা যায় না তাকে। আজ জানলায় দাঁড়িয়ে কোন কাব্যে তন্ময় হয়ে ছিল সে-ই জানে। ঝকঝকে গাড়িতে চেপে আমায় বেরুতে দেখে একটু অবাকই হল যেন।

চেনা ড্রাইভার। আমি ওঠা-মাত্র গাড়ি চালিয়ে দিল।

বড় রাস্তায় পড়তে কি-রকম একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। সর্বদা ট্রাম বাস গাড়ি চলাচলের রাস্তাটা যেন ভারি নির্জন। রাস্তায় লোকও বিশেষ চোখে পড়ল না। সমস্ত পথটাই এই রকম।

চৌরঙ্গীতে এসে অবশ্য লোকজনের ব্যস্ততা কিছু চোখে পড়ল, তবে অপেক্ষাকৃত কম। মেট্রোর গাড়িবারান্দার নীচে মনতুদা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সঙ্গে ছোড়দিকে না দেখে আমি অবাক।

—ছোড়দি কই?

—বলো কেন, তোমার ছোড়দির হঠাৎ কর্তব্যবোধ চারিয়ে উঠেছে, ছেলেপুলে নিয়ে আমার এক বোন এসেছে বাইরে থেকে—আটকে গেল।

—কি কাণ্ড, তাহলে টেলিফোনে আমাকে বলে দিয়ে ক্যানসেল্ করলেই হত!

—হ্যাঁ, ইচ্ছে করলেই আসতে পারত, তারা থাকবে দু'চার দিন, টিকিট কেনা আছে বলে যাবার জন্য সাধাসাধিও করেছিল, কিন্তু মাথায় কখন যে কি চাপে, চলো—

ড্রাইভারকে শো-ভাঙার আগে আসতে বলে বাড়ি চলে যেতে নির্দেশ দিল মনতুদা।

সত্যি ভালো ছবি একটা। ঘণ্টা দুই আর এ-জগতে ছিলাম না।

শো ভাঙতে ভিড় ঠেলে নীচে নেমে এলাম আমরা। আমার একখানা হাত মনতুদার হাতে ধরা: ছোড়দির সামনে অমন হামেশাই হাত ধরে যখন একটুও সঙ্কোচ হয় না, কিন্তু সে না থাকলে একটু যেন অস্বস্তি।

বাইরে এসে গাড়ির সন্ধানে দশ পা এগোতে না এগোতে আচমকা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড একটা। ফটাফট আট-দশটা বন্দুকের আওয়াজ একেবারে কানের গোড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়ায় সামনেটা একাকার। তারপরেই টের পেলাম চোখ একেবারে যেন জ্বলে যাচ্ছে। এরই মধ্যে যে-যেদিকে পারে হুলস্থুলু ছোটাছুটি। সেই অবস্থায় মাত্র দু'তিন মিনিট আমার হাত মনতুদার হাতে ধরা ছিল—তারপরেই ভিড়ের চাপে দুজনের কে কোথায় ছিটকে গেলাম। আবার সেই ফটাফট শব্দ, আবার ধোঁয়াটে অন্ধকার, অসম্ভব চোখ জ্বালা। আর সেই দিশেহারা পালানোর হিড়িক। ভিড়ের চাপে আমিও একদিকে চলেছি, কিন্তু কোনোদিকে দিশা পাচ্ছি না, জ্বলুনির চোটে চোখ মেলে ভালো করে তাকাতেও পারছি না। বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত ত্রাস।

আভাসে যেটুকু দেখতে পাচ্ছি, রাস্তায় আর মোড়ে মোড়ে কেবল রিভলবার হাতে সার্জেন্ট।

তৃতীয় দফা সেই ফটাফট শব্দ হতে আমার মনে হল চোখ দুটো বুঝি অন্ধই হয়ে গেল। সামনেই একটা মোড়, পড়ি-মরি করে সকলে সেদিকেই ছুটছে—অন্ধের মত আমিও ঘুরলাম সেদিকেই। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন শক্ত হাতে আমার একখানা হাত ধরে ফেলল, কিছু বোঝবার আগেই দ্বিগুণ বেগে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়ে রাস্তাটা পার হল। সামনেই ছোট গাড়ি একটা। চোখের পলকে সামনের দরজা খুলে আমাকে একরকম ধাক্কা দিয়েই ঠেলে বসিয়ে দিল। তারপর ও-দিক ঘুরে ড্রাইভারের আসনে বসে যেন মুহূর্তের মধ্যেই গাড়ি ছোটালো।

আমার চোখে শাড়ির আঁচল চাপা, গাড়ি যে চালাচ্ছে তার মুখের আর চোখের চারভাগের তিনভাগ এক-হাতের রুমালে চাপা।

বড়জোর তিরিশ কি চল্লিশ সেকেন্ড। হুঁশ ফিরতে দেখি, আমি পাশে বসে আছি, ঝাপসা চোখ কোনো রকমে টান করে সবেগে গাড়ি চালাচ্ছে সুনন্দ বোস।

আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

বসে আছি। হতচেতন যেন আবার। দু'মিনিটে বোধহয় দেড় মাইল পথ পেরিয়ে এলাম। চোখ ভয়ানক জ্বালা করছে এখনো। স্টিয়ারিং ধরা লোকটার লাল চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে, আমারও সেই দশা।

হঠাৎ গাড়িটা থামলো রাস্তার পাশে এক জায়গায়।

—নামো।

দুই-এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে আমি বিমূঢ়ের মতই নেমে এলাম।

—এসো।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করতেই সামনের টিউবওয়েলটা চোখে পড়ল। আমি যেন জল দেখে বেঁচে গেলাম। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলাম। সে পাম্প করতে লাগল। আমি বোধহয় পরপর আট দশ আঁজলা জল চোখে মুখে ঝাপটা মেরে মেরে একটু সুস্থ বোধ করলাম।

—টেপো।

সুনন্দ বোস এবারে টিউবওয়েলের মুখে গিয়ে দাঁড়াল। ভেজা মুখে আমি পাম্প করলাম বারকতক। সে চোখে মুখে জল দিল। তারপর রুমালে করে নিজের মুখটা মুছে নিয়ে আমার দিকে তাকালো। আমি তখনো বুঝি আমাতে নেই।

—রুমাল কোথায়?

প্রশ্ন শুনে আমি এদিক-ওদিক তাকালাম। ভিড়ের ছোটাছুটিতে রুমাল কোথায় পড়ে গেছে। নিজের আধভেজা রুমাল আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এতে চলবে?

আমি দামী শাড়ির আঁচলে মুখ মুছে নিলাম।

—ওঠো।

যন্ত্রের মত গাড়িতে উঠলাম। চোখে অত জল দিয়ে একটু ভালো লাগছে, কিন্তু বোধশক্তি তখনো আচ্ছন্ন যেন। বড় রাস্তা দিয়ে সবেগে আসতে আসতে গাড়িটা হঠাৎ বাঁয়ের রাস্তায় ঘুরে গেল। কিছু বোঝবার আগে সেটা একটা গেট দিয়ে বিরাট কম্পাউন্ডের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারপর দেখলাম একটা বড় হাসপাতাল কম্পাউন্ডে ঢুকেছি। গাড়ি চালাতে চালাতে পাশের লোকের ডাইনে-বাঁয়ে সন্ধানী দৃষ্টি।

এক জায়গায় ফার্স্ট-এড-এর লাল বোর্ড দেখে গাড়িটা সেখানে থামলো। নিজে নামল। আমি বসেই আছি দেখে বলল, নেমে এসো, চোখ এখনো ভয়ানক লাল হয়ে আছে।

যন্ত্রচালিতের মতই আমি নেমে এলাম।

ফার্স্ট-এড-এ একজন ছোকরা ডাক্তার বসে ছিল। এগিয়ে গিয়ে তাকে কি বলতে সে এসে আমাকে পরীক্ষা করল। পরে মাথা নেড়ে জানালো সেরকম কিছু নয়—টিয়ার গ্যাসের ঝাপটা বেশি লাগলে এ-রকম হয়ই। আজ কালের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে। ডাক্তার সুনন্দর দিকে এগোতে সে বলল, আমার কিছু হয়নি, ঠিক আছে।

আমার জন্য এক শিশি লোশন দিতে দিতে গম্ভীর রসিকতার সুরে ছোকরা ডাক্তার সুনন্দকে বলল, শহরের সর্বত্র গোলমাল শুনছি আজ, আর আজকের দিনেই সিনেমা দেখাতে নিয়ে বেরিয়েছিলেন?

আমি অবাক হয়ে দেখলাম ততোধিক গম্ভীরমুখে মাথা নাড়ল লোকটা। অর্থাৎ তাই নিয়ে গেছল।

লোশনের শিশি হাতে আবার গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো।—ওঠো।

উঠে বসার পর যেন আমার মাথাটা সক্রিয় হতে থাকল। আর তক্ষুনি মনে হল, লোকটা যেন সেই থেকে আমাকে হুকুম করে যাচ্ছে আর আমি মুখ বুজে তাই পালন

করে চলেছি। ওঠো—নামো—এসো হুকুম করেই চলেছে পর পর। এতক্ষণে সচেতন অসহিষ্ণুতায় সজাগ হয়ে উঠতে লাগলাম আমি। ইচ্ছে হল গাড়িটা থামাতে বলে নেমে যাই। কিন্তু ট্রাম-বাস নেই যাব কি করে। তাছাড়া কেমন ধারণা হল, নামতে চাইলেও নামতে দেবে না বা গাড়ি থামাবে না। নিজের কল্পনায় ভিতরে ভিতরে আরো উষ্ণ হয়ে উঠলাম। গাড়িটা আবার বড় রাস্তায় এনে সামনের দিকে চোখ রেখেই আবার বলল, ডাক্তার ভদ্রলোক কি বলল শুনলে তো?...তুমি যখন গাড়ি চেপে বাড়ি থেকে বেরোও তখনি শুনেছিলাম গণ্ডগোল বেধে গেছে—কলেজ স্ট্রীটে পুলিসের গুলিতে তিনটে ছেলে খতম হয়ে গেছে। এই দিনে সিনেমা না দেখলেই হত না?

পরিস্থিতি বিশেষে এই সাধারণ উক্তিও ভয়ানক অভদ্র মনে হয়েছে আমার। সেই থেকে গুরুমশায়ের মত তুমি-তুমি করে বলছে, তাও কানে লাগছে। যেন সেই ফ্রক-পরা মেয়ে আমি আর উনি সেই মাতব্বর। রাগে 'তুমি'র জবাবে আমারও তুমি করে বলতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু মেয়েদের বেলায় তার আবার অন্য অর্থ দাঁড়ায়। কালচারের 'ক' জ্ঞান নেই যার তার সঙ্গে কথা বলতেও বিতৃষ্ণা। ও-দিকে মনে দুশ্চিন্তাও দেখা দিয়েছে এতক্ষণে। মনতুদার কি হল কে জানে! তক্ষুনি মনে হল এই লোকটা আচমকা আমাকে এ-ভাবে গাড়িতে টেনে না তুললে একটু বাদেই হয়ত মনতুদার সন্ধান মিলত —সেই বিভ্রাটের মধ্যে এখনো আমাকে খুঁজছে কিনা কে জানে। আর এই লোকটাই বা ও-রকম একটা সময়ে সেখানে গিয়ে পড়ল কি করে? বাড়ির জানলায় দাঁড়িয়ে তো দুপুরের আকাশ দেখছিল!

ঝাঁঝালো জবাব দিলাম, আপনার সঙ্গে পরামর্শ করে বেরুলে এই ভুল হত না বোধহয়। তা আপনিই বা সে-সময়ে ওখানে ছিলেন কেন--বিপদে পড়তে পারি ভেবে?

চোখ সামনের দিকেই। কিন্তু পুরু ঠোঁটে হাসির রেখা ঠিকই চোখে পড়ল। বলল, না—এই দিনে তুমি সিনেমা দেখতে গেলে শুনে আমারও দেখার লোভ হল। অনেক দিন দেখি না...

রাগ সত্ত্বেও আমি বিস্মিত।—কার কাছ থেকে শুনে?

—বউদির। তুমি গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলে যখন, তোমার বউদি দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। শহরে গণ্ডগোল লেগেছে, তার মধ্যে তুমি কোথায় বেরুলে জিজ্ঞাসা করাটা কর্তব্য মনে হল। তিনি বললেন মেট্রোয়। তখন আমারও ইচ্ছে হল সুদিনে একটু সিনেমা দেখি...

কথা নয় তো যেন জলবিছুটি। তার ওপর একটু বাদেই আবার আলতো করে জিজ্ঞাসা করল, ওই গাড়িটা কার, এমন দিনে সিনেমা দেখতে কে গাড়ি পাঠিয়েছিল?

আস্পর্ধার কথা শুনে নিজেকে সংযত রাখা গেল না।--সে খোঁজে আপনার দরকার কি?

নির্বিকার মুখেই জবাব দিল, দরকার একটু ছিল।

এ-রকম অমার্জিত লোকের সঙ্গে কথা না বলাই ভালো। আমি চুপ করে থাকতে চেষ্টা করলাম।

—তোমার বাবা কেমন আছেন?

—ভালো।

—এখন আর বেশি কথা বললে ক্ষতি হবার ভয় নেই?

কথার ছলে কথা বাড়াচ্ছে দেখেও রাগ হচ্ছে। ঠাণ্ডা জবাব দিলাম, বেশি কথা কোনো সময়েই না বলা ভালো।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, কাল-পরশুর মধ্যেই তাঁর কাছে একবার যাব ভাবছি।

নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা রসাতলে গেল।—কেন? আপনার গাড়ি আছে, আর সেই গাড়িতে তুলে আমাকে এতবড় একটা বিপদ থেকে উদ্ধার করে এনেছেন, এ-কথা বলতে?

পুরু ঠোঁটে আবার সেই হাসির দাগ।—না, আমার নিজেরই দরকার আছে।

এই দরকারের পিছনে যেন একটা অমার্জনীয় উদ্দেশ্যের ছায়া পড়ছে আমার মনে। তাই সরোষেই আবার বললাম, কি দরকার? মামলার ব্যাপার হলে বাবাকে বিরক্ত না করাই ভালো, বাবা আজকাল কোনো কেস [illegible] না।

খুব সত্যি কথা বলিনি। আমার কথা ভেবেই এই শরীরেও বাবার আজকাল কেস নেবার ঝোঁক। আমরাই বাধা দিই।

সামনেটা ফাঁকা। দু'হাতে স্টিয়ারিং ধরে রেখে এই প্রথম আমার দিকে সোজাসুজি ফিরল একবার। জবাব দিল, আমার কেস যাতে নেন, সেই চেষ্টা করব।

বাড়ির গায়ে গাড়ি থামাতে দেখি, উদগ্রীব মুখে রেলিং ধরে বাবা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে। পাশে বউদি। এই গাড়ি থেকে আমাকে নামতে দেখে বউদি হাঁ।

যে আমাকে নিয়ে এলো তার দিকে একবারও না তাকিয়ে আমি [illegible] ভিতরে ঢুকে গেলাম। ওদিকে বউদি তর-তর করে নীচে নেমে এলো।—কি কাণ্ড, চারদিকে এত গণ্ডগোল শুনে বাবা সেই থেকে ভয়ানক—ও কি? তোমার চোখ এত ফোলা কেন? এত লাল কেন?

ওপরে উঠতে উঠতে আমি রসিকতাই করলাম।—অনেক কেঁদেছি।

সঙ্গ নিয়ে বউদি আবার বলল, সত্যি মুখচোখ অদ্ভুত দেখাচ্ছে তোমার! ওদিকে বাবা ভয়ানক অস্থির, তার ওপর বাড়ি গিয়েই মনতুবাবু টেলিফোনে জানিয়েছেন, টিয়ার গ্যাসের মধ্যে ভিড়ের ছোটাছুটিতে তুমি কোথায় ছিটকে গেছ—অনেক খুঁজেও তোমাকে পেলেন না—তাই বাড়ি ফিরেই টেলিফোন করেছেন—শুনে তো বাবা আরো যান আর কি!

না থেমে বললাম, আমি বাবার কাছে যাচ্ছি, তুমি মনতুদাকে টেলিফোনে জানিয়ে দাও আমি ঠিকমত ফিরেছি।

—কিন্তু তুমি সুনন্দবাবুর গাড়িতে এলে কি করে?

বিরক্তিতে থমকে দাঁড়ালাম। ব্যঙ্গ করে বললাম, ওই গাড়িতে আসার ব্যবস্থা তো তুমিই করেছ শুনলাম!

বাবা এগিয়ে আসতে তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে গেলাম। আমার দিকে চেয়েই আঁতকে উঠলেন তিনি।—কি সর্বনাশ! এ কি হয়েছে? বউমা টেলিফোন করে শিগগির একজন ডাক্তার-টাক্তার ডাকো।

আমি তাড়াতাড়ি বাবাকে ধরে বললাম, ডাক্তার দেখিয়েই বাড়ি আসছি, তুমি কিছু ভেবো না বাবা, আমার কিছুই হয়নি।

ধরে এনে তাঁকে বিছানায় বসিয়ে আমিও পাশে বসলাম। বাবা উত্তেজিত হয়ে বকে উঠলেন।—তোর সঙ্গে সঙ্গে কি মনতুটারও মাথা খারাপ হয়েছিল! এই দিনে কেউ বেরোয়! তার ওপর টেলিফোন, গণ্ডগোলে ওর গাড়িটাও যেতে পারেনি, আর ওদিকে তুইও কোথায় ছিটকে গেছিস যে, সে তোকে আর খুঁজেই পেল না—এভাবে ভাবিয়ে আমাকে কি মারবি তুই?

আমি সভয়ে তাড়াতাড়ি বললাম, না জেনেশুনে আর কক্ষনো এভাবে বেরুবো না বাবা—

বাবা জিগ্যেস করলেন, তারপর এলি কি করে? সুনন্দকে পেলি কোথায়?

—ওখানেই ছিল।

—ওখানেই ছিল! ট্রাম নেই, বাস নেই, ও না থাকলে কি হত—আসতিস কি করে? ...ডাক্তার সে-ই দেখিয়ে এনেছে?

মাথা নাড়তে হল।

—বুদ্ধিমানের কাজ করেছে; কিছু ভয় নেই তো, চোখ এখনো এত লাল কেন?

—সেরে যাবে। ওষুধ দিয়েছে।

তক্ষুনি মনে পড়ল লোশনের শিশিটা ওই লোকের গাড়িতে থেকে গেছে।

বাবার কাছ থেকে উঠে নিজের ঘরে এসে আয়নায় মুখ দেখলাম। দুটো চোখ যেন এখনো দুটো জবা ফুল। হঠাৎ দেখলে মনে হবে আলগা রক্তের ছোপ লেগে আছে।

আধ-ঘণ্টার মধ্যেই লোশনের শিশি হাতে বউদি হাজির।—তোমার ওষুধ, সুনন্দবাবু পাঠিয়ে দিলেন।

আমার মনে হল, ওষুধ আনা বা এই কথা বলার মধ্যে যেন চাপা হাসি লুকিয়ে আছে। শিশিটা তার হাত থেকে নিয়ে মাটিতে আছড়ে ভাঙতে ইচ্ছে করল। তার বদলে ঠিক করে ড্রেসিং টেবিলের ওপরে রাখলাম।

তিন দিন পরের ঘটনা।

আমাদের বাড়ির দোতলার সিঁড়ির সামনের বারান্দায় সুনন্দ বোসের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। হাতে একটা মোটা ফাইল। এক পলক আমার দিকে তাকিয়ে তারপর পাশ কাটিয়ে সোজা বাবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। যেন নিজের অধিকারেই সোজা দোতলায় এসে বাবার কাছে যাচ্ছে। ও-ধারের ঘর থেকে বউদিকে মুখ বাড়াতে দেখে আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, একটা খবর না দিয়ে এ-ভাবে ওপরে উঠে আসে কেন?

বউদি আমতা আমতা করে জবাব দিল, বাবার কাছে তো সকালেই খবর পাঠিয়েছিল, বাবা আসতে বলেছেন—

য়ুনিভার্সিটির সময় হয়ে আসছে আমার। খেতে বসা দরকার। কিন্তু ভিতরে কি-জানি একটা অস্বস্তি। বাবার ঘরের দরজার কাছে একবার ঘুরে না গিয়ে পারলাম না। ...ফাইল খুলে কৌটো-কারখানার জায়গা জমি কিছু একটা দেখাচ্ছে মনে হল। আর বাবাও গভীর মনোযোগে দেখছেন।

খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে খেয়ে দেয়ে আমি য়ুনিভার্সিটি চলে গেলাম।...হয়ত ব্যবসা

সংক্রান্ত কোনো পরামর্শ নেবার জন্যই বাবার কাছে এসেছে। আবার ভাবছি এটা ছলও হতে পারে।

বিকেলে বাড়ি ফিরে বাবাকে কেমন খুশী খুশী দেখলাম। এ-রকমটা আজকাল বড় দেখিনে তাঁকে। কিন্তু ততক্ষণে সকালে ওই লোকের আসার ব্যাপারটা আমি ভুলে গেছি। তাই বাবাকে খুশী দেখে আমিও খুশী।

পরদিন সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ দাদাকে বাবার ঘরে দেখে আমি অবাক একটু। দাদা পারতপক্ষে বাবার ঘরে আসে না। অথচ আজ দাদা হাসিমুখে বাবাকে কি বলছে আর বাবা সাগ্রহে তাই শুনছে। আমি ঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়ালাম। কারো ব্যবসা ভালো চলার চাক্ষুষ-দেখা ফিরিস্তি দিচ্ছে দাদা। তারপঙ্খেই সুনন্দর নাম!

আমি যেন তক্ষুনি কিছু একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পেলাম। আর তারপর থেকেই মাথায় যেন আগুন জ্বলতে লাগল। কেবলই মনে হল মানুষের স্থূল বিবেচনারও একটা সীমা থাকা উচিত। বাবার বয়েস হয়েছে, শরীর ভেঙেই পড়েছে, আমার জন্যে খুবই চিন্তা করেন সবই ঠিক—কিন্তু তা বলে চিন্তা এই স্তরে নেমেছে!

খানিক বাদে বাবার ঘরে আমার ডাক পড়ল। আমি প্রস্তুত হয়েই গেলাম। বাবা শুয়ে ছিলেন, খুশীমুখে ডাকলেন, আয়, য়ুনিভার্সিটি নেই?

—আছে।

—তোর সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল, আজ না যদি যাস?

—দেরিতে যাব। বলো।

—বোস।

আমি পাশে বসতে শুয়ে শুয়েই আমার পিঠে দুই একবার হাত বোলালেন। তারপর বললেন, হ্যাঁ রে, ও বাড়ির সুনন্দ তো বেশ চমৎকার ছেলে, ওর বাবাকে অবশ্য আমি জানতাম, গরীব হলেও বড় ভালো লোক ছিল—তোর ঠাকুমাও ওদের খুব পছন্দ করত। তা হাতের কাছে এ-রকম একটা ছেলে থাকতে আমি তোর জন্য এত ভেবে মরছি কেন?

আমি খুব স্পষ্ট করেই পাল্টা প্রশ্ন করলাম, আমার জন্য তুমি এত ভাবছই বা কেন?

—কেন ভাবি সে তুই এখন বুঝবি না।...তোর বউদি অনেক দিন ছেলেটার খুব প্রশংসা করেছে আমার কাছে। তুই কবে নাকি কি-একটা গল্প লিখেছিলি ওদের নিয়ে, তাই পড়েই ঝোঁকের মাথায় সুনন্দ ব্যাঙ্কের কেরানীগিরি ছেড়ে ব্যবসায়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। শুনে ওর দাদাকে একদিন ডেকে পাঠিয়ে একটু জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করব ভেবেছিলাম। তার মধ্যে সুনন্দ কাল নিজেই একেবারে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে হাজির। ...কোথায় কারখানা, কারখানায় কি কি হয় না হয়, ভবিষ্যতে আরো কি কি করার ইচ্ছে সব দেখালো। এই দক্ষিণেই কোথায় জমি কিনেছে একটা তারও কাগজ-পত্র দেখালো। আমি তখনো বুঝিনি কি বলতে চায়।

আমার ভেতরটা কঠিন হয়ে উঠেছে। বাবার হাসি-হাসি মুখের দিকে স্থির চেয়ে আছি আমি।

কি মনে পড়তে বাবা হেসেই ফেললেন। বললেন, এমন ছেলেমানুষ, ফাইলের মধ্যে ব্যাঙ্কের পাসবইসুদ্ধু নিয়ে এসেছিল, আমি দেখতে চাইলে তাও দেখাত! এত সবের পর বিয়ের প্রস্তাব—ছেলেবেলা থেকেই নাকি তোকে ওদের বাড়ির সকলের পছন্দ, তাই

আজ নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পর এ প্রস্তাব নিয়ে এসেছে।

আরো শুনতে হল। যার সার মর্ম, ছেলেটার স্পষ্ট কথায়-বার্তায় আর সহজ অথচ বলিষ্ঠ আচরণে বাবা একেবারে মুগ্ধ। নিজের সম্পর্কে এত কথা বলা সত্ত্বেও একটু দেমাকি মনে হয়নি তাকে। বরং খুব স্বচ্ছ জোরালো ছেলে বলে মনে হয়েছে। আর তার ফলেই বাবার নিজের যে কিছু নেই সে কথাও নাকি মুখ ফুটে বলতে বাধেনি তাকে। আর সেই সঙ্গে বাড়ির একটা অংশ আমাকে লিখে দেবার ইচ্ছে আছে তাও জানিয়েছেন। তার জবাবে ওই চমৎকার ছেলে সবিনয়ে অথচ স্পষ্ট করে বলেছে, চঞ্চলদার তিনটে ছেলেপুলে...সেটা ঠিক হবে না, আপনার আশীর্বাদে আপনার মেয়ের কোনো অভাব থাকবে না।

আমি নির্বাক। আমার দিকে চেয়ে এতক্ষণে বাবার খটকা লাগল একটু! তবু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন তুই কি বলিস?

—তুমি কি তাকে কোনোরকম কথা দিয়েছ?

—না, কথা ঠিক দিইনি...তবে ছেলেটা যেন ধরেই নিয়েছে এখানে বিয়ে হবে। ...কিন্তু তোর মত নেই নাকি?

আশা আর উৎকণ্ঠা চাপতে না পেরে বিছানায় উঠে বসেছেন। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। ঠাণ্ডা সুরেই বললাম, বাবা, আমি তোমাকে আগেও বলেছি এখনো বলছি আমাকে নিয়ে তুমি এত চিন্তা-ভাবনা করো না।

উদ্বেগে বাবার দু'চোখ আমার মুখের ওপর থমকে রইল একটু। —তোর কি আর কোনো ছেলেকে পছন্দ?

জোর দিয়েই বললাম, না, এখন পর্যন্ত কাউকেই পছন্দ নয়।

শুনে বাবার আগ্রহ আরো বাড়ল।—তাহলে এখানে আপত্তি কি? আমি সব বলতে পারলাম না, বউমাকে জিজ্ঞেস করে দেখ, তার সঙ্গে সুনন্দর অনেক দিন অনেক কথা হয়েছে।

—জিগ্যেস করব।

আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে এলাম আমি। সেই মুহূর্তে সব থেকে বেশি অভিমান আমার বাবার ওপরেই। এর থেকে বাবা যদি আমার জন্যে অল্প মাইনের কোনো কলেজের মাস্টারও ঠিক করতেন, এত খারাপ লাগত না। টাকা নেই বলে মেয়ের জন্যে একটু বিবেচনাও থাকবে না? একজনের টাকা হচ্ছে সেটাই সব!

য়ুনিভার্সিটি যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে খেতে বসলাম। এ সময় বউদি সামনে থাকে। সামনেই ছিল। ভয়ে ভয়ে আমাকে লক্ষ্য করছে টের পাচ্ছি। কিন্তু বিতৃষ্ণায় আমি তার দিকে তাকালামও না। তার সাহসেরও একটা সীমা আছে এটাই বোঝাতে চাইলাম।

য়ুনিভার্সিটিতে বেশিক্ষণ ভালো লাগল না, সেখান থেকে ছোড়দির বাড়ি চলে গেলাম। ওদের দুজনের সামনেই বললাম ব্যাপারটা। শুনে ছোড়দি একেবারে আকাশ থেকে পড়ল—বলিস কি রে, টিনের কৌটো-অলার সঙ্গে বিয়ে! ওর বরের দিকে তাকালো।—তুমি কিছু বলছ না যে!

বিস্ময়ের ধাক্কায় ছোড়দি অ্যালুমিনিয়মকে টিন বানিয়ে ফেলল। নিস্পৃহ কৌতুকে মনতুদা জবাব দিল, তোমার সাহিত্যিক বোনের জিনিয়াস তো কৌটোয় পুরে রাখারই

জিনিস। তারপর হেসেই বলল, তুমি একেবারে জলে পড়ে আছ ভাবছেন কেন শ্বশুরমশাই...মাসে তোমার চার-পাঁচশ টাকা রোজগারের ব্যবস্থা তুমি এম. এ. পাস করার আগেই আমি করে দিতে পারি।

আমি উত্তেজিত।—সত্যি পারো?

মনতুদা রহস্য করে জবাব দিল, তোমার নিজের সৌরভ তো নিজে টের পেলে না প্রিয়সখী—কালে দিনে তোমার নিজের গুণেই এর থেকে ঢের বেশি তুমি নিজেই রোজগার করতে পারবে।

ছোড়দি বাধা দিল, থাক, এম. এ. পাস করার আগে আর রোজগার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই।

আমি উত্তেজিত।—এ-সব কথা বাবাকে তোমরা বলতে পারবে?

মনতুদা জবাব দিল, তুমি হুকুম করলেই পারব।

ঠিক তখনই মনতুদার বড় অ্যালসেসিয়ানটা ঘরে ঢুকল। বাড়িতে জমকালো দুটো অ্যালসেসিয়ান কুকুর আছে মনতুদার। আমার সঙ্গে ওদের চেনা পরিচয় হয়ে গেছে, কিন্তু দেখলে এখনো ভয়ই করে। মনতুদা ঠাট্টা করল, এক কাজ করো, এই বড়টাকেই নিয়ে গিয়ে তোমাদের বাড়িতে রাখো—কৌটো-অলা ফৌটো-অলা ঢুকলে আর আস্ত ঠ্যাং নিয়ে ফিরতে দেবে না।

বেশ একটা উদ্দীপনা নিয়েই বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু চার পাঁচ ঘণ্টা যেতে না যেতে সেই পুরনো অসহিষ্ণু অস্বস্তি আবার যেন ছেঁকে ধরতে লাগল। ভিতরটা আমার দুর্বল জানি বলেই নিজের ওপরে রাগ। থেকে থেকে কেবলই মনে হচ্ছিল একজনের এই সবল চাওয়া প্রতিহত করার ক্ষমতা যেন আমার নেই।

সেদিন আর পরদিন বিকেল পর্যন্ত বউদির সঙ্গে আমার কথা বন্ধ। রাগ আমার সব-থেকে বেশি তারই ওপর। এর মধ্যে বাবা অনেকবার করে তাকে ঘরে ডেকেছেন টের পেয়েছি। ধারণা, আমি কিছু বললাম কিনা সেই খোঁজখবর নিচ্ছেন, আর আশায় উদগ্রীব হয়ে আছেন।

একটানা দেড়দিন কথা বন্ধ থাকার পর বউদি আর চুপ করে থাকতে পারল না। বিকেলে আমি চা নিয়ে বসেছিলাম, ভয়ে ভয়ে বউদি মুখ খুলল।—তুমি আমার ওপর এমন রেগে আছ কেন?

এই প্রতীক্ষাতেই ছিলাম। ঝলসে উঠলাম, নিজেকে তুমি খুব বুদ্ধিমতী ঠাওরেছ, কেমন? বাবাকে দুর্বল দেখে তোমার এত সাহস যে আমার ব্যাপার নিয়ে তুমি তাঁর কাছে পর্যন্ত নাক গলাও—আর দিনের পর দিন তুমি বাইরের একটা লোককে প্রশ্রয় দাও? বাবা যে আমাকে নিয়ে খুব ভাবেন তাতে তোমারও খুব সুবিধে হয়েছে, না?

মিনমিন করে বউদি বলল, এ-সব কি কথা ভাই!

—থামো! তোমাকে আমি খুব ভালোরকম চিনেছি। নিজের কি বিয়ে হয়েছে সেটা হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছ বলেই আমাকে যেখানে খুশি ঠেলে দিয়ে মজা দেখতে চাও, কেমন? আর ওই লোকটা তোমার চোখে এত ভালো কেন—বাড়ির অংশ লিখে দিতে হবে না বলে?

ক্ষিপ্ত হবার ফলে আমার গলা কতখানি চড়েছিল আমি জানি না। বউদির সমস্ত

মুখ বিবর্ণ। কিন্তু আমার জ্বালা বরং তাতে বাড়ল। বলে উঠলাম, শোনো, তোমাকে খুব ভালো জানতুম, কিন্তু আর তোমার মুখের দিকে তাকাতেও আমার রুচি হয় না।

—অরু!

আমি ঈষৎ চমকে ফিরে তাকালাম। দরজা ধরে বাবা দাঁড়িয়ে, তার পিছনে দাদা। বাবার সমস্ত মুখ সাদা, কাঁপছেন ঠকঠক করে। বিস্ময় আর বেদনার শেষ নেই যেন। অব্যক্ত যাতনায় বিড়বিড় করে বললেন, বউমাকে তুই এত অপমান করলি...এ-রকম হয়ে গেছিস তুই...মুখের ওপর এইসব বললি বউমাকে!

বাবা ঘামছেন, কথা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পড়েই যাবেন বুঝি। বউদিই দৌড়ে এসে বাবাকে ধরল, তারপরেই দাদার উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল, কি-রকম করছেন দেখছ না! শিগগির শুইয়ে দাও!

ধরাধরি করে বাবাকে তাঁর বিছানায় এনে শুইয়ে দেওয়া হল। আমিও নিস্পন্দের মত এসে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলাম। বাবার অস্থিরতা দেখে মনে হল এক্ষুনি বুঝি প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। ভাগ্যের এমন বিভীষিকা আর বুঝি হয় না।

দুটো দিন দু'বেলা করে ডাক্তার আনাগোনা করল। আর আমি কেবল অদৃশ্য দেবতার পায়ে মনে মনে অবিরাম মাথা ঠুকলাম।

ফাঁড়া কাটল। স্ট্রোক হল না। তৃতীয় দিনে বাবা অনেকটা সুস্থ। সমস্ত রাত টানা ঘুমোলেন। সকালে বেশ খুশীমুখ। নিজের ওপর অপরিসীম ধিক্কারে আমি ঘরে যেতে পারিনি, আড়াল থেকে দেখছি। বউদি তাঁর শিয়রে বসে।

খানিক বাদে বাবা ডাকলেন আমাকে। আমি এলাম।

খুব সহজ মুখে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, বউমায়ের কাছে ক্ষমা চেয়েছিস?

বউদির অপ্রস্তুত মুখ একটু। আমি তার দিকে ফিরে তার চোখে চোখ রেখে বললাম, ক্ষমা করো বউদি।

বউদি উঠে বাবার সামনেই আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি নির্বাক। ভিতর থেকে বউদিকে যে ক্ষমা করতে পারিনি সে-শুধু আমিই জানি।

বাবার মুখখানা খুশীতে ভরপুর। ঘরের ছাদের দিকে চেয়ে যেন ভারি আনন্দের কিছু দেখছেন। বললেন, আর আমার কোনো ভাবনা নেইরে...ভোররাতে চমৎকার একটা স্বপ্ন দেখলাম...সুনন্দর সঙ্গে তোর সদ্য সদ্য বিয়ে হয়েছে, আর তোর ঠাকুমা আমাকে হেসে হেসে বলছে, তোর এই মেয়েটারই সব থেকে ভালো বিয়ে হবে বলেছিলাম কিনা —এখন দ্যাখ্।

পরিস্থিতিবিশেষে মুখের ক'টা কথায় অনুভূতির এতবড় বিপর্যয়ও ঘটে যেতে পারে? সেই মুহূর্তে আমার ভিতরে ভিতরে কি-যে হয়ে গেল আমি জানি না। প্রাণপণে নিজেকে সংবরণ করে আবার বউদির দিকে ফিরলাম। বললাম, আমি আর আপত্তি করব না, তোমরা ব্যবস্থা করো।

নিজেকে নির্দ্বিধায় বলি দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েই আমি যেন ঘর ছেড়ে চলে এলাম।

বাড়ির হাওয়া সরগরম। বিয়ের দিন এগিয়ে আসছে। বারণ করা সত্ত্বেও মনতুদা বাবাকে একটু বোঝাতে চেষ্টা করেছিল। বাবা জবাব দিয়েছেন, ও নিজেই মত

দিয়েছে...ভালোই হবে দেখো। পরে একসময় ঘরে ঢুকে দেখি ছোড়দি খুশীমুখে বাবাকে বলছে, খুব ভালো হয়েছে, চমৎকার হয়েছে—নিজের জোরে ব্যবসায়ে বড় হয়েছে, ক'জন পারে?

আমাকে পিছনে দেখে অপ্রস্তুত। বাইরে এসে ফিসফিস করে বলেছে, বিয়ে হচ্ছেই যখন খারাপ বলে লাভ কি বল্—ভালো বললে বাবা কত খুশী হয় দেখলি তো?

আমি হেসে ফেললাম। ছোড়দিটা চিরকালের ভীতু জানি।

বিয়ের কিছুদিন আগে বউদির ওপর মনে মনে আর একপ্রস্থ বিরূপ হয়েছি আমি। তার এত দেমাক যে বাবাকে বারকয়েক অনুরোধ করেছে, বাড়ির অংশ আমাকে আগেই লিখে দেওয়া হোক।

বাবাকে দো-মনা দেখে আমি বাবাকেই বকেছি।

আমার কেবল ভয় বাবা এ বিয়ের দরুন কোথাও ধার-ধোর না করে বসেন। আবার যে-ঘরে যাচ্ছি তার উদারতা দেখেও রাগ। জামা-বোতাম ঘড়ি যা-ই পছন্দ করার কথা বলা হয়, তার জবাবেই আপত্তি আসে, কিছু দরকার নেই—সব আছে।

এটা নতুন পয়সার দেমাক ছাড়া আর কিছু আমি ভাবতে পারিনি। বউদি ঠাট্টা করেছে, দেখেছ লোকটার কাণ্ড, তার কিছুই চাই না, কেবল আসল জিনিসটি পেলেই হল!

আমি তির্যক ঠেস দিয়েছি, সেটাই কি যথেষ্ট নয়?

কিছুদিন ধরে এই মর্যাদার আসনেই মনে মনে নিজেকে আমি বসিয়ে রেখেছি, সত্যি কথা।

বিয়ে হয়ে গেল।

সকলের চপল পীড়াপীড়িতে পাঁচ বার করে শুভদৃষ্টি হল। প্রতিবারই আমি খুব স্পষ্ট করে তাকিয়েছি। দেখেছি। আগে যা দেখিনি, এরই মধ্যে তাও যেন চোখে পড়েছে। ...ঠোঁট একটু পুরু জানি, চোখও তেমন বড় নয়...কিন্তু কান দুটোও যেন স্বাভাবিকের থেকে একটু লম্বা ধরনের।

যাবার আগে বাবাকে প্রণাম করলাম। বউদির চোখে জল দেখেও তার দিকে এগোলাম না। ধরা গলায় বাবা বলে উঠলেন, এ কি রে, তোর ঠাকুমার ছবি প্রণাম করলি না!

ঠাকুমার ফটোর দিকে এগোলাম। পিছনের জোড়ে-বাঁধা মানুষটাও। কেউ জানল না, আমি ঠাকুমার মুখের দিকে তাকাইনি। হাত জোড় করে প্রণামই করেছি শুধু। পাশের লোক বরং আমার থেকে অনেক বেশি প্রণাম করেছে।

উল্টোদিকের বাড়ি শ্বশুরবাড়ি। আমারই সম্মানে এ বাড়ির ভোল আর একদফা বদলানো হয়েছে। আমার ভাসুর সুনন্দর থেকে অনেক বড়। আমি বাড়িতে পা-দেওয়া মাত্র সেই মানুষটির ব্যস্ততা দেখবার মত। কি যে করবেন, কোথায় বসাবেন, কত ভাবে যত্ন করবেন ভেবে পাচ্ছেন না যেন। আমার নতুন জায়েরও সেই অবস্থা।

রাতের বউ-ভাতের উৎসব হয়ে গেল। বাড়ি নিঝুম হতে রাত প্রায় একটা।

ঘরের দরজা বন্ধ করে, আনাচে-কানাচে কেউ উঁকি দিচ্ছে কিনা দেখে নিয়ে আমার সামনে চেয়ার টেনে বসল। আমি নতুন শয্যায় বসে।

বলল, কেমন জব্দ?

আমি চেয়ে রইলাম।

বলল, কাল শুভদৃষ্টির সময় তুমি যে-ভাবে তাকাচ্ছিলে, আমি ভাবলাম ঠিক জিভ ভেঙাবে।

ঠোঁটের ডগায় হাসির আভাস ধরে রেখেছি। বললাম, ইচ্ছে ছিল। পারা গেল না।

হেসে উঠল।—এখন তো ঘরে কেউ নেই, ইচ্ছেটা এখন পূরণ করে ফেল।

বললাম, তাও পারছি না।

চুপচাপ চেয়ে রইল খানিক। তারপর সামনে ঝুঁকে এসে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, আমাকে তোমার এত অপছন্দ কেন?...আমি সবই জানি, মাঝখানে তোমার বউদি আর তোমার বাবা না থাকলে এ বিয়ে হতই না, কেন অপছন্দ?

জবাব না দিয়ে এবারে আমি চুপচাপ চেয়ে রইলাম।

এতেই ধৈর্য গেল যেন। উঠে এক ঝটকায় আলোটা নিভিয়ে দিল।

## ছয়

সুনন্দর তৃষ্ণার অনাবৃত দুর্দম রীতি অনেকসময় স্বেচ্ছাচারী স্থূল জুলুমের মত মনে হত। গোড়ায় গোড়ায় এর সঙ্গে আপস করে নেওয়াটা সহজ হয়নি খুব। তবু একে অস্বীকার না করেও জীবনযাত্রার এই নতুন পটভূমিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে বেগ পেতে হয়নি। আমার সে-স্বাধীনতায় অন্তত অনেকদিন পর্যন্ত কেউ হস্তক্ষেপ করেনি।

কিন্তু শুরুতেই আমি কতকগুলো ভুলের বীজ ছড়িয়ে বসেছিলাম।

প্রথম ভুল, নিজের এক বিশিষ্ট সত্তার স্পষ্ট ঘোষণা নিয়ে আমি এই নতুন জীবনে পদার্পণ করেছিলাম। তাতেও ক্ষতি ছিল না, যদি উপলব্ধি কবতাম সেই ঘোষণা আর একজনের মধ্যেও থাকতে পারে। উপলব্ধি করিনি।

দ্বিতীয় ভুল, যে স্থিতধী নিষ্ঠার ফলে এই দরিদ্রের সংসারে কমলার হাসি ঝলমল করে উঠেছে, আমি তাকে পুরুষকার ভাবিনি। তার কাজটাকে কখনো দরদের চোখে দেখিনি, সে-কাজের সঙ্গে কোনো সময় নিজেকে আমি মানসিকভাবে যুক্ত করিনি। তার কর্মক্ষেত্রে তাকে আমি নিঃসঙ্গ রেখেছি।

তৃতীয় ভুল, আবার গল্প আর কবিতা লেখা শুরু করে নিজস্ব যে আনন্দ জগৎ গড়তে চেয়েছিলাম, সেখানে বাইরের রসিকজনের আমন্ত্রণ ছিল, কিন্তু নিজের ঘরের লোকের সাদর অভ্যর্থনা ছিল না।

চতুর্থ ভুল, আর সেটাই বোধকরি সব থেকে বড় ভুল—নিজে বোকা বলেই এই ঘরের লোককে আমি তেমন বুদ্ধিমান ভাবিনি।

এতগুলো প্রাথমিক ভুল থেকে পরে খুঁটিনাটি আরো বহু ভুলের সূত্রপাত। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এই সব ভুলের একটাও বিদ্বেষপ্রসূত নয়। রাতের নিভৃতে যে মানুষটা প্রায় উদভ্রান্ত বাসনার দাস, দিনের আলোয় সে কাজের জাঁতায় আবদ্ধ। এ দুইয়ের বাইরে তার আর কোনো রূপ আমি দেখতে পেতাম না। আর এই জীবনের শুরুতে তার বিজেতার ভূমিকা বলে চেষ্টাও করিনি দেখতে।

দিনকয়েকের মধ্যেই সে আমাকে গাড়িতে পাশে বসিয়ে তার কারখানা দেখাতে নিয়ে গেছল। আগে যা শুনেছিলাম, ওষুধের কারখানায় অ্যালুমিনিয়ামের কৌটো সাপ্লাইয়ের ব্যবসা, ঠিক তা নয়। নানা আকারের অ্যালুমিনিয়াম কনটেনার তৈরি হয় ঠিকই, কিন্তু তার থেকেও বড় এবং সুচারু কাজ যা দেখলাম, তার নাম শুনলাম অ্যানোডাইজিং—অর্থাৎ অ্যালুমিনিয়ামের বিভিন্ন বস্তুর ওপর প্লেটিং করা। এইভাবে প্লেটিং করে ওষুধের কারখানার কনটেনার ছাড়াও বহু সৌখিন জিনিস বাজারে চালু করা হয়েছে। সৌখিন ছিটকিনি, বাথ-শাওয়ার, টাওয়েল হ্যাঙার, রং-বেরঙের বাটি গেলাস। জিনিসগুলো দেখলে চোখ টানে ঠিকই।...তখনো যদি মনে হত, শুধু ব্যবসা নয়, সেই সঙ্গে খানিকটা শিল্প-দৃষ্টি ভিন্ন এই সব হয় না!

গাল-ভরা নাম বটে, অ্যানোডাইজিং—কিন্তু কৌটোর ফ্যাক্টরি শুনেও এর থেকে বড় ধারণা ছিল আমার। বড় দুটো ঘরের আয়তনের এক ইঁটের ওপর করোগেটেড শেড একটা। সেখানেই স্পিনিং মেসিন, বল্ প্রেস, পাওয়ার প্রেস, ওয়েলডিং সেট, অ্যাসিড বাথ, জেনারেটর ইত্যাদি সরঞ্জাম। আর ওটুকুরই আর একধারে গোডাউন।

না বলে পারলাম না, এটুকু থেকেই তোমার এত রোজগার হয়?

পরিতুষ্ট মুখে জবাব দিল, যত আশা করছি তত আর কোথায় হয়?...দেখো না, বেশ মোটা টাকা ইনভেস্ট করতে পারলে সিঁড়ির ডেকরেটিভ হ্যান্ডল্, নানা রঙের গ্রিল আর গাড়ির ড্যাশ বোর্ডও তৈরি করব। মাথায় অনেক কিছু প্ল্যান আছে।

এরপর মনতুদা যখন জিগ্যেস করেছে, কি গো, তোমার কর্তার কৌটোর কারখানা কেমন চলেছে—ছদ্ম কোপ দেখালেও আমি মনের কথাই বলেছি।—কৌটো নয়, কনটেনার, আর বলবে অ্যানোডাইজিং।

আগ্রহ নিয়েই ছোড়দি আর মনতুদা একদিন ফ্যাক্টরি দেখে গেছে। আমি সঙ্গে ছিলাম এবং অস্বস্তি বোধ করছিলাম। পরে গাড়িতে উঠে মনতুদা আমাকে বলল, চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার বা লাখ-খানেক টাকা খাটালে এটা যদি বড় করে তোলা যায় তো সে চেষ্টা করতে বলো, টাকার ব্যবস্থা করা যাবে।

মনতুদা না হয়ে আর কেউ হলে আমি উৎসাহ বোধ করতাম কিনা সন্দেহ। কিন্তু মনতুদা এগিয়ে আসা মানেই গোটা জিনিসটার মর্যাদা বেড়ে যাওয়া। সুনন্দ বাড়ি ফিরতেই মনতুদার প্রস্তাব জানালাম তাকে।

—না!

এমনভাবে শব্দটা উচ্চারণ করল যে আমি হতচকিত কয়েক মুহূর্ত। পরে অবশ্য বলল, বড় একদিন আমি নিজেই করতে পারব।

তা সত্ত্বেও ওই অসহিষ্ণু না শব্দটাই আমার কানে লেগে থাকল। তার কাজের সঙ্গে আমার যোগও সেইখানেই শেষ।

বিয়ের দেড় বছরের মধ্যে রুমু এলো। ও হবার কিছুদিন আগে থেকে বাবা আমাকে নিজের কাছে এনে রেখেছিলেন। প্রথম সন্তানের মা হয়ে আমি আনন্দে আত্মহারা হইনি, আবার যে এলো তার অনাদরও করিনি। আমার মেয়ে রূপসী না হোক কুশ্রী কেউ বলবে না। তাছাড়া শিশুমাত্রেরই আলাদা একটা রূপ আছে। তবু মেয়েটা আরো সুশ্রী কেন হল না সে-কথা আমার মনে এসেছে।

বিয়ের দু'বছরের মধ্যে এখানে এই নতুন বাড়ি করে আমরা উঠে এসেছি। ব্যবসার উন্নতি হচ্ছিলই। আরো উন্নতির জন্য সেখানে সব টাকা ঢালার আগে বাড়ি করাটা আমি দরকার মনে করেছি। ভাসুর আর বড় জা আমাকে কত ভালোবাসে জেনেও আমি এই তাগিদ দিয়েছি। আমার পদস্থ আত্মীয় পরিজন অথবা কাব্য-সাহিত্য রসিকরা কেউ ওই একতলা দালানের নিজস্ব দখলের একখানা মাত্র ঘরে এলে আমি অস্বস্তিবোধ করতাম। মনতুদার কল্যাণে দু'চারজন নামী লোকও আসত। এমনও হয়েছে তখন যে আমি তাদের বাপের বাড়িতে বসার ব্যবস্থা করেছি। তাই জমি যখন কেনাই আছে, বাড়িটাই আগে তোলার কথা ভেবেছি। নতুন বাড়িতে আসার সময় ভাসুরের চোখে জল দেখেছি, বড়-জা তো কেঁদেই ভাসিয়েছে—আর মন আমারও খারাপ হয়েছে। পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে তারা আসবে না জানা কথাই। কিন্তু আমি কারো ওপর অবিচার করেছি ভাবিনি। যে মানুষের ওপর তাদের একান্ত নির্ভর, বাড়ি বদল করলেও সে নির্ভরতা কমিয়ে আনার কথা আমার কোনো সময়ে মনে হয়নি।

নতুন বাড়িতে এসে আমি নিজস্ব আনন্দ-জগৎ রচনায় মগ্ন হয়েছি। কবিতা আর গল্প লেখায় মন দিয়েছি; বাড়িতে সংস্কৃতির মজলিশ বসেছে। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ বেড়েছে। বলা বাহুল্য এ-ব্যাপারে প্রধান সহায় মনতুদা। মনে মনে এটা সর্বদাই অনুভব করতাম, এই একজন না থাকলে আমার জীবন অনেকখানি নীরস আর বিরস হয়ে যেত। মেয়ের জন্য মোটা মাইনে দিয়ে এক বয়স্কা ট্রেনড গভরনেস্ রাখা হয়েছে। তাকেও মনতুদার মারফতই পাওয়া গেছে। মেয়েটা তার কাছে দিব্বি থাকে। অতএব আমার অবকাশে টান পড়েনি।

এরই মধ্যে আমার ঘরের লোকের নিভৃতের তৃষ্ণা আমাকে ক্লেশ উতলা করে তুলতে লাগল। মনে হত এটা আরো বেড়েছে। তাই স্পষ্ট করেই একদিন জানালাম, আর ছেলেপুলে হোক সেটা আমার ইচ্ছে নয়।

মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল, একটাই যথেষ্ট?

—হ্যাঁ, ও-ই বেঁচে থাক। ছোড়দির তো একটাও হয়নি।

তেমনি চেয়ে থেকে আবার জিজ্ঞেস করল, তাহলে?

হেসেই জবাব দিলাম, তাহলে আবার কি. কতরকম ব্যবস্থা আছে, আজকাল আবার এক-গাদা ছেলেপুলে হয় কার?

ফট করে বলে বসল, এ পরামর্শটাও কি তোমার মনতুদার নাকি?

এই উক্তি আমার কান বিষিয়েছিল। আমার স্পষ্ট মনে হয়েছিল লোকটা মনতুদাকে ঈর্ষা করে। তবু রাগ না করে বলেছিলাম, না, এই পরামর্শটা আমার নিজেরই।

—ভালো কথা।

হাসতে হাসতেই উঠে গিয়ে কাজ নিয়ে বসেছিল। সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করেছিল। তার পরেও কটা রাত কাছে আসেনি। আমি নিজের সঙ্কল্পে অটুট থেকেই হাসিমুখে তার রাগ ভাঙিয়েছি।

না, আমার মধ্যে কোনো বিদ্বেষ ছিল না, শুধু ভুলই ছিল। কিন্তু সংসার-জীবনের কতগুলি ভুল যে বিদ্বেষেরই দোসর এ কে জানত!... অমরদা মস্ত স্কলার, মনতুদা যেমন বিদ্বান, তেমনি বুদ্ধিমান, আর ধনী হয়েও শিল্পানুরাগী মানুষ—অন্য যারা আসে এ-বাড়িতে

তারাও উঁচু পর্যায়ের রসিক—এ বৈষম্যটা আমি কিছুতে ভুলতে পারতাম না। ফলে তারা যখন আসত, আমি আদর অভ্যর্থনায় অনেক বাড়তি জাঁকজমক করে আর বাড়তি খরচ করে এই বৈষম্যটুকু ঢেকে রাখতে চাইতাম। বাড়িতে কাব্য-সাহিত্য ইত্যাদির ঘরোয়া বির্তকের আসর বসলে এই ঘরের লোককেই আমি নিরাপদ ব্যবধানে রাখতে চেষ্টা করতাম। আর সেটা নিজের উদারতাই ভাবতাম।

কিন্তু তবু অবকাশ থাকলে সুনন্দ এসে যোগ দিত। মাঝে-সাজে এটা সেটা মন্তব্যও করে বসত। আর আমার শঙ্কা বাড়ত। ছোটগল্পে কবিতার স্বাদ থাকতে পারে, এই আলোচনার মধ্যে একদিন তো বলে বসল, বাঘের গায়েও যেমন কবিতা লেখার মত সুন্দর ডোরা-কাটা দাগ থাকে। সকলে হেসে উঠল। মনতুদা তো ওর পিঠ চাপড়ে বাহ্‌বা-বাহ্‌বা করে উঠল। আমি ছদ্ম রাগ দেখিয়েই বললাম, আদার ব্যাপারী তুমি এ-সবের মধ্যে কেন, অ্যানোডাইজিং-এর প্ল্যান ভাবো গে যাও না!

এ-রকম কথা আরো বলেছি। ফলে মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়েছে তাও টের পেয়েছি। আর সেই কারণে আমিও বিরক্ত হয়েছি। কিছু বোঝার বুদ্ধি যদি থাকত!

খুঁটিনাটি অসন্তোষ বাড়তেই থাকল। যে-কোনো খুঁত ধরে কথা শোনাতে ছাড়ে না। মনতুদার দৌলতেই আমার দ্বিতীয় গল্পের বই ছাপা হল। সকলে খুশী। কিন্তু এই একজনের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠা দূরে থাক, উল্টে গম্ভীর। বইটা উল্টে-পাল্টে দেখল, বড় প্রকাশকের নাম দেখল। তারপর বলল, যে-ই ছাপুক, টাকা নিশ্চয় তোমার ঘর থেকে গেছে! কত লেগেছে জিগগেস করে দিয়ে দাও।

হতে পারে যা বলেছে তাই ঠিক, কিন্তু সেই মুহূর্তে কথাগুলো বিচ্ছিরি লাগল। মনতুদা আসতে তার সামনেই বললাম, কত খরচ হয়েছে তোমার বলো আর টাকা নিয়ে নাও—নইলে একজনের মান যাচ্ছে।

হা-হা শব্দে হেসে উঠে মনতুদা ওকেই বলল, তুমি একটি আস্ত মূষিক দেখি যে হে, এ-ভাবে তল-কাটুনী!

—কেন? আপনার শালী এমন লেখিকা যে প্রকাশক আগ্রহ করে এই বই ছেপেছে বলতে চান?

মনতুদা হাসিমুখে জবাব দিল, যে-ই ছাপুক, আমি বলতে চাই তুমি আমার প্রিয়সখী অর্থাৎ তোমার স্ত্রীরত্নটির কদর বুঝলে না।

ওমনি ঠাস করে মুখের ওপর জবাব দিল, সে-তো আপনারাই বেশ যত্ন করে বোঝাচ্ছেন।

মনতুদা অবাক। আর লজ্জায় আমার যেন মাথা কাটা গেল। অথচ এমন অশালীন উক্তির পরেও একটুও অনুতাপ নেই। উল্টে দুদিন ধরে আমার সঙ্গে প্রায় বাক্যালাপ বন্ধ।

অশান্তির রাশ টেনে না ধরলে সেটা বাড়তেই থাকে। গোড়ায় আমি আপসের চেষ্টা করি, কিন্তু সেটা যখন তোষামোদ ভেবে আরো বেশি বিরক্তি দেখায় তখন আমারও রাগ হয়ে যায়।

আরো অপমান বোধ হয় যখন কোনো অসুবিধের কথা বললেও এ কান দিয়ে শুনে ও কান দিয়ে বার করে দেয়। কদিন একটা ড্রাইভার রাখার কথা বলেছি। নিজে

ড্রাইভ করলে আমার দরকারে গাড়ি পাই না। ওটা কারখানাতেই আটকে থাকে। ড্রাইভার রাখলে দুজনের কারোই কোনো সমস্যা থাকে না।

ক'দিন কান না দেবার পর রাগত মুখেই বললাম, তোমার তো সময় নেই দেখছি, ড্রাইভারের ব্যবস্থা তাহলে আমিই করি? মুখের কথা খসালে মনতুদা ড্রাইভার এনে হাজির করবে সেটাও ও জানে।

—না। গাড়িটা আমার শখের জিনিস নয়, যখন তখন কাজে বেরুতে হয়, গাড়ি কারখানায় না থাকলে অসুবিধে।

সত্যি কিনা জানি না। আমি সত্যি ভাবিনি। এ-রকম স্বার্থপরতা দেখে আমার ঘেন্না ধরে গেছে।

আগে বাবাকে দেখতে যাব বললেই অবশ্য ঠিক-ঠিক সময়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে এসেছে। বাবা আজকাল বিছানা ছেড়ে উঠতেও পারেন না। এর পর সেজন্যেও গাড়ি চাওয়া ছেড়ে দিলাম।

গাড়ির জন্যে অবশ্যই আটকায়নি কখনো। মনতুদার গাড়ি আছে, ট্যাক্সি আছে। আড়াআড়ি করে ট্যাক্সিতেই বেশি চড়ি। তার চোখের সামনেই ট্যাক্সি ডাকিয়ে এনে বেরিয়ে যাই। রাগ বেশি হলে এক-এক সময় ইচ্ছে হয়, আর একখানা গাড়ি কিনে ফেলি। পঁচিশ-তিরিশ হাজার টাকা আমার নামে আমার পাসবইয়েতেই আছে এখন। আছে ইনকাম ট্যাক্সের ভয়ে বোধ হয়।

কিন্তু আসল গোঁ কি জন্যে বুঝতে আমার দেরি হয়নি। আমি উৎসব অনুষ্ঠানে বেরোই, সাহিত্য অধিবেশনে যাই, মনতুদার পার্টিতে যোগ দিই—এ-সবেই আপত্তি। এগুলো ঠেকানো যাচ্ছে না বলেই রাগ বাড়তে লাগল। ভালো কথা, রুমু হবার আগে নিয়মিত য়ুনিভার্সিটিতে না গিয়েও আমি এম. এ-টা পাস করে নিয়েছিলাম। ভালো না হোক একেবারে মন্দ রেজাল্টও হয়নি। মনতুদা জিগ্যেস করেছিল চাকরির যোগাড় দেখব নাকি।

তখন গা করিনি। কিন্তু এখন ঘরের লোকের ব্যবহারে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে চাকরি করলে কেমন হয়। বেশি রাগ হলে সে-কথা শোনাইও। একবার তো ওর সামনেই মনতুদাকে বলেছিলাম, আমার জন্য একটা চাকরি-বাকরি দেখো তো—এই দিনে মেয়েরা দিন-রাত ঘরে বসে থাকবে, এ যারা আশা করে তারা একটু বেশি আশা করে।

মুখ কালো করে উঠে চলে গেছল। মনতুদা জিজ্ঞাসা করেছিল, মানলীলা চলেছে?

রাগের মুখেও আমি হেসে ফেলেছিলাম।—আর বোলো না।

যা বলছিলাম, আমার নিজের ব্যাপারে বাইরে বেরুনো নিয়েই পষ্টাপষ্টি গণ্ডগোলের সূত্রপাত।...এক বেলার জন্য আমরা একদিন দল বেঁধে আউটিং-এ বেরিয়েছিলাম। দিদি-অমরদা, ছোড়দি-মনতুদা, জনা-দুই উঠতি সাহিত্যিক, আর মনতুদার জনা-তিনেক শাঁসালো অন্তরঙ্গ বন্ধু। সকালে গিয়ে সন্ধ্যায় ফিরেছি। এসেই দেখি মুখ হাঁড়ি একেবারে।

শুনলাম সমস্ত দিন কাজে মন দিতে পারেনি, কারখানা থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসতে হয়েছে—মেয়েটার এই অসুবিধে হয়েছে, ওই অসুবিধে হয়েছে, ইত্যাদি।

আমারও তক্ষুনি মেজাজ চড়ে গেল কেমন। মেয়েটার একটুও অসুবিধে হবার কথা নয়, কারণ সমস্ত দিনের বেশির ভাগ সময় মেয়ে এমনিতেও গভর্নেসের কাছেই থাকে,

আর বেশ ভালোই থাকে। তক্ষুনি ডাকলাম গভর্নেসকে, বেশ ঝাঁজের মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, উনি বলছেন, মেয়ের এই এই অসুবিধে হয়েছে—কেন?

মেয়ে তখনো তার কোলে চেপে হাসছে। গভর্নেস বেচারী আমার মেজাজ দেখে হকচকিয়ে গেল। আর ওদিকের মুখ আরো থমথমে।

আরো মাসকয়েক পরের কথা।

দেশে ভয়ানক বন্যা হয়ে গেছে। কত জায়গায় কত যে ক্ষতি হয়েছে ঠিক নেই। মনতুদা সবেতে আছে। তাদের সাহায্যের জন্য একটা নাটক মঞ্চস্থ হবে। সেই নাটকের লেখিকা আমি। এটা আমার প্রতি একটা দুর্লভ সম্মান। কারণ মনতুদাদের যে কালচারাল ইউনিট এই নাটক অভিনয় করবে তার মধ্যে জনাকতক নামজাদা শিল্পীও আছে। মনতুদা বলেছিল, শুধু নাম নয় বেশকিছু টাকাও আমার প্রাপ্য হবে। আমি সে-টাকাও ত্রাণের উদ্দেশ্যে দিয়ে দেব বলেছি।

রাত জেগে নাটক লিখে দিয়েছি। আমি উত্তেজনায় ভরপুর। কিন্তু তখনো ঘরের লোকের এতটুকু আগ্রহ দেখিনি। বরং সর্বদাই মহা বিরক্ত মুখ।

মনতুদার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে টিকিট বিক্রি করেছি। অবাক হয়ে দেখেছি পঞ্চাশ-পাঁচাত্তর-একশ টাকার টিকিটও কত সহজে বিক্রি হয়ে যায়। নাটক রচয়িত্রী সঙ্গে থাকার দরুনও সর্বত্র সমাদর। মনতুদা সেদিন খুশিমুখে বলছিল, তোমার কদর দেখলে প্রিয়সখী!

সেই মুহূর্তে আমার ঘরের কথাই মনে হয়েছিল। সেখানে এর অর্ধেক কদর দেখলেও দ্বিগুণ আনন্দ হত।

মনতুদার বাড়িতে পুরো দমে রিহার্সাল হয় বিকেলের দিকে। আমি রোজই ছুটি সেখানে। ফিরতে এক-একদিন রাত হয়। মনতুদার গাড়িতে যাতায়াত করি।

সেদিন সকাল থেকে গভর্নেসের দেখা নেই। এ-রকম কখনো হয় না। দুপুরে সুনন্দ খেতে এলে বললাম, মহিলা আজ এলো না, একটা খবরও দিল না, কি করে যে বেরোই আমি—

খেতে খেতে গম্ভীর মুখে জবাব দিল, গভর্নেস আর আসবে না।

আমি হতভম্ব।—তার মানে?

—সে অন্য জায়গায় বেশি মাইনের কাজ পেয়ে চলে গেছে।

আমি তেতে উঠলাম তক্ষুনি।—তোমাকে বলে গেছে?

—হ্যাঁ।

—একটা লোক না দিয়ে চলে গেল, আর তুমি তাকে ছেড়ে দিলে? আমাকে একবার বলারও দরকার মনে করলে না?

—তোমার দেখা আর কতক্ষণ পাওয়া যায়।...কারো ভালো হলে তাকে আটকাবই বা কেন?

আমার কেমন খটকা লাগল।...এই মানুষটাই ওকে তাড়ায়নি তো! জিগ্যেস করলাম, ভালো কাজটা সে কোথায় পেল?

—আমার ডাক্তার বন্ধুর নার্সিং হোমে, সেখানে অনেক বাচ্চা-কাচ্চা, একজন ট্রেনড় গভর্নেস দরকার—

ডাক্তার বন্ধু রণেন দত্ত দু'তিন দিন বাড়িতে এসেছে। আলাপ আছে। সোজা বেরিয়ে

এসে আমি টেলিফোন তুলে নিলাম। ডায়েল করছি, এরই মধ্যে খাওয়া ফেলে উঠে এলো।

—কোথায় টেলিফোন করছ?

—রণেন দত্তকে। সে কিভাবে আমার লোক ছাড়িয়ে নিয়ে যায় জিগেস করব।

—টেলিফোন রেখে দাও, সে ছাড়িয়ে নেয়নি। তার দরকার শুনে আমিই ছেড়ে দিয়েছি।

সঙ্গে সঙ্গে আমার ধৈর্য গেল।—তুমি এত নীচ!

একেবারে গায়ের কাছে এগিয়ে এলো।

—কি বললে?

—কি বললাম বেশ ভালোই শুনেছ!

ঘোরালো চোখে চেয়ে রইল একটু।—হ্যাঁ আমি নীচ, চেষ্টা করলে তুমি আমাকে আরো অনেক নীচে নামাতে পারো, বুঝলে?

খাওয়া ফেলেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। রাগে দুঃখে আমি স্তব্ধ।

বিকেলের দিকে গাড়ি আসতে রুমুকে সঙ্গে নিয়ে বেরোলাম। তাকে বাপের বাড়িতে বউদির কাছে রেখে আমি রিহার্সালে চলে গেলাম। আসার সময় তাকে নিয়ে এলাম।

এই ভাবেই চলতে লাগল। যাবার সময় রুমুকে বাবার ওখানে দিয়ে যাই, আসার সময় নিয়ে আসি। দেখতে দেখতে বাড়ির বাতাস ঘোরালো হয়ে উঠল। বাক্যালাপও বন্ধ।

সেদিন স্টেজ রিহার্সাল। আর দিন দশেক বাদে নাটক মঞ্চস্থ হবে। মনতুদার ধরা-করায় মাঝে একদিন স্টেজ খালি পাওয়া গেল।

সেই দিনই দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর গম্ভীর মুখে সুনন্দ আমার সঙ্গে কথা বলল।—আজ বেরোবে না, সন্ধ্যার পর এক জায়গায় যেতে হবে।

আজকের দিনে এ-কথা শুনলে মাথা কার ঠিক থাকে? তবু ব্যাপার বোঝার জন্য সংযত মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায়?

—রণেনের বিয়ে। বিশেষ করে যেতে বলেছে।

শোনামাত্র ভিতরে ভিতরে জ্বলে উঠলাম। আগে বললে মনতুদা হয়ত এই দিনে স্টেজ রিহার্সালই ফেলত না! আমি ধরে নিলাম আমাকে জব্দ করার জন্যেই বলেনি।

—বিয়েতে যাওয়া সম্ভব নয়, আমার আজ স্টেজ রিহার্সাল আছে।

সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গভরা কুৎসিতই দেখালো মুখখানা।—তোমার স্টেজ রিহার্সাল কি-রকম, অভিনয়ও করছ নাকি?

আমিও জবাব দিলাম, করার জন্য ওরা সাধাসাধি করেছিল। অভিনয় করছি না, স্টেজ রিহার্সালে আমার থাকা দরকার।

কাছে এগিয়ে এসে বলল, কিন্তু আজ আমি তোমাকে নিষেধ করছি!

—আমার নিষেধ শোনার উপায় নেই, কি করব বলো!

গলার স্বর আরো কঠিন পর্দায় চড়ল।—কি করবে তাই তোমাকে বললাম। আজ তুমি কোথাও বেরুবে না, আমার সঙ্গে যাবে!

—আর সেকথা শোনা যদি আমার পক্ষে সম্ভব না হয়?

—হতে হবে! না হলে তার ফল আরো অনেক খারাপ হবে, বুঝলে?

আমি নির্বাক। রাগে অপমানে ঘণ্টা দুই পর্যন্ত কেঁপেছি থরথর করে। তারই মধ্যে টের পেয়েছি লোকটা আর কারখানায় গেল না। আমাকে পাহারা দেবার জন্যই যেন বসে রইল। মনতুদার গাড়ি আসতে বাড়িতে কাজ আছে বলে সেই গাড়ি ফিরিয়ে দিল। খানিক বাদে মনতুদা টেলিফোন করেছে টের পেলাম। জবাব সে-ই দিচ্ছে কানে এলো। বাড়িতে দরকার আছে, তাই যাওয়া সম্ভব হল না। মনতুদা হয়ত আসার জন্য অনুরোধ করেছিল। তার জবাবে এদিক থেকে সাফ জবাব গেল, বাড়ির দরকারটা শখের রিহার্সালের থেকেও বেশি।

অপমান হবার ভয়েই মনতুদা টেলিফোনে আর আমাকে ডাকেনি।

রাগে অপমানে আমি দিশেহারা, নিস্পন্দ।

বিকেলে রুমুকে নিয়ে বেরুতে দেখলাম। এক ঘণ্টার মধ্যে তাকে বাপের বাড়িতে রেখে উপহারের প্যাকেট হাতে ফিরল।

সন্ধ্যার আগেই মুষলধারে বৃষ্টি।

সন্ধ্যে গড়িয়ে গেল বৃষ্টি ছাড়ল না। হঠাৎ এক সময় উঠে এসে বলল রেডি হয়ে নাও।

রেডি হতে আমার দশ মিনিটও লাগল না। যে সাজে রেডি হলাম তার থেকে বেশি সাজ আমি রিহার্সালে যাবার সময়েও করে থাকি। ক্রূর গাম্ভীর্যে দেখল একটু, কিছু বলল না।

দুজনে পাশাপাশি বসে আছি। মাঝে দুস্তর ব্যবধান। একহাঁটু জল ভেঙে সে গাড়ি চালাচ্ছে। বিয়েবাড়ি কাছে নয়।

হঠাৎ একজায়গায় বেশি জলে গাড়িটা থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ভিতরে আমার একটা উৎকট আনন্দ হল।

রাতের অন্ধকারে ঠায় দেড় ঘণ্টা আমরা সেই জলের মধ্যে বসে রইলাম। ইতিমধ্যে রাস্তার লোক এগিয়ে এসেছে গাড়ি ঠেলার জন্য। গাড়ির মালিক বলেছে দরকার নেই।

আমি সেই থেকে নির্বাক। মানুষটা ঘাড় ফিরিয়ে মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আবছা অন্ধকারে সেই মুখ আর চাউনি আরো কুৎসিত, আরো হিংস্র মনে হচ্ছে আমার।

হঠাৎ সবিস্ময়ে একসময় দেখি গাড়ি চলতে শুরু করল! দুপুরের পর এই প্রথম আমি কথা বললাম।—এতক্ষণ গাড়ির কল বিগড়েছিল, না তোমার?

উগ্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিড়বিড় করে জবাব দিল, আমরা কোনো শোকের বাড়িতে যাচ্ছি কিনা তাই ভাবছিলাম।

নির্বাক আমি চেয়ে চেয়ে দেখলাম, দেড় ঘণ্টা ভাবার পর গাড়ি বাড়ির দিকে ফিরে চলেছে। আমার বাইরেটা যত স্থির, ভিতরটা তত কঠিন।

রাত্রি।

মেয়েকে আনা হয়নি। টেলিফোনে কি বলে দিয়েছে আমি জানি না।

তখনো যে চরম কিছু বাকি, ভাবিনি।...মানুষটা ঘরে এসেছে। নীরব কিন্তু হিংস্র। নিঃশব্দে দখল নিতে এগিয়ে এলো। আমি বিস্ফারিত চোখে দেখছি তাকে। বিদ্বেষের ঝাপটায় ওই মুখ ক্ষতবিক্ষত করে দিতে চেয়েছি। কিন্তু ক্ষতবিক্ষত হয়নি। উল্টে আমিই এক নির্মম নিষ্ঠুর গ্রাসের অতলে ডুবে গেছি।

একদিন নয়, পর-পর সাতদিন মানুষটা বাড়ির বার হল না। কাজে গেল না। শুধু রাতের প্রতীক্ষা, গ্রাসের প্রতীক্ষা। সাতটা দিন আমি যেন একটা পশুকবলিত হয়ে ছিলাম।

ইতিমধ্যে মনতুদা ফোন করেছে, চিন্তিত হয়ে বাড়িতে আসতে চেয়েছে। আমি বাধা দিয়েছি। আসতে বারণ করেছি।

বিকৃতি কতদূর গড়াতে পারে আমারও দেখার সঙ্কল্প। আমার একটা স্নায়ুও তখন নিজের বশে নেই।

সাত দিন পরে মাথা থেকে ওই পশুটাকে বিদায় হতে দেখলাম। শান্ত, ঠাণ্ডা মাথায় আবার কাজ-কর্মে মন দিতে চেষ্টা করল।...চেষ্টাই শুধু।

কিন্তু আমি চেষ্টাই বা করব কেমন করে? কি করে ঠাণ্ডা হব, শান্ত হব?

## সাত

পরের তিন বছর সাড়ে তিন বছরের মধ্যে যে বিপর্যয় একে একে ঘটে গেল তার জন্যে আমি নিজে কতটা দায়ী সে হিসেব করিনি। একেবারে শেষের প্রান্তে এসে না দাঁড়ানো পর্যন্ত আমার চেতনা ফেরেনি।

ওই সাত দিনের ঘটনার দেড় মাসের মধ্যে আমি টের পেয়েছি আবার সন্তান আসছে। আব আমার মাথায় তখন শুধু আত্মধ্বংসী আগুনই জ্বলছে। আমি যেন তখন সব-কিছুর একটা শেষ জবাব দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম।

ঠিক এই সময়েই বাড়ির মালিক শুধু যেন আমাকে জব্দ করার জন্যেই নীচের তলায় আমার বসার ঘরটা দুজন অজানা অচেতনা বুড়ো-বুড়ীকে ভাড়া দিয়ে বসল।

ভুবন দাস আর তাঁর স্ত্রী।

কোথা থেকে এসে বাড়ির দাওয়ায় ঘন্টাখানেক বসে রইল। দোতলা থেকে লক্ষ্য করলাম থেকে থেকে দুজনে বেশ হাসছে। বুড়ীর কপালে আগের দিনের পয়সার মত মস্ত টকটকে সিঁদুরের টিপ। ওঁদের মুখের অত হাসিই বোধহয় আমার লক্ষ্য করার কারণ। আমি সেই দেড় মাস যাবৎ হাসতে ভুলেছি। আমার মেয়ে পর্যন্ত আমাকে দেখলে ভয়ে ভয়ে দূরে সরে থাকে।

খানিক বাদে নীচের সিঁড়ির আধা-আধি নেমে দেখি সেই বুড়ো-বুড়ী সুনন্দর সঙ্গে কথা কইছেন। তাঁদের দুজনারই মুখে হাসি যেন চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে। অথচ আমাদের একটা ঘরে থাকার আবেদন জানাচ্ছেন তাঁরা। বুড়োটি বলছেন, যেখানে থাকেন তাঁরা সেখান থেকে হারামজাদারা একেবারে বিনা কারণে উচ্ছেদ করেছে তাঁদের—

বুড়ী ফোঁস করে উঠলেন, আ-হা, ভীমরতি ধরেছে তোমার? একপাল ছেলেপুলে, ঘরের দরকার ছিল না ওদের? বেঁচে থাক সব—

বুড়ো ওমনি চোখ পাকালেন, তা বলে ওরা মামলা করবে? সুনন্দর দিকে ফিরলেন, মুখে সেই চোয়ানো হাসি। বুঝলে বাবা, যেই শোনালে মামলা করবে, আমরা তক্ষুনি বোঁচকা আর প্যাঁটরা নিয়ে বুড়োবুড়ীতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম, থাক বাবা, তোরা সুখে থাক—

পরের বক্তব্য, তিন দিন ধবে একটা অতি বাজে হোটেলে এক কাঁড়ি করে টাকা

শুনে রাত কাটাচ্ছেন দুজনে, আর সমস্ত দিন ধরে ঘর খুঁজছেন। কিন্তু আগাম টাকা গুঁজে দিতে চাইলেও কেউ ঘর ছাড়ে না, আসলে কেউ বিশ্বাসই করে না যে সত্যি-সত্যি টাকা দিয়ে তাঁরা থাকতে পারেন।...এখানে বসে থাকতে থাকতে শুনেছেন, এতবড় বাড়িটাতে মাত্র আড়াইটে প্রাণী থাকা হয়, তাই আশা নিয়ে এসেছেন। তক্ষুনি ঝোলা থেকে এক বাণ্ডিল নোট বার করে বুড়োটি ওর হাতে গুঁজে দিতে চেষ্টা করলেন।—বিশ্বাস করো বাবা টাকা আমাদের আছে, এই হাজার টাকা তুমি যত মাসের খুশী আগাম ধরে নাও—একটা ঘরে আমাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই দাও। সময় তো হয়ে এলো, শেষে কি তোমাদের নামে নালিশ নিয়ে খেয়া পাড়ি দেব—নাকি বুড়োবুড়ী দুটোতে মিলে রাস্তায় পড়ে মরে থাকব!

আমি বোকাচোখে তাঁদের মুখের সেই অদ্ভুত হাসি দেখছি। হাসিটা নালিশের কল্পনায় কি রাস্তায় পড়ে মরে থাকার দৃশ্য মনে করে জানি না।

সুনন্দর কথা কানে এলো, এতক্ষণ সেও হাঁ করে দেখছিল তাঁদের। বলল, টাকা পরে দেবেন—সামনের এই ঘরটায় থাকার ব্যবস্থা করে নিন।

সেই মুহূর্তে মাথায় বুঝি দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল আমার। আগুন আগেই জ্বলছিল। ওপরে এসেই স্যুটকেস গুছিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছি, ও এসে দাঁড়াল। দেখল।

—কোথায় যাচ্ছ?

দু'চোখে ভস্মের আগুন নিয়ে জবাব দিলাম, যমের বাড়ি, তোমার সে খোঁজে দরকার কি?

—যেখানেই যাও, খোঁজ আমাকেই নিতে হবে। যাচ্ছ কোথায়?

হঠাৎ খুব কঠিন আর সেই সঙ্গে খুব ঠাণ্ডাও হয়ে গেলাম আমি।—এখন বাবার ওখানে, পরে কি করা যায় ভেবে ঠিক করব।

—এর দরকার হল কেন, ওঁদের ঘর ছেড়ে দিলাম বলে?

জবাব দিলাম না। ও আবার বলল, কি করা যায় ঠিক করার মালিক তুমি?

—তাই তো জানি।

এক সর্বনাশা আক্রোশেই বুঝি পেয়ে বসল আমাকে। বিকারগ্রস্তের মতই চিৎকার করে উঠলাম। অকথ্য গালাগাল করতে লাগলাম। ওই ভাষা আমার মুখ দিয়ে বেরুতে পারে নিজেও জানতাম না। ছোটলোক বলেছি, কাপুরুষ বলেছি, চরিত্রহীন লম্পট বলেছি, আবার ছেলেপুলে এনে আমার জীবন বিষিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে এতবড় ঘৃণ্য হীন সে, তাও বলেছি।

আর এই শেষটুকু শুনেই বোধহয় এই গালাগালের পরেও সে নির্বাক। স্যুটকেস ফেলেই আমি বেরিয়ে এলাম। সিঁড়ির মুখেও বুড়োবুড়ী হাঁ করে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে চেয়ে আছেন। ওপরের চেঁচামেচি তাঁদের কানে না আসার কথা নয়। আমার চোখের ঝাপটায় সভয়ে দুজনেই সিঁড়ির মুখ ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন।

আমি চলে গেলাম।

মনতুদাকে খোলাখুলিই বললাম, এভাবে আর চলছে না, মুক্তি চাই, যা হোক ব্যবস্থা করো।

মনতুদা বিমর্ষ, চিন্তিত। বলল, চলছে যে না, সে তো অনেকদিন ধরেই দেখছি।

অসহিষ্ণু মুখ করে ছোড়দি বলে উঠল, তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে, বাবার এই অবস্থা, কিছু একটা করে বসে মেরে ফেলবি? ক'দিন আর, তাঁকে যেতে দে—

ছোড়দির ওপর আমার রাগ হল। আমার এ অবস্থার জন্য বাবাই দায়ী। তবু আমার ব্যাপারে আঘাত পেয়ে চোখ বুজুক এ আর কে চায়?

মনতুদা পরামর্শ দিল, চুপচাপ থাকো এখন কিছুদিন, ছাড়া-ছাড়ি হলেও সেটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার কিছু নয়। আকছারই হচ্ছে। কিন্তু এ-ভাবে ছেড়ে দেবে কেন, নিজের আর তোমার মেয়ের ব্যবস্থা বুঝে নিয়ে তারপর যা করার ভেবে-চিন্তে করতে হবে।

আমি রেগে গেলাম, কেন, নিজের ব্যবস্থা আমি নিজে করতে পারব না?

মনতুদা হেসে বলল, তুমি না পারলে এ-দেশের কোনো মেয়ে পারবে না—সে কথা নয়, ভায়াবও একটু শিক্ষা হওয়া দরকার।

ঠিক বলেছে মনতুদা, শিক্ষা হওয়া দরকার। ওই লোককে কিছু একটা চরম শিক্ষা দেওয়া ছাড়া এই মুহূর্তে আর বোধহয় কিছুই আমি চাই না। তার শিক্ষার কথা ভেবেই বিকেলের দিকে বাড়ি চলে এলাম। শিক্ষা দিতে হলে আমারও চোখের ওপরেই থাকা দরকার।

মনের এই অবস্থায় অসহ্য লাগল ওই বুড়োবুড়ীকে। যে হাসি দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম, সেই হাসিই আমার চক্ষুঃশূল। তার ওপর ওই বুড়ী আদর করে গায়ে হাত পর্যন্ত বোলাতে আসে। আমি শুনি বা না শুনি, তাঁর নিজের গল্প বলা সারা। ভুবন দাস সুতোর ব্যবসা করতেন। বুড়ী একটাই হতভাগা ছেলে পেটে ধরেছিলেন। তার বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কোথাকার একটা ডাইনি মেয়ে নিয়ে ছেলে কোথায় পালিয়ে গেল। শোকে বউটা আত্মহত্যা করল। না, আর তারা ওই শত্তুরের মুখ দেখেননি—সেও আর মুখ দেখাতে আসেনি। বেঁচে আছে কিনা সে খবরও রাখেন না।

বুড়ী যেন আমার শাশুড়ী! তাকে দেখলেই আমার পিত্তি জ্বলে যায় এখন। মেয়েকে বকলে উপদেশ দিতে ছুটে আসেন, কপালে সিঁদুর না দেখে সেদিন তাঁর চোখ কপালে। বকাবকি করে সিঁদুরকৌটো হাতে ছুটে এলেন! আমি তাকে প্রায় অভদ্রভাবে বকে তাড়ালাম।

দিন দশেকের মধ্যে আমাদের ভিতরের অশান্তিটা তাঁরা ভালোই টের পেলেন। আর ধরে নিলেন তাঁদের ঘব দেওয়া হয়েছে বলেই এই অশান্তি। সেদিন বেলা এগারোটা নাগাদ বুড়োবুড়ী দুজনেই ওপরে এসে হাজির। সুনন্দ তখন কারখানায়।

দাসমশাই বললেন, আমরা চলে যাচ্ছি গো মা। বুড়ী বলল, আমরা এসে মা-লক্ষ্মীর মুখের হাসি কেড়ে নিলাম এ-কেমন কথা! আমাদের তো প্রায় চার কাল গেছে—তোমরা সুখে থাকো।

ওঁরা গেলেও ঘরের লোক একটু জব্দ হবে তাই তেতে উঠে মুখের ওপর জবাব দিলাম, হ্যাঁ যান, আগাম যা দিয়েছেন তাও নিয়ে যান।

পাঁচদিন আগে দু'মাসের ভাড়া দেড়শ টাকা ওর পকেটে গুঁজে দিয়েছিলেন দাসমশাই, তাও জানি।

বুড়ো মাথা নেড়ে বললেন, চাঁদপানা মেয়ে তোমার আমাকে দাদু ডেকেছে, ও-টাকা দিয়ে তাকে কিছু কিনে দিও। চলো গো—

স্তব্ধ বিস্ময়ে আমি দেখলাম, রাগ করা দূরে থাক, চার চোখে আমার ওপর যেন স্নেহ ঢেলে দিয়ে তাঁরা টুকটুক করে নীচে নেমে গেলেন।

একলা ঘরে আমার ভিতরটা কেমন করতে লাগল। কিন্তু চলেই যে যাবেন তাঁরা এ বিশ্বাসও করতে পারছি না।

খানিক বাদে নীচে নেমে এলাম। দেখি রান্না পর্যন্ত চড়েনি, তাঁরা বেরোবার জন্য প্রস্তুত। আমাকে দেখে দাসমশাই হেসে বললেন, চিঁড়ে গুড় বেঁধে আর ঝোলাঝুলি নিয়েই আমরা বেরিয়ে পড়লাম গো মা—পরে কোনো আস্তানা জুটলে এই রাজশয্যা নিয়ে যাব —কটা দিন তোমাদের কষ্ট হবে।

কি রকম যেন হয়ে গেলাম আমি। বললাম, আপনাদের কোথাও যেতে হবে না।

বুড়োবুড়ী দুজনেই সবিস্ময়ে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। আনন্দে আত্মহারা ভুবন দাস প্রায় ধমকের সুরেই বুড়ীকে বলে উঠলেন, দেখলি? শুনলি এখন? আমি তোকে বলিনি মায়ের আমার এমন লক্ষ্মী-শ্রী, তার ভেতরটা সব-সুন্দর না হয়ে যায় না! বলিনি তোকে? আর তারপরেও তুই কিনা আমার কান-ভাঙানি দিলি! আমার দিকে ফিরলেন, এমন হাসি আর এমন চাউনি আর বুঝি দেখিনি। বললেন, বাঁচালে গো মা বাঁচালে, কটা দিন নিশ্চিন্তে কাটিয়ে আবার বড় কষ্টে পড়তাম।

আমার চোখের কোণ দুটো সিরসির করে উঠল কেমন। একরকম ছুটেই পালিয়ে এলাম ঘর থেকে।

এরপর আর রাগ দেখালেও হাসেন ওঁরা, বলেন, ভেতর দেখে নিয়েছি গো মা তোমার—আর রাগলেও যাচ্ছি না, তাড়ালেও যাচ্ছি না।

ওদের প্রতি আমার আচরণের ব্যতিক্রমটা সুনন্দ যাতে টের না পায় সে-চেষ্টাও করি। বুড়োবুড়ী নিজেদের ঘরে বসে হি-হি করে হাসেন, কড়ি খেলেন, লুডো খেলেন। এই নিয়ে এক-একদিন ঝগড়াও বেধে যায় দুজনের—তখন পরস্পরকে গালি-গালাজ। তার আধঘণ্টা না যেতে আবার সেই হাসি।

এক-একদিন দেখি, নামা বা ওঠার সময় ওই সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে কি রকম সতৃষ্ণ চোখে ওদের বন্ধ ঘরের দিকে চেয়ে আছে। তাই দেখেও কে জানে কেন আমার রাগ হত, জ্বালা ধরত।

মানসিক অশান্তির মধ্যে ন'মাসে ছোট মেয়ে ঝুমু এলো।

আর তার ঠিক একবছর বাদে বাবা মারা গেলেন। আমার কষ্ট অন্য বোনেদের থেকে বেশি ছাড়া কম হয়নি। কিন্তু সেই সঙ্গে বাবার প্রতি অভিমানও আমি ভুলতে পারিনি।

আরো পারিনি কারণ ঘরের অশান্তি বেড়েই চলেছে। বাবা চলে যাবার পর থেকেই আমার কেবলই মনে হয়েছে সামনে কি-এক অনাগত দুর্যোগ হাঁ করে আছে। আর তারই ফলে আমি দিনকে-দিন বে-পরোয়া হয়ে উঠছি।

মানুষটা প্রায়ই কারখানা কামাই করে আজকাল। চুপ-চাপ ঘরে বসে থাকে। আর এক-একসময় ঘোরালো চোখে তাকায় আমার দিকে। কিন্তু আমি যে তাকে আর একটুও কেয়ার করি না, সেটা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিই।...ব্যবসার রোজগার কমে আসছে তা অনুমান

করতে পারি। এও ইচ্ছাকৃত আমার মনে হয়। দিন-রাত ঘরে বসে মতলব ভাঁজলে ব্যবসার আয় কমবে না তো কি?

রেষারেষি করেই আমি বাইরের যোগ বাড়িয়ে তুলেছি। দু'মেয়ের জন্য একটা ছেড়ে দু'টো ভদ্র-ঘরের আয়া রেখেছি। সে-জন্যে কারো অনুমতি নিইনি। ছোট মেয়েটাকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না বলেই ধারণা, তবু ওর অসুবিধে যাতে না হয় সেদিকে একটু বেশিই চোখ রেখেছি। তাব ওপর দাস-গিন্নি তো সর্বক্ষণই ওকে নিয়ে থাকতে চান।

আমার জন্যে মেয়েদের অসুবিধে যেটুকু দেখা যায়, আমার ধারণা তার সবটুকুই সুনন্দর আবিষ্কার। কিন্তু মুখে কিছু বলে না। বাক্যালাপ তো বলতে গেলে বন্ধই। যেটুকু বলার চোখ দিয়ে বলে।

কথা আমারও বিশেষ বলার দরকার হয় না। আমার নামের দুটো পাসবইয়ে সাতষট্টি হাজার টাকার মত আছে এখন দেখেছি। সে পাসবই আমার নিজের কাছেই থাকে। টাকার দরকার হলে চাইতে হয় না, সোজা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে আনি।

...রাতে অনেক সময় যখন ঘুম আসতে চায় না, তখনই শুধু অগোচরের ভয়ের অনুভূতি একটা। থেকে থেকে শুধু মনে হয় কিছু একটা ঘটবে। কিন্তু দিনের আলোয় এই দুর্বলতার আমল দিই না, বরং দ্বিগুণ বেগে চলি।

সেদিন মনতুদা বলছিল, তোমাদের যদি মান-অভিমান মিটে থাকে ভালো কথা, কিন্তু তোমার মত মেয়ে এ-ভাবে বসে থাকবে কেন, উপার্জনে মন দাও, তখন দেখবে ঘরেও কদর বাড়ছে।

ঘরের কদর বাড়ানোর তাগিদে না হোক, কথাটা কিছুদিন ধরে চিন্তা করছি আমি।

সেদিন এক সাহিত্য-চক্রের আলোচনা-চক্র থেকে রাতে বাড়ি ফিরে দেখি, সুনন্দ বিছানায় শুয়ে আছে আর বউদি তার মাথা টিপে দিচ্ছে। বাবা মারা যাবার পব থেকে বউদি মাঝে মাঝে আসা শুরু করেছে। বউদির সঙ্গে তার বরাবরই খাতির, আমার আড়ালে তাকে কিছু বলে বোধহয়। কারণ বউদি ভয়ে ভয়ে আমাকে দুই একটা উপদেশ দিতে আসে। এই দিন বকুনির সুরেই বলে উঠল, তোমার কি আক্কেল ভাই, ভদ্রলোক সেই থেকে মাথাব যন্ত্রণায় ছটফট করছে, গায়ে তাপও একটু উঠেছে মনে হয়, ওদিকে তোমার শুনলাম বিকেল থেকে দেখা নেই।

আমার স্নায়ু আজকাল এটুকুতেই তেতে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট। তবু ঠাণ্ডা মুখেই টিপ্পনি কাটলাম, তাতে কি, সেবা-যত্ন তো আটকায়নি দেখছি।

লোকটা ও-পাশ ফিরে ছিল, ছিটকে এদিক ফিরে চিৎকার করে উঠল, ও-সব গাড়োয়ানী ইয়ারকি এ-ঘরে করবে না।

বউদি অপ্রস্তুত। চোখে চোখ রেখে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম একটু। তারপর বউদির দিকে ফিরে বললাম, জ্বর তো বেশিই মনে হচ্ছে।

ঘর ছেড়ে চলে এলাম। একটু বাদে বউদি কি বলতে আসতে কঠিন মুখেই তাকে বিরত করলাম।—রাত হয়েছে বউদি, এখন বাড়ি যাও।

আধ-ঘণ্টা বাদে আবার ওর ঘরে এলাম। ঝুমু হবার পর থেকেই আলাদা ঘরে শোয়া আমাদের। এ ব্যাপারেও আমি কোনো আপস করিনি।

ও-পাশ ফিরেই শুয়ে আছে। বললাম, জ্বর বেশি কিনা বা ডাক্তার ডাকতে হবে কিনা জিগগেস করলেও গাড়োয়ানী ইয়ারকি হবে বোধ হয়?

জবাব দিল না বা এদিকে ফিরল না।

আরো মাস ছয়েক গেছে। ব্যবসার অবস্থা মনে হয় আরো খারাপ। আমার বদ্ধ ধারণা আমাকে জব্দ করার জন্যেই কারবারে মন নেই। আয় কমিয়ে আমাকে শিক্ষা দেবে।

কিন্তু শিক্ষা যে আর আমাকে দেওয়া যাবে না সেটা জানে না।

এই সময়ে আমি ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ করে বসলাম। এর সঙ্গে মনতুদা যুক্ত বলেই দ্বিধা করিনি। মনতুদা ছোড়দির সামনেই হঠাৎ আমাকে বলে বসল, তোমার কাছে তো টাকা আছে, হাজার ষাটেক টাকা আমাকে দাও তো!

আমি অবাক। দেখি ছোড়দি মুখ টিপে হাসছে। বললাম, একেবারে রাজভিখারী ভিখারিণীর কাছে কি ব্যাপার?

মনতুদা যা বলল তার সারমর্ম, টাকা আমারই জন্য চাইছে। খুব দাঁওয়ের ওপর বড় একটা জমি কেনা হবে বড়জোর পাঁচ-ছ'মাসের জন্য—মনতুদা পাকা খবর জানে, তা দ্বিগুণ দামে সে-জমির জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে দেখতে দেখতে, কারণ বিরাট সরকারী প্ল্যান্ট বসছে তার গায়েই। আমার কিছু টাকার যোগাড় থাকা দরকার বলেই মনতুদার এই ব্যবস্থা। পাঁচ ছ' মাসে ষাট হাজার টাকায় কম করে আরো ষাট হাজার ঘরে আসবে—এর কোনো মার নেই।

আসবে জানা কথাই। এই করে মনতুদাকে কত টাকা ঘরে আনতে দেখেছি ঠিক নেই। ছোড়দির উৎসাহ পেয়ে আমারও কেমন ঝোঁক চাপল। মনতুদাকে সুনন্দ হিংসেই করে জানি, কিন্তু মানুষটা কোন দরের একবার বুঝুক।

মানসিক উত্তেজনার মধ্যে সাত দিনের নোটিসে ব্যাঙ্ক থেকে ষাট হাজার টাকা তুলে মনতুদার হাতে দিলাম।

মনতুদা হেসে বলল, ব্যাঙ্কের আধুলি হাত-ছাড়া করেছ শুনলে ওদিকে আবার হার্টফেল করবে না তো?

আমি ঝাজ দেখিয়ে জবাব দিলাম, শুনে কাজ নেই—একবারে ডবল টাকার পাস বই সামনে ফেলে দেব।

ছ'মাস না যেতে একের পর এক বিপর্যয়। মা-গো! এতও পর পর কোনো জীবনে ঘটে!

প্রথম সূত্রপাত আমার দ্বিতীয় কবিতার বইটা কেন্দ্র করে। এবারে ঘরের টাকা খরচ করেই এটা ছেপেছি। টাকা তো তখনো আমার কাছে পাঁচ-ছ'হাজার ছিল।

এই বইটারও সুখ্যাতি হয়েছিল।

সেদিন ছোট মেয়ে ঝুমুর আয়া আসেনি। আমিই ওকে খাওয়াব। এর মধ্যে নতুন একটা সাহিত্যপত্রের তরুণ সম্পাদক দেখা করতে এলো। তারপর আমার কবিতা আর গল্পের শতমুখে প্রশংসা। সেই প্রশংসার উচ্ছ্বাসে আমি ভাসতে লাগলাম। মেয়েকে সময়ে

খাওয়াবার কথা ভুলে গেলাম। ওদিকে পাশের ঘরে দাস-গিন্নিও অসুস্থ, নইলে তাঁর অন্তত মনে থাকত।

ঘণ্টাখানেক বাদে সম্পাদক উঠে যেতে সিঁড়ির কাছে এসে ঝুমুর কান্নার আওয়াজ পেয়ে লজ্জিত হয়েই তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এলাম। তারপরই দু'চোখ বিস্ফারিত আমার।

আমার দুটো নতুন কবিতার বই ছিঁড়ে নিয়ে থমথমে মুখে সুনন্দ তাই জ্বালিয়ে দুধ গরম করছে। আর ঝুমু অদূরে বসে কাঁদছে।

দৃশ্যটা দেখামাত্র ওই আগুন আমার মাথায় জ্বলে উঠল। আমি পাগলের মত চিৎকার করে সেই ছেঁড়া আধপোড়া বই ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে বললাম, এ কি করছ?

সজোরে ঠেলে সরিয়ে দিল আমাকে। কঠিনমুখে বলল, কাছে এসো না, যা করা উচিত তাই করছি।

নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে আমি বই জ্বালিয়ে দুধ গরম হতে দেখলাম। সেই দুধ মেয়েকে খাওয়াতে চেষ্টা করে পারল না। ক্ষিপ্ত রোষে দুধের বোতল মাটিতে আছড়ে ভাঙল। ঘরের মেঝে ভাঙা কাঁচে ছত্রখান। মেয়ে দ্বিগুণ জোরে কেঁদে উঠল। তাকে বিছানায় ফেলে দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

আমার মাথায় আবার দাবানল জ্বলতে লাগল। ঝুমুকে তুলে নিয়ে আমি কোণের ঘরে রুমুর আয়ার কাছে দিলাম। বললাম, দুধ গরম করে খাইয়ে দাও।

সেই বেশেই বাড়ি থেকে বেরুলাম আমি। ট্যাক্সি নিয়ে সোজা মনতুদার বাড়ি। ছোড়দি আর মনতুদাকে সব জানিয়ে বললাম, এবারে সময় হয়েছে, ব্যবস্থা করো।

ছোড়দি নির্বাক। মনতুদাও অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তোমার মত মেয়ে বলেই এতদিন সহ্য করেছে, কিন্তু এরপর আর সহ্যই বা করবে কি করে!

—সহ্য করার আর দরকার নেই। আর এক কথা, ওই টাকাটা এবারে পাবার ব্যবস্থা করে দাও, আর বেশি লাভের দরকার নেই, যা পাবে তাই দাও, ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

মনতুদা বলল, ক্ষেপেছ! এর পর ওর হাতে টাকা দেবে, আগে একটু নাকের জলে চোখের জলে হোক, তারপর ভাবা যাবে।

এই প্রথম বোধহয় মনতুদার কথা আমার ভালো লাগল না। বললাম, তার দরকার নেই, তুমি এখনই জমি ছেড়ে দিয়ে যা পাও রেডি রেখো।

বাড়ি ফিরেই দেখি ডাক্তার এসেছে। দাস-গিন্নি বেশিরকম অসুস্থ। তিন চার দিনের জন্য আর বিশেষ কিছু ভাবার সময় পেলাম না। দাস-গিন্নি একটু ভালো হলেই আপাতত বাপের বাড়ি চলে যাব ঠিক করেছি। তারপর পরের ব্যবস্থা।

সন্ধ্যার পর সুনন্দ আমার সামনে এসে দাঁড়াল। ক্রূর দৃষ্টি।—তোমার এখন ডাইভোর্সই দরকার তাহলে, সে চেষ্টায় এগোচ্ছ?

আমি নিরুত্তর। তক্ষুনি মনে হল, ছোড়দি বউদিকে বলেছে আর বৌদি শোনামাত্র এই কানে দিয়েছে। এ সে ছাড়া আর কারো কাজ নয়। দাস-গিন্নির অসুখের মধ্যেই দাদা আর বউদিকে শুকনো মুখে আসতে দেখেছি এর কাছে।

জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল, তার আগে অনেক কিছু দেখবে

তুমি, অনেক কিছু দেখতে বাকি। ছাড়া-ছাড়ি হবার আগে দুজনের একজন শেষও হয়ে যেতে পারি—বুঝলে?

আমি এবারও নির্বাক, কঠিন।

ও চলে গেল। ভেবেছিলাম চূড়ান্ত কিছু নিষ্পত্তির আগে বাপের বাড়ি যাব।...না, সেখানে যাব না। তাহলে কোথায় যেতে পারি, ছোড়দির ওখানে? কেন জানি না, ভিতর থেকে সায় মিলছে না।

পরদিন সকালেই বউদি এসে হাজির। তার এই মূর্তি দেখে আমি অবাক, কথা শুনে আরো বিভ্রান্ত। কথা সুনন্দর সঙ্গেই কইছিল, আমি তখন ঘরের বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

বউদির এমন উত্তেজিত কণ্ঠস্বরও আর বোধহয় শুনিনি। এসেই সোজা ওর ঘরে ঢুকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি ওকে টাকা দেবেন আশা দিয়েছেন?

প্রশ্নটা শুনেই অবাক হয়ে আমি ঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়ালাম। সুনন্দ গম্ভীর মুখে খবরের কাগজ পড়ছিল। জবাব না দিয়ে বলল, বসুন।

আরো চাপা অসহিষ্ণু গলায় বউদি আবার জিজ্ঞাসা করল, আপনি ওকে টাকা দেবেন বলেছেন কিনা?

—ঠিক দেব বলিনি, বলেছি কি করা যায় দেখি।

—কি করে দেখবেন আমি জানি কিন্তু কেন? কেন আপনি টাকা দেবেন? কেন এভাবে দয়া করবেন? কেন আপনি অন্য দু'বোনের মত বাড়ির দাবি জানিয়ে অ্যাটর্নির চিঠি দিচ্ছেন না? আমি জানি শ্বশুরমশায়ের একমাত্র অরুকেই বাড়ির অংশ দেবার ইচ্ছে ছিল।—কোর্টে আমি বলব সে-কথা!

আমি হতভম্ব। সবই দুর্বোধ্য লাগছে।

সুনন্দ ঠাণ্ডা মুখে জবাব দিল, আপনার নির্বুদ্ধিতার জন্যেই এ-রকম হয়েছে, শ্বশুরমশাইকে উইল করতে দিলে এতটা হত না। কিন্তু ভাগাভাগির ব্যাপার তো পরের কথা, তার আগেই তো বাড়ি নিলামে যাবে। ছেলেপুলে নিয়ে তখন দাঁড়াবেন কোথায়?

বউদির দিকে চেয়ে যাতনা-ক্লিষ্ট ধৈর্যের অবসান দেখছি। বলে উঠল, আমি কোথায় দাঁড়াব সে দেখার দায়িত্ব আপনার নয়, রাস্তায় দাঁড়াব, চোখের সামনে ছেলেপুলে মরতে দেখব—তাতে আপনার কি?

আরো ঠাণ্ডামুখে সুনন্দ জবাব দিল, আমার কর্তব্য। চোখ বোজার আগে শ্বশুরমশাই একমাত্র আমাকেই বলে গেছলেন, ওদের দিকে চোখ রেখো।

বউদি বলে উঠল, বেশ, দয়া যদি করতে চান, দুদিন ধরে আমি যা বলছি তাই করুন। বাড়ি বিক্রি করে দিন, মর্টগেজের টাকা মিটিয়ে দিয়ে যা থাকে আপনারা তিনজন ভাগ করে নিন।

খবরের কাগজ ফেলে সুনন্দ উঠে দাঁড়াল। তেমনি ঠাণ্ডা গলায় স্পষ্ট করে বলল, আমার কর্তব্য কি আমি জানি বউদি, মর্টগেজ থেকে বাড়ি খালাস করে দেব—তারপর অন্য দুজনের কর্তব্য কি তাঁরা বুঝবেন।

আমার পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমি বিমূঢ়। পায়ে পায়ে বউদির কাছে এলাম—কি হয়েছে?

—তুমি কিছু জানো না?

আমি মাথা নাড়লাম, জানি না।

রাগত স্বরে বউদি বলে উঠল, এমন মহাদেবের মত স্বামী তোমার, আমাদের জন্য এত বড় ঘা খেতে চলেছে, আর তুমি তার খবর রাখারও দরকার মনে করো না?

—বাজে বোকো না! কি হয়েছে?

শুনলাম কি হয়েছে। বাবা চোখ বোজার পর থেকে বড় লোক হবার নেশায় দাদা বেশ ভালো মত রেস খেলা ধরেছিল। সেই সঙ্গে স্পেকুলেশনও বাদ যেত না। বাবা অনেকবার বাড়ি উইল করে যেতে চেয়েছিলেন, আমাদের চারজনেরই প্রাপ্য বলে বউদি তা করতে দেয়নি, বিশেষ করে আমার কথা ভেবেই দেয়নি। নানা অছিলায় বাবাকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। উইল না করেই বাবা চলে গেছেন। এদিকে দাদা সেই বাড়ি বন্ধক রেখে এই দু'বছরের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা উড়িয়েছে। বন্ধকের দায়ে বাড়ি এখন নিলামে যেতে বসেছে। আর ওদিকে ঠিক এই সময়েই আমার দুই দিদি বাড়ির অংশ দাবি করে অ্যাটর্নির চিঠি দিয়েছে।

এও বিশ্বাস করব? বউদি চলে যাবার পরেও একলা ঘরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছটফট করে শেষে টেলিফোন তুলে নিলাম। ওধারে মনতুদার গলা পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা নাকি বাবার বাড়ির অংশ চেয়ে অ্যাটর্নির চিঠি দিয়েছ?

ওধারে মনতুদার হাসি।—দিয়েছি তো, তুমি ঘাবড়ে গেছ?

—তা একটু গেছি তো। কি ব্যাপার?

মনতুদা জানালো, ওই রাজপ্রাসাদের প্রতি তার অন্তত একটুও লোভ নেই। দাদার হাতে থাকলে ওটা একেবারে যাবে, তাই বাড়িটা রক্ষা করার জন্যেই তারা এই ব্যবস্থা করেছে। কোনো ভাবনা নেই।

কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে চেষ্টা করলাম। যা বলেছে ঠিক কথাই। কিন্তু তবু এতটুকু স্বস্তি পাচ্ছি না কেন মনে? আমার বাপের বাড়ি বিকিয়ে যাক এটুকুও চাই না। কিন্তু সেই জন্য এখান থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়ার উদারতাও বিঁধছে। আমিই যেন এক অবাঞ্ছিত ঋণজালে আটকে পড়লাম মনে হচ্ছে। বউদিকে আজও প্রীতির চোখে দেখি না আমি, আর এখন পড়ন্ত ঘরের লোকের অনুকূলে কিছু ভাবার মন নয়। তাই উল্টো চিন্তাই মাথায় আনতে চেষ্টা করছি।...বউদিকে ওই একজনের বরাবরই পছন্দ, আমাকে এ-পরিবারে টেনে আনায় একমাত্র সে-ই সহায় হয়েছিল। উদারতা সেই কৃতজ্ঞতার বিনিময়েও হতে পারে। কিন্তু চিন্তা যে-ভাবেই করি ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বাড়ছেই।

দুটো দিন একভাবেই কাটল। নিঃসীম নীরবতা।

তৃতীয় দিন সকালের দিকে সুনন্দ এসে বলল, তোমার পাসবই দুটো বার করো তো—

আমি কি হঠাৎ চমকে উঠেছিলাম? একটু অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে থেকে ও আবার বলল, পাসবই দুটো চাইছি।

—কেন?

বিরক্ত মুখেই জবাব দিল, দরকার আছে।

কি দরকার আমি জানি। কিন্তু রাজ্যের অস্বস্তি। বললাম, পাসবইয়ে টাকা বিশেষ নেই।

ও বিমূঢ় মুখে চেয়ে রইল খানিক। কি বলছি তাই যেন বুঝতে পারছে না। দৃষ্টিটা ঘোরালো হল তারপর। টাকা আমি দিতে চাই না তাই ভাবছে বোধহয়। জিজ্ঞেস করল, টাকা নেই মানে?

বললাম, ষাট হাজার টাকা একটা জমির জন্য দেওয়া হয়েছে, পাঁচ-ছ'মাসের মধ্যে এক লাখ টাকার ওপর পাওয়ার কথা—সে-সময় হয়ে গেছে। ষাট হাজার টাকার ওপর এখন কত পাওয়া যাবে জানি না, যাই পাওয়া যাক, আমি দুই একদিনের মধ্যে এনে দিচ্ছি।

এমন চোখে চেয়ে রইল যে আমি ঘাবড়িয়ে গেলাম একটু। ও বলে উঠল, লাখ টাকার ওপর পাবে বলে ষাট হাজার টাকার জমি নিয়েছ! আমাকে কিছু না বলে! কোথায় জমি? কার জমি?...দেখি, জমির দলিল দেখি!

—সে-সব আমি কিছু জানি না, ছোড়দির কাছে থাকতে পারে। টাকা কবে চাই?

—কবে চাই? জমি না দেখে দলিল না রেখে তুমি ষাট হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছ? কাকে দিয়েছ? তোমার মনতুদাকে বোধহয়? তার দু'চোখে ব্যঙ্গ যেন উপচে উঠে আমার মুখের ওপর ঝাপটা মারতে লাগল। আরো জোরে চিৎকার করে উঠল, দিয়েছ কাকে —তোমার মনতুদাকে তো? এখন চাইলেই সে-টাকা তুমি আমাকে এনে দেবে, কেমন?

এবার আমারও সহিষ্ণুতায় ভাঙন ধরছে। সে যা ভাবছে আমার সে-রকম ভাবার কোনো কারণ নেই। ষাট হাজার টাকা মনতুদা একঘণ্টার মধ্যেই দিয়ে দিতে পারে সে আমি জানি। বললাম, চেঁচিও না, টাকা আজই চাই তোমার?

—আজই এনে দেবে? তোমার মনতুদার কাছ থেকে? ব্যঙ্গচ্ছটায় ওই মুখ বীভৎস দেখছি আমি। বলে উঠল, যাও নিয়ে এসো। লোক চিনতে যদি আমার এত ভুল হয় তাহলে তোমার সামনেই হাতের কব্জি দুটো কেটে ফেলব আমি। পরক্ষণে হা-হা শব্দে বেদম হেসে উঠল।—লাখ টাকা পাবার লোভে আমাকে না জিজ্ঞাসা করে ষাট হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছ তুমি! আবার সেই বিশ্রী হাসি। —যাও নিয়ে এসো, লাখ টাকার দরকার নেই, ষাট হাজারই নিয়ে এসো!

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে গেলাম। মুখের ওপর ওই টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিতে না পারা পর্যন্ত জ্বালা কমবে না। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, মনতুদার বাড়ির যত কাছে আসছি তত যেন কি এক অস্বস্তি আমাকে ছেঁকে ধরছে।

গিয়ে দেখি মনতুদা বাড়ি নেই। বারান্দায় ইজিচেয়ারে আধ-সোয়া হয়ে আছে ছোড়দি। সামনে চায়ের পেয়ালা। চোখে-মুখে ঝিমুনি-ভাব, রাতে ঘুম হয় না বলে প্রায়ই রাতে আজকাল ঘুমের ওষুধ খায় শুনি।

বললাম, মনতুদা কোথায় গেছে? তাকে খুব দরকার আমার। কখন ফিরবে বলেছে?

নির্লিপ্ত মুখে ছোড়দি ঠোঁট উল্টে দিল। অর্থাৎ কিছু জানে না। তারপরেই দু'চোখ কেমন খরখরে দেখলাম ছোড়দির, অস্বাভাবিক টান-ধরা মুখ।—কেন, কি দরকার তাকে?

বললাম কি দরকার। বললাম, ষাট হাজার টাকা এক্ষুনি না পেলে আমার মান-সম্ভ্রম সব যেতে বসেছে ছোড়দি!

ছোড়দি সোজা হয়ে বসল। আমাকে একেবারে তাজ্জব করে দিয়ে কি-রকম যেন হেসে উঠল।—মান-সম্ভ্রম! তোর? এত দিনে তোর টনক নড়েছে তাহলে? হাসছে। —ষাট হাজার টাকা চাই? হাসছে।—দেবার সময় মনে ছিল না? হাসছে।—ষাট হাজার ছেড়ে ষাট টাকাও তুই কোনোদিন ফিরে পাবি না—বুঝলি?

আমি কি দুঃস্বপ্নের ঘোরে কিছু দেখছি, কিছু শুনছি? শরীর কাঁপছে, পায়ের নীচের মাটি সজোরে দুলে উঠেছে। তবু অস্ফুটস্বরে বললাম, কেন, জমি...

—জমি! আবার সেই বিচ্ছিরি হাসি।—ওরকম অনেক জমি, অনেক কিছু আজ পর্যন্ত ও হজম করেছে—বুঝলি? ওর হজম-শক্তির তুলনা নেই!

আমি কাঠ একেবারে। এ-কি ছোড়দিকে দেখছি না তার প্রেত দেখছি! বললাম, সব জেনেশুনে তুই আমাকে টাকা দিতে বলেছিলি!

রাগে ছোড়দির ঘোলাটে চোখ দুটো থমকালো, তারপরেই বিকারগ্রস্তের মত চেঁচিয়ে উঠল, কেন বলব না? তোর থেকে বড় শত্রু আমার আর কে আছে? তোর মনতুদার ঘরে একটা বউ দরকার ছিল, এমন বউ যে বাইরে তার সঙ্গে সমানে তালে পা ফেলে চলতে পারবে—টোপ ফেলতে পারবে। সেদিক থেকে তোর মত মেয়ের তুলনা হয় না—বিয়ের পর থেকেই এ-কথা শুনে আসছি। কেন করব না তোর সর্বনাশ? একদিন তুই ওকে চিনতে পারবি এই আশাতেই তো করেছি—আর ওই সুনন্দকে আক্কেল দেবার জন্যে—কতবার তাকে টেলিফোনে সাবধান করেছি ঠিক নেই—এত তেজ দেখায়, কিন্তু বিয়ে করেও তোর মত একটা মেয়েকে আটকে রাখতে পারল না কেন?

আমি স্তব্ধ, পাথর একেবারে।

ছোড়দির দু'চোখ ধক-ধক করে জ্বলছে। আবার বলে উঠল, তুই চাইলে টাকা এখন তোকে দিতেও পারে—বড় আনন্দে আছে, তোদের ছাড়াছাড়ি হবে—তখন আর তাকে পায় কে, তার হাতের মুঠো থেকে আর তোকে রক্ষাই বা করে কে? তার জালে পড়লে আর বেরুতেও ইচ্ছে করবে না তোর—খুব সুখে থাকবি! যা—দূর হ তুই আমার চোখের সমুখ থেকে—তোকে এই সব বলছি শুনলে আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলবে! ওকে আমি ভয় করি, এত ভয় পৃথিবীতে আর কাউকে করি না—যা যা, চলে যা এক্ষুনি এখান থেকে!

বাড়ি।

স্তব্ধ হতচেতনের মত বসে আছি। সুনন্দ কাছে এসেছে, তীক্ষ্ণ চোখে দেখেছে আমাকে। জিজ্ঞেস করেছে, টাকা পেয়েছ? পাওনি? পাবে না আমি জানি—আমি জানি —তা মি জানি।

আমি নির্বাক, নিস্পন্দ। এই মুহূর্তে নিজের মৃত মুখ দেখানো ছাড়া আর আমার কিছু কাম্য নয়।...থেকে থেকে কোনো একদিনের এক ছোকরার কথা মনে পড়ছে —রমেশ ভার্গব। তখনো ছোড়দির হিংসে দেখেছিলাম, রাগ দেখেছিলাম আমার ওপর। এও কি সেই বিকৃতি?

...কিন্তু মন থেকে জানি তা নয়। আজ এই জানার অনুভূতিটা কোথা থেকে এলো জানি না।

একে একে চার পাঁচ দিন কেটে গেল।...পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে বাবার বাড়ি নিষ্কণ্টক করা হল টের পেলাম। কোথা থেকে টাকা দিল জানি না। দাদা-বউদি দুজনেই এসেছিল। সুনন্দকে বলতে শুনেছি, দাদাকে বলছে, আপনার মেজবোন লোক ভালো, তার সঙ্গে আমার টেলিফোনে কথা হয়েছে, আমি আশা করছি সে সত্যিই কিছু দাবি করবে না—আর, ইচ্ছে থাক আর না থাক অমরদা দাবি ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছে, এখন দেখুন—

আমি নির্বাক শ্রোতা, নির্বাক দ্রষ্টা। ভগবান আমাকে অন্ধ করো না কেন, বধির করো না কেন? ক্ষণে ক্ষণে মাথা ঘুরে চোখে যে অন্ধকার দেখছি—তাতেই মুখ থুবড়ে পড়ে একেবারে শেষ অন্ধকারে ডুবে যাই না কেন?

টেলিফোন বেজে উঠল। সুনন্দ নীচে দাসমশায়ের ঘরে হয়ত, একটু আগে নীচে থেকে তার ডাকা-ডাকি কানে এসেছিল।

উঠে টেলিফোন ধরলাম।

পর-মুহূর্তে সভয়ে আঁতকে উঠলাম। আর্তনাদও করে উঠলাম বোধহয়। বউদি ফোনে জানাচ্ছে, গতকাল ছোড়দি ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছিল। তখুনি ধরা পড়তে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ফাঁড়া কেটেছে। পুলিসের কাছে ছোড়দি বলেছে, রাতের পর রাত ঘুম না হওয়ার যন্ত্রণায় এই চেষ্টা করেছে। সেই টানা-হেঁচড়া এখনো বাকি। হাসপাতাল থেকে ছোড়দি নিজের বাড়ি না গিয়ে এক-রকম জোর করেই দাদা-বউদির সঙ্গে তাদের ওখানে চলে এসেছে। এসেই বার বার আমাকে দেখতে চাইছে। এখনো দুর্বল খুব—

ফোন ফেলে ঝড়ের বেগেই আমি ছুটে গেছি।

ছোড়দি শুয়ে আছে। কাঁদছে। তাকে ঘিরে বসে আছে দাদা বউদি দিদি অমরদা। আমাকে দেখেই ছোড়দি অন্যদিকে মুখ ফেরালো।

আমি বলে উঠলাম, ছোড়দি এ তুই কি করেছিলি?

ওদিক ফিরে ছোড়দি আরো বেশি কাঁদতে লাগল।

ঘণ্টাখানেক ছিলাম। ছোড়দি পরে কথা বলেছে। তার থেকেও কেঁদেছে বেশি। কেবল বলেছে, আমি পাগল হয়ে গেছলাম, নইলে তোর সঙ্গে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করলাম কি করে!

কথায় কথায় দাদার মুখে শুনলাম ছোড়দির বর মনোতোষ চৌধুরীও হাসপাতালে গেছল। ছোড়দি জোর করে এখানে এলো বলে সে রাগ করে বাড়ি চলে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে মাথায় বুঝি খুন চাপল আমার। আমি যেন উন্মাদ হয়ে গেলাম। অসহ্য আক্রোশ, আর মাথার মধ্যে অসহ্য দাপাদাপি।...আমাকে একবার ওই লোকটাকে দেখতে হবে, ওই লোকের মুখোমুখি একবার অন্তত গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালাম। দাদা জিজ্ঞাসা করল, কোথায় চললি?

সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বললাম, ছোড়দির বাড়ি।

ছোড়দি চিৎকার করে নিষেধ করে উঠল, দাদা বাধা দেবার জন্য এগিয়ে এলো। কারো কথায় কান না দিয়ে এক দুর্জয় আক্রোশে আমি সোজা রাস্তায় নেমে একটা চলতি ট্যাক্সি থামালাম।

ওই বাড়িতে ঢোকার মুখে কি আমার বুক কেঁপে উঠেছিল? জানি না। শুধু জানি এক অব্যক্ত যাতনা আর অব্যক্ত তাড়না যেন আমাকে দোতলায় ঠেলে তুলেছিল।

মনতুদা আয়েস করে চা খাচ্ছে আর পায়ের ওপর পা তুলে খবরের কাগজ পড়ছে। আমাকে দেখা-মাত্র চিরাচরিত খুশীর অভ্যর্থনা।—এসো প্রিয়সখী এসো, সকাল বেলায়ই এত ভাগ্য আমার?

স্থির চোখে তার দিকে চেয়ে বললাম, দুর্ভাগ্যও হতে পারে। আমি ছোড়দি নই সেটা তোমার জানতে এখনো বাকি আছে।

—এ আবার কি কথা! হেসে উঠল, ছোড়দি নও বলেই তো তুমি প্রিয়সখী!

এই ডাক শুনে আজ গা ঘিনঘিন করে উঠছে। তবু খুব শান্ত কঠিন সুরে জিজ্ঞাসা করলাম, টাকাটা ফেরত দিচ্ছ না কেন?

—কিসের টাকা!...ও সেই টাকা! হাসছে।—সুনন্দকে দেবে?

আমি চেয়ে আছি। দেখছি। দেখতেই এসেছি।

হাসি কমে এলো। বলল, বেশ দেব—এক শর্তে। তোমাদের ছাড়াছাড়ি হবার কথা ছিল—তোমার যদি এখনো সেই মতলব থাকে তো দেব।

শরীরের সমস্ত রক্ত খুব ধীরে ধীরে মাথার দিকে চলেছে আমার। তবু প্রাণপণে সংযত রাখছি নিজেকে। জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর?

ছুরির ফলার মত দুটো চকচকে চোখ আমার মুখের উপর বিঁধিয়ে রেখে জবাব দিল, তার পর আশা করব তুমি খুব নির্বোধ মেয়ে নও। সুনন্দর সঙ্গে তোমার এ জীবনে বনবে না সেটা যদি বুঝে থাকো যা বলছি তাই করো।

দ্রুত, খুব দ্রুত চিন্তা করে নিলাম।—তাই করলে তুমি এক্ষুনি ওই ষাট হাজার টাকা দেবার ব্যবস্থা করবে?

ঠাণ্ডা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে তির্যক চোখে তাকালো।—যদি বলি হ্যাঁ?

—বেশ, টাকা দাও।

হঠাৎ সজোরে হেসে উঠল। কৌতুক যেন আর ধরে না। বলল, এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি এ-বাড়ির সিঁড়ি টপকে দোতলায় উঠেছ প্রিয়সখী!...আজ নয়, কোর্ট থেকে যেদিন তোমাদের ছাড়াছাড়ির রায় বেরুবে সেদিন দেব।

এরপর আর কি কথা হত বা কি করতাম আমি, জানি না। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। ফিরে দেখি সুনন্দ। পরে শুনেছি, আমি বেরিয়ে আসার পরেই ছোড়দির তাগিদে ব্যস্ত হয়ে বউদি তাকে টেলিফোনে জানিয়েছে আমি এখানে এসেছি। এই মানুষকে দেখে জীবনে বোধহয় এমন নিশ্চিন্ত আর কখনো বোধ করিনি। সেই মুহূর্তে আমি অনুভব করেছি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে আমি কোন নরকে এসে দাঁড়িয়েছিলাম!

বিরসমুখে হাসি টানতে চেষ্টা করে মনতুদা বলল, ভায়া যে, কি খবর...?

জবাব না দিয়ে সুনন্দ আমাদের দুজনকেই নিঃশব্দে দেখল খানিক। ওদিকে নতুন মানুষের গন্ধ পেয়েই যেন টাইগার—বাড়ির বড় অ্যালসেসিয়ানটা ফোঁস-ফোঁস করতে করতে ঘরে ঢুকল। আজ ওটাকে দেখা মাত্র অজানা আতঙ্কে আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। হাত বাড়িয়ে মনতুদা গলার বেল্ট ধরে ওটাকে নিজের কোলের কাছে টেনে নিল।

সেদিক ভ্রূক্ষেপ না করে নির্মম অনুচ্চ-কঠিন গলায় সুনন্দ আমাকে জিজ্ঞাসা করল, এখানে কেন এসেছ...টাকার আশায়?

আমি জবাব দিতে পারলাম না। জবাব মনতুদা দিল। ঠোঁটের ডগায় হাসি।

—ওর আসাটা নতুন কিছু নয়, তুমি হঠাৎ এখানে কোন আশায় হাজির তাই বলো দেখি ভায়া, শুনি—।

সুনন্দর নির্মম চাউনিটা আমার দিক থেকে এবারে তার দিকে ঘুরল। মনতুদা কুকুরের মাথায় হাত বোলাচ্ছে, ব্যঙ্গ-ভরা হাসি-হাসি মুখ। তার চোখে চোখ রেখে আবার বলল, হ্যাঁ, তোমার ওই টাকা কটা ও দিয়ে দেবার কথাই আপাতত বলছিল বটে।...তা আমি এক শর্তে রাজী হয়েছি, বলেছি তোমাদের ডাইভোর্সটা হয়ে গেলেই দিয়ে দেব, কিন্তু প্রিয়সখী তাতে রাজী নয়, আগে টাকা কটা ফেলে দেবার জন্য ঝোলাঝুলি করছে।

এবার আতঙ্কে আমার বুকের ভিতরে ঠকঠক শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, সুনন্দ এই মুহূর্তে কুকুর কোলে ওই লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে বুঝি।

কুকুরটা তার দিকে চেয়ে গোঁ-গোঁ শব্দ করে উঠল। তার মাথা চাপড়ে দিয়ে মনতুদা হেসে উঠল।—দেখলে? মনিবের ওপর কেউ চোখ রাঙাবে সেটা টাইগার পছন্দ করে না...এ-রকম আর একটা আছে। সোজা হয়ে বসল, সুন্দর হাসিমুখ মুহূর্তের মধ্যে বীভৎস কঠিন। বলল, আর এক মিনিট তোমাকে সময় দিচ্ছি, এরমধ্যে নেমে সোজা বাড়ির বাইরে চলে যাও, নইলে এরপর কোথায় যে তোমাকে যেতে হবে আমি জানি না—

এক মিনিটের মধ্যে তিরিশ সেকেন্ড বোধহয় চলে গেল। আমার ইচ্ছে করছে, পাগলের মত ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে আসি। কিন্তু পারছি না। ওর মুখের দিকে চেয়ে রোষের এত অব্যক্ত রূপ দেখছি। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখছি।

হঠাৎ ঝড়ের মতই নেমে চলে গেল। সেই মুহূর্তে একটা ঝাঁকুনি খেয়ে আমারও সংবিৎ ফিরলো। দ্রুত সিঁড়ির দিকে ছুটলাম আমি। পিছন থেকে মনতুদা ডাকল, যেও না, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

ততক্ষণে আমি নীচে। ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে এসেই থমকে দাঁড়ালাম। সুনন্দ গাড়িতে উঠে বসেছে। আমাকে দেখেও ক্ষিপ্ত হাতে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করল।

এক রাশ ধোঁয়া ছড়িয়ে গাড়িটা আমার চোখের ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমার দেহের সবগুলি স্নায়ু একসঙ্গে ছিন্নভিন্ন হয়ে মুখ থুবড়ে বিকল হয়ে গেল বুঝি। এক বিন্দুও শক্তি অবশিষ্ট নেই আর। মাটি কাঁপছে, পৃথিবীটা ঘুরছে, চোখে রাজ্যের অন্ধকার নেমে আসছে।

একটা ট্যাক্সি ধরলাম। তার পরেই বাড়ি ফেরার এক অসহ্য তাড়া। মনে হতে লাগল যে বেগে ও বেরিয়ে গেল তার নাগাল আর জীবনে আমি পাব না।

আর তখনি এক বিচিত্র বিস্ময় আমার, বিচিত্র অনুভূতি। আমি কেমন করে যেন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি, ওই একটা লোক ছাড়া আমি অচল, অস্তিত্বশূন্য। ওকে ছেড়ে আমার একদিনও চলেনি, একদিনও চলতে পারে না।...শুধু আজ নয়, আমার মধ্যে সেই এক তেরো বছরের মেয়েও জানত, ওই একজন তার আছে—জানত বলেই তার অত তেজ অত দাপট।

ট্যাক্সি থেকে অবশ পা দুটোকে সিঁড়ির দিকে টেনে নিয়ে এলাম। পায়ের নীচের

মাটি যেন আরো অস্থির। ওই সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠতে পারব কিনা জানি না।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে গেলাম। দাসমশাইয়ের হাসি। অসুস্থ দাসগিন্নীর সঙ্গে লুডো খেলছেন। জিতেছেন কিংবা হেরেছেন—তারই হাসি।

ওপরে উঠতে পারলাম।

সামনের ঘরের দোরে এসে পা দুটো আটকে গেল। দরজা ধরে দাঁড়ালাম।

...ওদিক ফিরে টেলিফোনে কথা কইছে। পরক্ষণে মুহূর্তের জন্য সচকিত। মাটি এবার প্রচণ্ড বেগে দুলে উঠল। কথা বউদির সঙ্গেই কইছে। মেয়েদুটোকে কিছুদিনের জন্য নিয়ে গিয়ে রাখতে বলছে। আজই কিছুদিনের জন্য কলকাতার বাইরে যাবে বলছে। কোনো কথার জবাবে তার শেষ অসহিষ্ণু উক্তি, সে কি করবে, কোথায় থাকবে আমার তা জানার দরকার নেই।

সশব্দে রিসিভার ফেলে দিয়ে ফিরল। পাশ কাটিয়ে চলে যেতে গিয়েও দাঁড়াল। জীবনের একটা শেষ কথা শোনার জন্যেই আমি প্রাণপণে শক্তি সংগ্রহ করছি।

বলল, আমি আজই কলকাতা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, মেয়েদের ব্যবস্থা আমি এসে করব, তোমার দাদা এসে ওদের নিয়ে যাবে।...এর মধ্যে তুমি কোর্টে ডাইভোর্সের দরখাস্ত করে রাখতে পারো, আমার দিক থেকে আর কোনো বাধা আসবে না।

মৃত্যুর পরোয়ানা পেয়েছি। কথা বলতে পারিনি। কিন্তু তবু সেটা ঠেকাবার জন্যে সবেগে মাথা নেড়েছিলাম। বলতে চেয়েছিলাম—না...না।

কাছে ঝুঁকল। নির্মম তীক্ষ্ণ দু'চোখ আমার মুখে বিঁধে আছে—আর তুমি তা চাও না, না? এখন আর তুমি এটা চাও না—কেমন? কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি চাই। তুমি ডাইভোর্স করতে পারো, যা খুশি করতে পারো—আমার জীবনে তোমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

পাশ কাটিয়ে মেয়েদের ঘরের দিকে চলে গেল। আমি হাত বাড়াতে পারলাম না, তাকে ধরে রাখার শেষ চেষ্টা করতে পারলাম না। যে অন্ধকারের সঙ্গে এতক্ষণ যুঝছিলাম সমস্ত দিক ঢেকে দিয়ে সেটা এবার আমাকে গ্রাস করতে আসছে। মা-গো এত অন্ধকার! চারদিকে কি ভূমিকম্প হচ্ছে? দরজাটাই বা কোথায়?

তারপর আর কিছু মনে নেই।

চোখ মেলে দেখি আমি আমার ঘরে খাটে শুয়ে আছি। আমাকে ঘিরে কয়েকটা মুখ।...দাদার, বউদির, দাসমশায়ের, বাড়ির ডাক্তারের, আর অদূরে আর একজনের। ফ্যালফ্যাল করে সেই মুখের দিকেই চেয়ে আছি। আমি কি দুঃস্বপ্ন দেখে উঠলাম একটা? নাকি এটাই আশার স্বপ্ন!

মনে হল বিকেল তখন। ওই একজন ছাড়া সকলে আমার দিকে ঝুঁকে এলো। বউদি যেন কিছু জিজ্ঞেস করছে। কিন্তু ঠিক শুনতে পাচ্ছি না। ডাক্তার এগিয়ে এসে ইনজেকশান দিল একটা। বোধহয় ঘুমের। একটু বাদেই আর চোখ মেলতে পারলুম না।

পরদিন সকাল থেকে সুনন্দ অনেকবার ঘরে এলো। গম্ভীর। চুপচাপ চেয়ে দেখেছে, ওষুধ খাইয়েছে, আবার চলে গেছে।...আমার কিছু হয়েছে। যা-ই হোক, এ-যদি তাকে আটকে রেখে থাকে, ভগবান, জীবনে আমি আর ভালো হতে চাই না।

বিকেলের দিকে খাটে বসেছিলাম। স্নায়ুগুলো সব অবসন্ন তখনো। বউদি এলো। ওদিকে ছোড়দির শরীর খারাপ, কত ছোটাছুটি করবে। আমাকে বসে থাকতে দেখে হেসে জিজ্ঞাসা করল, কেমন?

আমি একটু চেয়ে থেকে আমার পাশটা দেখালাম।—এইখানে বোসো।

বউদি বসল। আমি আস্তে আস্তে নেমে দাঁড়ালাম। তারপর মেঝের ওপর তার পায়ের কাছটিতে বসে দু'হাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরে দুই হাঁটুর ওপর কপাল রাখলাম। বউদি ব্যস্ত হয়ে উঠল, ও-কি!

হাঁটুতে মুখ গুঁজে রেখেই আমি বললাম, মা কেমন ছিল জানি না বউদি, এখন জেনেছি, আমাকে এমনি করে কিছুক্ষণ থাকতে দাও।

আমি কাঁদিনি। কিন্তু বউদি আনন্দে কাঁদছে জানি।

একটু বাদে তার নড়াচড়ায় ঘরে কেউ এসেছে টের পেলাম। কে এসেছে জানি। আস্তে আস্তে উঠলাম আবার। আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে সুনন্দ জিজ্ঞাসা করল, বউদি কতক্ষণ?

—এই তো। হাসি-ভরা মুখে, জলভরা চোখে বউদি প্রায় ঝাঁঝিয়েই উঠল, আপনি মশাই এই ভালো মেয়েটাকে সেই থেকে এত কষ্ট দিচ্ছেন কোন্ সাহসে শুনি?

...গম্ভীর মুখের পুরু ঠোঁটের কোণে আমি কি হাসির আভাস দেখলাম?

রাত্রি।

ছাইয়ের ওষুধের ধকলে দু'চোখ বেশিক্ষণ মেলে রাখতে পারি না। ঝিমুনো শরীরে হঠাৎ যেন স্পর্শের তরঙ্গ একটা। চেয়ে দেখি শিয়রে বসে মানুষটা আমার মাথায় কপালে গালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কি এক দুঃসহ আবেগে সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠল আমার। পরমুহূর্তে সবলে দু'হাতে আঁকড়ে ধরলাম তাকে।

কতক্ষণ ছিলাম এ-ভাবে জানি না। আর আমার ভয় নেই জানি। দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা কাটতে চায় না তবু। জিজ্ঞাসা করলাম, ভালো হলে তুমি কি আমাকে ছেড়ে যাবে?

হাসছে। পুরু ঠোঁটের, ছোট চোখের হাসি এত সুন্দরও হয়!

জবাব দিল। মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে গলা খাটো করে বলল, একটা ফ্রক-পরা মেয়ের জন্য ন'বছর আর বিয়ের পরও ছয় বছর অপেক্ষা করে তাকে পরে ছেড়ে যাওয়া এত সহজ!

কাল আমি অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছিলাম, আজ এত আলোও বুঝি সহ্য হবার নয়।

এখন আমাদের গাড়ি নেই। এক-তলাটা ভাগ-ভাগ করে ভাড়া দিয়েছি। আর একজন তার দেনায় বিকনো নড়বড়ে ব্যবসা আবার আগের মত দাঁড় করানোর জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করছে। তারই মধ্যে ওই মানুষকে আমি দিনে দিনে আবিষ্কার করেছি। করছি। যত দেখি তত যেন তার মাথাটা প্রায় নাগালের বাইরে উঁচু মনে হয় আমার।

...ঠাকুমা গো, আর-জন্মে কি তুমি দেবী ছিলে?

গোড়ায় গোড়ায় আমার মনে অনটনের কালো ছায়া পড়ত অস্বীকার করব না। মনে হত, আগের মত সচ্ছলতা ফেরা দূরে থাক, মোটামুটিভাবে দিন কাটবে তো? কিন্তু দু'বছর ধরে এই একজনের কাজের সঙ্গে মানসিকভাবে যুক্ত হয়ে সে-ভয় ঘুচে

গেছে। মনে হয়েছে, ঠিক এইরকম কেটে গেলেও, বা আরো অনটনের মধ্যে পড়তে হলেও ক্ষতি নেই, ভয় নেই। এই একজনের সঙ্গে মিশে থাকতে পারাটাই পরম নির্ভয়ের। এখন বেশি পরিশ্রম করতে দেখলে আমি ধমকাই পর্যন্ত।

দাস-গিন্নী মারা গেছেন প্রায় দু'বছর হতে চলল। আমি অত কান্না বোধহয় জীবনে কাঁদিনি। সেদিন দাসমশাই আমাদের দুজনকেই নীচে ডেকেছিলেন। আমরা যেতে তোষকের ওয়াড়ে হাত ঢুকিয়ে দশ টাকার আর একশ টাকার গাদা-গাদা নোট বার করতে লাগলেন। তেলচিটে পুরনো নোট সব। বার করছেন তো করছেনই। আর আমাদের হাঁ-করা মুখের দিকে চেয়ে হাসছেন মিটিমিটি।

ওকে বললেন, এগুলো তোমাদের জন্যেই ছিল সব নিয়ে যাও—পাপের টাকা নয় একটা পয়সা অবধি হকের টাকা—এই দিয়ে আবার ব্যবসা দাঁড় করাও।

তারপর এক দৃশ্য। ও নেবে না, দাসমশাই নেওয়াবেনই। শেষে ও হাত জোড় করে বলল, এ-টাকা আপনার কাছেই থাক এখন, তেমন দরকারে নেব, আমি আপনার মা-লক্ষ্মীকে বড়াই করে কথা দিয়েছি, আবার আমি নিজের পায়ে দাঁড়াবই, আবার সব ঠিক হয়ে যাবেই। আর কিছুদিন আমাকে চেষ্টা করতে দিন।

এ-কথার পর দাসমশাই ক্ষান্ত হয়েছেন। কিন্তু আমার অস্বস্তি, ও এই প্রতিজ্ঞা কেন করে? কেন এত জোর দিয়ে বলে আগের ঐশ্বর্য আবার ফিরে আসবেই। সেদিন রাতে তাই ওর বুকে মুখ গুঁজে বলেছিলাম, তুমি এভাবে আর বলবে না, এত পরিশ্রম করবে না—তুমি যে-ভাবে বলছ সে-ভাবে আবার সব ঠিক না হলেও আর কিছু যায় আসে না—যা গেছে তার কত গুণ ঐশ্বর্য ফিরে এসেছে তুমি জানো না।

...হ্যাঁ আজ আমি লিখতে পারি। আজই পারি, আগে পারতুম না।...জীবনের এই রূপটা আমি আঁকতে পারি। জীবনে আলো আছে, অন্ধকার আছে, সুন্দর আছে, কুৎসিত আছে। সেই আলো-অন্ধকার সুন্দর কুৎসিতের ভিতর থেকে যদি জীবন-সোনা ঝালিয়ে নিতে পেরে থাকি—সে-বারতা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে আর আমার কোনো দ্বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই। নেই, কারণ, আমি যা হতে পারতুম তা আমি হইনি।

আমার কাহিনী বলুন, গল্প বলুন, এটুকুই সব। এটুকুই শেষ।

# দিনকাল

উৎসর্গ

অমিতাভ চৌধুরী

অনুজপ্রতিমেষু

এ-রকম একটা ছবি কলকাতা শহরেও কমই দেখা যায়।

বর্ষায় কলকাতার অনেক বড় বড় রাস্তায় হাঁটুজল দেখে দেখে চোখ পচে গেছে। ট্রাম দাঁড়িয়ে আছে, অনেক ট্যাক্সি আর প্রাইভেট গাড়ি বিকল হয়ে চাকা-ডোবা জলের মধ্যে সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছে, আর মরুভূমিতে ওয়েসিসের নাগাল পাবার মতো দুরাশা নিয়ে এক-এক জায়গায় এক-একটা মানুষের পিণ্ড জোট বেঁধে আছে এমন ছবিও আকছার চোখে পড়ে। একটা বাস দেখলেই জট ছাড়িয়ে ছোটাছুটির হিড়িক পড়ে যায়। যে নামবে সে নামতে পারে না। যে উঠবে সে উঠতে পারে না। এই চেষ্টা করতে গিয়ে বেশির ভাগ লোকের আর একটু বেশি ভেজা সার।

এরই মধ্যে যে দৃশ্যটা নতুন ঠেকল রণিত দত্তর চোখে, এই জলছবি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে সে-ও জাদুঘরের চিত্রের মতো বস্তাপচা পুরনো ব্যাপার। ট্রাম বাস গাড়ি ঘোড়া লরি টেম্পো রিকশ স্কুটার—সব-কিছু অনড়-করা লম্বা মিছিল। হামেশাই দেখতে হয়। হামেশাই গতির পাখা মুড়ে নিরাসক্ত তপস্বীর মতো বসে থাকতে হয়। তবু রণিত দত্তর চোখে আজকের এই ছবিটা অনেকটা নতুন। উত্তর আর মধ্য কলকাতার ঠিক মাঝামাঝি একটা রাস্তা জলে জলাকার। বিকল প্রাইভেট গাড়ি আর ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। পয়সার বিনিময়ে সেগুলো ঠেলে সচল করার মতো রাস্তায় মেহনতী ছেলের দঙ্গলও নিরুৎসাহ। ফুটপাথের শেডে, দোকানের চালা আর গাড়িবারান্দার নিচে সহাবস্থানের মহড়া চলেছে। আর রাস্তার জলে বিশাল লম্বা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে মস্ত মস্ত ট্রাক লরি উঁচু-উঁচু একতলা দোতলা বাসগুলোও। এগুলো ওই হাঁটুজলের পরোয়া করে না। জায়গা পেলেই চলতে পারে। কলকাতার কাঁধে (নাকি বুকে ?) গতির ডানা যারা জুড়ে দিতে চান, বড় রাস্তায় বর্ষার জল এখনো বড় বাস বা ট্রাকের এনজিন ডোবায় না এমন দাবী করে থাকেন। কিন্তু বেশি জলে সরকারী বাসগুলো বিকল হবার সামর্থ্য নিজেরাই রাখে। আর জল দেখলে তারা জ্বরেও পড়ে, আস্তানা থেকে বেরুতে চায় না।

কিন্তু এই বর্ষণের সাজগোজ চলছিল বহুক্ষণ ধরে। ছোট বড় হুমকিও দিচ্ছিল থেকে থেকে। বহ্বাড়ম্বরে লঘুক্রিয়া ধরে নিয়ে কলকাতার চলমান মিছিলে ছেদ পড়েনি। কিন্তু আকাশটা একেবারে বিশ্বাসঘাতকের মতো ভেঙে পড়ল। একঘণ্টার মধ্যে রাস্তা একহাঁটু জলের নিচে। সেই জল ভেঙে সপসপ করে এগিয়ে আসছে এক বিরাট মিছিল। উত্তর থেকে তারা দক্ষিণে চলেছে। লক্ষ্য সম্ভবত ময়দান। এই মিছিলেরও সাজসজ্জা অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল ধরে নেওয়া যেতে পারে। মাঝপথে আকাশ এমন বেইমানি করলে তারা কি করবে? এত বড় একটা মিছিল ভেঙে দিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে সরে পড়বে? তাতে জলের হাত থেকে মাথা বাঁচবে, না জিনিসপত্রের দাম নেমে আসবে? তার থেকে এই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে ফুঁসলে আর গজরালে সংকল্পের জোরটা আরো বরং মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। সকলে বুঝবে পশ্চিম বাংলা দুর্বল আপোস জানে না—ঝড় জল কেয়ার করে না। বিশেষ করে এটা যখন অনেকটা দলমত নির্বিশেষের মিছিল। বামপন্থী সরকারও স্পষ্ট আঙুল তুলে কেন্দ্রকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। বলেছে, সব-কিছুর আকাশ-ছোঁয়া দামের জন্য কেন্দ্র দায়ী। মাত্র ক'টা মাসের মধ্যে সব-কিছুর দাম বিশ থেকে পঁচিশ ভাগ উঁচিয়ে উঠল কেন্দ্রের বে-হিসেবী [illegible] দরদী অপদার্থতার কারণে। এর বিরুদ্ধে বাঁচার জেহাদে আবার দলমত কি। তাই মিছিলের আঁকা-বাঁকা দু'সারি বপুটিও সুদীর্ঘ।

হাঁটুজল। তার মধ্যে শম্বুকগতি চলমান মিছিল। তার ফলে সচল বাস, ডবল ডেকার, মিনি আর ছোট বড় গাড়িগুলোও অচল। এই চিত্রটাই রণিত দত্তর চোখে নতুন ঠেকছিল।

সাধারণত মিছিল কভার করার ভার তার ঘাড়ে পড়ে না। সে ভিতরে ভিতরে একটা সংস্কারের ঝাঁটা হাতে ঘুরে বেড়ায়। সুড়ঙ্গপথের অনাচার ব্যভিচার চুরি জোচ্চুরি বাটপারি ঝেঁটিয়ে প্রকাশের আলোয় নিয়ে আসে। তারপর টকমিষ্টি রসের ভিয়েনে চড়িয়ে সে-সব গরম গরম পরিবেশন করে। এই গুণাবলীর জন্য 'সবুজ রঙের' কর্মকর্তাদের সে বেশ প্রিয়পাত্র। আজ হাতে কিছু কাজ ছিল না। আপিসেও লোক কম। তাকে মিছিলের দিকে যেতে বলা হয়েছে—সে-ও বেরিয়ে পড়েছে। ডেস্ক-এ বসে মাথা-গুজে কাজ তার ভালোও লাগে না।

লেন্স মুছে মুছে বেশ জুৎসই গোটাতিনেক ছবি নিল রণিত দত্ত। ভালো সাবজেক্ট পেলে সঞ্চয় রাখতে হয়। পরে বেশি দরে বিকোয়। হঠাৎ মাঝরাস্তায় জলের ওপর ঠুঁটো জগন্নাথের মতো দাঁড়ানো একটা দোতলা বাসের একতলার জানলায় চোখ গেল তার। মুখ চেনা কিনা ঠাওর হল না। কত জায়গায় ঘোরে, কত দেখে। চেনা-অচেনার ফারাক তার কাছে খুব বেশি নয়। কিন্তু চোখ টানল অন্য কারণে। মেয়েটা সুশ্রী বেশ (অমন বয়সের প্রায় সব মেয়েই রণিতের চোখে মোটামুটি সুশ্রী) কিন্তু তার মুখে রাজ্যের বিরক্তি বাসা নিয়েছে। কোমরের খানিকটা ওপর থেকে মাথা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। তাতে বোঝা যাচ্ছে সর্বাঙ্গ ভেজা। পরনে মোটামুটি ভালো একটা সাদা জমিনের ওপর লালচে ডুরির শাড়ি, গায়ে তেমনি হালকা লাল ব্লাউজ। শাড়িটা বুক-কাঁধ বেড়িয়ে গলা পর্যন্ত জড়ানো। ঢাকাঢুকি দিয়ে বসে থাকার চেষ্টা, কিন্তু শাড়ি ব্লাউজ দস্তুরমতো ভেজা বলে ঐশ্বর্য তেমন ঢাকা পড়ছে না। বিরক্তি-ছাওয়া চাউনি ওই মিছিলটার দিকে। ওটার যেন আদি অন্ত নেই। বছর বাইশ তেইশ হবে বয়েস। একখানা স্থির যৌবন ভিতরে ভিতরে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠছে।

মেয়েটি চেনা কি অচেনা রণিত দত্ত তা নিয়ে আর এক মুহূর্ত মাথা ঘামালো না। সে সাবজেক্ট খোঁজে। সাবজেক্ট পেলে তার চোখে পর্দা থাকে না। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল আগের তিনটে ছবিই ম্যাড়মেড়ে। জল আর মিছিল আর অচল যানবাহনের সঙ্গে এই চিত্রটিও কাগজে বসিয়ে দিতে পারলে সোনায় সোহাগা। সুশ্রী মেয়েরা মাঙ্গল্যের প্রতীক। আগের দিনের রাজা-মহারাজারা যুদ্ধে বেরুনোর সময়েও সুন্দরী মেয়েদের মুখ দেখে রওনা হত।

ক্যামেরা রেডি করে চটপট বাসটার গায়ে চলে এলো। মেয়েটা তখনো তাকে দেখেনি।

—এ দিকে শুনুন!

পাশ থেকে ডাক শুনে মেয়েটি চকিতে এ-দিকে ফিরল। সঙ্গে সঙ্গে মুখের ওপর ফ্ল্যাশ বালব ঝলসে উঠল।

—থ্যাংক ইউ।

কেউ কিছু ভালো করে বোঝার আগেই রণিত দত্ত সপসপ জল ভেঙে বাসের পিছন দিক দিয়ে সরে গেল। যে দু'চারজন দেখেছে বা বুঝেছে, এই জলে ভিড় ঠেলে

বাস থেকে নেমে বীরত্ব দেখাতে আসবে না। এলেও কাগজের কার্ড পকেটে আছে। আগের ছবিতে কত ছেলের মুখই তো উঠেছে—তেমন দুই একটা মেয়ের মুখ না থাকলে কাগজের ছবি জমে? এটা তার মতে নির্দোষ সাংবাদিকতা আর নির্দোষ লোকরঞ্জন।

কিন্তু এই শেষের ছবিটা দেখলে সবুজ-রঙ্গ সম্পাদক মহেন্দ্র চক্রবর্তী ঠিক আলাদা করে একটা কপি চাইবে। ইদানীং ব্যাটার মতি-গতি তেমন স্পষ্ট বুঝছে না রণিত দত্ত। পঞ্চাশের দিকে বয়েস গড়াচ্ছে, সেই সঙ্গে রসও বাড়ছে কিনা কে জানে! বাইরে গম্ভীর, কিছু বোঝা যায় না। রণিত দত্ত এক সময় একে দেখেই তলোয়ারের থেকে কলম বড় ভাবত। সংস্কারের মোক্ষম ঝাঁটাটি এই ভদ্রলোকই তার হাতে তুলে দিয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি সতীর্থদের এর সম্পর্কে চুটকি রসিকতা কানে আসছে। ঘরে ডেকে এর মধ্যে ওর কাছ থেকে তিন-তিনটে ছবিও চেয়ে নিয়েছে। নিজস্ব একটা ডকুমেন্ট অ্যালবাম করছে নাকি। দুটো দুই অভিজাত মক্ষীরাণীর ছবি। তৃতীয়টি বিপাকে-পড়া এক তরুণী প্রোফেসারের।

না, এ-ছবিটা আলাদা করে সম্পাদককে আর দেখাবে না। একবারে সুপারইমপোজ-টিমপোজ যা করার করিয়ে নিয়ে ছাপতে দেবে। তারপরে চাইলে মূল ছবিটা হারিয়ে যেতে কতক্ষণ? আর নেগেটিভও কি জলে-টলে নষ্ট হয়ে যায় না? খটকা যখন লেগেছে একটু, অমন জলে-ভেজা মেয়ের ছবি তার খপ্পরে গিয়ে না পড়াই ভালো। যদিও সতীর্থদের ঠাট্টা-টিসারার মধ্যে সত্য কিছু আছে সে একবারও ভাবে না।

বাসের সেই মেয়ে দর্বা বোস।

ছেলেটা এ-ভাবে তাকে ডেকে নিয়ে ছবি তুলে চলে যাবার পর তার ভিতরের মেজাজের আঁচ কেউ অনুমান করতে পারবে না। চাল-জল চড়ালে সেই আঁচে ভাত হয়ে যেত। যে আশায় দক্ষিণ কলকাতা থেকে উত্তর কলকাতায় বাস ঠেঙিয়ে আসা —তাতে ছাই। খুব আশা করে এসেছিল বলে মন-মেজাজও আগে থাকতে তেমনি খারাপ। তারপর এই বৃষ্টি। ছুটে বাস-স্টপের শেডে গিয়ে দাঁড়ানোর আগেই বিচ্ছিরিভাবে ভেজা হল একপ্রস্থ। বহুক্ষণ বাদে শ্যামবাজার থেকেই মোটামুটি ভিড় নিয়ে এসেছে বাসটা। উঠতে গিয়ে আরো খানিকটা ভিজল। যে অবস্থা তাতে আর অপেক্ষা করার মানে হয় না।

বাসে আর একপ্রস্থ মেজাজ চড়ছিল। বাসে ভিড় থাকলেও এমন ভিড় নয় যে চাপাচাপি বাঁচিয়ে সামনে নিরাপদ দিকটায় আসা যায় না। কিন্তু সে চেষ্টা করতেই পিছনের দিকের কতগুলো চলতি মানুষ রড ধরে এদিক ওদিক ঘুরে বৃষ্টি দেখায় তন্ময় হয়ে পড়ল। আর্দ্র অঙ্গে চাপাচাপির ধকল সামলে তবু সামনে না এগিয়ে উপায় কি। আর কয়েকটা স্টপ পার হতে সামনের দিকেও চাপাচাপি। অবশ্য তখন সত্যিই জমাট-বাঁধা ভিড়। তবু দূর্বার ধারণা লোকগুলো চেষ্টা করলে আর একটু সুস্থির আর সভ্যভব্য হতে পারে। কিন্তু ভদ্রলোকও বাসে থাকে না এ-তো আর হতে পারে না। দূর্বার পাশেও আর একটি মেয়ে। সে আগে থাকতে স্টপে দাঁড়ানোর ফলে মাথা গা বাঁচাতে পেরেছিল। আর সামনেই এক-জোড়া তরুণ-তরুণী বসে। একটু বাদে ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে দূর্বাকে বসতে বলল। তারা সামনের স্টপে নেমে যাবে। দূর্বা হাঁপ ফেলে বাঁচল। স্টপ আসার আগেই বউটাও উঠল। ভিড় ঠেলে দরজায় যেতে হলে আগে থাকতে প্রস্তুত হওয়া

দরকার। দূর্বা বোস জানলায় সরে গেল, পাশে অপর মেয়েটি বসল।

বসার পরেও অস্বস্তি। বিরক্তি। সেই ওঠার সময় থেকে এ-পর্যন্ত কত জোড়া পুরুষের চোখ যে ভিজে জামা কাপড় ফুঁড়ে সর্বাঙ্গে বিঁধে আছে ঠিক নেই। ফলে জানলা দিয়ে সে ঠায় বাইরের দিকে চেয়েই বসে আছে। তার মধ্যে এই মিছিল। মিছিলটা আ এক রাস্তা দিয়ে বেঁকে বড় রাস্তায় এসে পড়েছে। এর শুরু কোথায় বা শেষ কোথায় ঠাওর করতে না পেরে দূর্বা বোস প্রায় হাল ছেড়ে ওই মিছিলই দেখছিল আর জল দেখছিল। তার মধ্যে এমন বেপরোয়া ছবি তোলার কাণ্ড।

দূর্বার পাশে যারা দাঁড়িয়ে বা ঠিক সামনে অথবা পিছনে যারা বসে তারা ব্যাপারখানা বুঝেছে। এ-রকম একটা অভিনব ব্যাপার ঘটে যেতে তারা বেশ মজাই পাচ্ছে। দূর্বা আবার সেই সামনের দিকেই চেয়ে আছে আর রাগে ফুঁসছে। সুবিধে এই, খুব রাগ হলেও চট করে বাইরে থেকে সেটা বোঝা যায় না।

একটু বাদে ভুরু কুঁচকে মনে করতে চেষ্টা করছে কিছু। যে লোক এই কাণ্ড করে গেল তার মুখটা তারও চেনা-চেনা লাগছে। ক্যামেরা কাঁধে খবরের কাগজের লোক হতে পারে ভাবতেই মনে পড়ে গেল। আলাপ কখনো হয়নি, তবে চেনাই বটে। ফলে এবারের রাগ এক ঝটকায় মাথায় চড়ল।

## দুই

দূর্বা বোসের একটি নির্ভেজাল প্রেমিক আছে। পাশের ছোট্ট দোতলা বাড়ির বাসিন্দা। বাড়িটা নিজস্ব। দোতলার সবটা তাঁর দখলে। একতলায় ছোট-খাট একটা টিউটোরিয়াল হোম। তার ভাড়া মন্দ হয়। প্রেমিকের নাম রাধাকান্ত আচার্য। বয়েস পঁচাত্তর। এখনো শক্তপোক্ত, পাকানো চেহারা। রাত থাকতে উঠে লেকে বেড়াতে যান। বিকেলেও কম করে তিন মাইল হাঁটেন। ঠোঁটের ফাঁকে মজাদার দুনিয়া-দেখা হাসি লেগেই আছে। হাতের লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করলে ছেলে-ছোকরার দল সরে পড়ে। এত বড় পাড়ার মধ্যে মানী মানুষ। আবার ভক্তি-ভালবাসার মানুষও। আর সুরসিকও তেমনি। জিভের কোনো লাগাম নেই।

মস্ত নামী স্কুলের নামী মাস্টার ছিলেন। স্কুল মাস্টারি করে নিজের বাড়িঘর ক'জনের হয়? এঁর হয়েছে। হয়েছে নিজের লেখা খানকয়েক বইয়ের কল্যাণে। অঙ্কের বই আর স্কুল-পাঠ্য ফিজিক্সের বই। সমস্ত পশ্চিম বাংলার স্কুলের ছেলেমেয়েদের এই বইয়ের চাহিদা। যত দিন যাচ্ছে ততো কদর বাড়ছে।

নিজের কেরামতির গল্প নিজেই করেন ভদ্রলোক। তাঁর প্রথম বারের এম. এস. সি.-র সাবজেক্ট ছিল অঙ্ক। তখন আবার এম. এ., এম. এস. সি.-তে থার্ড ক্লাসও ছিল। ফল বেরুতে ফার্স্ট ক্লাস থেকেই নিজের নাম খুঁজতে শুরু করেছিলেন। নামতে নামতে দেখা গেল সেকেন্ড ক্লাসের একেবারে শেষ নামটা তাঁর। আর একটু নামতে পারলেই থার্ড ক্লাস ফার্স্ট হতে পারতেন। গোঁ ধরে এরপর ফিজিক্স নিয়ে পরীক্ষা দিলেন। এবারে তাঁর নামটা সেকেন্ড ক্লাসের মাঝামাঝি ঠাঁই পেল। ডবল এম. এস. সি. হয়েও সরকারী কলেজের চাকরি জুটল না। অগত্যা সোজা রাস্তায় পা বাড়ালেন। সেই থেকে তিন যুগের

ওপরে স্কুল মাস্টারের চেয়ারে জাঁকিয়ে বসেছিলেন। চব্বিশ বছর বয়সে চাকরিতে ঢুকেছিলেন। পঁয়ষট্টিতে রিটায়ার করেছেন। স্বাস্থ্য দেখে স্কুল কর্তৃপক্ষ তখনো ধরে রাখার জন্য ঝুলোঝুলি। তিনি স্বেচ্ছায় চলে এসেছেন।

যে-কথা নিজের মুখে খুব জাহির করেন না, সেটা তাঁর ছেলে পড়ানোর কেরামতি। গাধা পিটে সত্যি ঘোড়া হয় কিনা কে জানে। কিন্তু অনেক গাধা-মার্কা ছেলেকে যে তিনি ঘোড়া-মার্কা বানিয়েছেন এটা সত্যি কথা। পরের দিকের ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া মাস্টাররাও তাঁর এই প্রতিভা অস্বীকার করতেন না। জটিল জিনিসের সহজ রাস্তা বার করার ব্যাপারে তাঁর জুড়ি নেই। এই মাস্টারির জীবনে একটাই নেশা ছিল তার, এবং এখনো কিছু কিছু আছে। জ্যোতিষী-চর্চা। এতে খুব যে একটা অন্ধ বিশ্বাস আছে এমন নয়। নেশাটাই বড়। এতেও জটিল অঙ্ক কষার আনন্দ পান। আর বলেন, এই বিদ্যে ফলিয়ে অন্য লোককে ঘায়েল করার মতো মোক্ষম অস্ত্র আর নেই। স্কুলের হেডমাস্টার ছেড়ে কত বড় বড় গণ্যমান্য জনের কাছে এই বিদ্যের দরুন তাঁর খাতির কদর। এখনো এই গুণের ফলে পাড়ার প্রবীণরা তাঁকে সমীহ করেন, বিপাকে পড়লে ছুটে আসেন। রাধাকান্ত আচার্য অবশ্য জ্যোতিষীর থেকে সহজ যুক্তির রাস্তাই বেশি দেখিয়ে দেন। আর ছেলে-ছোকরারা ভাগ্যফল জানতে এলে লাঠি নিয়ে তাড়া করেন।

এই জ্যোতিষী চর্চার যাচাই নিজের ওপর দিয়েই তিনি প্রথম করেছিলেন। ঠিকুজির মতে তার বেশ টাকা আর ভালো নামডাক হবার কথা। বাড়তি পয়সার টিউশনি ভালো লাগে না, লটারির টিকিটও কেনেন না। টাকা হবে কোত্থেকে? আর স্কুল মাস্টারের নামডাক হতে পারে এমন কোনো রাস্তা আছে নাকি?

অবশ্য ছাত্রমহলে ততদিনে তাঁর দারুণ নামডাক। ততদিনে স্কুলে চৌদ্দ বছরের বনবাস কাল পার। অঙ্ক বা ফিজিক্স-এর দুরূহ জিনিসকে সহজ মেড্-ইজি করার চিন্তা সর্বদাই মাথায় ঘুরপাক খায়। ভেবেচিন্তে স্কুলের নিচের দিকের চার-পাঁচ ক্লাস জুড়ে অঙ্কের বই লিখলেন একটা। এক বন্ধুর সঙ্গে শেয়ারে সেই বই ছাপা হতেই দিন ফেরার সূচনা দেখা গেল। পরের দু'বছরে উঁচু ক্লাস ক'টার জন্য অ্যারিথমেটিক অ্যালজাব্রা আর জিওমেট্রির এক্সট্রা চ্যাপ্টারগুলো ধরে মোটা বই লিখে ফেললেন একটা। অনেক ঝুঁকি নিয়ে, বউয়ের গয়না পর্যন্ত বেচে একলার দায়িত্বে সেই বইও ছেপে ফেললেন। তারপর থেকে অভাব কাকে বলে জানেন না।

উঁচু ক্লাসে ফিজিক্স পাঠ্য হবার পর থেকে বই লেখা আর উপার্জনের রাস্তা আরো প্রশস্ত হয়েছে। টানা একচল্লিশ বছরের শিক্ষকজীবনে এক-এক যুগে এক-এক রকমের ছাত্রধারা দেখেছেন। তাঁর অনেক কৃতী ছাত্রও এখন অবসর জীবনে পা ফেলেছে। আর বহু ছাত্র এখনো বড় চাকরি বা বড় রকমের মর্যাদার আসনে বসে আছে। কেউ ডাক্তার, কেউ এনজিনিয়ার, কেউ শিক্ষাবিদ। ক্বচিৎ কারো সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে তারা এগিয়ে এসে পায়ের ধুলো নেয়। ছাত্র বলে পরিচয় দেয়। রাধাকান্ত আচার্যর কারো মুখ ধু-ধু মনে পড়ে, কারো বা পড়ে না। বিশেষ করে কারো কথা অত মনে করে বসে থাকেন না তিনি। যুগে যুগে ছাত্রধারার যে পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন সেটুকুই কৌতূহলের ব্যাপার। এই পরিবর্তনের মূলে বেশির ভাগ আধুনিক ছাত্রের আধুনিক গার্জেনরা। এ-সম্বন্ধে চেষ্টা করলে সম্ভবত একখানা মজার বই লিখে উঠতে পারেন রাধাকান্ত।

ছেলে নেই। তিনটিই মেয়ে। এক একটি মেয়ে এসেছে আর ভদ্রলোকের আয়পয় বেড়েছে। স্ত্রীর এ-কারণে গর্ব ছিল খুব। কথায় কথায় বলতেনও সে-কথা। স্ত্রীর হিসেবে যে বেশ ভুল হচ্ছে জেনেও ভদ্রলোক প্রতিবাদ করতেন না। চাকরিতে ঢুকেছিলেন চব্বিশ বছর বয়সে, বিয়ে করেছিলেন উনত্রিশ বছর বয়সে আর বই লেখা শুরু করেছিলেন আটত্রিশ বছর বয়সে। বড় দুই মেয়ে তার অনেক আগেই পৃথিবীর মুখ দেখেছে। বাড়তি রোজগারের তাগিদে তখন টিউশনি করতে হত, জুটতও সহজে। বড় মেয়ে আসার পর আই. এস. সি. ছাত্র পড়ানোর টিউশনি পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় মেয়ে আসার পর টিউশনির সংখ্যা আর একটা বাড়াতে হয়েছিল। এও আয়পয়ের লক্ষণ হলে তর্ক তুলে লাভ কি। সময় ধরে হিসেব না করলে ভাগ্যের মুখ যে মেয়েরা আসার পরে দেখেছেন তাতে তো ভুল নেই। মেয়েদের আয়পয় না বলে স্ত্রী যদি বলতেন তাঁর নিজের আয়পয়ে তাতেও আপত্তি করার কিছু ছিল না।

সাত বছর হল স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে। তার ফলে ভদ্রলোক কতটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন সেটা শোকের মুখেও তেমন বোঝা যায়নি। নিজে বরং ভেঙে পড়া মেয়েদের সান্ত্বনা দিয়েছেন। তার ঢের আগে অর্থাৎ সময়কালে তিন মেয়েরই একে একে বিয়ে হয়ে গেছে। সকলেই ভালো ঘরে-বরে পড়েছে। আটটি নাতি নাতনির মুখ দেখে মনে কোনো খেদ না রেখেই গৃহিণী চোখ বুজেছেন। মেয়েরা এখন তাদের সংসারের গিন্নি-বান্নি হয়ে বসেছে। এসে থাকতে কেউ পারে না। ফাঁক পেলে বাপকে এসে দেখে যায়। পুরনো দিনের রান্নার বামুনটা আছে। দোকান-পাটে ছোটাছুটির যেটুকু কাজ, সেই করে। এ ছাড়া গিন্নির আমলের পুরনো ঝি-টাও আছে। রাধাকান্ত আচার্যর বোধহয় অসুবিধে বোধটাই কম। তাই দিব্বি চলে যাচ্ছে।

এ-হেন আচার্য মশায়ের প্রেমিকার আসনটি পাশের বাড়ির একতলার দূর্বা সেন যে জুড়ে বসে আছে তার পিছনে ছোট্ট একটা ঘটনা আছে। তাঁর বড় মেয়ে অমিতার প্রথম সন্তানটি ছিল মেয়ে। এক বছর বয়সে ফুড পয়েজনিং-এ মারা যায়। কি মুখে দেওয়া বা খাওয়ার ফলে সেই শোকাবহ ঘটনা আজও কেউ জানে না। বড় মেয়েও তার অনেক আগের থেকেই খুব অসুস্থ। ছ'মাস বাবা-মায়ের কাছে এসে ছিল। পাশের বাড়ির এই দূর্বারও তখন বছরটাক বয়েস। ফুটফুটে বাচ্চা। ঝিয়ের কোলে চেপে হামেশা এ-বাড়িতে আসত। অমিতার মেয়ের সঙ্গে খেলা করত। মেয়েটা চলে যাবার পরেও ঝিয়ের কোলে চেপে এসে চারদিকে তাকাতো, একজনকে খুঁজত—হুঁ-হাঁ করে জিজ্ঞাসা করত তার সাথীটি গেল কোথায়।

সেই থেকে বড় মেয়ে আর সেই সঙ্গে গিন্নিরও এই বাচ্চা মেয়েটার ওপর খুব টান। যখন তখন তাকে এ-বাড়ি নিয়ে আসা হত। গিন্নি অনেক সময় তাকে খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতেন পর্যন্ত। আর বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটাও সর্বদা এ-বাড়ি আসার জন্য ব্যস্ত। এই টান বজায় থাকার আরো কারণ, পরের দু'বছরের মধ্যেও অমিতার আর ছেলেপুলে হয়নি। তার পরেও মেয়ে আর হয়-ই নি। পর পর চারটেই ছেলে। ফলে তার কাছে দূর্বার আজও মেয়ের আদর, আর রাধাকান্ত আচার্যর কাছে বড় নাতনির আদর। কিন্তু ওদের ঘরের অনেক সমস্যা আর অনেক অশান্তি বলেই আদরটা সর্বদা খোলাখুলি দেখানো সম্ভব হত না। কিন্তু ভিতরের টান থেকেই গেছে। ও-দিকে

অমিতা সংসারের জালে বেশি জড়িয়ে পড়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই তার বাপের বাড়ি আসা কমেছে। সেই ফাঁকটুকু ভরাট করেছেন দাদু অর্থাৎ রাধাকান্ত আচার্য। আর সাত বছর আগে গিন্নি চোখ বোজার ক'দিনের মধ্যেই দাদুর ঠাট্টা, তোর আর সতীন বলে কেউ থাকল না রে, এখন শুধু তুই আর আমি।

দূর্বার তখন ষোলো বছর বয়েস, স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ে। এ-সব রসের কথা তার না বোঝার কথা নয়। তার তখন মন মেজাজ ভীষণ খারাপ। এ-বাড়ি ভিন্ন একটু আদর যত্ন কোথাও জোটে না। এ-বাড়ির দিদুটিও ওকে কম ভালো বাসত না। যখন তখন ডাকত, এটা সেটা খেতে দিত, সমবয়সীর মতো কত রকমের কথাবার্তা হত দুজনের। সেই দিদু নেই। তার মধ্যে দাদুর অমন ঠাট্টা। রাগ চাপতে না পেরে দূর্বা বেশ করে জিভ ভেঙচে ছুটে পালিয়েছিল। পরের এই ছ'সাত বছরে ওদের ছোট্ট পরিবার ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে। শান্তি বলে কিছু নেই। এ অবস্থায় পাশের বাড়ির এই দাদুটি না থাকলে দূর্বা হয় পাগল হয়ে যেত নয়তো গোঁ ধরে আরো দুর্বিপাকের মধ্যে তলিয়ে যেত। দাদু তখন তাকে চুম্বকের মতো টেনে রেখেছে। এখনো রাখছে। অন্য দিকে রাধাকান্ত আচার্য জানেন নিজের আপদে বিপদে মেয়ে জামাইরা আছে, ফোনে একটা খবর পেলেই সব ছুটে আসবে। তবু মনে মনে অনুভব করেন সব থেকে কাছে আছে পাশের বাড়ির একতলার দু'ঘরের ফ্ল্যাটের ওই পাতানো নাতনিটি।

বৃষ্টির দাপটে আজ বিকেলে বেরুতে পারেন নি। এদিকের রাস্তায়ও বেশ জল জমেছিল। এখন অবশ্য বৃষ্টি নেই, জলও সবে গেছে। কিন্তু আকাশ এখনো কালি হয়েই আছে। যে-কোনো সময়ে আবার ভেঙে পড়লেই হয়। অল্প-স্বল্প বৃষ্টি হলে তিনি ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু এ দুর্যোগে বেরুনোর চিন্তা বাতিল। তাই রাস্তার দিকের সরু বারান্দার এ-মাথা ও-মাথা হেঁটে বিকেলের বেড়ানো সারছিলেন। আর মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে নিচের রাস্তার লোক চলাচল দেখছিলেন।

একটু বাদে বেড়ানো সাঙ্গ করেই দাঁড়িয়ে গেলেন। দূর্বা আসছে। দূর্বা রূপসী নয় এমন কিছু। গায়ের রং মোটামুটি ফর্সা। স্বাস্থ্য ভালো। চাউনি মিষ্টি। সাজসজ্জায় সাদাসিধের ওপর পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ আছে। রাধাকান্ত আচার্য অত খুঁটিয়ে দেখেন না অবশ্য। তাঁর মনে হল মেয়েটা পথ আলো করে আসছে। সর্বদাই এমনি সুন্দর দেখেন তিনি ওকে। ওর দৃষ্টি কাড়ার অপেক্ষায় চেয়ে আছেন। হাসছেন অল্প অল্প।

দূর্বাও দূর থেকেই দেখেছে দাদুকে। কিন্তু বুঝতে দেবার ইচ্ছে নেই। গায়ের জামা-কাপড় দুই-ই সপসপে না হোক, ভেজা এখনো। চোখোচোখি হলে এমন কিছু রসের কথা চেঁচিয়ে বলে উঠতে পারে যে কান গরম হবে আর ওকে পালিয়ে বাঁচতে হবে। চোখোচোখি না হলেও ছাড়বে মনে হয় না। এমন হাড়ে-হাড়ে বজ্জাত বুড়ো দূর্বা কম দেখেছে। আগে তার ঘরে ঢুকে জামা-কাপড়গুলো বদলানোর তাড়া। তাছাড়া রসিকতা শোনার মেজাজ নয় একটুও। অন্য সময় হলে আর লোকের চোখে না পড়লে দূর্বা বুড়োকে জিভ ভেঙচায় এখনো।

বাধা পড়ল।—বর্ষা বাদলায় শ্রীমতীর চলার ঠমক দেখে তো বাঁচি না, ও-কি ও-দিকে পা বাড়াচ্ছিস কেন—আগের দরজা দিয়েই ঢুকে পড়—তোর দিদুর কিছু জামা-কাপড় এখনো আলমারিতে আছে বোধহয়, বার করে দিচ্ছি।

রাস্তার লোক ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে, বুড়োর ভ্রূক্ষেপও নেই। একবারও না তাকিয়ে দূর্বা আরো তাড়াতাড়ি নিজেদের দরজা ঠেলে ভেতরে চলে গেল। রাধাকান্ত আচার্য বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলেন।

মিনিট কুড়ি বাদে জামা-কাপড় বদলে আবার ওকে দরজার বাইরে আসতে দেখেই রাধাকান্ত তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে এসে বসলেন। গম্ভীর। তিন-বার পড়া খবরের কাগজে মন।

একটু বাদে দূর্বা দোতলায় উঠে এলো। ঘরে ঢুকল। কাছে এলো। দাদুর গম্ভীর মুখে কাগজ পড়া দেখল। তারপর তার হাতের এক ঝাপটায় কাগজটা দাদুর হাত থেকে খসে মেঝেতে গিয়ে পড়ল। দাদু তবু গম্ভীর। বলল, বেইমানি করে যে আমাকে কলা দেখায় তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

গম্ভীর দূর্বাও।—বেইমানি করে কি কলা দেখালাম?

দাদু চোখ পাকালো।—তোমাকে যতটা ভেজা দেখলাম, জামাকাপড় তার থেকে ঢের বেশি ভিজেছিল কিনা?

—ভিজেছিল।

—ডবকা জিনিস-পত্র তখন আরো বেশি দেখা যাচ্ছিল কিনা?

অনায়াসে যে ধরনের কথাবার্তা হয় দুজনের বাইরের কেউ হঠাৎ শুনলে কানে আঙুল দেবে। দূর্বা জবাব দিল, যাচ্ছিল বোধহয়।

হিংসেয় মুখ কালো করার চেষ্টা দাদুর।—বাসের আর রাস্তার লোকেরা সব তখন ড্যাবড্যাব করে দেখছিল কিনা?

—দেখছিল বোধহয়।

—গেট আউট! আমার ঘর থেকে বেরো এক্ষুনি! রাস্তার লোককে মজা লুটতে দিয়ে আমার বেলায় যত আপত্তি! জামাকাপড় বদলে পটের বিবি সেজে আসা হল?

দূর্বা তার পাশেই বসে পড়ল। বলল, ঠিক আছে, নাগালের মধ্যেই বসলাম, যেমন ইচ্ছে তেমনি দেখো।

দাদুর মুখে হাসির ফাটল ধরল।—যা, এবারের মতো ক্ষমা করে দিলাম, সর্বদা এ-রকম উদার হবি। চট করে উঠে বারান্দার তারে ঝোলানো শুকনো তোয়ালেটা নিয়ে এলেন। তারপরে নিজেই ওর মাথাটা ভালো করে মুছে দিতে লাগলেন। একটু বাদে দূর্বা তার হাত থেকে তোয়ালেটা ছুঁড়ে দূরে ফেলে দিল।

দাদু বললেন, আমার কাছে ব্রায়োনিয়া আছে, এক ডোজ খেয়ে নিবি?

—খিদেয় পেট চোঁ-চা করছে, আর তুমি এক ডোজ ব্রায়োনিয়া খাওয়াচ্ছ!

দাদু বলল, তাহলে কি দিই তোকে এখন, হারু ব্যাটার তো এখনো দেখা নেই। ঘরে ডিম আর পাঁউরুটি আছে, আলু-পটলও আছে—কিছু করে নিবি?

—শেফালি কি করছে দেখে এলাম, ব্যস্ত হয়ো না। তোমার চা-টা খাওয়া হয়েছে?

—বিকেলে তো আর টা কিছু খাই না—চা চারটের মধ্যেই করে খেয়ে নিই। তোকে করে দেব একটু?

—না, তোমার জন্যেই জিগ্যেস করছিলাম। যাকগে, শোনো, যে-জন্যে গেছলাম কিছু হল না।

রাধাকান্ত ভরসা করে এটুকুই জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারছিলেন না। ভাবছিলেন মেয়েটা কাজের কথা কিছু বলে না কেন? শোনামাত্র বিমর্ষ।—হল না? যার নামে চিঠি দিয়েছিলাম তার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—হয়েছে। তাকেই চিঠি দিয়েছিলাম। মন্টেসেরি পাশ না শুনে দু'কথায় বিদেয় করে দিলেন। বললেন, গ্র্যাজুয়েট হলে হবে না, তাঁদের মন্টেসরি পাশ চাই।

শুনেই রাধাকান্তরও মেজাজ বিগড়লো।—গুষ্টির মাথা চাই! পড়বে সব অ-আ-ক-খ, তাও গ্র্যাজুয়েট দিয়ে হবে না—কালে কালে আরো কত যে দেখব!

দাদু যে তার মতোই হতাশ দূর্বা বুঝতে পারে। উত্তর কলকাতায় মেয়েদের নামী স্কুল আছে একটা। তাতে বাচ্চাদের একটা আলাদা ব্র্যাঞ্চ আছে। সে ব্র্যাঞ্চের টিচারদের বেশ ভালো মাইনে। অনার্স গ্র্যাজুয়েট নয়, বি. টি. নয়—অমন নামী স্কুলে উঁচু ক্লাসের টিচারের চাকরি হবে না সেটা দূর্বা যেমন জানে, দাদুও তেমনি জানেন। নইলে ওই স্কুলের সর্বেসর্বা যে মহিলা সে তাঁর একজন কৃতী ছাত্রের স্ত্রী। ছাত্রটির এখনো মাস্টারমশায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি। প্রতি বছর বিজয়ার পর আসে, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে যায়। অনার্স বা বি. টি.-র ফ্যাকড়া না থাকলে ওই স্কুলেই দূর্বার একটা চাকরি অনায়াসে হয়ে যেতে পারত। এ-সব কথা নিজেই তিনি একসময় ওকে বলেছিলেন।

সেই স্কুলে একেবারে বাচ্চাদের বিভাগে শিক্ষয়িত্রী নেওয়া হবে খবর পেয়ে দূর্বা দাদুর কাছে ছুটে এসেছিল। ইদানীংকালের স্কুল মাস্টারদের মাইনে-পত্তর কি রকম হয় দাদুর কোনো ধারণা ছিল না। বিশেষ করে হালফ্যাশনের মেয়েদের নামী স্কুলে। তাই বাচ্চাদের বিভাগ আছে জেনেও তিনি বড় একটা গা করেননি। রোজ শ্যামবাজারে যাতায়াতেই তো কত খরচ হয়ে যাবে। কিন্তু দূর্বার মুখে মাইনের অঙ্ক শুনে তাঁরও কিছু উৎসাহ হয়েছিল। তক্ষুনি ছাত্রকে টেলিফোনে অনুরোধ করেছিলেন কাজটা যেন দূর্বা বোসের হয়—মেয়েটা তাঁর নিজের নাতনির থেকেও বেশি।

ছাত্রও শোনামাত্র তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিল, স্ত্রীকে তিনি যা বলার বলে রাখবেন—মেয়েটিকে যেন একটা চিঠি দিয়ে স্কুলে তাঁর স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেন। রাধাকান্ত পরদিনই অর্থাৎ আজ সেই চিঠি দিয়ে দূর্বাকে পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এবারে তোর ঠিক হয়ে যাবে দেখিস—কাজটা হলে আমি তোর নরম গালের সঙ্গে নিজের এই বাঁধানো দাঁতের গালটা একবার ঘষে ছাড়ব বলে দিলাম।

চাকরির আশা এবারে ছিলই, তাই খুশি মুখে দূর্বাও জবাব দিয়েছিল, অত যখন সাধ চাকরির জন্য অপেক্ষা করার দরকার কি, এখনই ঘষে নাও না।

এতখানির পরে এই সমাচার। বড় করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে দাদু বললেন, লাভের মধ্যে তোর জলে ভেজা আর যাতায়াতের ধকল পোহানোই সার হল।

ছেলেবেলা থেকেই হতাশার জীবন দূর্বার তাই ভাবনা চিন্তা ঝেড়ে ফেলতেও পারে। না পারলে রক্ষা ছিল না। দাদুকে নকল করে তেমনি একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে সে-ও হালকা মেজাজে ফিরতে চেষ্টা করল। বলল, লাভ একেবারে কারো হয়নি এমন নয়, একটা ছেলের অন্তত হয়েছে।

দাদু রসের সন্ধান পেল। চোখ বড় করে জিগ্যেস করল, কি রকম?

বেশ গুছিয়ে রাস্তার জল, তার মধ্যে বিশাল মিছিলে বাস আটকে যাওয়া, ভিজে

শাড়ি গলায় জড়িয়ে বসে থাকা আর শেষে এক বেপরোয়া ছেলের ফোটো তুলে নেওয়ার ব্যাপারটা গল্প করল দাদুর কাছে। শুনে দাদুর দু'চোখ কপালে—বলিস কি রে! এ-যে একেবারে দিনেদুপুরে ডাকাতি—তোকে ডেকে মুখ ঘুরিয়ে ফোটো তুলে নিল! তুই নেমে এসে দু'ঘা দিতে পারলি না?

—কই আর পারলাম।

—কই আর পারলাম? এই ছেলে বিনা উদ্দেশ্যে অমন বেপরোয়ার মতো ফোটো তুলে নিয়ে গেল ভেবেছিস—ওটা ও রাতে বিছানায় নিয়ে যাবে না—প্রাণের সাধে চুমুটুমু খাবে না? উঃ! আমার বুকের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে একেবারে। তোর লজ্জা করল না বলতে?

দূর্বা হাসছে।—আমার আবার লজ্জা কি, ফোটোতে কি আমাকে পাবে? তারপর গম্ভীর একটু।—তোমাকে বললাম তার কারণ আছে। তুমি সেই ছেলেটাকে চেনো। তোমার এখানে তাকে আমি দুই একবার দেখেছি, মনে হয় সে-ও আমাকে দেখেছে। তাই আমি ভেবে পেলাম না এত সাহস হয় কি করে!

—আমি চিনি? আমার এখানে দেখেছিস? দাদু লাফিয়ে উঠল—কে বল দিকি, তার মাথাটা আমি একেবারে ছিঁড়েই নিয়ে আসব।

—নাম জানি নাকি! লম্বা কালো মতো ট্রাউজারের ওপর হাত-গোটানো শার্ট, বড় চুল—কোনো কাগজের রিপোর্টার-টিপোর্টার হবে—এমন কাউকে জানা নেই তোমার?

রাধাকান্ত আপন খেয়ালে থাকেন, কিন্তু স্মরণশক্তি এ-বয়সেও ভোঁতা হয়ে যায়নি। ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগলেন। কাগজের রিপোর্টার শুনে একটা মুখ হাতড়ে বেড়ানো সহজ হল। শরীর ঝাঁকিয়ে সোজা হয়ে বসলেন।—কে...রণিত দত্ত নয় তো?

—রণিত দত্ত কে আমি জানি?

—ওই যে কি-একটা থার্ড ক্লাস কাগজের সঙ্গে লেগে আছে, সবুজ রঙ্গ না কি নাম, যেমন বললি চেহারার সঙ্গে তো মেলে কিছুটা...সরকার বাড়ির ফরমাশ নিয়ে আমার এখানে কয়েক বার এসেছেও। কিন্তু ওই ছেলে তো মস্ত সমাজবাদী হয়ে বসে আছে, পার্টি করে, কোথাও বেলেল্লাপনা বা দুর্নীতি দেখলে কাগজে লিখে হুল ফোটায়—তার এমন কাজ? ফের দেখলে তুই চিনবি তো?

দূর্বা নির্দ্বিধায় মাথা নাড়ল, চিনবে।

দাদু বলল, দাঁড়া, সরকার বাড়িতে টেলিফোন করে জেনে নিচ্ছি ওখানে থাকে কিনা। থাকলে পাঠিয়ে দিতে বলব, তারপর তোকেও ডাকব।

দূর্বা হেসে জিজ্ঞাসা করল, সে-ই যদি হয় তো কি করবে?

দাদু তেমনি চোখ পাকিয়ে জবাব দিল, অল্পেতে ছাড়ব ভেবেছিস, ওই ফোটোর একটা কপি আমাকে না দিলে খুন করে ফেলব না?

দূর্বা হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল।—এরপর শেফালি আমাকে খুন করতে আসবে, খাবার তৈরি করে বসে আছে—

শেফালি ছোট বোন। বয়েস সতের। দূর্বার থেকে ছ' বছরের ছোট। কিন্তু বয়সের তুলনায় বেশি পেকে গেছে। কারো থেকে বেশি ছোট বা কম বুদ্ধিমতী ভাবে না নিজেকে। সিনেমার নাম শুনলে জিভে জল গড়ায়। একবার ফেল করে এবার ক্লাস টেন-এ উঠেছে।

পড়ার বইয়ের থেকে সিনেমার পত্র-পত্রিকাগুলোর প্রতি ঢের বেশি মনোযোগ। পাড়ার ছেলেমেয়েগুলোর কাছ থেকে চেয়েচিন্তে নিয়ে আসে। দিদির সঙ্গে বনিবনা তেমন নেই, কারণ দিদি ফাঁক পেলেই তাকে বকা-ঝকা করে, উপদেশ দেয়। দিদিকে হিংসে করে তার প্রধান কারণ, তারও চেহারাপত্র খারাপ নয়, কিন্তু দিদির ঢের ভালো। মনে মনে দিদিকে বোকাও ভাবে আবার। বছরের পর বছর চলে যায়, দিদি চেহারা ধুয়ে কেবল জলই খাচ্ছে—তেমন কেউকেটা কারো কাঁধে চেপে বসতে পারছে না। দিদিটি বে-খাপ্পা রকমের রেগে না গেলে তাকে ও কেয়ারও করে না। বরং নিজেই বড়র মতো উপদেশ আর পরামর্শ দিতে আসে।

দূর্বা ঘরে ফেরার দশ মিনিটের মধ্যে আবার বৃষ্টি এলো। তোড়ে নয় অবশ্য। সন্ধ্যে হয় হয়। বেশ ঠাণ্ডা বাতাসও ছেড়েছে। চিড়ের সঙ্গে আলু কুচিয়ে দিয়ে তেলে ভেজে বেশ রসালো জলখাবার করেছে শেফালি। এ ব্যাপারে তার মাথা ভালো খোলে। ওতে একটু পেঁয়াজ-কুচি ভাজাও মিশিয়েছে। তাতে নুন গোলমরিচ। দু'বোন নিঃশব্দেই খাচ্ছিল। শেফালি আশা করেছিল দিদির মুখে দুটো প্রশংসার কথা শুনবে।

আলু-চিড়েভাজা চিবুতে চিবুতে টেরিয়ে টেরিয়ে দিদির মুখখানা দেখল বার কয়েক।
—আজও তুই টিউশনিতে যাবি?

—না যাবার কি হয়েছে?

—এখনো তো বৃষ্টি পড়ছে, একবার ভিজে নেয়ে এলি, আবার ভিজতে হবে।

মুখ তুলে এবার বোনের মুখখানা লক্ষ্য করল দূর্বা। কোনো উদ্দেশ্য ভিন্ন ওর মুখে দরদের কথা বড় শোনা যায় না। একটা নয়, সকাল আর সন্ধ্যায় দু'দুটো টিউশনি করে নিজের আর বোনের অনেক খরচ চালাতে হয় তাকে। সন্ধ্যের টিউশনির কড়াকড়ি আরো বেশি। ক্লাস সেভেনের একটা মেয়ে পড়ে। মাস গেলে চল্লিশ টাকা মাইনে। গোটা মাসের কামাইয়ের হিসেব তারা রাখে। কামাই হলে মাইনে কাটে না অবশ্য, কিন্তু মেয়ের মা মাইনে দিতে এসে কথা শোনায়। শেফালি বলে তুই একটা বোকা তাই চল্লিশ টাকায় আছিস, আমাদের ক্লাসের টিচাররা ক্লাস সেভেনের মেয়ে পড়াতে কমসে কম একশ' টাকা নেয়। বসন্তদাকে বলে মাইনেটা পঞ্চাশ ষাট টাকা করে নিলেও তো পারিস।

আজকালকার বাজারদর দূর্বাও মানে। কিন্তু সে দাম তাকে দিচ্ছে কে? উল্টে ওই চল্লিশ টাকার জন্যেই বিচ্ছু ছাত্রীটিকে তোয়াজ তোষামোদ করে চলতে হয়। সকালের টিউশনির মাইনে পঁচিশ টাকা। একটা বাচ্চা ছেলে পড়ে। সর্বসাকুল্যে পঁয়ষট্টি টাকা ঘরে আনে। কিন্তু এতে সুখ না থাকুক স্বস্তি আছে। এক মারোয়াড়ী বাড়ি একশ' টাকা মাইনের টিউশনি জুটেছিল। এগারো দিনের দিন পালিয়ে বেঁচেছিল। সেই এগারোটা দিনের মাইনেও আর আনতে যায়নি। এগারো দিনের মধ্যে চার দিন ছাত্রী আর তার মা বাড়ি ছিল না। ছাত্রীর বাপ ছিল। সে এসেছিল। পড়ানোর সময় পর্যন্ত ঘড়ি ধরে তাকে আটকে রেখেছিল। সেই ফাঁকে একদিন তাকে বড়লোক করে দেবার প্রস্তাব করেছিল।

আজ এ-ভাবে ভিজে-টিজে এমন হতাশা নিয়ে ঘরে ফেরার পর সন্ধ্যায় আবার ছাত্রী ঠ্যাঙাতে যাবার ইচ্ছে দূর্বারও ছিল না। কিন্তু শেফালির মাথায় কি আছে সেটা বোঝার জন্য সে-কথা বলল না। জিজ্ঞেস করল, ঘরে বসে থেকে কি করব, তোর কি ইচ্ছে—

—তোর বরের কাছ থেকে কয়েকটা টাকা চেয়ে নিয়ে আয় না, বৃষ্টিবাদলার রাত, একঘেয়ে ভাত ডাল তরকারি আর ভাল লাগে না। ঘরে ডাল তো আছেই, কিছু সুগন্ধি চাল, কয়েকটা ডিম আর আদা-পেঁয়াজ এনে খিচুড়ি রাঁধতে পারিস—গরম গরম খিচুড়ি আর ডিমভাজা—আঃ!

ভাবতেও জিভে জল গড়ানোর দাখিল শেফালির। বরের কাছ থেকে টাকা চেয়ে আনার অর্থ ও-বাড়ির দাদুর কাছ থেকে। দরকারের আঁচ পেলে চাইতে হয় না, দাদু নিজে থেকেই ওর হাতে টাকা গুঁজে দেয়। আঁচ পেতে আর অসুবিধে কি, বাবাকে তো হাড়ে হাড়ে চেনে। তাই প্রতিমাসের শেষের দিকে নিজেই খুঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে হাতে খরচ চালানোর মতো টাকা আছে কিনা। থাকুক না থাকুক দূর্বা অম্লানবদনে মাথা নাড়ে। অর্থাৎ আছে। পারতপক্ষে হাত পেতে সে দাদুর কাছ থেকে টাকা নিতে চায় না। এই দাদুকে নিয়ে মনে মনে হিংসে শেফালির। অথচ দাদু যখন করে, দুজনার জন্যেই করে। পুজোতে ষষ্ঠীতে নিজের মেয়েদের আর নাতি নাতনিদের জন্য যেমন জামাকাপড় কেনে, ওদের দু'বোনের জন্যও তেমনি কেনে। জন্মদিনে শেফালি সবার আগে দাদুকে প্রণাম করতে ছোটে। সবার আগে কেন, আর কাউকে তো করেই না। শুধু এই এক জায়গায় প্রণাম করলে নগদ লাভ। দিদিটা বোকা, তার জন্মদিন কবে জিগ্যেস করলে বলে দেয়, জানে না। না জানলেও বছরের যে কোনো একটা দিন ঠিক করে নিলেই তো হয়। কিন্তু তবু শেফালি মনে মনে বেশ জানে দাদুর প্রাণবল্লভা যদি কেউ থেকে থাকে সে এই দিদিটি। তাই 'তোর বর' ছাড়া আর কিছু বলে না। শুনে শুনে দূর্বারও সয়ে গেছে।

মাসের এটা মাঝামঝি। সংসারের টাকা ছাড়াও নিজের টাকা কিছু হাতে আছে এখনো। হিসেবের বাইরে দূর্বা একটি টাকাও বাড়তি খরচ করে না। আজ বোনের এই খাওয়ার লোভটাকে সে দরদের চোখেই দেখল। ওর সবই স্বাভাবিক। খেতে ভালো লাগে, পরতে ভালো লাগে, ফুর্তি ভালো লাগে, সিনেমা থিয়েটার ভালো লাগে।

দূর্বা বলল, চাইতে হবে না, টাকা আমি দিতে পারি, কিন্তু তোকে রাঁধতে হবে, আমি পারব না।

শেফালি তখুনি ফোঁস করে উঠল।—তা পারবি কেন, কেউ রেঁধে এনে দিলে মহারানীর মতো বসে খেতে পারবি। আচ্ছা টাকা দে, আমিই করছি সব।

ব্যাগ খুলে দূর্বা পাঁচ টাকার একটা নোট বার করে ওর হাতে দিল। মুহূর্তের মধ্যে কিছু ভেবে বলল, এক কাজ কর, দাদুর ছাতাটা চেয়ে নিয়ে যা, আর হারুকে বলে দিবি, ভাত-টাত যেন না রান্না করে—এখান থেকে খিচুড়ি আর ডিমভাজা যাবে।

একটু ইতস্তত করে শেফালি বলল, তাহলে তো পাঁচ টাকার সবটাই লেগে যাবে—

—লাগে লাগবে, তা বলে আমরা খাব আর দাদু খাবে না?

এখানে সময় সময় একটু ভালো মন্দ যা-কিছু রান্না হয়, দাদুর জন্যে একটু ভাগ যায় জেনেও শেফালি ঠাট্টা ঠিসারা করতে ছাড়ে না। হি-হি করে হেসে উঠল।—আগের দিনে তো ঘাটের মড়াও নাবালিকা ঘরে আনত রে দিদি—বাবাকে বলে লাগিয়ে দিই না?

দাবড়ানি খাবার আগেই ছুটল। সোজা দোতলায় দাদুর ঘরে।—হারুকে বলে দাও

আজ তোমার নো ডাল ভাত রান্না—তোমার প্রাণেশ্বরী খিচুড়ি আর ডিমভাজা পাঠাচ্ছে, ছাতাটা দাও—জলদি।

দিতে হল না, ঘরের কোণ থেকে নিজেই তুলে নিল।

রাধাকান্ত হেসে জিজ্ঞেস করলেন, উৎসব কেন, তোর কিছু গতিটতি হল?

শেফালি মুখ মচকে জবাব দিল, আমার আর কি গতি হবে, বর্ষার দিনে তোমার জন্যে দিদির মন উড়ু-উড়ু, সেই মওকায় তার ঘাড় ভেঙে পাঁচটা টাকা আদায় করলাম—নইলে দিদির হাত দিয়ে পয়সা গলে?

ছুটল। পিছন থেকে রাধাকান্ত বললেন, হারুকে একবার ডেকে দিয়ে যা—।

বাজার আর দোকানপাট ঘর থেকে দু'মিনিটের পথ। কেনাকাটা শেষ করে দাদুর ছাতা দাদুকে ফিরিয়ে দিয়ে এসে শেফালি বাইরে তোড়জোড়ে বসল। রান্না-বান্না বেশির ভাগ দুজনকে কিছুটা ভাগাভাগি করে করতে হয়। সকালে দিদির টিউশনি। ফলে আপিসের আগে বাবাকে ভাত দেবার দায় শেফালির। এ নিয়ে দিদিকে কম কথা শোনায় না। যদিও খুব সকালে উঠে রান্নার কাজ কিছুটা সেরে রেখেই বেরোয়। রাতের রান্না দিদির বরাদ্দ। আটটার মধ্যে টিউশনি সেরে এসে রান্না চড়ায়। যে-দিন পারবে না ওকে আগে থাকতে বলে যায়। এ বিদ্যেয় শেফালিরও মোটামুটি পাকা হাত এখন।

গম্ভীর মুখে তোড়জোড়ে বসে শেফালি দিদিকে বলল, যা আজ তোর ছুটি, আমি সব ক'চ্ছি। তোর বর হুকুম করেছে, হারু এসে তোর আর তার খাবারটা একসঙ্গে নিয়ে যাবে, মুখোমুখি বসে খাবে। এমন দিনে তোকে বলার মতো তার কিছু কথা আছে।

মন মেজাজ এখনো ভালো না দূর্বার। তবু হাসি চাপতে হল। মেয়েটা দিনকে দিন বড় বেশি পাকা হয়ে যাচ্ছে ভেবে চিন্তাও হয়।

মিনিট পনেরর মধ্যে কড়া নাড়ার শব্দ। নিজের বিছানায় দূর্বা গা ছেড়ে শুয়েছিল। ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকাল। কিন্তু শব্দটা তেমন চেনা-হাতের কড়া নাড়ার মতো মনে হল না। উঠে এলো। কিন্তু তার আগে কে এলো দেখার জন্যে শেফালিও উঠে এসেছে। তারও অসহিষ্ণু চাউনি; দরজাটা সেই খুলল।

পরের মুহূর্তে দুই চক্ষু বিস্ফারিত। আনন্দে মুখে কথা সরে না।

হারু। তার হাতে ঝোলানো রূপোর চাঙের মতো নধর-বপু একটা গঙ্গার ইলিশ। দেখার মতোই, কম করে দেড় কিলো হবে। হারু জানাল, কর্তা বলেছেন, ডিম-ভাজা আর খিচুড়ির সঙ্গে ইলিশ মাছ ভাজাও খাবেন।

বিহ্বল আনন্দের ধাক্কায় শেফালি একটা কাণ্ডই করে ফেলল। হঠাৎ দিদির গলা জড়িয়ে ধরে দু'গালে চক-চক করে দুটো চুমু খেয়ে বসল। হারু মাছ রেখে চলে যেতে রাগের সুরে দূর্বা বলল, কি কারস, আমি সামনে না থাকলে ওই চুমু দুটো ওর বরাতেই জুটত?

শেফালি হি-হি করে হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে চলে গেল। দূর্বা একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলল। ও-রকম ইলিশ মাছ ওরা বাজারেই যা দুই একটা দেখে। ঘরে আনার কথা ভাবেও না। কিন্তু অদৃষ্ট তো এ-রকম হবার কথা নয়।

এবারে তাকেও এসে হাত লাগাতে হল। শেফালির এখন চার-গুণ উৎসাহ।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই এত উৎসাহে ছাই পড়ল এক-দফা। ওদিকের দরজায় আবার

ধাক্কা। এই ধাক্কা দু'বোনেরই খুব চেনা। বাবা এলো। দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকাল। এ সময়ে এই একজনের আসাটা উপদ্রবের মতো। নেশা সেরে রাত দশটা সাড়ে দশটার আগে সচরাচর ঘরে ফেরে না। দাদুর কারসাজিতে দাপটের বাবা বছর দেড় দুই যাবৎ অনেক টিট হয়েছে। চুক্তি-মতো বাইরের থেকে নেশা সেরে আসতে হয়। তার আগে সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ ছ'দিন বাড়িতেই হুলস্থূলু কাণ্ড হত। তবু বাড়িতেও যে এক-একদিন নেশা করে না এমন নয়। কিন্তু নিজেও দায়ে পড়ে কিছুটা সতর্ক। আর বাড়াবাড়ি করার মতো ইন্ধনও কেউ জোগায় না।

দূর্বার মুখে কঠিন আঁচড় পড়তে লাগল। বোনকে বলল, খুলে দিয়ে আয়।

চাপা রাগে শেফালি মুখঝামটা দিল।—আমি পারব না, সঙ্গে আবার সেই কার্তিকও আছে কিনা কে জানে—তুই যা।

দূর্বা উঠে হাত ধুয়ে নিল। ওদিকে আবার অসহিষ্ণু হাতের ধাক্কায় বন্ধ দরজা কেঁপে উঠল। দূর্বা দরজা খুলল।

বাবা। হাতে কাগজে মোড়া বোতল। পরনের ট্রাউজার আর শার্ট জবজবে ভিজে। খেঁকিয়ে উঠল, ভরসন্ধ্যায় ঘুমোস নাকি সব—এতক্ষণ দরজা ধাক্কাচ্ছি কানে যায় না?

বছর তিন চার আগেও এই বাবাকে যমের মতো ভয় করত তারা। যতক্ষণ বাড়িতে থাকত, কাঁপত। শেফলি এখনো ভয় করে। দূর্বার ভয়ডর এখন গেছে। আছে শুধু অফুরন্ত ঘৃণা। জবাব না দিয়ে দরজার কাছ থেকে সরে দাঁড়াল। অপলক কঠিন চাউনি বাবার মুখের ওপর।

কৃষ্ণেন্দু বোস ঘরে পা দিল। ভারী লালচে মুখ। চোখ দুটো সর্বদাই লাল। দেখলেই বোঝা যায় সুঠাম সুপুরুষ ছিল এক-কালে। তার পিছনে অমল বিশ্বাস। বাবার আপিসে তার আন্ডারে চাকরি করে। তার দায়ে-পড়া গোছের হাসি-হাসি মুখ। দূর্বাকে বোঝাতে চায় তার কোনো দোষ নেই, গলায় গামছা বেঁধে আনা হয়েছে বলে এসেছে। বাপের অন্তরঙ্গ সহচর হলেও বয়েসে দুজনের কুড়ি একুশ বছরের তফাৎ। বাবার ঊনপঞ্চাশ, এর আটাশ ঊনত্রিশ। বাবা তার কাছে একজন আদর্শ পুরুষ। ভাবখানা তাকে আগলে রাখার জন্যই সর্বদা তার সঙ্গে ছায়ার মতো ফেরে। সঙ্গে থেকেও মদ না খেলে বাবা চটে যায় বলেই খেতে হয় নইলে এ জিনিসে তার একটুও আসক্তি নেই। বাবাকে বশ করার পিছনে তার মতলবখানা কি, দূর্বা কেন, অনেকেরই তা জানতে বাকি নেই।

নেশা করলে কৃষ্ণেন্দু বোসের দাপট বাড়ে। আগে প্রায়ই তাকে চিৎকার করে বলতে শোনা যেত, তার ভাবী বড় জামাইকে কেউ হেলাফেলা করলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে। এ নিয়ে অনেক কাণ্ড অনেক কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে।

মেয়ের ধারালো মূর্তির দিকে চেয়ে কৃষ্ণেন্দু বোসের মেজাজ খিঁচড়ে গেল। কিন্তু আগের দিন আর নেই সে-জ্ঞান আছে। ছোট মেয়ে হলে হাতের বোতল উঁচিয়েই মারার হুমকি দিত। বড় মেয়েকে ইদানীং একটু সামলে চলতেই হয়। উষ্ণ ঝাঁঝে মেয়েকে বলল, ও-রকম চেয়ে আছিস কেন, এত বৃষ্টির মধ্যে কোথায় যাব? নিজের ঘরে বসে চুপচাপ খাব, তাতে কার কি? যা নিজের কাজে যা—কোনো হল্লা-টল্লা না হলেই তো হল!

নিজের ঘরে চলে গেল। পিছনে অমল বিশ্বাস।

দূর্বা আর শেফালি দুজনেই চুপচাপ। হাঁড়িতে চাল ডাল চড়িয়ে শেফালি আনাজ-কাটা বঁটি দিয়ে কিছু আলু পটল ছাড়াতে বসেছে। খিচুড়িতে ফেলে দেবে। দূর্বা আঁশ-বঁটি দিয়ে মোটামুটি একটা হিসেব মাথায় রেখে মাছের টুকরো করছে। কারো মুখে কথা নেই। আনন্দের অর্ধেক মাটি কি তারও বেশি সেটা এখনো অনিশ্চিত।

তরকারি নিয়ে বসার আগেই শেফালি একটা ডিশে খানিকটা নুন আর আদা কুঁচিয়ে রেখেছিল। চাইতে এলো বলে। বাংলার সঙ্গে এ দুটো জিনিস লাগে। জল আর গেলাস খাবার ঘরেই থাকে। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে হাসি-হাসি মুখে অমল বিশ্বাস কাছে এসে দাঁড়াল। শেফালি সঙ্গে সঙ্গে আদাকুঁচি আর নুনের ডিশ তার দিকে এগিয়ে দিল।

—বাঃ, একেবারে রেডি! দূর্বার দিকে চোখ যেতেই গলা দিয়ে সত্যিকারের বিস্ময় ঝরল, কি ব্যাপার, কোনো উৎসব-টুৎসব নাকি? আমাদেরও ভাগে জুটবে তো?

আস্তে আস্তে মুখ তুলে দূর্বা সোজা তার দিকে তাকাল। ঠাণ্ডা কঠিন চাউনি। বলল, কিছু দেরি হবে, হয়ে গেলে দুজনেরটাই ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি কিন্তু কোনরকম হৈ-হল্লা হলে সকলেরটা উনুনে যাবে।

অমল বিশ্বাস জোরে মাথা নেড়ে আশ্বাস দিল টুঁ-শব্দটি হবে না দেখে নিও—ওই জন্যেই তো আমি সঙ্গে এলাম—এত দিনেও আমি তোমাদের মন বুঝি না ভাবো?

দুর্বার চোখ আবার মাছের দিকে ফিরল। কথা বাড়ালে এই লোক এখান থেকে সহজে নড়তে চাইবে না জানে। ও-দিক থেকে কৃষ্ণেন্দু বোসের হাঁক শোনা গেল, কই রে—!

অগত্যা লুব্ধ চাউনি তার তপ্ত মুখ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে ঘরে চলে গেল। শেফালি একটুও শব্দ না করে হেসে উঠল। দূর্বা তা-ও টের পেল। মুখ তুলে থাকাতে ফিসফিস করে বলল, গঙ্গার ইলিশ আবার একটা জিনিস—ওর কাছে তার থেকে ঢের ভালো জিনিস তোর মুখখানা।

হঠাৎ-হঠাৎ যে মুখ আর চোখ দেখলে শেফালি একটু ঘাবড়ে যায়, দিদির এই মুহূর্তে সেই মুখ আর সেই চোখ। তাড়াতাড়ি আনাজ ছাড়ানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দূর্বা আর মুখে কিছু বলল না ওকে। ভিতরটা বিষিয়ে গেছে। ছ' বছরের বড় বোনের সঙ্গে এ-রকম রসিকতা করার কথা নয়। কিন্তু ওর কি দোষ। সবটাই এ-বাড়ির হাওয়ার দোষ।

হারুকে খবর না দিয়ে দূর্বা দাদুর একলার খাবারটাই নিয়ে এলো। দেখা মাত্র দাদু সকোপে ঘোষণা করল, খাব না—যা।

—দেখো, আমার মেজাজ-পত্র ভালো না। শেফালিটার উৎসাহে এ সব হল, ওকে ফেলে খাই কি করে। তুমি খাও, আমি বসছি।

গম্ভীর মুখখানাব দিকে চেয়ে রাধাকান্ত মিটিমিটি হাসছেন।—মেজাজ ভালো না কেন, চাকরিটা হল না বলে?

দূর্বা জবাব না দিয়ে দাদুর সামনে থালা বাটি সাজিয়ে দিতে লাগল। চাকরির ব্যাপারে হতাশাটা নতুন কিছু নয়। ভিতরটা হঠাৎ কেন এত খিঁচড়ে গেল নিজেও জানে না।

ইলিশ মাছের পরিমাণ দেখে রাধাকান্ত আঁতকে উঠলেন।—করেছিস কি, এই বুড়ো বয়সে মারবি নাকি আমাকে!

ঠাণ্ডা গলায় দূর্বা বলল, অত এনেছ কেন—শুরু করো তো।

রাধাকান্ত একটা মাছভাজা আর অর্ধেক ডিমভাজা আলাদা সরিয়ে রাখতে রাখতে জিগ্যেস করলেন, তোদের সকলের জন্য ঠিকমতো আছে তো?

—অনেক আছে।

হৃষ্ট বদনে খেতে শুরু করে রাধাকান্ত বললেন, তোর মেজাজ ভালো করার একটা ওষুধ পেয়ে গেছি—এখন তুই সেটা গিলবি কিনা বুঝছি না।

ভনিতা শুনে দূর্বার মনে হল, দাদু কোনো সুপাত্র-টাত্রর কথা বলবে। দাদুর খাওয়ার সময় রাগারাগি করার ইচ্ছে নেই বলেই চুপ করে রইল। একটুও আগ্রহ দেখাল না।

কিন্তু দাদুর মুখের হাসিটা অন্যরকম লাগল। দুই এক গরাস খেয়ে আবার বললেন, দেখ, খারাপের সবটাই খারাপ নয়—আজ বাসে যে ছেলেটা তোর ফোটো তুলে নিয়েছে বললি, আমার মনে হল সে রণিতই হবে। তাই থেকে যে বাড়িতে ওর হামেশা যাতায়াত তাদের কথা মনে পড়ে গেল। তুই চলে যাবার পর সেই বাড়ির গিন্নির সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্তা হয়ে গেল। যদি রাজি থাকিস এবারে আর ফিরতে হবে না—কাজটা হয়েই যাবে—কাল তোকে পাঠিয়ে দিতে বলেছে।

দূর্বা এতক্ষণে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল।—স্কুলের কাজ না?

—না, বাড়ির কাজ।

দূর্বা ভেবাচাকা খেয়ে গেল একটু। দাদু ওকে বাড়ির কি কাজে পাঠানোর কথা ভাবতে পারে!

—বসেই তো আছিস, গিয়ে দেখ্ না কেমন লাগে। সে-রকম ভালো কাউকে পেলে পাঁচশ টাকা পর্যন্ত মাইনে দিতে রাজি তারা।

টাকার অঙ্কটা প্রায় অবিশ্বাস্য ঠেকল দূর্বার কানে। আজ যেখান থেকে নিরাশ হয়ে ফিরেছে সেখানেও মাইনে সর্বসাকুল্যে আড়াইশ'। অথচ দাদু এমনভাবে বলছে যেন এ চাকরি একেবারে হাতের মুঠোয়। ব্যস্ত হয়ে উঠল, বাড়ির কি কাজ তাই তো বলছ না?

—ষোল বছরের একটা অসুস্থ ছেলের জন্য হোল-টাইম কম্‌পেনিয়ন দরকার তাদের—হোল-টাইম বলতে সকাল আটটা থেকে রাত আটটা। দুপুরের খাওয়াটা—বড়লোকের বাড়িতে খাওয়া বলে না লাঞ্চ বলে—সেটাও তারাই দেবে।

শুনে দূর্বা হাঁ খানিক।—আমি নার্সিংয়ের কি জানি!

—নার্সিং বললাম নাকি তোকে? ইনভ্যালিড ছেলের একটি সারাক্ষণের কম্‌পেনিয়ান দরকার—সর্বক্ষণ তার কাছে থাকতে হবে, গল্প করতে হবে—বই-টই পড়ে শোনাতে হবে—এই সব। তুই রাজি থাকলে আর তাদেরও মনে ধরলে তাদের বলে ওই মাইনে আমিই আরও বাড়িয়ে দিতে পারব।

এরপর সাগ্রহে বিস্তারিত শুনল দূর্বা। বাবা আজ ঘরে বসে মদ খাচ্ছে বা শেফালি তার জন্যে অপেক্ষা করছে, তারও মনে থাকল না।...রাজি থাকলে বালিগঞ্জের যে ঠিকানায় ওকে যেতে হবে তার নাম সরকার লজ্‌। বাড়ির কর্তা নিখিলেশ সরকার মস্ত অবস্থার মানুষ—ডালহৌসীর সরকার মোটরস-এর মালিক। বিলেত-ফেরৎ অটোমোবাইল এনজিনিয়ার। ভদ্রলোকের বয়েস এখন বাষট্টি তেষট্টি হবে। তার বাপের ছোট-খাট

মোটর পার্টস-এর দোকান ছিল। নিখিলেশ সরকারের এনজিনিয়ার কাকা দাদুর অন্তরঙ্গ সহপাঠী ছিলেন। দুজনে এক স্কুলে এক কলেজে পড়েছেন। আর নিখিলেশ সরকারও দাদুর গোড়ার দিকের ছাত্র ছিলেন। তাঁর কাকা অর্থাৎ বন্ধুর অনুরোধে ম্যাট্রিক পর্যন্ত তাঁকে বাড়িতেও পড়িয়েছেন। কাকা এনজিনিয়ার হলেও দাদুর জ্যোতিষীর ওপর বেজায় আস্থা ছিল। তাঁর আগ্রহে নিখিলেশ সরকারের ঠিকুজি দেখে দাদু বলেছিলেন, কালে দিনে ওই ছেলে স্বাধীন ব্যবসায় মস্ত একজন হবে। আসলে দাদু নাকি তখন ভালো ছাড়া মন্দ বড় কাউকে বলতেন না। যা-ই হোক, সেই ভবিষ্যদ্বাণীও লেগে গেল। নিখিলেশ সরকার বিলেতে এনজিনিয়ার হতে গিয়ে হয়ে এলেন অটোমোবাইল এনজিনিয়ার। এ-জন্যে কাকার সঙ্গে মন-কষাকষিও হয়ে গেছল। তিনিই তাঁকে খরচ-পত্র করে পাঠিয়েছিলেন। ফিরে আসার পর মোটামুটি ভালো চাকরি পেয়েও তাঁর মন ওঠেনি। মাস্টারমশায় অর্থাৎ দাদুর ভবিষ্যদ্বাণী মাথায় ছিল। দু'চার দিন বাদে বাদে এসে দেখাও করেছেন তাঁর সঙ্গে। ও-দিকে বাপের মোটর পার্টস-এর ব্যবসায় যোগ দিয়েছেন। তাঁর কাকার রাগও দাদুই ঠাণ্ডা করেছেন। শুধু তাই নয়, দাদুর কথার ওপর নির্ভর করে ব্যবসা বাড়ানোর জন্য সেই দিনে ভাইপোকে তিরিশ হাজার টাকা পর্যন্ত দিয়েছিলেন।

সেই থেকেই এখন এত বড় অবস্থা। ভদ্রলোকের বাবাও আর বেঁচে নেই, কাকাও না। নিখিলেশ সরকার ছাত্রকাল থেকেই দাদুকে ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন খুব, পরে সেটা আরো ঢের বেড়েছে। অবস্থা ফেরার পর দাদুকে কতভাবে কত কিছু দিতে চেয়েছেন, কিন্তু দাদু দাবড়ানিও দিয়েছেন আবার বুকে টেনেও নিয়েছেন। ছাত্র নিখিলেশ সরকারের স্ত্রী নির্মলা সরকারও বড় ঘরের মেয়ে। তাঁদের আভিজাত্যের চটক শ্বশুরবাড়ির থেকেও বেশি। নিখিলেশ বিলেত-ফেরৎ না হলে ও মেয়ে এ ঘরে আসতেন কিনা সন্দেহ। স্বামীর মুখ থেকে শুনেই হোক বা যে কারণেই হোক দাদুর ওপর তাঁরও গোড়া থেকেই খুব ভক্তি শ্রদ্ধা। নিখিলেশ সরকার তেমন সময় পান না, দাদুর সঙ্গে যোগাযোগ বেশি তাঁর স্ত্রীটির। বাইরের আদব-কায়দা যেমনই হোক, ভাগ্যের ব্যাপারে চাপা দুর্বলতা অনেকেরই। সেই কারণে, আপদ বিপদের ছায়া দেখলেই মহিলা টেলিফোনে অথবা লোক পাঠিয়ে দাদুর শরণাপন্ন হন। অত টাকা অমন অবস্থা, কিন্তু শান্তি খুব নেই। সব থেকে খারাপ ওদের সন্তান-ভাগ্য। তিনটে ছেলে আর দুটো মেয়ে ছিল। বছর ছ'সাত আগে একটা তাজা ছেলে অ্যাকসিডেন্টে বেঘোরে মারা গেল। বছর তিনেক হল ছোট ছেলেটার ভয়ংকর রোগ ধরা পড়েছে। লিউকিমিয়া। এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই, বাঁচেও না। মাঝে মাঝে রক্ত দিতে হয়। দাদু অনেকবার দেখেছে, ভারী মিষ্টি ছেলেটা, সব সময় বোঝাও যায় না এমন একটা মারাত্মক রোগ নিয়ে বসে আছে।

শুনে মনটাই খারাপ হয়ে গেল দূর্বার। বাঁচবে না এমন একটা ছেলের সঙ্গে সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত লেপটে থাকতে হবে...! জিগ্যেস করল, আর অন্য ছেলে আর মেয়েরা?

—তাদেরও মতি-গতির ঠিক নেই। গেলেই টের পাবি।

দূর্বা জিগ্যেস করল, তাহলে আমাকে পাঠাতে চাইছ কোন ভরসায়?

কি বলতে চায় বুঝে রাধাকান্ত বললেন, সে-রকম ভয়ের কিছু নেই, ওই ছেলে-মেয়েরাও আমাকে ভালোই জানে। অসম্মান করবে মনে হয় না...তাছাড়া তোকেও তো

চিনি—ঠিক বুঝে শুনে চলতে পারবি।

একটু চুপ করে থেকে দূর্বা জিগ্যেস করল, আজ যে আমার ফোটো তুলল এর মধ্যে সেই ছেলে এলো কোত্থেকে?

কোত্থেকে এলো শুনল। সরকারদের যে ছেলেটা অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে, রণিত দত্ত তার প্রাণের বন্ধু ছিল। ও-বাড়ির ঘরের ছেলের মতোই হয়ে গেছে। খেয়ালখুশি মতো ওদের কাছে এসে থাকেও। বিশেষ করে ওই অসুস্থ ছেলেটার ওপর তার নাকি খুব টান। নিজের ছেলেমেয়েদের দিয়ে কুটোটি নাড়াতে পারেন না নির্মলা সরকার, তার দরকারে রণিত ভরসা। তাদের মস্ত গাড়ি হাঁকিয়ে মাসে একবার দু'বার ওই রণিত দত্ত দাদুকে নিয়ে যেতে আসে।

শোনার পর দূর্বার মনে পড়ল। গাড়িও দেখেছে, রণিত দত্তকেও দেখেছে।

রাধাকান্ত বললেন, ও-ছোঁড়ার কথা না উঠলে তো ভুলেই গেছলাম—এই দিন দশেক আগে এসে বলে গেছল মিসেস সরকার ছেলের জন্য ভালো একজন কমপেনিয়ন খুঁজছে, জানা-শোনা তেমন কেউ আছে কিনা।...পালা করা নার্স দিয়ে সুবিধে হচ্ছে না, তারা আপনার জনের মতো হয়ে উঠতে পারে না। ডাক্তারও পরামর্শ দিয়েছে নার্স দরকার নেই, ওর মনের মতো একজন সঙ্গী বা সঙ্গিনী দরকার। তোর কথা তখন অবশ্য একবারও মনে হয়নি আমার...। গিয়ে দেখ না, ভালো লাগতেও পারে, ছেলেটার জন্যে সত্যি খুব মায়া হয় আমার।

দূর্বা বলল, মাসে যা দেবে শুনে তো আমারও ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু যে রোগের কথা বললে...চোখের সামনে দু'চার মাসের মধ্যে কিছু হয়ে গেলে বিচ্ছিরি লাগবে!

রাধাকান্ত আশ্বাস দিলেন, না রে না, পয়সার জোর আছে, চিকিৎসার অন্তত ত্রুটি হবে না—দু'চার মাস ছেড়ে দু'দশ বছরও টিকে যেতে পারে, আর তার মধ্যে এ-রোগের চিকিৎসা কিছু বেরিয়ে যাবে কিনা কে বলতে পারে।

শুনে দূর্বা সত্যি উৎসাহ পেল।—ঠিক আছে, তোমার চিঠি নিয়ে আমি কালই দেখা করব।

## তিন

বাইরে থেকে দেখলে দূর্বা বোসের ভিতরের আঁচ কেউ কল্পনা করতে পারবে না। বাইরে থেকে দেখার লোক অনেক আছে। সব থেকে বেশি দেখে পাড়া-প্রতিবেশীরা। বছরের পর বছর ধরে দেখে এসেছে। এখনো দেখছে। পাঁচ বছর আগে পর্যন্ত তাদের নিয়ে ঘরে ঘরে কানাকানি ঠাট্টা-বিদ্রূপ আর মুখ চুলকনো দরদের অন্ত ছিল না। এখন আর দরদের ছিটে ফোঁটাও নেই। দূর্বা বোসের কানে না এলেও কানাকানি ঠাট্টা-বিদ্রূপ আগের থেকে কিছুমাত্র কমেনি সেটা বেশ বুঝতে পারে। পাশের বাড়ির দাপটের দাদু না থাকলে কবেই তাদের পাড়া-ছাড়া হতে হত। ভাগ্য গোনার দৌলতে দাদুকে সমীহ করে না পাড়ায় এমন বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় কেউ নেই।

ভিতরের আগুন অতি নিরীহ জনকেও একসময় বিদ্রোহী করে তোলে। ছেলেবেলা

থেকে দূর্বা বোসের বুকের তলায় সেই আগুনই জ্বলছে। জীবনের প্রতিটা দিনকে ধিক্কার দিয়েছে। জন্মটাকে অভিসম্পাত করেছে। চার বছর আগেও রাস্তায় চলতে যে মেয়ে মুখ তুলে কোনো দিকে তাকাত না, মাটিতে চোখ নামিয়ে স্কুল কলেজ যেত—ফিরত, তার চলা-ফেরাটা পাড়াপড়শীর চোখে উদ্ধত নির্লজ্জ মনে হয় এখন। তাদের বিবেচনায় উল্টো হবার কথা। মাটির সঙ্গে আরো মিশে থাকার কথা। পাড়ার সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা আগেও ছিল না, এখনো নেই। আগে ছিল না কারণ মুখ ছিল না। যা ঘটে গেছে, সেই মুখে ডবল কালি পড়ার কথা। অথচ মেয়ে এখন সটান সোজা হয়ে চলে, কারো দিকে বা কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। আড়ালে আবডালে বা সোজাসুজি চোখের ভাষায় অনেকে বলে, মা ভালো পথ দেখিয়ে গেছে, আর ভাবনা কি! বয়স্কা পড়শিনীদের বরং জোয়ান বয়সের ঘরেব ছেলেকে এই মেয়ের সংস্রব থেকে আগলে রাখার চেষ্টা। সে চেষ্টাও খুব যে সফল এমন নয়। তবু নিজের ছেলের দোষ কে দেখে। এই মেয়েই চক্ষুশূল।

দাদুকে বাদ দিলে দুনিয়ার কোনো মানুষকে কি দূর্বা বোস ভালবেসেছে? বুকের তলার মরুভূমিতে কোনো নরম দাগের অস্তিত্ব নেই তার। তবে দরদ ছিল, তার থেকে বেশি অনুকম্পা ছিল একজনের প্রতি। মা। সেই মা-কে সে এখন ভক্তিশ্রদ্ধা না করুক, মনে মনে তারিফ করে। সমস্ত সত্তা দিয়ে ঘৃণা করে এসেছে—এখনো করে, শুধু একজনকে। বাবা। কোনো মেয়ের জীবনে এতবড় লজ্জা এত বড় অভিশাপ আর হয় কিনা দূর্বা বোস জানে না।

জ্ঞান বয়েস থেকে মায়ের কান্না দেখে এসেছে। তারও আগের কথা মনে নেই। কিন্তু এটুকু জানে বাবাকে তার ঢের আগে থেকেই বিভীষিকার চোখে দেখত। মায়ের নাম সুতপা। কে রেখেছিল এমন নাম জানে না। জীবনভোর মায়ের মতো তাপে জ্বলতে আর কাউকে দেখেনি। শোনেও নি। মায়ের দুটো অভিশাপ। এক বাবা। দুই রূপ। ম্যাট্রিক পাশের আগে রূপ দেখে মা-কে ঘরে আনা হয়েছিল। বাবারও সুঠাম স্বাস্থ্য। লম্বা, সুপুরুষ। গায়ে কত শক্তি রাখত। তার মেজাজের মুখ আট দশ বছর আগেও দূর্বা দেখেছে আর ভয়ে কেঁপেছে। সকলের চোখের ওপর বাড়ির মুখোমুখি কাবুলিওয়ালা টাকার তাগিদে বসে থাকত। বাবা দিন কয়েক সহ্য করেছে, নিষেধ করেছে, তারপর একদিন বেরিয়ে এসে ওদেরই লাঠি কেড়ে নিয়ে একসঙ্গে দু'জনকে বেধড়ক ঠেঙিয়েছে। পাড়াসুদ্ধু টি-টি পড়ে গেছে। দূর্বারা ক'দিন বাড়ির বাইরে মুখ দেখাতে পারেনি। কাবুলিওয়ালা ছাড়া আরো অনেক পাওনাদারকে মারধর খেতে দেখেছে তারা। বাবা বার কয়েক বলে, হাতে টাকা নেই এখন, এলে দেব। কিন্তু পাওনাদার ক'বার এমন কথা শুনতে রাজি? তাদের মুখ দিয়ে কটূক্তি বেরিয়ে আসেই। সঙ্গে সঙ্গে হাত আর কব্জির জোরে অপমানের ফয়সলা। পাড়া-মাতানো জটলা আর কটূক্তি। সামনে বা বাবার মুখোমুখি নয়। তার আড়ালে। সে-সব মায়ের কানে আসত, দাদার কানে আসত, দূর্বার কানে আসত। কিন্তু বাবার কাছে নালিশ করবে কে? বাবারও তখন সাঙ্গপাঙ্গ কম নয়। বাবার মতো অতটা না হলেও তারাও বেপরোয়া বটেই।

পাড়ার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত সকলেই জানত, কৃষ্ণেন্দু বোসের ভেতর-বার সবটাই কালো—ইন্দু কোথাও নেই। দূর্বা বা দাদা বা তাদের মা ঘরে বসে সেই

কালের আবর্তে খাবি খেত। দূর্বা ভেবে পেত না অকারণে মানুষ এমন নৃশংস কি করে হয় বা কেন হয়। বয়েসকালে বাবা ভালো স্পোর্টসম্যান ছিল শুনেছে। মরচে ধরা তার কত কাপ মেডেল ঘরে পড়ে আছে। ওদিকে অনার্স ডিগ্রী। ভালো চাকরি পেয়ে যেতে আর এম. এ. পড়েনি। কাগজে কলমে এখন তো দস্তুরমতো ভালো মাইনে। আপিসেও মদ খাওয়া রেস খেলা আর ধারে ডোবার দুর্নাম না থাকলে এতদিনে অনেকের মাথার ওপর বসে থাকত। এখনো মাস গেলে মাইনে হিসেবে যে-টাকার অংকে সই করে তা ঘরে এলে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার কথা।

মায়ের বিয়ে দিয়েছিল মামারা। তাদের দোষ খুব নেই। তারা সুপাত্রই ধরে নিয়েছিল। বিয়ের আগে থেকে বাবা যে মদ খেত, ভালো করে খোঁজ খবর নিলে জানা যেত কিনা দূর্বা বলতে পারে না। মদ সঙ্গী বাবার খেলোয়াড় জীবন থেকে। তারপর রেস এসেছে, জুয়া এসেছে। বারো তেরো বছর বয়সেই লোকের কানাকানিতে হোক বা যে-করেই হোক, দূর্বা এ-ও জেনেছে, এ-সব ছাড়াও বাবার অন্য দোষ আছে। আরো একটু বড় হবার পর ওর অবাক লাগত, মা তাদের এখনো এত সুন্দর দেখতে অথচ তাকে ছেড়ে বাবা কুচ্ছিত রাস্তা মাড়ায় কেন!

ছেলেবেলা থেকে মার খেয়ে খেয়ে দূর্বা আর তার দাদার হাড় শক্ত হয়ে গেছল। বাবা মারত, আবার নিষ্ফল আক্রোশে মা-ও সময় সময় বেদম মারত। দূর্বা আবার দাদাকেও দু'চক্ষে দেখতে পারত না। কারণ, মাত্র দু'বছরের বড় দাদা একটু ছল ছুতো পেলেই ওকেও ধরে ঠ্যাঙাতো। দূর্বা ভাবত, বড় হলে দাদাও ঠিক বাবার মতো হবে। বাবার মতো নিষ্ঠুর হবে।

কিন্তু সব থেকে বেশি মার খেত মা নিজে। শুধু মার নয়, সেই সঙ্গে বাবার কুৎসিত ইতর গালাগালি কানে আসত। এমনও অনেক দিন হয়েছে, রাতে ভাইবোনেরা খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। মায়ের চাপা আর্তনাদে ঘুম ভেঙে গেছে, মদে মত্ত বাবা ক্ষেপে গিয়ে মা-কে তাড়া করছে। মার খেতে খেতেও মায়ের সবার আগে ঘরের জানলা দরজা বন্ধ করার তাড়া। আশপাশের বাড়ির লোক শুনতে না পায় বা বুঝতে না পারে। কিন্তু তারা শুনতেও পেত, বুঝতেও পারত। তাদের ঘরের জানলা বন্ধ হত, আর অন্য বাড়ির বন্ধ জানলাও খুলে যেত।

...হঠাৎ-হঠাৎ ঠাস-ঠাস চড়ের শব্দ কানে আসত। ওরা ছেড়ে বাচ্চা বোন শেফালিও ভয়ে কাঠ হয়ে যেত। দূর্বা আড়াল থেকে দেখত মায়ের ফর্সা গালে টকটকে আঙুলের দাগ। কিন্তু সব-কিছুর আগে একটুও শব্দ না করে মা ঘরের জানলা বন্ধ করতে ছুটেছে। বাবার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। চুলের মুঠি ধরে মাকে টেনে এনে মেঝেতে ফেলে এলোপাথাড়ি পিটিছে। সেই সঙ্গে অশ্রাব্য গালাগাল। মা-কে দূর্বা সব সময় অনুনয় করত, দাদাও বলত, মদ খেয়ে ঘরে ফিরলে মা যেন একটি কথাও না বলে। কিন্তু মা তখন ওদেরই মারতে আসত। কিন্তু মা যে কোন্ দায়ে বাবার মুখোমুখি হয় তাও জানত। কিছু টাকা ছিনিয়ে নিতে না পারলে ছেলেমেয়ের মুখে কি দেবে? মাসের শেষের পনের দিন তো শুধু ডাল-ভাত আর সেদ্ধ ভাত ছাড়া এমনিতেই আর কিছু জোটাতে পারে না।

বাবাকে কিছু দিনের জন্য দূর্বা প্রথম একটু স্তব্ধ হয়ে যেতে দেখেছিল বছর আটেক আগে। এই বাংলার রাজনীতিতে তখন ধুন্ধুমার কাণ্ড চলেছে। নকশালবাড়ি খৈরিবাড়ির আগুন কলকাতায় পৌঁছে গেছে আরো একবছর আগে।

সেই খুনোখুনির রাজনীতি কলকাতার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সুযোগ সুবিধে বুঝে যারা আন্দোলনের 'আ' বোঝে না এমন সব সমাজবিরোধীরাও ছোট বড় দল বেঁধে নিজেদের নকশাল বলে ঘোষণা করেছে, লুঠতরাজ মারামারি কটাকাটিতে মেতে উঠেছে। সব থেকে শস্তা তখন মানুষের জীবন। নিলেই হল। বড় বড় সরকারি চাকুরে ব্যবসায়ী বিচারক শিক্ষাবিদরাও শিকারের লক্ষ্য। এমন দিনে হঠাৎ দাদা বাড়ি থেকে উধাও। দূর্বার বয়েস তখন পনের, দাদা গৌতম বোসের সতের। আগের বছর স্কুল ফাইন্যালে ফেল করে পড়া ছেড়েছে। ঠেঙিয়ে আধমরা করেও বাবা তাকে আর স্কুলে পাঠাতে পারেনি। বাবা তাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে। মায়ের ওপর হুকুম, ওকে বাড়ির ভাত খেতে দিলে কেউ আস্ত থাকবে না। রাগ না পড়া পর্যন্ত দাদাকে কোনো বন্ধুর আশ্রয়ে থাকতে হয়েছে। দাদার বখাটে বন্ধুর সংখ্যা তখন কম নয়।

দাদা নিখোঁজ হবার পর মা অবশ্যই উতলা। কিন্তু মুখ ফুটে একটি কথাও বলেনি। আকণ্ঠ মদ গিলে রাতে বাড়ি ফিরে রোজই একবার করে খোঁজ করেছে, ফিরেছে? ফেরেনি শুনে বলেছে, চুলোয় যাক।

দিন দশেক বাদে সেই দাদার সঙ্গে দূর্বার একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখা। দেখা করার জন্য দাদাই ওঁত পেতে দাঁড়িয়েছিল। ওকে একটু নিরিবিলিতে টেনে নিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করল, বাড়ির খবর কি?

দূর্বা জবাব দিল, এক রকমই। তুই অ্যাদ্দিন বাড়ি ছেড়ে কোথায় পড়ে আছিস?

—চুপ! শোন, পুলিশ আমাকে খুঁজছে, পেলেই খাঁচায় নিয়ে পুরবে। আমার সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে এক মা-কে ছাড়া আর কাউকে বলবি না। তিরিশটা টাকা হাতে গুঁজে দিল।—সাবধানে নিয়ে যা, মায়ের হাতে দিবি, আর বলবি তার দুঃখের দিন শেষ হয়েছে। বাবা হয় বদলাবে নয়তো শ্মশানে যাবে। বাবার সঙ্গে খুব শিগগীরই আমাদের বোঝাপড়া হয়ে যাবে।

দূর্বা হাঁ প্রথম। তারপরেই ভয়ে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল তার। এই দশ দিনের মধ্যে মাত্র দু'বছরের বড় দাদা ওর থেকে যেন ঢের বড় হয়ে গেছে। নকশাল নামটাই শুধু মুখে মুখে শোনা, দূর্বা তাৎপর্য কিছু বোঝে না। সভয়ে জিজ্ঞাসা করল, আমাদের মানে আর কারা? তুই কি নকশাল হয়ে গেছিস নাকি?

—চুপ! আস্তে কথা বল!...চেষ্টা করছি। এখনো ওদের হদিস পাইনি। নিজেরা একটা দল গড়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। খবরদার! কারো কাছে টুঁ শব্দটি করবি না—চলে যা।

দূর্বা কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ফিরল। মায়ের হাতে টাকা দিল। বলল সব। দাদার দেওয়া টাকা মা ব্যবহার করেনি সেটা অনেক পরে জেনেছে। বাবার মুখের দিকে চেয়ে ভয়ে তার গায়ে কাঁটা দিয়েছে। সে-রকম মন্ত্র জানা থাকলে বাবাকে মেরে ফেলত—দূর্বা এ-রকম কত ভেবেছে। কিন্তু এখন বাবার দিকে তাকালেই কেবল দেখে তার কাঁধের ওপর মাথাটা নেই। বাবার জন্যে মায়া দয়া তখনো এক ফোঁটা নেই, কিন্তু কি একটা ভয় একেবারে ছেঁকে ধরে আছে। কতবার ভেবেছে দাদুর কাছে ছুটে যায়, দাদুকে সব

বলে। দাদা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে এ-তো দাদু ওর মুখে কবেই শুনেছে, রোজই একবার করে ডেকে দাদার খোঁজ নেয়। দাদুকে জানালে সে-তো আর কাউকে কিছু বলবে না। কিন্তু অবুঝ ভয়টা শেষ পর্যন্ত এমনিই যে দাদুকেও বলতে পারেনি।

দিন চারেক বাদে দূর্বা লক্ষ্য করল, বাবা সন্ধ্যার কিছু পরে ট্যাক্সি করে ফিরল। সমস্ত মুখ ভীষণ থমথমে। বাইরে মদ খেলে রাত এগারোটার আগে ফেরে না। বাড়িতে মদ খেলে সঙ্গে গেলাসের ইয়ারবন্ধু কেউ না কেউ থাকেই। সঙ্গে কেউ নেই। রাত বাড়তে থাকল, মদও খেল না। কারো সঙ্গে একটা কথা নেই। রাতের খাওয়ার পরে বাইরের ফুটপাথ-এ অনেকক্ষণ পায়চারি করল। দূর্বা মায়ের মুখের দিকে তাকাল। মা ওর দিকে।

পরদিনও তাই। তার পর দিনও। পর পর পাঁচ দিন আপিসের পর বাবাকে সোজা বাড়ি ফিরতে দেখল। মদ খেল না। মারা দূরে থাক, মায়ের বা দূর্বার সঙ্গে কথাই বলল না। মদ না খাওয়ার ফলও দূর্বা দেখছে। তাকালেই মনে হয় সমস্ত রাত ঘুমোয় না। ঘোলাটে চোখ। মাঝে মাঝে মা-কে আর ওকে দেখে। কিছু একটা সন্দেহ মাথায় ঢুকেছে। সেই তাকানো দেখলে মনে হয়, গিলে খেয়ে ফেলবে। কিন্তু কিছুই করে না, কিছুই বলে না।

দু'বছরের বড় দাদার ওপর ভক্তিশ্রদ্ধা দারুণ বেড়ে গেল দূর্বার। দাদা নিশ্চয় এমন কিছু করেছে যার ফলে বাবা টিট একেবারে।

কি করেছে পরদিনই জানা গেল। দাদা সেদিনও স্কুলের গেট থেকে একটু দূরে ওর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। ইশারায় কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করল, বাবাকে কেমন দেখছিস? মায়ের বা তোর গায়ে এর মধ্যে একদিনও হাত তুলেছে?

দূর্বার ভিতরে উত্তেজনার স্রোত বইছে। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, একদিনও না। গত পাঁচ দিনের মধ্যে মদও ছোঁয়নি! তুই কি করে বাবাকে এমন করলি দাদা? বাবা এখন থেকে এ-রকমই থাকবে?

দাদার চোখে মুখে বিজয়ীর হাসি। বলল, না থাকলে সোজা কেওড়াতলা চলে যাবে —মদ ছাড়ার জন্য আমি সাত দিন সময় দিয়েছিলাম, সত্যি একদিনও খায়নি?

দূর্বা আবার মাথা ঝাঁকালো।—আমরা তো টের পাইনি।

দাদার বয়েস হাজার হোক সতের মাত্র। এমন বাহাদুরির ব্যাপারটা বোনকে না বলে পারেনি।

...দলের মধ্যে দাদা সকলের ছোট হলেও তাকে কেউ হেলাফেলা করে না। এর মধ্যে সে তিন-চারটে ভয়ংকর সাহসের পরিচয় দিয়ে সক্কলের খুব খাতিরের একজন হয়ে উঠেছে। বাবাকে ধরার আগে কি করা হবে না হবে সেটা ঠিক করাই ছিল। বুকে ছুরি ঠেকিয়ে সক্কলে তাকে মেরে ফেলতেই চাইবে, দাদাই এ-যাত্রা বাবার প্রাণ ফিরিয়ে দেবে।

বাবাকে কোথায় বাগে পাওয়ার সুবিধে দাদার তাও জেনে নিতে অসুবিধে হয়নি। বাবা মাঝে মাঝে এক খারাপ মেয়েলোকের বাড়ি যায়। সেই রাস্তাটাও ভালো না। ছ'সাতটা ছেলে মিলে বাবার ওপর হঠাৎ চড়াও হয়ে তার মুখ কষে বেঁধে ফেলল, তারপর দাদা যে নিরিবিলি জায়গাটায় অপেক্ষা করছিল সেখানে টেনে নিয়ে এলো। তাদের সকলের হাতে ছোরা, কারো হাতে টর্চ। দাদার হাতেও টর্চ। বাবাকে মাটিতে ফেলে ছোরা হাতে একজন তার বুকের ওপর চেপে বসল।

দাদার হি-হি হাসি। বাবার তখনকার মুখ যদি দেখতিস! সেই ছেলেটা বাবার পোর্টফোলিও ব্যাগ থেকে মদের বোতলটা বার করে ছিপি খুলে তার মাথায় কপালে চোখে ঢেলে দিয়ে বলল, শেষ খাওয়া খেয়ে নিন। তারপর ছোরা উঁচিয়ে ধরল।

তখন দাদা এসে তাকে থামালো। বাবাকে বলল, আমার বাবা বলে দুটো শর্তে বাঁচার একটা সুযোগ তুমি পাবে। এক, মা বা বোনেদের করো গায়ে হাত তুলবে না বা কাউকে বকাবকি করবে না। দুই, আজ থেকে সাত দিনের মধ্যে মদ ছাড়বে।

বাবাকে যারা চেপে ধরেছিল বা যে ছোরা হাতে বুকে চেপে বসেছিল, তারা সকলেই খেঁকিয়ে উঠেছিল। একজন বলে উঠেছিল, বাগে যখন পেয়েছি, খতম করে দিই না —এই লোক কথা দিলেও কথা রাখার মানুষ? হাজার ধুলেও কয়লার ময়লা ওঠে? সব শেখানো বুলি।

দাদাদের লিডার তখন বলেছে, গৌতমের বাবা বলে একবার মাপ করা যেতে পারে —এই ওয়ার্নিং রইল, ছেড়ে দে। আর দাদা বলেছে, তোমার নাড়ি-নক্ষত্র খবর আমি রাখি আর রাখবও। যা বললাম একটু এদিক ওদিক হলে আমি জানতে পারব। তখন শ্মশানে মুখাগ্নি করে ছেলের কর্তব্য করব।

এরপর ঠিক হাতে গোনা চার দিনের দিন আবার শ্মশানেই দেখা হয়েছে তাদের। দাদা বাবাকে দেখেছে কিনা দূর্বাও জানে না। বাবা দেখেছে। বাবা দাদার মুখাগ্নি করেছে।

পুলিশী তৎপরতার খুঁটিনাটি না জানলেও ধর-পাকড়ের হিড়িক পড়ে গেছল দূর্বাও জানত। দাদা কোনো দুর্ধর্ষ দলে ভিড়ে গেছে দূর্বা এটুকুই জানত। আর তারপর থেকে খবরের কাগজে নকশালদের কোনো খবর দেখলেই খুঁটিয়ে পড়ত। দূর্বার ভিতরে ভিতরে সারাক্ষণের উত্তেজনা। বাবা কেন অমন ঢিট হয়ে আছে, মা-কে চুপিচুপি বলেছে। চাপা ফুর্তিতে টইটুম্বুর ও। কিন্তু মা এমন একটা খবর পেয়েও কেন যে একটুও খুশি না, উল্টে সমস্ত মুখে বিষাদের কালি—ভেবে পাচ্ছিল না।

দূর্বারও বুক দুরু দুরু। কারণ কাগজে দেখেছে কলকাতার ছ'হাজার নকশালের মধ্যে চার হাজার ধরা হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে পুলিশের সঙ্গে লড়াইয়ে অনেকে মরেছে। কলকাতার আশপাশে আর বাইরে আরো হাজার হাজার নকশাল আছে বটে—তাদেরও ছেঁকে তোলার চেষ্টায় পুলিশ আদাজল খেয়ে লেগেছে। নকশালদের শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে পুলিশ সমস্ত কলকাতায় ঘাটি করে বসেছে, প্লেন ড্রেসে পুলিশ আর সি. আই. ডি. ঘুরছে। পুলিশেরও খুন-জখম হয়েছে পাঁচশ'র কাছাকাছি। একের বদলে তারা চারের মাথা নেবে পণ করেছে। কে নকশাল কে-বা নয় অত খুঁটিয়ে বিবেচনা করার ধৈর্য নেই তাদের। ফলে সন্দেহ হলেই গুলি।

আগের দিন সন্ধ্যায় একজন অচেনা লোক বাড়িতে এসে খবর দিয়ে গেল। ঘন্টাখানেক আগে পুলিশ টালিগঞ্জ এলাকা থেকে কতগুলো ছেলেকে ট্রাকে তুলে নিয়ে গেছে, তাদের মধ্যে গৌতম বোসও আছে। শোনার পর দূর্বা আর তার মা সমস্ত রাত ঘুমোতে পারল না। খবর পেয়ে বাবা বেরিয়ে গেছল। তারা ভেবেছিল থানায় খোঁজ খবর নিতে গেল। তা না, ঘন্টা দুই বাদে বাবা টলতে টলতে ফিরল।

পরদিন সকালের কাগজে দেখা গেল, টালিগঞ্জের এক গোপন ঘাঁটিতে হানা দিতে গিয়ে পাঁচ ছ'টি ছেলের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ হয়, তাতে কয়েকজন পুলিশ অল্প-বিস্তর

আহত হয়, আর সমাজবিরোধী ছেলে ক'টা মারা যায়। সকালের মধ্যেই পুলিশের লোক বাড়িতে এসেছে, বাবার সঙ্গে কথা বলেছে। বাবার সেদিন আপিসে যাওয়া হয়নি। তাকে হয়তো ছেলে সনাক্ত করার জন্য পুলিশের সঙ্গে যেতে হয়েছে। বেশি রাতে পুলিশের গাড়িতে দাদার দেহ কেওড়াতলায় এসেছে। তাদের সামনে দাদাকে দাহ করে বাবা সকালে ঘরে ফিরেছে।

দূর্বা বাবার চোখে জল দেখেনি। মায়ের চোখে না। নিজেও কাঁদেনি, টুঁ-শব্দটি করেনি।.একসময় অসহ্য লাগতে দাদুর কাছে ছুটে গেছল। দাদু ওর গায়ে পিঠে হাত বুলিয়েছে। কেউ কোনো কথা বলেনি।

বাবা তারপর আবার যে-কে সেই। মদ গিলে মারমুখি মেজাজ নিয়ে ঘরে ফেরে। পানের থেকে চুন খসলে চিৎকার চেঁচামেচি অকথ্য গালিগালাজ মারধর। দাদা নেই। দূর্বা ধরে নিয়েছিল এর থেকে জীবনে আর অব্যাহতি নেই।

বছর সতের বয়েস হতে মা আর দূর্বার গায়ে হাত তুলত না। ততদিনে ও হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছে। মা তখন তাকে অনেক কথা বলত যা আগে কখনো বলেনি। ..মদের নেশা বাবার বিয়ের আগেই ছিল। চাকরিতে কিছু কিছু উন্নতি হবার আগে রেস আর জুয়ার নেশায় পেয়ে বসেছিল। বাবা তখন থেকেই মা-কে সন্দেহ করত। পাড়ায় কারো বাড়ি বেড়াতে গেলে বা ক্বচিৎ কখনো কারো সঙ্গে সিনেমা-টিনেমায় গেলে বাবা তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতো। আর তখন মদের ঝোঁকে থাকলে মেরেও বসত। মদ খাওয়া আর রেশ জুয়া যত বেড়েছে, সন্দেহও ততো বেড়েছে। সকালে মোটামুটি ভালো মানুষ, রাতে নেশা করে ফিরলেই সন্দেহ রোগ। সেটা আরো বেড়ে গেল শেফালি আসার পর। ডাক্তারকে অনুময় বিনয় করে মা অপারেশন করে দিতে বলেছিল। আর যাতে ছেলেপুলে না হয়। এমনিতেই চোখে অন্ধকার দেখে, এর পরেও খাওয়ার মুখ বাড়লে উপায় কি হবে। ফর্ম সই করিয়ে নিয়ে শেফালি হবার সময় ডাক্তার অপারেশন করে দিয়েছিল। বাবা সেটা অনেক পরে জানতে পেরেছিল। তারপর থেকে নেশা চড়লেই বাবার ওই সন্দেহ, মা তার নিজের সুবিধের জন্যেই ওই কাজ করেছে। মাসের গোড়াতে মায়ের হাতে যা দেয় তাতে চলা যে কঠিন এই জ্ঞানও টনটনে। বেশি দেবে কোত্থেকে, এক পশলা ধার তো আপিসেই শোধ করে আসতে হয়। তার ওপর বাইরের ধার আছে, নেশার জন্য টাকা মজুত রাখা আছে। কিন্তু মায়ের চলে কি করে? কোথাও এক পয়সা ধার না রেখে গোটা মাসটা মা চালিয়ে দেয় কি করে?

আসলে মামারা যে গোপনে কিছু কিছু দেয় সে খবর বাবা জানত না। ততো দিনে তারা খুব ভালোই জেনে গেছে বোন তাদের কি মানুষের খপ্পরে পড়েছে। মামারা যা দিত তা অবশ্য বেশি কিছুই না। এক একটা মাস কাটাতে মা-কে হিমসিম খেতে হত। তা-ও মামারা সব মাসে সাহায্য করত এমন নয়। মা-ও মুখ ফুটে চাইত না। কিন্তু এই সাহায্যের কথা বাবা জানতে পেলে পেয়ে বসবে, মাসের বরাদ্দ আরো কমিয়ে দেবে। ফলে বাবার কুৎসিত সন্দেহ আর গালাগালও মা-কে মুখবুজে হজম করতে হত।

...মা এই ঘর ছেড়েছে, বাবাকে ছেড়েছে, আর ওদেরও দু'বোনকে ছেড়ে চলে গেছে পাঁচ বছর আগে। চলে যাবে যে দূর্বা জানত। সে একলাই শুধু জানত। মা তার আগে ওর সঙ্গে কথা বলেছে, পরামর্শ করেছে। শুধু কোথায় যাবে সেটা ওকেও বলেনি।

যেতে হয়েছে কারণ বাবার বিকৃতি তখন এত নিচু স্তরে নেমে গেছে যে মায়ের চলে যাওয়া ছাড়া আর গতি ছিল না। বাবা তখন সন্ধ্যার পর তার দুজন শাঁসালো বন্ধুকে বাড়িতে এনে ঘরে বসেই মদ খেত। এক-এক দিন এক-একজনকে আনত। একসঙ্গে দুজনকে নয়। দূর্বা তখন দাদুর কাছে পড়তে চলে আসত। দাদু পড়াক বা না পড়াক, আরো দু'তিন বছর আগে থেকেই দাদুর ঘর দূর্বার পড়ার ঘর।

দূর্বার বয়েস তখন আঠেরো। কলেজে পড়ছে। অনেক জানে, অনেক বোঝে, অনুমান করতে পারে। মায়ের বয়েস ঊনচল্লিশ। কিন্তু বাবার এত অত্যাচার নির্যাতনেও শরীরে বাঁধুনি তার অদ্ভুত। বয়েস আরো পাঁচ ছ' বছর কম মনে হয়। দুজনে একসঙ্গে রাস্তায় চললে কেউ মা-মেয়ে ভাবে না। এই মায়ের একমাত্র আশা ছিল বড় মেয়ে পড়াশোনা করে দাঁড়িয়ে গেলে তবে যদি একটু সুখের মুখ দেখতে পায়। তাই সন্ধ্যা পেরুলে মা-ই দূর্বাকে পড়াশুনার জন্য দাদুর কাছে তাড়া দিয়ে পাঠাতো। কিন্তু আশ্চর্য, এই মা-ই মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পর ওকে ঘরে আটকে রাখতে লাগল। বলত, যেতে হবে না, ঘরেই পড়। আরো আশ্চর্য, বাবা সে-সময় ওকে ঘরে বসে পড়তে দেখলে ক্ষেপেই যেত। হাত ধরে এক-একদিন হিড়হিড় করে টেনে দরজার বাইরে ঠেলে দিয়েছে, বলেছে, পড়তে যা, দু'ঘণ্টার আগে নেমে এলে আস্ত রাখব না।

পাশের ঘরে বাবার গেলাসের অতিথি। যে দুজন ইদানীং আসছে, দুজনেরই গাড়ি আছে! যে যেদিন আসে, তার গাড়ি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। মা-কে এটা সেটা রেঁধে নিজের হাতে ও-ঘরে পৌঁছে দিতে হয়। বসে গল্পও করতে হয়। নইলে মানী অতিথির মর্যাদাহানি হয়। এরা দুজনেই বাবার নাকি অনেক উপকার করেছে। করছে। উদার হয়ে আর বাবাকে ভালবেসে তার অনেক দেনা পর্যন্ত নাকি শুধে দিয়েছে।

ব্যাপারটা কোন দিকে গড়াতে চলেছে, মায়ের মুখের দিকে চেয়ে দূর্বা সেটা বুঝতে পারে। মায়ের সারাক্ষণ থমথমে মুখ। কেবল বন্ধু নিয়ে সন্ধ্যার পর বাবা এলে হাসে, তৎপর হয়। যেদিন এর ব্যতিক্রম হয়েছে, বেশি রাতে বাবার হুমকি আর তর্জন গর্জন শোনা গেছে, মারের শব্দও কানে এসেছে।

এর মধ্যে দূর্বা একটা ছোট গল্প পড়েছিল। লেখকের নাম মনে নেই। অবাঙালী এক পুরুষের দুই স্ত্রী ছিল। লোকটা যেমন ষণ্ডামার্কা, তেমনি রাগী আর তেমনি মাতাল। দুই সতীনে একটুও বনিবনা ছিল না। তাদেরও ঝগড়াঝাঁটি খেয়ো-খেয়ি লেগেই ছিল। মাতাল অবস্থায় ঘরে ফিরে তাদের মরদ দুজনকেই বেধড়ক পিটত। মেরে এক-একদিন মাটিতে শুইয়ে ফেলত। তারপর খেয়ে দেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতো। সেই ঘুম সকালের আগে ভাঙত না।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এমনি চলে। স্বামী তাদের কাছে যম। দুই সতীনের মাথায় বুদ্ধি খেলল একদিন। স্বামীর অত্যাচার দুজনকে কাছাকাছি এনে দিল। এত মার আর এত গঞ্জনা দুজনেরই অসহ্য হয়ে উঠেছে। দুজনে বসে খুব সংগোপনে শলাপরামর্শ করল কিছু। সন্ধ্যার পর স্বামী মদে চুর হয়ে ঘরে ফিরল। বউ দুটোর ত্রুটি খুঁজে বার করতে হয় না, মুখের দিকে তাকালেই ত্রুটি। সেদিন খেতে দিতে একটু দেরি হল বলে দুজনেরই অদৃষ্টে মারটা একটু বেশি জুটল। তারপর স্বামী তার খাটিয়ায় শুয়ে কুম্ভকর্ণের ঘুম। ঠেলে খাটিয়া থেকে ফেলে দিলেও সকালের আগে এ-ঘুম ভাঙবে না।

গা-ঝাড়া দিয়ে প্রস্তুত হয়ে তখন দুই সতীন ঘরে এলো। তাদের দুজনেরই হাতে শক্তপোক্ত অনেকটা করে কর্ডের দড়ি। খুব নিঃশব্দে সেই দড়ি দিয়ে দু'দিক থেকে দুজনে স্বামীকে বেশ করে খাটিয়ার সঙ্গে বাঁধতে লাগল। পা হাঁটু ঊরু কোমর পেট বুক দুটো হাত—এক কথায় পা থেকে গলার নিচ পর্যন্ত খাটিয়ার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়ে গেল। তখন পর্যন্ত লোকটা ভালো করে টের পেল না। কেবল ঘুমের মধ্যে কোথায় যেন সামান্য একটু অসুবিধে হচ্ছে।

বাঁধার কাজ খুব ভালো করে শেষ করে এক সতীন একটা গামছা নিয়ে এলো। নেশার ঝোঁকে বেশ একটু হাঁ করেই ঘুমোয় তাদের মরদ। অল্প অল্প করে সেই গামছার অর্ধেকটার বেশি তার মুখে গুঁজে দিল পুঁটলির মতো করে। তখনো ঘুমের মধ্যে অসুবিধে আর একটু বাড়ছে শুধু, মুখ বন্ধ, নাক দিয়ে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কাজ চলছে। অন্য সতীন ততক্ষণে মরদেরই শক্তপোক্ত অনেক তেলখাওয়া ডাণ্ডা দুটো নিয়ে প্রস্তুত। একটা নিজের রেখে অন্যটা সতীনের হাতে দিল।

তারপর শুরু হলো মার। সে কি মার কি মার! একেবারে যাকে বলে প্রাণের সাধে আশ মিটিয়ে মার। এতকাল ধরে ওই নির্মম মরদের হাতে যে মার খেয়েছে তার সবটা এক রাতের মধ্যে উশুল করল তারা। কেবল পেট আর বুকের ওপর দিকে এগোলো না। পা থেকে কোমরের হাড় পর্যন্ত গুঁড়িয়ে দিল। মরদ মার খাচ্ছে আর দেখছে। মুখে গামছা গোঁজা। সর্বাঙ্গ খাটিয়ার সঙ্গে বাঁধা। গলা দিয়ে গোঁ-গোঁ একটা আওয়াজ বার করছে, আর চোখ দুটো যন্ত্রণায় ঠেলে বেরিয়ে আসছে। সেই রাম-পিটুনির চোটে আবার ঘুমিয়ে পড়ল সে—অর্থাৎ অজ্ঞান হয়ে গেল।

দুই সতীন থামল এবার। তারপর যে যার ঘরে গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ল।

পরদিন পড়শীরা এসে সব দেখল। সব বুঝলও। মরদকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। হাসপাতাল থেকে সে ছ'মাস বাদে ফিরল।

এখন সে সাত বেঁকা হয়ে অষ্টাবক্র মুনির মতো পথ চলে। ছোট ছেলেরা তাকে দেখে হাততালি দেয়।

পড়ার পর দূর্বার মনে হয়েছিল এমন গল্প আর জীবনে পড়েনি। গল্পটা জোর করে মা-কেও পড়িয়েছিল। ওর সাহসের অভাব নেই, কিন্তু মায়ের অত সাহস হবে না জানত।

দিন কয়েকের মধ্যেই মা ওকে বলল, এখান থেকে চলে যেতে হবে, নইলে আত্মহত্যা করতে হবে। রাতের সেই অতিথিদের খুশি করার হুকুম হয়েছে। অপারেশন যখন হয়ে গেছে, ভয়ের কি আছে! অসহায় মায়ের মুখে এ কথাও শুনতে হয়েছে দূর্বার।

তলায় তলায় মা অনেক আগে থেকেই প্রস্তুত হচ্ছিল জানত না। তার সঙ্গে কাছাকাছি মেয়েদের একটা বড় হাসপাতালের বড়-মায়ের খুব খাতির হয়ে গেছল। বড়-মা বলতে সেবায়তনের এক সন্ন্যাসিনী। দূর্বারা সকলে সেই হাসপাতালেই জন্মেছে। বড়-মা মা-কে বেশ স্নেহ করতেন। ঘরের খবর জানতেন বলেই মায়ের ওপর তাঁর করুণা ছিল। বছর কতক হল তিনি আর এ হাসপাতালে নেই। বাইরে দূরে কোথায় চলে গেছেন শুনেছে। ওই সেবাপ্রতিষ্ঠানের শাখা-প্রশাখা ভারতের প্রায় সর্বত্র।

...মা তলায় তলায় খোঁজ করে তাঁর ঠিকানা যোগাড় করেছিল। তাঁকে চিঠি লিখে

সমস্যার কথা জানিয়ে আশ্রয় ভিক্ষা করেছিল। তিনি পত্রপাঠ চলে আসতে লিখেছেন।

দূর্বাকে মা সে-চিঠি দেখায়নি। কোথায়, কত দূরে যাচ্ছে তা বলেনি। কারণ বাবা তাহলে মারের চোটেই সব বার করে নেবে। দূর্বাও জানার জন্য পীড়াপীড়ি করেনি। সে চেয়েছে মা চলে যাক। মা-কে আশ্বস্ত করেছে, দাদু আছে, দাদু আমাদের ঠিক দেখবে। আর জোর দিয়ে বলেছে, তুমি চলে গেলে বাবার অত্যাচার আমি বন্ধ করতে পারব জেনে রেখো। দাদা পেরেছিল। আমিও যেভাবে হোক পারবই। তুমি দেখে নিও। কিন্তু তুমি চলে না গেলে কিছুই পারব না।

কি করবে, কেমন করে করবে কিছুই জানে না। কিন্তু ভিতর থেকে জোর ঠিকই পেয়েছে। আর ভেবেছে, মা জীবনে কখনো শান্তি পায়নি। দূরে সরে গিয়ে একটু শান্তি পাক।

পরদিন সকালে বাবা খেয়ে দেয়ে আপিসে গেল। ওদের খাইয়ে নিজে খেয়ে মা-ও নিঃশব্দে চলে গেল। শেফালি পর্যন্ত কিছু জানল না। তার বয়েস মাত্র বারো তখন। রিকশয় ট্রাংক চাপিয়ে মা-কে কোথাও যেতে দেখলে হাজার প্রশ্ন করবে, নিজে যাবার বায়না তুলবে। আর বাবাও পরে জানবে ওদের দেখিয়েই মা কোথাও চলে গেছে। তাই খেয়ে দেয়ে সে যেমন স্কুলে যায় তেমনি গেল। ঘুণাক্ষরে জানতেও পারল না ফিরে এসে মা-কে দেখবে না।

রিকশয় মায়ের ছোট ট্রাংক আর পুঁটলির মতো একটা বিছানা তুলে দেওয়া হলো। তার আগে রিকশর পর্দা ফেলে দেওয়া হয়েছে। তারপর চুপিসাড়ে মা-কে নিয়ে দূর্বা রিকশয় উঠেছে। তখন দুপুর। কেউ কিছু লক্ষ্যও করল না। অনেকটা পথ পেরিয়ে নিরাপদ জায়গায় এসে দূর্বা রিকশ থেকে মা-কে নিয়ে নামল। তারপর তাকে হাওড়ার বাসে তুলে দিল।

নিজে সে সেখান থেকে কলেজে চলে গেল। অত্যাচারে মানুষের ভিতরটা কত পাথর হয়ে যায় মা-কে দেখেই বুঝেছে। মা-কে এতটুকু বিচলিত হতে দেখেনি, বা যাবার আগে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলতে দেখেনি। মা যেন ওকে আর শেফালিকে ঈশ্বরের পায়ে সঁপে দিয়ে অটুট সংকল্পে বুক বেঁধে ঘর-ছাড়া হয়ে গেল।

কলেজ থেকে একটু সকাল সকালেই ফিরল। ঘরের চাবি তার কাছে। শেফালি ফেরার আগে বাড়ির দরজাব তালা খুলতে হবে।

স্কুল থেকে ফিরে ঘরে মা-কে না দেখে শেফালি সতের বার করে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, মা কোথায়? দূর্বারও এক জবাব, জানে না। সে-ও কলেজ থেকে ফিরে দেখেছে মা ঘরে নেই। সন্ধ্যার পর বড়লোক গেলাসের বন্ধুকে সঙ্গে করে বাবা এসেছে। মা-কে এদিক ওদিক কোথাও না দেখে ভ্রূকুটি। বড় মেয়েকে জিগ্যেস করেছে কোথায় গেল। তার এক জবাব, কলেজ থেকে ফিরে দেখে মা ঘরে নেই। বাবার সেই মুখ দেখে মনে হয়েছে পেলে মা-কে আস্ত চিবিয়ে খেত। চিবিয়ে খাবার জন্য তৈরিও ছিল। কারণ বাবার ধারণা, বন্ধু বিদেয় হবার পরে মা ঘরে ফিরবেই।

সেই রাতে আর কিছু গণ্ডগোল হল না। কারণ রাগের চোটে নেশার মাত্রা খুব বেশি হবার ফলে বন্ধু বিদেয় হতেই বাবা ঘুমিয়ে পড়ল। খেলও না। পরদিন সকালে মা আর রাতে ফেরেইনি শুনে মাথায় খুন চাপল। মায়ের তোরঙ্গও নেই তা-ও চোখে

পড়েছে। কিছুদিন আগে দূর্বাদের বড় মামা মারা গেছে। ছোট মামা আছে। সেখানে আছে ধরে নিয়ে আপিস কামাই করে ছোট মামার বাড়ি চলে গেল।

সেখানকার বৃত্তান্ত দূর্বা পরে জেনেছে। ছোট মামা বাবার বয়সী। মায়ের খবর কিছু জানে না শুনে বিশ্বাস করেনি। ষড়যন্ত্র করে মা-কে কোথাও পাঠানো হয়েছে ভেবে ছোট মামার সঙ্গে তুমুল কাণ্ড হয়েছে। বাবা তাকে মারতে বাকি রেখেছে। তার ছেলেরা বাবাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়েছে। বড় মামার বাড়িতেও গেছে। আরো কোথায় কোথায় খুঁজেছে দূর্বা জানে না। ঘরে ফিরেছে বিকেল চারটেয়। ভাত মুখে দিয়ে আবার বেরিয়ে পড়েছে। সন্ধ্যায় ফিরেছে।

খুব আলতো করে হঠাৎ দূর্বাকে জিগ্যেস করেছে, কাল তুই কলেজ থেকে ফিরে দেখলি দরজা কপাট খোলা পড়ে আছে, আর মা নেই?

এখানেই দূর্বা মস্ত ভুলটা করে ফেলল। যদিও ভুলের ফসল শেষ পর্যন্ত ভালোই হয়েছে। বাবার প্রশ্নের জবাবে দূর্বা যদি শুধু মাথা নেড়ে সায় দিত, ফুরিয়ে যেত। তার কেবল মনে হল মা অমন কাজ করতে পারে না। তাই জবাব দিল, কলেজ যাবার আগে মা তার হাতে একটা চাবি দিয়ে বলেছিল, তার একটু বেরুতে হবে, ফিরতে দেরি হতে পারে।

—কোথায় যাবে তুই জিগ্যেস করিস নি?

দূর্বা মাথা খাটিয়ে জানাল, জিগ্যেস করেছিল, মা শুধু বলল খুব দরকারে এক জায়গায় যেতে হবে—।

বাবা চুপচাপ খানিক তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর এগিয়ে এসে এমন একটা চড় বসালো গালে যে দূর্বার পায়ের নিচে মাটি দুলতে লাগল, চোখে অন্ধকার দেখল। সেই অবস্থাতেই বাবা তাকে চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে আর এক চড়ে মাটিতে বসিয়ে দিল। তারপর আলনা থেকে লাঠিটা তুলে নিয়ে কুকুর বেড়ালের মতো পিটতে লাগল। সেই সঙ্গে হুমকি আর গর্জন, বল শিগগীর কোথায় গেছে, নইলে আজ মেরেই ফেলব!

দূর্বা যতক্ষণ পেরেছে মাথা নেড়েছে। বলেছে জানে না। তারপর বুঝেছে বাবা সত্যি সত্যি মেরে ফেলবে। নিজের কান্না আর আর্তনাদ যাতে বেরিয়ে না আসে তার জন্যে মুখে শাড়ির আঁচলের অনেকটা গুঁজে দিয়ে নির্জীবের মতো মার খেয়েছে। শেফালি একবার ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল। বাবার বাঁ হাতের একটা চড় খেয়ে সে-ও তিন হাত দূরে ছিটকে পড়েছে।

যতটা মারলে পেটের কথা গলগল করে বেরিয়ে আসবে ভেবেছিল বাবা ততটাই মারল। তার পরেও কথা বেরুলো না দেখে হয়তো ধরে নিল সত্যিই জানে না। কিন্তু তার পরেও অনুতাপ নেই। মায়ের শাস্তি তার আদরের মেয়ে পাবে না তো কে পাবে?

লাঠি ফেলে দিয়ে বাবা মদ নিয়ে বসল।

প্রায় এক-ঘণ্টা নিস্তেজের মতোই মাটিতে পড়ে থাকল দূর্বা। তারপর উঠল। এক গেলাস জল গড়িয়ে খেল। তের বছরের শেফালি তখন দিদিকে দেখছে। এত মার দিদি এমন মুখ বুজে সহ্য করল কি করে তার কাছে এটাই অবাক ব্যাপার।

দূর্বা শাড়ির আঁচল জড়িয়ে চুপচাপ বেরিয়ে এলো। পাশের বাড়ির দোতলায় উঠে সোজা দাদুর ঘরে।

রাধাকান্ত তাঁর অঙ্কের বইয়ে নতুন কি বাড়াবেন, কাগজ কলম নিয়ে বসে তার খসড়া করছিলেন। ডাকলেন, আয়, তোর বাবার তর্জন গর্জন শুনছিলাম, তোর মা-টা আজ আবার ভরসন্ধ্যেতেই মার খেল বুঝি?

দূর্বা কাছে এসে দাঁড়াল।—না, আমি।

চকিতে মুখ তুলে তাকালেন রাধাকান্ত। ফর্সা দুই গালে ঘন আঙুলের ছাপ। দূর্বার দু'চোখ জ্বলছে। ঘুরে দাঁড়াল। শাড়ির আঁচল সরিয়ে ব্লাউজের পিছনটা ঘাড় পর্যন্ত তুলে ফেলল। সেই দাগড়া দাগড়া চামড়া-ফাটা মারের দাগ দেখে রাধাকান্ত অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন। ব্লাউজ নামিয়ে দূর্বা ঘুরে দাঁড়ালো। সে-ও তখন কাণ্ডজ্ঞানশূন্য। শাড়ির নিচের দিকটা হাঁটুর ওপর তুলে ফেলল। সেখানেও ওই রকম দাগের সারি। শাড়ি নামিয়ে হিসহিস করে বলল, আরো আছে, দেখাতে পারছি না।

ব্যাকুল আবেগে ওকে দু'হাতে কাছে টেনে আনতে চাইলেন রাধাকান্ত, কেন? কি হয়েছে? পাষণ্ডটা এ-রকম করে মারল কেন তোকে?

দাদুর দু'হাত ঠেলে দিল দূর্বা। দাঁড়িয়েই রইল। জবাব দিল, মা কাল দুপুরে ঘর ছেড়ে চলে গেছে। না গেলে তাকে বাবার দুই বন্ধুর হাতে পড়তে হত। তারা বাবার দেনা শুধছে। মা বাংলা দেশের বাইরে কোথাও চলে গেছে।—কোথায় গেছে জানি না, কাদের আশ্রমে গেছে জানি। আমার মুখ থেকে কথা বার করার জন্য এ-রকম করে মেরেছে—আমি যেটুকু জানি তা-ও বলিনি। তুমিও খবরদার কাউকে বলবে না—কাউকে না। আশ্রম শুনলেই বাবা ঠিক বার করে নেবে।...এখন তুমি কিছু করতে পারবে কিনা বলো, না যদি পারো আমিও আর ওখানে থাকব না, যেখানে খুশি যার সঙ্গে খুশি চলে যাব!

রাধাকান্ত এবারে জোর করেই ওকে কাছে টেনে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। অনেকক্ষণ বাদে বললেন, কিছু করতে যদি না পারি তোর দাদু মরে গেছে ধরে নিস।

একটু বাদে উঠলেন। কাঠের হোমিওপ্যাথি বাক্সটা নিয়ে এলেন। অবসর সময় এ চর্চাও করেন। দূর্বা এবারে তাঁর দেওয়া ওষুধ খেতে আপত্তি করল না। আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে রাধাকান্ত বললেন, তোর মা কোনো আশ্রমে-টাশ্রমে চলে গেছে এ-ও যদি না বলি তাহলে তো যা-তা কথা উঠবে, পাড়ার লোকের মুখ তো জানিস...।

দূর্বা ঝলসে উঠল।—যে যা খুশি বলুক, তুমি কিচ্ছু বলবে না! যা-খুশি রটাক, কি যায় আসে?

—ঠিক আছে। তোর বাবা এখন কি করছে?

—মদ নিয়ে বসেছে।

—সকালে ঘুম থেকে ওঠে ক'টায়?

—সাতটার আগে না।

—আপিসে বেরোয় ক'টায়?

—সাড়ে ন'টায়।

পরদিন কি হবে বা কি দেখবে দূর্বারও ধারণা ছিল না।

রাধাকান্ত ঘুম থেকে ওঠেন রাত চারটেয়। এই বয়সেও গাঢ় ঘুম হয়। কিন্তু রাতটা

প্রায় ছটফট করে কাটল। চা-টা খেয়ে সকাল ছ'টার মধ্যে তিনি বেড়িয়ে ফেরেন। সেদিনও তাই ফিরলেন। কিন্তু নিজের বাড়িতে ঢুকলেন না। পাড়ার লোকের বাড়ি বাড়ি ঢুঁ দিয়ে বেড়ালেন। পাড়ার সকলেরই সম্মান আর খাতিরের মানুষ তিনি।

কৃষ্ণেন্দু বোস একটা ওষুধই ভালো চেনে এটুকু রাধাকান্তের জানা ছিল। সতের বছরের ছেলে গৌতম কিছু দিনের জন্যে হলেও তার বাবাকে কি-রকম টিট করেছিল পরে দূর্বার মুখে শুনেছেন। এদিক থেকে পাড়ার হাওয়া অনুকূল। দু'বছর আগে এখানেও আবার পাকাপোক্ত কংগ্রেস রাজত্ব কায়েম হয়েছে। দু'শ আশীটার মধ্যে দু'শ ষোলটা সিট দখল করে সিদ্ধার্থশংকর মুখ্যমন্ত্রীর আসনে জাঁকিয়ে বসে আছেন। এ-রাজ্যে কংগ্রেসের এতবড় জয়ের নজির নেই। ফলে সর্বত্র তাদের হোমরাচোমরাদের ঘাঁটি। আর সেখানে নানা বয়সের সাগরেদদের ভিড় আর জটলা। নেতাদের জোরে তারা ধরাকে সরা দেখে। চোখের ওপর তাদের জুলুম দেখলেও পুলিশ বেশির ভাগ সময় চোখ বুজে থাকে।

আশপাশের অনেক বাড়ির কর্তাদের জুটিয়ে রাধাকান্ত এই এলাকার তরুণ এম-এল-এ'র সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর সাগরেদরাও সেখানে উপস্থিত। আর রাধাকান্তকে না জানে কে, না চেনে কে। দাদু তাদের যতটুকু বলার বললেন। কি চান জানালেন। প্রৌঢ় আর প্রবীণরা তার প্রস্তাবে এক বাক্যে সায় দিলেন। তরুণ নেতা কথা দিল, সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে ফয়সলা হয়ে যাবে।

সাড়ে আটটা নয়, ঠিক ন'টা তখন। দূর্বাদের দরজা সর্বদা বন্ধ থাকে। দুমদাম ধাক্কা পড়ল। বাইরে চাপা কলরব শোনা গেল। দরজা খুলেই দূর্বা দেখে নানা বয়সের পঞ্চাশ ষাটজন ছেলে দাঁড়িয়ে।

কি ব্যাপার না বুঝে কৃষ্ণেন্দুরও ভেবাচাকা মুখ। সে-ই এগিয়ে এসে জিগ্যেস করল, কি চাই?

জনা দুই বলল, আপনাকে। বেরিয়ে আসুন—

অজানা আতঙ্কে মুখ শুকালো কৃষ্ণেন্দুর।—আমার তো এখন আপিস আছে!

সঙ্গে সঙ্গে দু'তিনজন একসঙ্গে তার জামার বুকের কাছটা খামচে ধরল, একজন পালিশ করা চুলের মুঠিও। হিড়হিড় করে তাকে বাইরে টেনে এনে তারা বলল, তুমি আপিস যাবে কি যমের বাড়ি যাবে সেটা এক্ষুণি ঠিক হয়ে যাবে—

ধাক্কা মেরে মেরে তারা তাকে পাশের বাড়িতে তুলছে দেখে কৃষ্ণেন্দু বোস আতঙ্ক সত্ত্বেও অবাক। কিন্তু অনেকগুলো ছেলের তাতেও আপত্তি। বলে উঠল, আগে ওকে একটু পালিশ করে নিয়ে ওপরে পৌঁছে দেওয়া যাক না—

কিন্তু অপেক্ষাকৃত মাথা-ঠাণ্ডা ছেলেরা এ-প্রস্তাবে সায় দিল না। দাদু অনুরোধ করেছিল, কোনরকম বিশৃঙ্খলা বা হামলা যেন না হয়। নেতারও তাই নির্দেশ। অতএব ধাক্কা মেরে মেরে দাদুর বাড়ির দোতলায় এনে তোলা হলো তাকে।

এখানে এসেও দু'চক্ষু স্থির কৃষ্ণেন্দু বোসের। বড় ঘরে বসে আছে আশপাশের প্রায় সব ক'টা বাড়ির প্রৌঢ় বা প্রবীণ কর্তারা। কম করে বিশ-বাইশজন হবে। ছেলের দঙ্গল ধাক্কা মেরে কৃষ্ণেন্দু বোসকে সেই ঘরে ঢুকিয়ে দিল। তাদের ওপর হুকুম ছিল তারা যেন বাইরে অপেক্ষা করে, কেউ না ঘরে ঢোকে। তারা সেই হুকুম পালন করল

বটে, কিন্তু বিচার দেখার লোভ সামলে নিচে নেমে আসতে পারল না—বারান্দা আর দরজার কাছেই হুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

যে হামলার ব্যাপারে রাধাকান্তর এত সতর্কতা, কৃষ্ণেন্দু বোসকে দেখামাত্র তিনিই পাগলের মতো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলেন। তক্ষুনি দূর্বার সমস্ত গায়ের সেই নৃশংস মারের চিহ্নগুলো মনে পড়েছে। গালাগাল দিয়ে বেড়ানোর লাঠিটা তুলে নিয়ে ওকেও আগে একপ্রস্থ কুকুর বেড়ালের মতো মেরে নেওয়ার আক্রোশ। বুড়োর এমন রাগ আর কেউ কখনো দেখেনি। প্রবীণেরা তিন চারজনে মিলে তাঁকে আগলে রাখলেন। আর তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে উঠলেন, ছাড়ো—ছাড়ো বলছি—মেয়েটাকে কি মার মেরেছে তোমরা ভাবতে পারবে না—আমার জেল হোক, ফাঁসি হোক আমি ওকে খুন করব—ছাড়ো।

রাগে থরথর করে কাঁপছেন। বেশ চেষ্টা করে হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে তাঁকে আবার বসানো হল। কৃষ্ণেন্দুর সমস্ত মুখ ভয়ে বিবর্ণ। দরজার বাইরে ছেলের দঙ্গলটা দেখছে। কোন্ অপরাধে তাকে এ-ভাবে এখানে টেনে আনা হয়েছে তাও বুঝেছে। রাধাকান্ত তখনো ফুঁসছেন, গলায় দড়ি দিয়ে মরতে পারিস না জানোয়ার কোথাকারের, তোর মেয়ের ওই মার দেখিয়ে তোকে আমি জেল খাটাতে পারি কিনা দেখতে চাস রাসকেল কোথাকার?

কৃষ্ণেন্দু বোস কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে।

খানিক দম নিয়ে তিনি আবার গর্জে উঠলেন, আর কখনো ওই মেয়ে দুটোর গায়ে হাত উঠবে?

কৃষ্ণেন্দু বোস মাথা নাড়ল, উঠবে না।

রাধাকান্ত উঠে এগিয়ে দরজার কাছে এলেন। ছেলের দঙ্গলকে বললেন, তোমরা ভাইয়েরা (সকলেরই দাদু তিনি, সেই সম্পর্কে ভাই) নিচে গিয়ে দাঁড়াও। দরকার হলে তোমাদের ডাকব।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা নিচে নেমে গেল। আধা সিঁড়িতে কেউ কেউ দাঁড়িয়েও রইল। রাধাকান্ত দরজা দুটো বন্ধ করলেন। তারপর কৃষ্ণেন্দুর কাছে এসে বজ্রগম্ভীর আদেশ দিলেন, নাকে-খত দাও!

কৃষ্ণেন্দু মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েই রইল। দু'হাতে সজোরে তাকে একটা ধাক্কা মেরে রাধাকান্ত গর্জে উঠলেন, বোস! নাকে-খত দে! ওই মেয়েদুটোর জন্যেই এবারের মতো তোকে আমি প্রাণে বাঁচতে দিচ্ছি—দ্বিতীয় বার আর বলব না, দরজা খুলে ওই ছেলেদের হাতে তোকে ছেড়ে দেব!

কৃষ্ণেন্দু বোস মেঝেতে বসল। ঘামছে। নিচু হয়ে মেঝেতে নাক ছোঁয়ালো।

মুখ তুলতে রাধাকান্ত বললেন, তিনটি শর্তে এবারের মতো আমরা তোমাকে নিষ্কৃতি দেব আর ক্ষমা করব। এক, ওই মেয়ে দুটোর গায়ে হাত তুললে বা ওদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছ আমাদের কানে এলে তোমার দুটো হাত মুচড়ে ভেঙে দেওয়া হবে। মনে থাকবে?

কৃষ্ণেন্দু বোস মাথা নাড়ল। থাকবে।

—দুই, ঘরে বসে মদ খেতে পাবে না, বা একটুও হল্লা করতে পারবে না। তুমি

অপদার্থ, কিন্তু তোমার মেয়ের মাথা কাটা যায়। মনে থাকবে?

কৃষ্ণেন্দু বোস মাথা নাড়ল। থাকবে।

—তোমার স্ত্রীর হাতে সংসার-খরচের জন্য মাসে কত টাকা দিতে?

বিড়বিড় কর বলল কত দিত।

—মাসের কত তারিখে মাইনে পাও?

তাও বলল।

—তৃতীয় শর্ত, প্রত্যেক মাসের ওই তারিখে দূর্বার হাতে গুনে গুনে তুমি সেই টাকা তুলে দেবে। ওই টাকায় মাস চলার কথা নয়, চলে কিনা আমি খোঁজ নিয়ে দেখব—দরকার হলে আরো বেশি দিতে হবে। আপাতত ওই তারিখে অত টাকা তুমি তার হাতে দেবে। মনে থাকবে?

কৃষ্ণেন্দু বোস মাথা নাড়ল। মনে থাকবে।

আঠারো বছরের মেয়ে কি কাণ্ড বাধিয়ে তুলতে পারে কৃষ্ণেন্দু বোসের সেটা কল্পনার মধ্যেও ছিল না। ছেলেটার কথা ভোলেনি। কিন্তু মেয়েটাকে আরো ভয়ংকর মনে হয়েছে তার। না, মুখে আর একটি কথাও বলেনি। মনে মনে রাধাকান্ত আচার্যকে একনম্বর শত্রু ভাবে। দু' নম্বর বড় মেয়ে। ওই বুড়ো যখন তখন নাতনিদের খোঁজ নেবার জন্য হাসিমুখে অন্দরমহলে ঢুকে পড়ে। আসলে শর্ত মানা হচ্ছে কিনা নিজের চোখে সেটা যাচাই করে যায়, এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি কৃষ্ণেন্দু বোসের আছে। অবশ্য আসাটা এখন কমে গেছে। কারণ কৃষ্ণেন্দু বোস শর্ত মেনে চলেছে। বড় মেয়ের সঙ্গে কথাই বলে না। বছর তিন চারের মধ্যে বাড়িতেও মদ খায় না। বাইরে থেকে খেয়ে এসেও হৈ-হল্লা করে না। মাসের শেষে শেফালির হাত দিয়ে বড় মেয়ের কাছে টাকাও দেয়।

এই একবছর হল মাঝে মাঝে শর্তের খেলাপ করছে, দূর্বা সেটা দেখে যাচ্ছে। এক-একদিন আবার ঘরে বসে মদ খেতে শুরু করেছে। কিন্তু হৈ-হল্লা তেমন একটা করে না। ওকে শুনিয়েই বলে, কি কারণে ঘরে বসে একটু খেতে হচ্ছে। সঙ্গে তার ভক্ত চেলা অমল বিশ্বাসও থাকেই। সপ্তাহের মধ্যে তিন চারদিন অফিস-ফেরৎ বাবার সঙ্গে সে এখানে আসে, সন্ধ্যায় তার সঙ্গেই বেরিয়ে যায়। নেশা করে ফিরতে ফিরতে বাবার রাত সাড়ে দশটা বেজে যায়।

ওই অমল বিশ্বাসকে দিনে দিনে অসহ্য হয়ে উঠছিল দূর্বা বোসের। তার লোভী চাউনি দেখলেও সর্বাঙ্গ ঘিনঘিন করে। বাবা ইদানীং প্রায়ই ওকে শুনিয়ে বাতাসে কথা ছোঁড়ে। অমলের মতো অমন ছেলে হয় না, আপিসেও কাজের সুনাম কত। একটা প্রমোশন পেয়েইছে, আরো ক'টা পাবে বা কত ওপরে চলে যাবে ঠিক নেই। মদও একটু আধটু তার পাল্লায় পড়েই খায়—কেউ মুখের কথা খসালে সেই মুহূর্তে ছেড়ে দেবে। লোকটারও সর্বদা এই প্রশ্রয়ের সুযোগ নেবার চেষ্টা। হেসে হেসে সামনে এসে দাঁড়ায়। ওরা দু'বোন যেন কত স্নেহের পাত্রী তার। ছুটির দিনে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেতে চায়, খাবার কিনে আনে। শেফালি ছোট, লোভীর মতো খায়, দূর্বা স্পর্শও করে না।

গত পাঁচ বছর ধরে আর এক দিক থেকেও নিঃশব্দে কম উৎপাত সহ্য করে চলছে

না দূর্বা। কাছে পিঠের বয়সকালের ছেলেগুলোর বেপরোয়া প্রণয়ের উৎপাত। মা ঘর ছেড়ে চলে গেছে কোথাও, সেটা জানাজানি হতে সময় লাগেনি। ওকে ডেকে কেউ কিছু জিগ্যেস করেনি। যে যেমন খুশি ভেবে নিয়েছে। বয়স্করা গালে হাত দিয়ে তাজ্জব বনেছে, বাপ যত খারাপই হোক, ওই বয়সের মেয়ে দুটোকে ফেলে সে চলে যেতে পারল কি করে? ঘুরে ফিরে অনেকের সন্দেহ, বাবা অত্যাচার করত কেন তারই বা ঠিক কি—ওই রূপসীরও ভিতরে ভিতরে কি চরিত্র ছিল কে জানে!

দিন মাস গেছে, বছর ঘুরেছে একটা দুটো করে। তখন পর্যন্ত এ বাড়ির বউটা নিপাত্তা যখন, তার চরিত্র বুঝে নিতে আর বাকি নেই কারো। এমন মায়ের আর অমন মাতাল বাপের মেয়েকে কে আর কতটুকু সমীহ করবে? যারা রক্ষক হয়ে একদিন তাদের ঘরে এসে বাবাকে টেনে বার করে দাদুর কাছে ধরে নিয়ে গেছল, তাদের মধ্যে লায়েক ছেলেও কম নেই। তাদেরও আবার নিজস্ব ছোট-বড় দল আছে। সেই ব্যাপারের পর থেকেই রাস্তায় বা কলেজে বেরুলে ফাঁকমতো ভাব করার চেষ্টায় এগিয়ে এসেছে। বোবার শত্রু নেই। দূর্বা যতটা সম্ভব বোবা হয়েই থাকতে চেষ্টা করেছে। এই মেয়ে মাথা খেতে পারে ভেবে প্রতিবেশীদের অনেকেরই ছেলে আগলানোর চেষ্টা কিন্তু ছেলেরাও এত বোকা নয় যে মায়ের আঁচলের তলায় বসে থাকবে বা গার্জেনদের চোখের সামনে প্রেম নিবেদন করতে আসবে। দূর্বা কোন কলেজে পড়ে মাস্তানদের বা আশপাশের প্রেমিকদের কে না জানে। দূরে গিয়ে কলেজের পথে সঙ্গ নেয়, বাসে চেপে সঙ্গে কলেজ পর্যন্তও আসে কেউ কেউ। ফিরতিপথে একই ব্যাপার। হাতে চিঠি গুঁজে দেয়। আবার অবজ্ঞা করা হচ্ছে ভেবে তাদের আঁতেও লাগে। কিন্তু একটা সুবিধে প্রেমিকের সংখ্যা এমন পাঁচ সাত জন আছে। ওকে নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে মারামারি বেধে যাওয়াও বিচিত্র নয়। যে দু'তিনটে ছেলে বেশি বেপরোয়া বা বেশি সেয়ানা, দূর্বাকে তাদের সঙ্গে একটু মানিয়ে চলতে হয়। হেসে দুই একটা কথা বলে, অল্প হেসে তাদের কথা শোনে। নিরীহ মুখে জানান দেয় ওমুক-দা ওমুক কথা বলেছিল। ওমুকদার ওপর সেই ছেলে খাপ্পা হয়। ওকে আশ্বাস দেয়, কিচ্ছু ঘাবড়াবার দরকার নেই, দরকার হলে খতম করে দেবে। ওমুক-দাকেও আবার সেই কথাই বলে, আর তারও একই রকম উষ্মা দেখে। এ-সবের কিছুই পাড়ার মানুষের চোখের ওপর নয়।

দায়ে পড়ে এক-আধজনের কাছে এমন আভাসও প্রকাশ করতে হয়েছে, ওর বি. এ. পাশ করা হয়ে গেলে আর প্রেমিকের চাকরি বাকরির ব্যবস্থা হলে তারপর না-হয় ভবিষ্যৎ চিন্তা করবে। কিন্তু এ-ও বোঝে প্রেম যারা করতে চায়, বিয়ে পর্যন্ত তাদের সকলের লক্ষ্য নয়। তাদের আপাত খিদেটাই বড়।

কলেজে পড়ার শেষের দিকে একমাত্র দাদুকেই ও এই উৎপাতের আভাস দিয়েছিল। দাদু শুনে যাচ্ছেতাই ঠাট্টা করেছে। বলেছে, তোকে দেখে এই বুড়ো বয়সে আমারই যা হয়, ওদের আর দোষ কি দেব বল! কিন্তু করার যেটুকু চুপচাপ করেছে। এলাকার সেই কংগ্রেস এম.এল.এ. নেতার বাড়ি তার যাতায়াত বেড়েছে। তার সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আর দাদু ওকে কি চোখে দেখে তাই বা না জানে কে! তাই ভরসা করে অসম সাহসের ব্যাপার কেউ করে বসেনি। প্রণয়ের রাস্তা ধরে যতটা এগোনো যায় সেই চেষ্টা করেছে। ফলে কলেজের মেয়েরা ওকে যাচ্ছেতাই ঠাট্টা ঠিসারা করত।

তারা জেনে বসে আছে, দূর্বা বোস একসঙ্গে গোটাকতক ছেলেকে বেশ খেলাচ্ছে।

বি. এ. পরীক্ষার পর কিছুটা স্বস্তি। দরকার খুব না হলে ঘর থেকে বেরুতোই না। দোকানে বা বাজারে হামেশাই যেতে হয়। কিন্তু পাড়ার ছেলেরা অন্তত চোখে পড়ার মতো প্রণয়কাণ্ডের মহড়া দিতে আসে না। বড় জোর এক ফাঁকে কেউ সময় ধরে বিকেলের দিকে লেকে-টেকে নিরিবিলি সাক্ষাৎকারের বাসনা জানায়। দূর্বার কিছু না কিছু দরকারি কাজ পড়েই যায়। সে যেতে চেষ্টা করবে বলেও গিয়ে উঠতে পারে না।

বি. এ. পাশ করার পরের বছরে এই উৎপাত অনেকটা কমল। গত দেড় দু'বছর রাজনীতির বাতাস আবার নানা দিক থেকে সরগরম হয়ে উঠেছিল। শুধু দিল্লিতে নয়, এই বাংলায়ও কংগ্রেস শাসনের আত্মপ্রসাদ আর নতুন নতুন আইন জারির ফাঁক দিয়ে একটা বিরুদ্ধ শক্তি প্রবল হয়ে উঠছিল। এর মধ্যে সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ খেপে খেপে পশ্চিম বাংলায় এসেছেন, সর্বত্র বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে এক সামগ্রিক বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে কায়েমী শাসনের অবসানের দিকে এগোনোর সংকল্প তাঁর। জেপির লক্ষ্য পীড়িত সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন। তাঁর ইচ্ছের বেগ সাধারণ মানুষের বুকের তলায় পৌঁছেছে। সর্বত্র দাবি, মিশা তুলে দাও, ডি. আই. আর. তুলে দাও—মানুষের নাগরিক স্বাধীনতা ফিরিয়ে দাও। এর জবাবে এলো 'ইমারজেন্সি'— আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কারণে দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা। অসুস্থ জয়প্রকাশসহ ভারতের বাছাই করা বিরুদ্ধাচারী নেতাদের ছেঁকে নিয়ে জেলে পোরা হল। পরের বছরে এর ওপর নতুন অর্ডিনান্সে মিসা'র কড়াকড়ি আরো বেড়ে গেল। কারণ না দেখিয়ে সরকারের যে-কোনো লোককে চব্বিশ মাস পর্যন্ত আটক করে রাখার ক্ষমতা। কিন্তু এত করেও শেষ রক্ষা হল না। পরের বছরের সাধারণ নির্বাচনে দেশের মানুষ কংগ্রেস দলকে শাসনের মসনদ থেকে টেনে নামালো। কিছু দিনের মধ্যে রাজ্যে রাজ্যেও ওলট-পালট। পশ্চিম বাংলায় বামপন্থী শাসন ফিরে এলো।

দূর্বা বোস কখনো রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না বা ঘামায়নি। কিন্তু আশপাশের ছেলেছোকরাদের আচরণের রকমফের অনুভব করেছে। কিছুদিন আগেও যারা বুক ফুলিয়ে রাস্তায় চলেছে তারা সাপের মাথায় ধুলো-পড়া গোছের ম্রিয়মাণ। দাদু ওরই মুখ চেয়ে এই ফাঁকে আবার স্থানীয় বাম-পাণ্ডাদের সঙ্গেও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছে। এই দলের ছেলেরাও রক্ষকের ভূমিকা থেকে কবে আবার ভক্ষক হয়ে উঠতে চাইবে দূর্বা জানে না। কিন্তু আপাতত সুস্থির একটু। আগের কাউকে পাত্তা না দিলেও তাদের ভ্রূকুটি তেমন ঘোরালো হয়ে ওঠে না।

ব্যতিক্রম একজন। বসন্ত রায়। এই রাস্তাটার দক্ষিণে শেষের প্রান্তে তাদের বাড়ি। অনেকের ধারণা এই বসন্ত রায় দূর্বা বোসের খপ্পরে পড়েছে। অবস্থাপন্ন। বাপ অ্যাডভোকেট। তাঁর এই এক ছেলের পর তিন মেয়ে। ফলে একটু বেশি আদরের। কিন্তু ছেলেটা ভদ্র, বছর কয়েক আগে বি. এ. পাশ করে কাব্যচর্চা করছে, গল্প লেখায় হাত মক্স করছে। বয়েস সাতাশ আঠাশ। বাপের ইচ্ছে ছিল ল' পাশ করে ছেলে তাঁর পেশায় আসুক। কিন্তু অমন গদ্যাকারের জীবন বসন্ত রায়ের আদৌ পছন্দ নয়। এ দিকের ছেলেরা তাকে ঠিক পাড়ার ছেলে ভাবে না। তাই এদিকে এলেই তাদের ঘাড় বেঁকে যায়, চোখ তেরছা হয়। কিন্তু সহ্য করতে হয়, কারণ সেই ছেলে দূর্বাদের বাড়ি আসে

না, বা রাস্তায় অপেক্ষা করে তার সঙ্গে কথা বলারও ফাঁক খোঁজে না। আসে দাদুর বাড়ি। তারও উকিল-বাবা স্কুলে দাদুর ছাত্র ছিলেন। বসন্ত ছেলেবেলা থেকে মাস্টার দাদুর কাছে আসে। দূর্বা যখন স্কুলে একটু ওপরের ক্লাসে পড়ে আর ও-ছেলে কলেজে—তখন থেকেই দূর্বা তার মতি-গতি লক্ষ্য করে আসছে। আর ক্রমে সেটা এমনি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে দাদুরও জানতে বুঝতে বাকি থাকেনি।

দাদু বসন্তকে এ-ব্যাপারে তেমন প্রশ্রয় দেয়নি, কিন্তু দূর্বাকে ঠাট্টা ঠিসারায় জর্জরিত করে তোলে। কারণ বি. এ. পাশ করার পর থেকে দূর্বার সন্ধ্যার টিউশনি ওই বাড়িতে। বসন্ত রায় দাদুকে অনুরোধ করেছিল, তার ছোট বোনটাকে দূর্বা পড়াবে কিনা। মাস গেলে টাকার এত টানাটানি যে দাদুর প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেছে। এই ছেলের জন্য আর যা-ই হোক ঘাবড়াবার কোনো কারণই নেই। অ্যাডভোকেট গৃহিণীর মেয়ের জন্য এই বয়সের শিক্ষয়িত্রী রাখাটা খুব পছন্দ ছিল না। আর ছেলের ইচ্ছেটাও সাদা চোখে দেখেননি। কিন্তু দাদুর সুপারিশ এই অ্যাডভোকেট ভদ্রলোকের কাছেও ভিন্ন ব্যাপার। তিনি খবর নিতে এসে প্রশংসার ফিরিস্তি শুনে চোখ-কান বুজে এই শিক্ষয়িত্রীই বহাল করেছেন। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি তিরিশ টাকা মাইনে ঠিক করেছিলেন। পরের বছর মেয়ে মোটামুটি ভালো পাশ করতে সেটা চল্লিশ টাকায় উঠেছে।

উকিল বাড়ির কর্তা-গিন্নি দূর্বাদের পারিবারিক খবর অত রাখতেন না। কিন্তু ক্রমশ তাঁদেরও কানে উঠেছে। বসন্তর বাবা যত না, তার মা-টি কারণে অকারণে সন্দিগ্ধ। অন্যদিকে আবার ভারী হিসেবী মহিলাটি। তার ছোট মেয়ের এই মাস্টার ভারী পছন্দ। সরাতে চাইলে চিৎকার চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় করবে। দ্বিতীয়, এই মাইনের ভাল টাকা গুনেও মেয়ের জন্য ভালো মাস্টার পাবেন কিনা সন্দেহ। তৃতীয়, ছেলেকে কি কারণ দেখাবেন? বাইরে যত নরম-সরমই হোক, বাড়িতে তো এই ছেলে নয়নের মণি। ছেলের কাছে কি কৈফিয়ৎ দেবেন? ওই মেয়ে যখন পড়াতে আসে, ছেলের তখন বার কয়েক অন্তত ওই ঘরে কাজ পড়ে সেটা লক্ষ্য করেছেন মহিলা। কিন্তু গত দু'বছরের মধ্যে কোনরকম বেচাল তো দেখেননি। ছেলে হয় কবিতা শোনাতে যায়, নয়তো সাহিত্য নিয়ে তার কিছু আলোচনার দরকার হয়ে পড়ে—তার বেশি কিছু নয়।

কিন্তু এ-ব্যাপার এমনি জিনিস যে অশান্তি বাড়ে ছাড়া কমে না। ছেলে আর দূর্বা বোসকে নিয়ে বেনামি একটা বিচ্ছিরি উড়ো চিঠি পর্যন্ত মহিলার নামে ডাকে এসেছে। অমন চিঠি কোনো বাজে ছেলের কাণ্ড এই সহজ বুদ্ধিও তাঁর আছে। স্বামীকে সেই চিঠি দেখিয়েছেন—তাঁরও একই মন্তব্য। কিন্তু দুজনেরই অস্বস্তি যাবে কোথায়।

এই ছেলেকে নিয়ে তাঁদের অনেক আশা, অনেক বাসনা। এমন কন্দর্পকান্তি ছেলে (চেহারা সত্যি সুন্দর) তার, ছেঁকে বেছে বড় ঘরের কত রূপসী বউ আনবেন, আমোদ আহ্লাদ করবেন। এ আশায় ছাই পড়লে সেটা আদৌ বরদাস্ত হবে না। অ্যাডভোকেট ভদ্রলোক বাইরে অন্তত রাশভারি মানুষ। ছেলেকে ডেকে সোজা বলে দিলেন, তাঁর মাস্টারমশায়ের (দাদুর) কাছে শুনেছেন মেয়েটি ভালো, তিনি অবিশ্বাসও করেন না —যদিও তার নাম করে কুৎসিত উড়ো চিঠি এসেছে—তবু ছেলে যেন এটুকু ভালো করে জেনে রাখে তাঁদের অমতে কোথাও বিয়ে-থাওয়ার ব্যাপার ঘটিয়ে বসলে সেটা বরদাস্ত হবে না—এ-বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্কও থাকবে না। বাপের মুখের ওপর ছেলে

কথা বলে না। মুখ আমসি করে চলে এসেছে। পরে ফাঁকমতো দূর্বাকে বাপের অবুঝপনার কথা বলে রাগে ফুঁসেছে। দূর্বা শুধু হেসেছে। কোনো মন্তব্য করেনি।

দিন যায়। বসন্ত রায়ের উদ্বেগ একটু কমেছে। কারণ বাবা-মা এত মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তাদের চাহিদা-মতো যোগাযোগ হয়ে উঠছে না। রূপ কিছু মেলে তো বড় ঘর মেলে না, আবার বড় ঘর মেলে তো রূপ মেলে না।

মাস দেড়েক আগের কথা। তার বোনকে পড়িয়ে রাস্তায় নেমে দূর্বা দেখে অদূরের আবছা অন্ধকারে কেউ দাঁড়িয়ে। ভালো করে লক্ষ্য করে বুঝল, বসন্ত। কি করবে ঠিক করতে না পেরে পায়ে পায়ে এগোতেই থাকল। বাড়ি দশ মিনিটের হাঁটা পথ।

বসন্ত কাছে এসে সঙ্গ নিল। আমতা আমতা করে বলল, ক'দিন ধরেই তোমাকে বলব-বলব ভাবছি...এরা যে-যাই বলুক, দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে, এবারে আমাদের বিয়েটা হয়ে যাওয়া উচিত।

দূর্বা মুখ ঘুরিয়ে একবার তার দিকে তাকাল শুধু। জবাব দিল না।

বসন্ত রায় আরো উদগ্রীব।—কি বলো? আর কত অপেক্ষা করা যায়, বিয়েটা সেরে ফেলা উচিত না?

পাশাপাশি এগোতে এগোতে একটু চিন্তিত সুরে দূর্বা বলল, উচিত তো...। কিন্তু তুমি বেকার আর আমি গরিবের মেয়ে, কে-ই বা আমাদের বিয়ে করতে আসছে বলো।

বিমূঢ় মুখে বসন্ত রায় দাঁড়িয়েই গেল। জবাবটা পরিষ্কার ভাবে মাথায় ঢুকছে না। হাসি চেপে দূর্বা দ্রুত পা চালিয়ে দিল।

দিন তিন চার বাদে দাদুর ডাক পড়ল। ও গিয়ে দাঁড়াতে কিছু বলার আগে দাদু হেসেই বাচে না। দূর্বা জিগ্যেস করল, অত হাসার কি হল?

—হাসার কি হল, যতবার মনে পড়ছে হেসে অস্থির হচ্ছি। তুই কি মেয়ে রে, ছেলেটাকে বলে দিলি তুমি বেকার আর আমি গরিবের মেয়ে—কে-ই বা আমাদের বিয়ে করবে!

দূর্বাও হেসে ফেলল।

দাদু হালকা মেজাজে জিজ্ঞাসা করল, অমন একখানা সুন্দর ছেলে, কবি, হাফ-লেখক—তাকেও তোর পছন্দ নয় কেন বল দেখি?

ঠোঁট উল্টে দূর্বা জবাব দিল, তুমি আমার মাথাটা খেয়ে দিয়েছ, কি আর করা যাবে।

দাদু গম্ভীর।—শুধু মাথাটাই তো খেয়েছি, আর সব খাবার জন্য কে বসে আছে?

—তুমি একটা অসভ্যের ধাড়ী!

হাসতে হাসতে দাদু বলল, শোন, বেচারা আমাকে ভীষণ ধরেছে, দশ মিনিটের জন্য তোর সঙ্গে কথা বলতে চায়—এইখেনে, আমার সামনে।

—তোমার সামনে কেন? তুমি তার হয়ে ওকালতি করবে?

—আমি ও-ছোঁড়াকে বলে দিয়েছি, সামনে থাকতে পারি, কিন্তু একটা কথাও বলব না।

—তার মানে তুমি আমাদের এখানে মিট করাতে রাজী হয়েছ?

—না করে করি কি, মায়াও তো হয়। আর ভাবলাম, যদি তোর মতি বদলায়।

—ঠিক আছে। পরশু রোববার সন্ধ্যার পরে আসতে বলে দাও।

দাদু তক্ষুনি টেলিফোন তুলল।

যথা সময় বসন্ত রায় এসে হাজির হতে হারুর মারফৎ ওর ডাক পড়ল। হাতের কাজ ফেলে দূর্বা চুপচাপ উঠে এলো। দাদু গুরুগম্ভীর মুখে একটু তফাতে ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে বসে আছে। বসন্ত আর একটা চেয়ারে। দূর্বা তার মুখোমুখি দাদুর খাটে বসল।

ঢোঁক গিলে বসন্ত রায় জিজ্ঞাসা করল, ব্যস্ত ছিলে নাকি?

—না। রান্না চড়াতে যাচ্ছিলাম।

বসন্ত রায় একবার ওর মুখের দিকে তাকাল। একবার দাদুর দিকে। তার ভিতরে অনেক কথা। কিন্তু দূর্বা এসে বসার সঙ্গে সঙ্গে সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। শেষে মরিয়া হয়েই বলে ফেলল, তুমি সেদিন ঠাট্টা করেছিলে বুঝতে পারছি, কিন্তু বিশ্বাস করে তুমি আমাকে বিয়েটা করে ফেলো, আমি বলছি সব ঠিক হয়ে যাবে।

—কি ঠিক হয়ে যাবে?

—বাবা মায়ের ব্যাপারটা...।

—তাঁরা তো তাড়িয়ে দেবেন বলেছেন?

—দিলেও ক'দিন আর ছেড়ে থাকতে পারবে?

—যদি পারেন?

—তাহলে তখন যা-হয় ব্যবস্থা হবে।

দাদু বসে আছে দূর্বার ভ্রূক্ষেপও নেই। চেয়ে রইল একটু। বলল, তাহলে আমারও কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে। বসন্ত রায় উদগ্রীব।—হ্যাঁ, বলো?

—মাঝারি কোয়ালিটির চালের কিলো কত করে এখন?

বসন্ত রায় বিমূঢ়। দাদুকেও দূর্বার দিকে ফিরতে হল।

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে দূর্বা পরপর জিজ্ঞাসা করে গেল, গত দু'মাসে কয়লার দর কত বেড়েছে? তেলের দাম আর পোস্টম্যানের দামের তফাৎ কত? দুজনের মতো রেশনের চাল তেল চিনি আটা ব্ল্যাকে কিনতে হলে কত তফাৎ হয়? বাজারের ছোট মাছের দরও কত চড়ে আছে?

—থাম থাম—থাম বলছি! তুই কি ওর মাথাটা খারাপ করে দিবি? দাদু প্রতিশ্রুতি দিয়েও আর চুপ করে থাকতে পারলেন না।

দূর্বা উঠে পড়ল।—যাই, রান্না ফেলে এসেছি। দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। বসন্ত রায়ের দিকে চোখ।—বাবা মা যেখানে ঠিক করেন চোখ কান বুজে সেখানেই বিয়েটা করে ফেলো—সুখে থাকবে, এ-সব কিচ্ছু জানার দরকার হবে না—কবিতার খাতাও দেখতে দেখতে ভরে যাবে।

চলে এলো।

তারপর বর্ষার রাতে খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা সহযোগে দাদুর এই নতুন চাকরির প্রস্তাব। কাজ যেমনই হোক, মাস গেলে কড়কড়ে পাঁচশো টাকা মাইনেটা চট করে ভাবা যায় না। রাতে সহজে ঘুম এলো না। দাদুর সঙ্গে ফোনে কথা হলেও চাকরিটা যে একেবারে হবেই দূর্বা বোস নিঃসংশয় নয়।...যাঁর পছন্দে চাকরি তিনি অসুস্থ ছেলের মা হলেও মস্ত বড়লোকের ঘরণী ও তেমনি কেতাদুরস্ত খুব শুনেছে। দাদু বলছিল, অত টাকা অমন অবস্থা—অথচ শান্তি নেই। বড় ছেলে আর মেয়ে দু'টোরও মতি-গতির ঠিক

নেই শুনেছে। চাকরি পেলেও টিকে থাকতে পারবে কিনা—আর বড়লোকের বড় ছেলের মতিই বা কেমন কে জানে।

দূর্বা বোস ভাবনা চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করল। যা হয় হবে, কাজটা পেলে লেগে থাকতেই চেষ্টা করবে। যে জীবন পিছনে ফেলে আজ এই তেইশটা বছরে এসে পৌঁছেছে—নিজেও সে এখন বেপরোয়া কম নয়। তার খুব কিছু হারানো বা খোয়ানোর আতঙ্ক কিছু নেই।

## চার

দাদুর চিঠি সরকার মোটরস্-এর মালিক নিখিলেশ সরকারের স্ত্রী নির্মলা সরকারের নামে। বাড়ির দরোয়ান কার সঙ্গে দেখা করতে চায় শুনে ছাপানো ছোট স্লিপ প্যাড আর পেন্সিল এগিয়ে দিল। নিজের নাম লিখে দূর্বা যাঁর কাছ থেকে আসছে তাঁর নাম অর্থাৎ দাদুর নামটা শুধু লিখে দিল।

সেকেলে ধরনের ডাউস বাড়ি। দূর থেকে দেখলে পড়তি বড়লোকের বাড়ি মনে হয়। বাইরের সংস্কার বা চাকচিক্যের দিকে খুব একটা নজর দেওয়া হয়নি। যে দিন গেছে বাইরের জাঁকজমক দেখানোটা খুব নিরাপদ ছিল না বলেই হয়তো এই রকম। কারণ ভিতরে পা দিয়ে মনে হল এমন তকতকে মহল আর দেখেনি। বসার ঘরটা প্রকাণ্ড। প্রায় সমস্তটা মেঝে জুড়ে নরম দামী গালচে বিছানো। বাইরের জুতোসুদ্ধ পা ফেলতে সংকোচ হয়। ঝকঝকে কভার মোড়া অনেকগুলো সোফা-সেটি পাতা। তার ওপর পুরু ডানলোপিলো। সেগুলোরও পোশাক-আসাক চোখে পড়ার মতো। মাঝে মাঝে সেন্টার টেবিল, ওগুলোর ওপর এক-একটা ফুলদানীতে ফুল সাজানো। ডিসটেম্পারড্ দেয়ালের চারদিকে চারটে মস্ত মস্ত অয়েল পেন্টিং।

দূর্বা বোস সন্তর্পণে একটা সোফায় বসল।

মিনিট তিনেকের মধ্যে পরিচ্ছন্ন বেশবাস পরা একটি মেয়েছেলে এসে তাকে ডাকল, আসুন—

মেয়েছেলেটিকে বড়লোকের বাড়ির আয়া মনে হল দূর্বার। বয়স্কা। কোথায় যেতে হবে ঠাওর করতে না পেরেও সোফা ছেড়ে উঠে তার সঙ্গ নিল। হল-ঘরের সামনে চওড়া বারান্দা, ডাইনে মার্বেল পাথরের তেমনি চওড়া সিঁড়ি। মুখ দেখা যায় এমনি পালিশ করা কাঠের রেলিং। দোতলায় উঠতেই গায়ে কাঁটা। প্রকাণ্ড একটা ছাড়া অ্যালসেশিয়ান সোজা দূর্বার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গোঁ-গোঁ শব্দ করে বারান্দার ও-মাথা থেকে এগিয়ে এলো। সঙ্গের মেয়েলোকটি ধমকের সুরে তাকে তফাতে হটাতে চাইল, হুইস্কি! গো!

বড়লোকের বাড়ির পেল্লায় কুকুরের নাম শুনে দূর্বা মুগ্ধ হবার অবকাশ পেল না। ধমকে ভ্রূক্ষেপ না করে মেজাজী কুকুর তার পায়ের কাছটা শুঁকে গলা দিয়ে এমনি গম্ভীর গোঁ-গোঁ আওয়াজ বার করে সোজা তার দিকে তাকাল। দূর্বা ভয়ে কাঠ।

—ভয় পাবেন না, কিছু বলবে না, চেনা-জানা না হলে ওই-রকম করে। হুইস্কি! গো!

রাশভারি কুকুর ধীরে সুস্থে প্রস্থান করল। মেয়েলোকটি দূর্বাকে নিচের তুলনায় ছোট

আকারের আর একটা বসার ঘরে নিয়ে এলো। একটু বসতে বলে চলে গেল। এ-ও তেমনি শৌখিন সাজানো গোছানো বসার ঘর। সম্ভবত কর্ত্রীর নিজস্ব এটা। দূর্বা ভালো করে দেখার বা ভাবার অবকাশ পেল না। ভয়ে সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল আবার। নিঃশব্দে ঘরে যে ঢুকল সে ওই বাছুরের মতো কুকুর হুইস্কি। দূর্বা বাইরে কাঠ, ভিতরে ছুটে পালানোর তাগিদ। এমন ভয়ংকর উপদ্রবের কথা দাদু মোটে বলেননি। ওটা পাঁচ হাতের মধ্যে এসে সোজা আবার তার দিকে তাকাল, গলায় গুরুগম্ভীর গোঁ গোঁ আওয়াজ।

উঠলে বা নড়লে বিপদ হতে পারে ভেবে দূর্বা কাঠ হয়ে বসেই রইল। খুব নরম করে মৃদু শুকনো গলায় ডাকল, হুইস্কি...

ওটার মেজাজ ঠাণ্ডা করার তাড়নায় এই চেষ্টা। কিন্তু জবাবে মাঝারি চালের একটা ধমক খেয়ে উঠল। অচেনা লোকের নাম ধরে ডাকার ধৃষ্টতা পছন্দ করে না বুঝিয়ে দিল। দূর্বা তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফেরালো।

পরের পাঁচ সাত সেকেন্ডের মধ্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। এবারে যিনি ঘরে ঢুকলেন তিনি কর্ত্রী হবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। চাকরি হোক না হোক এ-যাত্রা দূর্বা প্রাণে বাঁচল যেন। তাড়াতাড়ি উঠে দু'হাত জুড়ে নমস্কার জানাল।

মহিলা মাথা নেড়ে সেটুকু গ্রহণ করলেন। তারপর মুখের দিকে চেয়েই বুঝলেন কিছু। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটার উদ্দেশ্যে ধমকে উঠলেন, ইউ হুইস্কি, কাম হিয়ার! লেজ নেড়ে কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দিকে ফিরল। আঙুল তুলে দরজা দেখিয়ে তিনি হুকুম করলেন, আউট! এতটুকু প্রতিবাদ না করে কুকুরটা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

দূর্বার দিকে ফিরলেন।—বসুন, ভয় পেয়েছিলেন বুঝি, হি ইজ ফেরোশাস বাট ভেরি ওয়েল ট্রেনড। মাস্টারমশায়ের কাছ থেকে আসছেন?

সবিনয়ে মাথা নেড়ে হাতব্যাগ খুলে দাদুর চিঠিখানা তাঁর দিকে এগিয়ে দিল।

একটা সোফায় বসে পড়ে খাম থেকে চিঠি বার করে পড়তে লাগলেন। সামনের সোফায় আবার সন্তর্পণে বসে দূর্বা তাঁর দিকে তাকাল। ...ষাটের কাছাকাছি বয়েস। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। কানের দু পাশের আর সামনের দিকের চুল একটু বেশি পাকা। সুন্দরী খুব ছিলেন না হয়তো, তবে সুশ্রী ছিলেন বোঝা যায়। ঝকঝকে চওড়া পাড়ের সাদা জমিনের শাড়ি কুঁচি দিয়ে পরা। গায়ে পাড়ের সঙ্গে ম্যাচ করা ব্লাউজ। বাঁ হাতে দামী রিস্টওয়াচ। পায়ে শৌখিন চপ্পল। এ-ই মহিলার ঘরোয়া পোশাক মনে হল দূর্বার।

চিঠিটা পড়ে সামনের ছোট টেবিলে রাখলেন। ভালো করে লক্ষ্য করলেন একটু। —মাস্টারমশায়ের সঙ্গে আপনার কত দিনের জানাশোনা?

ফোনে দাদু সবই বলেছেন মনে হয়, তবু যাচাই কবাটা অস্বাভাবিক নয়। ইন্টাভিউই তো বটে। 'আপনি' শুনেই মনে হল মহিলার কালচারের ছটা একটু বেশি। সবিনয়ে বলল, আমার জন্ম থেকেই।...আমাকে তুমি করে বলুন।

আবার কয়েক মুহূর্তের নীরব পর্যবেক্ষণ।—এ ধরনের কাজ করার একটু আধটু অভ্যেস আছে?

দূর্বা মাথা নাড়ল। নেই।

—কিছুই করো না?

—সকালে আর সন্ধ্যায় দুটি মেয়েকে পড়াই।

—নিজে কতটা পড়াশুনা করেছ?

—বি. এ. পাশ করেছিলাম...।

তাঁর চাহিদার সঙ্গে একটু যেন মিলল।—কত দিন আগে পাশ করেছ?

—দু'বছর।

—এম. এ. পড়লে না কেন?

—সুবিধে হয়নি।

প্রশ্নের ফাঁকে লক্ষ্য করে যাচ্ছেন।—বি. এ. পাশ করে এ-ধরনের কাজ তোমার ভালো লাগবে?

বুদ্ধি করে এবার বেশ ভালো জবাবই দিল।—দাদু বলেছিলেন ভালো লাগবে।

—দাদু!...ও মাস্টারমশাই। দরজার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে মিসেস সরকার গলা চড়িয়ে ডাকলেন, সুমতি—।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দোরগোড়ায় আগের সেই মেয়েছেলেটির মুখ দেখা গেল।

—সাহেবকে একবার আসতে বলো।

দূর্বা মনে মনে ভাবল বাড়িতে এঁরা তাহলে সায়েব মেমসায়েব। কাজ হলে ওকেও মহিলাকে মেমসায়েব বলতে হবে কিনা ভেবে অস্বস্তি একটু। ব্যস্ত পায়ে যে মানুষটি ঘরে ঢুকলেন, বছর পঁয়ষট্টি হবে তাঁর বয়েস। লম্বা তেমন নয়, একটু মোটার দিক ঘেঁষা শরীর। গায়ের রং স্ত্রীর থেকে ফর্সা। পরনে সাদা ট্রাউজার গায়ে মোটা কলার-অলা গেঞ্জি। কাঁধের ওপর ধপধপে তোয়ালে। সদ্য শেভ সেরে আসছেন বোঝা যায়। দু'কানে এখনো সাবান লেগে আছে।

তাঁকে দেখেই দূর্বা সোফা ছেড়ে আবার সবিনয়ে উঠে দাঁড়াল।

তার দিকে চেয়ে নিখিলেশ সরকার মাথা নাড়লেন।—গুড মর্নিং, সীট ডাউন প্লীজ। স্ত্রীর দিকে ফিরলেন। তাইতেই বোঝা গেল তাঁর এখন বসার সময় নেই।

নির্মলা সরকার বললেন, এঁর নাম দূর্বা বোস, বিজুর জন্য মাস্টারমশাইকে একজন কমপেনিয়নের কথা বলেছিলাম, তিনি পাঠিয়েছেন। এই চিঠি—

চিঠিটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

—দ্যাটস অল রাইট। আর একবার দূর্বাকে দেখে নিয়ে স্ত্রীর দিকে ফিরলেন, মাস্টারমশাই যখন পাঠিয়েছেন আর কথা কি, তুমি কথা বলে সেটল করে নাও...সি ইজ ভেরি ইয়ং অ্যান্ড দি জব ইজ টায়ারসাম, সব জেনে উনিও ডিসাইড করুন। রাজি থাকলে বিজুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও, ও কি বলে দেখো, ওকে নিয়েই তো যত মুশকিল। আবার দূর্বার দিকে ফিরলেন, আই অ্যাম ইন এ হারি, এক্সকিউজ মি...

লঘু পায়ে চলে গেলেন। আবার নির্মলা সরকারের পালা। এবারে গম্ভীরই একটু। —আমার ছোট ছেলের সম্পর্কে সব শুনছ?

—দাদু মোটামুটি বলেছেন।

মহিলা সামান্য মাথা নাড়লেন।—হ্যাঁ...ছেলেও ওঁকে লাইক করে। তা শোনো, তোমাকে খোলাখুলি বলি, পাঁচ সাত দিন এসে তুমি ট্রায়েল দিয়ে দেখে নাও তোমার কি রকম লাগে, আর আমিও দেখি ছেলের কি রকম লাগে। ওর ভালো লাগাটা কত দরকার বুঝতেই পারছ...আগে দুজন নার্স ছিল, কিন্তু একজনকেও ওর তেমন পছন্দ

নয় দেখে আমাকে অন্য চেষ্টা করতে হচ্ছে। অবশ্য যে ক'দিন ট্রায়েল দেবে সে ক'দিনের টাকাও তুমি পাবে। সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ডিউটি শুনেছ বোধহয়?

দূর্বা মাথা নেড়ে জানাল শুনেছে। ট্রায়েল শুনে একটু অনিশ্চয়তাও বোধ করছে। মহিলা আবার দরজার দিকে মুখ ফেরালেন।—সুমতি!

সুমতি বাড়ির আয়া এটা এখন স্পষ্ট। সে আসতে জিজ্ঞাসা করলেন, বিজু কি করছে?

—ছবি আঁকছে।

—ইনি ওর সঙ্গে কথা বলবেন, জিগ্যেস করে এসো ও আসবে না এঁকে ওর ঘরে পাঠাব।

দূর্বা আবারও মনে মনে ঘাবড়ালো একটু। কি মেজাজের ছেলে কে জানে যে মা-কে এই অনুমতিও নিতে হচ্ছে।

কিন্তু সুমতি আর ফিরল না। তার বদলে ছেলেটাই এলো। তার এক হাতে ওই ভয়ংকর কুকুরটার লম্বা কান পাকড়ানো। কান ধরে টেনে ওটাকে সঙ্গে নিয়ে আসছে, কিন্তু সে-জন্যে অমন জাঁদরেল কুকুরটার একটু আপত্তি বা মান অভিমান নেই। সুড়সুড় করে সঙ্গে আসছে।

ছেলেটাকে দেখামাত্র দূর্বার বুকের তলায় একটা অদ্ভুত মোচড় পড়ল। ষোল বছর বয়েস শুনেছে কিন্তু দেখলে আরো কচি মনে হয়। না কালো না ফর্সা। দাদু বলেছিল, ভারী মিষ্টি ছেলেটা। কিন্তু মিষ্টি বললে সবটা বলা হয় না। ঠোঁটের ফাঁকে দুষ্টু দুষ্টু হাসি, বড় বড় দুটো স্বপ্নালু চোখ, যেন দূরের কিছুতে তন্ময়—আবার সোজা তাকালে চোখের আয়ত গভীরে একটু যেন কৌতূকের ছোঁয়া। পরনে সামান্য খাটো পা-জামা, গায়ে খুব দামী সাদা কাপড়ের ওপর কালো ডোরা কাটা হাফ শার্ট। মুখের দিকে তাকালে মনে হয় ছেলেটা তার শীর্ণ দেহটা নিয়ে বেশ ক্লান্ত—অথচ ফ্যাকাশে মুখখানা সপ্রতিভ।

তাকে দেখেই মহিলা উঠে দাঁড়ালেন, খুব মিষ্টি করে ডাকলেন, আয়রে বিজু, তোর কাছে কে এসেছেন দেখ—ওঁর নাম মিস দূর্বা বোস, তোর সঙ্গে গল্প করার জন্যেই এসেছেন। ওঁকেও মাস্টারদাদু খুব ভালবাসেন।

কি করবে ঠিক না পেয়ে দূর্বাও আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়েছিল। ছেলেটার একটা হাতে তখনো কুকুরটার এক কান ধরা। এটুকু ছেলের সঙ্গে গল্প করতে আসাটা যেন অবাক হবার মতো কিছু নয়। সকৌতুকে একটু দেখল। তারপর বলল, আমার নাম বিজন সরকার—বাড়ির সকলে বিজু বলে ডাকে।

বুকের ভিতরটা তখনো এক অজানা দরদে খচখচ করছে দূর্বার। হেসেই বলল, আমি তো অনেক বড় দিদির মতো...আমিও বিজু বলে ডাকব তো?

হাসছে অল্প অল্প। হাসিটা অদ্ভুত সুন্দর। ফিরে জিগ্যেস করল, আমার দিদির মতো দিদিগিরি ফলাতে আসবে না তো?

দূর্বা অপ্রস্তুত।

তার মা হাসি মুখে হালকা শাসন করলেন, ইউ নটি বয়, দিদিরা কত ভালবাসে তোকে! দাঁড়িয়ে রইলি কেন, বোস—তুমিও বোসো। ...তুই গল্প কর, আমি এঁকে একটু চা-টা দিতে বলি, কেমন? তুই খাবি কিছু?

—নাঃ। মায়ের দিকে তাকালও না। কান ধরে কুকুরটাকে সোফার কাছে নিয়ে এলো।

হাঁটু দিয়ে ওর পেটের কাছে একটা গুঁতো মেরে হুকুম করল, লাই ডাউন। দূর্বা অবাক হয়ে দেখল ওই বিশাল কুকুর তক্ষুনি বাধ্য বাচ্চার মতো সোফার সামনে কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়ল। ছেলেটা সেই সোফায় বসে দুটো পা-ই অনায়াসে ওর পিঠের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তার দিকে তাকাল। একবার ফিরে দেখল মা ঘর ছেড়ে চলে গেছে কিনা। তারপর অল্প অল্প হেসে মজার গোপন কিছু ফাঁস করার মতো করে বলল, দিদিরা আমাকে একটুও ভালবাসে না, বুঝলে?

খুব নরম করে দূর্বা বলল, তোমার মতো ভাইকে কেউ ভাল না বেসে পারে?

হাসি ছোঁয়া দু'চোখ তার মুখের ওপর আটকে রইল একটু।—তোমার ভাই আছে?

দাদা ছিল আর নেই শুনলে ধাক্কা খেতে পারে ভেবে বলল, না। মাথা নাড়ল। নেই।

ছেলেটা এবার বলল, বাঃ, আমি বসলাম, তুমি বসছ না কেন!

জবাব না দিয়ে দূর্বা কুকুরটার দিকে তাকাল। গায়ে কাঁটা দেওয়া বা সিঁটিয়ে যাবার মতো অত ভয় এখন করছে না অবশ্য, তবু ওটার এক দেড় হাত ফারাকে মাটিতে পা রেখে বসতে একটু অস্বস্তি। তবু বসল। কুকুরটা তখুনি মাথা তুলে তাকাল একবার। দূর্বা তাড়াতাড়ি দু'পা অন্য দিকে সরালো।

বিজু হেসে উঠল।—হুইস্কিকে এত ভয় পাচ্ছ কেন, ও খুব ভালো—মানুষের থেকেও ভালো।

এই ছেলের মুখে শেষের কথা কানে লাগার মতো। দূর্বা বলল, না, আমাকে তো এখনো ভালো চেনে না...

বিজু উৎসাহ বোধ করল, আচ্ছা আমি চিনিয়ে দিচ্ছি। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, নড়তে দেখেই কুকুরও দাঁড়িয়ে গেছে। কান ধরে ওটাকে একেবারে দূর্বার পায়ের কাছে নিয়ে এলো।—হুইস্কি! আঙুলে করে দূর্বার পা দেখালো।—লাই দেয়ার! লাই ডাউন!

দূর্বার আবার অস্বস্তি। পা সরাতে চেষ্টা করে বলে উঠল, থাক থাক, আস্তে আস্তে ঠিক চিনে নেবে—

তার মুখে স্পষ্ট ভয় দেখে বিজু মজাই পেল। কুকুরটার পিঠে সশব্দে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে কড়া ধমক লাগালো, হুইস্কি! লাই দেয়ার!

এবারে ওই বিশাল কুকুর দূর্বার পা ঘেঁষে শুয়ে পড়ল। পা থেকে চার আঙুলের মধ্যে।—তুমি ওর গায়ে হাত বুলিয়ে এবারে একটু আদর করো, কিচ্ছু বলবে না।

ভয়ে ভয়ে দূর্বা ওটার গায়ের কাছে হাত আনতেই গলা দিয়ে গম্ভীর আপত্তির গর-গর শব্দ বার করল একটা। দূর্বা সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে নিল।

—এই হুইস্কি, এবার তোর আমি কান দুটো ছিঁড়ে নেব বলে দিলাম। একেবারে কাছ ঘেঁষে এসে হাঁটু মুড়ে বসল। তারপর দূর্বার একটা হাত টেনে নামিয়ে ওটার গায়ে বোলাতে লাগল। আর আপত্তি জানাতে গেলে সুবিধে হবে না জাঁদরেল কুকুরও যেন বুঝল।

উঠে বিজু আবার সোফায় বসল। দূর্বার ভয় কাটল বটে, অস্বস্তি একেবারে গেল না। কুকুরের মেজাজপত্র তার একটুও জানা নেই। আর এটাকে তো দেখলেই গা শিরশির করে। কিন্তু শ্রান্তমুখ ছেলেটাকে অদ্ভুত ভালো লাগছে। জিগ্যেস করল, ওর হুইস্কি নাম কে রাখল?

—বড়দা। তার আবার এ-সব বেশ চলে তো। আমার অসুখের পর হুইস্কিকে চাইতে বড়দা আমাকে দিয়ে দিল।

মদের নেশা কাকে বলে দূর্বা হাড়ে হাড়ে জানে। শুনেই অস্বস্তি। জিজ্ঞেস করল, বড়দা তোমাকে খুব ভালোবাসেন বুঝি?

—ছাই ভালোবাসে, আমার ঘরে আসেই না মোটে। সাফ জবাব।

মদ খায় শুনেই বাড়ির অদেখা অচেনা একটা লোককে নিয়ে দূর্বার ভাবনা ধরে গেছে। সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এখানে থাকতে হবে। ভাইয়ের ঘরে আসেই না শুনে তবু স্বস্তি একটু।

কুকুরটা এবারে আড়মোড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর গজেন্দ্রগমনে দরজার দিকে এগুলো। ছেলেটার সামান্য মজা-ছোঁয়া দু'চোখ তার মুখের ওপর।—মাস্টার দাদু তোমাকে ভালোবাসে?

দূর্বা খুশি মুখে মাথা হেলালো।—খু-ব।

—মাস্টার দাদু গ্রান্ড—না?

—দারুণ গ্রান্ড। তোমাকে তিনি কত ভালোবাসেন তা-ও জানি।

শুকনো মুখের দুষ্টু দুষ্টু হাসিটুকু এত সুন্দর যে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। তোয়াজ করা হচ্ছে একটু তা-ও যেন বুঝতে পারে।

ট্রে-তে পেয়ালায় চা আর একটা প্লেটে এক পিস কেক আর দুটো ভালো বিসকিট নিয়ে সুমতি এলো। দুজনের মাঝের ছোট টেবিলে ট্রে রেখে খুব মিষ্টি করে বিজুকে বলল, ছোট পেয়ালায় এক পেয়লা দুধ নিয়ে আসি বাবা?

—নাঃ! বিরক্ত।

—তাহলে এই দিদির সঙ্গে বসে একটু কেক খাও...আনি?

রেগেই গেল। ফ্যাকাশে মুখ লাল একটু।—হ্যাঁ, নিয়ে এসো—ডিশসুদ্ধু আছড়ে ভেঙে শেষ করে দেন—সব-সময় কেবল খাও-খাও-খাও!

সুমতি দ্রুত চলে গেল। বিরক্ত মুখে বিজু দূর্বার দিকে তাকাল।—আমি একটুও রাগ করতে চাই না আর ওরা আমাকে রাগিয়ে দেবেই।

দূর্বা চুপচাপ বসে। ক্লান্ত মুখের এই রাগ দেখেও বুকের ভিতরে মোচড় পড়ছে। ওর ভিতরে নিঃশব্দে কেউ যেন সেই থেকে হায়-হায় করছে।

—কি হল, চা খাও?

দূর্বা হাসতে চেষ্টা করল।—তোমার রাগ দেখে ভয় পেয়ে গেছি, যা বলতে যাচ্ছিলাম তা বলতে আর সাহস পাচ্ছি না...।

তরল তক্ষুনি।—তোমার ওপর রাগ করেছি নাকি! কি বলবে?

—বকবে না?

—তোমাকে বকতে যাব কেন?

—ছোট ভাইকে সামনে বসিয়ে এতবড় দিদি একলা কখনো খেতে পারে? এখান থেকেই যা-হোক একটু খেলে একসঙ্গে খাওয়ার মতো হত।

ছেলেটা থমকালো একটু। তারপর ঠোঁটে হাসি ভাঙল।—তুমি চালাক মেয়ে। ডিশটার দিকে তাকাল।—আচ্ছা একটু কেক ভেঙে দাও, বেশি দিলে খাব না কিন্তু।

দূর্বার এটা বড় রকমের জয় মনে হল। শশব্যস্তে উঠে বিস্কুট দুটো পেয়ালার ডিশে সরিয়ে চামচে দিয়ে আধখানা কেক কেটে নিল। বাকি আর্ধেকও পেয়ালার ডিশে সরিয়ে এই ডিশ আর চামচ হাতে বিজুর চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়াল।

বিজু অবাক একটু। হাত বাড়াল।—দাও?

দূর্বার ঠোঁটে টিপ-টিপ হাসি, চোখেও। চোখে চোখ রেখে মাথা নাড়ল। বলল, ছোট ভাইকে নিজের হাতে খাওয়াতে কেমন লাগে দেখব...।

ছেলেটা সকৌতুকে চেয়ে থেকে হেসে ফেলল।—তুমি খুব দুষ্টু। হাঁ করল, দাও—একবারে বেশি দিও না।

চামচেয় করে কেক কেটে কেটে ওর মুখে দিতে লাগল। ছেলেটা খাচ্ছেও, হাসছেও।

নির্মলা দেবী ঘরে ঢুকে এই দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ালেন। প্রায় অবিশ্বাস্য কিছু দেখছেন যেন। হেসে কাছে এসে দাঁড়ালেন।—কি রে, দিদির সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে বুঝি?

ছেলে সঙ্গে সঙ্গে বিরক্ত।—হ্যাঁ হয়েছে, খাচ্ছি দেখে খুশি হয়েছ তো—এখন যাও!

দূর্বা অপ্রস্তুত একটু। ওর মা বললেন, ঠিক আছে, তুই গল্প কর, আমার কত কাজ পড়ে আছে—

চলে গেলেন। কেকটুকু শেষ করে বিজু দূর্বার হাতেই জল খেল। জল খাওয়া হতে দূর্বা নিজের পরিষ্কার রুমালে তার মুখ মুছিয়ে দিল। তারপর নিজের চা নিয়ে বসল।

চোখে চোখ রেখে বিজু হাসছে।

—হাসছ যে?

—তুমি কেন এসেছ আমি জানি।

দূর্বা থতমতো খেয়ে জিগ্যেস করল, কেন?

—নার্স দুটোর একটাও আর নেই তো, সেইজন্য রণদা তোমাকে পাঠিয়েছে।

খেয়াল না করে দূর্বা জিজ্ঞাসা করল, রণদা কে?

—বাঃ, রণদা-কে চেনো না! রণিত—ছোড়দার খুব বন্ধু ছিল, আমাকে দারুণ ভালোবাসে। অবাক একটু, রণদা পাঠায়নি তোমাকে?

দূর্বার মনে পড়েছে। সত্যি কথাই বলল, তিনি তোমার মাস্টার দাদুকে বলেছেন, দাদু আমাকে পাঠিয়েছেন। চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, দুজন নার্সের একজনকে তোমার পছন্দ হল না কেন?

—কি করে হবে, একজন আমি যা চাই তা করে না, কেবল বলে, এখন এটা করো, এখন ওটা করো, চোখ বুজে শুয়ে বিশ্রাম করো। আর একজন দুপুরে গল্প করতে করতে বা বই পড়তে পড়তে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়, ডাকলে বলে, কই ঘুমোইনি তো—একটু বাদেই আবার ঝিমোয়। সমস্তক্ষণ আমার কাছে থাকতে কারো ভালো লাগে না—তোমারও দু'দিন বাদেই ভালো লাগবে না—দেখো।

ছেলেটা সরল বটে, নির্বোধ নয় একটুও। দুটো ডাগর চোখে দূরের বিষণ্ণ ছায়া। দূর্বার বুকের তলায় আবারও মোচড়। সামনে ঝুঁকে সাগ্রহে বলল, তোমাকে আমার খুব ভালো লাগছে, পরে আরো ভালো লাগবে...তোমার ভালো লাগবে কিনা আমার সেই চিন্তা।

চুপচাপ চেয়ে রইল একটু। নিঃসংকোচে যাচাই-ই করছে মনে হল।—তুমি গান করতে পারো?

দূর্বা অপ্রস্তুত। মাথা নাড়ল। পারে না।

—ছবি আঁকতে পরো?

এবারও ফেল। বিমর্ষ মুখে আবার মাথা নাড়তে হল। পারে না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ছেলেটা ওকে বাতিল করল মনে হল না।—বই পড়ে শোনাতে আর ভালো ভালো গল্প বলতে পারো তো?

এবারে সাগ্রহে সায় দিল।—তা খুব পারি, তুমি যত শুনতে চাও।

—ছবি আর গানও তোমার খুব ভালো লাগে তো?

—খুব ভালো লাগে।

—আমার অনেক রেকর্ড আছে, যখন যে-টা বাজাতে বলব বাজাবে। আর আমি নিজেই ছবি আঁকতে পারি, একজন আর্টিস্ট সপ্তাহে দু'দিন করে এসে শিখিয়ে যায়। তুমি চুপ করে বসে থাকলে তোমার মুখও এঁকে ফেলতে পারি। আচ্ছা আমার ঘরে চলো, তোমাকে সব দেখাই।

উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দূর্বাও। ছেলেটার শ্রান্ত মিষ্টি মুখের দিকে চেয়ে ওর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল। বাইরে আসতে নির্মলা সরকার হাত ধরাধরি করে চলার দৃশ্যটাও দেখলেন। খুশি নিশ্চয়, কিন্তু নতুন মেয়েকে সেটা বুঝতে দেবার ইচ্ছে নেই। একেবারে শেষের কোণের ঘর থেকে একটা রিম-ঝিম আওয়াজ আর সেই সঙ্গে তবলার মৃদু মিঠে আওয়াজ কানে এলো। এই সকাল ন'টায় ওখানে ঝুমুর-পায়ে নাচের মহড়া দিচ্ছে বোঝা যায়।

বিজুর সঙ্গে তার ঘরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর। দামী টাইলের মেঝে। হালকা সবুজ ডিসটেমপার্ড দেয়াল। দেয়ালের এক-পাশে একটাই বড় খাটে পুরু গদির বিছানা। দেয়ালের তাকে রেকর্ড প্লেয়ার আর রেকর্ডের বাক্স। পাশাপাশি দুটো ছোট কাচের আলমারি বোঝাই নানারকমের চকচকে বই। মাঝারি সাইজের টেবিলের দু'দিকে ছোট দুটো শৌখিন চেয়ার। টেবিলের ওপর আঁকার সরঞ্জাম ছড়ানো।

আঁকার খাতাটাও টেবিলে পড়ে আছে। দূর্বা সাগ্রহে উল্টে দেখতে লাগল। কাঁচা হাত হলেও আঁকার বিষয় স্পষ্ট আর পরিচ্ছন্ন। নানা রকমের ফুল, মায়ের ছবি, বাবার ছবি, আবার অচেনা মুখের ছবিও, নানা পোজের হুইস্কির ছবি। একজন নার্সের বই হাতে ঝিমুনো ও ঘুমন্ত ছবি তিন চারটে। আর একটি মাঝ-বয়সী নার্সের টান ধরা কড়া-মুখের স্কেচ গোটা দুই। এই দুই নার্সের ছবিগুলো দেখে দূর্বা বিজুর দিকে চেয়ে হেসে ফেলল। বিজুও হাসতে লাগল, বলল, ওই ছবি দেখে নার্সদের মনে মনে রাগ, পাছে বাবা মা বা দিদিরা দেখে ফেলে।

ওদিক থেকে নাচ আর তবলার রিমঝিম আর ডুপ-ডুব শব্দ আরো একটু স্পষ্ট হল। দূর্বা জিজ্ঞাসা করল, ও-দিকে কেউ নাচ শিখছে নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে কচি মুখে বিরক্তির ছায়া।—হ্যাঁ—ছোড়দি—সময় অসময় নেই কেবল নেচেই চলেছে—থামাতে বলে দেব?

—না-না, আমি এমনি জিগ্যেস করছিলাম। ছেলেটার প্রতিপত্তির কথা শুনে

অবাকও একটু।—তুমি থামতে বললেই নাচ থেমে যাবে?

—যাবে না মানে? দেখবে?

—না না, আমার একটুও খারাপ লাগছে না।

বিজুর ঠোঁটে দুষ্টু দুষ্টু হাসি।—এ বাড়িতে আমার কথা সব্বাইকে শুনতে হয়।

দূর্বা এবারে আলমারির বই দেখতে লাগল। থাকে থাকে ছবির বই, ছবিতে গল্প। এ-ছাড়াও দেশবিদেশের ইংরেজি বাংলা অনেক রকমের গল্পের বই। দূর্বা জিগ্যেস করল, এত বই তোমার সব পড়া হয়ে গেছে নাকি?

—আমার পড়তে ভালো লাগে না। বইগুলো পড়ে শোনালে ভালো লাগে। আর ইংরেজি কিছুই প্রায় বুঝি না, কেউ পড়ে সুন্দর করে গল্প বললে ভালো লাগে। কত ভালো ভালো ইংরেজি বই ওখানে দেখো, বড়দা কিনে আনে, রণদা কিনে আনে, বউদিও এক এক সময় কেনে—কিন্তু নার্সরা নিজেরাই ইংরেজি বই ভালো পড়তে পারে না, আমাকে গল্প বলবে কি!

এত কথার মধ্যে 'বউদি' শব্দটা কানে আটকেছে। জিগ্যেস করল, বউদি মানে তোমার নিজের বউদি...?

—নিজের বউদিই ছিল, পাঁচ ছ' বছর আগে বড়দার সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেছে—আমাকে ভালোবাসে বলে এখনো মাঝে মাঝে দেখতে আসে।

দূর্বা সশঙ্কে একবার দরজার দিকে তাকাল। কি গল্প হচ্ছে কারো কানে গেলে কিছু মনে করা অস্বাভাবিক নয়। তাড়াতাড়ি কথা ঘোরাল।—রাতে এ-ঘরে তুমি একলা শোও?

—না, ওই কোণের মেঝেতে সুমতি মাসি শোয়। সুমতি মাসিও খুব ভালো।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এ-বাড়ির সকলের কথাই শোনা হল। একজন বাকি। ছোড়দি নাচে বোঝা গেল। বাকি বড়দি। জিগ্যেস করল, তোমার দুই দিদি শুনেছিলাম, বড়দি শ্বশুর বাড়িতে নাকি?

বিজু মজাই পেল।—বিয়ে না হলে আবার শ্বশুরবাড়ি হয় কি করে! বড়দি বিয়েও করবে না, শ্বশুরবাড়িও যাবে না। কিন্তু মনে পড়তে আরো উৎফুল্ল।—বড়দিকে দেখবে?

জবাবের অপেক্ষা না রেখে ফড়ফড় করে টেবিলের ড্রইংখাতার পাতা ওলটালো কয়েকটা।—এই দেখো!

দুষ্টু ছেলে নিজের মন থেকে এঁকেছে দেখলেই বোঝা যায়। খরখরে মুখ, চিমসে গাল ফুলিয়ে রাখা হয়েছে, নাকের ডগায় চশমা, এক হাতে বুকের কাছে একটা বই ধরা অন্য হাতে উঁচনো বেত।

দরজার দিকে আর একবার দেখে নিয়ে দূর্বা জিগ্যেস করল, এ-রকম এঁকেছ কেন? বড়দি রাগী নাকি খুব?

—রাগী ঠিক না। সব-সময় এ-রকম করে থাকে—নিজের দু'গাল ফুলিয়ে দেখালো—বড়দি খৃশ্চান হয়ে গেছে তো, মিশনারি স্কুলে পড়ায়, সেখানকার হস্টেলে থাকে, শনি রোববার বাড়ি আসে। হাসছে।—স্কুলের মেয়েরা বড়দিকে দারুণ ভয় করে, সেই জন্যেই হাতে বেত দিয়েছি—দেখলে আমাকেও যা লেকচার ঝাড়তে শুরু করবে না! নিজেই খুব হাসতে লাগল।

দূর্বা আর ঘাঁটাতে সাহস করল না তাকে। অনুমতি নিয়ে আলমারি থেকে কয়েকটা

ইংরেজি গল্পের বই বেছে নিল। এই বই যখন আছে গল্পের স্টকের জন্য চিন্তা নেই।

বিজু এবারে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল।—আজ অনেক হাসলাম আর অনেক কথা বললাম, ভালো লাগছে, তুমি কাল থেকে আসছ তো?

শোবার পর একটু বেশি শ্রান্ত দেখাচ্ছে ছেলেটাকে। দূর্বা জবাব দিল, তুমি যেমন বলবে।

—আচ্ছা কাল এসো। কখন আসবে?

—তোমার মা আটটায় আসার কথা বলেছিলেন...।

ভাবল একটু। মাথা নাড়ল।—কাল শনিবার, দশটায় এসো, আটটায় আমার আঁকার মাস্টারমশায় আসবে।

নিজের ঘরে না ঢুকে দূর্বা আগে দাদুর কাছে চলে এলো। ওকে দেখে একগাল হেসে রাধাকান্ত বললে, মেরে দিয়েছিস তো, আর ভাবনা কি—তোর কেমন লাগল বল—

—বিচ্ছিরি—খুব বিচ্ছিরি—এ-রকম জানলে আমি যেতাম না। ছেলেটাকে দেখার পর থেকে আমার আর কিচ্ছু ভালো লাগছে না—এত মন খারাপ হয়ে গেছে!

রাধাকান্ত প্রথমে অবাক হয়ে গেছলেন। পরে বুঝলেন। বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তা আর কি করা যাবে, ভগবানের মার—

দূর্বা রেগেই উঠল।—ভগবান টগবান থাকলে অমন সুন্দর ছেলের এ-রকম হয়!

—যাক, ওর মায়ের সঙ্গে কি কথা হল?

—এক সপ্তাহ ট্রায়েলের পর পাকাপাকি হবে।

—সে-কি রে! দাদু বেশ অবাক।—তুই সেখানে যাবার এক ঘণ্টার মধ্যেই তো বউমা মানে বিজুর মা আমাকে টেলিফোন করে জানাল, তার ছেলের তোকে খুব পছন্দ হয়েছে—আবার ট্রায়েল-ফায়েল কি?

দূর্বা জানাল, ছেলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবার আগে ও-রকম কথা হয়েছিল। আসার আগে আর কিছু বলেন নি।

যাচাইয়ে উৎরোবে কিনা দূর্বা সে-নিয়ে আর মাথা ঘামায় না, বা কারো সুপারিশও আর চায় না। অমন একটা ছেলে যদি ওকে পছন্দ না করে, বা তার সেবার যদি অযোগ্য হয় তাহলে এ চাকরি না হওয়াই ভালো। এই ছেলের সামনে দু'দুটো নার্স অমন পেশাদারী হয়ে গেছল কি করে দূর্বা ভেবে পায় না। একটু আধটু গান জানে না বা আঁকতে পারে না বলে দুঃখ হচ্ছে। জানলে বা পারলে ছেলেটার হয়তো আরো ভালো লাগত। গান-টান আর গলায় আসবে না, কালকের দিনটা বাদ দিয়ে ওর আঁকার মাস্টার আসার দিনেও আগে গিয়ে দেখে দেখে যদি একটু হাত-মক্স করতে পারে। স্কুলে পড়তে খুব মন্দ আঁকত না।

...কিন্তু শেষের সেই ভয়ংকর দিন যদি হঠাৎ এসে পড়ে? মনে মনে দূর্বা সেই সম্ভাবনার শেকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলে দিতে চাইল। এ রকম হতে পারে না, কখনো হতে পারে না। দাদুর কথাই ঠিক হবে। দু'চার বছর কাটিয়ে দিতে পারলে ঠিক কোনো ওষুধ বেরিয়ে যাবে। যাবেই।

পরদিন ঘড়ি ধরে ঠিক দশটায় হাজিরা দিল। আজ আর দরোয়ান চিরকূট চাইল

না, ওপরে চলে যেতে বললো। সিঁড়িতে পা দিয়েই হুইস্কির ভাবনা। চিনতে পারবে না তেড়ে আসবে কে জানে। সিঁড়ির বাঁক পর্যন্ত উঠে আবার দাঁড়াল, কাউকে যদি চোখে পড়ে। আয়া ছাড়া বাড়িতে আরো দুটো চাকর আছে।

দেখা প্রথমে হুইস্কির সঙ্গেই। সে বারান্দায় টহল দিচ্ছিল। দাঁড়িয়ে গেল। গলা দিয়ে গরগর শব্দ বার করল একটু। অল্প অল্প লেজও নাড়ল। দূর্বার মনে হল এটা ঠিক রাগের লক্ষণ নয়। ওর চোখের দিকে চেয়ে সুন্দর করে হাসল একটু। হুইস্কি আবার হেলে দুলে ফিরে চলল। তার ছোট্ট মনিবের ঘরেই ঢুকে গেল। যেন তাকে খবর দিতে চলল।

পায়ে পায়ে বাকি ক'টা সিঁড়ি টপকে দূর্বা দোতলার বারান্দায় উঠে এলো। তারপর পা বাড়াবার আগেই বসার ঘর থেকে একজন মহিলা বেরিয়ে এলো। লম্বা ছিপছিপে গড়ন, চোখে পুরু লেনস-এর চশমা, লালচে ছাঁটা চুল কাঁধ ছুঁয়ে আছে। বছর তেত্রিশ চৌত্রিশ হবে বয়েস। দূর্বা এই প্রথম দেখল তাকে, কিন্তু দেখামাত্র চিনেছে। বিজুর আঁকার সঙ্গে খুব যে মেলে এমন নয়। সব মিলিয়ে রসশূন্য টান-ধরা ভাবটুকু মেলে।

দরজার বাইরে পা দিয়ে দূর্বার দিকে সোজা তাকাল। কি চাই বা কাকে চাই প্রশ্নটা শুধু চোখে।

—বিজু তার ঘরে?

জবাবে মহিলার ঠাণ্ডা দু'চোখ দূর্বার আপাদমস্তক নামা-ওঠা করল একবার—তুমি দূর্বা বোস?

দূর্বার তক্ষুনি মনে হল, স্কুলের কড়া শিক্ষয়িত্রীই বটে। যেন সে-ও ছাত্রী বা ছাত্রীর মতো কেউ। সবিনয়ে মাথা নেড়ে সায় দিল।

—আমি বিজুর বড়দি, কমলা সরকার। আজ সকালেই মা তোমার কথা বলছিল। বিজু তার ঘরেই আছে, এসো—

সঙ্গে নিয়ে চলল। আজ আর শেষের ঘর থেকে নাচ বা তবলার শব্দ কানে আসছে না। বিজুর বড়দির এত বয়েস দূর্বা ভাবেনি। সরকার বাড়ির ছেলে-মেয়ের মধ্যে এই সব থেকে বড় কিনা জানে না।

কমলা সরকার হঠাৎ গলা খাটো করে বলল, বিজু নাকি কাল তোমার হাতে খেয়েছে?

দূর্বার আপাতত এটাই সব থেকে বড় সার্টিফিকেট বোঝা গেল। সে তার মুখের দিকে চেয়ে হাসল একটু।

—দাঁড়াও, তোমাকে দুটো কথা বলে রাখি। কতবড় অসুখ বা কি অসুখ বিজু সেটা জানে না, কিন্তু বেশ গণ্ডগোলের কিছু যে এটা বেশ বুঝে ফেলেছে। এ-জন্যেই ওর মতলব আর মর্জি-টর্জিগুলো বেড়েই যাচ্ছে মা সেটা বুঝতে চায় না। খাওয়ার নামে মারতে আসে অথচ তোমার হাতে খেলো—এই থেকেই বুঝতে পারছ ইচ্ছে করেই অনেক সময় ও গোঁয়ারতুমি করে। ও তোমাকে পছন্দ করেছে বলে তুমি যেন ওকে বেশি প্রশ্রয় দিতে যেও না। আমি দাদা আর রমলা ছাড়া সকলেই তাই করছে—

কথার মাঝে দূর্বার সিঁড়ির দিকে চোখ গেল। কারণ ও সেদিকে ফিরেই কথা শুনছে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলার বারান্দায় উঠলেন নির্মলা সরকার। বড় মেয়েকে ওর সঙ্গে কথা

বলতে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। এই কারণেই অখুশি না হোক, একটু উতলা কিনা দূর্বা ধরতে পারল না।

কমলা সরকার ফিরতেই উনি ব্যস্ত মুখে সামনের ঘরে ঢুকে গেলেন। কমলা সরকার টান হয়ে বসার ঘরের দিকে চলল। দূর্বা ফ্যালফ্যাল করে সেদিকে চেয়ে রইল খানিক। যা বলে গেল তার সাদা অর্থ, অসুখের জন্য শুধু সে দাদা আর রমলা ছাড়া আর সকলের কাছে ভাই বেশি প্রশ্রয় পায় আর বেশি বিগড়য়। বাবা মা ছাড়া আর বাকি থাকল কে দূর্বা জানে না। বোধহয় সুমতি।...রমলা ছোট বোন হবে। বড় বোনকে দেখে আর তার কথা শুনে দূর্বার গলা জিভ শুকিয়ে যাচ্ছিল। তবু রক্ষে সপ্তাহের পাঁচটা দিন সে এখানে থাকে না। কিন্তু নাচিয়ে ছোট বোন আবার কেমন হবে কে জানে। কেবল একটু যা স্বস্তি, দাদা বলল যখন, বাড়ির বড় ছেলে কমলা সরকারের থেকেও বড়। একে মদ খায়. তায় বউয়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি—শোনার পর থেকে দূর্বার ভিতরে একটু অস্বস্তি থিতিয়েই ছিল। ঘর-পোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেও ডরায়। বড় ছেলে বুড়ো শুনলে আরো নিশ্চিন্ত হত।

—তোমার দশটায় আসার কথা ছিল, দশটা দশ হয়ে গেল। ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজুর গম্ভীর অনুযোগ।

—খুব অন্যায় হয়ে গেল। তোমার বড়দির সঙ্গে একটু আলাপ করতে হল তো..।

সঙ্গে সঙ্গে তরল মুখ।—ও, বড়দির পাল্লায় পড়েছিলে? তোমাকে অনেক উপদেশ দিল না?

—না...ভালো কথাই তো বললেন।

—কি ভালো কথা?

দূর্বা বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেল। ওর সততার সম্পর্কে এই ছেলের মনে এতটুকু সংশয়ের আঁচড় পড়ুক, চায় না। হুইস্কি কাছে এসে দূর্বার শাড়িসুদ্ধ পায়ের কাছটা শুঁকল একবার, তারপর টেবিলটার ওদিকে তার ছোট মনিবের ধার ঘেঁষে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ছেলেটার হাসি-ছোঁয়া দু'চোখ তখনো তার মুখের ওপর।

—কি ভালো কথা বলছ না কেন?

খুব সহজ একটা সত্যি পথ ধরল দূর্বা। বেচারী মুখ করে বলল, তুমি তো আর্টিস্ট, চোখে না দেখেও ভেতর বুঝে হাতে বেত তুলে দাও—এ-রকম জিগ্যেস করে মুশকিলে ফেলো কেন?

সঙ্গে সঙ্গে হাসির চোটে ছেলের মুখ লাল। এত হাসি দেখে হুইস্কিও মাথা তুলে মনিবকে লক্ষ্য করছে। দূর্বা তাড়াতাড়ি সামাল দিতে চাইল, বলল, তাহলে একটুও খারাপ কথা বলেননি, তোমার জন্য সত্যি খুব চিন্তা, তাছাড়া আমি নতুন মানুষ...কিভাবে চলতে হবে না হবে তা তো বলবেনই।

হাসির মধ্যেই টুলটুলে মুখখানা বেঁকে গেল। কচি গলায় কড়া হুমকি, এঃ! তাহলে বড়দির হস্টেলে গিয়ে থাকো, এখানে থাকতে হবে না—কিভাবে চলতে হবে বড়দি বলে দেবে!

দূর্বার ভিতরে নাজেহাল দশা, বাইরে হাসছে। চোখে চোখ রেখে খুব চাপা গলায়

রহস্যের মতো করে বলল, আমি এখানে সক্কলের কথা কানে শুনব, কিন্তু যা করার করব শুধু একজনের কথায়।

আবার হাসি।—বুঝেছি, আমার কথায়।

দূর্বা হাসি মুখে সায় দিয়ে মাথা নাড়ল। প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য বলল, আজ কি আঁকা হল দেখি—।

বিজু সোৎসাহে দেখাতে লাগল। দূর্বাও মন দিয়ে দেখল। ইস্কুলের ড্রইং মাস্টারের মুখে একসময়ের একটা শোনা গল্প সকালে আসার সময় মনে পড়েছিল। এখন সেটা মাথায় গিসগিস করছে। আঁকা দেখার পর লজ্জা-লজ্জা মুখ করে দূর্বা বলল, কাল আমি তোমাকে ঠিক বলিনি, আমিও কিন্তু বেশ আঁকতে পারি।

বিজুর খুশি ছোঁয়া অবাক মুখ।—এঁকে দেখাও তো একটা? আঁকার খাতাটা এগিয়ে দিল।

সেটা নিয়ে দূর্বা বলল, তোমার সামনে পারব না, তুমি তোমার খাটে বোসো, আগে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে কিচ্ছু দেখবে না কিন্তু—

বিজু তক্ষুনি বিছানায় গিয়ে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ল। টেবিলে ঝুঁকে রং-পেন্সিল নিয়ে দূর্বা প্রায় দশ মিনিট ধরে কি করল। বিজু উঠে বসে দেখে না ফেলে সেই ভয়ে খাতার পিছনে একটা হাতের আড়াল রেখেছে।

আঁকা শেষ হল। ড্রইং খাতার পিছনটা বিজুর দিকে ধরে নিজের আঁকা মন দিয়ে দেখল দূর্বা। তারপর নিজেই বলল, সুন্দর হয়েছে।

বিজু তড়াক করে উঠে বসল।—দেখি?

দূর্বা খাতা উপুড় করে তাতে হাত চাপা দিয়ে বলল, কি আঁকলাম সেই বিষয়টা শোনো। যীশুর নাম শুনেছ তো?

—বা-ব্বা, বড়দি খৃশ্চান হয়েছে আর যীশুর নাম শুনিনি!

—বেশ। যীশুর অনেক ভক্ত ছিল। আর অনেক শত্রুও ছিল। একবার সেই শত্রুরা ভক্তদের আক্রমণ করতে এলো। কিন্তু ভক্তরা আগেই খবর পেয়ে গেল। তাদের প্রার্থনায় লোহিত সমুদ্র দু'ভাগ হয়ে গেল, আর ভক্তরা তার ভিতর দিয়ে পালাতেই সমুদ্র আবার জোড়া লেগে গেল।—এই বিষয়টাই এঁকেছি...বুঝলে?

গল্পটাই কান পেতে শোনার মতো। এই গল্প আঁকা তো সাঙ্ঘাতিক কথা! সাগ্রহে হাত বাড়াল, শিগগীর দাও, দেখি—

—না, আমার হাত থেকে দেখো। দূর্বা খাতাটা এবার তার দিকে ফেরালো।

সেদিকে চেয়ে বিজু হাঁ একটু। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, তুমি এক নম্বরের মিথ্যেবাদী! গল্প বলে আমাকে এখন সাদা পাতা দেখাচ্ছ!

দূর্বার কাঁচুমাচু মুখ।—ঠিক হয়নি বলছ?

—ঘোড়ার ডিম হয়েছে! দুষ্টুমি করে একটা আঁচড়ও কাটোনি—না কি ভিতরে লুকিয়ে রেখেছ?

—না, এইটেই। তুমি ভালো করে দেখো, খুব খারাপ হয়নি।

বিজু একটু রেগেই গেল।—সব তো সাদা, কি দেখব?

ব্যস্ত হয়ে দূর্বা বলল, আচ্ছা, কি পাচ্ছ না আমাকে জিগ্যেস করো, আমি বলে দিচ্ছি।

কিছু মজার খেলা হতে পারে ভেবে বিজু থমকালো একটু। জিগ্যেস করল, দু'ভাগ হওয়া আর জুড়ে যাওয়া লোহিত সমুদ্র কোথায়?

দূর্বা জবাব দিল, তুমি ম্যাপ দেখলেই বুঝতে পারবে, সেই অত-শ' বছর আগের লোহিত সমুদ্র এখন কত দূরে সরে গেছে। তাহলে এখানে তুমি সেটা পাবে কি করে?

এবারে একটু মজার গন্ধ পেল বিজু। আবার জিগ্যেস করল, যীশুর সেই ভক্তরা কোথায়?

—বা-রে! তারা তো পালিয়েই গেছে, তাদেরই বা দেখবে কি করে?

এবারে বিজুর বড় বড় চোখ।—আর যে শত্রুরা আক্রমণ করতে আসছে?

মুখ কাঁচুমাচু করে দূর্বা বলল, তারা তো এখনো এসে পৌঁছয়নি।...।

বিজু তার মুখের দিকে থমকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর হাসির চোটে বিছানায় গড়াগড়ি। মুখ রক্তবর্ণ, চোখে জল এসে গেল। তবু হাসি আর থামেই না। দূর্বা তাড়াতাড়ি উঠে এসে তার গায়ে মাথায় হাত বুলোতে লাগল।—এই এই! এত হাসে না—থামো থামো এবার।

দরজায় চোখ পড়তেই দূর্বা আরো বিব্রত। ট্রেতে কিছু খাবার আবার চা-টা নিয়ে সুমতি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। এত হাসি দেখে সে-ও হতভম্ব।

চোখ মুছতে মুছতে বিজু উঠে বসল। সুমতি ট্রে-টা টেবিলের ওপর রাখল। কৈফিয়তের সুরে দূর্বা বলল, এত হাসবে ভাবিনি...ওর তাতে ক্ষতি হবে না তো?

একগাল হেসে সুমতি বলল, হাসা তো খুব ভালো, এক রণ এলে যা একটু হাসে, নইলে তো হাসেই না।

ট্রের ডিশে কিছু খাবার আর চায়ের পেয়ালার পাশে আধ গেলাস দুধ দেখেই বিজুর মেজাজ সপ্তমে চড়ল। চেঁচিয়ে উঠল, দুধ কে আনতে বলেছে? শিগগীর নিয়ে যাও বলছি, নইল গেলাসসুদ্ধু ছুঁড়ে ফেলে দেব! সকালে এক-কাঁড় খাইয়ে সাধ মিটল না?

সুমতি হালছাড়া চোখে দূর্বার দিকে তাকাল। দূর্বা বলল, ঠিক আছে, আমিই খেয়ে নেব'খন সুমতি মাসি।

সুমতি খুশিমুখে পালালো। বিজুর সন্দিগ্ধ চোখ দূর্বার মুখের ওপর।—দেখো, কাল বলেছ—খেয়েছি। আজও ভুলিয়ে ভালিয়ে খাওয়াবার মতলব—কেমন? এই করলে আমার সঙ্গে ওই নার্সদের মতো ঝগড়া হয়ে যাবে।

দূর্বা খুব নরম করে বলল, তুমি এত বড় ছেলে, তোমাকে ভুলিয়ে খাওয়াবো কি করে? কিন্তু সাতটা দিন অন্তত আমার কাছে একটু না খেলে আমি তোমার কাছে থাকতে পাব কি করে? সাতটা দিন আমার পরীক্ষা না?

—সাত দিন কি পরীক্ষা?

—এই সব পরীক্ষা...এতে পাশ করলে তবে তো আমি পাকাপাকি ভাবে তোমার কাছে থাকতে পাব!

—কে বলেছে? মা?

দূর্বা এবারে বিপন্ন একটু।—বলবেন না কেন, কতটা পারি না পারি আগে দেখে নেবেন না?

কথা শেষ হবার আগেই বিজু খাটে লাগানো বোতামটা টিপে ধরল, আর ধরেই

থাকল। বাইরে একটানা প্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ আওয়াজ। দূর্বা গতকালই ওটা লক্ষ্য করেছে—কলিং বেল। এগিয়ে এসে তাড়াতাড়ি ওর হাত টেনে নিল।—এ কি করছ? কি চাই?

জবাব পাওয়ার আগে একটা চাকর আর সুমতি ছুটে এসেছে। বিজু সেদিকে চেয়ে চেঁচিয়ে হুকুম করল, মা-কে—শিগগীর!

দূর্বার ত্রাস।—মা-কে কেন? কি বলবে?

জবাব না দিয়ে বিজু রাগত মুখে দরজার দিকে চেয়ে আছে। দূর্বার কিছু বলার ফুরসত মিলল না। নির্মলা সরকারও প্রায় ছুটে এসেছেন। পিছনে বড় মেয়ে কমলা। তার পিছনে সুমতি।

—কি রে বিজু? কি হয়েছে?

—দূর্বা দিদিকে তুমি কি বলেছ?

সঠিক না বুঝে মহিলা দূর্বার দিকে তাকালেন। মনে মনে দূর্বা সত্যি প্রমাদ গণছে।

মা ছেলের দিকে ফিরলেন।—কেন? কি বলেছি?

—কি বলেছ? দূর্বাদি যে বলল, সাত দিন অন্তত আমি তার কাছে একটু না খেলে পরীক্ষায় পাশ করবে না, আর আমার কাছে তাহলে থাকতেও পাবে না?

নির্মলা সরকার ধরেই নিলেন ছেলেকে ভুলিয়ে ভালিয়ে খাওয়ানোর চেষ্টায় ওই রকম বলেছে। হাসি চেপে নিরীহ মুখ করে দূর্বা যা বলেছিল তা-ই বললেন।—কি-রকম পারে না পারে একটু দেখে নেব না?

বিজুর ক্রুদ্ধ দু'চোখ দূর্বার দিকে ফিরল।—দুধের গেলাসটা দাও তো!

দূর্বা শশব্যস্তে দুধের গেলাস তুলে নিয়ে তার মুখের সামনে ধরল। চোঁ-চোঁ টানে এক নিঃশ্বাসে আধ গেলাস দুধ খালি। বড় করে দম ফেলল একটা। তারপর চেঁচিয়ে সুমতিকে হুকুম করল, ও-রকম আরো দু'গেলাস দুধ নিয়ে এসো এক্ষুনি! এক দিনেই সাত গেলাস খেয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি পাশ কি ফেল—দাঁড়িয়ে আছ কেন? শিগগীর নিয়ে এসো!

এবারে মা ব্যতিব্যস্ত। না-না—পাশ—খুব ভালো পাশ! এখন আর তোকে দুধ খেতে হবে না। তাড়াতাড়ি দূর্বার কাছে এগিয়ে এলো, আর তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে না, গতকাল থেকেই তুমি একদম পাকা—বুঝলে?

দূর্বারও তৎক্ষণে ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে। ভালো মুখ করে মাথা নাড়ল, বুঝেছে।

এরই মধ্যে ছন্দপতন ঘটিয়ে বসল কমলা সরকার। এতক্ষণ গম্ভীর ছিল। শুনছিল আর দেখছিল। এখন আরো গম্ভীর গলায় ভাইকে বলল, ইচ্ছে করলেই তো বেশ খেতে পারিস—অত মরজি করিস কেন?

আর যায় কোথায়! রাগে সুন্দর মুখটা একেবারে বিকৃত করে বলার ঢং নকল করে ভেঙচে উঠল, ইচ্ছে কেল্লেই তো খেতে পারিস—যাও এখান থেকে—যাও বলছি! ওঁর স্কুলের মেয়ে পেয়েছে আমাকে!

দূর্বা অবাক হয়ে দেখল অমন গুরুগম্ভীর বড়দি-টি সুড়সুড় করে ঘর ছেড়ে চলে গেল। অসহায় মুখ করে নির্মলা সরকার দূর্বাকেই সাক্ষী মানলেন।—অতবড় দিদির সঙ্গে কি রকম করে কথা বলে দেখলে?

ছেলে মায়ের ওপরেও খেঁকিয়ে উঠল।—অত বড় দিদি আমার সঙ্গে লাগতে আসে কেন? দু'দিনের জন্যে এসেও মাস্টারি করা চাই!

—আচ্ছা থাম এবার, অনেক চেঁচিয়েছিস, এরপর শরীর খারাপ হবে। তিনিও ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

বিজুর দিকে চেয়ে এবারে দূর্বাও ব্যস্ত একটু। বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। মুখও ফ্যাকাশে। বিছানায় শুয়ে পড়ে চোখ বুজল। দূর্বা খাটের ওপরেই তার পাশে বসল। মাথার পাতলা চুলে আঙুল ডুবিয়ে ওপরদিকে তুলে দিতে লাগল।—খারাপ লাগছে না তো বিজু?

বিজু মাথা নাড়ল। খারাপ লাগছে না। চোখ মেলে দূর্বার দিকে তাকাল। ঝপ করে বলে বসল, এক রণদা ছাড়া আসলে এরা কেউ আমাকে ভালোবাসে না—বুঝলে?

এমন সুরে বলল যে দূর্বার বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠল। কি ধরনের ভালোবাসার কাঙাল এই ছেলে তা-ও ঠাওর করে উঠতে পারল না। ঝুঁকে মাথায় আরো ভালো করে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, মা কি কখনো তার ছেলেকে ভালো না বেসে পারে?

প্রতিবাদ না করে বিজু আবার চোখ বুজল।

ঘড়ি ধরে ঠিক একটায় বিজুর লাঞ্চের টাইম। সুমতি ছাড়া অন্য সকলেরও তাই, বোঝা গেল। একজন চাকর একটার দু'মিনিট আগে এই ঘরে একটা ভাঁজকরা টেবিল এনে পেতে রেখে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে থালায় ভাত আর কাচের কয়েকটা সাজানো বাটি হাতে সুমতি এলো। দূর্বাকে বলল, সকলে খেতে গেছে, দিদি তোমাকেও ডাইনিং রুমে যেতে বললেন। আমি ওকে খাইয়ে দিচ্ছি।

দূর্বা ফাঁপরে পড়ল। ডাইনিং রুম ওপরে কি নিচে তাই জানে না। সকলে বলতে আর কে কে গেছে আঁচ করতে পারে। বিজুর সঙ্গে গল্প করে এর মধ্যে কিছু খবর সংগ্রহ করেছে। বাড়ির কর্তা নিখিলেশ সরকার রোজ সকাল ন'টার মধ্যে বেরিয়ে যান। আপিসে লাঞ্চ করেন। রাত আটটার পরে ফেরেন। আপিস থেকে যেদিন ক্লাবে চলে যান, ফিরতে রাত দশটা সাড়ে দশটাও হয়ে যায়। বিজুর ছোড়দি রমলা গতকাল আসানসোলে কোন ফাংশানে নাচতে গেছে। আজ সন্ধ্যার আগে ফিরবে না। অতএব খাবারঘরে সে নেই। মিসেস সরকার আর বড় মেয়ে তো আছেই। বাড়ির যে বড়দাটিকে এখনো দেখেনি, তার থাকাই সম্ভব।

আমতা আমতা করে দূর্বা সুমতিকে বলল, আমি যদি একটু পরে আপনার সঙ্গে যাই সুমতি মাসি, খুব অসুবিধে হবে...ওর হয়ে গেলে তারপর খেতাম।

সে কিছু বলার আগেই বিজু হুকুম করল, দূর্বাদির খাবারটাও এখানে দিয়ে যেতে বলো।

—না-না না-না! দূর্বা ব্যস্ত হয়ে উঠল, এখানে আনতে হবে না, আমি পরে খেয়ে নেব।

বিজুর খাবারটা রেখে আবার বাইরে যেতে যেতে সুমতি চোখের ইশারা করল। দূর্বা বাইরে আসতে হাসিমুখে ফিসফিস করে বলল, দিদি শুনলে খুশি হবেন—আপত্তি কোরো না।

বলল বটে। কিন্তু দূর্বার সংকোচ একেবারে গেল না। বাড়ির কর্তা সাহেব হলেও কর্ত্রীটি তার দিদি বোঝা গেল। ঘরে ফিরতেই বিজু চোখ পাকিয়ে জিগ্যেস করল, বাইরে ডেকে নিয়ে সুমতিমাসি কি বলছিল?

ছেলের চোখে কিছুই এড়ায় না। ঢোক গিলে দূর্বা বলল, তোমার কথার অবাধ্য হতে বারণ করল।

বিজুর পরিতুষ্ট মুখ। একটু বাদে সুমতি ফিরল। তার হাতে ট্যাবলেটের শিশি। আর এক প্রস্থ খাবার নিয়ে পরিষ্কার পা-জামা হাফশার্ট আর চপ্পল পরা বাবুর্চি ঘরে ঢুকল। চেহারাপত্তর দেখে হিন্দুই মনে হল দূর্বার।

বিজুর ফোলডিং ডাইনিং টেবিল একেবারে ছোট নয়। সুমতির ইশারায় বিজুর খাবারের পাশেই দূর্বার খাবার রেখে গেল। জলের সঙ্গে ট্যাবলেট গলায় ফেলে বিজু খেতে বসল। তবে খাবারের ঢাকনা খোলা হতে কি খায় দূর্বা লক্ষ্য করল। সুপ, ভাত-ডাল, কিছু ভাজা, বড় এক টুকরো ভালো মাছ, মাংসের স্টু, একটু দই, একটা মিষ্টি।

—বসে যাও। ওই একটা চেয়ার টেনে নাও। কোলের ওপর বিজু নিজের ন্যাপকিন পেতে নিল।

এবারে অনুনয়ের সুরে দূর্বা বলল, তোমার সব কথা শুনেছি, আমার একটা কথা কিন্তু রাখতে হবে। তোমার খাওয়া হয়ে গেলে তারপর আমি খাব। তোমার খাওয়া দেখতে না পেলে আমার বিচ্ছিরি লাগবে।

—খেতে খেতে দেখো।

—হ্যাঁ, খেতে খেতে দেখি আর গলায় মাছের কাঁটা ফুটুক। লক্ষ্মীটি তুমি খাও। তোমার হয়ে গেলেই তোমার সঙ্গে গল্প করতে করতে আমি খেয়ে নেব।

বিজু বিরক্ত হতে গিয়েও হেসে ফেলল।—তুমি এক নম্বরের দুষ্টু, আসলে আগে আমাকে খাইয়ে পরে নিজে খাবে!

নিজের হাতে ফেলে ছড়িয়ে খেতে শুরু করে দিল। তিন চামচ সুপ মুখে দিয়ে বাটি সরালো। তারপর ঠুকরে ঠুকরে এটা ওটা খেতে লাগল। তাও বেশ তাড়াতাড়ি।

—ও কি, আস্তে আস্তে ভালো করে খাও, অত তাড়া কিসের?

সুমতি বলল, এই রকমই খায়, খাওয়ার সময় যত ব্যস্ততা।

বিজু বলল, দেরি করে কি হবে, খাওয়া হলেই তো হজমের ওষুধ গেলাবে।

দূর্বা নিঃশব্দে উঠে অ্যাটাচড বাথ-এ ঢুকে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে তার মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে বসল। বিজু সঙ্গে সঙ্গে মতলব বুঝল। তপ্ত গলায় বলে উঠল, আমার খাবারে হাত দিলে আমি আর খাবই না—এতবড় ছেলেকে তুমি খাইয়ে দেবে?

দূর্বাও সমান ওজনের জবাব দিয়ে বসল, এতবড় ছেলে এমন অবুঝ হলে কি করব?

—আঃ, আমার এর থেকে বেশি খেতে ভালো লাগে না!

দূর্বা ক্ষুব্ধ মুখে চেয়ে রইল একটু। তার পর সুমতিকে বলল, আমার খাবারটা নিয়ে যেতে বলুন মাসি—এখানে যা আছে আমার তাতেই হয়ে যাবে।

বিজুর ঠোঁটে দুষ্টু হাসি।—হুঃ, চালাকি বুঝি না, আমার পাতেরটা তুমি খেতে যাবে—

জবাবে দূর্বা তার থালা থেকে একটা ভাজা তুলে নিয়ে নিজের মুখে দিল। বিজু বড় বড় চোখ করে দেখল এবার। পরে হালছাড়া গলায় বলল, তুমি খুব বিরক্ত করো, জোর করে বেশি খাওয়ালে আমার অসুবিধে হয় কেউ বোঝে না—ঠিক আছে, ওই দই আর মিষ্টি তুমি চামচে করে খাইয়ে দাও।

আর পীড়াপীড়ি না করে দূর্বা তাই করল। সুমতি মাসির মুখ দেখে মনে হল যেটুকু খাওয়া হল আজ, খুব যথেষ্ট।

ওর থালা বাসন তুলে নিয়ে চলে গেল। দূর্বা খেতে বসল। সকলের সঙ্গে বসে খাওয়ার ঝামেলা থেকে বিজু বাঁচিয়েছে। ঢাকনা তুলে তুলে দেখল তারও একই রকমের খাওয়া। কেবল স্টুর বদলে বেশ পাকানো মাংস। এত সব দেখে দূর্বার মনটাই খারাপ হয়ে গেল। শেফালিটা খেতে এত ভালবাসে...নিজে রান্না করে কি খেয়েছে কে জানে! দূর্বা চুপচাপ খেতে লাগল।

বিজু শুয়ে শুয়ে চুপচাপ তাকেই দেখছিল। হঠাৎ জিগ্যেস করল, তোমার দূর্বা নাম কে রেখেছে?

—ঠিক জানি না, মা বোধহয়...কেন?

—খুব সুন্দর নাম, পুজোয় লাগে।

মন্তব্যটুকু কানে বেশ লাগল দূর্বার। হেসেই বলল, গোরু ছাগলেও খায়, মানুষে মাড়িয়ে যায়।

একটু চুপ করে থেকে বিজু আবার বলল, তা হলেও দূর্বা শুনলে পুজোয় লাগাটাই আরো মনে আসে।

দূর্বা খাওয়া ফেলে থমকে তাকালো। মনে হল, এই ষোল বছরের ছেলের মধ্যেও এমন স্বচ্ছ কিছু আছে যার বিচার বয়েস দিয়ে হয় না। এ-রকম বলে দূর্বা যেন এই স্বচ্ছতার ওপর কালো দাগ ফেলতে যাচ্ছিল।

গল্পে গল্পে দুপুরটা ভালো কেটে গেল। একটা জিনিস দূর্বা লক্ষ্য করেছে। মাঝে মাঝে ছেলেটা নিজেই বিছানায় শুয়ে পড়ে। চোখ বুঝে খানিক বিশ্রাম নেয়। হয়তো ঝিমুনিও আসে একটু। তারপর আবার তরতাজা হয়ে উঠে বসে। আগ্রহ দেখে প্রথম দিনেই দূর্বাকে একটা আঁকা শেখাতেও চেষ্টা করেছে। আর চোখ বুজে শুয়ে দুটো খুব সুন্দর গল্প শুনেছে। ওরই ইংরেজি বইয়ের গল্প যে, জানে না।

সন্ধ্যাও পেরুলো। এতক্ষণের মধ্যে বিকেলে বাইরে যাবার জন্য তৈরি হয়ে নির্মলা সরকার একবার এসেছিলেন। সুমতি বার দুই তিন এসেছে। বিকেলের হাল্কা খাওয়া খাইয়ে দিয়ে গেছে। দূর্বাকে চা বিস্কুট দিয়েছে। বড়দি কমলা সরকার আর এ ঘরে ঢোকেনি।

সন্ধ্যে সাতটা। দূর্বার এখানে থাকার মেয়াদ আর এক ঘণ্টা। বাড়ির কর্ত্রী তার মধ্যে না ফিরলে তার যাওয়া হবে কিনা জানে না। বিজুর মুখে শুনেছে, উনি তাঁর ক্লাবে গেলেন। মেয়েদের ক্লাবে তার মা নাকি প্রেসিডেন্ট। অনেক কাজ থাকে। রোজ একবার যেতেই হয়। বেশি কাজ পড়লে দু'বেলাই যেতে হয়। অবশ্য বিজুর শরীর ভালো না থাকলে কম বেরোন। গেলেও বেশি সময় থাকেন না।

যত বড় লোকই হোক, যাঁর ছেলের এমন রোগ তাঁর ক্লাব করাটা কি রকম লাগল দূর্বার। তবে ক'টা বড়লোকই বা আর দেখেছে!

বসা থেকে উঠে দাঁড়াল। দরজার সামনে একজন অদেখা মানুষ দাঁড়িয়ে। বিজু অন্য দিকে ফিরে হুইস্কির সঙ্গে খুনসুটি করছে। দরজায় যে দাঁড়িয়ে সে দূর্বার দিকেই চেয়ে আছে। পরনে পা-জামা পাঞ্জাবি, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। ব্যাক-ব্রাশ করা পাতলা চুল—কপালের দু'দিকে খানিকটা করে টাক। বছর আটত্রিশ ঊনচল্লিশ হবে বয়েস। মার্জিত চেহারা, চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ।

আগে না দেখেও দূর্বা চিনল। এ-বাড়ির বড়দা অঞ্জন সরকার।

দরজার দিকে চেয়ে হুইস্কি সরবে আনন্দ প্রকাশ করতে বিজু ঘুরে তাকাল। তারপর সে-ও খুশি।—বড়দা এসো, বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন? দুদিনের মধ্যে তো দূর্বাদির সঙ্গে দেখাই হল না তোমার—দূর্বাদি খুব ভালো বড়দা—

এটুকুর মধ্যেই দূর্বা লক্ষ্য করল, বড়দির সঙ্গে যে-রকম আচরণ ছেলেটার, বড়দাটির সঙ্গে সে-রকম নয়। সত্যিই বেশ খুশি ও। দূর্বা দু'হাত তুলে নমস্কার জানাল। ভদ্রলোকের হাত দুটো পাঞ্জাবির দুই পকেটে। মাথা নেড়ে প্রতি নমস্কার জানিয়ে ভিতরে এসে দাঁড়ালো। ঠোঁটে মৃদু হাসি। ভাইকে বলল, তোর খুব পছন্দ হয়েছে মায়ের কাছে শুনেছি। কেমন আছিস আজ?

—আজ খুব ভালো আছি বড়দা। সকালে নিজের আঁকা দূর্বাদি যা একখানা ছবি দেখালো না! মনে পড়তেই হেসে অস্থির। ভাইকে অত হাসতে দেখেই অঞ্জন সরকারও খুশি একটু।—আপনি আর্টিস্ট?

বয়সে অত বড় হলেও কমলা সরকারের মতো হুট করে তুমি বলল না। রীতিমতো লজ্জা পেয়ে দূর্বা বলল, আমি আঁকার কিছুই জানি না।

দুষ্টুমি করে বিজু বলে উঠল, দারুণ আর্টিস্ট বড়দা—দেখবে?

হাসি মুখেই বড়দা বলল, আচ্ছা এখন থাক, পরে দেখা যাবে। যে-জন্যে এলাম শোন—রণ ফোন করেছিল, কাগজের কাজে পাঁচ-ছ'দিনের জন্য আজই বাইরে চলে যাচ্ছে। তুই কেমন আছিস জিগ্যেস করল, আর ফিরে এসেই তোর সঙ্গে দেখা করবে বলল।

শুনে রাগে গরগর করে বিজু বলল, কেন, যাবার আগে একবার দেখা করে যেতে কি হয়েছিল—দূর্বাদির কথা শুনেছে?

—এখন বললাম।

—তুমি আর কি জানো যে বলবে—এই তো সবে দেখলে।

অর্থাৎ রণদাকে পেয়ে সে কত কথা বলত ঠিক নেই। জবাবে অঞ্জন সরকার হাসল একটু। দূর্বার দিকে ফিরল।—ফাঁক পেলে একবার পরে আসবেন, দরকার আছে।

চলে গেল। দূর্বা স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল একটু। হঠাৎ ওপরে ডাকার মতো কি দরকার পড়তে পারে ভেবে পেল না। ঘড়ি দেখল। সাতটা দশ। একটু অস্বস্তির মধ্যেই পড়ে গেল।...দাদু বলেছিল, অন্য ছেলেমেয়েগুলোর মতিগতির ঠিক নেই। গতকাল এই বিজু বলেছিল, কুকুরের হুইস্কি নাম বদনাম দেওয়া—কারণ তার আবার ও-সব জিনিস বেশ চলে। সশঙ্কে বিজুর দিকেই তাকাল। কিন্তু বিজুর নির্লিপ্ত মুখ।—বড়দা ডাকল যে,

যাচ্ছ না কেন? শুনে এসো। সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠে গেলে শেষের দিকে বড়দার ঘর।

এমন করে বলল, যেন ও-বাড়ির বড়দা ডাকলে কারো একটুও দেরি করা চলে না। দূর্বা অগত্যা বেরিয়ে এলো। দোতলার বারান্দাটা ফাঁকা। পায়ে পায়ে তিনতলায় উঠল। তাও ফাঁকা। বারান্দার শেষে মস্ত মস্ত দুটো ঘরে আলো জ্বলছে।

নিরুপায় দূর্বা এগিয়ে চলল। সামনের ঘরের দরজা ভেজানো। পরেরটা খোলা। আস্তে আস্তে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। যে দৃশ্য চোখে পড়ল, বুকের তলায় টিপটিপ।

ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে চটি মতো একটা বই পড়ছে অঞ্জন সরকার। পাশের টেবিলে আধ-খাওয়া মদের গেলাস। টেবিলের পায়ার ফাঁক দিয়ে হুইস্কির বোতল আর সোডার বোতল দেখা যাচ্ছে। দূর্বা নিঃশব্দে আবার চলে যাবে কিনা সেই দ্বিধা।

—আসুন। হাতের বই খোলা অবস্থাতেই উপুড় করে গেলাসের পাশে রাখল।

একটা বিচ্ছিরি অস্বস্তি চেপে দূর্বা ভিতরে এলো। পাঁচ সাত হাত তফাতের একটা চেয়ার দেখিয়ে তাকে বসতে বলা হল। বসল। বড়সড় লাইব্রেরি ঘর এটা। বড় বড কাঁচের আলমারি ঠাসা মোটা মোটা বই। পাতলা চটি বইয়ের ছোট আলমারিও দেখল একটা। সাময়িক বিশ্রামের মতো অদূরে একটা ছোট শয্যাও পাতা আছে।

একলা তিনতলায় ডেকে আনাটা বা টেবিলে মদের গেলাস দেখে প্রতিক্রিয়া কি হতে পাবে এ-সব যেন খেয়ালের মধ্যেই এলো না মানুষটার। জিগ্যেস করল, আপনার এ-ধরনের কাজেব কিছু এক্সপিরিয়েন্স আছে?

দূর্বা মাথা নাড়ল। নেই।

—নার্সিং এক্সপিরিয়েন্সের খুব দরকার নেই অবশ্য, হি নিডস এ কমপেনিয়ন। মায়ের কাছে যা শুনলাম, ভালই পারবেন মনে হয়। তাহলেও কিছু ব্যাপার আপনার জানা থাকা দরকার। কি কেস জানেন তো?

দূর্বা একবার ভাবল বয়সে পনেব ষোল বছরের বড় লোকটাকে তুমি করে বলতে বলে। বলা গেল না। মৃদু জবাব দিল, দাদুর কাছে শুনেছি।

—দাদু কে?

নাম বলল।

—ও...! অবাক একটু।—আপনার নিজের দাদু?

মাথা নেড়ে সহজ হতে চেষ্টা করল।—নিজের থেকেও বেশি হয়ে গেছেন।

—এ-রোগের ভবিষ্যৎ কি তাও জানা আছে তাহলে?

দাদু বলছিলেন আট দশ বছর টিকে থাকতে পারলে তার মধ্যে ওষুধ বেরিয়ে যেতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত অসহিষ্ণু গোছের হাসি একটু।—লেটস হোপ সো। কিন্তু উনি কিছু জানেন না। মাঝ বয়েসের ক্রনিক মাইলয়েড লিউকিমিয়া হলে বহুকাল টিকিয়ে রাখা যায়। এ-বয়েসের ছেলেদের যেটা সেটা অ্যাকিউট লিউকিমিয়া। ছ'মাস থেকে এক বছরের বেশি বড় এটা টিকিয়ে রাখা যায় না। তবে সে-রকম বরাত থাকলে বা হালের চিকিৎসাপত্র করতে পারলে দু'চারটে কেস চার পাঁচ বছরও টিকে যায়—বিজুর প্রায় দু'বছর তো হয়ে গেল, আশা করা যায় আমাদেরও সে-রকম বরাত হতে পারে।

যে-ভাবে বলে গেল, এ-সব যেন জল-ভাতের মতো জানা ব্যাপার তার কাছে। মদের গেলাসের কথা আর মনে নেই। আশংকাটাই ভেতর ছেয়ে ফেলল।

—যাক্, আপনার কি করণীয় শুনুন। রোজ ওকে আর ওর সমস্ত গা খুব ভালো করে ওয়াশ্ করবেন। খুব বেশি ক্লান্তি দেখলে বা বার বার ঝিমিয়ে পড়ছে দেখলে তক্ষুনি আমাকে খবর দেবেন। আমি দু'পাঁচ দিনের জন্য মাঝে মাঝে বেরিয়ে যাই, না থাকলে তক্ষুনি রণর অফিসে ফোন করবেন। তাকে না পেলে যেমন করে হোক মেসেজ দিতে বলবেন। রণ বা আমি দুজনে একসঙ্গে কলকাতার বাইরে যাই না, একজন না একজন এই জন্যেই থাকি। বাই চান্স একজনকেও না পেলে প্রথমেই মেট্রন বিশাখা ব্যানার্জীকে ফোনে খবর দেবেন। সুমতির কাছ থেকে রণ আর বিশাখার কাগজ আর হাসপাতালের অ্যাড্রেস ফোন নম্বর সব লিখে নিয়ে নিজের কাছে রেখে দেবেন। তার থেকেও ইম্পরট্যান্ট, জ্বর হলে বা শরীরের কোথাও হাড়টাড়ে ব্যথা শুনলে, কোনো গ্ল্যান্ড ফোলা দেখলে বা নাক অথবা মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়তে দেখলেই যা বললাম তাই করবেন। হাড়ে বা বুকের মাঝখানেও ব্যথা হতে পারে, চামড়ার তলায় হঠাৎ কিছু জমাট রক্তও দেখতে পাবেন—এ-সবের যা-ই দেখুন, একটুও সময় নষ্ট করবেন না। এ-সবের জন্যেই আগে নার্স রাখা হয়েছিল, কিন্তু একটু লক্ষ্য রাখলে সকলেরই বুঝতে পারার কথা। যা বললাম মনে থাকবে?

অজানা ভয়ে বুকের তলায় আবার দুরুদুরু করে উঠল দূর্বার। ভদ্রলোক ওকে ইচ্ছে করে বেশি ভয় পাইয়ে দিচ্ছে কিনা বুঝছে না। মাথা নাড়ল। মনে থাকবে।

—ঠিক আছে, আপনি ওর কাছে যান। ওর ওষুধপত্র কি চলছে সুমতির কাছ থেকে বুঝে নেবেন।

চলে এলো। কিন্তু অবাক হবার মতো এই সন্ধ্যায় পর-পর আরো কিছু মজুত ছিল। দোতলায় নেমেই দেখে কমলা সরকার বারান্দায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সেই একই রকম টান ধরা মুখ। ওকে তিনতলা থেকে নামতে দেখে ওই মুখে একটা রেখাও পড়ল না। শুধু চেয়েই রইল।

কৈফিয়ত দেবার সুরে দূর্বা নিজের থেকেই বলল, বিজুর কখন কি সিমটম দেখলে কি করতে হবে বুঝিয়ে দেবার জন্য বড়দা ডেকেছিলেন...।

রুক্ষ গম্ভীর মুখের ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসির আঁচড় পড়ল কি পড়ল না। বলল, বিজুর কাছে বিশাখা ব্যানার্জী এসেছে।...চেনো?

হাসপাতালের মেট্রন বিশাখা ব্যানার্জীর নামটা এইমাত্র শুনে এসেছে মনে পড়ল। কিন্তু এই মহিলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বেশি কথা বলাও মুশকিল। মাথা নেড়ে দিয়ে জবাব সারল। চেনে না।

—যাও, বিজুই চিনিয়ে দেবে'খন।

অন্যদিকে চলে গেল। বিছানায় যে মহিলা বিজুকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে হাসি মুখে তার কথা শুনছে আর মাথা নাড়ছে, এই বেশে তাকে দেখলে মেট্রন-টেট্রন কিছু মনে হয় না। বছর বত্রিশ বয়েস, গায়ের রং কালোই বলা চলে, কিন্তু বেশ সুশ্রী। আর দিব্বি আঁট স্বাস্থ্য।

দূর্বা ঘরে পা দিতেই হেসে বলল, এসো, এতক্ষণ তোমার গল্প শুনে আমার হিংসেই

হচ্ছিল। এই দেড় দিনের মধ্যে আমার কাছ থেকে তুমি ওর মন কেড়ে নিয়েছ।

বিজু পরিচয় করিয়ে দিল, এই হল আমার বড় বউদি, শনিবারে শনিবারে আমাকে দেখতে আসে, শরীর খারাপ হলেও আসে—বড় বউদির কথা কাল তোমাকে বলেছি না?

দূর্বা হতভম্ব কয়েক মুহূর্ত। সঙ্গে সঙ্গে সহজ হবার ধকল। দু'হাত জুড়ে কপালের দিকে তুলল। সেদিকে না চেয়ে মহিলা বিজুর দিকেই ফিরল। মেকি কড়া গলায় বলল, আমার কথা কি বলা হয়েছে শুনি?

বিজুও তক্ষুণি জবাব দিল, সব বলা হয়েছে—বেশ করব বলব— ঝগড়া করে ছাড়াছাড়ি হয়েছে তো হয়েছে—আবার ভাব করে নিতে পারো না?

—এবারে আমি তোর কানে হাত দেব—অভাব কোথায় দেখলি!

—অভাব কোথায় দেখলি? আমি বাচ্চা ছেলে, কিছু বুঝি না?

দূর্বা অস্বস্তি বোধ করছে, কিন্তু মহিলা দিব্বি হাসছে। ওকে বলল, বাড়িসুদ্ধু লোককে ও শাসনে রাখে বুঝলে—তুমিও টেরটি পাবে। তবে বিজুবাবু সত্যি খুব ভালো ছেলে। ...অর্জু কি করছে দেখলে?

দূর্বা থতমত খেল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলও। মনে মনে বলল, বা-ব্বা, আধুনিকা বটে! —বই পড়ছেন।

মহিলার মুখে চাপা হাসি খেলে।—কি বই তুমি আবার চেয়ে নিয়ে দেখনি তো?

দূর্বা বোকার মতো মাথা নাড়ল! হাতে অবশ্য চটি বই ছিল, কিন্তু আলমারি বোঝাই মোটামোটা বাঁধনো বই দেখেছে।

নিজের হাতঘড়ি দেখে বিশাখা উঠল। দূর্বাকে বলল, —আচ্ছা আজ চলি, পরে আবো গল্প হবে।

পিছন থেকে বিজু হুকুম করল, বড়দার সঙ্গে দেখা করে যাও।

ঘুরে বিশাখা ব্যানার্জী হাসিমুখে দুজনের দিকেই তাকাল একবার। তারপর বিজুর কথায় মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সব থেকে বড় ধাক্কা মিনিট তিনেকের মধ্যেই। ঘড়িতে পৌনে আটটা প্রায়। বিজু বলছিল, দুধ পাঁউরুটি আর একটু মিষ্টি খেয়ে তারপর ওষুধ খেয়েই সে আটটার মধ্যে শুয়ে পড়ে। আর দু' মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়েও পড়ে। তাই ওষুধ খাওয়া হলেই তার ছুটি। দূর্বার ধারণা, রাতের এটা সিডেটিভ কিছু হবে। কাল ওষুধ-টষুধগুলো সুমতির কাছ থেকে বুঝে নেবে। সুমতি ওর খাবারের জোগাড়ে গেছে। চটির ফটফট শব্দে জানান দিয়ে ঘরে ঢুকল একজন। তাকে দেখেই দূর্বার এই ধাক্কা।

—কি রে বি-চ্ছু, কেমন আছিস? খাটের ও-দিকে আর কে আছে খেয়ালও করল না। দূর্বা মশারিটা ফেলে গুঁজে দিচ্ছিল। মশারির ও-ধারে থাকাতে নজরে পড়েনি।

—বিচ্ছু বলায় বিজুও ভেঙচে ভেঙচে জবাব দিল, খুব ভালো আছি নাচন-দি, তুমি একটা দিন ছিলে না, কান ঠাণ্ডা ছিল।

—এই! নাচনদি চোখ পাকাল।—দেব ধরে থাপ্পড়!

—দাও দেখি কত সাহস? নাচ দেখে সবাই ছ্যা-ছ্যা করেছে তো?

—সব মূর্ছা গেছে, বুঝলি হাঁদা—একটা মেডেল পর্যন্ত পেয়েছি, দেখবি?

—এখন আমি খেয়ে ঘুমুবো, তুমি মেডেল ধুয়ে জল খাওগে যাও!

—ফের?

—ফের!

দূর্বা পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখা-মাত্র বিজুর ছোড়দি রমলা সরকারও হাঁ একেবারে।—তুমি...ইয়ে দূর্বা বোস না?

দূর্বা নিজেও বিস্ময়ের ধকল ভালো করে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বিজুর ছোড়দি এই রমলা হতে পারে ভাবেনি। হাসতে চেষ্টা করে বলল, সেই রকমই তো জানি...।

রমলার তখনো আকাশ থেকে পড়া মুখ।—তুই এখানে বিজুর ঘরে মশারি টাঙাচ্ছিস, কি ব্যাপার?

রহস্যের ব্যাপার কিছু ঘটেছে আঁচ করে বিজু বলল, দূর্বাদি তো কালকেও এসেছিল, তুমি নেচে নেচে বাড়ি মাথায় করছিলে জানবে কি করে!

—তুই থাম ছোঁড়া! দূর্বার দিকেই ফিরল আবার।—তুই এখানে বিজুর কাজে লেগেছিস নাকি?

কথার মধ্যে রুচির বালাই নেই। ঠাণ্ডা মুখে দূর্বা জবাব দিল, হ্যাঁ।

—বলিস কি রে! একই সঙ্গে খুশি যত বিস্ময় ততো।—তোর অতসব নাগর থাকতে শেষে কিনা—

মুখের দিকে চেয়ে থেমে গেল। ওদিক থেকে সুমতি বিজুর খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল। রমলা তড়বড় করে বলে উঠল, বিজু লক্ষ্মী ভাই, তুই খা, আমি ওকে একটু আমার ঘরে নিয়ে যাই—কলেজে আমরা ক্লাসফ্রেন্ড ছিলাম জানিস না বুঝি?

দূর্বাদির মুখ দেখে ব্যাপারটা তেমন খুশি হবার মতো কিনা বিজু ঠাওর করে উঠতে পারল না। অনুমতি দিল।—নিয়ে যা, কিন্তু বেশি রাত করিয়ে দিবি না—কাল আবার সকালে আসতে হবে।

হাত ধরে রমলা ওকে বাইরে টেনে নিয়ে এলো।—তুই আমাকে সত্যি অবাক করেছিস মাইরি!

এক কলেজ থেকে একই সঙ্গে দুজনে বি. এ. পাশ করেছিল। কিন্তু দূর্বার সঙ্গে তখন ওর এমন কিছু ভাব-সাব ছিল না। দু'চারটে মুখের কথাও হত না বড়। বড়লোকের মেয়ে, গাড়িতে আসত যেত। তখনো নাচের সুনাম ছিল। এখানে ওখানে ডাক পড়ত। স্তাবকের অভাব ছিল না। মাটিতে পা পড়ত না। যে মেয়েরা তোয়াজ তোষামোদ করত, ভাব কেবল তাদের সঙ্গে। তাদের নিয়ে ফুর্তি করত, টাকা ওড়াতো। দূর্বার মতো মেয়ে যে সর্বদাই নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকত, সে ওর কাছে পাত্তা পাবে কেন। কিন্তু আসলে রমলা তখন ভিতরে ভিতরে ওকে একটু হিংসেই করত। কলেজের সামনে বা কলেজের রাস্তায় অনেক ছেলের ছোঁক-ছোঁকানি দেখেছে। ওদের ধারণা, ওই ভিজে-বেড়াল মেয়ে একসঙ্গে বেশ কয়েকটা ছেলেকে খেলাচ্ছে। চুপচাপ থাকাটাও দেমাক ভাবত। যতই বড়লোকের মেয়ে হোক বা নেচে বেড়াক, সুন্দরী ছেড়ে তেমন সুশ্রীও কেউ দেখত না রমলাকে। তখন রোগা আর ঢ্যাঙা ছিল। এখন তার থেকে শ্রী ফিরেছে। নাচের দৌলতে মোটা হয়নি, কিন্তু গায়ে মাংস-টাংস লেগেছে।

দোতলাতেই একটা ঘর ছেড়ে রমলার ঘর। এ-ঘরে গালচে বিছানো। নাচ প্র্যাকটিসে

সুবিধে হয় বলে বোধহয়। একদিকে বাজনার সরঞ্জাম। দেয়ালে সারি সারি নাচের ঢঙের ছবি। ছোট কাচের আলমারিতে কাপ মেডেল সাজানো। এ-বাড়ির সবগুলো ঘরই বোধহয় দূর্বাদের চারটে ঘরের সমান। নাচের মহড়ার সময় নিজের পিছনদিক দেখা যায় সে-রকম তিন-প্রস্থ আয়নার দুটো ড্রেসিং টেবিল। এ-ঘরে একটা বড় খাট ছাড়া বসার টেবিল চেয়ার নেই।

দূর্বার হাত ধরে রমলা তাকে গদীর খাটে বসালো। নিজেও বসল।—তুই অবাক করলি, শেষে কিনা বিজুর কমপেনিয়ন! তোর সেই প্রেমিকরা সব গেল কোথায়?

দূর্বার একটুও ভালো লাগছিল না। এরপর নিজের মা-কে কি বলবে না বলবে ঠিক কি! ঠাণ্ডা জবাব দিল, আমার কোনো প্রেমিক ছিল না...আমি কত গরিবের মেয়ে জানা থাকলে কলেজে তোমরা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা ঠিসারা করতে না।

রমলা থমকালো একটু।—এমন বিচ্ছিরি করে বলিস, গরিবের মেয়ের প্রেমিক থাকতে পারে না?

—আমার মতো মেয়ের থাকতে পারে না, নিজেকে বাঁচাতে আমার হিমসিম খেতে হত। চোখে চোখ রেখে আরো ঠাণ্ডা গলায় বলল, এ-কাজটা পেয়ে আমি কতখানি বেঁচে গেছি তোমার ধারণা নেই, আর বিজুরও আমাকে এরই মধ্যে খুব পছন্দ হয়ে গেছে —কিন্তু তোমার এ-সব ঠাট্টা থেকে ও যদি একটুও অন্য চোখে দেখে, আমাকে বাধ্য হয়ে চলে যেতে হবে।

রমলা বড় বড় চোখ করে একটু দেখল ওকে। তারপর কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, তুই একটা যাচ্ছেতাই প্র্যাকটিকাল মেয়ে হয়ে গেছিস—কলেজে তোকে আমি কত হিংসে করতাম জানিস না! ঠিক আছে, বিজু তোকে দেবী-টেবিই ভাববে'খন, কিন্তু আমার সঙ্গে তুই অমন পিসিমা-মুখ করে থাকলে হাটে হাঁড়ি ভাঙব বলে দিলাম!

—আমার হাটে কোনো হাঁড়ি নেই, শুনলে তো!

—না থাকলেও আমি বানিয়ে বলব। চেহারখানা যা রেখেছিস এখনো, কেউ অবিশ্বাস করবে না।

মুখের দিকে চেয়ে রমলা হাসতে লাগল। তারপর আচমকা যে-কাণ্ড করে বসল দূর্বা তার জন্য একটুও প্রস্তুত ছিল না। ঝুঁকে ওকে দু'হাতে জাপটে ধরল। সরাসরি ঠোঁটে বেশ চেপে একটা চুমু খেয়ে বসল। তারপর দুই গালে। ছেড়ে দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল।—তোকে দেখে আমার কি যে আনন্দ হচ্ছে...!

মেয়েটাকে বিকৃতিতে পেয়ে বসেছে কিনা দূর্বা ভেবে পেল না। তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে ফেরার চেষ্টা। হেসেই বলল, এবারে তোমার কথা বলো, খুব নাচছ?

—হ্যাঁঃ, কেবল নেচেই বেড়াচ্ছি, সে-রকম কাউকে নাচাতে পারছি না। ভালো লাগে না আর—

—কি ভালো লাগে?

—চুটিয়ে প্রেম করতে।

—অসুবিধের কি আছে, আঙুল নাড়লেই তো কতজন ছুটে আসবে।

—আঙুল তো নাড়ি, ছুটেও আসে, কিন্তু সব আমার বেয়ারা হবার মতো ছেলে, আমার বাজনা বইতে পারলেই কৃতার্থ একেবারে। কি মনে পড়তে হেসে সারা।—একবার

একটা ছেলেকে একটু মনে ধরেছিল, বুঝলি—তা একদিন তাকে এ-ঘরে ধরে এনে বলা নেই কওয়া নেই বেশ করে জাপটে ধরে লম্বা-আ একটু চুমু খেয়ে বসেছিলাম। ছেড়ে দিতে কাঁপতে কাঁপতে এই গালচেটার ওপর বসে পড়ল। আমি চোখ পাকিয়ে বললাম, এবারে বাবাকে ডাকি? আবার এক প্রস্থ হাসি।—কি করল জানিস, উঠেই চোঁ-চাঁ দৌড়, আর তারপরেই হুইস্কির তাড়া খেয়ে সিঁড়িতে ডিগবাজী—তার ফলে হাতে কমপাউন্ড ফ্র্যাকচার।

হাসছে দূর্বাও। কিন্তু ভিতর থেকে সে-রকম হাসি আসছে না। —তাহলে এক কাজ করো, কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে বলো মা-কে, ঝুড়িঝুড়ি ছেলে এসে যাবে—দেখে শুনে একজনকে বিয়ে করে যত খুশি প্রেম করো।

—তুই একটা রাম হাঁদা, বিয়ের পরে প্রেম—ইডিয়েট আর কাকে বলে! কাগজে প্রেম করার মতো সর্বগুণসম্পন্ন ছেলে চাই বলে বরং বিজ্ঞাপন দেওয়া যেতে পারে—বিয়ের প্রশ্ন প্রেমের ফলাফল অনুযায়ী। নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল।

আগে হৃদ্যতা না থাকলেও এত দিন বাদে দেখা, কিন্তু অন্য কোনো কথা নেই। মেয়েটার মাথায় প্রেমজ্বর ভর করে আছে দূর্বার বুঝতে বাকি থাকল না। হালকা সুরেই জিজ্ঞাসা করল, প্রেম করার মতো কি-রকম ছেলে পছন্দ তোমার?

রমলা অনায়াসে তুই-তুই করে বলছে ওকে কিন্তু দূর্বা তা পারছে না। পারার ইচ্ছেও নেই। রমলা জবাব দিল, নিজেই কি ছাই জানি কি-রকম পছন্দ, তবে চেহারা-পত্র ভালো হওয়া চাই। কি মনে পড়তে আবার হেসে উঠল।—চেহারা ভালো নয়, এ-রকম একজনকেও হঠাৎ মনে ধরেছিল, বুঝলি? রণদাকে দেখেছিস? আলাপ হয়েছে?

আবার কি শুনতে হবে জানে না। এ-বাড়িতে এই একজনের নাম অনেকবার শুনেছে। তাই উৎসুক একটু। মাথা নাড়ল—দেখেওনি, আলাপও হয়নি।

—আছিস যখন দেখা হবেই। ছোড়দার ছেলেবেলার বন্ধু ছিল, বাড়ির ছেলের মতো হয়ে গেছে। চেহারা ভালোর কাছাকাছিও নয়, তার ওপর আদর্শ ধুয়ে জল খায়। তবু দিনকতক কেন যেন তাকেই বেশ ভালো লাগতে লাগল। কিন্তু ও-যে মনে মনে ছোড়দার থেকেও আপনার দাদা হয়ে বসে আছে তা কি ভেবেছি! একদিন রণদাকে জোরজার করে এই ঘরে ডেকে এনে চিত্রাঙ্গদার নাচ দেখালাম। আমি ভাবলাম, মুণ্ডু ঘুরে গেছে। জিগ্যেস করলাম, কেমন?

রণদা বলল, অখাদ্যি।

ওই রকমই বলে। আবার জিগ্যেস করলাম, কি অখাদ্যি, আমি না নাচ?

রণদা বলল, তুইও তোর নাচও।

আমি তখন সরাসরি মুখঝামটা দিলাম। বললাম, ছেলেরা দেখি বন্ধুর বোনের সঙ্গে প্রেম করে, আর বোনও দাদার বন্ধুর সঙ্গে প্রেম করে থাকে। তুমি কি-রকম উজবুক একটা?

...শুনে একটু চেয়ে রইল, তারপর ঠোঁটে হাসি মাখিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আমি ভাবলাম হয়ে গেছে. এবারে চুমুটুমু খাবে। ও-মা, কাছে এসে তালুর ওপর সে-কি এক গাঁট্টা! আমি চোখে অন্ধকার দেখে একটা চিৎকার করে বসে পড়লাম—তালুর ওপর একটা সুপুরি গজিয়ে গেছে। চিৎকার শুনে মা আর বড়দি ছুটে এলো।

রণদা তখনো হাসছে। বলল, কিছু না মাসিমা, ছোট বোনকে একটু আদর করলাম। ব্যস, প্রেমের লিস্ট থেকে রণদা ছাঁটাই!

শুনে দূর্বা হেসেই ফেলল।

নির্মলা সরকার ঘরে ঢুকলেন। দূর্বা সঙ্গে সঙ্গে খাট থেকে নেমে দাঁড়াল। মহিলা প্রথমে মেয়েকে বললেন, তুই এসে গেছিস? দূর্বার দিকে ফিরল, তুমি এখনো আছ কিনা ভাবছিলাম। কাল তো রোববার, অন্য দিন না পারলেও রোববারে রণ এসে থাকেই—সে কাগজের কাজে বাইরে চলে গেছে শুনলাম।...তুমি কাল দুপুরটা অন্তত এসে থাকতে পারবে? আমি অবশ্য তার জন্য এক্সট্রা যা-হয় দেব—

রবিবারে ছুটি কিনা দূর্বা তা-ই জানে না। বলল, কিছু দিতে হবে না, আমি আসব।

নিশ্চিন্ত হয়ে নির্মলা সরকার মেয়ের দিকে ফিরলেন।—বিজুর এরই মধ্যে ওকে খুব পছন্দ হয়ে গেছে, কাল তুই ব্যস্ত ছিলি, নইলে কালই আলাপ হয়ে যেত।

মেয়ে তড়বড় করে উঠল।—আলাপ হয়ে যেত! কলেজে আমরা ক্লাসফ্রেন্ড ছিলাম, একসঙ্গে বি. এ. পাশ করেছি, বুঝলে? কাকে পেয়েছ জানো না তো, আমি ছেলে হলে কলেজে পড়ার সময়েই ওকে বিয়ে করে বসতাম—কত মাইনে ঠিক করেছ?

—পাঁচশ। মায়ের আমতা-আমতা জবাব।

—ঠিক জানি ঠকাবে। ওর মতো মেয়েকে হাজার টাকা দেওয়া উচিত।

—সে আস্তে আস্তে দেখা যাবে'খন, তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে বিজুর মুখ মনে পড়তে দূর্বার এই টাকা-পয়সার কথা একটুও ভালো লাগল না।

পরদিন বাড়িতে খাওয়া সেরে দূর্বা বারোটার মধ্যে সরকার বাড়িতে হাজিরা দিল। বিজু জানত আসবে। খুব খুশি। রমলা বাড়ি নেই শুনেও দূর্বা স্বস্তি বোধ করল। তার বাইরে কোথায় লাঞ্চের নেমন্তন্ন। সুমতির কাছ থেকে খাওয়ার ওষুধ বুঝে নিয়েছে। শিশির লেবেল পড়ে মনে হল, রাতেরটা ঘুমের ওষুধ, সকালের ট্যাবলেটেও কি আছে ঠিক বোঝা গেল না। গতকাল দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর একটু ঝিমুনি ভাব দেখেছিল। আজ গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়েই পড়ল। না, সে-রকম দুর্বল বা নিস্তেজ দেখেনি তার আগে, তবু ঘুমিয়ে পড়তে দেখে দূর্বার ভয়। কিন্তু যে-রকম হলে তৎপর হওয়ার নির্দেশ সে-রকম মনে হল না। তবু সুমতিকে একবার ডেকে দেখিয়ে নিশ্চিন্ত। সে জানালো, সে-রকম কিছু না—খারাপ দেখলে অনেক আগে থেকেই বোঝা যায়।

ঘড়িতে তখন আড়াইটে। বিজু ঘুমোনোর ফলে বাড়ি নিঝুম। দূর্বা বিজুর একটা ইংরেজি বই পড়তে পড়তে গল্পের পুঁজি বাড়াচ্ছে। হঠাৎ সচকিত। অঞ্জন সরকার দরজার কাছ থেকে প্রথমে ঘুমন্ত বিজুকে দেখল। তারপর ঘরে ঢুকে খুব আলতো করে পালস পরীক্ষা করে ইশারায় দূর্বাকে ডেকে বাইরে এসে দাঁড়াল। দূর্বা দরজার কাছে আসতে মৃদু গলায় বলল, আমি একটু বেরুচ্ছি, ফিরতে সন্ধ্যা হবে...বিজু ভালোই আছে, তবু যদিই দরকার হয়, এই নম্বরে আমাকে ফোনে পাওয়া যাবে।

কাগজে লেখা একটা ফোন নম্বর তার হাতে দিয়ে চলে গেল।

দূর্বা এরই মধ্যে একটা নোটবই করে ফেলেছে। সুমতিকে জিগ্যেস করে এ-বাড়ির তিনটে ফোন নম্বর, রণিত দত্তর কাগজের আপিসের আর মেট্রন বিশাখা ব্যানার্জীর

হাসপাতালের নাম্বার লিখে রেখেছিল। চিরকুটের এ নম্বরও লিখে রাখল।

আর বেশিক্ষণ পড়তে ভালো লাগল না। বই ফেলে বিজুর একটা ছবির বইয়ের পাতা উল্টে উল্টে দেখল খানিকক্ষণ। দূরে কোনো বাড়ির একটা খাঁচার কোকিল থেকে থেকে ডেকে উঠছে। ওটাও যেন নির্জনতার নালিশ জানাচ্ছে।

দূর্বা পায়ে পায়ে ঘরেব বাইরে অর্থাৎ ভিতরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এ-মাথা ও-মাথা ফাঁকা। রেলিং-এর কাছে হুইস্কিও গা ছেড়ে ঘুমোচ্ছে।

হঠাৎ রীতিমতো অবাক দূর্বা। অথচ হবার মতো কিছু ছিল না। তিনতলা থেকে পা-টিপে নেমে আসছে কমলা সরকার। বড়দি। শাড়ির আড়ালে তার হাতে চটি-মতো একটা বই সম্ভবত। দূর্বাকে দেখেই হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হাতের জিনিস আরো আড়ালে। অমন গুরুগম্ভীর বড়দির কিছু চুরি ধরা-পড়া গোছের মুখ মুহূর্তের জন্য। তারপরেই যে-কে সেই। টান হয়ে নেমে এসে ওদিকের ঘরে ঢুকে গেল। দূর্বা বিমূঢ় খানিক। কমলা সরকারের এ-রকম আচরণের কোনো অর্থই খুঁজে পেল না।

## পাঁচ

সেই বিশেষ দিনের একখানা সবুজ রঙ্গ দূর্বা বোসও কিনেছিল। প্রথম পাতাতেই মস্ত জায়গা জুড়ে ছবিটা ছাপা হয়েছিল। জলে ডোবা কলকাতার রাস্তা, সেই জলে বিরাট মিছিল, তার ফলে অনড় অসংখ্য মোটর ট্যাক্সি লরি বাস মিনি। একটা বাসে ভেজা শাড়ি গলা পর্যন্ত জড়িয়ে বিরক্ত গম্ভীর মুখে বসে আছে যে মেয়ে সে দূর্বা বোস। যে-ভাবে সাজানো হয়েছে তার ছবিই সকলের আগে চোখে পড়বে। দূর্বা ওটা কাউকে দেখায়নি। শেফালিকেও না। দাদুকে দেখানো যেত। কিন্তু পরদিন থেকেই এমনি ব্যস্ত হয়ে পড়ল, দেখানোর ফুরসত মেলেনি।

যে-ভাবে তাকে ডেকে ছবিটা তোলা হয়েছিল, দূর্বার সেদিন রাগ হয়েছিল সত্যি কথা। কিন্তু পরদিন থেকে রাগের ছিটে-ফোঁটাও ছিল না। কারণ তার এই কাজটা জোটার মূলে ওই ঘটনা। নইলে দাদুর মনেও পড়ত না। পাঁচশ টাকা মাইনে যেমন অভাবিত, বিজুর মতো একটা ছেলের এমন কাছে আসতে পারাটাও তেমনি ভাগ্যের ব্যাপার ভাবে।

কিন্তু মনে যাই থাক, সরকার বাড়িতে রণিত দত্তর সঙ্গে প্রথম দিনের সাক্ষাৎকারটা একটুও হালকা পর্যায়ে টেনে নিয়ে যেতে রাজি নয় দূর্বা বোস। তাছাড়া ও-বাড়িতে রণিত দত্ত ঘরের ছেলে। আর সে মাসমাইনের চাকুরে। ওই লোকের কথামতো দাদুই পাঠিয়েছে তাও জানতে বাকি থাকবে না। ফলে একট দূরত্ব বজায় রেখে চলাই ভালো। না, দেখা হলে ও-ভাবে ফোটো তোলার কথা বা লোকটার মুখ দূর্বার মনেও পড়বে না। কিন্তু প্রথম দিনের দেখাশুনার পর্ব ঠিক হিসেব-মতো হল না।

বিজুর ছবি আঁকা শেখার দিন সেটা। দূর্বার দশটায় অর্থাৎ আরো ঘন্টাখানেক বাদে এলেই চলত। কিন্তু এই চার পাঁচ দিন ধরেই রমলাটা অবুঝের মতো জ্বালাতন করছে। সে বাড়িতে থাকলে তার ঘরে তার সঙ্গে বসে আড্ডা দিতেই হবে। খুব বেশি সময় বাড়িতে থাকে না এই যা রক্ষে। কিন্তু যখন থাকে, এই নিয়েই ভাই-বোনে ঝগড়া হয়ে যায়। রমলা দূর্বাকে তার ঘরে নিয়ে যেতে চাইলে বিজু ক্ষেপে যায়। যা মুখে আসে

তাই বলে বসে। রমলারও রাগতে সময় লাগে না। ফলে তাদের মা ছুটে আসে। রমলা তাকে বলে, অসুখ বলে আসকারা দিয়ে তুমি ওকে মাথায় তুলেছ। আর বিজু দূর্বাকে বলে আমার কাছে আসতে হবে না, ওই ধিঙ্গির ঘরে গিয়ে নাচ শেখো গে যাও। রমলা দাঁত কিড়মিড় করে হাত তুলে মারতে আসে। গায়ে হাত ছোঁয়াতেও পারবে না বিজু সেটা ভালো জেনে বসে আছে। সেও পাল্টা হাত তুলে দাঁত মুখ খিঁচোয়। আজ দূর্বার এক ঘণ্টা আগে হাজিরা দেবার উদ্দেশ্য বিজু যতক্ষণ আঁকা শিখবে, ও ততক্ষণ রমলার ঘরে তার কাছে বসবে।

দূর্বা এখন দোতলায় এলে হুইস্কি এগিয়ে এসে পায়ের কাছে একটু মাথা ঘষে সোহাগ জানায়। দূর্বাও নির্ভয়ে তার মাথায় একটু বিলি কেটে দেয়। তারপর দুজনে একসঙ্গে বিজুর ঘরে ঢোকে। বিজুকে একবার দেখা দিয়ে রমলার ঘরে চলে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু ঘরে পা দিয়ে দাঁড়িয়েই পড়তে হল। টেবিলের দু'দিকে মুখোমুখি বসে বিজু আর তার আঁকার মাস্টার। তাদের পাশে ইজিচেয়ারে বসে আর কেউ, দু'হাতে খোলা খবরের কাগজের আড়ালে মুখ। পরনে পাজামা পাঞ্জাবি।

বিজুর দরজার দিকে মুখ। দূর্বাকে আগে সে-ই দেখল। সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল।—দূর্বাদি এসো, এই দেখো রণদা এসে গেছে—কাল রাতে এসেছে, আমি আর যেতেই দিইনি।

কাগজ বন্ধ হল। রণিত দত্ত সোজা হয়ে বসল। তারপরেই দুই ভুরুর মাঝে ভাঁজ পড়ল একটু। কিছু স্মরণ করার চেষ্টা। মনে পড়ল বোধহয়। কয়েক মুহূর্তের জন্য হতচকিত মুখ।

দূর্বা দু'হাত জুড়ে একটু নমস্কার জানানোর মতো করল। সঙ্গে সঙ্গে ওই লোকের সপ্রতিভ হবার চেষ্টা। দু'হাত কপাল পর্যন্ত তুলে প্রতিনমস্কার জানিয়ে চটপট উঠে দাঁড়াল। বলল, বসুন, কাল আমি এসেই শুনলাম আপনি তার এক মিনিট আগে চলে গেছেন। আমি থেকে যাব কথা দিতে বিজু ঘুমিয়েছে।

সৌজন্য বোধে দূর্বার ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসির আঁচড় পড়ল। বিজুর দিকে ফিরে বলল, তুমি কাজ করো, আমি একটু রমলার কাছে যাচ্ছি।

ফেরার আগেই রণিত দত্ত বলল, বাইরের কে একজন ড্যান্সার এসেছে, রমলা তার শোয়ের টিকিট কিনতে বেরিয়েছে। চলুন আমরা ততোক্ষণ ও-ঘরে গিয়ে বসি।

অগত্যা দূর্বা তার সঙ্গে ঘর ছেড়ে বারান্দায়। অকারণে হঠাৎ রমলার ওপরেই রাগ হতে লাগল। বারান্দায় এসে রণিত হাঁক দিল, সুমতি মাসি, বসার ঘরে দু'পেয়ালা চা পাঠাও!

শুধু চা নয়, আরো কিছু আসে জানে না। দূর্বাকে ডাকল, আসুন—

দোতলার বসার ঘরে।—বসুন, বসুন।

তার ব্যস্ততা তেমন অকৃত্রিম মনে হল না দূর্বার। হয়তো আশা করছে, বর্ষার দিনের সেই মুখ এখন আর মনে নেই। তার মুখোমুখি সোফায় বসে রণিত দত্ত তড়বড় করে বলে গেল, কাল রাতে মাসিমা আর সুমতি মাসির মুখে আপনার খুব প্রশংসা শুনলাম, এমন কি বড়দা—যে কোনো সাত পাঁচ কথার মধ্যে নেই—সে-ও বলল, বেশ ভালো মেয়ে, বিজুকে ক'দিনের মধ্যেই আপনার করে নিয়েছে। আর সকাল থেকে বিজুর মুখে তো কেবল আপনার কথা। আপনি কত ভালো ছবি আঁকেন, সাদা কাগজ দেখিয়ে সেই

গল্পও করেছে। আপনার মতো একজনকে পাওয়ার ফলে সকলেই বাহাদুরিটা আমাকে দিচ্ছে—আমি শুধু মাস্টারদাদুকে বলে রেখেছিলাম, তাইতেই সব ক্রেডিট আমার।

সহজ হবার চেষ্টায় শব্দ করে হেসে উঠল।—আমার নাম রণিত দত্ত, আমি 'সবুজ রঙ্গ' পত্রিকার রিপোর্টার, আর—

দূর্বার ঠোঁটের ফাঁকে নির্লিপ্ত হাসির রেখা। মাঝখানেই ছেদ ঘটালো।—জানি।

—আপনি জানলেন কি করে! নড়েচড়ে বসল।—ও...মাস্টারদাদু বলেছেন? হ্যাঁ, তাঁর ওখানে এক আধ সময় দেখেছি মনে হচ্ছে।

যা কখনো বলবে না ভেবেছিল, সে-কথাই ফস করে বলে বসল।—আরো কোথাও দেখেছেন।

ভুরু কুঁচকে মনে করার চেষ্টা।—কোথায় বলুন তো?

—বৃষ্টির দিনে মিছিলে আটকে যাওয়া বাসে।

মুহূর্তের জন্য মুখখানা দেখার মতোই হল বটে। দূর্বার সমস্ত মুখ ব্যক্তিত্বে মোড়া। হাসার ইচ্ছে নেই। সুমতি ঘরে ঢুকতে লোকটা বিড়ম্বনা সামলে উঠল। তার হাতের ট্রেতে দু'পেয়ালা চা আর একটা প্লেটে খাবার। সামনে রাখতে রণিত বলল, আমার একরাশ খাওয়া হয়ে গেছে, ওটা আপনার। চায়ের পেয়ালা তুলে নিল।

দূর্বা সুমতিকে বলল, যে দু'দিন দেরিতে আসি আমিও খেয়েই আসি—ওটা নিয়ে যাও মাসি।

সুমতির অনুরোধে দূর্বাও তাকে তুমি বলা শুরু করেছে। দূর্বাও নিজের পেয়ালা তুলে নিল। রণিত বলল, মাসিমাকে খবর দাও, মিস বোস এসেছেন—

দূর্বা সোজা তাকাল তার দিকে।—আমি রোজই আসছি—আসব, তাঁকে বিরক্ত করার কি দরকার?

থতমত খেল একটু।—ও, ঠিক আছে, ও-ঘর থেকে তাহলে আমার সিগারেটের প্যাকেটটা দিয়ে যাও।

সুমতি চলে যেতে তার দিকে ফিরে সৌজন্যের আতিশয্য দেখালো।—আমি আবার একটু বেশি সিগারেট খাই, আপনার অসুবিধে হবে না তো?

পরিস্থিতি যা, দূর্বাই যেন এই লোকের থেকে বেশি জোরের ওপর দাঁড়িয়ে। কয়েক পলক চেয়ে থেকে ফিরে বলল, আপনি আদর্শবাদী মানুষ অথচ বেশি সিগারেট খান?

হেসে উঠল।—আমি আদর্শবাদী এ-খবর আপনাকে কে দিল? তাছাড়া আদর্শের সঙ্গে সিগারেটের কি সম্পর্ক, এটা নিছক নেশা।

দূর্বার জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করছিল, মদও নেশা, সেটা তাহলে কি চোখে দেখেন? বলল না। গায়ে পড়া কথার মধ্যে সে নেই।

সুমতি সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই আর একটা অ্যাশপট রেখে গেল। মেয়েদের বসার ঘর বলেই হয়তো এ-ঘরে অ্যাশপট নেই। সিগারেটের প্যাকেট হাতে নিয়ে একটু ইতস্তত করতে দেখে দূর্বা বলল, আমার কিছু অসুবিধে হবে না।

—থ্যাংক্স। সিগারেট ধরালো।

যে-প্রসঙ্গটা মুলতবী আছে সেটার সম্পর্কে দুজনেই সচেতন। রণিত বিড়ম্বনা ছেঁটে

ফেলার মতো করে হেসে বলল, আপনি চিনতে পারবেন না ভেবে ভুল করেছি...ও-ভাবে ছবি তোলার জন্য আপনি নিশ্চয় খুব রেগে গেছেন?

দূর্বা চুপচাপ চেয়ে রইল একটু, যার সাদা অর্থ, কি মনে হয়, খুশি হব? তারপর ঘুরিয়ে জবাব দিল, ব্যাপারটা বোঝার পর বাসের কেউ কেউ নামতে যাচ্ছিল—

কথাটা দূর্বা বানিয়েই বলল। প্রতিক্রিয়া দেখছে।

—হুঁ! আমি আর মানুষ চিনি না, একহাঁটু জলে নেমে বীরত্ব দেখাবে! আর এলেও আমার সঙ্গে আইডেন্টিটি কার্ড ছিল—কি জন্যে ছবি তোলা হয়েছে বোঝাতে আধমিনিটও লাগত না। কিন্তু আপনি রেগে গিয়ে থাকলে আমি খুব দুঃখিত...আমি কাগজের ইন্টারেস্টে ছবিটা তুলেছিলাম—আপনি পরদিনের কাগজ দেখেছেন?

দূর্বা হাঁ না কিছুই বলল না। দাদুর ঠাট্টা মনে পড়ল। অমন জলে-ভেজা ফোটো যে তুলেছে সে রাতে ওটা বিছানায় নিয়ে যাবে না!—প্রাণের সাধে চুমুটুমু খাবে না! মুখে লালের ছোপ লাগলেও দূর্বার হঠাৎ রাগই হচ্ছে। ঠাণ্ডা গলায় বলল, কাগজের ইন্টারেস্ট তো শেষ হয়েছে, নেগেটিভটা আমাকে দিয়ে দেবেন।

—কোথায় পড়ে আছে...আচ্ছা খুঁজে দেখব'খন।

শুনে দূর্বার আরো রাগ হয়ে গেল। আর ওই লোক সেটা বুঝলও। হাসি মুখে কৈফিয়তের সুরে বলল, আপনি খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন বুঝতে পারছি, আর পর-দিনের সবুজ রঙ্গ দেখেছেন ধরে নিচ্ছি। এবারে বলুন, আপনি না হয়ে আর কোনো মেয়েকে দেখলে আপনার রাগ হত। না ওই ছবি দেখে বেশ একটা বর্ষার কাব্যের মতো মনে হত? ওই ছবির জন্য আপিসে আমার কত নাম হয়েছে জানেন?

রাগ আবার আপনা থেকেই তরল হয়ে আসছে দূর্বার। ওই ছবির দৌলতেই এ-বাড়ির সঙ্গে এমন যোগাযোগ সে তো আর ভোলবার নয়। ঢ্যাঙা লোকটার কালো মুখে বেশ একটু ছেলেমানুষি কমনীয়তা চোখে পড়ছে এখন। তবু পলকা গাম্ভীর্যে জবাব দিল, আপনার নাম হয়েছে, আমার লোকের কাছে মুখ দেখানো দায় হয়েছে।

রণিত দত্ত থমকালো। ভুরু কোঁচকালো —আপনাকে কেউ কিছু বলেছে বুঝি? যারা বলেছে তারা মুখ্যু। আপনি রমলার ক্লাসফ্রেন্ড আর বি. এ. পাশ শুনেছি—আপনার অন্তত বোঝা উচিত অতবড় বর্ষার আর মিছিলের আর গাড়ির জ্যামের স্টোরিটাতে রঙ ফলানোর জন্য ওই ছবি তোলা হয়েছে। তারপরেই রেগে ওঠা ছেলেমানুষের মতো ডম্ফাই, আমি কখনো কোনো নোঙরামির মধ্যে নেই এ আপনি জেনে রাখতে পারেন। এ-বাড়ির মাসিমার কাছেও ওই ছবি নিয়ে নালিশ করে দেখুন উনি কি বলেন। যান, ওই ছবির নেগেটিভও আপনাকে দিয়ে দেব, ভালো ছবি পরে অনেক সময় বেশি দামে বিক্রি হয় বলে নেগেটিভ যত্ন করেই রেখেছি।

দূর্বা বেশ কৌতুক বোধ করছে। গাঁট্টার চোটে এই লোক রমলার মাথার তালুতে সুপুরি ফলিয়েছিল তা-ও মনে পড়ল। নিরীহ মুখ, নিরীহ চাউনি।—এখন তো মনে হচ্ছে আপনি আমার থেকে বেশি রেগে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে এক পশলা হাসি। পরিষ্কার মুখ। যাক, আমি ভেবেছিলাম আপনি সাংঘাতিক রেগে গেছেন তাই আমারও রাগ হয়ে যাচ্ছিল। আজ কালের মধ্যেই মাস্টার দাদুর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে আসব—রাতে আর সকালে আপনার কথা

শুনেছি তো—আপনাকে দেখেই আমার দারুণ ভালো লাগল, মনে হল, বিজু যেমন চায় সব দিক থেকে তেমনটি হল।

উচ্ছ্বাসের কথা শুনে দূর্বার মুখ লাল একটু। সব দিক থেকে বলতে চেহারা-পত্রের এই দিকও ছাড়া আর কি হতে পারে? ছবি তোলার মতো দারুণ ভালো লাগাটাও নিঃশঙ্ক বেপরোয়া গোছের মনে হল।...পুরুষের মুখে অনেক জটিলতা দেখেছে দূর্বা বোস, চাউনিতে অনেক বীভৎস লোলুপতা দেখেছে। এই মুখ বা চাউনি সে-রকম নয়।

সাত আট মিনিটের মধ্যে রণিত দ্বিতীয় সিগারেট ধরালো। নির্মলা সরকার আসছেন। দূর্বা সিগারেট আড়াল করতে দেখল না। তাঁর সামনে ওটা চলে বোঝা গেল। চাপা গলায় বলল, মাসিমা যে-মুখ করে আসছে, আমাকে ঝাড়বে মনে হচ্ছে।

মহিলার ব্যক্তিগত কথা কিছু থাকতে পারে ভেবে দূর্বা উঠে দাঁড়াল। নির্মলা সরকার কাছে এসে বললেন, উঠলে কেন, বোসো —বিজুর মাস্টার দশটা সাড়ে দশটার আগে যাবে না। ও-দিক ফিরলেন, তোর মতলবখানা কি? সুমতিকে বারোটায় লাঞ্চ দিতে বলেছিস?

—হ্যাঁ, একবার আপিস যেতে হবে।

—আর বিজু যে বলে দিল চার-পাঁচ দিনের মধ্যে তোর যাওয়া হবে না?

সিগারেটে লম্বা টান পড়ল। হাসছে।—বিজুকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করেই যাব। তোমাকেও বোঝাতে হলে তো মুশকিল। কেন, তোমার ক্লাবের ফরমাশ কিছু আছে?

রেগেই গেলেন।—আমার ক্লাবের চিন্তায় তো তোর ঘুম নেই একেবারে! ক'দিন বাদে এলি, দু'চার দিন থাকা যায় না এত কাজ তোর? কাজ থাকলেও সেরে চলে আসা যায় না?

—আ-হা, বুঝছ না, রাত এগারোটা বারোটার পর দশ মাইল পথ ঠেঙিয়ে আসি কি করে! বাইরে থেকে এ ক'দিন যে কাজের বোঝা নিয়ে এসেছি, ক'টা দিন এখন হিমসিম খেতে হবে।

নির্মলা সরকার আরো তেতে উঠলেন।—তাহলে তুই এ-কাজ নিয়েই পড়ে থাক, আমি তোর মেসোমশাইকে সাফ বলে দিচ্ছি আর কারো আশায় থেকে কাজ নেই, নিজে যা পারে করুক নয়তো কারবার গুটিয়ে ফেলুক। এই বয়সে একজন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খেটে মরছে আর উনি ঘণ্টার এক কাগজে বসে সমাজ সেবা করছেন—এ-ভাবে সময় নষ্ট করলে শেষে তোর সেবা কে করবে?

চলে গেলেন। সিগারেট অ্যাশপটে গুঁজতে গুঁজতে হাসি মুখে রণিত দূর্বার দিকে তাকাল।—ঘাবড়াবেন না, এখানে থাকলেই এটুকু আমার নৈমিত্তিক বরাদ্দ।

দ্বিধা কাটিয়ে দূর্বা জিজ্ঞাসা করল, উনি আপনাকে ব্যবসার দায়িত্ব নিতে বলেন বুঝি...?

মাথা ঝাঁকালো। তাই। বলল, আমার ওনলি কোয়ালিফিকেশন হল আমি এ-বাড়ির মেজ ছেলে সুজন সরকারের ছেলেবেলার বুজম্ ফ্রেন্ড। আমার মতো অকর্মা যাবে ওদের এতবড় বিজনেসে মাথা গলাতে! চিন্তা-ভাবনা যা-কিছু সব এই মাসিমার মাথায়, বুঝলেন! নইলে মেসোমশাই নিজেকে বুড়োও ভাবেন না, অসহায়ও ভাবেন না—তাঁর জেনারেল ম্যানেজার আছে, ম্যানেজার আছে, বিজনেস সেক্রেটারি আছে, এজেন্ট আছে, সেলস

অফিসার আছে—কিন্তু মাসিমার একটুও তাদের ওপর বিশ্বাস নেই, তার ধারণা ওরাই তার ভদ্রলোকটিকে ডোবাবে একদিন। মেসো রেস খেলেন, রাতে ক্লাবে-ট্লাবে যান—তাইতে আরো অবিশ্বাস। মাসিমা ফাঁক পেলেই তাঁকে আমার কথা বলে আর উনিও সায় দেন, রণ এলে তো ভালই হয়— বলে দেখো।

দূর্বার মনে হল, মানুষটা সরল। নইলে একদিনের এটুকু আলাপে কারো ঘরের কথা কেউ এমন অনায়াসে বলে না।

রণিত দত্ত নিজে থেকেই আরো একটু বিস্তার করল।—মাসিমারও অবশ্য দোষ নেই। অমন তাজা ছেলেটা হুট করে মারা গেল, নইলে ব্যবসার হাল এতদিনে সে-ই ধরত। ও-দিকে বড়দার আশা তো আগে থেকেই ছাড়তে হয়েছে, কারো কথায় কান না দিয়ে সে ডাক্তার হয়ে বসল—

দূর্বা নতুন কিছু শুনল যেন। উৎসুক।—বড়দা মানে এ-বাড়ির বড়দা? তিনি ডাক্তার নাকি?

—বাঃ! আপনি জানেন না? আপনার সঙ্গে বড়দার আলাপ হয়নি?

—হয়েছে...আমাকে ডেকে বিজুর কখন কি করতে হবে না হবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন...কিন্তু নিজেও ডাক্তার জানতাম না।

বড়দার প্রসঙ্গে এই লোককে বেশ উৎসাহিত দেখা গেল। সোজা হয়ে বসে আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, শুধু ডাক্তার—কলেজের সব পরীক্ষায় আগাগোড়া ফার্স্ট হওয়া ডাক্তার। দেখতে দেখতে তারপর দিব্বি প্র্যাকটিসও জমিয়ে বসেছিল—ওদিকে এম-ডি দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল।...তার মধ্যে তিন-তিনটে বিভ্রাট—একটা বড়দার হিসেবে ছোট, দুটো বড়।

দূর্বা তেমনি উৎসুক।

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে রণিত বলে গেল, এক, হাসপাতালের এক নার্সকে ঝোঁকের বশে বিয়ে করে বসেছিলেন—তার সঙ্গে ডিভোর্স। সেই মহিলাকে এখানেও দেখবেন, বিজুকে ভালবাসে—

—দেখেছি। দূর্বার খুব শোনার ইচ্ছে ছিল ডিভোর্স কেন।

—ও...। সুজনের অ্যাকসিডেন্ট আর ডেথ। দুই, বৃষ্টির রাতে গাড়ি হাঁকিয়ে আসছিল কলকাতার বাইরে থেকে, একটা ট্রাকের সঙ্গে হেড-অন কলিশন। হাসপাতালে আনার আগেই শেষ। অমন তরতাজা ছেলেটার ভাঙাচোরা বীভৎস মূর্তি সকলেই দেখেছে, কিন্তু বড়দা তারপর থেকে কেমন যেন হয়ে যেতে লাগল। ডিভোর্সের আগে থেকেই মদ ধরেছিল, সুজন চলে যাবার পরে মাত্রা বাড়তে থাকল।...তিন, বিজুর এই অসুখ। ব্যস, বড়দারও ডাক্তারি জীবন খতম। দু'চোখের চাপা বেদনায় রণিত দত্তর মুখও অন্যরকম এখন। একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার মতে বড়দার ডাক্তার হওয়াও ভুল হয়েছে, ভিতরে ভিতরে এক মস্ত দার্শনিক বুঝলেন...এক আমি ছাড়া আর তাকে কেউ বুঝতেই পারে না। বিজুর সম্পর্কে বড়দা কি বলে জানেন? বিজু হল ইন্ডিয়া, কেউ ছেড়েও থাকতে পারে না, ইন্ডিয়ার রক্ত খারাপ হয়ে গেছে কিন্তু একবার রক্ত বদলাতেই তিরিশটা বছর লেগে গেল। সেন্টারে জনতা সরকার এলো, বড়দা টিপ্পনী কাটল, নতুন রক্তে কত দিন চলে দ্যাখ। শুনে আমি রেগে গেছলাম কিন্তু এরই মধ্যে হালচাল যা

দেখছি...যাক গে, বড়দার মজার কথা শুনুন, ডিভোর্সের পরেও বিশাখা বউদি বিজুকে দেখতে আসে—বড়দা হেসে মন্তব্য করেছিল, আসবে না কেন, গদি-ছাড়া হলেও ইন্দিরা কি ইন্ডিয়াকে ছেড়ে থাকতে পেরেছে?

কান পেতে শোনার মতো। বড়দার এরকম ধারণা ছিল না। দূর্বাকে ঘরে ডেকে নিয়ে যা বলেছিল মনে পড়ছে। নিজে ডাক্তার বলেই অত সহজ করে বলতে পেরেছে। আর দাদুর আশার কথা শুনে কিরকম হেসে বলেছিল, লেটস হোপ সো, কিন্তু উনি কিছু জানেন না। দু'কথায় এ-রোগের ব্যাপারটা বুঝিয়েও দিয়েছিল। একটু চুপ করে থেকে দূর্বা বলল, প্র্যাকটিস না করলেও এখনো তো উনি খুব পড়াশুনা করেন দেখলাম...

শুনে বিস্ময়ের কারণ ঘটল যেন কিছু। মানুষটাকে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসতে দেখল। দূর্বার চোখে চোখ রেখে সিগারেট অ্যাসপটে গুঁজল।—আপনি পড়াশুনা করেন দেখলেন...কোথায় দেখলেন?

—তাঁর ঘরে। বিজুর সম্পর্কে সব বুঝিয়ে দেবার জন্য আমাকে তাঁর ঘরে ডেকেছিলেন বললাম, সে দিনই।

—কখন ডেকেছিলেন, দিন না রাতে?

দূর্বা থতোমতো খেলো একটু।—সন্ধ্যের পরে। ঘরের আলমারিতে মোটা বই দেখলাম...

—সেই মোটা বই পড়ছিল?

—না, চটি মতো...।

—আর ড্রিংক করছিল?

দুর্বোধ্য লাগছে দূর্বার। মুখের ওপর চোখ তুলে সামান্য মাথা নাড়ল।

রণিত দত্ত এবারে নিঃশব্দে হাসতে লাগল। রকমসকম দেখে দূর্বা আরো অবাক।

—যাক, বড়দা ঘরে না থাকলে সময় কাটানোর জন্য একটা বই-টইয়ের খোঁজে কখনো যেন গিয়ে হাজির হবেন না, বা কোনো বই-টই টেনে বার করবেন না।

দূর্বা হকচকিয়ে গেল।—কেন, উনি কি বই পড়েন?

অম্লানবদনে জবাব দিল, পর্নোগ্রাফি। কোত্থেকে যে পাঁজা পাঁজা এসব বই যোগাড় করে আনে সেই জানে। আমি একবার একটা বই চেয়ে নিয়েছিলাম—আরে ব্বাপ রে বাপ! কি কুৎসিত আর কি জঘন্য—পাঁচ দশ পাতা ওলটাতেই এমন গা ঘুলিয়ে উঠল যে তাড়াতাড়ি ফেরত দিয়ে হাত ধুয়ে বাঁচলাম।

দূর্বার সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ। শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে এক দুপুরের সেই দৃশ্য মনে পড়েছে।...কোকিল-ডাকা নির্জন দুপুরে বড়দি সন্তর্পণে তিনতলা থেকে নেমে আসছে। তার খানিক আগে দূর্বাকে বলে বড়দা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। শাড়ির আড়ালে বড়দির হাতে চটি বইয়ের মতো কিছু একটা। ওকে দেখে সেই গুরুগম্ভীর বড়দির কয়েক মুহূর্তের জন্য চুরি ধরা পড়া গোছের মুখ।

—বাঃ, আপনি দারুণ লজ্জা পাচ্ছেন যে দেখি! রণিত দত্ত বেহায়ার মতো চেয়ে আছে আর মজা পাচ্ছে। বলল, বড়দা না হয়ে আর কেউ হলে আমি সব পুড়িয়েই ফেলতাম। রেগেমেগে বড়দাকেই বলেছিলাম, এ কি প্রবৃত্তি তোমার—কি জঘন্য জিনিস পড়ো তুমি? তার জবাব কি শুনবেন? নির্বিকার মুখ করে বলল, প্রবৃত্তি ভালো করার

জন্যেই তো পড়ি। এগুলো হল সেফটি ভাল্‌ব—পড়লে ভিতরের কামনা বাসনা সব ক্ষয় হতে থাকে—তখন গঙ্গার বাতাসের জন্য ভিতরটা আঁকুপাঁকু করে।

দূর্বার মুখ লাল তখনো। উঠতে পারলে বাঁচে। পরিস্থিতির মোড় ফেরালো রমলার সরব পদার্পণে।—গুড মর্নিং রণদা, দুটিতে বেশ জমে গেছ দেখছি—কবে এলে?

রণিত দত্ত গম্ভীর একটু।—কাল রাত আটটা পাঁচে। তুই আজকাল রাত সাড়ে দশটার পর বাড়ি ফিরিস নাকি?

—যখন খুশি তখন ফিরি। রাতে দেখা হয়নি বলে সরি। দূর্বার দিকে ফিরল, দু'হাত কোমরে।—এই মেয়ে, এ-বেলা বুঝি বিজুর জন্য ছটফটানি নেই?

দূর্বা মনে মনে বেশ বিরক্ত। শালীনতা বোধটুকু পর্যন্ত নেই। কিন্তু রাগ দেখাবার জায়গা নয় এটা তা ও ভালোই জানে। বলল, বিজুর আঁকার মাস্টারমশাই এসেছেন, আমি তোমার সঙ্গে একটু গল্প করার জন্যেই আগে এসেছিলাম—

—কি ভাগ্য আমার! হেসে অন্যজনের দিকে ফিরল, টিটকিরির সুরে বলল, ক'দিন ছিলে না শুনলাম, গুরুদর্শনে গেছলে নাকি—তোমার জেপি কেমন আছেন?

রণিত দত্ত গম্ভীর।—ভালো আছেন। তোকে গলায় বকলেস বেঁধে নিয়ে যাবার লোক জুটেছে কিনা খোঁজ করছিলেন।

একটুও রাগ না করে রমলা আবার দূর্বার দিকে ফিরল।—রণদার মতে ইণ্ডিয়ার দুটো মানুষ—একজন ছিল আর একজন আছে। যে ছিল সে গান্ধীজী, আর যে আছে সে জয়প্রকাশ। যদি রণদার প্রেমে পড়তে চাস তো ঠেসে জেপি-চরিত মুখস্থ কর—

—আঃ রমলা! করুণার পাত্রী ভুলে গিয়ে চাপা গলায় দূর্বা ধমকেই উঠল।

কিন্তু রমলা সতর্ক অন্য কারণে। নিরীহ মুখ করে রণিত দত্তকে সোফা ছেড়ে উঠতে দেখে তিন গজ দূরে সরে দাঁড়িয়ে চোখ পাকাল।—দেখো রণদা, গায়ে হাত দিলে ভালো হবে না বলছি! সেই মেজাজেই দূর্বাকে ডাকল, এই মেয়ে, চলে আয়—

এই বিড়ম্বনারও অবসান সুমতি ঘরে ঢুকতে। সে জানান দিল, আঁকার মাস্টার চলে গেছে, দূর্বাদিকে আর রণদাকে বিজু ডাকাডাকি করছে।

আর কোনো বাধার অপেক্ষা না রেখে দূর্বা উঠে দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে এলো।

## ছয়

প্রথম মাসের মাইনের টাকা হাতে পেয়ে দারুণ ভালো লেগেছিল দূর্বার। প্রায় রবিবারেই কিছু[illegible]ণের জন্য হাজিরা দিয়েছিল বলে নির্মলা সরকার পঞ্চাশ টাকা বেশি ধরে দিয়ে[illegible]লেন। দূর্বা মিনতি করে তাঁকে সে-টাকা ফেরং দিয়েছে। বলেছে, ভালো লাগে বলে রবিবারেও পারলে খানিকক্ষণের জন্য আসে. আর বিজুও তাতে খুব খুশি হয়। কিন্তু সে-জন্য বাড়তি টাকা হাত পেতে নিলে এ-রকম আসার অন্য মানে দাঁড়ায়। টাকা বাঁচল বলে নয়, এই আন্তরিকতা দেখে কর্ত্রী খুশি। খুশি রণিত দত্তও। পঞ্চাশ টাকা ফেরৎ দেওয়ার কথা তাকে নির্মলা সরকার ছাড়া আর কে বলবে! ঠাট্টার সুরে ওকে বলেছে, আপনারও আমার দশাই হবে, অর্থাৎ কিস্‌সু হবে না।

যা-ই হোক, সেই পাঁচশ টাকা নিয়েই বাতাস সাঁতরে ঘরে ফিরেছিল। দিনকাল

যা, পাঁচশ টাকা কিছুই নয়, তা ও জানে। কিন্তু নিজের রোজগারের পাঁচশ টাকা ভাবা যায় না। এই টাকা দিয়ে সাম্রাজ্য কেনা যায় এ-রকম একটা অনুভূতি।

গতকাল দ্বিতীয় মাসের মাইনে হাতে পেয়েও অতটা না হোক, ভালই লেগেছে। আজ রবিবার। সকাল সকাল উঠেছে। ভিড় না লাগতে বাজারটা সেরে আসবে। রবিবারে বাজারে-বাবুদের ভিড় দেরিতেই হয়। বাজারে গেলে দূর্বা খুব সকালেই যায়। নইলে বাজারের অতি লোভের মাছ-টাছ দেখার মতোই কত জনে যে ওকে দেখে ঠিক নেই। তাতে পয়সা খরচ নেই। গেল মাসের মাইনে পেয়েও ভালো বাজার করেছিল। নিজেরা খেয়েছিল, দাদুকে খাইয়েছিল। আজও সেই রকমই ইচ্ছে। তাছাড়া দায়ও আছে একটু। বিকেলের দিকে রমলা আসবে দাদুর কাছে। ওর নাকি ভবিষ্যৎ জানা ভীষণ দরকার। ওর নাচ চলছে বটে, কিন্তু নাচের ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামায় না। ঝোঁকও কমে আসছে। প্রেম-প্রেম করেই মেয়েটা গেল আর ওকেও জ্বালিয়ে মারল। অনেক দিন ধরে দাদুর কাছে আসবে আসবে করছিল। দূর্বা যতদিন পারে কাটান দিয়েছে। ওর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে রমলা নিজেই শেষে দাদুকে ফোন করে আজকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাকা করেছে। আসছে যখন, দাদু আর কি করবে, আতিথ্যের ব্যবস্থা দূর্বারই করতে হবে।

তেইশ বছরের জীবনে এই দুটো মাসই শুধু জমার বাক্সে আলাদা করে তুলে রাখার মতো.। চাকরি করছে বাবা জানে, দাদুর দেওয়া চাকরি তাও জানে। কিন্তু বাবার সঙ্গে বাক্যালাপ নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া আগেও যেমন ছিল না, এখনো তেমনি নেই। চাকরির খবর শেফালির মুখে শুনেছে। কি চাকরি বা কত মাইনের চাকরি জিগ্যেস করেনি। দূর্বাও বলেনি। মাইনে জানলে মাসের টাকা আর দেবেই না, সব মদে যাবে। শেফালিও অনেক জেরা করেছে, কিন্তু আসল মাইনে ওকেও বলেনি। ওর মতি-গতি ভালো না, দিদির হাতে টাকা আছে টের পেলেই হাত পাতে। সিনেমা দেখার নেশা এই দু'মাসেই অনেক বেড়ে গেছে। তার ওপর দাদু সেদিন বলেছিল, বোনের হাতে খবরদার কাঁচা টাকা বেশি দিবি না—রোজ বিকেলে দেখি ঘর তালাবন্ধ করে উনি বেড়াতে বেরোন, বেড়িয়ে ফেরার সময় দুই একদিন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে রেস্টুরেন্টে বসে খেতেও দেখেছি। মেয়েবন্ধু শুনে দূর্বা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। শেফালিকে জিগ্যেস করতে ও চোখ বুজে অস্বীকার করেছে, খিদে পেলে নিজে হয়তো এক-আধ সময় খায়, কিন্তু অন্যকে খাওয়াবার পয়সা পাবে কোত্থেকে? আর রেগে গিয়ে দাদুকে শকুনি বুড়ো বলে গালাগাল করেছে।

কিন্তু দাদুর ধারণায় কক্ষনো কোনো ভুল হয় ভাবে না দূর্বা। তাই টাকা দেবার ব্যাপারে আগের থেকেও একটু সতর্ক হয়েছে। ভালো খায় খাক, ও নিজেও তো সকালে আর দুপুরে কত ভালো খায় আজকাল, তখন বোনের কথা মনে পড়েই। কিন্তু শেফালির সিনেমা দেখার ঝোঁকটাকেই বেশি ভয় ওর। অন্য দিন সুবিধে হয় না, স্কুল থাকে আর দূর্বাও বিকেলের শো ভাঙার আগেই ঘরে ফেরে। কিন্তু শনিবারে স্কুল নেই, সেদিন কি করে কে জানে। জিগ্যেস করলে রেগে ওঠে, অস্বীকার তো করেই। কিন্তু দূর্বার খুব বিশ্বাস হয় না। এই মেয়ের মিথ্যে কথা জিভে আটকায় না। ওর দিকে চেয়ে দূর্বার বেশ ভয়ই হয়। আর দুটো বছর গেলে ওর থেকেও ঢের ভালো দেখতে হবে জানা কথাই। রবিবারে যতক্ষণ বাড়ি থাকে, বছর বিশ বাইশের কয়েকটা ছেলেকে সামনের রকে বসে আড্ডা দিতে দেখে। তাদের জোড়া-জোড়া চোখ ওদের ঘরের জানলায় আটকে থাকে।

শুধু দূর্বা জানালায় এসে দাঁড়ালেই ওদের চাউনি চটপট অন্য দিকে ফেরে।

বাড়ির ভাবনা ছেড়ে দিলে দূর্বা এখন অনেক নিশ্চিন্ত। হাতে মাইনেটা পেলে ভালো লাগে ঠিকই, কিন্তু কাজের সঙ্গে টাকাটাকে এক করে দেখে না সে। তখন কেবলই মনে হয় ও যেন কোনো শাপভ্রষ্ট দেবশিশুর সেবায় লেগেছে। অন্তরের দরদ সকলেই টের পায়। ওই ছেলেটা ওকে বেঁধেই ফেলছে। আর দু'দুটো মাস কেটে গেল অথচ একবারও রক্ত দিতে হল না দেখে বাড়ির গিন্নিটিও খুব পয়মন্ত ভাবছে ওকে। আর তার ফুর্তি যে বেড়েছে, সুমতি তো তা পঞ্চমুখে বলে।

এরকম নাকি খুব শিগগীর হয়নি। বাড়ির কর্তা নিখিলেশ সরকারের সঙ্গে কমই দেখা হয়। সকাল ন'টার মধ্যে বেরিয়ে যান, তার আগে পর্যন্ত ব্যস্ত। আর রাত আটটায় তো কোনদিনই ফেরেন না। দেখা যা হয় একটু আধটু সে রোববারে। এত বড় লোক, কিন্তু অমায়িক। প্রথম দিন বলেছিলেন, বিজুর তোমাকে এত পছন্দ সে-জন্য আমরাই তোমার কাছে গ্রেটফুল। ও-বাড়িতে ওকে দেখলে সেই চিরাচরিত কাঠ-খোট্টা মুখ একমাত্র বড়দি কমলা সরকারের। সেই প্রথম দিন থেকেও বেশি। চোখোচোখি হলেই গম্ভীর, রুক্ষ। নিজের অপরাধ দূর্বা ভালোই জানে। এই মহিলার সম্পর্কে ওরও এখন কৌতূহল কম নয়।

অনাগত দুঃসময়ের ছায়া মনের তলায় একেবারে উকিঝুঁকি দিত না এমন নয়। রাতে ও আর শেফালি এক খাটে শোয়। শেফালির শুতে না শুতে ঘুম। তখন দূর্বার নানা অবাঞ্ছিত চিন্তাও এক একসময় মাথায় আসত। যেমন, যতদিন ওই ছেলের পরমায়ু ততদিন তার চাকরি। রোগ যা, সেটা কতদিন। নিজের ওপরেই রেগে গিয়ে চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে চাইত। বিজুর রোগের থেকেও কি তার চাকরি বেশি? কখনো না! এমন কিছু মন্ত্র বা জাদু তার জানা থাকত যে বিজুর রোগ এক মুহূর্তে ভালো হয়ে যাবে—তাহলে সে চাকরির পরোয়া করত না। তক্ষুণি বিজুকে ভালো করে দিত। তবু বাস্তব এমনি কঠিন বস্তু যে এক একসময় ছায়া পড়তই। এখন সেটাও গেছে। গেছে ওই রণিত দত্তর জন্যেই। অথচ দাদুর মুখে শুনে দূর্বা রেগেই গেছল।

...দাদুর কাছে রণিত দত্ত এখন আগের থেকে একটু বেশি আসে। তাকে নিয়ে দাদু এখন ঠাট্টা-ঠিসারাও শুরু করে দিয়েছে। সেই রণিত দত্তকে দাদু কথায় কথায় বলেছিল, মেয়েটা তো এখন ভালোই আছে, কিন্তু ওই ছেলের কিছু একটা ঘটে গেলে তখন কি হবে সেটাই ভাবনা। তাই শুনে রণিত দত্ত নাকি তক্ষুনি বলেছে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সে-রকম হলে ওই মাইনেয় মিস দূর্বার কাজ সরকার মোটরস-এর আপিসেই হবে—আমিই আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি।

শোনামাত্র রেগে গিয়ে দূর্বা দাদুকে বলেছিল, এ-কথা কেন তুমি বলতে গেলে —উনি যদি মনে করেন এই ভাবনার কথাটা আমিই তোমাকে বলেছি?

জবাবে দাদু প্রথমে কটমট করে খানিক চেয়ে রইল। তারপর হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে পেন্সিল-কাটা ছুরিটা নিয়ে নিজের বুকে ছোঁয়ালো।—দেব বসিয়ে? অসতী মেয়ে কোথাকারের—এরই মধ্যে আমাকে বাতিল করে এখন উনি যদি মনে করেন? আসুক আবার, ঘাড়ধাক্কা দিয়ে না তাড়াই তো কি বললাম।

রাগ ভুলে দূর্বা হেসে সারা। তারপর বলেছিল, এখানে এসে ঘাড়ধাক্কা না-হয় দিলে,

ও-বাড়ি থেকে তাড়াতে পারবে?

কিন্তু সত্যি যা তা সত্যিই। দাদুর মুখে রণিত দত্তর ওই কথা শোনার পরে সেই অস্বস্তিকর দুশ্চিন্তাটা একেবারে চলে গেছে। ও যেন একটা অন্ধকার বৃত্ত থেকে আলোর বৃত্তে এসে পৌঁছেছে।

রণিত দত্তকে ভালোই লাগে নিজের কাছে সেটা অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু এই ভালো লাগার বিশেষ কোনো সংজ্ঞা নেই। যদিও নিরাপদ তফাতে দাঁড়িয়ে রমলা যা-খুশি তাই বলে। এত খারাপ মুখ কোনো মেয়ের সে দেখেনি। ওদের সামনেই মাকে বলে, রণদা আজকাল এ বাড়িতে বেশি আসছে, বেশি থাকছে কেন? আবার বলে, বিজুর যে দুটো দিন আঁকার মাস্টার আসে, দুজনেই ওরা সেই দু'দিন আগে আসবে আর বসার ঘরে আড্ডা দেবে—এ কি ব্যাপার!

মা অবশ্য মেয়েকেই ধমকান। বলেন, এরপর ও তোর গায়ে হাত তুললে আমার কাছে নালিশ করতে আসিস না। কখনো বলেন, খামোখা এই মেয়েটাকে লজ্জা দিস কেন? রমলা টেরিয়ে দেখে কতটা লজ্জা পেল। কিন্তু মা কাছে না থাকলে সে এভাবে বড় একটা লাগতে আসে না। সেই এক গাঁট্টা ও বোধহয় জীবনে ভুলবে না।

দূর্বার ভালো লাগে কারণ মানুষটা একদিকে যেমন সহজ সরল, অন্য দিকে তেমনি ঝোঁকের বশে চলে। কারো কোনো অন্যায় দেখলে সরাসরি বলে দিতে বাধে না। স্বার্থপরতা দেখলে রেগে যায়। আদর্শের কথা শুনলে ছেলেমানুষের মতো উৎসুক হয় আর খুশি হয়। এ-সব নিয়েও রমলা ঠাট্টা করে। বলে, কেউ কেউ বরাবর নাবালক থেকে যায়, তাদের একজন করে স্পিরিচুয়াল গাইড দরকার হয়, এখানে হাতের কাছে তো আর জেপি নেই, এখানে রণদার সেই ম্যাগনিফায়েড গাইড হল গিয়ে বড়দা।

বলে রমলা নিজেই হেসে বাঁচে না। ঠাট্টাটা অসারও একেবারে নয়। যে-মানুষ অত মদ খায়, অমন সব জঘন্য বই পড়ে, তার প্রতি এত শ্রদ্ধা দেখে দূর্বারও অবাক লাগে। রণিত বলে আমি বড়দার ভেতর দেখতে পাই—ভেতরখানা তার কি জিনিস জানেন না। রণিত সকালে বা সন্ধ্যায় যখনই আসুক, কোনদিকে না তাকিয়ে আগে তিন তলায় উঠে যায়। ঘণ্টাখানেক বা আধঘণ্টা বাদে নেমে আসে। আর এ-বাড়িতে থেকে গেলে তার শোবার জায়গা ওই বড়দাটির ঘরে।

গোড়ার দিকেই রণিত দত্ত নিঃসংকোচে ওকে বলেছিল, আপনার সঙ্গে গল্প করতে আমার ভালো লাগে, আপনি বিরক্ত হন না তো? হলে পরিষ্কার বলে দেবেন।

দূর্বা হেসে জবাব দিয়েছে, বিরক্ত হব কেন!

—যাক নিশ্চিন্ত। আমি অনেক রকম লোক দেখেছি, বুঝলেন, বেশির ভাগ মনে এক মুখে এক। আপনাকে কেন ভালো লাগে জানেন, আপনি এখানে চাকরি করতে আসেন বটে, কিন্তু চাকরির স্বার্থ থেকে বিজু আপনার কাছে ঢের বেশি হয়ে গেছে।

স্বার্থপরতা কত দু'চক্ষের বিষ তার নজিরও গড়গড় করে দেখিয়েছে। —দাদাদের সঙ্গে আমার ওই স্বার্থপরতার জন্যেই ছাড়াছাড়ি। ভালো সরকারি চাকুরে তারা, আমি জেল-খাটা ভাই—সর্বদা ভয়, কখন তাদের চাকরির গায়ে কুলোর বাতাস লাগে—এখন ডাকে, আমি যাই না।

—আপনি জেলও খেটেছেন নাকি? দূর্বা না জিগ্যেস করে পারেনি।

ওমনি হাসি।—বা রে, একবার নাকি, গত চার পাঁচ বছরের বেশির ভাগ সময় তো জেলেই কেটেছে।

দূর্বা চেয়ে রইল খানিক।—আপনাকে দেখলে বোঝা যায় না।...জেলে খুব কষ্ট হত না?

রণিত হাসল, কষ্ট আর কি, তবে মার-ধোর খেতে কার আর ভালো লাগে বলুন —মারের চোটে এক-একসময় চোখে অন্ধকার দেখতে হত।

দূর্বার চোখ বড় বড়।—এ-রকম মারত!

শুনেই কষ্ট পাচ্ছে দেখে রণিতের মজা লাগছে। জবাব দিল না। দূর্বা জিগ্যেস করল, এখন যে শাসন দেখছেন, সেটা কেমন...ভালো?

সঙ্গে সঙ্গে রাগে বিকৃত মুখ।—ভালো? খেয়োখেয়ি লেগেই আছে, দেখছেন না? সব স্বার্থপর। জয়প্রকাশজীর সব আশায় ছাই দিচ্ছে এরা।

এ নামটা প্রায়ই শোনে, তাই দূর্বার কৌতূহল।—জয়প্রকাশজী আপনাকে বুঝি খুব ভালোবাসে?

—তিনি সকলকেই ভালোবাসেন। দেশকে যে ভালোবাসে তাকেই ভালোবাসেন। —আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ সেই তিয়াত্তর সালে যেবারে তিনি কলকাতায় এলেন সেইবার। তখন আমার বয়স কত আর, একুশ বাইশ—সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছি। কাগজের আপিসে ঢুকেছি। একটা মানুষের মতো মানুষ দেখলাম। পরে শুনেছি, তিনি জ্যোতিবাবু আর সুন্দরায়ার সঙ্গে এক মিটিং করেছেন—সমস্ত বিরোধী দলকে সরকারের বিরুদ্ধে একত্র হওয়ার সেই তাঁর প্রথম প্রস্তাব। তারপর আরো কয়েকবার এসেছেন, আমি প্রত্যেকবার ছুটে গেছি—কাগজের লোক বলে সুবিধেও হয়েছিল। পঁচাত্তর সালে এখানে যে বিশহাজার লোকের বিরাট মিছিল নিয়ে নিজে তিনি রাস্তায় নামলেন—সেই মিছিলে আমিও ছিলাম। কিন্তু কি হল শেষ পর্যন্ত, অতবড় মানুষটা রোগে ধুঁকছেন আর দেশের ভালো চিন্তা করছেন—ওদিকে নেতারা সব যে-যাঁর নিজের স্বার্থ দেখছেন।

এমন জ্বলজ্বলে চোখ যে দূর্বার কিছু বলতেও সাহসে কুলোচ্ছিল না।

বিজুর কথাই অবশ্য বেশি হয়। কেবল প্রথম দিন দেখেনি, নইলে লাঞ্চ আর তারপর ওষুধ খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে বিজু একটু ঘুমিয়ে পড়েই। সেদিন ওরা সামনের বারান্দায় চেয়ার পেতে দুজনে গল্প করে। রণিত দু'দিন এখানেই ছিল। অতএব বিজুর চোখ বোজার আগে বা পরে দুজনকেই চাই।

দূর্বা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা, বিজুর জন্য সবাই চিন্তা করে, সবাই ভালও বাসে ওকে, অথচ রাগ হলেই বিজু কেন বলে এ বাড়ির কেউ ওকে ভালোবাসে না?

রণিত দত্ত হেসেই জবাব দিয়েছে, ওই ষোল বছরের ছেলের মাথাখানা আর চোখ দুটো কম পরিষ্কার ভাবেন আপনি? ও ঠিক বোঝে, এক আমি-আপনি বাদে আর সকলে ভালোবাসলেও ওর কাছ থেকে পালাতে চায়।...যেমন প্রথমে ধরুন, এ-বাড়ির কর্তা। বরাবরই খুব ব্যস্ত। কিন্তু এক ছেলে গেছে আর এক ছেলেও যাবে ধরে নিয়ে আরো ব্যস্ত। ব্যস্ত থাকা মানেই সব ভুলে থাকা। মাসিমারও তাই, বিকেল হতে না হতে ক্লাবে যাচ্ছেন, না হয় ফাংশানে মেতে আছেন। ভাই বোনের মধ্যে বড়দা বোধহয় বিজুকে সব থেকে ভালোবাসে—কিন্তু দরকার না পড়লে বা ডেকে না পাঠালে সে ওর ঘর

মাড়াবেই না—অথচ এই দুটো ভাইয়ের জন্যেই বড়দা এ-রকম হয়ে গেল। তারপর বড়দি—সপ্তাহে যে দুটো দিন এখানে থাকে তাতেই তার হাঁপ ধরে যায়। এ-কথা আমাকে নিজের মুখে বলেছে। আর রমলাও যে ওকে ভালোবাসে না তা না—বরং ওর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে রোগটাকে উড়িয়ে দিতে চায়। কিন্তু রোগ যে কি তা ও জানে, তাই পাঁচ দশ মিনিটও বিজুর কাছে থাকতে পারে না।

দূর্বা এ-দিক থেকে মোটে ভাবেইনি। শোনার পর মনে হয়েছে এ-ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। বাবা মা ভাই বোনের মধ্যে বিজু তার বড়দাটিকেই ভিন্ন চোখে দেখে এ দূর্বা বেশ লক্ষ্য করেছে। কিন্তু রাগ বা অভিমান হলে বিজু তাকে জড়ায় এই কারণেই হয়তো।

বাড়ির লোকের মধ্যে দুজনের সম্পর্কে দূর্বার চাপা কৌতূহল। এক, বড়দার সঙ্গে বিশাখার ছাড়াছাড়ি কেন—দুই, ভাই বোনের মধ্যে কমলা সরকার এ-রকম কেন। কিন্তু সাহস করে বড়দার সম্পর্কে কিছু জিগ্যেস করতে পারেনি। যে আশ্চর্য স্বভাবের মানুষ ওই বড়দাটি, গা-ঘিনঘিন-করা পর্নোগ্রাফি পড়ার মতোই আবার কিছু শুনে বসবে কিনা জানে না। এখনই আর ওপরে ওঠা দূরে থাক, তার সিঁড়ি দিয়ে নামা-ওঠার সময় ক্বচিৎ কখনো দেখা হয়ে গেলেও মুখের দিকে তাকাতে পারে না।

কমলা সরকারের কথা শুনেছে। ছেলেবেলায় মিশনারি স্কুলে আর তারপরে মিশনারি কলেজে পড়ত। এতগুলো বছর সেখানে এক গোঁড়া ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীর আওতায় ছিল, আর তার দারুণ ভক্তও হয়ে উঠেছিল। এই থেকে ওই রকম। নিজের মা-বাবার ক্লাবে যাওয়া পর্যন্ত বরদাস্ত করতে চায় না। আর ছোট বোনের ওপর তো দারুণ রাগ। মহিলা এখন তার কতটা মাশুল দিচ্ছে মুখ ফুটে সে আর বলার নয়, দূর্বার মুখ শেলাই।

রণিত দত্ত এলে বা এখানে থেকে গেলে অবসর সময় গল্প করাটা সহজ হয়ে এসেছে। কিন্তু রাজনীতির প্রসঙ্গ উঠলে দূর্বা ভয়ে ভয়ে মুখ বুজে থাকে। কি বলতে কি বলে বসবে ঠিক কি। এই সেদিন ও জব্দ হতে হতে খুব সামলে নিয়েছে। দুম করে ওকে জিগ্যেস করে বসেছিল, মরিচঝাঁপির ব্যাপারটা সম্পর্কে আপনার কি মত?

দূর্বার কাহিল অবস্থা। দণ্ডক না কোথা থেকে এক ঝাঁক রিফিউজি এসে বসেছে সেখানে আর সরকার তাদের ফেরৎ পাঠাতে চায় জানে। খবরের কাগজে তো ওপর-ওপর চোখ বোলায় শুধু এ-বাড়ি এসে। অগত্যা একেবারে বোকা মুখ করে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, কি ঝাঁপি?

—মরিচঝাঁপি! কি আশ্চর্য, এত কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে আর আপনি মরিচঝাঁপির ব্যাপার জানেন না? কাগজ পড়েন না?

নিরীহ মুখে দুষ্টুমির রাস্তাই ধরল। জবাব দিল, পড়ে কি লাভ, কারো এক ফোঁটা উপকার করতে পারব? আপনি এত পড়েও আর কাগজের একজন হয়েও এ-সব ব্যাপারে কিছু করতে পেরেছেন?

—বা রে, তা বলে কি হচ্ছে না হচ্ছে জানবেন শুনবেন না?

—তাতে তো শুধু আপনার মতো মেজাজ হবে, আর কি হবে?

রণিত দত্ত হেসে ফেলল, সবটাই ঠাট্টা ধরে নিল।

বাড়ির মধ্যে দূর্বার যাকে নিয়ে সব থেকে মুশকিল সে রমলা। ওকে নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে তার রেষারেষি লেগেই আছে। নাচফাচ অত মাথায় নেই, মেয়ে প্রেমজ্বরে ফুটছে, অথচ প্রেমিক নেই। ফাঁক পেলেই অভাবের সেই হামলাটা করে দূর্বার ওপর দিয়ে। ওর সতর্ক থাকতে হয়। কখন জড়িয়ে ধরে চুমু খাবে ঠিক নেই। ঠোঁট বাঁচানো গেলেও গালের ওপর হামলা। বাড়িতে থাকলে দুপুরে বিজুর ঘুমের ফাঁকে দূর্বাকে ঘরে ডেকে নিয়ে যাবেই। সন্ধ্যায় বা রাতের দিকে ডাকলেও দূর্বা তার ঘর মাড়ায় না। কিছু একটা দরকারি অজুহাতে বিজুর কাছ থেকে নড়ে না। বিকৃতিতে পেয়ে বসেছে মেয়েটাকে। হেসে হেসে দূর্বাকে বলে, যতদিন না মনের মতো প্রেমিক জুটছে ততদিন তুই-ই সম্বল। সেদিন দুপুরে নিজের খাটে শুয়ে রমলা তার কৃতিত্বের গল্প শোনাছিল—কোথায় কোথায় দারুণ রিসেপশন পেয়েছে আজ পর্যন্ত। দূর্বা পাশে বসে শুনছিল। হঠাৎ বাজের মতো ছোঁ মেরে দু'হাতে ওকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে জড়াজড়ি গড়াগড়ি। গালে মুখে চুমু খাওয়ার চেষ্টা। মেয়েটার গায়ে জোরও কম নয়। দুজনেরই বসন বিস্রস্ত। কোনরকমে ওর হাত ছাড়িয়ে দূর্বা খাট থেকে নেমে এলো। রমলা হাসছে হি-হি-করে।

দূর্বার বিরক্তির একশেষ।—আমি আর তোমার ঘরে আসছিই না।

রমলাও সঙ্গে সঙ্গে চোখ পাকালো।—তোর ঘাড় আসবে, অত সতীপনা দেখাবি তো থাপ্পড় খাবি। আবার হাসি।—মাইরি বলছি, তুই কাছে এলে তোকে মেয়ে আর নিজেকে ছেলে ভাবতে আমার বেশ লাগে।

রমলা সরকারের বিকৃতি টের পেয়েছে দূর্বা। এটাকে আবার আর এক-রকমের বিকৃতিতে পেয়ে বসছে। কমলার গোপনতা দোসর। রমলার ঝামেলা নিয়েই তার দুর্ভাবনা।

বাজারে গেলে দূর্বা যা কেনার চটপট কিনে ফেলে। দরদস্তুর তেমন করতে পারে না। আজ কি নেবে ঠিক করেই এসেছে। বেশি করে ভালো একটু রুই মাছ, কিছু তপসে মাছ আর কিছু তরকারি। গরম লুচির সঙ্গে সাদা তরকারি, তপসে মাছের ফ্রাই আর রুই মাছের কালিয়া—খাসা অতিথি সৎকার হয়ে যাবে। রমলা প্রায়ই বাইরে খায় কারণ বাবুর্চির রান্না খেতে ওর নাকি মুখ পচে গেছে। এ-সব ভালোই খাবে।

বাজারে ঢোকার মুখেই থমকাতে হল। সেই ফুটপাথ ধরে উল্টো দিকে যে লোকটা আসছে আর তাকে এড়ানোর উপায় নেই। অ্যাডভোকেট বাড়ির ছেলে হবু লেখক আর হবু কবি বসন্ত রায়। দু'মাস বাদে দেখা, তাই অভিমানে পাশ কাটানোর বদলে হাসিমুখে কাছে এগিয়ে এলো।

—ভালো আছ?

—মোটামুটি...।

—মোটামুটি কেন, দাদুর কাছে শুনেছি ভালো চাকরি করছ।...দু'মাস দেখিনি, আমি কিন্তু আগের থেকে ঢের ভালো দেখছি।

মুখের দিকে চেয়ে দূর্বা একটু হাসল শুধু। যে বলল, চাকরি না করা সত্ত্বেও তার চেহারাখানা আগের থেকে কম খোলতাই মনে হল না। বাজারের গেটে পা বাড়াতে এই লোকও সঙ্গ নিল। নেবে জানা কথাই।

বসন্ত রায় হাসি মুখে জানান দিল, তুমি আমাকে সত্যিকারের শিক্ষা দিয়েছ। এখন কিন্তু আমি চাল ডাল তেল নুন চিনি মাছ তরকারির দর মোটামুটি জানি, আর লেখার মধ্যেও সে-সব আনতে চেষ্টা করছি।

দূর্বা কোথায় কি উঠেছে দেখতে দেখতে নিস্পৃহ মুখে জিজ্ঞাসা করল, লেখা ভালো চলছে?

উৎসাহে ডগমগ মুখ।—গত দু'মাসের মধ্যে দুটো বড় কাগজে আমার দুটো গল্প আর ছোট বড় কাগজে পাঁচটা কবিতা ছাপা হয়েছে...তুমি দেখনি সে-সব? দাদুকে তো কাগজগুলো সব দিয়ে এসেছিলাম।

মনে পড়ল। দাদু বলেছিল, মুখে না বলে গেলেও এগুলো সব তোর জন্য—নিয়ে যা।

দূর্বা উৎসাহ বোধ করা দূরের কথা, ফিরে ব্যঙ্গ করেছিল, টাকার জোর থাকলে আজকাল লেখা ছাপা কিছু কঠিন নয়। এ বেচারাকে সে-রকম বলা যায় না। জবাব দিল, দেখেছি।

পায়ে পায়ে মাছের বাজার চক্কর দিচ্ছে। এক জায়গায় দাঁড়াল। ভালো বড় তপসে মাছ উঠেছে। কিন্তু বসন্ত রায়ের আর কোনো দিকে চোখ নেই। উদ্‌গ্রীব।—পড়েছ সব? ...যতটা সম্ভব বাস্তব ঘেঁষেই তো লিখতে চেষ্টা করেছি।

তপসে মাছ ছেড়ে দূর্বা তার মুখের দিকে তাকাল। দ্রুত কিছু একটা মগজের দিকে ধেয়ে আসছে। পাঁচ সেকেন্ড আগেও এ-রকম চিন্তার কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

ও-ভাবে চেয়ে থাকার ফলে বসন্ত রায় চুপসে গেল একটু।—পড়োনি?

পড়া দূরে থাক, দাদুর কাছ থেকে ওই মাসিক সাপ্তাহিকগুলো নিয়ে একবার উল্টেও দেখেনি। দূর্বার মাথা তড়িঘড়ি কাজ করে চলেছে।...রমলা সরকারের ভালো চেহারার ছেলে ভারী পছন্দ! পথ-চলতে সে-রকম কন্দর্পকান্তি কোনো ছেলেকে দেখলে তার নাকি জিভে জল আসে।

বলল, পড়েছি। আমার কিছু বলারও আছে। কিন্তু এই মাছের বাজারে দাঁড়িয়ে আলোচনা হয় কি করে, আমার তাড়াও আছে।

পড়েছে শুনে খুশি। বলার আছে শুনে আরো উদগ্রীব। বাজারে দাঁড়িয়ে আলোচনা হয় না তা-ও ঠিক। বিমর্ষ মুখে বলল, তুমি যে চাকরি করছ, সকালে বেরিয়ে রাতের আগে ফেরো না—রবিবারেও প্রায়ই বেরিয়ে যাও...আলোচনা কখন হতে পারে...?

দূর্বার মন স্থির। একটু ভেবে জবাব দিল, আজ বিকেলের দিকে দাদুর কাছে এলে হতে পারে...আমি থাকব।

সুন্দর মুখ উদ্ভাসিত একেবারে।—বিকেলে কখন?

দূর্বা একটু হিসেব করে নিল। রমলার ঠিক চারটেয় আসার কথা। নেচে বেড়ানো মেয়ে সময়ের খেলাপ করে না।—সাড়ে চারটেয় এসো। চা-টা খেয়ে আসতে হবে না, দাদুর ওখানেই খেও, আমি ব্যবস্থা করব।

সকালে কেউ আকাশের চাঁদ হাতে পেলে কারো এমন মুখ হয় কিনা দূর্বা জানে না। এবারে হাল্‌কা হেসে তাড়া দিল, তুমি সামনে থাকলে আমি বাজার করতে পারছি না, এখন সরে পড়ো।

বসন্ত রায় বসন্ত-বাতাসের ঝাপটায় বিহ্বল হয়ে প্রস্থান করল।

দূর্বা বাজার সেরে ফিরল। মনে মনে হাসছে সে-ও। ছক কেটে চলেছে। জলে-পড়া মেয়ের পায়ের তলায় মাটির হদিস মেলার আশা। বাজারটা ফেলেই শেফালিকে বলল, তুই এগুলো নামা, আমি এক্ষুনি এসে বলছি কি হবে।

এক মিনিটের মধ্যে দাদুর ঘরে।—দাদু, সেই ম্যাগাজিনগুলো সব দাও তো!

—কোন ম্যাগাজিনগুলো?

—আঃ, ওই যে-গুলোতে বসন্ত রায়ের গল্প আর কবিতা বেরিয়েছে।

দাদুর ছদ্ম ভ্রূকুটি।—হঠাৎ সেগুলোর খোঁজ কেন?

—লেখাগুলি সত্যি ভালো হয়েছে শুনলাম, চটপট দাও, আমি আবার বাজার ফেলে এসেছি!

দাদুর তবু চটপট করার তাড়া নেই।—বাজার করতে গিয়ে শুনলি লেখা ভালো হয়েছে?

—নাঃ, বড্ড বাজে বকো তুমি, বিকেলে ভালো খাবার ইচ্ছে থাকলে জলদি দাও—সরকার বাড়ির ছোট কুমারী আসছেন মনে আছে তো?

ম্যাগাজিন ক'টা হাতে পেয়েই আবার ছুটল।

বিকেল চারটের দু'মিনিট আগে সরকার বাড়ির তিনটে গাড়ির মধ্যে মাঝারি গাড়িটা দাদুর বাড়ির দরজায়। দূর্বা নিচেই অপেক্ষা করছিল। হাসিমুখে এগিয়ে এলো। গাড়ি থেকে নেমে রমলা আড়চোখে ওর মুখখানা একবার দেখে নিয়ে চাপা গলায় পুরুষালি মন্তব্য করল, দ্যাটস লাইক এ গুড গার্ল।

আজ দূর্বাই তাকে জড়িয়ে ধরে দোতলায় নিয়ে এলো। দাদুও সহাস্য অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত।—আয় আয়, আজ কি দিন আমার—একসঙ্গে দু'দুটো অপ্সরা আমার ঘরে। তা কি নাম যেন নতুনটির?

রমলা হেসে জবাব দিল, রমলা। নতুনটি বলছ কেন মাস্টারদাদু, তুমি বাড়িতে আমাকে দেখনি?

—বাড়িতে দেখা আর এই নিরিবিলিতে দেখা কি এক! দেখেই মুণ্ডু ঘুরে গেছে। তা হ্যাঁরে মেয়ে, খুব তো নেচে বেড়াস শুনলাম, তা এখানে একটু কোমর বেঁকিয়ে টেকিয়ে নাচ দেখাবি না?

হেসে উঠে রমলা তক্ষুনি তার দু'কাঁধে দু'হাত তুলে দিয়ে ঢং করে কোমর দুলিয়ে নাচ শুরু করে দিল।

—বাপরে বাপ, ছাড়—ছাড়—এখন দেখছি নিজেকে যত বুড়ো ভেবেছিলাম ততো বুড়ো নই!

শুধু রমলা নয়, দূর্বাও হেসে সারা। খাটের ওপর ধুপ করে বসে পড়ে রমলা বলল, মাস্টারদাদু তুমি এত ওয়ান্ডারফুল আগে জানতাম না।

দাদুর পরিতুষ্ট মুখ।—সৌরভ কি যত্রতত্র বিলোতে আছে রে! আঙুল নেড়ে দূর্বাকে দেখালো, এ আর কি, ও ছুঁড়ীর সঙ্গে কত রকমের রস হয়।

দূর্বা মুখঝামটা দিল, থাক, ঘাটে যাবার আগে পর্যন্ত তোমার রস যাবে না—রমলা যেজন্যে এসেছে সেদিকে মন দাও।

বিরক্ত মুখ করে রমলা তক্ষুণি সমস্যার কথাটা জানাল।— কিন্তু মা তো আতি-পাতি করে খুঁজেও আমার ঠিকুজি-মিকুজি বার করতে পারল না—পারবে কি করে, কেবল নিজের আর ছোট ছেলেরটাই সব। তাহলে কি দেখবে?

দাদু হাত বাড়ালো।—হাতটাই দে দেখি।

—তুমি হাতও দেখো তাহলে? রমলা খুশি মুখে বাঁ হাত বাড়িয়ে দিল।

—হাতের মতো হাত হলে দেখি। দাদু মনোযোগ দিয়ে হাতের চেটো থেকে কনুই পর্যন্ত বেশ করে টিপে টিপে উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগল। দুষ্টুমি হচ্ছে বুঝে রমলা চোখ পাকালো, এ কি-রকম দেখা?

দাদু তেমনি হাত টেপায় মগ্ন, কেন, এ-রকম করে দেখে দেখে ও ছুঁড়ীর দুটো হাতই আমি তুলো করে দিয়েছি। তা তোরও বেশ হাত—

দূর্বা ধমকে উঠল, দেখো দাদু, সবসময় ইয়ারকি ভালো লাগে না। তুমি হাত দেখে বলো ওর প্রেমিক কোথায় ডুব মেরে আছে।

এমন করে বলল যাতে দাদু ধরেই নেয়, প্রেমিক একজন আছেই, এবং কিছুদিন সে নিপাত্তা। দাদুও সত্যি সেই গোছেরই কিছু ভেবে নিল। এবারের ছদ্ম মনোযোগ হাতের রেখার দিকে। নিবিষ্ট একটু। বললেন, ডুব মেরে আর ক'দিন থাকবে, দরজায় ঘা পড়ল বলে।

দূর্বা টুপ করে ঝুঁকে দাদুর হাতঘড়িতে সময় দেখে নিল। চারটে বাইশ। ওদিকে রমলা উৎসুক।—দেখতে কেমন হবে বলো।

দূর্বা ফড়ফড় করে বলে উঠল, দেখতে কেমন হবে তুমি নিজে জানো না? যেমন তেমন হলে মন ওঠার মেয়ে তুমি?

দাদুও সঙ্গে সঙ্গে সূতো পেয়ে গেল। রমলা দূর্বার কথায় কান দিয়ে সাগ্রহে দাদুর দিকে চেয়ে আছে। দাদু ঘটা করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল।—এই জন্যেই আমাতে তোর মন উঠল না, কার্তিক কার্তিক—স্রেফ একখানা কার্তিক। করেছিস কি রে, আগলে রাখতে পারবি তো?

দূর্বার আর একটু সময় কাটানোর তাগিদ।—ওর বিয়ের কত দেরি দেখো তো!

সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাশা সফল। হাত টেনে নিয়ে রমলা ওকে ধমকে উঠল, এই মেয়ে, বিয়ে নিয়ে তোকে কে মাথা ঘামাতে বলেছে?

মুখ কাঁচুমাচু করে দূর্বা বলল, দাদুর হাত দেখাও তো একেবারে অব্যর্থ—থাক দাদু, ও-সব বলতে হবে না। তোয়াজের চেষ্টা, আচ্ছা, ঠিকুজিটা কোথায় যেতে পারে, মাসিমাকে বলে আমিও একদিন খুঁজে দেখব।

—হুঃ! রমলা ঠোঁট বাঁকালো।—ঠিকুজি খোঁজার জন্য তোর ওই বিচ্ছু দুলাল তোকে ছেড়ে দেবে!

—যা-ই বলো, বিজু তোমাকে মনে মনে কিন্তু বেশ ভালোবাসে...।

—ছাড় তো, ও-সব কথা এখন ভালো লাগে না।

সিঁড়িতে মৃদু পায়ের শব্দ। দূর্বার বুক টিপ-টিপ। পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে বসন্ত রায়ের ফুটফুটে মুখখানা ওরই আগে চোখে পড়ল। দোতালায় উঠে দরজা পর্যন্ত এসে ঘরে আর এক অচেনা মুখ দেখে দাঁড়িয়ে গেল।

তাকে দেখেই দাদু বলে উঠল, কি রে, ঘরে দু'দুটো ডবকা ছুঁড়ী নিয়ে বসে আছি, তুই আবার এর মধ্যে এসে হাজির হলি!

রমলার চোখে হঠাৎ পলক পড়ে না। দরজা থেকে সেই চোখ-জোড়া দূর্বার দিকে ফিরতে তার অপ্রস্তুত গেছের মুখ। উঠে দু'পা দরজার দিকে এগিয়ে বেশ নরম করে ডাকল, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ভিতরে এসো...আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

অনুমতি পেয়ে বসন্ত রায় সপ্রতিভ মুখে ঘরে ঢুকল। ওদিকে রমলা কানে যেটুকু শুনল তাতেই তার দু'চক্ষু স্থির। একবার ওই ছেলের দিকে তাকায় আর একবার দূর্বার দিকে।

—এই আমার বন্ধু রমলা সরকার...নামটা শোনা থাকার কথা, নাচের জন্য চারদিকে নাম-ডাক। দূর্বা রমলার দিকে ফিরল, আর এর নামও তোমার কাছে নতুন না লাগতে পারে—বসন্ত রায়, লেখক—কবিও।

বসন্ত রায় দু'হাত জোড় করে সবিনয়ে নমস্কার জানালো। রমলার এখনো পলক পড়ে না। বার দুই মাথা নেড়ে নমস্কারের জবাব দিল।

দূর্বা নিজের চেয়ারটা বসন্তকে দেখিয়ে বলল, বোসো। নিজে রমলার পাশে খাটে বসল। আপ্যায়ন দেখে দাদুর কি-রকম লাগছে। কিন্তু দূর্বা তার দিকে তাকাচ্ছেও না। গলার স্বরে একটু উৎসাহ মিশিয়ে রমলাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি বসন্তর গল্প বা কবিতা কিছু পড়েছ?

রমলার চোখে মুখে আফসোস একটু। মাথা নাড়ল, পড়েনি।

—আচ্ছা, আমি তোমাকে দেব'খন। বসন্তর দিকে তাকাল।—তোমার এবারের লেখা গল্প কবিতা সবই পড়েছি।...ভালোই লেগেছে, কিন্তু এখনো একটু স্বপ্ন-দেখা ভাব থেকে গেছে।

বসন্ত রায়ের বিগলিত মুখ, কিন্তু ত্রুটি সরাসরি মেনেও নিতে পারছে না। বলল, যতটা সম্ভব বাস্তব ঘেঁষেই তো লিখেছি...গল্পের কথা বলছ, না কবিতার!

—দু'য়েরই। তবে কবিতায় বেশি। অত খিদের মুখে ঘন ছোলার ডাল আর গরম রুটি এনেছ কেন—গলায় আটকে যাবে না?

চোখ গোল-গোল করে দাদু একবার এর দিকে ফিরছে একবার ওর দিকে। সকালে ম্যাগাজিনগুলো নিয়ে যাওয়াও মনে পড়েছে। ও-দিকে দূর্বার দিকে চেয়ে রমলা যেন অভাবিত কিছু আবিষ্কার করেছে। আবার কবি-লেখকের দিক থেকে ও মুখ ফেরাতে পারছে না।

দূর্বা আবার বলল, অবশ্য আমার মতটাই সব নয়, রোসো আগে রমলাকে পড়াই—আমার প্রবল বুদ্ধি বিবেচনা ওর, ও কি বলে দেখি, তার আগে কিছু বলব না।

না পড়েই রমলা ফুল মার্কস দিয়ে বসে আছে মনে হল। বসন্তর মুখে খুশির হাসি দেখে ফুল মার্কসও ছাড়িয়ে যাচ্ছে বোধহয়।

দূর্বা উঠে দাঁড়াল।—এবারে চা আর খাবারের ব্যবস্থা করি—দাদু, হারুকে থাকতে বলে দিয়েছিলাম, আছে তো?

দাদু ওর দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখে নির্বাক একটু মিনতি পেশ করল

শুধু। অর্থাৎ, দোহাই দাদু, বেফাঁস কিছু বলে বসে আমাকে ডুবিও না। চলে গেল।

খাবার করাই ছিল। দু'বোনে হাত লাগিয়ে চটপট কিছু লুচি ভেজে ফেলা। ময়দাও মেখে রেডি করা ছিল। মিনিট পনেরর মধ্যে হয়ে গেল। হারুর হাতে ঢাকা বাসনে সব পাঠিয়ে দিয়ে শেফালিকে চায়ের জল চড়াতে বলে দূর্বা আবার এ-বাড়ির দোতলায়। তার হাতে সাপ্তাহিক আর মাসিকপত্র ক'টা।

গম্ভীর মুখে দাদু কি-কি করা হয়েছে দেখল। দূর্বা খাবার সাজাতে ব্যস্ত। বসন্ত আর রমলা গল্প করছে। খাবার দেখার ছলে দাদু দূর্বাকেই দেখছে। বলল, আমার সঙ্গে ঘর করে তোরও অঙ্কের মাথা খাসা খুলেছে।

দূর্বা সচকিত হয়ে ওদের দিকে তাকাল একবার। না শোনার কথা নয়। দাদু স্বাভাবিকভাবেই বলেছে। ওরাও এ-দিকে তাকাল। কিন্তু দাদুর দৃষ্টি খাবার দেখায় মগ্ন। ওরা ও ব্যাপারেই প্রশংসার কিছু ধরে নিল। বসন্ত রায় একসঙ্গে অনেক কথা বলতে পারে না। লেখকরা গল্পের প্লট কি করে পায় রমলার জানার কৌতূহল। মুগ্ধ হয়ে শুনছে। দাদুকে একটা ভ্রূকুটি-শাসনে ঘায়েল করে দূর্বা খাবার সাজানো শেষ করল।

খাবার ভালো না লাগার কথা নয় রমলার। কম কিছু খেল না। কিন্তু মন বেশি অন্য দিকে। খাওয়ার ফাঁকে আর গল্পের ফাঁকে দূর্বা আর বসন্তকে দেখছে। দূর্বার মনে হল, মাছভাজা চিবুতে চিবুতে দুই চোখে থেকে থেকে ওর মাথাটাও চিবিয়ে নিচ্ছে।

ঠাণ্ডা দু'চোখ বসন্ত রায়ের মুখের ওপর স্থির রেখে দূর্বা জিগ্যেস করল, তোমার উপন্যাস শুরু করছ কবে?

খুশিতে খাবি খাবার দাখিল বসন্তর। ওর ধারণা, মোটামুটি ভালো চাকরি পাবার পর দূর্বার এই পরিবর্তন। জবাব দিল, ইয়ে...এ-দিকে আর একটু নাম-টাম করে নিই—

দূর্বা তার মুখের খাবার অল্প অল্প চিবুচ্ছে, কিন্তু সেই রকমই চেয়ে আছে। অর্থাৎ জবাব শুনে একটা ধমক লাগানোর ইচ্ছে। কিন্তু গলা একটুও না চড়িয়ে বলল, লোকে নাম করে উপন্যাস লেখে না, লিখে নাম করে।

অকাট্য যুক্তি। বসন্ত রায় সাগ্রহে সায় দিল, তা তো বটেই, ঠিক আছে, ভেবে-চিন্তে একটা শুরু করে দেব।...তোমার সঙ্গেও একটু আলোচনা করে নেব।

—হুঃ, আমার কত সময়!

খাওয়ার পাট শেষ হতেই রমলা উঠে পড়ল। যাবে। মুখখানা সদয় বা প্রসন্ন নয় একটুও। রমলা সঙ্গে সঙ্গে বলল, চলো, বিজুকে কথা দিয়েছিলাম বিকেলে যখন হোক একবার যাব—

রমলার চাউনিও খরখরে। এক-হাত নেবার সুযোগটা যেন সেধে এলো। বলল, চল—

দূর্বা ম্যাগাজিন ক'টা তার হাতে তুলে দিয়ে বলল, এগুলো নিয়ে যাও, পড়া হলে খবরদার বাড়িয়ে প্রশংসা করবে না, এমনিতেই ভালো লেখে বলে অহংকার, ঠিক যা মনে হয় তাই বলবে। বসন্তর দিকে ফিরল, তোমার বাড়ির ফোন নম্বরটা রমলাকে দিয়ে দাও, যা-বলার ও নিজেই বলবে, আমার মুখে শুনলে তোমার আবার সন্দেহ থেকে যাবে।

দাদুর টেবিল থেকে কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসন্ত রায় তক্ষুনি ফোন নম্বর লিখে

রমলার হাতে দিয়ে কৃতার্থ। বলল, তা'বলে আপনার বন্ধুর মন রাখার জন্য যেন সমালোচনার ব্যাপারে বেশি নির্দয় হবেন না।

রমলা অসহিষ্ণু জবাব দিয়ে বসল, আমি কারো মন রাখা-রাখির ধার ধারি না।

দূর্বা সে-কথায় কান না দিয়ে বসন্তকে বলল, তুমিও যাবে তো চলো, নামিয়ে দিয়ে যাই। রমলার দিকে ফিরল, কাছেই, গাড়িতে দু'মিনিটের পথ—

তকমা পরা অবাঙালী ড্রাইভার পিছনের দরজা খুলে দিতে দূর্বা বসন্তকে বলল, তুমি তো ও-দিক থেকেই নামবে—ওঠো।

যেন ওরই গাড়ি। বসন্ত তাড়াতাড়ি উঠে কোণের দিক ঘেঁষে বসল। দূর্বা তারপর রমলাকে বলল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ওঠো— ?

রমলা উঠে বসন্তর পাশে বসতে দূর্বা এদিকের জানালার ধারে বসে দরজা বন্ধ করল। সামনের আসনে ড্রাইভার একলা। পিছনে তিনজনে যে-ভাবেই বসুক গায়ে গায়ে ঠেকা-ঠেকি একটু হবেই।

গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিগলিত বসন্ত রায় বলল, আপনার নাচের এত নাম, কিন্তু আমার দেখা হয়ে ওঠেনি...

রমলা তার দিকে ফিরল একটু। ফলে কাঁধে কাঁধ ঠেকল।—কোথায় দেখবেন, ফাংশনে না বাড়িতে?

বসন্ত রায় এখনো জানে না দূর্বার চাকরিটা ওদের বাড়িতেই। তাই কোথায় দেখা উচিত সেটুকু বুদ্ধি বা বিবেচনা তার আছে। জবাব দিল, ফাংশনের অ্যাটমসফিয়ার অন্যরকম, সেখানে দেখতেই ভালো লাগবে—

—আচ্ছা, খবর দেব।

অ্যাডভোকেট বাড়ির সামনে গাড়িটা দাঁড়াতে বসন্ত রায় নামল। মস্ত বাড়িটা দেখে আর সামনের গ্যারাজে বড়সড় একখানা গাড়িও দেখে রমলা আর একটু গম্ভীর।

কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ ইত্যাদির পরে বসন্ত রায় সরে দাঁড়াতে গাড়ি আবার ছুটল। রমলা মাঝের ফারাক বাড়িয়ে ও-দিকে সরে বসল। দূর্বা সেই ফাঁকে আড়চোখে তার থমথমে মুখখানা দেখে নিল।

—বাড়িটা ওদের নিজের?

—হ্যাঁ।

—গাড়ি?

—বসন্তর বাবার। তিনি হাইকোর্টের মস্ত অ্যাডভোকেট।

—বাড়িতে আর কে আছে?

—ওর বাবা-মা, আর একটা ছোট বোন।

—পড়াশুনা কদ্দূর করেছে?

—কে বসন্ত?

জবাবে কঠিন চোখে রমলা ওর দিকে তাকাল।

দূর্বা তাড়াতাড়ি বলল, বি. এ. পাশ, বাংলায় অনার্স ছিল...

—শুধু লেখে না আর কিছু করে?

—আর আবার কি করবে, বাপের এক ছেলে, অবস্থা ভালো, ওর বাবা মাও চান

ছেলে লিখে নাম করুক—দু'নৌকোয় পা দিয়ে তো সে-রকম বড় হওয়া যায় না।

চুপচাপ একটু। তারপরেই ফেটে পড়ল, তুই একটা বেইমান, তুই একটা পাজী, তুই একটা ছুঁচো, বিজুটা ও-ভাবে কলে না পড়ে গেলে আজই তোকে আমি ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে তাড়াতাম—বুঝলি?

দূর্বা মনে মনে অন্তত হাসতে পারত, কিন্তু ড্রাইভার তেমন বাংলা না বুঝলেও ছোট মেমসায়েবের মেজাজ টের পাচ্ছে। ওকে সচেতন করার জন্যেই দূর্বা ড্রাইভারের দিকে তাকাল একবার। তারপর মৃদুগলায় বিস্ময় ঝরালো।—হল কি হঠাৎ? কি আবোল তাবোল বলছ?

—আবোল তাবোল বলছি? তুই এতবড় শয়তান! প্রেম কাকে বলে জানিস না? ভাজা মাছখানা উল্টে খেতে জানিস না? আমাকে বললে আমি তোর কাছ থেকে ওকে কেড়ে নিয়ে গিলে খেতাম?

এতক্ষণে যেন বোঝা গেল ব্যাপারটা। বিস্ময়ের বদলে দূর্বা মুখে বিষাদের ছায়া টেনে আনতে চেষ্টা করল। চোখের ইশারায় ড্রাইভারকে দেখিয়ে মৃদু গলায় বলল, আস্তে, কি ভাবছে ঠিক নেই। ...তুমি এমন একটা ভুল করবে ভাবিনি।

—ভুল? কে শুনছে না শুনছে এই মেজাজে রমলা তার ধার ধারে না।—আমাকে কচি খুকী পেয়েছিস? আমার নিজের চোখ নেই? কান নেই?

—তোমার মাথার ঠিক নেই, সব জানলে আমাকে এ-রকম করে বলতে তোমার মায়া হত।

এবারে থমকাতে হল।—কেন, কি জানার আছে?

গম্ভীর নিচু গলায় দূর্বা বলল, দু'মাস বাদে আজ হঠাৎ এসে গেল তাই, নইলে প্রেম দূরে থাক, আমি ওর ধারে-কাছেও ঘেঁষি না। আমার কাছে ও-বাড়ির দরজা বরাবরকার মতো বন্ধ।

এবারে উৎসুক একটু।—কেন?

—আমরা কত গরিব তোমার ধারণা নেই। ওর বাবা মায়ের ইচ্ছে বড় ঘরের মেয়ে এনে ধুমধাম করে একমাত্র ছেলের বিয়ে দেবে। ছেলেকে তাঁরা শাসিয়েছেন, তাঁদের অবাধ্য হলে বাড়িতে ঠাঁই হবে না। তাঁদের আরো রাগ কারণ আমার সম্পর্কে তাঁদের কাছে কুচ্ছিৎ উড়ো চিঠি গেছে। কিন্তু তবু ছেলেকে বোঝাতে না পেরে—

এখানে থেমে গেল। কারণ এবারে যা বলতে যাচ্ছে সেটুকু সত্যি নয়।—না থাক, তুমি আবার বলে-টলে ফেললে মুশকিলে পড়ে যাব...।

—আমি আবার কাকে কি বলতে যাব! ছেলেকে বোঝাতে না পেরে কি হয়েছে?

—কক্ষনো কাউকে বলবে না?

—আঃ, তুই আমাকে বিশ্বাস করিস না?

দূর্বা এবারে যা বলল সে-রকমটা কোনো ছবিতে দেখেছে কি গল্পে পড়েছে মনে নেই। জানাল, ওই মা শেষে ছেলেকে গোপন করে তার কাছে ভিক্ষে চাইতে এসেছিল। তাদের ঘর যেন ও ভেঙে না দেয়। একমাত্র ছেলের এতবড় সর্বনাশ যেন না করে। দূর্বা ভিক্ষে দিয়েছে। যে দাদুর থেকে আপনার আর কেউ নেই, তার নাম করে শপথ করেছে, ওই ছেলের কাছ থেকে সে দূরে সরে থাকবে—এর আর নড়চড় হবে না।

রমলা বিমূঢ় খানিকক্ষণ।—সত্যি সত্যি সরে থাকতে পারবি?

—পেরেছি।

—তুই ওকে ভালোবাসিস না?

—আমাদের মতো গরিবের ও-সব বিলাস মানায় না।

রমলা ওর দিকে চেয়ে ওপরের দাঁতে করে নিচের ঠোঁটে আঁচড় কাটতে কাটতে ভাবছে কিছু।—ধর ওই বসন্ত যদি আর কারো প্রেমে পড়ে যায় বা সে-রকম কিছু হয়, তুই সহ্য করতে পারবি?

—আমি বেঁচে যাব। ওর পার্টস আছে, সত্যি হয়তো একদিন মস্ত লেখক হয়ে উঠবে। কিন্তু আমার জন্য এখনো সে-ভাবে লেখায় মন দিতে পারছে না। তুমি যা বললে তা যদি হয় আমি সব থেকে খুশি হব। তখন ঠাণ্ডা মাথায় লেখায় মন দিতে পারবে।

রমলার হাব-ভাবে আর রাগের চিহ্নমাত্র নেই। দাঁতে করে ঠোঁটে আঁচড় কেটেই চলেছে, আর থেকে থেকে চোখ বেঁকিয়ে ওকে দেখছে। হঠাৎ ওর দিকে ঘুরে বসে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, তোর দাদু সত্যি কি-রকম জ্যোতিষী রে?

—দারুণ দারুণ! দূর্বার চোখে মুখে এবারে অকৃত্রিম উৎসাহ। —মুখ ফুটে একবার যা বলে একেবারে অব্যর্থ, তার আর নড়চড় হয় না।

রমলার ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসি ঝুলছে। গা ছেড়ে এবারে পিছনের গদিতে মাথা নাড়ল।

দাদুকে দিয়ে কায়দা করে যা বলানো হয়েছে দূর্বার অন্তত ভোলার কথা নয়। দাদু বলেছে, রমলার প্রেমিক মানুষ ডুব মেরে আর ক'দিন থাকবে, দরজায় ঘা পড়ল বলে। আর দূর্বার কাছ থেকে আভাস পেয়ে দাদু কিচ্ছু না জেনেই বলেছে, ঘা দিতে আসছে যে সে একখানা কার্তিক—তাকে আগলে রাখা সহজ হবে কিনা দাদুর সেই দুশ্চিন্তা।

দূর্বা নিশ্চিন্ত। দাদুর ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাওয়ার সূচনা দেখছে রমলা সরকার।

## সাত

এরপর ধৈর্য ধরে দিন-কতক দূর্বাকে একটু ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। পরদিনের মধ্যেই রমলা বসন্তর গল্প দুটো আর কবিতা তিনটে পড়ে ফেলেছে। তার খুব একটা ভালো লাগেনি বোঝা গেছে। দূর্বাকে বলেছে, তোর এত বড় লেখকের গল্পে আর কবিতায়ও এত টাকাকড়ি আর দরাদরির হিসেব কেন?

দূর্বা ঠাণ্ডা জাবাব দিয়েছে, গরিবের মেয়ের মুখ চেয়ে লিখেছে, তোমার পছন্দ না হয় বলে দাও—

—বলবই তো, আমি কারো পরোয়া করি!

কি বলেছে দূর্বা জানে না। ওর কাঁধে প্রেমের ভূত চাপিয়ে দিতে পেরে নিশ্চিন্ত। দুপুরের নিরিবিলিতে আর ওর ডাক পড়ে না, ঘণ্টাখানেক ঘণ্টা-দেড়েক ফোন কানে নিয়ে বসে থাকতে দেখে। বিকেল চারটে না বাজতে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়। দূর্বা মুখ দেখেই বুঝতে পারে, লেকে বা আর কোথাও অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

আবার একদিন হেসে বলল, তোর লেখকটা হাঁদা নাকি রে—যা বলি তাই সায় দেয়।

দূর্বা গম্ভীর।—আমার লেখক—আমার লেখক কোরো না...তা তোমার মতামতটা কি কম কিছু নাকি?

রমলা এখন অকারণ খুশিতে ওকে জাপটে জাপটে ধরে। সেদিন তো হেসেই বাঁচে না।—লেখক যে তার উপন্যাসের প্লট ঠিক করে ফেলেছে রে! নায়িকা একজন অ্যারিস্টোক্রাট্ ড্যান্সার। কি-রকম হবে বল্ তো?

দূর্বা নির্দ্বিধায় জবাব দিয়েছে, তুমি সাহায্য করলে রিয়েল হবে আর সত্যিকারের ভালো হবে।

—সত্যি বলছিস? আনন্দে হাবুডুবু।

—আমার মিথ্যে বলে লাভ কি। আমি তো জানি সে-ভাবে চালাবার কেউ থাকলে ও একদিন নাম করবে।

ওদের প্রেম যত জমাট বাঁধছে দূর্বা ততো স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে। বিকৃত হামলার হাত থেকে বেঁচেছে। এই প্রেমের ব্যাপার নিয়ে এখন ওর কাছেও বেশি ঘেঁষে না। সম্ভবত চক্ষুলজ্জায়। কিন্তু মাসখানেকের মধ্যে রণিত দত্তই হঠাৎ একদিন দূর্বাকে জিগ্যেস করল, আচ্ছা, রমলা নাকি কে একটা ছেলের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করছে যার জন্য বড়দি খুব অসন্তুষ্ট...আর সেই ছেলেকে নাকি আপনি চেনেন?

দূর্বা থমকালো একটু।—বড়দি জানলেন কি করে?

—পর পর দুই রোববার সেই ছেলেকে এখানে নিজের ঘরে এনে সমস্ত দুপুর ধরে গল্প-সল্প করেছে, নাচ দেখিয়েছে।...স্কুলের কিছু মেয়ে নিয়ে একদিন লেকে বেড়াতে গেছল, সেখানেও নিরিবিলি কোনো গাছতলায় কি-রকম ভাবে ওদের বসে থাকতে দেখেছে। এই নিয়ে বোনের সঙ্গে বড়দির ঝগড়া হতে ও নাকি সাফ বলে দিয়েছে, কি-রকম ছেলের সঙ্গে মিশছে আপনার কাছ থেকে জেনে নিতে পারে।

একটু চুপ করে থেকে দূর্বা বলল, একদিন দাদুর বাড়িতে রমলার সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল, ভদ্রলোক আমাদের এলাকার লোক, তার সম্পর্কে খারাপ কিছু শুনিনি।...তবে রমলা কতটা মিশছে না মিশছে আমি জানি না, জানার দরকারও নেই।

রণিত দত্ত বলল, মুশকিল হয়েছে বড়দি এ-নিয়ে মাসিমাকেও যা-তা বলেছে।

দূর্বা এ নিয়ে আর কথা বাড়াল না। বড়দি এ-ব্যাপারে ওকে একটি কথাও বলেনি। কোনো কথাই প্রায় বলে না। কিন্তু হাবভাবে তার আচরণ যে সদয় নয় এটুকু বুঝতে পারে।

পরের দু'টো মাসই বিজুর খুব ভালো গেল না। এই দু'মাসে দু'বার রক্ত দিতে হল। শরীর খারাপ হলে বিজু আগে থাকতে বুঝতে পারে। দূর্বা ভালো করে বোঝার আগে দু'বারই সে ওকে বলেছে, শরীর ভালো লাগছে না—বড়দাকে খবর দাও।

শুনে প্রথমবারে অন্তত দূর্বা দারুণ ঘাবড়ে গেছল। কিন্তু ছুটে যেতে গিয়েও থমকেছে। সুমতিকে তক্ষুনি পাঠিয়েছে খবর দিতে। শোনামাত্র বড়দা নেমে এসেছে। পালস্ দেখেছে। সমস্ত শরীর পরীক্ষা করেছে। এই বড়দার ওপরেই বিজুর যা-একটু অভিমান, বলেছে, অনেকক্ষণ ধরেই একটু একটু খারাপ লাগছিল—

—তাহলে আগে খবর দিসনি কেন?

—কেন দেব? ঠিক-ঠিক খারাপ হয়েছে শুনলেই তুমি আস—নইলে এ-ঘরে ঢোকো কখনো?

জবাব না দিয়ে বড়দা ঘর থেকে চলে গেল। দু'মিনিটের মধ্যে আবার নেমে এলো। হাতে ছোট্ট কালো ব্যাগ একটা। সেই ব্যাগ খুলে তিন মিনিটের মধ্যে বিজুর ভেন থেকে রক্ত টেনে কাঁচের টিউবে রেখে ছিপি এঁটে ব্যাগ বন্ধ করল। একটি কথাও না বলে নিচে নেমে গাড়ি হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল। এক ঘণ্টার আগেই ফিরল।

তারপর বিজুকে নিয়ে হাসপাতালে। সেখানে ওর জন্য একটা কেবিন ঠিক করাই থাকে। দূর্বাও এসেছে। নির্মলা সরকারও। দূর্বার বুকের তলায় ঠকঠক কাঁপুনি। বিশাখা ব্যানার্জীর তৎপরতায় রক্ত দেওয়া শুরু হতে খুব সময় লাগেনি। খবর পেয়ে বিকেলের মধ্যে বিজুর বাবা এসেছেন, রণিত দত্ত এসেছে, বিজুর বড়দি আর ছোড়দিও এসেছে। ঘরের ভিতরে একবার করে বিজুকে দেখে সকলেই বাইরে এসে বসছে। ঘরে কেবল বড়দা, হাসপাতালের ডাক্তার, রণিত দত্ত আর বিশাখা ব্যানার্জী। অনেকক্ষণ বাদে বড়দা বাইরে এসে দাঁড়াল। পায়চারি করল খানিক। তারপর দূর্বার দিকে চোখ গেল তার। চুপ-চাপ খানিক চেয়ে থেকে কাছে এসে বলল, কিচ্ছু ভয় নেই, ঠিক হয়ে যাবে।

বুকের তলার অনেকক্ষণের একটা জমাট-বাঁধা ত্রাস সরে যেতে লাগল। এই মানুষের আশ্বাসে কত যে জোর এই প্রথম অনুভব করছে। এরা সব বিজুর এ-রকম শরীর খারাপ হওয়া আর রক্ত দেওয়া দেখে অভ্যস্ত বোধহয়। সকলেই বিষণ্ণ বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে দূর্বার মতো কেউ এত ছটফট করছে মনে হয়নি। কিন্তু বড়দা ওর ভিতরের অবস্থা টের পেল কি করে সেটাই আশ্চর্য।

তৃতীয় দিনে বিজুকে বাড়ি ফিরিয়ে আনা হল। রিঅ্যাকশন দেখার জন্য রক্ত দেবার পর দু'দিন ওকে হাসপাতলেই রাখা হয় শুনল। সেই দু'রাত দূর্বাও এখানেই কাটিয়েছে। বরাবর রণিত একা থাকে। বিজুর বায়না এবারে দূর্বাদিও থাকবে। বায়না না করলেও দূর্বা থাকতে চাইত। কিন্তু সকলের মধ্যে দেখা গেল শুধু বড়দি কমলারই সেটা পছন্দ নয়। সে বাধা দিল, দুজনের থাকার কি দরকার—

বিজুর কেবিনের সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। নিখিলেশ সরকার চলে গেছেন। তাঁর গাড়িতে বড়দা আর রমলাও। নির্মলা সরকার আর কমলা সরকারের জন্য অন্য গাড়ি অপেক্ষা করছে। বড়দির কথায় রণিত তক্ষুনি সায় দিল, না, দুজনের থাকার কিচ্ছু দরকার নেই। একজন নার্স তো ঘরে থাকবেই।

দূর্বার হঠাৎ কি-রকম রাগ হয়ে গেল। কিন্তু প্রকাশ করাটা অশোভন হবে জানে। রণিতের দিকে ফিরে বলল, নার্স থাকবে যখন আপনিই চলে যান—আমি আছি—বাড়ি গিয়ে একটা ফোন করে দাদুকে শুধু বলে দেবেন আমার বোনকে ডেকে যেন জানিয়ে দেয়।

বিশাখা ব্যানার্জী চুপচাপ দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিল। এবারে বড়দির দিকে ফিরে সে বলল, বিজু চাইছে যখন, ওরা দুজনেই থেকে গেলে তোমার কি অসুবিধে?

শুনে দূর্বা সত্যিকারের আনন্দ পেল। জবাব না দিয়ে কমলা তার মা-কে শুধু বলল, চলো—

কেবিনের সামনে ঢাকা বারান্দায় বিশাখা ব্যানার্জী একটা ইজিচেয়ার আনিয়ে দিয়েছে। ক্যাবিনে আর একটা ইজিচেয়ার আছে। যে-যেখানে খুশি থাক। বিজুর সমস্ত রাত ওষুধের ঘোরেই কেটে যাবে।

বাড়ি থেকে দুজনের রাতের খাবার আসবে ভেবেছিল দূর্বা। কিন্তু এ-ব্যবস্থাও বিশাখা ব্যানার্জীই করল দেখা গেল।

দু'দিনই সকালে রণিত দত্ত আগে দূর্বাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। বাড়ির লোক আসতে সে নিজে গেছে। তার কথা-মতো দূর্বা খেয়েদেয়ে দুপুরে বিশ্রাম করে বেলা চারটের মধ্যে চলে এসেছে। রণিত দত্ত তার আগেই হাজির।

তাদের কারোই করার কিছু নেই। যেটুকু করার বিশাখা ব্যানার্জীই করছে। ঘুরে ফিরে অনেকবার করে আসে সে। বিজুর সঙ্গে হেসে বেশ ইয়ারকি ঠাট্টাও করে। বিজু বিরক্ত হয় না, মজা পায়। পরদিন সন্ধ্যায় বাড়ির লোক চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে নিজে ওর বিছানা-পত্র টান-টোন করে দিয়ে হেসে বলেছিল, তোর জন্য কত করি আমি, এখনো ভেবে দ্যাখ আমাকে বিয়ে করবি কিনা।

বিজুর রাগ করা দূরে থাক, বেশ মজা পায়। হেসে তক্ষুনি জবাব দিয়েছিল, তোমার মতো কালো কুচ্ছিত ঢেপসিকে আমি বিয়ে করতে গেলাম আর কি!

বিশাখা ব্যানার্জী কালো বটে, কিন্তু কুচ্ছিত তো নয়ই, মোটাও নয়। কালো মুখের শ্রী আর শরীরের আঁট বাঁধুনি বরং চোখে পড়ার মতো। বিশাখা ব্যানার্জীও হেসেই চোখ পাকিয়েছিল—তুই এত বেইমান!

দু'রাতের মধ্যে রণিত দত্তর সঙ্গে দূর্বার কটা কথা হয়েছে হাতে গোনা যায়। কিন্তু ভয়াল ব্যাধি থেকে একটা ছেলেকে টেনে তোলার তাগিদে এই লোকের সঙ্গে একাত্ম বোধটুকু দূর্বার বুকের তলায় অনেকবার মুখর হয়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয়বার আবার রক্ত দেওয়া হয়েছে পরের মাসের মাঝামাঝি সময়ে। এবারও উনিশ-বিশ সেই একই ব্যাপার। দূর্বার ভীষণ খারাপ লেগেছে বটে, কিন্তু প্রথমবারের মতো অতটা কাঠ হয়ে যায়নি। রণিত দত্ত কতটা পারে জানে না। কিন্তু একটা অমোঘ কিছু মেনে নেবার মতো নিরাসক্ত হতে পারা যে কত কঠিন এটুকু অনুভব করেছে। রণিত বলেছিল, এমনি রক্তদেবার ফারাক কমতে কমতে এক সময় আর করার কিছু থাকে না। দূর্বার অন্তরাত্মা হাহাকার করে উঠেছিল, চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করেছিল, তা হবে না, কক্ষনো হবে না—হতে পারে না!

রাত এগারোটা হবে। বিজুর কেবিনে সবুজ আলো জ্বলছে। বিজু ঘুমে অচেতন। রক্ত দেবার পর গতকাল থেকে আজ অনেক ভালো। আশা করা যায়, গতবারের মতো আগামী কালই ওকে নিয়ে ঘরে ফেরা যাবে। নার্স বিজুর বেডের পাশে একটা চেয়ার টেনে বোনা নিয়ে বসেছে। বাইরের লম্বা বারান্দার প্রায় সব আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেবল দু'মাথায় দুটো জ্বলছে। ফলে বারান্দাটা অন্ধকার নয় বলা যেতে পারে শুধু।

দূর্বা পায়ে পায়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো। প্রথমে মনে হল, বারান্দায় ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে রণিত দত্ত ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরে ফেরার আগেই সাড়া পেল, বলবেন কিছু?

—না। এমনি এসেছিলাম...আপনার ঘুম পাচ্ছে না?

হেসে সোজা হয়ে বসল।—এখানে এসে কেউ ঘুমোতে পারে? তার থেকে আপনি এ-চেয়ারটায় এসে বসুন, খানিকক্ষণ গল্প করা যাক।

—না না, আপনাকে উঠতে হবে না। দূর্বা এগিয়ে গিয়ে রেলিং-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

রণিত বলল, আপনি কিন্তু সত্যি মিছিমিছি কষ্ট করছেন, বিজুর জন্য রাতে ঘরে থাকার কারো দরকার হয় না। তাছাড়া বউদি তো আছেই, তার হেপাজতে এনে ফেলতে পারলেই নিশ্চিন্ত।

মৃদু গলায় দূর্বা জবাব দিল, বিজু তো চায় থাকি।

—তা চায় অবশ্য। হাসল।—অথচ আশ্চর্য দেখুন, আমরা দুজনে ওর কেউ না, অথচ শুধু আমাদের দুজনকেই চায়।

দূর্বা কিছু বলল না। লজ্জাও পেল না। এই ছেলেকে উপলক্ষ করে সেই একাত্মতাবোধটুকু আরো নিবিড়।

রণিত দত্ত অস্বস্তি বোধ করছে।—কিন্তু আপনি দাঁড়িয়েই থাকবেন?

—এ-ই ভালো লাগছে। আপনি ব্যস্ত হবেন না। একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ সে-ও হাসল একটু। বলল, বড়দি কিন্তু চান না রাতে আমি এখানে থাকি...

এবারে অবশ্য রাতে থাকার ব্যাপারে কমলা সরকার ওকে কিছু বলেনি। কিন্তু এবারে অর্থাৎ আজই বিকেলে রমলা বসন্ত রায়কে সঙ্গে করে ভাইকে দেখতে এসেছিল। তার সমস্ত মুখ তখন রাগে থমথম করছিল। আর মাঝে মাঝে উষ্ণ চোখে দূর্বাকে দেখছিল।

সোজা ওর মুখের দিকে চেয়ে রণিত দত্ত হাসতে লাগল। বলল, বড়দির নীতির চোখ যে, আপনি থাকলে আমার যে বেশ ভালো লাগে এটুকু বুঝেছে।

বড়দির নীতির চোখ শুনেই ভেতরটা চিড়বিড় করে উঠেছিল দূর্বার। কিন্তু পরেরটুকু কানে যেতেই মুখে লালের ছোপ। অথচ এমন অনায়াসে বলল যে লজ্জা পেতেও লজ্জা। চোখে চোখ রেখে ওরও সহজ হবার চেষ্টা।

তারপরেই সচকিত একটু। বিশাখা ব্যানার্জী আসছে। রাতে শুতে যাবার আগে বিজুকে একবার দেখে যাবে জানা কথাই। কিন্তু দূর্বার খেয়াল ছিল না। কালো মুখে মৃদু হাসি। নিঃশব্দে বিজুর কেবিনে ঢুকে গেল। দু'মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে ওদের কাছে একটু দাঁড়াল।—কি গল্প হচ্ছে?

রণিত জবাব দিল, এমনি কথা কইছিলাম, তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোওগে যাও—

বিশাখা ব্যানার্জী সুন্দর করে ভুরু কোঁচকালো একটু।—আমি থাকলে এমনি কথা কও'ার অসুবিধে হচ্ছে বুঝি?

হাসতে হাসতে চলে গেল। এটা হাসপাতাল। কেবিনে এমন একজন রোগী। এ-ধরনের হাসি কৌতুক এখানে সাজে না। তবু দূর্বা অস্বীকার করতে পারবে না তার ভালো লাগছে। বিশাখাদি যেন গুমোট বাতাস আরো কিছুটা হালকা করে দিয়ে গেল।

সে ও-দিকের বাঁকে আড়াল নিতে দূর্বা ভিতরে ভিতরে আবার একটু নাড়াচাড়া খেল। ইজিচেয়ারের মানুষটা আত্মবিস্মৃতের মতো তার দিকে চেয়ে আছে।

অন্য প্রসঙ্গে ফেরার তাগিদে দূর্বা বলল, একটা কথা ভেবে আমার খুব অবাক লাগে...

রণিত আত্মস্থ একটু।—কি?

—এই বড়দা আর বিশাখাদির ব্যাপারটা। আপনার মতে তো বড়দার মতো এমন মানুষ হয় না, আর এ-দিকে বিজুর জন্য বিশাখাদিও কত করেন—এ-সময় বড়দা পর্যন্ত তাঁর ওপর সব থেকে বেশি নির্ভর করেন। অথচ এঁদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল কেন?

রণিত সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, কালের হাওয়ায় ছাড়াছাড়ির বিষ ঢুকেছে, তাই হল।

দূর্বা জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে রইল।

রণিত নিঃসংকোচে বলল, বিশাখা বউদির হাসপাতালের চাকরি রেখেই নামকরা ডাক্তারের বউ হবে এই ইচ্ছে বরাবর ছিল, এখনো আছে। বড়দার খুব বড় হবার সম্ভাবনা কম ছিল না, আপনাকে তো বলেছি। তাকে বিশাখা বউদি অনায়াসেই বশ করতে পেরেছিল। বড়দা আমাকে নিজে বলেছে, বিয়ের আগে তার সঙ্গে তিন চার দিন এক ঘরে রাত কাটিয়েছে।

অল্প আলোয় দূর্বার টকটকে লাল মুখ দৃষ্টি এড়ালো না রণিতের। একটু হেসে আবার বলে গেল, বিয়ের পরেও খারাপ কাটছিল না। সুজন মারা যাবার পর থেকেই গণ্ডগোলের শুরু। বড়দার প্র্যাকটিসে মন নেই, এম. ডি. দিল না, মদের মাত্রা বাড়ছে। আর বিশাখা বউদিরও মেজাজ চড়ছে। বিজুর অসুখ ধরা পড়তেই বিশাখা বউদির বড় ডাক্তারের বউ হবার আশায়ও জলাঞ্জলি। বড়দা প্র্যাকটিস একেবারে ছেড়েই দিল। মদের মাত্রা আরো চড়ল। তার সঙ্গে ওই সব নোঙরা বই এনে পড়া। কিন্তু বড়দার একরোখা মেজাজ। বউদির সঙ্গে ঠোকাঠুকি বেড়েই চলল—কিছু বলতে গেলে বড়দা যা-তা বলে দেয়। ব্যস, তারপর নিঃশব্দে ডিভোর্স দুজনের।

একটু চুপ করে থেকে রণিত আবার বলল, এখন আবার আর একজন নামী ডাক্তারের সঙ্গে প্রেম-পর্ব চলছে বিশাখা বউদির—বড়দাও জানে।...সেই ভদ্রলোকও ডিভোর্সি...দুজনার বিয়েও হয়ে যাবে হয়তো। কিন্তু আমার ধারণা, বিশাখা বউদি এখনো বড়দাকেই ভালোবাসে, তা না হলে বিজুর জন্য তাঁর এত দরদ থাকত না।

পরের মাসটা ভালোয় ভালোয় কেটে যেতে দূর্বা হাঁপ ফেলে বাঁচল। কেস খারাপ হয়ে থাকলে রক্ত দেবার সময় এগিয়ে আসে শুনেছিল। গত দেড় মাসের মধ্যে বার দুই তিন বিজুর শরীর খারাপ হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রক্ত দিতে হয়নি।

তার পরের মাস অর্থাৎ উনআশির জুলাইয়ের গোড়া থেকেই সূচনা শুভ নয়। নানা দিক থেকে ঝড়ো সমুদ্রের এলোপাথারি ঝাপটা এসে পড়তে লাগল।...রণিত দত্ত তার কাগজের এত সাধের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে বসল। এই দিনেও লোকটা একটা আদর্শ সামনে রেখে চলছিল। নইলে ওই কাগজের আপিসের মাইনে সর্বসাকুল্যে হাজার টাকাও নয়। নির্মলা সরকারের কথা শুনে তাঁদের কারবারে ঢুকলে শুরুতে তার ডবলেরও বেশি টাকা পেতে পারত। কিন্তু নিজের স্বার্থ তুচ্ছ করে ওই কাগজে কলম নামে একটা ঝাঁটা হাতে করে বসেছিল, অন্ধকারের গহ্বর থেকে দুর্নীতি আর পাপ টেনে বার করত। কলমের ঝাঁটায় সে-সব লোকের চোখে তুলে ধরত। এ ব্যাপারে তার প্রধান প্রেরণা-দাতা সবুজ রঙের আধ-বয়সী সম্পাদক মহেন্দ্র চক্রবর্তী। ওই লোকের সম্পর্কে ইদানীং অনেক

রকমের কুৎসা কানে আসছিল, কিন্তু রণিত দত্তর বিশ্বাসে ফাটল ধরেনি। কারণ, গুরুর মতো এই ভদ্রলোকই তাকে টেনে এনেছিল, আর এই নির্মম গোছের সংস্কারের মন্ত্র তার কানে জপে দিয়েছিল। নিজস্ব ডকুমেন্ট অ্যালবাম করার জন্য যে-সব বাতাস-বিষানো মেয়েদের ছবি ভদ্রলোক তার কাছ থেকে চেয়ে নিত, তার পিছনে বিকৃত রুচি রণিতের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। বিপাকে-পড়া সেই তরুণী প্রোফেসারের কুৎসিত ব্যাপারটা সবুজ রঙ্গে আজও ছাপা হয়নি। রণিত তাগিদ দিতে মহেন্দ্র চক্রবর্তী বলেছিল, দাঁড়াও, কলেজে পড়ায় মহিলা, আট-ঘাট না বেঁধে নামা ঠিক হবে না।

কি ছাপা হবে না হবে তা সম্পাদকের বিবেচনার ব্যাপার। রণিতের বলার কিছু নেই। কলেজে পড়ায় যে, তার বিকৃত দিকটা আলোয় টেনে আনা হচ্ছে না দেখে ভিতরে ভিতরে একটু ক্ষোভ ছিল রণিত দত্তর। এর মধ্যে দু'দুজন সহকর্মীর মুখে খবর পেল, ওই রমণীটিকে নিয়ে সম্পাদক নিজেই এখন রঙে রসে মেতেছেন। তারা স্বচক্ষে ওঁদের ট্যাক্সিতে হাওয়া খেতে দেখেছে, ইংরেজি সিনেমা হলেও দেখেছে। রণিত দত্ত ভিতরে ভিতরে গুম হয়ে ছিল। গত সপ্তাহে রাত সাড়ে দশটায় কাগজের আপিস থেকে মেসে ফেরার সময় নিজের চোখে একই ব্যাপার দেখেছে! ট্র্যাফিক লাইটে ওদের ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে গেছল।...দুজনে ঘেঁষা-ঘেঁষি বসে, মহেন্দ্র চক্রবর্তীর এক হাত মহিলার কাঁধের ওপর।

পরদিন আপিসে এসে রণিত দত্ত সোজা সম্পাদকের ঘরে ঢুকেছে। জিগ্যেস করেছে, সুলতা ঘোষের স্টোরিটা কাগজে ছাপা হবে কি হবে না। ভদ্রলোক সাফ জবাব দিয়েছে, হবে না।

রণিত দত্ত সেই দিনই রিজাইন করে চলে এসেছে। বাড়ির কেউ কিছু এখনো জানে না। জানলে নির্মলা সরকার অন্তত খুশি হবেন। সে কেবল দূর্বাকে বলেছে। মেসেও থাকছে না। এ বাড়িতেই আছে। বিজু খুব খুশি।

সব শুনে দূর্বারও সত্যি মন খারাপ হয়ে গেছল। লোকটা যেন বড় রকমের কিছু পুঁজি খুইয়ে বসে আছে। দূর্বার মনের ওপর পরের ধাক্কাটা এলো এ-বাড়ির বড়দি কমলা সরকারের কাছ থেকে। কোনো কারণে স্কুল ছুটি কিনা জানে না, তিন চারদিন হল বাড়িতেই আছে। দুপুরে হঠাৎ হঠাৎ এক-একবার ঘর থেকে বেরোয়। বারান্দায় রণিতকে আর ওকে গল্প করতে দেখলে গম্ভীর মুখে আবার ঘরে চলে যায়। দেখলেও রণিত খেয়াল করে না। বড়দিকে সে একরকমই দেখে। কিন্তু দূর্বা তফাৎ বোঝে। ছোট বোনের কারণে বড়দিটি দূর্বার ওপরেই বেশি ক্ষিপ্ত সম্ভবত। রমলার প্রেম-পর্ব এখন তুঙ্গে চড়ে আছে। নাচিয়ে নায়িকাকে নিয়ে বসন্ত রায়ের উপন্যাস এখন শেষের দিকে। ফলে রমলার এখন নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। পনের দিন হল ভালো হোটেলের একটা ঘর ভাড়া করেছে রমলা। এমন লেখা বাড়িতে বসে হয়, না সে-রকম আলোচনা করা যায়? ফলে চান-টান করে সকাল আটটার মধ্যে রমলা সেই হোটেলে চলে যায়। ফেরে কোনদিন রাত আটটায়, কোনোদিন ন'টায়। ও-দিক থেকে ঘড়ি ধরে বসন্ত রায় আসে। লেখকের জন্য এত দরদ সে-ও কি কোনো মেয়ের দেখেছে? তাছাড়া প্রতিটি সেনটেন্স রমলার মনে ধরলে তবে তো লেখা! খুশি ডগমগ হালছাড়া মুখ রমলার, বড় লেখক না ছাই, কিচ্ছু যদি নিজের মাথায় কুলতো! আবার কেমন বড় লেখক জানিস, ঘণ্টায় ঘণ্টায় চুমু না খেলে তার কলমে লেখাই আসে না।

...কমলা সরকার এরই মধ্যে একদিন দাদুর কাছে গেছল। দূর্বাকে দাদুই বলেছে। ভাইয়ের ঠিকুজি নিয়ে এসেছিল। কিন্তু ভাইকে নিয়ে যত চিন্তা, বোনের জন্য তার থেকে কম কিছু নয়। বোনের প্রেমের এই বেলেল্লাপনার কথাও সে দাদুকে বলেছে। দাদু সাত পাঁচ না ভেবেই বলে ফেলেছিল, তার বাড়িতেই বসন্তর সঙ্গে তার বোনের আলাপ। দূর্বার কাঁধ থেকে নেমে এখন তাহলে সে ভালো জায়গাতেই নোঙর ফেলেছে—এখানে বিয়ে দিতে ছেলের বাপ-মায়ের আপত্তি করার কথা নয়, ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে বিয়েটা দিয়ে দিলেই তো হয়। দাদু তাকে পরামর্শ দিয়েছে, বাবা মা-কে জিগ্যেস করে দেখো, ছেলেটা খারাপ নয়—তাদের আপত্তি না থাকলে আমিই ছেলের বাবা-মায়ের কাছে প্রস্তাবটা তুলতে পারি।

কোনো জবাব না দিয়ে কমলা সরকার নাকি থমথমে মুখে উঠে চলে গেছে।

সেদিন রাত আটটার পরে দূর্বা নিচে নেমে এসেছে। বাড়ি যাবে। দাঁড়িয়ে যেতে হল। নিচের বসার ঘরের সামনে কমলা সরকার দাঁড়িয়ে। ওকে দেখে ডাকল, শোনো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

দূর্বার বুক দুরু দুরু। আজ দুপুরে দু'দুবার ঘর থেকে বেরিয়ে রণিতের সঙ্গে ওকে কথা কইতে দেখেছে। বিজুর ঘরেও বিকেলে এসেছিল, তখনো সকলকে বেশিমাত্রায় হাসি-খুশি দেখেছে।

তার পিছনে নিচের বসার ঘরে ঢুকল। কোনরকম ভনিতা না করে কমলা সরকার গলা না চড়িয়ে কঠিন গলায় বলল, এ-সব কি শুরু হয়েছে?

জবাব না দিয়ে দূর্বা চুপচাপ চেয়ে রইল। আরো কঠিন গলা কমলা সরকারের। —কিছু বুঝছ না—কেমন? কিচ্ছু না?

নিজের অজ্ঞাতে মাথায় রক্ত চড়ছে দূর্বার। মাথা নাড়ল। কি-চ্ছু বুঝছে না।

—ওই একটা শয়তান ছেলেকে নিজের কাঁধ থেকে নামিয়ে এখন আমার বোনের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছ—কেমন?

চোখে চোখ রেখে দূর্বা চুপ একটু। তারপর আস্তে আস্তে জবাব দিল, আপনার বোন কচি মেয়ে নয়, আমার থেকে বুদ্ধি-বিবেচনাও তার কম নয়।

—ও...। গলায় শ্লেষের আগুন ঝরল এবার।—আর রণিত কাজকর্ম ছেড়ে এখানে পড়ে আছে কেন? আপিসে পর্যন্ত যায় না কেন?

দূর্বার সমস্ত মুখ লাল। দু'কান গরম।—এ কথা আপনি তাঁকে না বলে আমাকে জিগ্যেস করছেন কেন?

—করছি কারণ আমার চোখে বেঁধে—বুঝলে?

সংযমের বাঁধ ভাঙল দূর্বারও। যতকাল বিজু আছে ততকাল অন্তত এই বড়দি চাইলেও তার এতটুকু ক্ষতি করতে পারবে না এ-বিশ্বাসে এখন আর কোনো ভুল নেই। গলা চড়ালো না। তেমনি চোখে চোখ রেখে বলল, আপনার অন্তত চোখে বেঁধা উচিত নয়...।

মুহূর্তের মধ্যে ওই থমথমে মুখ ফ্যাকাশে বিবর্ণ। হতচকিত। তারপরেই দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল কমলা সরকার।

দূর্বা পায়ে পায়ে বাড়ির বাইরে এলো। মিনিটখানেক হেঁটে এসে ট্রাম স্টপে দাঁড়াল।

...সেই এক দুপুরে বাড়ির বড় ছেলের অনুপস্থিতিতে তিনতলায় উঠে তার ঘর থেকে চটি বই নিয়ে নেমে আসতে দেখাটা দূর্বার কোনদিন কাউকে বলার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বলল কিনা কমলা সরকারকেই।

ট্রাম থেকে নামল। বাড়ির পথ অন্ধকার। দু'দিকের বাড়িগুলোও। এখানে লোডশেডিং চলছে বোঝা গেল। ভিতরটা আরো তিক্তবিরক্ত হয়ে গেল দূর্বার।

দরজা দুটো ভেজানো। ঠেলতেই খুলে গেল। বাবার ঘর অন্ধকার। ওদের ঘরও। সামনের দিকে ভিতরের চিলতে বারান্দায় একটা হ্যারিকেন টিমটিম করে জ্বলছে। দূর্বার রাগ হল, একলা বাড়িতে দরজা খোলা রেখে শেফালি ঘুমুচ্ছে নিশ্চয়...

পরের মুহূর্তে কাঠ একেবারে। ওদের অন্ধকার ঘরে শেফালির অস্ফুট মিনতি। —না ছাড়ুন...আমার ভয়ানক ভয় করছে...ছাড়ুন...

সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের প্রায় ফিসফিস গলা, অত ভয় কিসের, তোমার বাবা তো বেহুঁস হয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে—এর পর একমাস ধরে সিনেমা দেখার টাকা দিয়ে যাব তোমাকে...লক্ষ্মী মেয়ে...ভালো করে আর একবার মাত্র...

কি যে হতে থাকল মাথার মধ্যে দূর্বা জানে না। বাইরের ভেজানো দরজাটা নিঃশব্দে আবার খুলে হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে বন্ধ করল, আর তারপরেই ছুটে গিয়ে বারান্দার হ্যারিকেনটা হাতে করে সামনে এগিয়ে এলো। চোরের মতো তক্ষুণি ঘর থেকে বেরুলো বাবার মদের সঙ্গী অমল বিশ্বাস। একটু থমকেই দ্রুত দরজা খুলে রাস্তায়। শেফালি দিদির দিকে চেয়ে. ভূত দেখছে।

হ্যারিকেন হাতে দূর্বা ঘরে ঢুকল। মেঝেতে হ্যারিকেনটা রাখল। ঘরের দরজা দুটো বন্ধ করল। শেফালি কাঁপছে।

দূর্বা ঝাঁপিয়েই পড়ল ওর ওপর। মারতে মারতে ওকে বিছানায় এনে ফেলল। শেফালি অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল, দিদি তোর পায়ে পড়ি, আর কক্ষনো—

আর বলতে পারল না। দূর্বা ওর বুকে চেপে দু'হাতে গলা টিপে ধরল। একটা হাত তুলে নিজের শাড়ির আঁচলটা বুক-কাঁধ থেকে খসিয়ে যতটা পারে ওর মুখে গুঁজে গুঁজে দিল। তারপর পাগলের মতো কিল-চড়-ঘুষি। শেফালির দাঁত দিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। দূর্বা পাগলের মতো মেরে চলেছে। চৌকির এক ধারেই পালকের ঝাড়নটা পড়ে আছে। সেটা তুলে নিয়ে উল্টো করে বেতের দিকটা ধরে চৌকি থেকে নেমে আবার এলোপাথারি পিটতে লাগল। ওর শাড়ির আঁচল তখনো শেফালির মুখে গোঁজা।

পরদিন।

সকালে রাস্তার লোক কি নিয়ে জটলা করছে দূর্বা বুঝেছে। দিল্লিতে জনতা সরকারের আঠাশ মাস পাঁচদিনের রাজত্ব শেষ হয়েছে। মোরারজি দেশাই রিজাইন করেছে। কিন্তু দূর্বার এ-নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। সে বাবার মুখোমুখি হবার অপেক্ষায় আছে।

কৃষ্ণেন্দু বোসের কাগজ পড়া আর দাড়ি কামানো শেষ। এবারে স্নানে যাবে। দূর্বা ঘরে ঢুকল। অনুচ্চ কঠিন গলায় বলল, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে কৃষ্ণেন্দু বোস যথার্থ অবাক। একটু সচকিতও।

দূর্বার সমস্ত মুখ জ্বলছে, চোখে আগুন ঠিকরোচ্ছে।—শোনো, তোমার অমল

বিশ্বাসকে এই প্রথম আর শেষবারের মতো বলে দিও, আর একটা দিন যদি তাকে এ-বাড়িতে দেখা যায় তার গায়ের ছাল চামড়া থাকবে না।—এখান থেকে সোজা তাকে হাসপাতালে যেতে হবে—সেখান থেকে শ্মশানে। আমি দরকার হলে কতটা করতে পারি তোমার জানা আছে বোধহয়...

কৃষ্ণেন্দু বোস বিমূঢ়।—কেন? অমল কি করেছে? ইয়ে—অসভ্যতা করেছে কিছু?

—হ্যাঁ করেছে। কতটা করেছে তুমি ধারণা করতে পারবে না। ফের এলে কি হবে তুমি তাকে জানিয়ে দিও।

ঘর ছেড়ে চলে এলো।

ট্রামে বসে থেকে থেকে ঘড়ি দেখছে। সরকার বাড়ি পৌঁছতে আজ এক ঘণ্টারও বেশি দেরি হয়ে যাবে। একটা ছোট মিছিল পার হচ্ছে বলে ট্রামটা দাঁড়িয়ে আছে। এটা আনন্দ মিছিল। দিল্লির জনতা সরকার পড়ে গেল দেখে যে-দল খুশি এটা তাদের মিছিল।

দূর্বা ভাবছিল, সুখ দুঃখ সব নিয়েই মানুষ হয়তো ইচ্ছে করলে সুখে না হোক কিছুটা শান্তিতে থাকতে পারে। নিজের মনে নিজের মতে চলতে পারে। কিন্তু থাকে না কেন? থাকতে পারে না কেন? কেউ যদি চায়ও থাকতে, অন্যে সেটা সহ্য করবে না। বাধা দেবে।...এ-রকম হয় কেন!

বিজু বলল, আজ তোমার এত দেরি? আমি আর রণদা কত ভাবছিলাম—

—দেরি হয়ে গেল ভাই, তুমি রাগ করোনি তো?

বিজু হেসে উঠল, বোকা না হলে তোমার ওপর কেউ রাগ করতে পারে? রণদা বলছিল, শরীর-টরীর খারাপ হয়ে থাকতে পারে, আমারও তাই ভাবনা হচ্ছিল—

অদূরের চেয়ারে রণিত চুপচাপ বসে আছে। এ-দিকেই চেয়ে আছে। বিমর্ষ, বিষণ্ণ। দিল্লির ওলট-পালটের ফলে বোধহয়। দূর্বা হেসেই বিজুকে বলল, আমার শরীর-টরীর খারাপ হয় না।

গম্ভীর মুখে বিজু বলল, ও-রকম অহংকার করতে নেই, ঠাকুর রেগে গেলে দেবে'খন—

হাসতে চেষ্টা করে রণিত চেয়ার ছেড়ে উঠে ভিতরের বারান্দার রেলিং-এ এসে দাঁড়াল। মিনিট পনের কুড়ি বাদে সুমতির খোঁজে দূর্বা বেরিয়ে এসে দেখে সে তখনো তেমনি দাঁড়িয়ে। দূর্বা তাড়াতাড়ি ও-দিকে চলে গেল। মনের তলায় কিছু দুর্ভাবনা থিতিয়ে আছেই। কমলা সরকারের আজ কোন্ মূর্তি দেখবে কে জানে! দোতলায় বসার ঘরের দরজার ও-ধারে দাঁড়িয়ে নির্মলা সরকার সুমতির সঙ্গে কথা কইছেন। ওকে দেখে বললেন, তোমার আজ আসতে কিছু দেরি হয়েছে, বিজু বার বার খোঁজ করছিল।

দূর্বা মনে মনে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কমলা সরকার মা-কেও কিছু বলেনি বোঝা গেল।—হ্যাঁ, একটু আটকে পড়েছিলাম। মাসি, বিজু একটু দুধ খেতে রাজি হয়েছে, তাড়াতাড়ি দিয়ে যাও—

সুমতি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। দূর্বাও ফেরার জন্য ঘুরেছে, নির্মলা সরকার অনেকটা নিজের মনেই বললেন, কমলাটা ক'টা দিন থাকবে বলে এসেছিল, আজ সকালেই হুট করে হস্টেলে চলে গেল। কি হল, সুমতি কিছু জানে কিনা জিগ্যেস করছিলাম...কারোরই মতিগতি বুঝি না।

থাকবে বলে এসে বাড়ির মেয়ে হঠাৎ চলে গেলে মায়ের একটু দুশ্চিন্তা হবারই কথা। কিন্তু স্বার্থপরের মতোই দূর্বা ভারী হালকা বোধ করছে। ফিরে আসছে। রণিত ও-দিক ফিরে রেলিং-এ ভর করে দাঁড়িয়ে আছে।

দূর্বা বিজুর ঘরের কাছাকছি এসে সিঁড়ির কাছে হুইস্কির গলায় আদরের আওয়াজ পেয়ে আবার ফিরল। বড়দা। নিচে থেকে ওপরে উঠে আসছে। দোতলায় পা দিয়ে হুইস্কির ঘাড় পিঠ চাপড়ে একটু আদর করল। একই সঙ্গে রণিতের দিকে চোখ গেল তার। মুখে টিপটিপ হাসি।—কি রে, দিল্লিব সিংহাসন তো ফাঁকা আবার, তোর বড় বড় সমাজসেবী নেতাদেরও ভোল পাল্টাভে 'দেখে মেজাজ খারাপ নাকি?

রণিতও সিঁড়ির দিকে ফিরেছে, শুনেছে। যে-রকম গম্ভীর, দূর্বার ভয় ধরল কিছু না বলে বসে। কিছুই না বলে শ্লেষটুকু হজম করল শুধু।

কিন্তু ও-দিক থেকে আর এক প্রস্থ ব্যঙ্গ ঝরল।—আমি তোকে আগেও বলেছি এখনো বলছি, যে-যার নিজের বুঝ বুঝে নেবার দিন এটা, সময় থাকতে এখনো বাবার সঙ্গে কাজে লেগে যা।

তিনতলায় উঠে গেল। রণিত দত্তর ঝাঁঝানো চাউনি দূর্বার মুখের ওপর ফিরল। কি-রকম ঘাবড়ে গিয়ে দূর্বা তক্ষুনি বিজুর ঘরে।

দুপুরে বিজুর চোখে তন্দ্রা নেমে আসতে দূর্বা পা টিপে ঘর ছেড়ে বেরুলো। ওই লোক এখন বারান্দার ইজিচেয়ারে শুয়ে জানে। বিজুর ঘুম ভাঙলেই তলব পড়ে তাই বারান্দাতেই থাকে বেশির ভাগ সময়। কাগজ পড়ে। বই পড়ে। আর দূর্বার ধারণা এ-সময় ওর সঙ্গে একটু গল্প-টল্প করার বাসনাও রণিত দত্তর মনের তলায় থাকে। প্রায়ই উঠে একটা গদির মোড়া এনে সামনে পেতে দেয়, বলে, বসুন, আপনি পারেনও—বিজু সাধে কেনা হয়ে আছে আপনার কাছে!

আজ বসেই আছে। কিছু পড়ছে না। চুপচাপ চেয়ে রইল।

দূর্বা কাছে এসে হেসেই বলল, সত্যি মন খুব খারাপ আজ—না?

মুখে হাসি টেনে এনে রণিতও নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিল, মন খারাপ হবে কেন, মুখোস খুলে গেল, সকলের স্বরূপ দেখা গেল—ভালই হল। বড়দা ঠিকই বলেছে।

—তাহলে সকাল থেকে আপনি এমন গুম হয়ে আছেন কেন?

—তা না, আমাদের অবস্থাখানা ভাবছিলাম। সোজা হয়ে বসল একটু।—যেমন ধরুন আমি স্বাধীনতার পাঁচ বছর পরে জন্মেছি, আপনি হয়তো দশ বছর পরে। আমরা দু'শ বছরের দাসত্বের শিকল ভাঙার কথা বইয়ে পড়েছি আর নেতাদের মুখে হাজার বার করে শুনেছি। কিন্তু বড় হতে হতে আমরা দেখছি কি? আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে কেবল দাসত্বের শেকল—ক্ষুধার শেকল, অভাব-অনটনের শেকল, অশিক্ষার শেকল, কুসংস্কারের শেকল—ভাবুন একবার, নেতারা বোঝায় তবু নাকি আমরা স্বাধীন! বড়দা ঠিক কথা বলেছে, খুব খাঁটি কথা বলেছে।

দূর্বা রাজনীতির বিন্দু-বিসর্গ বোঝে না। তবু ভালো লাগছে। সান্ত্বনার সুরে বলল, কিন্তু এ-রকম তো আর বরাবর চলতে পারে না—

থেমে গেল। লোকটা আরো সোজা হয়ে বসল। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে এঁটে বসতে লাগল। স্নায়ুগুলো সব টান-টান। চোখে সাদাটে আগুনের হলকা। বলে উঠল, না, চলতে

পারে না—যেদিন সব লোভ আর সব স্বার্থ নিয়ে সকলে আমরা পচে গলে মাটিতে মিশে যাব—আর সেই উর্বর মাটিতে অন্য মানুষ গজাবে—তখন সব অন্যরকম হবে। কিন্তু তার এখনো ঢের ঢের দেরি—বুঝলেন? ততোদিন?

দূর্বা বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

আত্মস্থ হয়ে রণিত দত্ত হঠাৎই হেসে ফেলে ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে দিল আবার। বলল, কেমন লেকচারখানা দিলুম দেখুন—নেতাদের বক্তৃতা শুনে শুনে আর কাগজে বড় বড় কথা লিখে আমারও বারোটা বেজে গেছে।

দূর্বা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

দিন দশেকের মধ্যে ভূমিকম্প।

বিজুর শরীর ক'দিন ধরেই ভালো যাচ্ছিল না। ক্লান্তি বাড়ছে অবসাদ বাড়ছে। ঝিমোয় বেশি। দূর্বা বুঝতে পারছে আবারও রক্ত দেবার সময় এগিয়ে আসছে। রণিতকে বলেছেও সে-কথা। কিন্তু আচমকা বিপদ এমন ভয়াবহ আকারে দেখা দিতে পারে ভাবেনি।

দুপুরে সেদিন রণিত পর্যন্ত বাড়ি নেই। কাগজের আপিস থেকে তার পাওনা টাকা-কড়ি আনতে গেছে। বিজু বিছানায় শুয়ে ছিল। দূর্বা তাকে ছোটদের বেশ মজার একটা বাংলা গল্পের বই পড়ে শোনাচ্ছিল।

খানিকক্ষণের মধ্যে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে দূর্বা তার দিকে তাকাল। প্রথমে মনে হল অন্য দিনের মতো গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তার পরেই মনে হল মুখটা কি-রকম দেখাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। ঠোঁটের কোণে রক্তের আভাস। মুখের ওপর ঝুঁকে তাড়াতাড়ি ঠোঁট ফাঁক করে দেখে ভেতরটা রক্তে ভেজা। তারপরেই দেখে হাতের কাছে ঘন কালো দাগড়া দাগড়া কি-সব।

—মাসিমা! সুমতি মাসি!

আর্তনাদ করেই দূর্বা দরজার দিকে ছুটল। বারান্দা থেকে ঘেউ ঘেউ করে আগে হুইস্কি ছুটে এলো। কোনদিকে না তাকিয়ে দূর্বা পাগলের মতো তিনতলায় উঠে এলো। শেষের ঘরের দরজায় এসেই থমকে দাঁড়াল। ঘরের লোক ইজিচেয়ারে শুয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন। কোলের ওপর চটি বই একটা। কিন্তু এই মুহূর্তে দূর্বার অন্য কোনো দিকে হুঁশ নেই। —বড়দা শিগগীর নেমে আসুন—বড়দা!

বড়দা চেয়ার থেকে ছিটকে উঠে দাঁড়াল।

—বিজুকে খুব খারাপ দেখছি, মুখে রক্ত, গায়ে কালো কালো দাগ, জ্ঞান নেই—

তার মুখের দিকে চেয়ে মানুষটা স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল খানিক। তারপরেই ঝড়ের মতো বেরিয়ে এলো। পিছনে দূর্বা।

বিজুর বিছানার পাশে এসে বড়দা আবার স্থির হয়ে দাঁড়াল। সক্কলের উদ্গ্রীব চোখ বড়দার দিকে। নির্মলা সরকারের, সুমতির, দূর্বার, এমনকি হুইস্কিরও।

দেখেই বড়দা যা বোঝার বুঝল।

গাড়ি ছুটেছে। বড়দা ড্রাইভ করছে। তার পাশে নির্মলা সরকার। তার পাশে সুমতি। পিছনে দূর্বা দরজায় পিঠ দিয়ে বসে, তার কোলে অচেতন বিজু।

দূর্বার বুকের ভেতরটা এত কাঁপছে, মনে হচ্ছে বিজুরও তাতে অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু ও কাঁপুনি থামাবে কি করে?...বিজুকে নিয়ে আসার সময় হুইস্কিটা কি-রকম ডাকছিল। ও-রকম করে কক্ষনো ডাকে না।

হাসপাতাল।

তিন ঘণ্টা হয়ে গেল, বিজু রক্ত নিতে পারছে কি পারছে না দূর্বা কিছুই বুঝতে পারছে না। একভাবেই বেহুঁসের মতো পড়ে আছে। অবশ্য রক্ত দেবার সময় এমনিতেই পেশেন্টকে সিডেশনে রাখা হয়। তবু অবস্থা আদৌ ভালো নয়, এক-একবার দরজায় উঁকি দিয়ে এটুকু বুঝছে। বিশাখা ব্যানার্জীর চেষ্টায় একে একে তিনজন বড় ডাক্তার এসে গেছে। তারা চলে যাচ্ছে আবার খানিক বাদে বাদেই ফিরে আসছে। বিশাখা ব্যানার্জীও সেই থেকে ছোটাছুটি করছে। বাড়ির লোকের মধ্যে কেবিনে শুধু বড়দা আর রণিত দত্ত আছে। বাইরের বেঞ্চিতে বিজুর বাবা মা বড়দি ছোড়দি। অদূরে বসন্ত রায়। কেউ একটা কথা বলছে না। নড়েচড়েও বসছে না। বড়দা বেরিয়ে গিয়ে প্রায় আধঘণ্টা বাদে কাকে সঙ্গে করে ফিরল।

দূর্বার ধারণা ঘরের মধ্যে যমে মানুষে টানাটানি চলেছে। বিজুর ছোট্ট শরীরটা ঘুরিয়ে শিরদাঁড়া ফুঁড়ে ভয়ংকর একটা ইনজেকশান দেওয়ার তোড়জোড় চলেছে দেখে দূর্বা কান্না চেপে দরজার কাছ থেকে সরে গেল।

প্রায় সন্ধ্যের কাছাকাছি এ-যাত্রায় মানুষেরই জয় হল কি? দূর্বা ঠিক বুঝতে পারছে না। বিশ্বাস করতে সাহসে কুলোচ্ছে না। দুজন বড় ডাক্তার বেরিয়ে গেল। একজন থাকল। বিজুর হাতের শিরায় ইনজেকশন বেঁধা, সামনের ফ্রেমে উপুড় করা রক্তের বোতল। আর কারো মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। দূর্বা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রণিতকে লক্ষ্য করছে। তার মুখে স্বস্তির আভাস।

এরপর আস্তে আস্তে বোঝা যেতে লাগল অবস্থা ভালোর দিকে।

রাত প্রায় ন'টার সময় বড়দা ঘর ছেড়ে বাইরে এলো। বাবা-মাকে বলল, ভালোই আছে। তোমরা আর রাত করো না, বাড়ি চলে যাও।

দূর্বার বুক থেকে পাথর নেমে গেল। বড়দার কথা সকলের কাছেই হুকুমের মতো। ঘুমন্ত বিজুকে একবার দেখে সকলে একসঙ্গেই চলে গেল। তখনো কারো মুখে কথা নেই।

রাত সাড়ে দশটা।

বড়দা বাইরের বারান্দায় পায়চরি করছে। রণিত দত্ত একের পর এক সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। দূর্বা এক-একবার কেবিনে ঢুকে ঘুমন্ত বিজুকে দেখে আসছে। তার মুখের চেহারা ক্রমশ যত ভালো লাগছে ততো বেশি দেখার লোভ। ঘরে এখন একজন নার্স, একজন জুনিয়র ডাক্তার আর বিশাখা ব্যানার্জী। সমস্ত রাত পেশেন্টের রি-অ্যাকশন লক্ষ্য করার জন্য ওই ডাক্তারকে রাখার ব্যবস্থা বিশাখা ব্যানার্জীই করেছে।

শ্রান্ত বিশাখা ব্যানার্জী এবারে বাইরে এলো। রণিত আর দূর্বাকে লক্ষ্য করে বলল, তোমরা মুখ হাত ধুয়ে নাও, খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি, বেঞ্চিতে বসেই খেয়ে নিও। বড়দার দিকে ফিরল, তুমি কি করবে?

জবাব না দিয়ে বড়দা চুপচাপ তার দিকে চেয়ে রইল।

—থেকে যেতে চাও তো এসো, আমার ঘর ছেড়ে দিচ্ছি।

বড়দা সোজাসুজি তেমনি চেয়ে আছে।—আমার এখন ড্রিংক দরকার, আছে কিছু?

—এখানে থাকবে কি করে!...বাড়িতে ফোন করে আনিয়ে দিতে পারি।

—থাক্ । তুমি যাও, আমি চলে যাব।

বিশাখা ব্যানার্জী তবু অপেক্ষা করল একটু। তারপর পায়ে পায়ে চলে গেল।

বড়দা বারান্দায় আবার পায়চারি করল একটু। তারপর ওদের দুজনের সামনে এসে থামল। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আঁচড়।—বিজু এবারকার মতো ফিরল তাহলে...।

দূর্বার কানে 'এবারকার মতো' কথা দুটো খট করে বিঁধল। একটুও ভালো লাগল না। রণিত দত্ত নির্বাক।

—ভালো কথা, বড়দার ঠোঁটের হাসি আরো স্পষ্ট, বিজুর ইনজেকশান কিনতে বেরিয়ে শুনলাম, সঞ্জীব রেড্ডী মিনিস্ট্রি ফর্ম করার জন্য চরণ সিংকে ডেকেছে—শুনেছিস?

সিগারেট হাতে রণিত দত্ত একটু থমকে দাঁড়াল। হাঁ না কিছুই বলল না।

বড়দা আবার পায়চারি করছে আস্তে আস্তে। অল্প অল্প হাসছেও। মন্তব্য করল, দ্যাখ্ ক'দিন চলে...

শোনামাত্র দূর্বার মনের তলায় কি-রকম মোচড় পড়ল একটা। বড়দা মুখে যা বলল সেটুকুই সব মনে হল না তার।...বড়দার চোখে বিজু নাকি ইন্ডিয়ার মতো। বিজুরও আজ রক্ত বদল হল। দুই-ই আপাত-ফাঁড়া কাটার মতো এক-রকম ভাবছে বড়দা।

বড়দা আবার এসে ওদের দুজনের সামনে দাঁড়াল। শুধু ঠোঁটে নয় চোখেও কৌতুক চিকচিক করছে। রণিত দত্তকে জিজ্ঞাসা করল, পৃথিবীতে সব থেকে ইন্টারেস্টিং জিনিসটা কি বল্ তো?

রণিত তার দিকে চেয়ে সিগারেট টানছে। নিরুত্তর।

বড়দা দূর্বার দিকে ফিরল, তুমি বলতে পারো?

নির্বাক সে-ও।

—তুমি পারলে না? হোয়াই—ইটস্ ম্যান! মানুষ! মানুষ ইজ্ দি মোস্ট্ ইন্টারেস্টিং ফুল ইন দিস ওয়ার্লড! মানুষ নামে এক জীব মাথার ওপরে ঈশ্বর নামে একজনের সব থেকে সেরা সৃষ্টি ভাবে নিজেকে। হিজ্ নোব্লেস্ট ওয়ার্ক! বড়দা আরো হাসছে। —কি-রকম ফানি বোঝো—মুখ্যু জ্ঞানের কথা বলে, নির্বোধ বুদ্ধির বড়াই করে, ভণ্ড সততার হাঁক পাড়ে—এই মানুষ কিনা সৃষ্টির গর্ব! ঈশ্বরের ন্যায়ের শক্তি তার মধ্যে কাজ করছে!

দূর্বা বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে। বড়দা আস্তে আস্তে বিজুর কেবিনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, গলা নামিয়ে বলল, আসল যে শক্তি কাজ করছে তা রোগ...শোক...ধ্বংস—ডিজিজ্ ডেথ্ অ্যান্ড ডিজাস্টার!

বড়দা চলে যাচ্ছে। দূর্বা বোসের ভীতত্রস্ত বড় বড় দুই চোখ তাকে অনুসরণ করল। তারপর রণিত দত্তর দিকে ঘুরল। একটা অব্যক্ত আর্তনাদ ভিতর থেকে ঠেলে উঠছে। এ হতে পারে না—মানুষ সম্পর্কে এ-ই শেষ কথা হতে পারে না! বিজুরা একদিন বাঁচবেই—ইন্ডিয়া বাঁচবেই। একটু আশ্বাসের আশায় দূর্বা বোসের দু'চোখের আর্তনাদ রণিত দত্তর মুখের ওপর আছড়ে পড়ল।

রণিত দত্ত সিগারেট টেনে চলেছে।

# সেই অবেলায়

শিশির ভট্টাচার্য
কবিবরেষু

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেছল অনুপমবাবুর। সাধারণত সকাল ছ'টায় ওঠেন তিনি। ঘড়ি না দেখেই বুঝলেন পাঁচটাও বাজেনি। অক্টোবরের সকাল। দিন ছোট, রাত বড়। বাইরে রীতিমত অন্ধকার এখনো। এ-রকম বড় হয় না। অনুপমবাবুর ভিতরে ভিতরে সারাক্ষণ একটা ঘড়ির কাঁটা প্রায় অজান্তে কাজ করে যায়। রাত এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটায় শোন। সকাল ছ'টার দু-চার মিনিট এধারে ওধারে চোখ খোলেন। সময় ধরে কাজ-কর্ম নাওয়া-খাওয়ার মতো ঘুমনো আর জাগাটাও অভ্যাসের ছকে বাঁধা। ছেলেমেয়েরা এই নিয়ে মায়ের সঙ্গে রসিকতা করত। ছেলে বলতে নিজের ছেলে নয়, বড় ভাইয়ের ছেলে মিলন। সে নিজের ছেলের থেকে বেশি ছাড়া কম নয়। অনুপমবাবুর পরপর চার মেয়ে। তারা বলত এ-বাড়িতে ঘড়ির দরকার নেই, বাড়ির কর্তাই ঘড়ি! আর তাদের মা জবাব দিতেন, ও-রকম অভ্যাস আগে তৈরি করতে গিয়ে দ্যাখ সর্ব ব্যাপারে কতখানি সংযম দরকার—

অত্যুক্তি কিছু নয়। ভদ্রলোকের সব-কিছুই অভ্যাসের সরল রাস্তায় চলে। যখন যে কাজ করেন তাই নিয়ে ভাবনা বা চিন্তা। একসঙ্গে পাঁচ-রকম চিন্তাভাবনা মগজে ঠাঁই পায় না।

আজ আপনা থেকে আগে ঘুম ভাঙার কারণ আছে। বাইরে প্রকাশ না পেলেও গত রাতে অনুপম মজুমদার ভিতরে বেশ একটু খুশির আবেগ নিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। রাত পোহালে মিলন আসবে। বলতে গেলে প্রায় তিন বছরের ওপর এমনি একটা দিনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন তিনি। এক বছর আগেই মিলন লন্ডন থেকে ফিরতে পারত। অনুপমবাবু আশা করেছিলেন ফিরবে। কিন্তু দু'বছরে এনজিনিয়ারিং-এর বাড়তি ডিগ্রি ডিপ্লোমা পকেটস্থ করে ভাইপো কাকাকে লিখল, হাতে-কলমে অভিজ্ঞতার জন্য আরো একটা বছর এখানে থাকা দরকার। বড় একটা এনজিনিয়ারিং ফার্মের সঙ্গে যোগাযোগও হয়েছে। এক বছরের চুক্তিতে তারা ভাল টাকাই দেবে। এরপর কাকাকে আর টাকা পাঠাতে হবে না। ফেরার খরচও সে অনায়াসে জমাতে পারবে।

সেই চিঠি পেয়ে কাকিমা মিনতি মজুমদার খুঁতখুঁত করেছিলেন। দু'টো বছরই তাঁর কাছে দশ বছরের মতো লাগছিল। এরপর ছেলে আরো একটা বছর সেই বাইরেই কাটাবে এটা তাঁর খুব পছন্দ ছিল না। বিশেষ করে এই দিল্লিতে তার জন্য ভালো চাকরি যখন লন্ডন পাড়ি দেবার আগে থেকেই এক-রকম ঠিক হয়ে আছে। খুঁতখুঁতুনির আসল কারণ, তাঁর ধারণা, ওই শ্বেতাঙ্গ রাজ্যের হাওয়া একবার রক্তে মিশে গেলে ছেলেরা চট করে আর দেশে ফিরতেই চায় না। ফিরলেও তাদের সে-রকম আর মন বসে না। পালাই পালাই করে। পালায়ও। দীর্ঘকাল এই দিল্লিতে বসেই অমন অনেক ছেলের খবর তাঁর জানা আছে বা শোনা আছে।...মিলনের জন্য আরো চিন্তা, বিলেত যাওয়ার আগে পর্যন্ত এই বাড়ির টানে দিল্লি ছেড়ে কোথাও নড়তে চাইত না। বছরে একবার ওর কলকাতায় মামার বাড়ি যাবার তাড়া এলে মুখ শুকোতো। আর লন্ডনে পৌঁছে গোড়ায় গোড়ায় প্রায় সব চিঠিতেই ওই দেশটার কত নিন্দা করত। লিখত, তোমাদের কথা মনে হলেই আমার কান্না পায় কাকিমা—কাকু অনুমতি দিলে চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে বড় হবার লোভ ছেড়ে অনায়াসে আমি তোমাদের কাছে ফিরে যেতে পারি। এরই মধ্যে মনে হচ্ছে, কতকাল তোমার হাতের সুক্তো খাই নে— কতকাল ছোট মাছের ঝাল আর চচ্চড়ি খাই নে।

সেই ছেলে দু'বছর কাটানোর পর আরো একটা বছর ওখানে পড়ে থাকতে চায় এটা মিনতি মজুমদারের খুব ভালো লাগার কথা নয়। স্বামীকে বলেছিলেন, এখানকার চাকরি ওর জন্যে হাঁ করে আছে আর উনি আবার একটা বছর হাতে-কলমে অভিজ্ঞতার জন্য থেকে যাবেন। তুমি চলে আসতে লিখে দাও—

অনুপম মজুমদার তা লেখেননি, আপত্তিও করেননি। ঠেকে না পড়লে বা নিতান্ত দরকার না হলে কারো ইচ্ছেয় তিনি বাধা দেন না। হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ব্যবস্থা মিলন এই দিল্লিতে পা দিলেই হতে পারত। সব ঠিক করাই ছিল। মিলনও তা জানে। তবু বিদেশের কাজ-কর্ম একটু বুঝে-শুনে আসতে চাইছে যখন ছেলেটা, তিনি আপত্তি করবেন কেন? 'বীভারস'-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হেমরাজ মোদীকে ভাইপোর ইচ্ছে জানাতে তিনিও খুশি হয়েই সায় দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ও যত পাকাপোক্ত হয়ে আসবে আমাদের ততো লাভ। লিখে দিন, আমার একটুও আপত্তি নেই।

...বিদেশের নামী ফার্মের সঙ্গে ভাইপোর ভাল যোগাযোগ বা চুক্তি হবে না কেন। এখান থেকে এনজিনিয়ারিং পরীক্ষায় প্রথম হওয়া সেরা ছেলেটি সেখানে গেছে তার বিদ্যের গণ্ডী বড় করতে। সেখানেও সব পরীক্ষায় সকলের নজর কেড়ে একেবারে প্রথম সারিতেই নিজের জায়গা করে নিয়েছে। এক বছর বাদেও সেখানকার নামী ফার্ম থেকে ও-ছেলে ছাড়া পাবে কিনা বা বেশি টাকার লোভে তার মতিগতি বদলাবে কিনা—ভিতরে ভিতরে অনুপম মজুমদারেরও তা নিয়ে একটু দুশ্চিন্তা ছিল। তক্ষুনি বললে স্ত্রী ওকে ফিরে আসতে লেখার জন্য জোর করবে জানা কথাই। মিলনের প্রস্তাবে সানন্দে মত দিয়ে চিঠি পাঠাবার পর তিনি ভিতরের দুশ্চিন্তাটুকু স্ত্রীর কাছে প্রকাশ না করে পারেননি। বলেছিলেন, ও সীরিয়াস ছেলে, আর ওর বড় হবার অ্যামবিশনও কম নয়।...ও-দেশটা গুণের কদর জানে, এখান থেকে পাঁচগুণ বড় টোপ ফেলে কেউ না এক বছর পরেও আবার আটকে দেয়।

মিনতি মজুমদারের মতো ওই আত্মসংযমী মানুষটাকে অত আর কে বোঝে? অমন সহিষ্ণু মানুষ কমই হয়। দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার ভাগ কাউকে বড় একটা দিতে দেখেন না। তাই যেটুকু প্রকাশ পেল, দুশ্চিন্তাটা তার থেকে ঢের বেশিই ধরে নিয়েছিলেন মিনতি মজুমদার। নিজের চার-চারটে মেয়ের প্রতি ওই লোক কর্তব্যনিষ্ঠ বা স্নেহপ্রবণ নয় এমন কথা নিশ্চয় বলা যায় না। কিন্তু ছেলে বা চোখের মণি বলতে ওই ভাইপো মিলন। এ-জন্যে মিনতি মজুমদারের এতটুকু খেদ বা আক্ষেপ নেই। এগারো বছর বয়সে ও-ছেলের মা চোখ বুজেছিল, চৌদ্দ না পেরুতে বাবা। সেই থেকে নিজের কাছে রেখে মায়ের স্নেহ ঢেলে তিনিই তাকে বড় করে তুলেছেন। তাঁরও ছেলে বলতে এখন ওই মিলনই। তাই ক্ষোভের কি আছে। মেয়েরা বরং বাপের আড়ালে কখনো-সখনো ঠাট্টা-টাট্টা করত। মা-কে বলত, আমরা আবার কে—তোমাদের কাছে এসে গেছি এই পর্যন্ত —বাড়ির যুবরাজ তো ওই মিলন।

মিনতি খুব বেশি হলে হাসতেন একটু। জবাব দেবারও দরকার বোধ করতেন না। ভাইপো আরো একটা বছর বিদেশে বেশি থেকে যাবে আর তারপরেও ফিরবে কিনা —স্বামীর এই চিন্তা দেখে তিনি নিজের দুশ্চিন্তাও ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। উল্টে জোর দিয়ে বলেছিলেন, মত যখন দিয়ে দিয়েছ আর ভেব না—আমি আগে যা-ই বলি না

কেন, তুমি যত কাল আছ, মিলন তোমাকে ছেড়ে কোথাও থাকতে পারবে না। এটা জেনে নিশ্চিন্তে থাকো।

...গত রাতে শুতে যাবার আধঘণ্টা আগে মিলনের ফোন এসেছে সে বম্বে পৌঁছেছে। আগামীকাল সকালের অর্থাৎ আজ ভোরের ফ্লাইটে দিল্লি আসছে। লণ্ডন থেকে রওনা হবার আগের দিনও ওর টেলিগ্রাম এসেছিল। ওমুক দিনের ওমুক ফ্লাইটে দেশের মাটিতে পা দিচ্ছে।

আজ ঘণ্টাখানেক আগেই ঘুম ভেঙেছে অনুপমবাবুর। তারপরেই চাপা খুশিতে ভিতরটা ভরে গেছে। তা সত্ত্বেও মনে হল শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে কেমন। মাথাও ভার-ভার লাগছে একটু। কিন্তু শরীরের একটু-আধটু ভালমন্দের ধার ধারেন না তিনি। শুয়ে শুয়ে খোশ মেজাজে দিনের প্রোগ্রাম পর পর ছকে নিলেন। এই দিনে ঠাসা কাজের প্রোগ্রাম অবশ্য কিছুই রাখেন নি। অফিস থেকে আজ ছুটিই নিয়েছেন তিনি। তবু মিলনকে নিয়ে আজই একবার অফিসে যাবেন ঠিক করেছেন। কর্তাদের সকলের সঙ্গে বিশেষ করে হেমরাজ মোদীর সঙ্গে মিলনকে নিয়ে দেখা তো করতেই হবে। 'বীভারস'-এর সঙ্গে যুক্ত হবার আগেই অত বড় মুরুব্বি ছেলেটার জন্য কম করেননি। আসলে করেছেন অবশ্য অনুপমবাবুর মুখ চেয়েই। নইলে অত খরচ জুগিয়ে ভাইপোকে দু'বছরের জন্য হায়ার স্টাডিতে পাঠানোর সাধ্য ছিল না। তাঁর সমস্যাটা বোঝামাত্র হেমরাজ মোদীর দরাজ গৌরী সেনের ভূমিকা। মজুমদারবাবুকে ভদ্রলোক শুধু যে বিশ্বাস করেন আর ভালবাসেন তাই নয়, বেশ শ্রদ্ধাও করেন। তাছাড়া এই তিন বছরের মধ্যে হেমরাজ মোদী দু-দুবার বিলেত ঘুরে এসে ভাইপো সম্পর্কে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মিলন লন্ডনে থাকাতে তাঁর যে কত সুবিধে হয়েছে দু'বারই ফিরে এসে এ-কথা তিনি অনেকবার করে বলেছেন।

...মিলনকে নিয়ে হেমরাজের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারটা লাঞ্চের পরের প্রোগ্রাম। কারণ, সকালের আপিসে ছোট বড় সক্কলে বিষম ব্যস্ত থাকে। ব্যস্ততা বিকেলের দিকেও কম নয়, তবু তার মধ্যে একটু ঢিলেঢালা ভাব আসে।...বম্বে থেকে সাড়ে সাতটায় ফ্লাইট, পালামে পৌঁছুতে সাড়ে ন'টা। পৌনে ন'টা নাগাদ রওনা হলেই যথেষ্ট। গাড়িতে সাত-আট মাইল পথ যেতে দিল্লির রাস্তায় বড় জোর পঁচিশ মিনিট। ...সোয়া আটটায় ড্রাইভারকে আসতে বলে দিয়েছেন। তার আগে সাড়ে সাতটা নাগাদ নিজেই তিনি গাড়ি নিয়ে বেরুবেন একবার। আরো আগে বেরুতে পারলে ভাল হত, কিন্তু দিল্লির বাজার তার আগে বসেই না। মিলনের পছন্দের মাছ-মাংস আগের রাতেই এনে ফ্রিজে রাখা হয়েছে। কিন্তু টাটকা ছোট মাছ কাল মেলেনি। রকমারি তাজা ছোট মাছ মিলনের খুব পছন্দ। লণ্ডন থেকে রওনা হবার আগে শেষ চিঠিতেও ওর কাকিমাকে লিখেছিল, ওখানে গিয়ে এবারে মনের সাধে তোমার হাতের ছোট মাছের ঝাল আর চচ্চড়ি খাব। মৌরলা পাবদা বাচা ট্যাংরারা ক'দিন ধরে আমার চোখের সামনে সাঁতরে বেড়াচ্ছে। সেই চিঠি পড়ে অনুপমবাবুরও হাসি পেয়েছিল। ...তিন বছরের মধ্যে ছেলেটা ও-সব চোখে দেখেনি।

মশারির খানিকটা তুলে তিনি গলা বাড়ালেন। ঘরের ভিতরে দস্তুরমত অন্ধকার এখনো। বাইরের অন্ধকার সবে একটু ফিকে হচ্ছে। ও-দিকের খাটে মিনতি এখনো দিব্বি ঘুমোচ্ছে মনে হল। বালিশের পাশে ঘড়ি রেখে শোয়া অনুপমবাবুর বরাবরকার অভ্যাস।

অন্ধকারেও এ-ঘড়িতে সময় দেখা যায়। ওটা তুলে জানালা-মুখো করে নজর করে দেখলেন। ছ'টা বাজতে মিনিট কুড়ি বাকি এখনো।

মিনিট পাঁচেক আবার এ-পাশ ও-পাশ করে মশারি সরিয়ে খাট থেকে নামলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক বিশ্রী কাণ্ড! বেশ বড়সড় একটা হাঁচি এসেই গেল। সেটা থামতে না থামতে পর পর আরো দুটো। একসঙ্গে তিনটে হাঁচি। এনজিনিয়ার মানুষ তিনি। বয়েস সাতান্ন গড়িয়েছে বাস্তব ব্যস্ততার মধ্যে। হাঁচি টিকটিকি নিয়ে সংস্কারের বালাই নেই। কিন্তু প্রত্যাশিত সুদিনের শুরুতেই নিজের তিন-তিনটে হাঁচি নিজেরই ভাল লাগল না। মা-বাবার কথা মনে পড়ল। মা এ সব দারুণ মানতেন, আর শেষের দিকে বাবারও এ সবে একটু খুঁতখুঁতুনি এসে গেছল। অনুপমবাবুর হাসি পেল। বয়েস হলে অনেক রকমের দুর্বলতা ছেঁকে ধরতে চায় বোধ হয়। নইলে এই দিনে নিজের তিন হাঁচি নিজেরই ভাল লাগল না কেন!

—উঠতে না উঠতে হাঁচি শুরু করে দিলে, ঠাণ্ডা-মাণ্ডা লাগল না তো? ওদিকের খাটের মশারির তলায় স্ত্রীর গলা।

স্ত্রীরও চোখের ঘুম ছুটেছে জেনে অখুশি হলেন না। অনুপমবাবু জবাব দিলেন, ঠাণ্ডা কোথায় যে লাগাবো।

দিল্লির ঠাণ্ডা এই অক্টোবরের এখন পর্যন্ত কিছুই নয় বটে। তবু শরীর যে রসস্থ হয়েছে একটু স্ত্রীর কাছে সেটা গোপন রাখতে চাইলেন। কাউকে ব্যস্ত করা তাঁর ধাত নয়।

কিন্তু এই ধাত জানেন বলেই মিনতিও সতর্ক কম নন। দু'হাত জুড়ে ঠাকুর প্রণাম সেরে বললেন, একটু অপেক্ষা করো, ঠাণ্ডা জলে দাড়ি কামাতে বোসো না, আমি উঠে জল গরম করে দিচ্ছি। সদাটার তো এখনো সাড়াশব্দ নেই দেখি—

সদা কলকাতা থেকে অনেককাল আগের আনা পুরনো লোক। ছেলেবেলায় এসেছিল, এখন মাঝবয়সী। সময়কালে হাতে টাকাকড়ি দিয়ে মিনতি তাকে বিয়ে করতে পাঠিয়েছিলেন। বছর দুই পরে পরে একবার দেশে অর্থাৎ ডায়মন্ড হারবারে যেত। এঁদের অসুবিধে হবে না এমন বদলি লোক দিয়ে যেত। তারও দুটো মেয়ে, ছেলে নেই। ছেলে কর্তাবাবুরও নেই বলেই ওরও কোন খেদ নেই। আগে এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে, তারপর বউ মরেছে, তারপর দ্বিতীয় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। এখন আর দেশের ঘরবাড়ির ওপর টান নেই। যাবার নামও করে না। এখানেই বেশ জমিয়ে আছে। বাসন মাজা ঘর ঝাঁট-পাট দেওয়ার ঠিকে মেয়েছেলে লছমি, ড্রাইভার রাম সিং অথবা সামনের সবজি মণ্ডীর চেনা লোকদের কাছে সে এনজিনিয়র সাহেবের নোকর নয়, ম্যানেজার। প্রভুপত্নীর কাছে থেকে থেকে নানা রকম রান্নায় হাত পাকিয়েছে। বাড়িতে আলাদা রান্নার লোক নেই। কারণ নিজের হাতে রান্না করতে মিনতিও ভালবাসেন। তাঁর রান্নাঘরে আধুনিক সরঞ্জামের অভাব কিছু নেই। দুজনে হাত লাগালে এ-পাট আর কতক্ষণের।

একের পর এক বাঁধা-ধরা ব্যাপারগুলো সেরে ফেললেন অনুপমবাবু। দাড়ি কামিয়ে কাগজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম পর্বের চায়ের পেয়ালা শেষ। তারপর গরমজলে স্নান সারতে বেলা সাড়ে সাতটা। নিজেই গাড়ি চালিয়ে আই এন এ মার্কেটের দিকে চললেন। টাটকা রকমারি ছোট মাছ ওই বাজারে বেশি ওঠে। ফিরতে সোয়া আটটা। সদা ততক্ষণে

খাবার টেবিলে ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে অপেক্ষা করছে। সেখানে বসেই মিনতি খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছেন। টেবিলের সামনে চেয়ার টেনে বসতে বসতে অনুপমবাবু ভিতরের দিকে তাকলেন একবার। আজ মিলন আসছে এটা আর কারো অজানা থাকার কথা নয়। জিগ্যেস করলেন, অমি ওঠেনি এখনো?

জবাব না দিয়ে মিনতি মুখ তুলে সদাকে বললেন, ডেকে দে—

প্রায় অকারণেই অনুপমবাবুর দুই ভুরুর মাঝে সামান্য ভাঁজ পড়ল। এই সংসারটাকে যদি একটা সচল যন্ত্র গোছের ধরা যায়, তাহলে দীর্ঘকাল ধরে বিনা বাধায় একে মসৃণ ভাবে চলতে দেখেই অভ্যস্ত তিনি। বাইরের দিক থেকে দেখলে এখনো তেমনি চলছে, কিন্তু বছর তিনেক হল কোথায় অদৃশ্য ব্যতিক্রম অনুভব করছেন অনুপমবাবু। সেটা এই ছোট মেয়ে অমি বা অমিতার কারণে। অমিতা আর আগের সেই অমি নেই। আগে বাড়ির মধ্যে সক্কলের আগে অমিতার ঘুম ভাঙত। তারপর চেঁচামেচি করে অন্য বোনেদের ঘুম ভাঙাতো বলে তারা রাগ করত। এক পেয়ালা চায়ের জন্য সাতসকালে হাঁকডাক করে সদারও ঘুম নষ্ট করত। ব্রেকফাস্টের টেবিলে সবার আগে ও হাজিরা দিত। দিদিদের রাগাবার জন্য কাড়াকাড়ি করে খেত। ছোট মেয়ের অমন দুরন্ত তাজা ভাবটুকুই অনুপমবাবুর সব থেকে ভাল লাগত।

সেই মেয়ের বেড-টির জন্য চেঁচামেচি বন্ধ হয়ে গেছে অনেক দিন। ব্রেকফাস্টের জন্যও ডেকে আনতে হয়। ডাকা হলে আসে। কারো দিকে না তাকিয়ে নিজের নির্দিষ্ট চেয়ারটায় বসেই খবরের কাগজ টেনে নেয়। খবরের কাগজে চোখ বোলাতে বোলাতে চুপচাপ খায়। কেউ কিছু জিগ্যেস করলে দুই এক শব্দে নির্লিপ্ত জবাব দেয়। খাওয়া হলে চুপচাপ উঠে চলে যায়। অনুপমবাবু অনেক দিন পর্যন্ত আশা করেছিলেন মেয়ে তার ভুল বুঝবে, বুঝে আগের মতো হবে। আর তিনি তখন অন্য তিন মেয়েদের থেকেও বেশি ঘটা করে ওর বিয়ে দেবেন। বোনেদের মধ্যে সব থেকে সুশ্রীও এই মেয়েই। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, অনুপমবাবু ভিতরে ভিতরে হাল ছাড়ছেন।

কিন্তু আজকের এই বিশেষ দিনেও এতটুকু ব্যতিক্রম দেখা গেল না। অমিতা এলো। মায়ের হাত থেকে স্টেটসম্যানটা নিয়ে তার পাশের চেয়ার টেনে বসে গেল। প্রথমে চায়ের পেয়ালায় গোটা কয়েক চুমুক দিল। তারপর কাগজের ওপর চোখ, কি খাচ্ছে না খাচ্ছে দেখছেও না। অনুপমবাবু প্রায়ই যেমন লক্ষ্য করেন আজও করলেন। মেয়েটার মুখের সুগৌর পেলবতার ওপর রুক্ষ ঘন কিছু এঁটে বসেছে।

একটু গলা-খাঁকারি দিয়ে যতটা সম্ভব সহজ ভাবেই অনুপমবাবু বললেন, অমি যাচি স তো?

অমিতা কাগজ থেকে মুখ তুলল।—কোথায়?

—বাঃ, আজ মিলন আসছে সাড়ে ন'টার ফ্লাইটে, তুই জানিসও না নাকি!

অমিতার দু'চোখ আবার কাগজের দিকে নেমে এলো।—জানব না কেন, মিলন আসছে বলে স্কুল কামাই করতে হবে...!

গলার স্বরে একটুও বিরক্তি নেই। তবু অনুপমবাবুর মনে হল তিনি যেন ছেলেমানুষের মতো কিছু জিগ্যেস করেছেন।

অমিতা ইংলিশ মিডিয়ামের এক নাম-করা মেয়েস্কুলে ইংরেজি পড়ায়। ভাল মাইনে।

চাকরি নিজেই জোগাড় করেছে। এম. এ.-তে যে রেজাল্ট করেছিল চেষ্টা করলে কলেজেও চাকরি পেত হয়তো। নিজের খরচ চালানোর জন্যে বাবার মুখাপেক্ষী হবার ইচ্ছে নেই—কিছু টাকার জন্যেই চাকরি। তাই হাতে যেটা সহজে এসেছে সেটাই ধরেছে। নামী স্কুল হলেও নিজের মরজিমাফিক অনেক দিনই কামাই করে থাকে। কামাইয়ের ফলে মেয়ে সব মাসে পুরো মাইনে পায় কিনা অনুপমবাবুর সন্দেহ।

মিনতিদেবী এমনিতেই স্বল্পভাষিণী। এখন আরো একটু গম্ভীর। আড়চোখে স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন একবার।

অনুপমবাবু আর যা-ই হোক, আজকের দিনেও এই জবাব আশা করেননি। রাগ সহজে করেন না তিনি, কিন্তু ভিতরটা আপনা থেকেই কেমন উষ্ণ হয়ে উঠছে। সকালের তিন হাঁচি মনে পড়ল। দিনটা সত্যি কেমন যাবে আজ কে জানে! নইলে তিন বছর দু'মাস বাদে মিলন আসছে জেনেও এই মেয়ে এমন কথা বলতে পারে!

সব থেকে খুশি হওয়া আর সব থেকে হৈ-চৈ করার কথা ওরই। দুজনে সমবয়সী ওরা। মিলনের থেকে অমিতা মাত্র আড়াই মাসের ছোট। ছেলেবেলা থেকে দুজনের ঝগড়াঝাঁটি আড়াআড়ি মারামারি লেগেই থাকে। বড় হবার পরেও ওদের ছেলেমানুষি কমেনি। কথায় কথায় একজন আরেকজনকে চড়চাপড় বসিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে এত ভাব যে দু'দণ্ড কেউ কাউকে চোখের আড়াল করতে পারত না। পিঠোপিঠি খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো ভাইবোন না হলে, ওদের কাণ্ড দেখে লোকের মনে অশোভন সন্দেহ উঁকিঝুঁকি দিত। অমিতার বড় এক পিসতুতো বোন একবার দিল্লি বেড়াতে এসে মিনতির কাছেই উঠেছিলেন। ছিলেনও প্রায় তিন সপ্তাহের উপর। সব দেখেশুনে যাবার আগে মহিলা বোনকে দস্তুরমত সতর্ক করে দিয়ে গেছলেন—হলেই বা খুড়তুতো ভাইবোন...এত ভাল নয়।

এত বলতে সেই মহিলা কত আর দেখেছেন। মিলনের মতো ছেলে হয় না সত্যি, তবু নিজের মেয়ের কাণ্ডজ্ঞানশূন্য মাখামাখি দেখে মিনতি নিজেই কত সময় রাগ করেছেন, স্বামীকেও বলেছেন, তোমার এই মেয়ের বয়েস বাড়লে কি হবে—বড় হবে না!

রাগের কারণও অগোচর নয় অনুপমবাবুর। মিলন অনেক সময় নিজের ঘরের খাটে শুয়ে পড়াশুনা করত। অমিতা এসে ধুপ করে হয়তো তার পাশেই শুয়ে পড়ল। তারপর গল্প শুরু হল বা পড়া নিয়ে আলোচনা। এ নিয়ে মা মেয়েকেই বকাবকি করতেন। তার জবাবে মেয়ে একদিন যা করল অনুপমবাবুর বেশি করে মনে পড়ল এখন।

...ওইরকম পাশাপাশি শুয়েই অমিতা মিলনের সঙ্গে কি নিয়ে তর্ক শুরু করে দিয়েছিল। বাইরে মায়ের গলা পেয়ে সচকিত একটু। তারপরেই দুষ্টুবুদ্ধি মাথায়। চাপা গলায় বলল, মা আসছে, মজা করি একটু, খবরদার ফাঁস করে দিবি না—

বলেই কাত হয়ে মিলনের কাঁধ বেড়িয়ে ধরে জোরে বার দুই ঝাঁকুনি দিয়ে গলা ছেড়ে বলে উঠল, ফের আমার সঙ্গে লাগতে আসবি তো তোকে আমি শেষ করে দেব বলে দিলাম—!

কিন্তু মা যে ওর চাপা গলার কথাগুলো আগেই শুনে ফেলেছে সেটা অমিতা জানত না। মিনতি তখন একেবারে দোরগোড়ায়। ঘরের এধারে পা দিয়ে দৃশ্যটা একবার

দেখলেন। তারপর সরে গিয়ে স্বামীর কাছে মেয়ের দুষ্টুমির কথা বলতে বলতে হেসেই ফেললেন।

অনুপমবাবু শব্দ না করে বড় নিশ্বাস ফেললেন একটা। মিলন যেদিন লন্ডন রওনা হয়ে গেল সেই দিনটার কথাও মনে পড়ছে। প্লেনটাকে যতক্ষণ দেখা যায় সকলেই সেদিকে চেয়ে ছিলেন। তারপর প্রথমেই এই ছোট মেয়ের দিকে চোখ গেছল তাঁর। নিজের মনও তখন ভারী খারাপ। স্ত্রীরও। তবু ঠাট্টার সুরে বলেছিলেন, কি রে, তুই কাঁদছিস-টাঁদছিস না তো?

অমিতা কাঁদছিল না বটে, কিন্তু মা বাবা আর দিদিদের চোখের আড়াল হবার তাগিদ ছিল। রাগ দেখিয়ে আগে আগে গাড়িতে গিয়ে উঠেছিল। মিলনের বিলেত যাবার ব্যাপারে ওরই সব চেয়ে বেশি আপত্তি ছিল। বাবাকে বলেছিল, ছেলে পাস করতে না করতে বাইরে পাঠানোর দরকার কি—দু'বছর সবুর করো না, তারপর একসঙ্গেই যাব।

...আর বাইরে যাওয়া একেবারে ঠিক হয়ে যেতে রাগ করে দিনকতক মিলনের সঙ্গে কথাই বলেনি তাও সকলের চোখে পড়েছিল। বাবা-মায়ের ওপরেও এত রাগ তখন যে সকলকে শুনিয়ে বলেছে, মিলন যদি একটা মেম বিয়ে করে নিয়ে আসে তাহলে ও আনন্দে হরিলুঠ দেবে।... মিলন চলে যাবার পর এই অমিতা কদিন বাড়িতে টিকতে পারেনি। ওর বড়দির সঙ্গে গাজিয়াবাদ চলে গেছল। তিন বছর দু'মাস বাদে আজ মিলন আসছে, কিন্তু মেয়ের মুখে এতটুকু খুশির আঁচ দেখলেন না অনুপমবাবু।

কাগজ রেখে অমিতা উঠে পড়ল। ডিশে অর্ধেক খাবার পড়ে থাকল। আগে মিনতি ওকে আটকে খাওয়াতে চেষ্টা করতেন, এখন আর করেন না। ও চলে যেতে অনুপমবাবু হাত-ঘড়ি দেখলেন। আর মিনিট কুড়ির মধ্যে এয়ারপোর্টে রওনা হবেন।

ঈষৎ বিরক্ত মুখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন।—তুমি যাচ্ছ তো...?

মিনতি কয়েক পলক চেয়ে রইলেন। অসহিষ্ণুতার আঁচ কেন বুঝতে এক মুহূর্ত লাগল না।—তোমার কি মনে হয় না-ও যেতে পারি?

—তৈরি হয়ে নাও তাহলে, আর বেশি সময় নেই।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমেই অনুপমবাবু থমকে দাঁড়ালেন। আর একটা চকচকে লাল বিলিতি ছোট গাড়ি পাশ কাটিয়ে কার পার্কিং-এর দিকে চলে গেল। অনুপমবাবুর গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসেছে রাম সিং। পার্কিং-এর দায় তার। এই গাড়ি সর্বক্ষণের জন্য চিফ এনজিনিয়ার হিসেবে অনুপমবাবুর হেফাজতে থাকলেও ওটার মালিক কোম্পানি। তেল খরচ বা ড্রাইভারের মাইনেও কোম্পানি দেয়। যে গাড়িটা পাশ দিয়ে পার্কিং-এর দিকে চলে গেল সেটা স্বয়ং বড় সাহেবের মেয়ের। ম্যানেজিং ডাইরেক্টার হেমরাজ মোদীর একমাত্র আদরের মেয়ে এলা মোদীর। সে নিজেই ও-গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়ায়, এখনো নিজেই চালিয়ে এলো। অনুপমবাবু গাড়িটাও চেনেন, মালিকের মেয়েকেও।

রাম সিংও গাড়ি নিয়ে পার্কিং-এর দিকে চলে গেল। স্বামীকে দাঁড়িয়ে যেতে দেখে মিনতি জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে তিনি সামান্য মাথা নাড়লেন শুধু। অর্থাৎ একটু সবুর।

মিনিট তিনেকের মধ্যে এলা মোদীকে ফিরে আসতে দেখা গেল। ঝকঝকে মেয়ে।

পরনে দামী শাড়ি ব্লাউজ। হাতে ম্যাচ করা ভ্যানিটি ব্যাগ। পায়ের হিল তোলা দামী জুতোও তাই। চোখে সাদা ফ্রেমের ধূসর-লালচে সান-গ্লাস। এবারে মিনতিও ওই মেয়েকে দেখলেন এবং সবুর করার কারণ বুঝলেন। এলা মোদীকে তিনিও ভালই চেনেন। মোদী কোর্টের সব থেকে বড় প্রাসাদখানাই ওদের। সামাজিক আমন্ত্রণে এ পর্যন্ত অনেকবারই মিনতি স্বামীর সঙ্গে সেখানে গেছেন। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর যাওয়াটাও আনুষ্ঠানিক নিয়মের মধ্যে পড়ে। মেয়েটার বয়েস এখন বছর বাইশ-তেইশ হবে। ও জন্মাবার পর ঘটা করে যে উৎসব হয়েছিল, মিনতি তাতেও গেছলেন। সেই মেয়ে এত বড়টি হয়েছে এখন। শুধু মেয়ে নয়, ওর মায়ের সঙ্গেও আলাপ আছে মিনতির। সাবিত্রী মোদী। মিনতির বয়সীই হবেন। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হেমরাজ মোদী অনুপম মজুমদারের থেকে বছর তিনেকের বড় হলেও এলা তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের মেয়ে। প্রথম পক্ষটি নিঃসন্তান অবস্থায় বিয়ের বছর দুই আড়াইয়ের মধ্যে মারা যান। তারও বছর দুই পরে দ্বিতীয় পক্ষটি ঘরে এসেছিলেন। কাজকর্মের ব্যাপারে হেমরাজ মোদী খুব রাশভারী কড়া মানুষ হলেও মানুষ হিসেবে তাঁর অনেক সুখ্যাতি মিনতি ঘরের লোকের মুখে শুনে এসেছেন। তাঁর দরাজ মনের পরিচয়ও অনেক পেয়েছেন। কিন্তু কুবেরের ঘরের গৃহিণী এমন সাদামাটা আর অমায়িক অতিথিপরায়ণ হতে পারেন, সাবিত্রী মোদীর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় না ঘটলে মিনতি ভাবতেও পারতেন না, বিশ্বাসও করতেন না। ফলে ওই পরিবারটির প্রতি তাঁরও শ্রদ্ধা কম নয়।

এলা মোদী খানিকদূর থেকেই তাঁদের দেখেছে। মজুমদার সাহেবকে তো চেনেই, তাঁর স্ত্রীকেও চেনে। একটু দূর থেকে দুই হাত তুলে নমস্কার জানাল। তারপর সপ্রতিভ মুখে কাছে এসে মিনতির উদ্দেশ্যে আবার দু'হাত জুড়ল। হেসে বলল, নমস্তে—

মেয়েটা ধপধপে ফর্সা। হাসলে অর্থাৎ লিপস্টিক মাখা দু'ঠোঁট ফাঁক হলে ঠোঁটের ভিতরটাও টুকটুকে লাল দেখায়। গাল দুটো একটু ফোলা হলেও বেশ লম্বা। ভাল স্বাস্থ্য। এত ফর্সা বলেই মাথার চুলও ততো কালো মনে হয় না। কিন্তু মিনতির বিবেচনায় সুখের ঘরে যে রূপের বাসা, সেই রূপ এই মেয়ের। কিছুটা চোখ-ধাঁধানো গোছের—চোখ জুড়নোর নয়। এই মেয়ের তুলনায় নিজের ছোট মেয়ে অমিতা অনেক কম ফর্সা হলেও নাক মুখ চোখের বিচারে তাকে ঢের বেশি সুন্দরী ভাবেন মিনতি মজুমদার। কিন্তু ভেবেছেনই শুধু, মুখে এ কথা স্বামীকেও বলেননি কখনো।

নমস্তের বিনিময়ে মিনতি আবার হেসে মাথা নাড়ালেন। এত কাল দিল্লি বাসের ফলে মোদীরাও ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে পারে। কিন্তু মজুমদার বাড়ির সকলের হিন্দী বলা-কওয়া তো জল-ভাত ব্যাপার। মিনতির তাড়া খেয়ে মেয়েগুলো আর মিলন যে বাংলা লিখতে বা বলতে পারে এটাই বেশি। অতএব দেখাসাক্ষাৎ হলে কথাবার্তা সব হিন্দীতে।

অনুপম মজুমদার হেসে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নিজে ড্রাইভ করে এয়ারপোর্টে যে মিস মোদী—কাউকে রিসিভ করতে নাকি?

নিজের ছোট মেয়ের থেকে ছোট হলেও বড় কর্তার মেয়েকে বাইরের কারো নাম ধরে ডাকার রেওয়াজ নেই। কখনো কোন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে ওদের বাড়ি গেলে মিনতি নাম ধরেও ডাকেন না, মিস-টিসও তাঁর মুখে আসে না। 'বীভারস'-এর পদস্থ

অফিসারদের মধ্যে একমাত্র অনুপম মজুমদারই হয়তো ওকে তুমি করে বলেন, সেই সুবাদে মিনতিও। আর বাবার যাঁরা শ্রদ্ধা আর নেকনজরের মানুষ এলা মোদীও তাদের ভাল জানে।

ধূসর-লালচে সান-গ্লাসের ভিতর দিয়ে হাসি-মাখা দু'চোখ ঠাওর করা যাচ্ছে। সপ্রতিভ হাসিমুখে মাথাও নাড়ল, অর্থাৎ তারও কাউকে রিসিভ করতেই এয়ারপোর্টে আসা। তারপর ফস করে বলে বসল, আপনারা যাকে রিসিভ করতে এসেছেন আমিও তাকেই রিসিভ করতে এসেছি। এর মধ্যে সকলে মিলে আমরা দু-দুবার লন্ডন গেলাম, মিলনের সঙ্গে আমারও দারুণ ফ্রেন্ডশিপ হয়ে গেছে—আপনারা জানেনও না? প্রশ্ন বা বিস্ময়টুকু মিনতির দিকে চেয়ে।

ভিতরে ভিতরে বেশ বড়সড় একপ্রস্থ ধাক্কা খেলেন অনুপম মজুমদার। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সপরিবারে লন্ডন যাচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা করে দরকারমত যতটা সম্ভব সাহায্য করার কথা দু'বারই ভাইপোকে তিনি লিখেছিলেন বটে। আর দেশে ফিরে হেমরাজ মোদী দু'বারই ভাইপোর খুব প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তাঁর মেয়ের সঙ্গে মিলনের দারুণ ফ্রেন্ডশিপ হয়ে যাবার সম্ভাবনা কখনো মাথায়ই আসেনি। দারুণ ফ্রেন্ডশিপ বলতে কি বোঝায় বা কতটা বোঝায় এখনো ধারণার বাইরে। কিন্তু এ মেয়ে যেভাবে বলল কথাগুলো তাতে তাঁর দু'চোখ এই মেয়ের মুখের ওপর যেন হোঁচট খেল একপ্রস্থ। বিপাকে পড়া গোছের মুখখানা হয়ে গেল তাঁর। এত বড় ঘরের দুলালী গলফ লিঙ্ক থেকে নিজে ড্রাইভ করে এয়ারপোর্টে এসেছে দারুণ ফ্রেন্ডশিপের মর্যাদা দিতে—ব্যাপারটা হঠাৎ কম দারুণ মনে হচ্ছে না অনুপম মজুমদারেরও। খুশিতে ওই ফর্সা মুখ টসটস করছে।... মিলন কত সময় কত কথা লেখে। 'বীভারস'-এর বড় কর্তার সপরিবারে দু'বারের সফর সম্পর্কে এটা-সেটা লিখেছে—কিন্তু তার মেয়ের সঙ্গে দারুণ ফ্রেন্ডশিপ ছেড়ে পরিচয়ের আভাসও দেয়নি।

কব্জির দামী হাত-ঘড়ি দেখল এলা মোদী।—চলুন, সময় হয়ে এলো।

ওকে আর স্ত্রীকে সঙ্গে করে অনুপমবাবু ইন্টারন্যাশানাল ভিজিটার্স লাউঞ্জে এসে দাঁড়ালেন। মিলনের সঙ্গে সকলে মিলে ওরা লন্ডন থেকে কোথায় কোথায় গেছল, কোথায় কি মজা হয়েছে, দ্বিতীয়বারে মিলন কোথায় কি ধরনের দুষ্টুমি করেছে—খুশি মুখে হাত নেড়ে স্ত্রীকে সেই গল্প শোনাচ্ছে এলা।...স্ত্রী-কন্যাসহ ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের সঙ্গে কোথায় কোথায় গেছল, মিলনও সে-সব কাকাকে দু'বারই চিঠিতে জানিয়েছিল বটে, কিন্তু সেই যাওয়াটা বড় কর্তার সুবিধার্থে অথবা গাইড হিসেবে যাওয়ার থেকে বেশি কিছু হতে পারে এমন চিন্তা অনুপমবাবুর কখনো মাথায়ও আসেনি। এই মুহূর্তেও দুশ্চিন্তার আঁচড় কিছু পড়েনি, কেবল হকচকিয়ে গেছেন বেশ। স্ত্রীও অবাক হয়েছে কিনা আড়চোখে লক্ষ্য করলেন।

ঘড়ি ধরা সময়ের পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে প্লেন এলো। ল্যান্ড করল। তোড়জোড় করে সিঁড়িটিঁড়ি লাগানো হল। তারপর একে একে যাত্রী নামতে লাগল। তারপর একটা ব্যাগ হাতে মিলনকেও নামতে দেখা গেল।

—হ্যালো! হ্যালো! হ্যলো! এলা মোদী জোরে জোরে রুমাল নাড়তে নাড়তে উৎফুল্ল ছোট মেয়ের মত চেঁচামেচি করে উঠল। কিন্তু এতটা দূর থেকে মিলনের তা ঠাওর

করতে পারার কথা নয়, শুনতে পাওয়ার কথা তো নয়ই। যদিও প্লেনটা ভিজিটার্স লাউঞ্জের কাছাকাছি অর্থাৎ আগত যাত্রীদের হাঁটাপথের ফারাকেই থেমেছে।

আরো আধাআধি আসার পর মিলনের চোখ এদিকে আটকাল। একমুখ হেসে হাত নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসছে এবারে।

এলার তর সইল না আর। একে ওকে ঠেলে ছুট লাগালো একটা। বিমূঢ় চোখে অনুপম মজুমদার স্ত্রীর দিকে তাকালেন। মিনতি তাঁর দিকে। চোখের ভাষা দুজনের এক প্রায়। কয়েকমুহূর্ত পরে আত্মস্থ হয়ে তাঁরাও পায়ে পায়ে এগোলেন।

কাছে এসে দেখলেন, মিলন আর এলা অতি অন্তরঙ্গ খুশি মুখে হাত ঝাঁকাঝাঁকি করছে।...এই তিন বছরে ছেলেটা আরো সুন্দর আর ঢের বেশি স্মার্ট হয়েছে বটে। কাকা কাকিমাকে দেখেই এলার হাত ছেড়ে মিলন ছুটে এলো। কাকার পায়ের ধুলো নিতে যেতে তিনি জড়িয়ে ধরলেন ওকে। ছেড়ে দেবার পর কাকিমাকে প্রণাম করল। তারপর ঈষৎ বিস্ময়ে এদিক ওদিক চেয়ে জিজ্ঞেস করল, অমি কোথায়? আসেনি?

মিনতি ছোট্ট জবাব দিলেন, স্কুলে যেতে হবে বলল...

—তিন বচ্ছর বাদে এলাম আর ওকে স্কুলে যেতে হবে! স্কুল করা বার করছি! তোমরা কেমন আছ?

হেসে এবারও মিনতিই বলল, আমরা তো ভালই আছি, তুই কেমন?

খোশমেজাজে এবারে টান হয়ে দাঁড়াল মিলন। ঘাড় ফিরিয়ে সাত গজ দূরে এলার দিকে তাকাল একবার। তারপর বলল, মূর্তিখানা দেখেও জিজ্ঞেস করছ?

নিজের চেহারার একটু দেমাক আগেও ছিল মিলনের। মিনতি হেসেই বললেন, খুব হয়েছে—

কাস্টমস—এর ঝামেলা বম্বেতেই শেষ হয়েছিল। এখন শুধু মালগুলো আসার অপেক্ষা। তাও বেশি সময় লাগল না। ওগুলো পোর্টারের মাথায় চাপিয়ে সকলে একসঙ্গে বেরুল। বাইরে পা দিয়ে এলা মোদী অনুপমবাবুকে বলল, আপনারা লাগেজ নিয়ে এখানে অপেক্ষা করুন, আমি আপনার ড্রাইভারকে খবর দিচ্ছি, আমার গাড়িটাও নিয়ে আসছি। তারপর উৎফুল্ল আহ্বান—মিলন, কাম উইথ মি—

ড্রাইভারকে খবর 'ইন্টারকম' কানেকশন থেকেও দেওয়া যেত। সেখান থেকে গাড়ির নম্বর বা নাম ধরে ডাকলেই রাম সিং গাড়ি নিয়ে চলে আসত। কিন্তু অনুপম মজুমদারের সেটা মাথায় এলো না। দেখলেন মিলনের মুখে এতটুকু বিব্রত আভাসও নেই। পাশাপাশি দুজনে কার পার্কিং-এর দিকে চলল ওরা। এলা মোদী হাত নেড়ে নেড়ে খুশি মুখে বলছে কি, আর মিলনও আনন্দে মাথা নাড়ছে। অনুপমবাবু স্ত্রীর দিকে তাকালেন। মিনতির দু'চোখ ওদের দিকেই।

হঠাৎ আবার সকালের তিন-হাঁচি মনে পড়ে গেল অনুপমবাবুর।

রাম সিং অনেক দিনের চৌকস ড্রাইভার। সে খবর পাবার অপেক্ষায় বসে নেই। ঠিক সময়ে নিজেই গাড়ি নিয়ে চলে এলো। তারপর নেমে মালগুলো সাজিয়ে তোলার দিকে মন দিল।

ততক্ষণে এলা মোদীর চোখ-ধাঁধানো লাল গাড়িটাও হাজির। এলার হাতেই স্টীয়ারিং। পাশে মিলন। ওদের গাড়ির পিছনে তার গাড়ি থামতে মিলন নেমে কাকা কাকিমার দিকে এগিয়ে এলো।

—লাগেজ তোলা শেষ?

অনুপমবাবু বললেন, হ্যাঁ। তারপর দ্বিধা কাটিয়ে জিগ্যেস করলেন, তুই কি ওই গাড়িতে যাবি নাকি?

—না, ও চলে যাচ্ছে। ফিরে এলার উদ্দেশে হাত নেড়ে আপাত বিদায় জানাল তাকে। তেমনি হাত নেড়ে এলা মোদী সামনের গাড়ির পাশ কাটিয়ে বেগে ছুটল। মিলন বলল, চলো, ওঠা যাক। কাকা-কাকিমার মুখের বিড়ম্বনার ছায়া তার চোখেও পড়েনি।

অ্যামবাসাডার গাড়ি। তিনজনেই পিছনের সীটে। ওধারে কাকা, মাঝে কাকিমা, এ-ধারে মিলন। গাড়ি সচল হতেই মিলন জিজ্ঞাসা করল, বড়দি মেজদি অ্যান্ড ছোড়দি কোম্পানির খবর কি? এখানে নেই কেউ?

বড়দি মেজদি ছোড়দি বলতে প্রমিতা নমিতা আর শমিতা। তিনজনেরই ছেলেপুলে আছে একটা দুটো করে তাই একসঙ্গে কোম্পানি বলে ছেড়ে দিল।

মিনতি জবাব দিলেন, না, যে-যার শ্বশুরবাড়ি...ভালই আছে সব।

একটু অভিমানের সুরে মিলন বলল, আমি আসছি শুনে বড়দি অন্তত দিল্লিতে থাকবে ভেবেছিলাম।

তিন মেয়ের মধ্যে মেজ নমিতা আর সেজ শমিতার কলকাতায় বিয়ে হয়েছে; আর বড় প্রমিতার বিয়ে হয়েছে গাজিয়াবাদে। দিল্লি খুব কাছে, তাই বলা।

মিনতি জবাব দিলেন, আসবে'খন, ওর আবার ছেলের স্কুল। তোর আসার খবর দিয়ে সকলকেই চিঠি দিয়েছি...

মিলনের গলায় এর পরেই সত্যিকারের বিস্ময়।—আচ্ছা, অমির ব্যাপারখানা কি বলো তো, আমি লন্ডনে পৌঁছনোর এক মাসের মধ্যে স্কুলে জয়েন করার খবর দিয়ে একটা মাত্র চিঠি লিখেছিল ও। তারপর থেকে আমার পর পর চার-পাঁচটা চিঠির একটা জবাব পর্যন্ত দিলে না! রাগ করে আমিও লেখা বন্ধ করে দিলাম—তোমরাও তো ওর কথা বিশেষ কিছুই লিখতে না—ও কি বিয়ে করবেই না ঠিক করে বসে আছে?

সামান্য ঘাড় ফিরিয়ে মিনতি আড়চোখে স্বামীর মুখখানা দেখে নিলেন। সামনের দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে আছেন। এদিক ফিরে এবারে একটু গলা খাটো করে খুব চাপা ক্ষোভে মিনতি জবাব দিলেন, ও-মেয়ের মতি-গতি আমরা কিছু বুঝি না, এবারে তুই চেষ্টা করে দেখ যদি কিছু বুঝতে পারিস—আমরা তোর আসার অপেক্ষাতেই ছিলাম—

একটু ঘুরে মিলন কাকিমার মুখখানা দেখল।—এনিথিং রং?

—কে জানে! বাড়ি গিয়ে ধীরেসুস্থে শুনিস'খন।

এটুকু থেকেই বোঝা গেল, ছোট মেয়ে অমি বা অমিতাকে নিয়ে কাকা-কাকিমার মনে শান্তি নেই। কাকিমাকে ছাড়িয়ে মিলনের দু'চোখ এবার কাকার মুখে আটকালো। বলে উঠল, এসে অবধি তো কাকুকে একেবারে চুপচাপ দেখছি!

অনুপমবাবু সহজ সুরেই বললেন, তোদের কথা-বার্তা শুনছি।

মিনতি শব্দ করে হাসলেন একটু। মন্তব্য করলেন, তোর কাকু একটু নার্ভাস শক খেয়েছে।...ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের মেয়ে এরোড্রোমে তোকে রিসিভ করতে এসেছে দেখল, তারপর ওই মেয়ে নিজেই বলল, দু-দুবার বিলেত গিয়ে দারুণ ফ্রেন্ডশিপ হয়ে

গেছে তোর সঙ্গে...দারুণ ফ্রেন্ডশিপটা কি ব্যাপার সেই থেকে তাই ভাবছে হয়তো।

মিলন হা-হা শব্দে হেসে উঠল। অনুপমবাবুর ঠোঁটের ফাঁকেও হাসি ভাঙছে একটু। ভাইপো এই প্রসঙ্গেই কিছু বলতে যাচ্ছে মনে হতে অস্ফুটস্বরে বললেন, বেটার নট হিয়ার...

সতর্ক করার কারণ, সামনের ড্রাইভার রাম সিং। সে এক বর্ণ বাংলা বলতে পারে না। কিন্তু দীর্ঘকাল এই বাঙালী পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে বাংলা একেবারে বোঝে না এমন নয়। কিন্তু সদ্য বিলেতফেরত ভাইপোটি যে-মেজাজে আছে, কথা ক'টা তার কানেই গেল না হয়তো। নিজের ঝোঁকেই ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের মেয়ের সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ। বলে উঠল, যা-ই বলো কাকিমা, দু-দুবার দেড় মাস ধরে এলা মোদীকে দেখে দেখে অবাক আমিও কম হইনি...অমন বিশাল বড়লোকের মেয়েরা খুব খামখেয়ালি হয় জানতাম।...কিন্তু এত সিম্পল আবার সেই সঙ্গে অত ব্রাইটও হতে পারে ধারণাই ছিল না। সবেতে খুশি, সবেতে ওর মজা—

একটু হাসি ছুঁয়ে থাকলেও তেমনি নির্বিকার মুখ অনুপমবাবুর। এবারে আরো একটু স্পষ্ট করেই বাধা দিলেন, নট হিয়ার—।

মিলন একটু থমকে ড্রাইভারের দিকে তাকাল। কাকার সতর্ক করার কারণটা এবারে মাথায় ঢুকেছে। অপ্রতিভ দু'চোখ কাকিমার দিকে ফিরতে তিনি একটা হাত ওর ঘাড়ের পিছনে চালিয়ে দিয়ে মাথাসুদ্ধ কান নিজের মুখের কাছে টেনে আনলেন। তারপর ওপাশের লোকও শুনতে না পায় এমননি চাপা আর গম্ভীর অনুশাসনের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, তোর কাকা ঘাবড়েছে, তুই অবাক হয়েছিস না মুগ্ধ হয়েছিস?

—কি যে বলো! হাসিমুখে কথাটা ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চাইল মিলন মজুমদার।

মিনতি মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে চাইলেন। অত বড় লোকের মেয়ের সঙ্গে যেটুকু হৃদ্যতা দেখলেন তাতে তিনিও হকচকিয়ে গেছলেন।

বাড়ি ফিরে দু'তরফের খবর আদান-প্রদানের ফাঁক দিয়ে ঘণ্টা দুই কেটে গেল। বিলেত থেকে মিলন কি ডিগ্রি আর ডিপ্লোমা এনেছে, কোথায় কি ধরনের কাজ করেছে, মাস গেলে কত করে পেয়েছে, কোথায় কোথায় বেড়িয়েছে সব খুঁটিয়ে শুনলেন অনুপম মজুমদার। এখানকার কোম্পানিতে অর্থাৎ 'বীভারস'-এ শুরুতে সে কি ধরনের কাজে লেগে যেতে পারে সেই আভাসও দিলেন। হেমরাজ মোদীর সঙ্গে তাঁর মোটামুটি কথা-বার্তা হয়েই আছে, কিন্তু আপাতত মাইনে কি হবে না হবে সে সম্পর্কে ভদ্রলোক মুখ খোলেননি জানালেন। শুধু বললেন, ভালই দেবে মনে হয়—তা যা-ই দিক, কাজে তো এই কোম্পানিতেই লাগতে হবে তোকে।

এ কথার কিছু তাৎপর্য আছে। আর মিলনও তা জানে।

সেই ছেলেবেলা থেকে বাবা-মায়ের সত্যিকারের অভাব সে কখনো টের পায়নি। কাকা-কাকিমা যখন ওকে কলকাতা থেকে দিল্লিতে নিজেদের কাছে নিয়ে আসেন তখন ও ক্লাস সেভেনে পড়ে। এখানে বোনেদের বাড়িতে পড়ানোর মাস্টার ছিল না, কিন্তু ওর জন্যে একজন মাস্টার রাখা হয়েছিল। দিল্লিতে প্রাইভেট টিউটরের মাইনে কলকাতার ডবল। অবশ্য আড়াআড়ি করে অমিতাও তার মাস্টারের কাছে পড়তে আসত। পড়তও। দুজনের আলাদা স্কুল কিন্তু একই ক্লাস। যাক, পড়াশুনায় মিলন যে সেই স্কুল থেকে

এনজিনিয়ারিং-এর শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত সকলকে পিছনে ফেলে রাখতে পেরেছে সেটা সম্ভব হয়েছে শুধু কাকার জন্যে। এনজিনিয়ারিং পড়বে কিনা সেই দ্বিধা বরং মিলনের নিজের ছিল। কারণ, তখন তো ও আর ছোটটি নেই, সব বুঝবে না কেন? কাকা বড় চাকরি করে, কনস্ট্রাকশন সাইডের চিফ এনজিনিয়ার হিসেবে মোটা মাইনেও পায়। মোদী-কোর্টের মধ্যেই ফ্রি কোয়ার্টার্স, ফ্রি-গাড়ি, ফ্রি টেলিফোন। কাকা সাদাসিধে চালের মানুষ হলেও তার মেয়েদের দিল্লির ঠাট বজায় রাখার ব্যাপারে তেমন আপোস ছিল না। ফ্রিজ তো বটেই, গরমের সময় টেকা যায় না বলে দু-দুটো এয়ারকুলার বসাতে হয়েছে। দিল্লির মানুষ টিভির নাগাল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাকার বাড়িতেও টেলিভিশন এসে গেছে। মেয়েদের আবদার রাখার ব্যাপারে কাকিমা বরং এক-আধ সময় বাধা দিয়েছে, কিন্তু কাকা যাকে বলে মুক্তহস্ত। সকলের ভাল খাওয়া-পরার ব্যাপারে কখনো এতটুকু কার্পণ্য করেননি।...তারপর একে একে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া আছে। এনজিনিয়ারিং পড়ার বছর দুই আগে খুব ঘটা করে শুধু বড়দির বিয়ে হয়েছিল। মেজদি নমিতা আর ছোড়দি শমিতার বিয়েও সুযোগ পেলে দিলেই হয়। কাকার সে-জন্য কত টাকা দরকার মিলনের ধারণা আছে।

অবশ্য বড়দির বিয়েতে, মিলন কাকা-কাকিমার মুখেই শুনেছে, হেমরাজ মোদী দরাজ হাতেই বাড়তি টাকা দিয়েছেন। এমনিতে ভদ্রলোক তাঁর পদস্থ আর বিশ্বস্ত অফিসারদের বছরে একবার করে থোকে আট-দশ হাজার টাকা করে দিয়ে থাকেন। সেই টাকা খাতা-কলমের হিসেবের বাইরের টাকা, দেওয়াটাও তেমনি হাতে হাতে আলাদা আলাদা এক একজনকে ডেকে হিসেবের বাইরে দেওয়া, যার সঙ্গে ইনকাম ট্যাক্সের কোন ছোঁয়াছুঁয়ি নেই। কিন্তু কাকুর এতই খরচ যে সে টাকাও থোকে জমবে তার উপায় নেই। বাড়তি টাকা আসতে না আসতে বাড়তি খরচ। হেমরাজ যতই দিক বাকি তিন মেয়ের বিয়ে দিতে প্রভিডেন্ট ফান্ডে হাত পড়বে কিনা মনে মনে মিলন সেই হিসেবও করত। তাই যত ইচ্ছেই থাক, এত খরচের এনজিনিয়ারিং-এ ভর্তি হবার ব্যাপারে মিলনের দ্বিধা ছিল। কিন্তু কাকার এক কথায় সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঘুচে গিয়েছিল। তিনি প্রায় ধমকের সুরে বলেছিলেন, খরচের কথা তোকে কে ভাবতে বলেছে—তুই কি আমার ছেলে নোস নাকি? আমার পিছনে তুই ছাড়া কে দাঁড়াবে?

এনজিনিয়ারিং পাশ করে বেরুনোর ফাঁকে মেজদি আর ছোড়দিরও তেমনি ঘটা করে বিয়ে হয়েছে। কাকার এতে খরচ আরো বেশি হয়েছে, কারণ পরের দুজনের বিয়ে কলকাতায় হয়েছে। আর দু'বারই ঘটাও বড়দির বিয়ের থেকে বেশি ছাড়া কম হয়নি। তা সত্ত্বেও ভাইপোর এনজিনিয়ারিং পরীক্ষার ফল দেখে কাকা খুশিতে আটখানা। বলেছেন, আমি এমনি আশা করেছিলাম।—এবারে বাইরে থেকে একবার ঘুরে আসতে পারলে আর দেখতে হবে না, সেই চেষ্টাই কর—আমিও দেখি কি করা যায়।

বরাবরই উঁচু আশা, খুশিতে মিলনের ভিতরটাও নেচে উঠেছিল বই কি। এমন ভাগ্য তার কল্পনাতেও ঠাঁই পায়নি। আবার কোথা থেকে এত টাকা আসবে ভেবে দমেও গেছল। কিন্তু কাকা যে এজন্যে প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে লোনের দরখাস্ত করবে ভাবতে পারেনি। আর এই সূত্রেই হেমরাজ মোদীর উদারতাও দেখা গেছে। লোন স্যাংশন তিনিই করে থাকেন। অনুপম মজুমদারের দরখাস্ত পেয়ে অবাক হয়েছেন। তাঁর অনেক পদস্থ

অফিসার ফাঁক পেলে টাকা চেয়ে বসে। কিন্তু অনুপমবাবু এতকালের মধ্যে কখনো হাত পাতেননি—প্রয়োজন বুঝে তিনি যখন যা দিয়েছেন। সেই মানুষের হঠাৎ লোনের দরকার হয়ে পড়ল কেন!

ডেকে পাঠিয়ে জিগ্যেস করেছেন, এত টাকা লোন হঠাৎ কি জন্য দরকার। শুনেছেন। কাকার গোপন করার কি আছে। নিজের ছেলের থেকে মিলন তো তাঁর কম কিছু নয়। এই কম-কিছু নয়-টা অনেক বড় করে দেখেছেন হেমরাজ মোদী। কিন্তু কথাবার্তায় বরাবর তাঁর রাশভারী মেজাজ। বলেছেন, এনজিনিয়ারিং-এ এত ভাল রেজাল্ট করেছে আপনার ভাইপো...তা বাইরে থেকে হায়ার স্টাডিজ শেষ করে ফিরে এসে সে আমাদের মতো ছোট ফার্মে জয়েন করবে, না তার থেকে বড় কিছু ইচ্ছে আপনার?

'বীভারস'কে ছোট ফার্ম বলার টিপ্পনীটুকু কাকা ঠিকই বুঝলেন। হাতে গুনে কয়েকটা বড় ফার্মের মধ্যেই 'বীভারস' একটা। সবিনয়ে জবাব দিলেন, এখানে চান্স পেলে তো ভাগ্যের কথা—

হেমরাজ বললেন, ভাগ্যের কথা তো লোনের দরখাস্ত করার আগে আমার সঙ্গে পরামর্শ করলেন না কেন? যাক, ওসবের দরকার নেই, আপনার ভাইপোর প্যাসেজ মানি আমি দিচ্ছি—আর হায়ার স্টাডিজ-এর জন্য মাসে এক হাজার টাকা করে পাবে —তার বেশি যা লাগে আপনি দেবেন। ফার্ম ধরেই নেবে, তাদের একজন যোগ্য লোককে হায়ার ট্রেনিং-এর জন্য বাইরে পাঠানো হচ্ছে। এ ব্যবস্থায় আপনার আপত্তি নেই তো?

...এই জন্যেই কাকার ওই মন্তব্য, মাইনে যা-ই দিক, কাজে তো এই কোম্পানিতেই লাগতে হবে তোকে। মিলনও জানে 'বীভারস'ই তার কর্মক্ষেত্র। মাইনে-পত্র কি দেবে না দেবে তা নিয়ে একটুও মাথা ঘামাচ্ছে না। বিলেতে থাকতেই হেমরাজ মোদীর সঙ্গে কথা বলে এটুকু অন্তত বুঝেছে, ফিরে গেলে তার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা হয়েই আছে।

এবারে ঘরোয়া প্রসঙ্গে চলে এলো। কাকিমাকে জিগ্যেস করল, অমি-টা স্কুল থেকে ফিরছে কখন?

—সাড়ে চারটেয় ছুটি, ফিরতে ফিরতে পাঁচটা...। এই জবাবটুকু দিতেও কাকিমার কি-রকম যেন দ্বিধা।

ফোড়ন কাটার সুরে অনুপমবাবু স্ত্রীর দ্বিধার কারণটুকু স্পষ্ট করে তুললেন। বিরস মুখে বললেন, স্কুল থেকে মেয়ে সোজা বাড়ি ফিরবে? না সেখান থেকে ক্লাবে চলে যাবে তোমাকে বলে গেছে কিছু? ক্লাবে গেলে ফিরতে তো রাত সাতটা-আটটাও হতে পারে।

কাকিমা জবাব দিলেন না। কাকার চাপা ক্ষোভ অস্পষ্ট নয় একটুও। অমিতাকে নিয়ে কাকা-কাকিমার কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে সেটা আগেই বোঝা গেছল। বাড়ির সব থেকে আদরের মেয়েটার এই তিনবছরের মধ্যে কি হল মিলন ভেবে পেল না। কৌতূহল চেপে হাল্কা করেই কাকিমার উদ্দেশে বলল, আজ ক্লাবে যাওয়া বার করছি, কোন্ স্কুলে কাজ করে...ফোন নম্বর আছে?

কোন্ স্কুল নাম বলে মিনতি টেলিফোনের পাশে কালো খাতাটা দেখিয়ে দিলেন। মিলন উঠে গেল। নম্বর ডায়েল করে অমিতার খোঁজ করতে ওদিক থেকে ক্লার্ক জানাল, মিস মজুমদার এখন ক্লাসে...ডেকে আনতে হলে একটু অপেক্ষা করতে হবে।

মিলন থমকালো একটু। তিন বছর বাদে দেশে ফিরল, তা সত্ত্বেও যে মেয়ে স্কুল

কামাই করল না, ফোন ধরার জন্য তাকে ক্লাস থেকে টেনে আনবে কিনা তাই ভেবে নিল। এই মেয়েকে নিয়ে কাকা-কাকিমা যে ঝামেলার মধ্যে আছেন তাতে আর সন্দেহ নেই। বলল, ডাকার দরকার নেই, ক্লাসের পরে শুধু জানাতে হবে মিলন মজুমদার বাড়ি থেকে ফোন করেছিল।

ফিরে আসতে অনুপমবাবু বললেন, বেলা হয়ে গেল, এবারে চান সেরে নে, তারপর খেয়ে নেওয়া যাক।

এবারে একটু কাঁচুমাচু মুখ মিলনের। ঠোঁটে সপ্রতিভ একটু হাসি।— ইয়ে...চান সেরে নিচ্ছি, কিন্তু এ-বেলা আর একসঙ্গে খাওয়া হচ্ছে না...এলা লাঞ্চের নেমন্তন্ন করে গেছে।

ভিতরে বেশ বড়সড় একটা মোচড় পড়ল অনুপমবাবুর। মুখ দিয়ে চট করে কোন কথা বেরুল না। মিনতিও সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর দিকে থমকে তাকিয়েছেন। কাল রাতে আর আজ সকালে কত উৎসাহ নিয়ে কত রকমের বাজার করেছে মানুষটা। মিলনের দিকে ফিরলেন মিনতি। গলার স্বরে অনুযোগ গোপন থাকল না।—তিন বছর বাদে এসে আজই তুই লাঞ্চের নেমন্তন্ন নিয়ে বসলি?

মিলন কাকা-কাকিমার সামনে কোন দিনই খুব একটা লাজ-লজ্জার ধার ধারে না। জবাব দিল, বা রে! এয়ারপোর্ট থেকেই তো ধরে নিয়ে যাবার জন্য টানাটানি করছিল, আমি রাজি না হতে লাঞ্চে ডাকল।...বলো তো ফোনে ক্যানসেল করে দিই।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে।—কথা দিয়েছিস যখন আর ক্যানসেল করতে হবে না। অনুপমবাবু ব্যস্ত একটু।—তাহলে আর দেরি করছিস কেন, চট করে চান সেরে বেরিয়ে পড়—আমার গাড়িটা নিয়ে যা।

—তুমি আজ অফিস যাবে না?

ওর জন্যেই আজ ছুটি নিয়ে বসে আছেন বললেন না। জবাব দিলেন, সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য তোকে নিয়ে বেলার দিকে একবার অফিসে যাব ভেবেছিলাম...

—ক'টায়?

—এই তিনটে নাগাদ...তা আজ থাক না।

—থাকবে কেন—এ-তো আমার দিক থেকে ইম্পরট্যান্ট ব্যাপার—আমি গিয়ে গাড়িটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি চলে যেও—আমি ঠিক তিনটেয় অফিসে তোমাকে মিট করব।

স্নান সেরে বিলিতি পোশাক-আশাক চড়িয়ে মিলন চলে গেল। বেরুবার আগে কাকাকে আর এক দফা জানান দিয়ে গেল সে ঠিক সময়ে অফিসে হাজির হবে। অনুপমবাবু খেতে বসলেন। মুখোমুখি মিনতিও। থেকে থেকে লক্ষ্য করছেন। খাওয়ার থেকে খাবার নিয়ে নাড়াচাড়াই করছেন বেশি।

...শুধু খাবার নয়, দিনটিই হঠাৎ কেমন বিস্বাদ লাগছে অনুপমবাবুর। কি খাচ্ছেন না খাচ্ছেন খেয়ালও করছেন না। ভিতরে ভিতরে অগোচরের কিছু অস্বস্তিও নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। সেই সঙ্গে এই তৃতীয় দফা প্রথম-সকালের সেই তিন হাঁচি মনে পড়ছে।

## দুই

কোম্পানির নাম 'দি বীভারস লিমিটেড'। শাখা-প্রশাখা ছড়ানো বটগাছের মূল কাণ্ডর মতো কোম্পানির সব শাখা-প্রশাখার মূল-কাণ্ড বীভারস। বীভারস কনস্ট্রাকশন, বীভারস হেভি এনজিনিয়ারিং, বীভারস কেমিক্যাল্স, বীভারস পারফিউমারি অ্যান্ড কসমেটিক্স —এমনি সব। শুধু দিল্লিতে নয়, গাজিয়াবাদ, ফরিদাবাদ, হরিয়ানা, কানপুর, পাটনা— অনেক জায়গায় এর শাখা প্রশাখা ছড়ানো। হেড অফিস দিল্লিতে। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হেমরাজ মোদী পুরো সাতটা দিন বড় একটা দিল্লিতে বসে থাকেন না। ষাট বছর বয়েস হলেও উদ্যমে তিলমাত্র ভাঁটা পড়েনি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে উদ্যম আর উৎসাহ উল্টে যেন বাড়ছে। তিনি আজ এখানে তো কাল ওখানে। সব মিলিয়ে মোটা মাইনের অফিসারের সংখ্যা অনেক। পটু আর অপটু মেহনতী কর্মচারীর সংখ্যা তারও ঢের বেশি। কখন কোথায় প্রভুর আবির্ভাব ঘটবে জানা থাকে না বলে কম বেশি প্রায় সকলেই সর্বদা সজাগ।

প্রভু বলতে হেমরাজ মোদী একা নন। কর্তা ব্যক্তির সংখ্যাও কম নয় খুব। তাঁর দুই খুড়তুতো ভাই আছেন কিশোরীলাল আর পুষ্করমল মোদী। বয়সে তাঁরা ছ-আট বছরের করে ছোট। তাঁরা ডাইরেক্টর আর মোটা শেয়ারের ভাগীদার। হেমরাজের পরেই তাঁদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। তাঁদের ছেলেদের প্রতাপও কম নয়। এ ছাড়া বড় বড় জায়গায় অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গ জাঁকিয়ে বসে আছে। কিন্তু প্রবীণ হেমরাজ মোদীর পাশে সকলেই অনেকটা নিষ্প্রভ। তাই প্রভু বলতে শুধু হেমরাজ মোদী।

বীভারস-এর সূচনা আর সমৃদ্ধি ত্যাগরাজ মোদীর হাতে। হেমরাজের বাবা ত্যাগরাজ। গুজরাটের মানুষ। বড় পরিবার। অনেকগুলো ভাই আর জ্ঞাতিবর্গের সংসারে প্রাচুর্যের জলুস ছিল না বললেই হয়। পরিবারের অন্যান্যদের মতো চাকরি বা বাঁধা রোজগারের মধ্যে না গিয়ে ত্যাগরাজ মোদী ভাগ্য যাচাইয়ে নেমেছিলেন। আর ভাইদের মধ্যে একজনই অর্থাৎ কিশোরীলাল আর পুষ্করমলের বাবা ইন্দ্রলাল তাঁর সঙ্গে অনুগত ছায়ার মত যুক্ত ছিলেন। সসমারোহে তখন নয়া দিল্লি গড়ে উঠছে। নয়া দিল্লির ছাঁদ ছিরি বদলাচ্ছে। ইন্দ্রলালকে নিয়ে ত্যাগরাজ সেই সময় দিল্লি চলে এসেছিলেন।

তাঁদের টাকার জোর খুব ছিল না, কিন্তু ভাগ্যের জোর ছিল। আর ছিল ত্যাগরাজের মাথা, সঙ্গে অফুরন্ত উদ্যম। মাটি কাটার বা মাটি ভরাট করার ছোট বা মাঝারি কনট্রাক্টরি দিয়ে শুরু। আর সেই শুরু থেকেই ভাগ্য সদয়। তিন চার বছরের মধ্যে বিরাট বিরাট কনট্রাক্টরির কাজ ধরেছেন। লাভের অঙ্কও তেমনি ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

কিন্তু যত বড়ই হোক, মাটি কাটা বা মাটি ভরাট করা আদৌ বড় লক্ষ্য নয় ত্যাগরাজ মোদীর। টাকার জোর বাড়তে জনা দুই এনজিনিয়ার নিয়ে ছোট করে কনস্ট্রাকশনের কাজ শুরু করেছেন একই সঙ্গে। সেটাই বীভারস-এর জন্মলগ্ন। অনেক মাথা ঘামিয়ে এই নামটিও ত্যাগরাজের আবিষ্কার। বীভারস-এর যে মনোগ্রাম ইনডাস্ট্রিতে এখন সর্বজন-পরিচিত সেটি হল পিছন ভারী কাঠের টুকরো মুখে ইঁদুরের মতো একটা ব্যস্তসমস্ত জীব। এই জীবটির বুদ্ধি বিবেচনা কনস্ট্রাকশন আর এনজিনিয়ারিংয়ের মাথা শুধু বিস্ময়কর নয়, প্রাণী-বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়ও। নাক থেকে লেজ পর্যন্ত আকারে বেশি হলে দু-আড়াই ফুট, ওজনে বড় জোর বিশ-পঁচিশ সের। কিন্তু প্রকৃতির সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার

মধ্যেও এই নিরলস জীবদের ড্যাম তৈরি বা বসত কুটির তৈরির কলাকৌশল আর সহজাত প্রতিভার তুলনা নেই। যেন নিখুঁত অঙ্ক কষে ওরা এই কাজ করে। ছেলেবেলায় ত্যাগরাজ মোদী শিল্পীর আঁকা এক 'বীভার লজ'-এর ছবি দেখে বিস্ময়ে হাবুডুবু খেয়েছিলেন। সেখানে নদীর বিপদ, জঙ্গলের বিপদ, শীত পড়তে না পড়তে নদীর জলের ওপরের দিক বরফ হয়ে যাওয়ার বিপদ—সব তুচ্ছ করে ওই ড্যাম-বাঁধা বীভার-কুটির দাঁড়িয়ে। শরীর গরম রাখার তাগিদে ওই প্রাণীদের ডাইনিং রুমের ওপরে বেড়রুম —সামনে হল্—সেখান থেকে পাথরের মত জমাট বরফের নিচে দিয়ে যাতায়াতের সুড়ঙ্গ পথ—জলের চাপ লাঘব করার জন্য আসল ড্যামের দু'দিকে যাকে বলে আবার দুটো সাপোর্টিং ড্যাম। ছেলেবেলায় সেই বীভার লজ দেখার বিস্ময় ত্যাগরাজ মোদীর মনের তলায় থিতিয়ে ছিল হয়তো। কোম্পানির নাম নিয়ে দু'ভাই যখন মাথা ঘামাচ্ছেন তখন হঠাৎ এই জীবটিকে মনে পড়ে গেছল ত্যাগরাজ মোদীর। একটুও দ্বিধা না রেখে তিনি কোম্পানির নাম রেখেছেন 'দি বীভারস'। বীভারস-এর এরপর দিকে দিকে দিগ্বিজয়।

এক সময় অনটনের মুখ দেখার দরুন কিনা বলা যায় না, ত্যাগরাজ মোদী বড় পরিবার বা অনেক ছেলেপুলে পছন্দ করতেন না। তাঁর একটিই ছেলে হেমরাজ। আর ইন্দ্রলালের দুই ছেলে কিশোরীলাল আর পুষ্করমল। এ ছাড়া দুটো মেয়েও আছে ইন্দ্রলালের। দাদার প্রতি বিশ্বাস আর ভক্তিশ্রদ্ধায় সর্বদা বিগলিত ইন্দ্রলাল। দাদার কথায় তাঁর ওঠা বসা। তবু সংসারের কথা উঠলে আত্মজনদের কাছে তিনি এই দাদাকে নিয়ে আড়ালে একটু আধটু রসিকতাও করতেন। বলতেন, দাদা সেভাবে আর সংসার করার সময় কোথায় পেলেন যে পরিবার বড় হবে—তাঁর সব সময় তো ব্যবসাই খেয়ে দিল।

এ-ও খুব অত্যুক্তি নয়। অর্থ এবং সামর্থ্যের বিবেচনায় ত্যাগরাজ যদি বারো আনার মালিক হতেন আর ভাইকে চার আনার অংশ দিতেন—ইন্দ্রলাল তাতেও খুশি আর কৃতজ্ঞ থাকতেন। কিন্তু কালে দিনে তাঁরা কত বড় শিল্পপতি হয়ে বসবেন সে ধারণা শুধু ত্যাগরাজ মোদীরই ছিল। অন্য দিকে মানুষটা নামের মতোই উদার। সুদিনের মুখ দেখে অন্য ভাইদের আর জ্ঞাতিদের কেউ কেউ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। যোগ্যতা বুঝে তিনিই টেনেছেন তাদের। সকলের স্বার্থের দিকে চোখ রেখেই ত্যাগরাজ ভাগ বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা করেছেন। ভাইয়ের থেকে নিজের অংশে এক কপর্দকও বেশি বাড়ান নি। নিজের ছ' আনা, কিশোরীলালের ছ' আনা আর বাকি চার আনা ভবিষ্যৎ দেখে অন্য ভাই বা জ্ঞাতিবর্গের জন্য বরাদ্দ।

এর ফলে সকলের একটা মিলিত উৎসাহ এই প্রতিষ্ঠানের পিছনে আপনা থেকে সংহত হয়েছে। পৈতৃক মালিকানার হিসেব ধরেই বর্তমানে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ছ' আনার অংশ ত্যাগরাজ মোদীর একমাত্র ছেলে হেমরাজের। অপর ছ' আনার তিন আনা তিন আনা ভাগ ইন্দ্রলালের দুই ছেলে কিশোরীলাল আর পুষ্করমলের। আর বাকি চার আনার এক পয়সা দু পয়সা বা চার পয়সা করে অন্যান্য ভাই আর জ্ঞাতিদের।

বাপের গুণ ষোলো আনায় পেয়েছেন হেমরাজ মোদী। ব্যক্তিত্ব যেমন, পরিশ্রমীও তেমনি। কুশাগ্র বুদ্ধি। আবার একটু খেয়ালী রাশভারী মেজাজেরও। সময় বুঝে আর মন বুঝে কেউ কিছু চাইলে উচিত-অনুচিত ভাবেন না, উদার হয়ে দিয়ে দেন। কিন্তু চালাকির রাস্তা ধরে প্রাপ্তির আশায় কেউ এগোলে তাঁর সংহার মূর্তি। সোজা রাস্তায় চলছে

না মনে হলে অনেক পদস্থ এনজিনিয়ার বা বড় অফিসারকেও তিনি সোজা আঙুল তুলে বরখাস্ত করেছেন। বিপাকে পড়ে অনেকে তারা অন্য বড় দুই শরিক অর্থাৎ কিশোরীলাল আর পুষ্করমলের শরণাপন্ন হয়েছে। কিন্তু খুড়তুতো ভাইদের সুপারিশ এক ভ্রূকুটিতেই নাকচ করে দিয়েছেন তিনি।

এত বড় প্রতিষ্ঠানের সব কিছু ছকে-বাঁধা মেসিনের মতোই চলছে। বছর বছরের লাভের অঙ্কও বাড়ছে বই কমছে না। বাইরে থেকে কেউ কোন রকম ব্যতিক্রমের আভাসও পায় না।

কিন্তু বছরখানেক বছর দেড়েক হল অনুপম মজুমদারের চোখে কিছু ব্যতিক্রম ধরা পড়ছে।

কোন রকম সন্দেহ তাঁরও হত না, ইঙ্গিতটা একদিন হেসে হেসে করেছিলেন হেমরাজ মোদী নিজেই। ভদ্রলোক এমনিতেই খোলা মনের মানুষ, তার ওপর যাঁকে পছন্দ করেন আর বিশ্বাস করেন তাঁর কাছে এক-আধ সময় মনও খুলে দেন। কনস্ট্রাকশনের কোন একটা কাজ যে ভাবে হবে ভেবেছিলেন তা থেকে খসড়ার কিছু অদল-বদল দেখে একটু খুঁতখুঁতুনি শুরু হয়েছিল অনুপমবাবুর। ব্যাপারটা সোজা ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকেই জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি। জবাবে হেমরাজ মুচকি হেসে বলেছিলেন, জমানা বদলাচ্ছে অনুপমবাবু, সবেতে বাধা না দেওয়াই ভাল। কিশোরীলাল আর পুষ্কর সামনে এসে মুখ তুলে কিছু বলতে পারে না, সে জন্য তাদেরও বোধ হয় একটু কমপ্লেক্স আছে—কিন্তু তাদের ছেলেরা একজনের দাপট অত বরদাস্ত করতে চাইবে কেন? প্ল্যান আর এস্টিমেট সব যখন আমার কাছে ফাইন্যাল হয়ে এসেছে, সেটা বুঝেই আমি সই করে দিয়েছি, কোন রকম আপত্তি তুলিনি...আপত্তি করার মতো তেমন কিছু অবশ্য ছিলও না, তাছাড়া উৎসাহ নিয়ে এগোলে আমিই বা বরবাদ করব কেন? তবে আশ্চর্য লাগছে যে এনজিনিয়ারদের নিয়ে তারা ব্যাপারটা সেট্‌ল করেছে তাদের মধ্যে আপনি নেই কেন?

এ-রকম কথা এই রাশভারী লোকের মুখে আগে কখনো শোনেননি অনুপম মজুমদার। কিন্তু তারপর থেকে তাঁর চোখ কান একটু বেশি সজাগ। তার ফলে যে আভাস তিনি পেয়েছেন বা পাচ্ছেন সেটা খুব চাপা গোছের এক ব্যক্তিত্বের বিরোধ। হেমরাজের ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি ভাইয়েরা, ভাইয়ের ছেলেরা বা জ্ঞাতিবর্গ কেউ দাঁড়াতে পারে না। আবার আড়ালে খুব একটা বরদাস্তও করতে পারে না। এই থেকেই কিছু ক্ষোভ বা অসন্তোষ উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে অনুপম মজুমদার টের পান।

...ভাইদের ছেলেদের কথা বলছিলেন হেমরাজ মোদী, কিন্তু ছেলেদের মধ্যে কার দিকে বিশেষ ইঙ্গিত, অনুপমবাবুর তা-ও বুঝতে সময় লাগেনি। কিশোরীলালের বড় ছেলে রাজেন্দ্রলাল মোদী। ছেলেটা এক সময় ভাল স্পোর্টসম্যান ছিল শুনেছেন। তখন থেকেই নিজের নাম কেটে-ছেঁটে সে রাজা মোদীতে দাঁড় করিয়েছে। ইনডাস্ট্রিতে বা বাইরের অভিজাত মহলে সে রাজ বা রাজা মোদী। বছর ঊনত্রিশ বয়েস। এখনো স্পোর্টসম্যানের মতোই দোহারা লম্বা দেখতে। সুস্বাস্থ্য। বংশের মধ্যে এখন পর্যন্ত একমাত্র দিগ্‌গজ। ইকনমিক্স-এ এম. এ.। এত পাণ্ডিত্য মোদী বংশে আর কারো নয়। কিন্তু চালচলনে সেটা খুব বোঝা যায় না।

ছেলেটার চরিত্রের বদনাম আছে। মদ খায়, অত বড় ঘরের ছেলের দিল্লির সোসাইটিতে এটা বড় দোষ কিছু নয়। বছর চারেক আগে মোদী কোর্টে টি টি পড়ে গেছল মেয়ে-ঘটিত ব্যাপারে। বাইরের নয়, অন্তঃপুরের মেয়ে। খবরের কাগজে লেখালিখি হয়েছে, পুলিসেরও পদার্পণ ঘটেছে। কারণ রাজা মোদীর বউ যশোদা মোদী আত্মহত্যা করে অকালে জীবন-যন্ত্রণায় ছেদ টেনে দিয়ে গেছল। বড় ঘরের ব্যাপার সহজে যেমন ধামাচাপা পড়ে, প্রকাশ হয়ে গেলে তেমনি বড় দরের সোরগোলও ওঠে। এখানে সোরগোল উঠেছিল কারণ যশোদা মোদীও তেমন ছোট ঘরের মেয়ে ছিল না। তারা এই ছেলের শেষ দেখার সংকল্পে উঠে-পড়ে লেগেছিল।

যাক, চরিত্রের ওপর বড়-সড় একটা কালো ছাপ পড়া ছাড়া রাজা মোদীর ক্ষতি তেমন হয়নি। ক্ষতি কি আর হতে পারে, যশোদা যে-রাতে আত্মহত্যা করে রাজা মোদী সেই রাতে দিল্লিতেই ছিল না। বউয়ের ওপর কোনরকম অত্যাচারের হদিসও মেলেনি। তাছাড়া বউটা চিঠি লিখে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে স্বীকারই করে গেছে। কাউকে দোষী বা দায়ীও করেনি।

সকলেই ধরে নিয়েছিল, দিন-কতক গেলে রাজা মোদীর জীবনে এবার কোন সোসাইটি গার্লের আবির্ভাব ঘটবে। কারণ, সম্বন্ধ করে আবার বিয়ের আশা দুরাশা। যত বড় লোকই হোক, এমন ঘটনা যেখানে ঘটে গেছে সেখানে আর কে মেয়ে দিতে আসছে।

কিন্তু চারটে বছর কেটে গেছে, এখন পর্যন্ত রাজার পাকাপোক্ত সঙ্গিনী কেউ আসেনি। ছেলেটার চালচলনও কিছুমাত্র বদলায়নি। আজ তাকে এক মেয়ের সঙ্গে হাওয়া খেয়ে বেড়াতে দেখা যায় তো কাল অন্য মেয়ের সঙ্গে। বাপ মা অবশ্যই আবার তার বিয়ের চেষ্টা করেছে, এমন কি হেমরাজ মোদীও বলেছেন। রাজার সাফ জবাব, তুমি অন্তত এ ব্যাপারে আর মাথা গলিও না। অন্যদের বলেছে, তার বিয়ে করার মতো মেয়ে দিল্লি সহরে নেই। বউ মরার পর তার চালচলন আরো বেপরোয়া হয়েছে। এই দুনিয়াটাকেও যেন কেয়ারই করে না।

জ্যাঠা অর্থাৎ হেমরাজের মুখোমুখি কখনো-সখনো একমাত্র সে-ই এসে দাঁড়ায়। কোন ব্যাপারে মতের অমিল হলে স্পষ্ট বলে বা নিজের কোন মতামত থাকলে তা-ও জানায়। অনুপমবাবু ভাবেন, নিজের জ্যাঠা তো নয়, বাবার জ্যাঠতুতো দাদা— তাঁর প্রতি দরদ বা শ্রদ্ধা কতটুকু আর থাকতে পারে! এই আচরণের পিছনে ঔদ্ধত্যই বেশি দেখতেন তিনি। কিন্তু অবাক লেগেছিল একদিন হেমরাজ মোদীর কথা শুনে। বলেছিলেন, একমাত্র এই ছেলেটারই পার্টস আছে, বড় হবার যোগ্যতাও আছে। তাঁর পরে এত বড় ব্যবসার হাল ধরার হিম্মত কেবল রাজেরই আছে। তবে মিসগাইডেড হলে মুশকিল—

অনুপমবাবুর ধারণা ও-ছেলে মিসগাইডেড হয়েই আছে, তবু ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের মতো মানুষ এখনো তার কাছ থেকে কি আশা পোষণ করেন! এই ছেলের ওপর ওই ভদ্রলোক আদৌ বিরক্ত বা অসহিষ্ণু নন্ কেন? উল্টে তার বিচার বিবেচনার ওপর অটুট আস্থা।

অনুপম মজুমদারের এতখানি ভাবনা চিন্তার কারণ, ভিতরের এই সব ব্যাপার মিলন কিছুই জানে না। তাকে কতটা আভাস দেওয়া দরকার এই নিয়ে তাঁর চিন্তা। আবার

এ-ও ভাবলেন, মিলনকে কিছু বলে রাখার দরকার হলে হেমরাজই হয়তো তাঁকে সে আভাস দিয়ে রাখতেন। কিন্তু আভাস দেওয়া ছেড়ে মিলন সম্পর্কে বড় কর্তার মনে কি আছে অনুপমবাবু ভাবতেও পারেননি।

সাততলায় নিজের অফিস ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে ছিলেন অনুপম মজুমদার। নিচের চত্বরে কাতারে কাতারে গাড়ি দাঁড়িয়ে। আবার মুহুর্মুহু গাড়ি আসছে আর যাচ্ছেও। ওপর থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে বেশ লাগে। গাড়িগুলোকে চ্যাপ্টা মতো দেখায় আর মানুষগুলোকে খুদে খুদে মনে হয়। হঠাৎ দৃষ্টি সজাগ তাঁর। এলা মোদীর টকটকে লাল রঙের সেই ছোট গাড়ি। সে-ই ড্রাইভ করে আসছে। পাশে মিলন। একটি ছেলে আর একটি মেয়ের এমন খুশি মুখের নিগূঢ় অর্থ যেন কিছু আছে। গাড়ি থামল। মিলন নামল। অন্যজনের উদ্দেশে হাত নেড়ে ব্যস্তসমস্তভাবে কালভার্টে অদৃশ্য হল। লাল ছোট গাড়ি সামান্য ব্যাক করে আধা চক্রাকারে সবেগে বেরিয়ে গেল।

অনুপমবাবু ঘড়ি দেখলেন। তিনটে বাজতে তিন মিনিট। ছেলেটার সময়জ্ঞান আছে। যখন আসবে বলেছিল ঘড়ি ধরে সেই সময়েই এসেছে। কিন্তু অনুপমবাবু খুব স্বস্তিবোধ করছেন না। ভিতরে ভিতরে হয়তো ছেলেটার কাণ্ডজ্ঞান অভাবের আশঙ্কা একটু।

মিলন দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। অনুপমবাবু তার আগেই নিজের চেয়ার নিয়েছেন। হাত-ঘড়ি দেখে নিয়ে মিলন হালকা সুরে বলল, ভাবছিলে নিশ্চয়, অ্যাম হিয়ার রাইট অন্ ডট...।

অনুপমবাবু মাথা নেড়ে সায় দিলেন। বললেন, বোস একটু...ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের সঙ্গে আন-অফিসিয়াল দেখা তো হয়েই গেছে তোর?

চেয়ার টেনে বসতে বসতে মিলন বলল, কই না তো! আমার সঙ্গে আবার কোথায় দেখা হল?

জবাব শুনে অনুপমবাবুর অবাক হবার পালা।—সে বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে এলি আর তাঁর সঙ্গে দেখাই হল না তোর?

এবারের জবাবেও ছেলের এতটুকু দ্বিধা নেই। বলল, বাড়িতে নেমন্তন্ন খেলাম কোথায়, আমরা বাইরে খেয়েছি।

অনুপম মজুমদারই থমকালেন একটু।—নেমন্তন্নের কথা হেমরাজ মোদী জানতেনই না তাহলে?

—তা কি করে বলব, জিজ্ঞেস করিনি।

এ-কালের ছেলেরা এমন নিস্পৃহ কি করে হতে পারে অনুপমবাবু জানেন না। সকাল থেকেই তাঁর ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে বাস্তবের গরমিল দেখছেন। মন্দ কিছুই দেখেননি অবশ্য, অথচ কেন যেন কিছুই ভাল লাগছে না।...একমাত্র মেয়ে বাইরে কোথায় কার সঙ্গে ডিনার সারল হেমরাজও কি সে-খবর রাখেন না!

ফোনটা তুলে অপারেটারকে বললেন ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের ঘরে দিতে। মিলনের নাম বলতেই ও-দিক থেকে হুকুম হল নিয়ে আসতে। ফোন রেখে অনুপমবাবু বললেন, চল্।

হেমরাজ মোদী হাসি মুখে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। নিজের পাশের চেয়ারটায়

মিলনকে বসতে ইশারা করে বললেন, আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। আই থিংক ইউ এনজয়েড ইওর জার্নি ব্যাক?

মিলন সপ্রতিভ হেসে সায় দিল, ইয়েস, থ্যাঙ্ক ইউ।

মাঝে দু-দুবার বিলেত গিয়ে বীভারস-এর এই কর্ণধারটি এ-ছেলের অনেকটাই দেখেছেন, জেনেছেন, বুঝেছেন। তাই আর কিছু জিজ্ঞাসাবাদের ধার দিয়েও গেলেন না। হাসি মুখে বললেন, এভরিথিং ইজ্ রেডি ফর্ ইউ হিয়ার, ইউ আর কর্ডিয়ালি ওয়েলকাম—

—থ্যাঙ্ক ইউ সার।

হেমরাজ মোদী অভ্যস্ত তৎপরতায় টেবিলের বোতাম টিপতে প্যাঁক করে আওয়াজ হল একটু। সঙ্গে সঙ্গে ও-পাশের দরজা ঠেলে আধবয়সী সুশ্রী মহিলা সেক্রেটারির পদার্পণ।

—মিস্টার মিলন মজুমদার্স অ্যাপয়েন্টমেন্ট—

এর বেশি বলার দরকার হল না। মহিলা চোখের কোণে একবার মিলনকে দেখে নিয়ে চলে গেল। আর একটা বোর্ড ফাইল হাতে তখুনি ফিরে এলো। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারসুদ্ধু রেডি করা হয়ে গেছে অনুপম মজুমদার ভাবেননি। কোথায় পোস্টিং হবে না হবে সে-ব্যাপারে ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে একটু আলোচনা করে নেবেন ভেবেছিলেন।

সেক্রেটারি প্রতি-লিপিতে প্রাপ্তি স্বীকার লিখিয়ে নিয়ে আসলটা মিলনের হাতে দিয়ে গেল। হেমরাজ বললেন, পড়ে দেখো—

পড়ল। এনজিনিয়ারিং সাইডে অ্যাসিস্ট্যান্ট এনজিনিয়ারের পোস্ট। মেকানিক্যাল এনজিনিয়ার যখন, এটাই স্বাভাবিক। মোট মাইনে মাসে তিন হাজার। শুরুতে এর থেকে বেশি আশাও করেনি।

—ও. কে?

মিলন মাথা নাড়ল।—থ্যাঙ্ক ইউ সার।

—কাকাকে দেখাও।

অনুপমবাবু ওটা নিলেন। পড়লেন। তাঁর অভিজ্ঞ চোখে হয়তো এমন কিছু পড়ল যা তিনি ঠিক আশা করেননি। হেমরাজ তাঁর দিকেই চেয়ে ছিলেন। ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসির আঁচড় পড়ল। তক্ষুনি মিলনের দিকে ফিরলেন।—মাই বয়, তোমাকে দুই একটা কথা বলার আছে।...আমি জানি এই ফার্মে এখন অ্যাকাডেমিক্যালি তুমি সব থেকে বেশি কোয়ালিফায়েড—এত বিলিতি ডিগ্রি আর ডিপ্লোমা এখানে কারো নেই—কিন্তু আই সাজেস্ট, সেটা তুমি বিশেষ করে মনে রেখো না—এখানে অভিজ্ঞতার দাম সব থেকে বেশি, সেদিকেই বেশি চোখ রেখো। ফলো মি?

মিলন মাথা নাড়ল। বুঝেছে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হেমরাজ মোদী অনুপমবাবুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, ও তো আপনার কোয়ার্টার্সেই থাকবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—যাক, তাহলে আমাদের আর একদিকের ঝামেলা কিছু বাঁচল। হৃষ্টমুখে ভদ্রলোক অনুপমবাবুকে বললেন, আপনি তাহলে ওকে নিয়ে গিয়ে আর সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন...বিশেষ করে রাজ-এর সঙ্গে, অ্যাজ সুপারভাইজার ডাইরেক্টর ও-ই তো মিলনের ডাইরেক্ট বস্ এখন—

সামান্য মাথা নেড়ে অনুপমবাবু উঠতে যাচ্ছিলেন। উনি বাধা দিলেন।—একটু বসুন, আপনার সঙ্গে দুই একটা কথা আছে। মিলনের দিকে তাকালেন।—তুমি ওঁর ঘরে গিয়ে বোসো, উনি এক্ষুনি আসছেন।

মিলন আর একবার ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল। হেমরাজ অনুপমবাবুর দিকে ফিরলেন। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আঁচড় একটু।—ওর অ্যাপয়েন্টমেন্টটা আপনার খুব মনে ধরল না কেন মজুমদারবাবু?

অন্তরঙ্গ আলাপে মজুমদারবাবুই বলে থাকেন। অনুপমবাবু একটুও অবাক হলেন না, মানুষটা এমনিই ভিতর দেখতে পান বটে। মিলন সম্পর্কে এই ফয়সলা তিনি আদৌ প্রত্যাশা করেননি। ইতস্তত করে বললেন, আপনার দিকেও মেকানিক্যাল এনজিনিয়ারের কাজ কিছু আছে, তাই ভেবেছিলাম আমাদের...মানে আপনার ডাইরেক্ট সুপারভিশনেই ওকে রাখবেন।

হেমরাজ মোদী মুচকি হাসতে লাগলেন। গলা সামান্য খাটো করে বললেন, আমার হিসেব একটু অন্য রকম মজুমদারবাবু।...আমার দিকে আপনি আছেন, ও-দিকে আপনার ভাইপো থাক। আমার ধারণা আপনার ভাইপো যথেষ্ট ইন্টেলিজেন্ট।

আর কিছুই বলার দরকার হল না। অনুপম মজমুদার যা বোঝার তক্ষুনি বুঝে নিলেন। একটু অস্বস্তিও বোধ করলেন। কারণ, মনে হল তাঁর দায়িত্ব আরো একটু বাড়ল।

কিশোরীলাল পুষ্করমল আর জ্ঞাতিদের মধ্যে আরো জনা দুই প্রবীণ এবং পদস্থ মোদীও মিলনকে সাদর অভ্যর্থনাই জানালেন। বললেন, দাদাজীর মুখে তাঁরা তার অনেক প্রশংসা শুনেছেন, এমন একজন ব্রাইট ইয়ং অ্যান্ড এক্সেপশনালি কোয়ালিফায়েড লোক কোম্পানিতে আসছে বলে তাঁরা খুশি। হেমরাজ মোদী জ্ঞাতিভাইদের সকলেরই দাদাজী। সৌজন্য এবং আনন্দ প্রকাশ করল নবীন মোদীরাও, তবু তাদের চোখে মুখে একটু চাপা কৌতুক কটাক্ষ দেখা গেল কিনা অনুপমবাবু তক্ষুনি ঠিক বুঝে উঠলেন না। কিন্তু একটু পরের অভিজ্ঞতায় বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

বয়স্ক মোদীদের পরেই রাজা মোদীর খোঁজ করেছিলেন অনুপমবাবু। তখন শুনেছেন সে অফিসে নেই। এই লোকের অফিসের আসা-যাওয়া মরজি মাফিক। অন্যদের সঙ্গে পরিচয়-পর্বের পর মিলনকে নিয়ে নিজের ঘরে এসে বসেছিলেন। খানিক বাদে অপারেটার ফোনে জানাল রাজা মোদী এসেছেন, জুনিয়ার মজুমদার তাঁর ঘরে আসতে পারেন।

অনুপম মজুমদার মিলনকে আবার সঙ্গে করে তার ঘরে নিয়ে এলেন। তাঁকে দেখেই সপ্রতিভ সৌজন্যে রাজা মোদী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, আপনি আবার কষ্ট করে আসতে গেলেন কেন, ওকে পাঠিয়ে দিলেই হত। মিলনের একখানা হাত নিজের হাতে নিয়ে গোটা দুই অন্তরঙ্গ ঝাঁকুনি দিল, দেন ইউ আর মিলন...হোয়াট ডু ইউ মিন বাই মিলন?

মিলনও সপ্রতিভ হাসিমুখে নামের তাৎপর্য বলল।

—গুড! ইউ মিন ইউনিয়ন—দ্য অপোজিট অফ সেপারেশন। দ্যাট সুড ব্রিং আস লাক্ দেন! সানন্দে আবার বার দুই হাত ঝাঁকাল।—সীট ডাউন মিলন, বৈঠিয়ে মিস্টার মজুমদার—ফরমাইয়ে টি অর কফি?

মিলন জবাব দিতে যাচ্ছিল, যা খুশি। কিন্তু তার আগেই কাকু বলে বসল, এর মধ্যে দু'বার হয়ে গেল, এখন আর কিছু না। থ্যাঙ্কস্—

মিলন লক্ষ্য করল, লোকটা ইংরেজি আর হিন্দীর খিচুড়ি পাকিয়ে তড়বড় করে কথা বলে। ওর দিকে ফিরল।—আওয়ার আংকল দ্যা গ্র্যান্ড কাল আমাকে ঘরে ডেকে নিয়ে তোমার সম্পর্কে অনেক কথা বলল—অ্যান্ড উই সেটলড থিংস অ্যাবাউট ইউ —গট ইওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট?

মিলন মাথা নেড়ে সায় দিল।

—অ্যান্ড লাইক্‌ড ইট টু বিগিন উইথ?

—সিওর...থ্যাঙ্ক ইউ সার।

—ও! আই অ্যাম নোবডি'জ সার হিয়ার, আ-অ্যাম জাস্ট মোদী—আমি তোমাকে মিলন বলে ডাকছি—ইউ মে কল্ মি রাজা অর জাস্ট রাজ—আই ওয়াজ কিউরিয়াস অব্যাউট ইউ, বিকজ্ অফ আওয়ার লিট্‌ল সুইট কাজিন এলা—সি ইজ্ ওয়ান অফ ইয়োর রিয়েল অ্যাডমায়ারর্স! চোখ টিপল, আর সঙ্গে সঙ্গে হেসেও উঠল।

এর পরেই অস্বস্তি অনুপম মজুমদারের। মনে হল এই জন্যেই এর ছোকরা আত্মীয়দের চোখে মুখে চাপা কৌতুক দেখেছিলেন। এই দিনকাল বা হুঁওয়ার মানুষ নন তিনি। এ-সব পছন্দও করেন না। এই কারণেই বাড়িতে ছোট মেয়ে অমিতাকে নিয়ে অশান্তির সূত্রপাত। আর সেই অশান্তি এখন ভালমতই বুকে চেপে বসেছে। অমিতা তাঁদের আক্কেল দিচ্ছে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, ভাইপো আর এলাকে নিয়ে এদের কাছে যেটা হাসি বা কৌতুকের ব্যাপার, হেমরাজ মোদীর কাছে তা কখনো সে-রকম হতে পারে না। একথা মনে হতে অনুপমবাবুর আরো অস্বস্তি।

কাকুর সামনে এ রকম বলার ফলে মিলনের মুখে সুচারু বিড়ম্বনা। সপ্রতিভ হাসি মুখেই সে চটপট উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল।—উই উইল বি গুড্ ফ্রেন্ডস দেন —হোয়েন ডু ইউ লাইক মি টু জয়েন?

রাজা মোদীও উঠে দাঁড়িয়ে তার হাত ধরল।—হোয়াই! রাইট টুমরো।

—ও. কে—টুমরো!

কাকার সঙ্গে বেরিয়ে এলো। হাত-ঘড়ি দেখল। পাঁচটা। প্রথম দিনের অভ্যর্থনা অপছন্দ হবার কারণ নেই। তবু খুশি মুখে মন্তব্য করল, এই একজনকে খুব ভালো লাগল কাকু, বেশ দিলদরিয়া—না?

অনুপম মজুমদার গম্ভীর। পাশে চলতে চলতে জবাব দিলেন, ওটাই সব থেকে বেশি হারামজাদা—

মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে যেতে নিজেই অপ্রস্তুত একটু। এ রকম অশালীন উক্তি তাঁর গলা দিয়ে বেরোয় না সচরাচর। কিন্তু সকাল থেকেই দিনটা তাঁর হিসেব ধরে গড়াচ্ছে না। ভিতরে ভিতরে অনাগত অশান্তির ছায়া পড়ছে বলেই স্নায়ুর ওপর খুব দখল ছিল না হয়তো।

মিলনের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক। ঈষৎ বিস্ময়ে ঘাড় ফিরিয়ে কাকুর দিকে তাকাল। অনুপমবাবু তাড়াতাড়ি সামাল দিতে চেষ্টা করলেন। বললেন, দিলদরিয়া ঠিকই, কিন্তু মেজাজের ঠিকঠিকানা নেই, তা ছাড়া কিছু গণ্ডগোলের ব্যাপারও আছে...এ-সব

আলোচনা এখন নয়, আস্তে ধীরে সবই জানবি'খন—বাড়ি চল এখন।

সঙ্গে সঙ্গে মিলনের ব্যস্ত মুখ।—আমার একটু দরকার আছে কাকু, তুমি যাও, আমি যত তাড়াতাড়ি পারি আসছি।

হনহন করে লিফট্-এর দিকে চলে গেল। লিফট্ নেমে যেতে অনুপমবাবু পায়ে পায়ে আবার নিজের অফিস ঘরে এলেন। জানালায় দাঁড়ালেন। নিচের গাড়ির সারি থেকে একটার পর একটা চলে যাচ্ছে। রাস্তার এক পাশে এলা মোদীর সেই টকটকে লাল ছোট বিলিতি গাড়িটা দাঁড়িয়ে। স্টিয়ারিং-এ শিথিল হাত রেখে মেয়েটা বসে আছে। হাসছে। সেই হাসিমাখা চাউনি অনুসরণ করে অনুপম মজুমদার দেখলেন একটা ছাড়ন্ত গাড়ি প্রায় লাফিয়ে টপকে মিলন ওই লাল গাড়িতে উঠল। মেয়েটার পাশে বসল। হাসছে দুজনেই। গাড়িটা চক্কর খেয়ে বেরিয়ে গেল।

অনুপমবাবুরও আস্তে ধীরেই এদের ব্যাপারটা বোঝার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে হাতে খুব একটা সময় নেই। বুঝতে দেরি হলে ভুগতে হতে পারে।

...একটা নয়, দুটো নয়, প্রথম সকালের সেই তিন-তিনটে হাঁচি মনে পড়তে ভিতরটা সত্যিই অসহিষ্ণু এখন।

## তিন

স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে অমিতা আগেই চলে এসেছিল। দুপুরে বাবা বেরিয়ে যেতেই রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে মায়ের সামনে এলো।—মিলন এলে বলে দিও আমি বেরিয়ে গেছি।

জবাব না দিয়ে মিনতি মেয়ের দিকে তাকালেন শুধু।

আসলে বিরক্তির থেকে অমিতার কৌতূহল বেশি। মিলন আসার পরে প্রাথমিক সমাচার মায়ের মুখে শুনেছে।...বড় সাহেবের মেয়ে মিলনকে রিসিভ করতে এয়ারপোর্টে গেছল, তার সঙ্গেই দুপুরের লাঞ্চ সারা হয়েছে। বিকেলেও গম্ভীর মুখে বাবাকে একলা বাড়ি ফিরতে দেখে কৌতূহল আরো বেড়েছে। কোন্ ব্যাপারখানা বাবার মনের মতো হয়নি মুখ দেখেই বুঝেছে। আজকের দিনে বাবার এই মুখ কেন আঁচ করতে একটুও অসুবিধে হয়নি। অমিতা জানে, বাবা চুপচাপ ঘরে একলা বসে থাকতে পারে না। কোন কাজ না থাকলে হনহন করে খানিক হেঁটে আসে। সন্ধ্যার পর অফিস থেকে ফিরেও খানিক বিশ্রামের পর তার হাঁটা চাই।

অমিতা বাবার হাঁটতে বেরুনোর অপেক্ষাতেই ছিল। ওর উষ্মার জবাবে মা কিছু বলল না দেখে বক্র সুরে আবার জিগ্যেস করল, বাবা অমন গোমড়া মুখ করে একলা ফিরল কেন, বিলেত-ফেরত লায়েকটি এ-বেলায়ও গেলেন কোথায়?

মিনতি দু'কথায় জবাব দিলেন, জানি না।

অসহিষ্ণু সুরে অমিতা বলল, তুমি জানো না বুঝতেই পারছি—বাবা কি বলল? কোথায় গেল বাবাও জানে না?

মিনতি জবাব দিলেন, জানার বলার আবার কি আছে, দিল্লি কি নতুন নাকি ওর কাছে! তাড়াতাড়ি ফিরবে বলে গেছে...

বাইরে ঝাঁঝালো মুখ অমিতার। চাউনিও খরখরে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে উৎকট রকমের আনন্দ হচ্ছে তার।—এর নাম তাড়াতাড়ি? এলে বলে দিও, তিন বছর বিলেতে থেকে সে এমন কিছু কেউকেটা হয়ে আসেনি যার জন্য আমাকে তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে!

তেমনি ঠাণ্ডা গলায় মিনতি বললেন, সাড়ে সাতটা বেজে গেছে, এখন আবার তোর বেরুনোর দরকারটা কি?

—কিচ্ছু দরকার নেই, কিচ্ছু দরকার নেই। হৈহৈ করে ঘরে ঢুকে এক হাতে মিলন বেশ জোরেই অনিতার কাঁধে একটা চাপড় বসিয়ে দিল। শাসনের সুরে বলল,—মেয়েদের রাতবিরেতে বেরুনো আমি একদম পছন্দ করি না—দিল্লীর বাতাসে অনেক গণ্ডগোল। আবার তেমনি জোরেই ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরল।—এয়ারপোর্টে তোকে না দেখে আমি সত্যি রেগে গেছলাম।

অমিতা ওর হাত ঠেলে সরাল না। ওই ভাবেই আস্তে আস্তে ঘুরল তার দিকে। দেখল, এই ভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর দরুন আরো ঘন হওয়া সত্ত্বেও মিলনেব মুখে সংকোচের লেশমাত্র নেই। তিন বছর বাদে দেখা হওয়ার আনন্দটুকুই যেন সব। কিন্তু অমিতা গম্ভীরই এখনো। ভুরু কুঁচকে ওকে ওজন করছে যেন। তেরছা গলায় বলল, তোর রাগ জল করার মতো একজন তো গেছল শুনলাম। পরের টিপ্পনী আরো নির্মম।—আর...তিন বছর মেমসায়েবদের সঙ্গে থেকে খুব উন্নতি দেখি যে—মায়ের সামনেও দিব্বি মেয়েদের ঘাড়ে কাঁধে হাত উঠে আসে!

এই প্রথম সাক্ষাতে মিলন যদি পিছন থেকে এসে সরাসরি ওকে জাপটেও ধরত তাহলেও মায়ের চোখে বিসদৃশ ঠেকত না। আগে মিনতি এর থেকে ঢের বেশি দেখে অভ্যস্ত, কিন্তু মেয়ে এ-রকম বলার ফলে মিনতির যেমন বিড়ম্বনা মিলনও তেমনি অপ্রস্তুত। কাঁধ ছেড়ে দিয়ে বলল, দেব ধরে এক থাপ্পড়, তোমার মেয়ের কথা শুনলে কাকিমা?

—শুনলাম তো। এখন অনেক দেখবি অনেক শুনবি।

মিনতি ঘর ছেড়ে অন্য দিকে চলে গেলেন। অমিতার অসহিষ্ণু চাউনি তাকে অনুসরণ করল। মিলন সেটুকু লক্ষ্য করল।

এগিয়ে এসে আবার ওর হাত ধরতে অমিতা মুখেই একটা ঝাপটা মারল।—ভাগ! রাতদুপুরে এসে এখন বড় ভাব—বাড়ি থাকবি না তো স্কুলে টেলিফোন করার কি দরকার ছিল?

জবাব না দিয়ে মিলন প্রায় হাঁ করেই কয়েক মুহূর্ত ওর দিক চেয়ে রইল। তারপর চাপা গলায় বিস্ময় ঝরল। —এই মেয়ে, তোর গায়ে মুখে সিগারেটের গন্ধ—তোর এত গুণ বেড়েছে নাকি!

অমিতার চোখে এখনো এতদিন পরে ওকে দেখার আবেগ বা উচ্ছ্বাস কম।—এ গুণ তো শেষের দিকে তুইও রপ্ত করেছিলি—এখন নেই?

—না! এখন তো ছেলেদের সিগারেট ছাড়ার হিড়িক ওখানে, মেয়েরা অবশ্য একটু বেশি খায়—কিন্তু তোর ব্যাপারখানা কি রে, বাড়িতে বসেই সিগারেট টানিস...কাকু টের পায় না?

সাদা কথায় কাকা এ সব ব্যাপারে এমনিই নেশাশূন্য মানুষ যে তাঁর বাড়িতে বসে কোনো মেয়ের সিগারেট খাওয়ার কথা মিলন আজও ভাবতে পারে না। কাকা কেন, মেয়েদের সিগারেট খাওয়া মিলনেরও পছন্দ নয়। চুপচাপ ওর মুখখানা আরো একটু দেখে নিয়ে অমিতা ধীরে-সুস্থে নিজের ঘরের দিকে চলল। ডাকলও না। পিছন পিছন আসবে জানা কথাই।

এলো। অমিতা খাটের পাশের ইজিচেয়ারে বসল। ছোট টেবিলটা থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর শৌখিন লাইটারটা টেনে নিল। দু'চোখ সোজা ওর মুখের ওপর ফেলে রেখে সিগারেট ঠোঁটে ঝোলালো। ধরালো। বড় করে একপ্রস্থ ধোঁয়া ছাড়ল। মিলন হাঁ করে দেখছিল। অমিতার এমন পরিবর্তন কল্পনার মধ্যেও ছিল না। বলে উঠল, এই অমি, আমার একটুও ভাল লাগছে না। আর তিন বছরে এ কি মূর্তি বানিয়েছিস? অমন সুন্দর চুলের গোছা মুড়িয়ে ফেলেছিস, চোখ মুখ কেমন টান ধরা —কি ব্যাপার তোর?

ঠোঁটের ফাঁকে টিপটিপ হাসি, নির্লিপ্ত দু'চোখ মিলনের মুখের ওপর। আবার সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে অমিতা বলল, আরো ভালো করে দ্যাখ, সব মিলিয়ে আগের থেকে ভালো না খারাপ?

—আগের থেকে ঢের খারাপ, ধপধপে ফর্সা না হলেও লোকে তোকে সুন্দরী বলত।

—এখন লোকে রূপসী বলে।

মিলনের ক্ষুব্ধ গলা।—যারা বলে তারা চোখের মাথা খেয়েছে—আঃ, সিগারেটটা ফেল না?

অমিতা হাসি চেপে চোখ পাকালো।—তোর পছন্দমতো আমাকে চলতে হবে?

...এই মেয়েকে নিয়ে কাকা-কাকিমার মনে শান্তি নেই। এই সুযোগে কথা ঘোরালো। —আমার পছন্দমতো না হোক, আর কারো পছন্দমতো চলার যোগাযোগই বা এখন পর্যন্ত হল না কেন?

—যোগাযোগ হয়নি তোকে কে বলল?

মিলন থমকালো একটু। এই জবাবের কোনো তাৎপর্য আছে কিনা বুঝতে চেষ্টা করল। বোঝা গেল না। আরো জোর দিয়ে বলল, যোগাযোগ হয়ে থাকলে এই যদি তার পছন্দের বহর হয়, তাকে পত্রপাঠ ছেঁটে দে। কি ছিলি আর কি হয়ে গেছিস তুই—অ্যাঁ?

সিগারেটে ছোট ছোট কয়েকটা টান পড়ল। কয়েকটা ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাক খেয়ে খেয়ে ওপরে উঠে গেল। অমিতা সিগারেটের শেষটুকু অ্যাশপটে গুঁজল। ওর দিকেই চেয়ে আছে। বেশ একটু মজা লাগছে যেন। কিন্তু চাউনিটা ধার-ধার।

—বোস্।

মিলন ওর খাটেই বসল। ঘরের চারদিকের দেয়ালে কোথাও কিছু নেই, কেবল এক দেয়ালে একটা ক্যালেন্ডার ঝুলছে। এ ছাড়া শোবার খাট, উল্টো দিকে ড্রেসিং টেবিল, আর বইয়ের ছোট আলমারি একটা। জামা-কাপড় রাখা বা পরার ব্যবস্থা পাশের খুপরি ঘরে। মিলন বিলেত যাবার আগেও এই রকমই ছিল ঘরটা। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘরে কি নেই মনে হল। তারপরেই খেয়াল হল কি নেই। ফুল। ফুল দারুণ ভালবাসত অমিতা।

বাড়িতেই বাগান। হরেক রকমের ফুলের গাছও লাগানো হত ওরই তাগিদে। মালির সঙ্গে নিজেও বাগানের তদারক করত। মিলন এ ঘর ফুল ছাড়া কখনো দেখেনি। ড্রেসিং টেবিলে মস্ত টাটকা ফুলের তোড়া থাকত, আয়নায় সুগন্ধ ফুলের মালা জড়ানো থাকত। ফুলের মিষ্টি গন্ধ এ ঘরটা বিশেষ করে টানত ওকে।

—কি দেখছিস? অমিতা বেশ মজাই পাচ্ছে। কি দেখছে বুঝেও প্রশ্নটা করল।

মিলন এবারে একটু খোঁচা দেবার মতো করেই বলল, তোর ঘরে ফুল নেই।...আর তোরও অনেকটা নেই।

চাউনিটা আবারও খরখরে হয়ে উঠল অমিতার। সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিয়ে আবার একটা সিগারেট ঠোঁটে ঝোলালো।—শোন, আমাকে নিয়ে কারো বেশি মাথা ঘামানো আমি বরদাস্ত করি না জেনে রাখ।...এবারে তোর কথা বল, কেমন কাটালি?

গম্ভীর মুখে মিলন খাট থেকে উঠে কাছে এসে ওর ঠোঁট থেকে সিগারেটটা টেনে নিয়ে জোরে জানলার দিকে ছুঁড়ল। তারপর আবার খাটে ফিরে এসে জবাব দিল, খুব ভালো।

অমিতা রাগ করল না। বলল, আমি গরিব স্কুল মাস্টার হলেও সিগারেটটা দামী —মিছিমিছি কতগুলো পয়সা নষ্ট করলি।...খুব ভালো কাটালি মানে আমিষ না নিরামিষ?

এতক্ষণে ওর গলায় পুরনো দিনের একটু ছোঁয়া পেল মিলন। হেসে জবাব দিল, আমিষের তো সেখানে ছড়াছড়ি, আমার নিরামিষই ভালো লাগল। আমার চেহারাখানা আগের থেকে কত স্মার্ট আর কত ভালো হয়েছে দেখছিস তো—আমিষদের উৎপাত লেগেই ছিল।

নিজের চেহারা নিয়ে ও আগেও এ-রকম বড়াই করত। অমিতার চোখের তারায় একটু হাসি চিকচিক করছে। বিলেতের আমিষ-নিরামিষ সম্পর্কে অমিতার কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। তার মুখের ওপর দু'চোখ আটকে নিয়ে জিগ্যেস করল, মায়ের কাছে শুনলাম, বাবার ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের মেয়ের সঙ্গে খুব খাতির তোর...এয়ারপোর্টে নিজে ড্রাইভ করে তোকে রিসিভ করতে গেছল?

মিলন হাসিমুখে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল।

—এত খাতির কোথায় হল, লন্ডনে?

—হ্যাঁ, মাঝে দু'বার তো ওরা গেছল।

অমিতা নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল। এবারের প্রশ্ন আরো সাদাসাপ্টা।—কতটা খাতির, লটঘট বেঁধে যেতে পারে?

মিলনের ভাষার দৌড় অমিতার মতো না হলেও না বোঝার কথা নয়। তবু জিগ্যেস করল, লটঘট বেঁধে যেতে পারে মানে?

শুধু চোখে নয় অমিতার সুন্দর দুই ঠোঁটের ফাঁকেও কৌতুকের ফাটল ধরল। জবাব না দিয়ে আবার জিগ্যেস করল, এলা মোদী তোকে লাঞ্চের নেমন্তন্ন করেছিল শুনলাম?

মিলন হাসি মুখেই সায় দিল।

—কোথায়?

—অশোকা।

—কোথায় বসে লাঞ্চ সারলি, সকলের চোখের সামনে ডাইনিং হল-এ, না আলাদা ব্যবস্থা করেছিল?

—আলাদা...।

—দুজনে মুখোমুখি বসে খেলি?

জেরা কোন দিকে গড়াচ্ছে সঠিক না বুঝেও মিলন জবাব দিল, খেলাম তো।

—তারপর কি খেলি?

মিলনের মনে হল তাকে বিপাকে ফেলার দিকে টেনে আনছে অমিতা। ফিরে জিগ্যেস করল, তারপর কি খেলাম মানে!

দু'চোখ পাকিয়ে অমিতা চেয়ে রইল খানিক, তারপর দাবড়ানি দিয়ে উঠল, চালাকি পেয়েছিস? এলা মোদী আলাদা জায়গা রিজার্ভ করেছিল শুধু খাবার চিবুনোর জন্য? শুধু চুমু-টুমুতেই শেষ করলি, না তার থেকে বেশি খাওয়া-খাওয়ি হল?

হাসি চেপে দু'চোখ বড় বড় করে ফেলল মিলন।—কি বিচ্ছিরি মুখ হয়েছে রে তোর!

অমিতার চোখের আর ঠোঁটের হাসির আভাস মিলিয়ে যেতে লাগল। খুব খেয়াল না করেই সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিল। দু'চোখ মিলনের মুখের ওপর অনড়। কথাগুলো খরখরে এবার।—তা ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের মেয়ে তোর প্রেমে মজেছে দেখে বাবার হাব-ভাব কেমন দেখলি—বেজায় খুশি?

এ-প্রসঙ্গে অমির হাব-ভাব হঠাৎ রুক্ষ হয়ে উঠল কেন মিলন ভেবে পেল না। তবু হালকা জবাবই দিল, প্রেমে মজেছে কাকু আর দেখল কোথায়, একটু-আধটু ভাব-সাব হয়েছে লক্ষ্য করেই কাকু-কাকিমা দুজনেই অবাক বোধ হয়।...কাকিমা তোকে কিছু বলেছে?

মুখখানা এবার যথাসম্ভব নির্লিপ্ত গোছের করে অমিতা জবাব দিল, মা অবাক নয়, একটু অস্বস্তির মধ্যে আছে মনে হল।...তা তোর কি মতলব, আচ্ছা করে অবাক করবি তাদের?

মাথা চুলকে মিলন বলল, ওই গোছের মতলব তো তলায় তলায় আছে একটু...কিন্তু কি দাঁড়াবে শেষ পর্যন্ত কে জানে! উৎসুক একটু।—কাকু বিগড়ে যাবে মনে হয় নাকি তোর?

অমিতার ফর্সা মুখে কঠিন রেখা পড়তে লাগল।—বিগড়ে না গিয়ে খুশিতে আটখানাও হতে পারে। এ তো আর নিজের মেয়ে নয় যে সর্বনাশ হয়ে গেল ভাববে...খোদ ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের সঙ্গে সম্পর্ক হলে তো সব দিকে লাভ। তারপরই নরম গলায় আশ্বাস দিল, যাক, যে যাই বলুক, তুই চোখ কান বুজে এগো—আমি তোর দিকে আছি।

মিলন বোকা একটুও নয়। অমিতার জীবনে বড় রকমের ক্ষোভের কিছু ঘটে গেছে বুঝতেই পারছে। আর সেটা কি নিয়ে এ-কথার পর তার আঁচও কিছু পাচ্ছে। এলা মোদীর ব্যাপারে এমন উৎসাহ যোগানোর পিছনে কাকুর আর কাকিমার সঙ্গে ওর কিছু হিসেবনিকেশের ব্যাপার আছে মনে হয়। কৌতূহল উপচে উঠলেও এ প্রসঙ্গ আপাতত এড়ানোই ভাল ভাবল। তাছাড়া মিলনের নিজের ভিতরটা এখন ভর-ভরতি। এই সন্ধ্যায়ও এলা এত তাড়াতাড়ি ওকে ছাড়তে চায়নি। তার দেশে ফেরার অপেক্ষায় দিন গুনছিল নিজের মুখেই বলেছে। এলার শেষের দিকের চিঠিগুলোতেও দুজনের সোনালি

ভবিষ্যতের ইঙ্গিত অস্পষ্ট ছিল না। আজ মিলন অমির দোহাই দিয়েই চলে এসেছে। বলেছে, আর দেরি করলে বোন এরপর রক্ষে রাখবে না। অমির গল্পও আজ এলার কাছে করেছে বই কি। বলেছে অমন হাসি খুশি চালাক চতুর অথচ মেজাজী মেয়ে হাজারে একটা হয় না। অবশ্য এই অমিতার সঙ্গে আগে দেখা হলে এতটা বলতে পারত কিনা সন্দেহ। তবু ভিতরের এই আনন্দ কারো কাছে উজাড় করে দিতেই ইচ্ছে করে। আর অমিতা ওর বোন শুধু নয়, সেই গোছের বন্ধু বা বান্ধবীও। মনের আনন্দ বাড়ির মধ্যে শুধু অমিতার কাছেই প্রকাশ করা চলে।

সানন্দে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ।...তুই এলাকে খুব ভালো করেই জানিস নিশ্চয়?

অমিতা পুরুষের এই ডগমগ মুখ চেনে। কিছুটা নির্লিপ্ত মুখে জবাব দিল, অত বড়লোকের মেয়েকে খুব ভালো করে জানার সুযোগ কোথায়? দুই এক বার দেখেছি এই পর্যন্ত...

মস্ত বড় লোকের মেয়ে—এলার শুধু এটুকুই যেন পরিচয় নয়। সাগ্রহে মিলন সেটুকুই নাকচ করতে চাইল।—আরে না-না, বড়লোক হলেও সে-রকম দেমাক দেমাক নেই—তা না হলে আমার দিকে ভেড়ে?

অমিতা মনে মনে ভাবল, সেটা বড়লোকের মেয়ের খেয়ালখুশিও হতে পারে। কিন্তু মনে সংশয় জাগতে পারে এ-রকম মন্তব্যের ধার দিয়েও গেল না। উল্টে তোষামোদের সুরে বলল, কেন, তুই কি একটা কম কিছু নাকি। যাকগে...আমার সঙ্গে কবে আলাপ করিয়ে দিবি?

মিলনের ডবল আগ্রহ।—যেদিন বলবি, কাল পরশু—কবে নিয়ে আসব বল?

—ছুটির দিন ছাড়া হবে না—আর তোর যেমন বুদ্ধি—এখানে নিয়ে আসবি কি!

মিলন অপ্রস্তুত একটু।—তাই তো...আচ্ছা অন্য ব্যবস্থা হবে।

প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করেও অমিতা আবার রেখে দিল। খুব নিস্পৃহ সুরে জিগ্যেস করল, ত'...এলার বাবা তোদের এই ব্যাপার-ট্যাপার জানে তো?

ছেলেমানুষি নিশ্চিন্ততায় মিলন বলল, এতটা জানে না, তবে এলা বলে তার বাবা কারো স্বাধীনতায় নাক গলায় না...তাছাড়া ভদ্রলোক আমাকে পছন্দও করে মনে হয়, আজ তো দেখলাম--

—আজ কি দেখলি?

—বাঃ, আজ তাকে মিট করলাম না! আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারসুদ্ধ রেডি ছিল, যেতেই পেয়ে গেলাম, কাল থেকে জয়েন করছি—কাকু-কাকিমাকে নিশ্চয় বলেছে —কাকিমা তোকে কিছু বলেনি?

মাথা নেড়ে অমিতা নিস্পৃহ মুখে ঠোঁট ওল্টাল। তারপর জিজ্ঞেস করল, কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট?

—অ্যাসিস্ট্যান্ট এনজিনিয়ার, আবার কি!

—বাবার আন্ডারে?

—কাকুর তো কনস্ট্রাকশন, আমাকে মেকানিক্যাল সাইডে নিল।...কাকুর এটা খুব পছন্দ হয়নি মনে হল।

দাঁতের কোণে ঠোঁট ঘষে অমিতা এবারে আরো আলতো করে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে রাজের ডিপার্টমেন্টে?

অমিতা যা ভেবেছিল তাই, মিলনের আকাশ থেকে পড়ার দাখিল।—তুই রাজকে চিনিস?

অমিতার চোখে মুখে আর কোন আগ্রহের ছিটেফোঁটাই নেই। একটু চুপ করে থেকে নির্লিপ্ত সুরে বলল, জিজ্ঞেস করিস—

—বাঃ, আমি তাকে জিজ্ঞেস করতে যাব তোকে চেনে কিনা? তুই বল্ না—

তেমনি নিস্পৃহ সুরে অমিতা বলল, ক্লাবে গেলে দেখা হয়।

—কোন্ ক্লাবে?

অমিতা নাম বলল। শোনামাত্র মিলনের সচকিত হবার কথা। হলও। ডেল্‌লি প্যারাডাইস! দিল্লির সাধারণ হাই সোসাইটির মেয়ে, পুরুষরাও সেখানে খুব একটা পাত্তা পায় না। তাদের থেকেও ঢের বেশি শাঁসালো আর অভিজাত যারা, ডেল্‌লি প্যারাডাইস তাদের অবাধ মেলামেশার রঙ্গস্থল বলে জানে সকলে। ফলে সকলের বিবেচনায় খুব সুনামের জায়গা নয় ওটা। মিলন মজুমদার তো মাত্র তিন বছর বাইরে কাটিয়ে এলো, তার না জানার কি আছে!

খানিক চেয়ে থেকে মিলন প্রায় অবিশ্বাস্য গলায় জিজ্ঞাসা করল, তুই ওই ক্লাবের মেম্বার?

এই আলাপে ছেদ টানার মতো করে অমিতা জবাব দিল, মেম্বার আবার কি, টানা হেঁচড়ায় পড়ে যেতে হয়।

সিগারেটের প্যাকেট হাতেই ছিল, টেবিল থেকে লাইটারটা নিয়ে অমিতা এবার একটা সিগারেট ধরালো।

মিলন চোখের কোণে দেখতে লাগল। অমিতা এই তিন বছরে কত যে বদলেছে ঠিক নেই। আগে যারা ওকে দেখেছে তাদের চোখ ধাক্কাই খাবে। আগে ওকে দেখলে চোখ জুড়োত। লম্বা, শামলা, পরিমিত সুঠাম স্বাস্থ্য। নাক-মুখ সুন্দর, বুদ্ধিদীপ্ত চাউনি। সব মিলিয়ে সুন্দর তো বটেই, প্রাণের ছোঁয়ায় একটা ভরপুর মেয়ে। যে হাসলে সুন্দর দেখায়, রাগলে সুন্দর দেখায়, চলতে ফিরতে কিছু যেন উছলে পড়ে যা আড়চোখে হলেও দেখার মতো, ভাল লাগার মতো। এখনো এই মেয়ে পুরুষের চোখ টানবে না এমন হয়তো আদৌ নয়। হয়তো বা যাদের সঙ্গে মেলামেশা করে এই রূপ তাদের চোখ আরো বেশি টানে। কিন্তু আগের থেকে অনেক তফাৎ। কত তফাৎ মিলন চুপচাপ তাই দেখছে। এ অনেক ধার অনেক ঝাঁঝ আর অনেক হিসেব-নিকেশের রূপ। একটু আগে বলছিল, মেম্বার না হলেও টানা-হেঁচড়ায় পড়ে ওই ক্লাবে যেতে হয়। মিলনের মনে হল, এই রূপের সঙ্গে পুরুষের টানা-হেঁচড়ার যোগ থাকতেও পারে। কেন যেন মিলনের হঠাৎ মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

পরদিন লাঞ্চের পর কাকিমাকে নিরিবিলিতে পেল। সকাল ন'টা থেকে অফিস। কাকুর সঙ্গে বেলা একটায় খেতে এসেছিল। লাঞ্চের পর আবার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অফিস। খাওয়া শেষ হতে মিলন বলল, আমি কাকিমার সঙ্গে একটু গপ্পো-টপ্পো করে যাচ্ছি—তুমি খানিক বাদে গাড়িটা পাঠিয়ে দিও।

কাজে ফাঁকি দিয়ে গপ্পো বরদাস্ত করার ধাত নয় অনুপমবাবুর। সবে আজই জয়েন করল, দেখে শুনে বুঝে নিতেই ক'টা দিন কেটে যাবে। তবু জিজ্ঞেস করলেন, লাঞ্চের পর দেরি হবে বলে এসেছিস?

—কাকে বলব, লাঞ্চে বেরুবার আগে বস্ নিজেই বলে গেছে আজ আর ফিরছেই না।

বস্ বলতে রাজা মোদী। কাকু চলে যেতেই কোন রকম ভনিতা না করে কাকিমাকে জিজ্ঞেস করল, অমির রকম-সকম তো ভালো ঠেকছে না—কি ব্যাপার বলো দেখি?

বিরস মুখে মিনতি বললেন, কি আর ব্যাপার, আমাদের আক্কেল দিচ্ছে।...তোর সঙ্গে তো কাল অনেকক্ষণ ধরে কথা হল। আমাদের নামে বলল কিছু?

—কি-চ্ছু না। তোমাদের আক্কেল দিচ্ছে মানে?

মিলন শুনল।

যা হামেশা ঘটে তেমনি কিছু। মিলন এই রকমই কিছু আঁচ করেছিল।...তিন বছর আগে মিলন দিল্লিতে থাকতেই অমিতা কেন বিয়ের নামে কান পাতত না বা গা করত না, কেউ বোঝেনি। এমন হাসিখুশি মেয়ে, কে আর কি সন্দেহ করবে। মিলন বিলেত চলে যাওয়ার কিছুদিন পরে ব্যাপারটা বোঝা গেল। অমিতারও তখন এম. এ. পরীক্ষা হয়ে গেছে। রেজাল্টও বেরিয়েছে। বড়দি প্রমিতা তখন এখানে। বেশির ভাগ সময় অমিতার ঘরে থাকার কথা। কিন্তু রোজ ওর বেরুনোর তাগিদ। কাকু আর কাকিমা ভাবত চাকরির চেষ্টা করছে। তাদের চার মেয়ের মধ্যে এই মেয়েরই সব থেকে বেশি খরচের হাত। কিন্তু একবার বেরুল তো তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে ফেরার নাম নেই। তাছাড়া প্রায়ই কাকুর কাছে গাড়ির তাগিদ। তার গাড়ি দরকার। কেন দরকার জিগ্যেস করলে রাগ।

কাকু যখনই ড্রাইভার রাম সিং-এর কাছে খোঁজ নেয় ফিরতে এত দেরি কেন, কোথায় গেছল—তখনই শোনে পালামে। এয়ারপোর্টে। এত ঘন ঘন ও এয়ারপোর্টে যায় কেন কেউ ভেবে পায় না। ভিতরে ভিতরে কাকু-কাকিমার দুশ্চিন্তা, মেয়ে এয়ার হোসটেসের কাজের চেষ্টায় আছে কিনা। বরাবরই অস্থির মতিগতি ওর। কিন্তু জিজ্ঞেস করলে আজগুবি সব অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা বলতে গিয়ে নিজেই হেসে গড়ায়।

শেষে বড়দির কাছে নিজেই একদিন ভাঙল। তাকে নিয়ে বাবার গাড়িতে একদিন এয়ারপোর্টে এলো। একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। পাঞ্জাবী ছেলে। নাম সুদর্শন সিং। না, লম্বা চুল বা ঝাঁকড়া দাড়ি-গোঁফের ব্যাপার নেই। পরিষ্কার শেভ করা স্মার্ট ছেলে। অমিতার বয়েস তখন চব্বিশ। ওর থেকে বছর চারেকের বড় হবে। নাম সুদর্শন, দেখতেও সুদর্শনই বটে। ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটের পাইলট। প্রমিতা আলাপ করবে কি একেবারে ভেবাচাকা খেয়ে গেছে। সুদর্শন সিং এয়ারপোর্ট রেস্তোরাঁয় ওদের আদর আপ্যায়ন করল, বড়দিকে দিদিজী দিদিজী করল। তারপর ফেরার সময় অমিতা গাড়িতে বড়দিকে বলল, সুদর্শন সিংকে সে বিয়ে করতে যাচ্ছে, বাবা-মায়ের মত করিয়ে দিতে হবে।

বড়দি আগেই হাঁ হয়ে গেছল। তাকে ধরে এনে পরিচয় করিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপার বুঝেছে। কিন্তু তখন মুখে কথা সরেনি। অমিতা হেসে হেসে সুদর্শন সিংকে বুঝিয়েছে তার দিদিটি বিষম লাজুক, ওর নিজের মতো বখাটে নয়। তেমনি হেসে হলেও

সুদর্শন সিং জবাব দিয়েছে, আমার মনে হচ্ছিল দিদিজীর আমাকে একটুও পছন্দ হয়নি।

অমিতা তখুনি বলেছে, তা হতেও পারে—দেখেই পছন্দ হবার মতো তোমার কি আছে?

এরপর ফেরার পথে গাড়িতে বসে বোনের প্রস্তাব শুনে বাবার কথা ভেবে প্রমিতার বুকের তলায় ধুকপুকুনি। আবার রাগও হয়েছে। বলেছে, তোর কি ভয়-ডর বলে কিছু নেই—বাবার কথা ভাবলি না? এ বিয়েতে বাবা মত দেবে?

অমিতার সাফ কথা, বাবার ভাবনা মাথায় আছে বলেই তো তোকে ধরা হয়েছে, তুই আদরের বড় মেয়ে, তোর কথার বাবা একটু আধটু দাম দেয় দেখেছি। পাঞ্জাবী ছেলে তাতে কি হয়েছে, তোর ভেতো বরের থেকে খারাপ দেখলি কিছু? বিয়ে এখানেই হবে, তাই মাস্টারি না করে বাবা যাতে ঠাণ্ডা মাথায় মত দেয় সেই ব্যবস্থা কর।

অশান্তির সেই শুরু। বড়দি সুপারিশ করবে কি, এমন বিয়েতে তার নিজেরই মত নেই। তার ওপর কাকু তো শুনেই রেগে অস্থির। শুধু রাগ নয়, তার মাথায় আকাশ ভাঙার দাখিল। অমির বারো তেরো বছর বয়সের সময় কলকাতার এক নামী জ্যোতিষী ওর ছক দেখে বলেছিল, এই মেয়ের বিয়ে নিয়ে বেশ মুশকিলে পড়তে হবে, অনেক রকম অশান্তির ব্যাপারও ঘটতে পারে। তাই মেয়ের পনের বছর বয়স হলেই রত্ন ধারণ করা দরকার। কি রত্ন তা-ও বলেছিল। কাকু এ-সব মানুক না মানুক বংশগত দুর্বলতা কিছু আছেই। তাঁর বাবা-মা ঠিকুজির বাইরে এক পা নড়ত না। কাকু তবু তখনকার মত দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলেছিল। কাকিমাকে বলেছিল, হুঁঃ, কেবল রোজগারের ফন্দি, ভাগ্যটা যেন জ্যোতিষীর বিধানের দাস—আমার চার মেয়ের মধ্যে ওই ছোটটাই দেখতে শুনতে আর লেখা-পড়ায় সব থেকে সেরা—মুশকিল আবার কি হবে। লোকে সেধে নিয়ে যাবে দেখো।

কিন্তু এমন সেধে নেওয়া কাকুর কল্পনার মধ্যেও ছিল না। মাথা একটু ঠাণ্ডা হতেই ভাবল এ একটা স্রেফ হুজুগের ব্যাপার, যার নাম অবাস্তব মোহ ছাড়া আর কিছু নয়। ছেলে পাইলট, আজ লন্ডন কাল আমেরিকা করে বেড়ায়—মেয়ের মনও সেই মোহে উড়ছে। প্রথমেই রাগারাগির রাস্তায় না গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় মেয়েকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করল, তারপর তেতে উঠতে লাগল। অমির কেবল এক কথা, তুমি কিছু চিন্তা কোরো না, আমি হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কিছু করছি না—ওকে দেখলে ওর সঙ্গে কথা বললে তোমারও অপছন্দ হবে না—আমি সুখী হব জেনেই মত দাও।

কিন্তু কাকু ভাবল, মেয়েটা আত্মহত্যাই করতে যাচ্ছে। শুধু কাকু কেন, কাকিমাও তাই ভাবল। কাকিমার অনুনয়ে এমন কি চোখের জলেও মেয়ে অনড়। তার সাফ কথা বিয়ে ওইখানে ওই ছেলের সঙ্গেই হবে। বড়দি কলকাতায় অন্য দুই বোনের কাছে এত বড় বিপদের কথা না লিখে পারেনি। সেই দুই বোনও কিছুটা রাগ করে আর কিছুটা কাকুতি মিনতি করে ছোট বোনকে চিঠি লিখেছে। বাবা মায়ের মুখ চেয়েও সে যেন এমন রাজ্যি-ছাড়া গোঁ ছাড়ে—এ-বয়সে এত বড় দুঃখ যেন বাবা-মাকে না দেয়। ফল আরো বিপরীত হয়েছে। বোনেদের ওপরেও রাগে জ্বলেছে অমিতা। মেজাজ-পত্র দিনে দিনে উগ্র হয়ে উঠেছে। কেউ কিছু বলতে এলে মুখে এক কথা।—কারো কোন উপদেশের দরকার নেই, বিয়ে এখানেই হবে।

ধৈর্যচ্যুতি কাকুরও ঘটেছিল। কাকিমার মারফৎ সাফ জানিয়েছে, এ বিয়ে হলে এ-বাড়ির সঙ্গে আর তার কোন সম্পর্ক থাকবে না।

অমিরও তেমনি সাফ জবাব, ক্ষোভে ঝলসে উঠে মা-কে বলেছে, থাকবে না সে-তো দেখতেই পাচ্ছি।

এই সময় একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটে গেল। রাত প্রায় আটটা হবে সেদিন। অমিতা বাড়ি ছিল না। ক'দিনের মধ্যে বাবা-মায়ের সঙ্গে মুখের কথাও নেই। ইদানীং ও কোথায় যায় কি করে কেউ জিগ্যেসও করে না। বাড়ির মধ্যে সর্বদা একটা গুমোট থিতিয়ে থাকে। সকলে ধরেই নিয়েছে হঠাৎ একদিন অমিতা আর বাড়ি ফিরবে না। হয়তো কাকিমার নামে বা বড়দির নামে একটা চিরকুট পাঠাবে—ও তার নিজের জায়গায় চলল।

গেটের সামনে একটা ট্যাক্সি থামল। দরজায় পুরু পর্দা ঝুলছে তাই ঘর থেকে ঠাওর করা গেল না কে এলো। একটু বাদে একজন অপরিচিত লোক দরজার কাছে এসে পর্দাটা একটু সরালো। লম্বার ওপর বেশ সুঠাম স্বাস্থ্য, স্মার্ট তো বটেই, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। বসার ঘরে তখন কাকু আর কাকিমা ছাড়া আর কেউ নেই। আগে আর না দেখলেও কাকিমার অন্তত তক্ষুনি মনে হল—এ সেই ছেলে। সুদর্শন সিং।

—মে আই কাম ইন?

কাকিমা উঠে ভিতরের দরজার আড়ালে চলে গেল। কাকু মাথা নাড়ল, আসতে পারে।

লোকটা ভিতরে এলো। বলল, আই অ্যাম সুদর্শন সিং...ডাজ ইট মীন এনিথিং টু ইউ?

চুপচাপ একটু চেয়ে থেকে কাকু সামান্য মাথা নেড়ে জবাব দিলে, মীনস এ লট। সীট ডাউন।

সুদর্শন সিং একটা চেয়ার টেনে তার মখোমুখি বসল।—দেন উই ক্যান অ্যাভয়েড প্রিলিমিনারিজ।...কিছু দিন ধরে আপনার মেয়ে অমিতাকে খুব ডিসটার্বড আর ডিপ্রেসড দেখছি। এ বিয়েতে আপনার এ-রকম আপত্তি কেন, আপনি কি আমাকে অযোগ্য ভাবছেন?

জবাব দেবার আগে কাকু চুপচাপ চেয়ে রইল খানিক। তার চাউনি আর গলার স্বর খুব ঠাণ্ডা—আমি কিছুই ভাবছি না, এ রকম বিয়ে আমাদের ট্র্যাডিশনেব বাইরে।

একটু সামনে ঝুঁকে প্রায় অনুনয়ের সুরে সুদর্শন সিং বলল, কিন্তু ট্র্যাডিশনের বাইরে আজকাল তো হামেশাই এ রকম বিয়ে হচ্ছে?

—আমাদের কখনো হয়নি। আমার ট্র্যাডিশন আমি ভাঙতেও চাই না। কাকুর গলা উঁচু পরদায় চড়েনি কিন্তু আরো কঠিন।—আমার মেয়ে কোথায়? তুমিই বা কেন এসেছ?

সুদর্শন সিং-এর আহত মুখ। বলল, তাকে ক্লাবে রেখে এক ফাঁকে আমি বেরিয়ে এসেছি। আমি এখানে আসব সে জানে না। ও এত কষ্ট পাচ্ছে দেখে আমি এসেছি। ...আপনি তাকে বলেছেন এ বিয়ে হলে তার সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক থাকবে না?

ভিতরে ভিতরে কাকু অসম্ভব তেতে উঠছিল। তার আরো কারণ ছেলেটা সামনে ঝুঁকে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অল্প অল্প একটু গন্ধ পাচ্ছিলেন। নিজে ড্রিংক না

করলেও এ-গন্ধ তিনি চেনেন। মেয়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকার ভেবে ভিতরটা তাঁর আরো পুড়ে যাচ্ছিল। তেমনি কঠিন গলাতেই জবাব দিলেন, বলেছি!

—বাট হোয়াই! আপনার মত নেই বলে এমনিতেই সে কষ্ট পাচ্ছে, বিয়ের পর আমরা তো বাইরেই চলে যাব—তার পরেও ফাদার হয়ে আপনি ওর ওপরে ক্রুয়েল হবেন কেন? আপনি নিশ্চয় জানেন সে আপনাকে কত ভালবাসে, তা না হলে এত কষ্ট পেত না—

কাকু হঠাৎ রাগত মুখে জিগ্যেস করল, তোমার বাবা আছেন? তাঁর মেয়ে আছে?

তক্ষুনি সুদর্শন সিং-এর লালচে মুখ একটু অন্য রকম হয় গেল। জবাব দিল, নেই। মেয়েও নেই। আমি তার একমাত্র ছেলে। বাবা নেভিতে ছিলেন, আমার ষোল বছর বয়সে জাহাজ-ডুবি হয়ে মারা যান।...তার মাত্র এক বছর আগে আমার মা মারা গেছল। আই রিমেম্বার হাউ ডিয়ারলি মাই ফাদার লাভড় মি...আর সেই থেকে এভরি ফাদার ইজ ডিয়ার টু মি...আমি আশা করতাম অমিতার বাবা বলে আপনি আমার আরো ডিয়ার হবেন।

কাকুর কানে সবটা ঢুকল কি ঢুকল না ঠিক নেই।...এই ছেলের বাবা নেভিতে ছিল, জাহাজ-ডুবি হয়ে মারা গেছে...এ-ও এয়ার পাইলট। চোখের সামনে হঠাৎ মেয়ের বিধবা মূর্তি দেখে উঠল কাকু। পরে নিজেই সে-কথা কাকিমাকে বলেছে, একই সঙ্গে মাথায় কিছু খেলে গেল। দেখছে ছেলেটাকে। ড্রিংক করার জন্যই মুখ অত লালচে ভাবছে।

—তুমি তোমার বাবাকে খুব ভালবাসতে?

—ও শিওর!

—আর সেই থেকে প্রত্যেক বাবার ওপর তোমার খুব দরদ? তোমার সত্যিকারের ভালবাসা?

সুদর্শন সিং নির্দ্বিধায় মাথা নাড়ল। বলল, তা না হলে আমি আপনার কাছে এলাম কেন?

এবারে কাকুর কথাগুলো আর নির্দয় নয়, বরং কোমল। বলল, তাহলে একটি বাবার বুক ভেঙে যাচ্ছে ভেবেও আমার মেয়ের কাছ থেকে তুমি সরে যেতে পারো। আমার মেয়েকে তুমি আমার থেকে ভাল নিশ্চয় চেনো না—আমি তোমাকে বলছি এ-বিয়ে কক্ষনো সাকসেসফুল হতে পারে না—টেক ইট ফ্রম মি মাই বয়—কক্ষনো না। আমি তোমার বাবার মতই একজন বাবা—তোমার সেই বাবার কথা চিন্তা করেও কি আমার কাছ থেকে আমার মেয়েকে ছিনিয়ে নেবার সঙ্কল্প ছাড়তে পারো না? কান্ট ইউ? কান্ট ইউ?

ছেলেটা হকচকিয়ে গেল কেমন। চুপচাপ বসে রইল। চুপচাপ চেয়ে রইল। তারপর উঠে চলে গেল।

ফয়সলা যে হয়েই গেল সেই রাতে বোঝা যায়নি। পরদিন বোঝা গেছে। অমিতার মুখ দেখেই কাকিমা প্রমাদ গুনেছিল। কথা শুনে আরো বোঝা গেছে। বিকেলে বাড়ি এসেই কাকিমার মুখোমুখি। সমস্ত মুখ আগুন।—বাবা দারুণ কাজ করেছে—তোমরা

দারুণ কাজ করেছ—বুঝলে? আর তোমাদের মেয়ে নিয়ে কোন ভাবনা-চিন্তা নেই—এখন থেকে তোমরা খুব নিশ্চিন্ত থাকতে পারো—বুঝলে? বুঝলে?

যা-ই বলুক, শেষ পর্যন্ত এই পরিণাম দাঁড়াবে—সেদিনের সেই মেয়েটা এমন হয়ে যাবে কাকু বা কাকিমা কেউ ভাবেনি। কাকিমা বলল, ঘরে বসে অমি এখন সিগারেট পর্যন্ত খায়, এদিকের ঘরে বসে ওর বাবা টের পায়। কত রাত করে বাড়ি ফেরে এক একদিন ঠিক নেই। তোর কাকুর এক এক সময় অসহ্য লাগে। আমাকে বলে ওকে যেখানে খুশি চলে যেতে বলো—এ বাড়িতে এভাবে থাকা চলবে না। আমি শুধু মুখ চাপা দিই আর বলি, আর কিছুদিন সবুর করো—মিলন এলে হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মিলন বলল, যাই বলো কাকিমা, কাজটা খুব ভালো হয়নি, কাকু এতটা না করলেই পারত। কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে নিজের সমস্যাটাও যেন বড় হয়ে উঠেছে। বীভারস-এর বড় সাহেব হেমরাজ মোদীর মেয়েকে ঘরে আনার প্রস্তাব শুনলে কাকু কোন্ মূর্তি ধরবে?

মিলনের কথা শুনে মিনতি খুশি হলেন না ঠিক একই কারণে। ঈষৎ অসহিষ্ণু জবাব দিলেন, আমরা সেকেলে মানুষ, তোদের পছন্দমতো খুব ভালো কাজ আর কি করে করব। এক যন্ত্রণায় বাঁচি না, তার ওপর তোরই বা মতলবখানা কি? কাল থেকে তো তোর জন্যেই ভদ্রলোক ভেবে ভেবে সারা—চুপচাপ থাকে বলে কিছু টের পাস না?

কেন কাকু ওর জন্যে ভেবে সারা বুঝেও মিলনের দু' চোখ কপালে। —আমার জন্যে কাকু ভেবে সারা! কেন? আমি কি করলাম? ও...

থমকালো একটু। আসলে মনে মনে জবাব হাতড়ে বেড়াচ্ছে। তারপর আলোচনার প্রসঙ্গ সহজ করে তোলার জন্য হেসে উঠে বলল, দেখ কাকিমা, দিনকাল সত্যি একটু বদলেছে, নিজেদের মন থেকে দুঃখ তৈরি করে কষ্ট পেতে না চাইলে দেখবে সব ঠিক আছে। আর একটা কথা জেনে রেখো, আমি কখনো এমন কোন কাজ করব না যাতে কাকু লজ্জা পাবে বা তার মুখ ছোট হবে। আমি যা-ই করি না কেন, তার সব দায়ও আমারই—আর কারো নয়।

মিলন বুঝল, এই শুনেও কাকিমা স্বস্তি-বোধ করল না খুব।

বিকেলে অফিসে এলা মোদীর টেলিফোন। ছদ্ম কোপে প্রথমেই শাসন, লাঞ্চের পর ফোনে পাওয়া যায় না, কাজে ফাঁকি দিয়ে কোথায় আড্ডা মেরে বেড়ানো হয়? পরের বক্তব্য, অফিস ছুটির পর ওকে তুলে নিতে আসছে। তারপর কোথায় যাবে ঠিক করা যাবে।

ছুটির পর আজও কাকুর চোখ এড়িয়ে এলার লাল গাড়িতে ওঠার চেষ্টা মিলনের। কিন্তু সেটা সম্ভব হল না। এলার পাশে বসে সাততলার দিকে চোখ তুলেই দেখে কাকু জানালায় দাঁড়িয়ে। বেশ অস্বস্তি বোধ করল। মনে হল কাকুর ঠিক এ-সময় ওই জানলায় দাঁড়ানোটা বিনা কারণে নয়।

দুপুরে কাকিমার মুখে ওই কথা না শুনলে মিলন এ-রকম ভাবত না। গাড়ি চোখের আড়াল হতে হালকা হেসেই বলল, ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের মেয়ে অফিসে এমন ঘনঘন টেলিফোন করলে আর নিজে গাড়ি হাঁকিয়ে এসে অফিস থেকে বার করে নিয়ে গেলে তো মুশকিল...।

এলা হাসলে ধপধপে দাঁতের সারির অনেকগুলো ঝকমকিয়ে ওঠে। মিলনের বেশ লোভনীয় রকমের দেখতে লাগে তখন। তেমনি হেসে সামনে চোখ রেখে এলা ফিরে জিগ্যেস করল, কি মুশকিল?

—মুশকিল না? অফিসের লোকেরা কে কি ভাবে ঠিক নেই।

এলার ভিতরে ভিতরে রঙের খেলা চলেছে এখন। তরল গলায় বলল, ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের মেয়ে হলেও একটা মেয়ে ছাড়া আর কিছু নাকি? ভাবল তো বয়েই গেল। তাছাড়া আমার কাজিনরা যা ভাবার ভেবে বসেই আছে।...কাল রাত্রিতে তো রাজ ভাইয়া টেলিফোনে ঠাট্টাই করল তোমাকে নিয়ে—বলল, ইওর মাংকি ইজ ইন মাই কেজ নাও —তাকে আক্কেল দিয়ে তোকে মজা দেখাব।

রাজা মোদীর প্রসঙ্গে মিলন উৎকর্ণ একটু। কাল রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর অফিস সম্পর্কে কাকুর সঙ্গে কিছু কথা-বার্তা হয়েছে। কোম্পানির ভিতরকার পরিস্থিতি সম্পর্কে কাকু মোটামুটি কিছু আভাস দিয়েছে। সর্বদা চোখ-কান খোলা রেখে কাজ করার উপদেশ দিয়েছে। ওকে কেন রাজা মোদীর ডিপার্টমেন্টে চালান করা হল কাকু তাও একটু বুঝিয়ে দিয়েছে। রাজা মোদীর নিজের বাপ-কাকা বা জ্ঞাতি-ভাইরা বেশির ভাগ সাইফার—সব ওর কথায় ওঠে বসে। ভিতরে ভিতরে খটোমটো একটু যা বাধে তা রাজা মোদীর জন্যেই বাধে—আর বড় কিছু গণ্ডগোল পাকাতে হলে একমাত্র সে-ই পারে। শুরুতেই রাজা যে ওকে বন্ধু-ভাবে নিয়েছে এটা ভালো কথা—মিলন যত তার আস্থাভাজন হয় ততো ভাল—সর্বদা ও যেন তার অনুগত বন্ধুর মত থাকে, আর একেবারে আপনার জনের মত উচিত পরামর্শ দেয়। কাল রাতে কাকু আরো এক ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিল। ওই রাজা মোদীর সঙ্গে পার্টিটার্টিতে গিয়ে মাতামাতি করা যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে...কারণ তার স্বভাব-চরিত্রের সুনাম কিছু নেই...অঢেল টাকার মালিক তাই ওরা অনেক কিছুই সামলে উঠতে পারে।

কাকুর ইঙ্গিত মিলন সঙ্গে সঙ্গেই বুঝেছে। তিন বছর বাইরে কাটিয়ে আসার পর কাল ওই লোকের মুখোমুখি আসামাত্র মনে পড়েনি। কিন্তু পরে কাকুর মুখে হারামজাদা কথাটা শুনে মনে পড়েছিল। রাজা মোদীর স্ত্রী যশোদা মোদীর আত্মহত্যা আর তাই নিয়ে খবরের কাগজে হৈ-চৈয়ের ব্যাপারটা মিলন বিলেত যাবার আগেই ঘটেছিল।

এই রাজা মোদীর সম্পর্কে আরো শোনার জন্যেই মিলন এলার দিকে ফিরে একটু শঙ্কার সুরে জিগ্যেস করল, তোমার বাবা সোজা আমাকে তার দপ্তরে ঠেলে দিলেন...সত্যি জব্দ-টব্দ করতে চাইবে না তো?...আমার কাকার সম্পর্কে তোমার রাজ ভাইয়ার কেমন ধারণা?

—তোমার কাকাকে সক্কলেই শ্রদ্ধা করে।

তারপর যা বলল, শুনে মিলন মনে মনে অবাকই একটু। আগে ওই লোকের সম্পর্কে যা শুনেছে তার সঙ্গে আদৌ মেলে না। এলার উচ্ছ্বাস, তুমি দারুণ লাকি বলেই রাজ্-ভাইয়ার ডিপার্টমেন্টে গেছ—ওর সম্পর্কে বাইরে অনেকে অনেক কথা বলবে, তুমি কিচ্ছু বিশ্বাস কোরো না—ওর মতো খেয়ালি দিলদরিয়া মানুষ কম হয়—আমাকে খুব ভালবাসে।...একটাই কেবল দোষ, মাথায় একবার গোঁ চাপলে তাই করবে, তখন বাপ জ্যাঠা কাকা দাদা বলে কেউ নেই। তোমার কিচ্ছু চিন্তার কারণ নেই—তোমাকে পছন্দ

হয়েছে বলেই আমাকে কংগ্র্যাচুলেট করল। এ-রকম পছন্দের জন্য আমাকে রেবেল এঞ্জেল বলল—ওর মতো ফুর্তির মানুষ আমাদের ফ্যামিলিতে আর আছে নাকি।

মিলন ওর প্রতিটি কথা কান পেতে শুনল। ওদের রক্ষণশীল পরিবারে এ-ধরনের প্রণয়-কাণ্ড কখনো ঘটেনি বলেই হয়তো এমন পছন্দের জন্য রাজা মোদী ওকে রেবেল এঞ্জেল বা বিদ্রোহী পরী বলে তারিফ করেছে। কিন্তু মনে মনে এলাকে সরল মেয়েই ভাবল মিলন। ওর মতে, রাজের মতো ফুর্তির মানুষ আর ওদের ফ্যামিলিতে নেই—তার রাজ্ ভাইয়ার ফুর্তির চোটে বিয়ে করা বউটার আত্মহত্যা করে নিষ্কৃতি পেতে হয়েছিল সে-প্রসঙ্গ মুখেও আনা সম্ভব নয়। আর ভিতরে ভিতরে মিলনের শ্রদ্ধা বেড়ে গেল ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হেমরাজ মোদীর ওপর। ভদ্রলোক কোম্পানির বাঁকা স্রোত বাড়ি পর্যন্ত ঠেলে আনেননি। তা না হলে তাঁর একমাত্র মেয়ের মুখে রাজা মোদীর এ-রকম প্রশংসা শোনা যেত না।

ফিরতে সেদিনও রাত প্রায় সাড়ে সাতটা। অমিতা নিজের ঘরে বসে একটা বই পড়ছিল। মিলন ঢুকতে মুখ তুলে তাকাল। বাড়িতে যেমন গম্ভীর থাকে এখনো তেমনি। মিলন বলল, আছিস তাহলে—আজও দেরিই হয়ে গেল, তোকে পাব কি পাব না ভাবছিলাম।

—তোর আজও দেরি কেন?

—আর কেন—মিলন হাসছে, ছুটির পরেই আজও অফিসে এসে টেনে নিয়ে গেল।

অমিতা তেমনি গম্ভীর।—তোদের টানাটানিটা ভালই শুরু হয়েছে তাহলে, শেষ রক্ষা হবে তো?

মিলন হাসি মুখে ড্রেসিং টেবিলের সামনে থেকে কুশনটা অমিতার প্রায় হাঁটুর কাছে টেনে নিয়ে বসল। পাশের ছোট টেবিলে সিগারেটের প্যাকেট নেই দেখে একটু খুশি হল। অমিতার সিগারেট খাওয়াটা সত্যিই চক্ষুশূল। জবাব দিল, শেষ রক্ষা না হবার তো কারণ নেই, তবে আজ দুপুরের কথাবার্তা থেকে মনে হয় কাকু-কাকিমা না একটু ধাক্কা খায়।

অমিতার স্থির চাউনি একটু কঠিন হল এবার। কথা কটাও।—সেই ভয়ে মুষড়ে পড়েছিস?

—দূর! তোর এই মতিগতি কেন আজ শুনলাম সব—আমি কাকিমাকে যা বলার সাফসুফ বলে দিয়েছি—তোর ব্যাপারটার ফয়েসলা কাকু খুব ভাল করেনি তা-ও বলে দিয়েছি ..অবশ্য কাকুকেও খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না, বাবার মন তো...ছেলে ড্রিংক করে দেখা করতে এসেছে, নেভির চাকুরে বাপ জাহাজ-ডুবিতে মারা গেছে বলেছে...নিজের ওদিকে আকাশে ওড়ার চাকরি—ঘাবড়ে যেতেই পারে—

—বাবার হয়ে সাফাই গাইছিস কেন—কঠিন গলায় অমিতা বলল, অশান্তির ঝড়টা এ-সব জানার ঢের আগেই উঠেছিল। মা তোকে সালেশী করার জন্য বলেছেন?

মিলনের ওকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা, কাকিমা কিছুই বলেনি, কি হয়েছে না হয়েছে শুনে আমি যা বুঝেছি তাই বলেছি।...ভালো কথা, সেই ভদ্রলোক মানে সুদর্শন সিং এখন কোথায় রে?

—জানি না।

—তার মানে দিল্লিতে নেই?

হঠাৎ রাগে অমিতার মুখ বেশ লাল হয়ে উঠেছিল। একটু একটু করে আবার স্বাভাবিক অর্থাৎ আগের মতোই গম্ভীর হল। খানিক চুপ করে থেকে বলল, একটা মেয়ে তাকে বিয়ে করার জন্য ক্ষেপে উঠেছিল, সুদর্শন তাকে একটুও পছন্দ করত না, আড়ালে বলত হোর—বাবার সঙ্গে কথা-বার্তার দু'দিনের মধ্যে দেখা গেল দুজনেই নিপাত্তা। তিন মাস বাদে নিউগিনি থেকে ওদের বিয়ের কার্ড পেয়েছিলাম।...যাক, আমার কথা ছাড়, তোর ওই সুইটহার্টের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছিস কবে?

মিলনও সানন্দে প্রসঙ্গান্তরে চলে এলো, সে-তো তুই ঠিক করবি— যেদিন বলবি সেদিন—এলা আজও তোর কথা জিজ্ঞেস করছিল—আলাপ করার আগ্রহ তোর থেকে ওর বেশি।

একটু ভেবে অমিতা বলল, পরশু রোববারে হতে পারে...কিন্তু সন্ধ্যায় আমাকে ছেড়ে দিতে হবে, একবার ক্লাবে যেতে হবে।

মিলন উৎসুক।—ডেল্‌লি প্যারাডাইসে?

অমিতা মাথা নাড়ল। তাই।

মিলনের আগ্রহ বাড়ল।—আগের দিনও বলেছিস, মেম্বার নোস কিন্তু টানা-হেঁচড়ায় পড়ে যেতে হয়। ঠোঁটের ফাঁকে দুষ্টু হাসি।—রোববারে আবার কার টানা-হেঁচড়ায় পড়লি?

অমিতার দু'চোখ সোজা ওর চোখে আটকালো। তেমনি গম্ভীর। শুধু ঘন কালো চোখের তারায় কৌতুক চিকিয়ে উঠল একটু। গলার স্বরও লঘু একটু।—যদি বলি তোর বস্‌-এর?

ছোট-খাট একটা ধাক্কাই খেল মিলন। বস্‌ হোক আর যা-ই হোক, ওই একটা লোকের চরিত্র যা শুনেছে—অমিতার মতো মেয়ে তার সঙ্গে মিশবে ভাবতেও বিচ্ছিরি।

—ইয়ারকি কচ্ছিস?

—প্রায়-ইয়ারকি বলতে পারিস। পালা এখন, মা সেই থেকে দরজার কাছে ঘুরঘুর করছে।

পরের রবিবারেই এলা মোদীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ। অমিতার বিবেচনায় অত বড়লোকের একমাত্র মেয়ের উচ্ছল হাসি-খুশি হওয়াই স্বাভাবিক—কিন্তু সেই সঙ্গে বেশ সরলও। ছুটির দিনের বিকেলে মিলন কাকুর গাড়ি চেয়ে রেখেছিল। কি ভেবে ড্রাইভার সঙ্গে নেয়নি। নিজেই ড্রাইভার। বিলেত যাবার আগেই ড্রাইভিং-এ হাত রপ্ত ছিল। কাছের সুপার মার্কেটের এক জায়গা থেকে এলা মোদীকে তুলে নেবার কথা। সে অপেক্ষা করছিল।

পরিচয় হতেই এলা দারুণ খুশি। অমিতার দু'হাত ধরে বলেছে, তুমি এত সুন্দর সে-কথা তো মিলন বলেনি!

অমিতাও তার গাম্ভীর্যের খোলস থেকে বেরিয়ে এসেছে মিলন লক্ষ্য করল। এলার আপাদমস্তকে একবারে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মুখ টিপে হেসে ও জবাব দিল, তোমাকে দেখার পর আর বলে কি করে?

—তার মানে আমি তোমার থেকে সুন্দর!

মাথা কাত করে অমিতা তেমনি হেসে জবাব দিল, ঢের বেশি। তাছাড়া আমি কি তোমার মত কচিকাঁচা নাকি—আমি আর মিলন একেবারে সমান বয়সী, জানো তো?

মিলন চোখ পাকালো।—এই! তুই তিন মাসের ছোট।

এলা দুজনের বয়েসই নস্যাৎ করে দিতে চাইল। বলল, তা হলেও ও আবার একটা বয়স নাকি। হলেও তোমার বরং কংগ্র্যাচুলেশন প্রাপ্য। অমিতার একটা হাত তখনো ওর দু'হাতে ধরা।—লন্ডনে আর এখানেও ফিরে এসে তোমার সম্পর্কে মিলন এত গল্প করেছে যে একটু আগেও আমি বেশ শেকি ফিল করছিলাম—এখন দেখছি তুমি দারুণ মিষ্টি।

পল্‌কা গম্ভীর মুখে অমিতা বলল, একেবারে সাক্ষাৎ খুড়তুতো জ্যাঠতুতা ভাই-বোন না হলে তোমার শেকি ফিল করার কারণ ছিল...আমাদের মেলামেশা দেখে অনেকের চোখে কাঁটা ফুটত।

এলা মোদী হকচকিয়ে গেল একটু, তারপর কৌতুকটা মাথায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে-কি হাসি। পরে বলল, তুমি স্কুলে পড়াও অথচ এমন আমুদে মানুষ ভাবিনি। কি মনে পড়তে ভ্রূকুটি করে মিলনের দিকে ফিরল।—ইউ মিলন, তুমি যে বলেছিলে তোমার কাজিনের অনেক চেঞ্জ হয়েছে—আগের মতো অত হাসিখুশি নেই?

মিলন অপ্রস্তুত একটু। অমিতা তার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল।—এই ইডিয়েট, এর থেকে বেশি আর কি বলেছিস?

জবাবে মিলন ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছাড়ল। এলাকে বলল, আমি কেমন বড় ভাই দেখলে তো? তারপর অমিতার কথার জবাব দিল, তোর রাগ করার মতো আর বেশি কিছু বলিনি।

এই প্রশ্ন বা উত্তরের তাৎপর্য এলার বোঝার কথা নয়। সাদা অর্থ ধরে নিয়েই ও হাসতে লাগল।

বড় রেস্তোরাঁয় বসে বিকেলের জলযোগ সারা হল। মোটা বিলও জোর করে অমিতাই দিল। জোর করে বিলটা কেড়ে নিয়ে মিলনকে ধমকে নিরস্ত করল, এলার কাছে আজ আমার প্রেস্টিজটাই বড়—বাড়াবাড়ি করবি তো এক্ষুনি কেটে পড়ব।

এরপর গাড়িতে ঘণ্টাখানেকের ওপর তিনজনে দিল্লির নানান্ ফাঁকা রাস্তায় বেড়িয়েছে। গাড়ির পিছনে কেউ বসেনি, তিনজনেই সামনে। মিলনের পাশে এলা, এলার পাশে অমিতা। ওঠার সময় অমিতা পিছনের সীটে যেতে চেয়েছিল, এলা তাকে টেনে পাশে বসিয়েছে। ফলে ঘেঁষাঘেঁষি একটু হবেই। গাড়ি দশ গজ না এগোতে অমিতা এই প্রথম সাদা বাংলায় মিলনের উদ্দেশে একটু টিপ্পনী কেটেছে, দেখিস, ওটুকুতেই ঘেমে নেয়ে অ্যাকসিডেন্ট করে বসিস না!

এলা অ্যাকসিডেন্ট শব্দটা শুধু ধরতে পেরেছ। মিলনের মুখ দেখে মজার কিছু বলা হয়েছে ধরে নিয়ে তক্ষুনি প্রতিবাদ করেছে, কি বললে আমি বুঝতে পারলাম না!

অল্প অল্প হেসে মিলন বুঝিয়ে দিল কি বলল। এলা ছদ্ম কোপে অমিতার দিকে ফিরে চোখ পাকাল, তুমি তো ভারী দুষ্টু!

হালকা কথাবার্তার মধ্যে মিলন এলাকে জানান দিল, অমি বলেছে ও আমাদের পিছনে আছে।

এলা মোদীর বুকের তলায় রঙিন প্রজাপতি নেচে বেড়াচ্ছে। অমিতার দিকে ফিরে বলল, রিয়েলি?

অমিতা গম্ভীর একটু।—তোমরা কতটা সামনে এগোলে আমার পিছনে থাকাটা তার ওপর নির্ভর করছে।

এলা আরো স্পষ্ট করে বুঝতে চাইল।—তার মানে আমরা যতটা এগোব তুমি ততটা পিছনে থাকবে?

মেয়েটা যে সরল কোন ভুল নেই। মুচকি হেসে অমিতা বলল, ঠিক বুঝেছ।...তা আমার পিছনে থাকার দরকার হবে ভাবছ কেন?

—আমি ভাবছি কোথায়, মিলন তো বলল।

অমিতা হাসি চাপল।—মিলন বোকা আর ভীতু তাই বলেছে, তুমি কি বোকা বা ভীতু?

এলা মাথা ঝাঁকাল।—একদম না। তাছাড়া এর মধ্যে ভয়ের কি আছে যে ভীতু হব?

অমিতা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে সায় দিল, ঠিক, ভয়ের কিছু নেই।...তোমার বাবাকে বলেছ?

—তা অবশ্য বলিনি। এবারে জবাবটা এলা বুদ্ধিমতীর মতোই দিল। বলল, সবে তো মিলন এলো, যাক ক'টা দিন—নইলে সবাই ভাববে আমরা বিলেতেই প্যাক্ট করে রেখেছি।

অমিতার হাসি এবারে আরো তরল।—ভাবলেই বা! সে-টা তো মিথ্যে নয়—প্যাক্ট তো আর এ দু'দিনে হয়ে যায়নি!

এলাও হাসতে লাগল।—কিন্তু সব কথা কি সবাইকে আগেভাগে বুঝতে দেওয়া উচিত?

অমিতা হেসে ফেলল, এটা ঠিক বলেছ।

প্রায় পৌনে ছ'টা নাগাদ অমিতা হঠাৎই এক জায়গায় বলল, নামব, থামা।

মিলন নিজের অগোচরে ব্রেক কষল। সেই ক্লাব এখান থেকে মাইল তিনেক। বলল এখানে কেন, যেখানে যাবি পৌঁছে দিচ্ছি।

—না, এখানেই।

অমিতা নেমে এলার চুলগুলো নেড়ে দিল। তারপর দরজাটা ঠাস করে বন্ধ করে সোজা সামনে এগলো।

মিলন আবার গাড়ি ছোটালো। পাশে এলা অমিতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে। কিন্তু মিলন খুব কান দিচ্ছে না। যদিও বাড়িতে রাজা মোদীর প্রসঙ্গে ওই প্রসঙ্গটুকু ঠাট্টাই ভাবছে।...অমিতা বলেছিল, আজকের অ্যাপয়েন্টমেন্টটা তার বস-এর সঙ্গেও হতে পারে। কিন্তু ক্লাবে তার সঙ্গে পরিচয় যদি থেকেও থাকে, তাকে না চেনার মতো বোকা মেয়ে অমিতা নয়। আসলে ওই ক্লাবের সঙ্গে অমিতার যোগাযোগটাই মিলনের অস্বস্তির কারণ।

## চার

মিলন কাজের মানুষ। ওপরঅলার নেকনজর যতই থাক, কাজ আর দক্ষতার ওপরই ভবিষ্যৎ। এ-ব্যাপারে অন্তত কাকুর ওপর নির্ভর করতে চায় না। তাই কাজের চাপ অপছন্দ নয়। আর যত বড়ই হোক, এ-সব প্রাইভেট ফার্মে হাঁফ ফেলার সময় থাকে না এমন কাজের চাপ এসেও যায়।

মিলন মজুমদারের ওপর দিন তিনেকের মধ্যে যে কাজের চাপটা এসে গেল তার পিছনে রাজা মোদীর তাকে যাচাইয়ের লক্ষ্য কিছু ছিল কিনা বলা যায় না। একটা জায়েন্ট ফারনেসের মেশিন বসানোর কাজ চলছিল ফরিদাবাদে। দিল্লি থেকে কম করে ষাট সত্তর কিলোমিটার দূরে। রাজা মোজী ওকে একদিন সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে সব দেখালো শোনালো। আলোচনা করল। লোকটা এনজিনিয়ার নয় মিলন জানে, কিন্তু জটিল ব্যাপারেও তার সাধারণ জ্ঞান অর্থাৎ কমনসেন্স দেখে মিলন ভিতরে ভিতরে একটু অবাকই হয়েছিল। যাই হোক, বিলেতে এর থেকে বড় ফারনেসের কাজের অভিজ্ঞতা তার ছিল। সে-অভিজ্ঞতায় খাদ তো ছিলই না, বেশ সুনামও অর্জন করেছিল। তার সঙ্গে আলোচনা করে রাজা মোদীও অখুশি হয়নি এটুকু স্পষ্টই বোঝা গেছল। নইলে সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার ওপর চাপত না।

ফলে পনেরোটা দিন ব্যতিব্যস্ত থাকল মিলন। ভোরে কোম্পানির গাড়িতে চলে যায়। ফিরতে রাত্রি। ভাইপোকে এরই মধ্যে এত বড় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে কাকু খুব খুশি। কিন্তু তাতে বড় কর্তার মেয়ের রাগ। এক- একদিন রাতে এলা মোদীর টেলিফোন আসে। সে অনুযোগ করে। সেদিন বলল, রাজ ভাইয়াকে আমি আচ্ছা করে বকে দিয়েছি —তোমাকে এর মধ্যে এত খাটাবে কেন?

এদিক থেকে মিলন হেসে বলল, এটা খুব খারাপ কাজ করেছ। এ-রকম খাটুনিতে আমার নিজেরই লাভ—তা বকুনি খেয়ে তোমার রাজ ভাইয়া কি বলল?

—ওটা কম দুষ্টু নাকি! খুব ভালো মুখ করে দোষ স্বীকার করল। তারপর বলল কিনা, দেড় মাসের জন্য তোমাকে কানপুর পাঠাবার কথা ভাবছে—সেখানে মস্ত একটা বড় কাজ ধরা হয়েছে—আমিও বলেছি তোমাকে কোম্পানির কাজে রিজাইন করতে বলব।

এটা রাজের ঠাট্টাই মিলন বুঝেছে। কারণ এ নিয়ে তার সঙ্গে রাজের কোন কথাই হয়নি। তবু সায় দিয়ে গলায় একটু বিষণ্ণ ভাব এনে বলল, তোমাকে ঠিক বলেনি, কানপুরে দু' মাসের ওপর লেগে যাবে। ফরিদাবাদের কাজ শেষ হবার আগেই ঠেলে পাঠাবে বোধ হয়।

—তুমি সেখানে পড়ে থাকবে!

—তা কি করা যাবে. চাকরি করছি. থাকব না!

রেগে গিয়ে ওধার থেকে এলা বলে উঠল, তাহলে তোমাকে আমি ডিভোর্স করব। বলে ফেলে নিজেই হেসে সারা।

ফরিদাবাদের কাজ মিটে যেতে আবার একটু ঢিলে সময় এলো। রাজা মোদীর একটা গুণ লক্ষ্য করেছে মিলন। লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যাপার যেখানে সেখানেও আদৌ সীরিয়াস

মনে হয় না তাকে। সুপটু শিল্পী যেমন তুলির গোটাকতক হাল্কা আঁচড়ে একটা বড় জিনিস সামনে তুলে ধরতে পারে—রাজা মোদীর ফয়েসলার ব্যাপারও অনেকটা সেই রকম। এই গুণেই হাড়ভাঙা খাটুনির কাজও খুব একটা বোঝার মতো মনে হয় না কারো। রাজা মোদী হাসে, পিঠ চাপড়ায়, পরামর্শ চায়, চিন্তার ফাঁকে শিস দেয়, কারো কাজে ত্রুটি হলে কপট ঝাঁঝে হম্বিতম্বি করে যেটা সহজেই বোঝা যায়। এই করেই এক-গাদা ছোট বড় সুপটু টেকনিক্যাল স্টাফকে অনায়াসে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার ওপর অখুশি কেউ নয়।

এরই মধ্যে একটু আধটু তুলনামূলক সমালোচনাও কানে এসেছে মিলনের। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হেমরাজ মোদীর অনেক গুণ নাকি একমাত্র এই একজনই পেয়েছে। দুজনার বুদ্ধি বিবেচনা আর উদারতার দিক তো মেলেই। একেবারে বিপরীত কেবল বাইরের আচরণে। একজন ধীর গম্ভীর ব্যক্তিত্বের মানুষ। অন্যজন কেবল ফুর্তির রসদ খোঁজে। কিন্তু তাহলেও গোঁ চাপলে দুজনের তফাৎ খুব নেই—একেবারে শেষ দেখে ছাড়বে।

নিজের অফিস ঘরে বসে মিলন একটা ডিজাইন দেখছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে কাজে খুব মন ছিল না। সামনে চার্ট, কিন্তু চোখের সামনে এলার মুখ। একটু আগে ফোন এসেছিল, সন্ধ্যার শো-তে তার সিনেমা দেখার ইচ্ছে। মিলন জরুরী অজুহাত দেখিয়ে ইচ্ছেটা নাকচ করেছে। গত দু'রাত এলার সঙ্গে বাইরে ডিনার শেষে বাড়ি ফিরে কাকা কাকিমার মুখ বেজায় গম্ভীর দেখেছে। আজ সকালে বাজারে যাবার আগে কাকা জিগ্যেস করেছিল, আজও তোর বাইরে খাওয়া নাকি?

মিলন বিব্রত মুখে মাথা নেড়েছে। আজ রাতে বাড়িতেই খাবে।

দরজা ঠেলে সেখান থেকেই রাজা মোদী বলল, হ্যালো মিলন, বিজ্‌ই?

—খুব না...।

—দেন কাম অন, লেট্‌স হ্যাভ এ রাইড।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে রাজা মোদীর বিলিতি গাড়ি রিং রোড ছাড়িয়ে হরিয়ানার দিকে ছুটল। নিজেই ড্রাইভ করছে। খুব দূরের পাল্লা না হলে নিজেই চালায়। ফলে তার ড্রাইভার বসে ঝিমিয়ে মাইনে খায়। পাশে মিলন। হরিয়ানা ছোটার কারণ শুনল। সেখানকার কারখানার একজন অভিজ্ঞ আধবয়সী ফোরম্যানকে ম্যানেজার সাসপেন্ড করে তাকে ডিসমিস করার সুপারিশ করেছে। রাজা মোদীর বাবা কিশোরীলাল বরখাস্তের অর্ডার সই করে দিয়েছে। সেই ফোরম্যান কান্নাকাটি করে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে একটা চিঠি লিখেছে, রাতে তার বউয়ের খুব খারাপ অবস্থা খবর পেয়ে ছুটি না নিয়েই সে কানপুরে চলে গিয়েছিল। আসার পর বউকে নিয়ে ক'টা দিন যমে-মানুষে টানাটানি গেছে বলে তার মাথার ঠিক ছিল না...এই জন্যেই জানান্ না দিয়ে ন' দিন কামাই করে ফেলেছিল। বউ সেরে না উঠতেই সে চলে এসেছে—এসে দেখে তার চাকরি খতম। এখন সে বালবাচ্চা নিয়ে না খেয়ে মরবে।

প্রশংসার সুরে রাজা মোদী বলল, আমাদের আংকল দ্য গ্র্যান্ডের একটা গ্র্যান্ড সিক্সথ সেন্স আছে—ওই ফোরম্যানের চিঠিটা আমাকে দিয়ে বলল, লেখাপড়া না জানা একটা লোক কাজের গুণে অতটা উঠেছিল...দোষ যা করেছে চাকরি যাবারই কথা। তোর বাবা

ম্যানেজারের নোট অনুযায়ী তাকে বরখাস্ত করে অন্যায় কিছু করেনি,...তবু বিবেচনা করার কিছু আছে কিনা দেখ্।

ঈষৎ আগ্রহে মিলন জিজ্ঞাসা করল, দেখলে?

—দেখলাম বলেই তো যাচ্ছি, চলো না।

ফ্যাক্টরির আঙিনায় গাড়ি থেকে নামতেই কোথা থেকে চার-পাঁচটা লোক ছুটে এলো। সকলেরই চোখে মুখে কিছু নীরব মিনতি। তাদের মধ্যে মাঝবয়সী একজন দু'হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে। রাজা মোদীর মুখে রাজ্যের বিরক্তি।—কি চাই?

হাত জোড় করা লোকটার থেকেও বয়স্ক একজন বলল, আমি হেড ফোরম্যান সাহেব—ওই বীঠলের পুরো মাসের মাইনে কেটে নিয়েও ওকে দয়া করে চাকরিতে বহাল রাখুন—

—ননসেন্স। রাজা মোদী আরো বিরক্ত।—কার কি জন্যে চাকরি গেছে আমি খবর রাখি? সে-রকম দোষ না করলে কারো চাকরি যায়? কাজের সময় জটলা করছ—তোমাদেরও চাকরি খোয়াবার ইচ্ছে?

গটগট করে ভিতরে ঢুকে গেল। পিছনে মিলন। ওদিক থেকে ম্যানেজার ছুটে এসেছে।

রাজা মোদী আর মিলনকে ম্যানেজার নিজের ঘরে এনে বসালো। পনেরো মিনিটের মধ্যে ওপরওয়ালার ফয়েসলা শুনে ম্যানেজারের মুখ শুকনো। চেয়ারে বসেই রাজা মোদী বলল, মিস্টার শর্মা, কাল দুপুরে কানপুরে আমাদেব পি. আর. ও. ভাস্করণকে টেলেক্স করতে খবর নিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে সে ফিরে জানাল বীঠল সিং-এর স্ত্রী সত্যি মরতে বসেছিল—এখনো সে দাঁড়াতে পারে না পর্যন্ত—একজন পুরনো ফোরম্যানের ডিসমিসাল সাজেস্ট করার আগে ভাস্করণকে টেলেক্স করে তো তুমিই খবর নিতে পারতে?

ম্যানেজার শর্মা হকচকিয়ে গিয়ে জবাব দিল, ফ্যাক্টরীর ডিসিপ্লিন মেনটেইন করতে হলে...আই মিন ন'দিন খবর না দিয়ে কামাই করল...এটা গ্রোস ইনডিসিপ্লিনের মধ্যে পড়ে—

—আই নো। রাজা মোদী অসহিষ্ণু মুখে মাথা ঝাঁকালো।—স্ত্রীর ওই অবস্থায়ও লোকটার এত বুদ্ধি থাকলে ও ফোরম্যনের বদলে ম্যানেজার হত! ওই যেটা বলেছে সেটা অনায়াসে যাচাই করা যেত জেনেও তা করলে না কেন? জেনে একেবারে চাকরি না খেয়ে ওয়ার্নিং দিতে পারতে বা লাইট পানিশমেন্ট দিতে পারতে। নাও, ডু ওয়ান থিং। ওকে ডেকে জানাও কানপুরে টেলেক্স করে তুমি বউয়ের অসুখের খবরটা জেনে ওকে ক্ষমা করলে...কিন্তু নেক্সট টাইম এমন হলে আর ক্ষমা করার রাস্তা থাকবে না! তারপর ওর বউ ভাল করে সেরে না ওঠা পর্যন্ত পুরো মাইনেয় ওকে ছুটি দিয়ে দাও—হি অ্যান্ড দেন আদার ওয়ার্কারস্ উইল অ্যাডোর ইউ—গেট মি?

নিরুপায় ম্যানেজার শর্মা মাথা নেড়ে সায় দিল।

দিল্লির রাস্তায় আবার গাড়ি ছুটেছে। বিচারের এই প্রহসনটুকু মিলনের মনে লেগে আছে। আসার সময় রাজ তার আংকল দ্য গ্রান্ডের সিক্সথ সেন্স-এর তারিফ করছিল। কিন্তু মনে মনে মিলন এখন এই লোককে কম তারিফ করেছে না। কর্মীদের কাছে ম্যানেজারের মুখ ছোট না করেও কি অনায়াসে ব্যাপারটার ফয়েসলা করে এলো।

ফিরতি পথে লোকটাকে একটু বিমনা মনে হল মিলনের। চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছে। মাঝে মাঝে হালকা শিস দিচ্ছে, কখনো বা টুকটাক অবান্তর দুই একটা কথা বলছে। সামনের মোড় পড়তেই দেখা গেল অদূরে একটা বড় ট্রাক গল-গল করে কালো ধোঁয়া উগরে ছুটে চলেছে।

সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে রুমাল বার করে রাজা মোদী নাকে চাপা দিয়ে রাগত গলায় বলে উঠল, এ-সব গাড়ি আইন করে বাতিল করা উচিত!

বলতে বলতে এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে দেড়া বেগে ট্রাকটার পাশ কাটিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেল। তারপর বলল, আমি কোন ধোঁয়া সহ্য করতে পারি না—সিগারেটের ধোঁয়াও না—ডু ইউ স্মোক?

মিলন মাথা নাড়ল।—না।

—গুড। ড্রিংক করো নিশ্চয়?

মিলন আবার মাথা নাড়ল। তা-ও করে না।

—এটা অবশ্য ভাল কর না। মুখখানা হঠাৎ হাসি হাসি, স্পষ্ট মন্তব্য। একটু চুপ করে থেকে ওর দিকে সামান্য ঘাড় ফেরাল।—হাউ ওয়েল ডু ইউ নো ইওর কাজিন অমিতা মজুমদার?

ভিতরে ভিতরে মিলন বড় রকমের একটা নাড়াচাড়া খেল। শোনামাত্র একই সঙ্গে গোটাকতক অনুভূতির বিদ্যুৎতরঙ্গ মাথায় ধাক্কা দিল।...এই প্রসঙ্গ তোলার জন্যেই তাকে সঙ্গে আনা হয়েছে...লোকটা কোন রকম ধোঁয়া পছন্দ করে না, সিগারেটেরও না...এদিকে ক'দিন হল অমিতার সিগারেট খাওয়া চোখে পড়েনি। মিলনের সহজ হবার চেষ্টা। জবাব দিল, আমরা এক বয়সী, ছেলেবেলা থেকে এখানে আছি, একসঙ্গে বড় হয়েছি, খেলাধূলা করেছি, পড়াশুনা করেছি...খুব ভালই জানি তাকে।

—বরাবর সে এই রকমই ছিল?

মিলনের দাবড়ানি দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল, তার অত খোঁজে তোমার দরকার কি? সেটা সম্ভব নয়। জবাব দিল, তিন বছর বাদে বাইরে থেকে ফিরে ওকে বেশ গম্ভীর দেখছি আর আগের থেকে কিছুটা বদলেওছে...তোমার সঙ্গে ওর আলাপ পরিচয় আছে নাকি?

—আলাপ পরিচয় আছে কি নেই অমিতা সেটা এর মধ্যে তোমাকে কোন দিন কিছু বলেনি?

মিলন নিরীহ মুখে মাথা নাড়ল। বলেনি।

ক্ষুব্ধ একটু।—নট্ ইভন্ মেনশানড় মি?

পলকে ভেবে নিয়ে মিলন সত্যি কথাই বলল, সেই গোড়ার দিনে শুধু জিগ্যেস করেছিল আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট তোমার আন্ডারে কিনা।

এটুকুতেই চোখে মুখে রং ধরল যেন। স্টিয়ারিং থেকে ঘাড় ফিরিয়ে জিগ্যেস করল —তুমি বললে হ্যাঁ?

—না তো কি বলব?

চোখে মুখে ছেলেমানুষি আগ্রহ।—তারপর?

—তারপর আর কি? এ প্রসঙ্গে মিলন স্বস্তি বোধ করছে না একটুও।

ফাঁকা রাস্তায় গাড়ির স্পীড চড়ছে। কিন্তু রাজা মোদীর সেদিকে খুব একটা লক্ষ্য নেই। একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, এলা সেদিন তোমার কাজিনের দারুণ প্রশংসা করছিল, কবে নাকি বিকেলে তোমরা একসঙ্গে রেস্তোরাঁয় খেয়েছিলে আর বেড়িয়েছিলে...এলা যা বলছিল আমার বিশ্বাসই হচ্ছিল না, তোমার ওই কাজিনকে আমি কমই হাসতে দেখেছি, কথা বলতেও—কিন্তু এলা বলল, তোমার কাজিনের মত অত ব্রাইট আর অমন আমুদে মেয়ে নাকি ও কম দেখেছে—ওয়জ সী রিয়েলি ইন এ নাইস জলি মুড?

তার কথায় সায় দিয়ে মিলন আরো একটু বলার লোভ সামলাতে পারল না। —আগে তো বরাবর ও ওই রকমই ছিল।

—স্ট্রেঞ্জ! হোয়াই সী ইজ ডিফারেন্ট নাও?

মিলন অম্লানবদনে মিথ্যে কথা বলল, তা তো জানি না।

আবার বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে রাজা মোদী হঠাৎ হাসল একটু। মন্তব্য করল, তুমি একটা হিপক্রিট।

—আমি! কেন!

রাজা মোদী তড়বড় করে জবাব দিল, কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ আমি তোমার কাজিন সম্পর্কে এত কথা বললাম, এত ইনকুইজিটিভ হয়ে উঠলাম—তোমার অবাক হবার কথা—ফিরে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করার কথা—বাট ইউ আর জাস্ট ইনডিফারেন্ট। হোয়াট ডাজ দ্যাট মীন?

লোকটা যে তুখোড় চালাক অস্বীকার করার জো নেই। জবাবের অপেক্ষায় এক-একবার ঘুরে তাকাচ্ছে। দ্বিধান্বিত সুরে মিলন বলল, কাকা আমাকে নিজের ছেলের মত ভালবাসে...তার মেয়ে...তাই ওর সম্পর্কে তোমার আগ্রহ দেখে হঠাৎ একটু অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেছি...।

ভুরু কুঁচকে আর একবার ওর দিকে ফিরে তাকাল। তারপর সামনে চোখ।—তার মানে এ আলোচনা তোমার পছন্দ নয়?

সরাসরি প্রশ্নটা করতে মিলনের সুবিধেই হল। হেসে উঠে জবাব দিল, তুমি বস, মুখের ওপর এ-রকম কথা বলি কি করে?

এবারে সে হাসিমুখেই ফিরে তাকাল। মুখে কপট কোপ। ঠোঁটে হাসি—বলতে খুব বাকি রাখলে...বাট আর ইউ ভেরি কনজারভেটিভ? তাহলে এলার দিকে ভিড়লে কি করে?

মিলন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, আমি না...কাকা কনজারভেটিভ। জানান দেবার এ সুযোগও মিলন ছাড়ল না।

ভ্রূক্ষেপও করল না। বলে উঠল, হি ইজ অ্যান ওলড ম্যান—বাট অমিতা ইজ নেভার কনজারভেটিভ—ইজ সী?

নিরুপায় মিলনকে সায় দিতে হল।—বোধ হয় না...

এর পরেই লোকটা একেবারে চুপ মেরে গেল। বেশ কিছুক্ষণ বাদে গাড়ি আবার রিং রোডে পড়তে প্রায় সমঝে দেবার সুরে রাজা মোদী বলল, লিসন মিলন, আমাদের যে আলোচনা হল তোমার কাজিনকে তার একটা কথাও বলবে না—ক্যান ইউ অ্যাসিওর মি?

কথাগুলো অনুরোধের মতো নয়, বরং ওপরওয়ালার হুকুমের মতো। মিলনের ভালো লাগল না। জবাব দিল, ঠিক আছে।

কিন্তু অমিতাকে সত্যি কিছু বলবে না তখনকার মত ভাবেনি। পরে বলাই ঠিক করল। কিছু বললে অমির মুখ থেকেই সেটা জেনে ফেলবে কিনা কে জানে। তখন লোকটা ওকে কথা খেলাপের মানুষ ভাববে।

রাতে খাবার টেবিলে বসে মিলন হরিয়ানা ফ্যাক্টরির ফোরম্যানকে বরখাস্ত করা আর ফিরে তাকে বহাল করার ব্যাপারটা সবিস্তারে বলল। কাকু সাগ্রহে শুনল। গল্প শোনার থেকে কে কি খাচ্ছে না খাচ্ছে কাকিমার সেদিকে চোখ বেশি। অমিতা নির্লিপ্ত। কোন দিকে তাকাচ্ছে না, শুনেও শুনছে না। খাবারের ডিশের প্রতি ওর এই নিবিষ্টতা মিলন স্বাভাবিক ভাবছে না।

অনুপম মজুমদার হৃষ্ট মন্তব্য করলেন, হেমরাজ মোদীর কেমন চোখ আর বিবেচনা বোঝ একবার—যত দেখবি ততো অবাক হবি।

সেটা মেনে নিলেও প্রশংসা রাজা মোদীরও কম প্রাপ্য নয় মিলনের মতে। বলল, কিন্তু রাজ-এর সাদা-সাপটা বিচারখানা কম নাকি। টেলেক্স করে কেমন বুদ্ধিমানের মত আসল ব্যাপারখানা জেনে নিয়ে ফয়েসলা করে দিয়ে এলো। মান বাঁচলেও ম্যানেজারের মুখ চুন।

কিন্তু এ-কথার পরেও কাকু ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের গুণই বড় করে দেখল। বলল, এই সব শিক্ষাই হেমরাজের, বুঝলি? জ্যাঠা কম ভালোবাসে নাকি ওকে—ছেলেবেলায় তো জ্যাঠার কাছেই থাকত—এখন বড় হয়ে লায়েক হয়ে উঠেছে, আর ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে পাঁচজনে আরো লায়েক করে তুলছে।

আড়চোখে মিলন অমিতাকে দেখে নিল। মুখভাবে কোনরকম প্রতিক্রিয়া নেই, কিন্তু তার ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত দু'চোখ এবারে বাবার মুখের ওপর। ইচ্ছা করেই মিলন পরের কথায় একটু দ্বিধাভাব টেনে আনল। বলল, কিন্তু কাকু, এ ক'দিন তাকে কাছ থেকে দেখে মনে হয় না রাজা মোদী কারো কথায় চলার বা ফুলে ফেঁপে ওঠার লোক।

অনুপম মজুমদার তবু অতটা নিঃসংশয় নন। ক্ষুদ্র মন্তব্য করলেন, না হলেই ভাল।

অমিতার চাউনি এবারে বাবার মুখ থেকে মিলনের মুখ হয়ে নিজের খাবার ডিশে নেমে এলো।

## পাঁচ

সন্ধ্যার গাড়িতে বড়দি প্রমিতা আসছে গাজিয়াবাদ থেকে মিলন জানতই না। এই দিন বিকেলে কাকুর গাড়িতে বাড়ি ফিরছিল। কাকু তখনো কিছু বলেনি। বাড়িতে পা দিয়ে আরো গম্ভীর। অমিতা তখনো স্কুল থেকে ফেরেনি। তার মানেই স্কুল থেকে ক্লাবে বা অন্য কোথাও চলে গেছে। অর্থাৎ ধরেই নেওয়া যেতে পারে তার ফিরতে রাত আটটা ন'টা। কাকুর নির্বাক ক্ষোভ এই জন্যে যে অমিতা ফোনেও একটা খবর দেওয়া দরকার মনে করে না।

সকালে চা খেতে খেতে কাকুর কথা শুনে মিলন মুখ তুলল। কাকিমাকে বলছে,

শরীরটা খুব ভালো লাগছে না, প্রেসার চড়ল কিনা বুঝছি না, গাড়ি নিয়ে তুমিই স্টেশনে চলে যাও—কেউ না গেলে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে মিতার একলা অসুবিধে হবে—

কাকিমা সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে ফিরে বলল, নিজেরই যখন মনে হচ্ছে প্রেসার নিশ্চয় বেশিই বেড়েছে—ফোনে ডাক্তারকে একটা খবর দিই না, দেখে যাক—

এটুকুতেই কাকুর মুখ এমন অপ্রসন্ন কেন মিলনের বোধগম্য হল না। বিরস সুরে কাকু জবাব দিল, এই জন্যেই তো কিছু বলতে চাই না, কথায় কথায় ডাক্তার ডাকো —যা বললাম কানে গেল?

কানে সকলেরই গেছে। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে মিতা আসছে অর্থাৎ বড়দি প্রমিতা আসছে। কিন্তু এ-কথাটা বাড়ির কেউ মিলনকে বলল না সেটাই তার কাছে একটু বিস্ময়ের ব্যাপার। তার ওপর আগের দিন হলে কাকু বা কাকিমা সোজা তাকেই বলত গাড়ি নিয়ে স্টেশনে যা, বড়দিকে নিয়ে আয়। কিন্তু তার বদলে কাকু কিনা কাকিমাকে স্টেশনে যেতে বলল। মিলন ভাবল, তার আচরণে এমন কিছু কি প্রকাশ পেয়েছে যার দরুণ কাকা কাকিমা ভাবছে সেই আগের দিন আর নেই?

গম্ভীর একটু। কাকুকে ছেড়ে কাকিমার দিকে চোখ তুলে মিলন জিগ্যেস করল, আজ বড়দি আসছে?

মিনতি চুপচাপ মাথা নাড়লেন একটু।

—তা আমি থাকতে সে-জন্য তোমাকে স্টেশনে যেতে হবে কেন? আমি বাচ্চা-কাচ্চা সামলে বড়দিকে ঠিকমতো নিয়ে আসত পারব না?

এটুকুতেই কাকুর গম্ভীর মুখে বিড়ম্বনার আঁচড় পড়ল। জবাবও সামান্য দ্বিধাগ্রস্ত। —তুই ফ্রি আছিস কি না ভেবে তোর কাকিমাকে বলছিলাম। স্ত্রীর দিকে ফিরলেন, মিতা আসছে ওকে বলোই নি?

দোষটা নিজের কাঁধে নিতে রাজি নন মিনতি। জবাব দিলেন, ও তো সেই সকালে চান সেরে বেরিয়ে এই ফিরল—মিতার ফোন তো তার পরে এলো, ওকে পেলাম কোথায় যে বলব!

আগের দিন হলে মিলন হেসেই ফোঁস করে উঠে বলতে পারতো, আমার অফিসের ফোন নম্বর তোমার জানা নেই—নাকি কাকুর সঙ্গে অফিসে আমার দেখাই হয়নি? কিন্তু বলা গেল না। তাকে নিয়ে কাকু আর কাকিমার কিছুটা অস্বস্তির কারণ ঘটতেই পারে। এলার প্রায়-অবুঝ দাপটের ডাকে সাড়া দিতেই হয়। এক অফিসের সময়টুকু বাদ দিলে সকাল আর বিকেলের বেশির ভাগ সময় এলার সঙ্গেই কাটছে। গত সাত দিনের মধ্যে বাড়িতে কাকু কাকিমার সঙ্গে দু'বেলা খাওয়া একদিনও হয়নি। আর গেল রবিবারে সকাল থেকে রাত প্রায় দশটা পর্যন্ত বাইরেই কেটেছে। শুধু এলার অবুঝপনাই নয়, নিজেরও যে দুর্বলতা আছে সেটা অস্বীকার করবে কি করে? এই অনিয়মের দরুন একমাত্র চাপা পরিতুষ্ট মুখ দেখে অমিতার। প্রেমের এই প্রায়-অপরিহার্য অধ্যায়ের সমজদার যেন শুধু সে-ই। গেল রোববার সকালে বেরিয়ে রাত দশটায় ফিরে পা-টিপে অমিতার ঘরে ঢুকেছিল। দরজা খোলা, ঘরে আলো জ্বলছিল। ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে একটা ইংরেজি উপন্যাস পড়ছিল। সামনের ছোট টেবিলে সিগারেট বা দেশলাই ছিল না। ওর সিগারেট খাওয়াটা ইদানীং দেখছে না।

অমিতা মুখের কাছ থেকে বই সরাতে কিছুটা কৈফিয়তের সুরে মিলন বলেছিল, বিচ্ছিরি দেরি হয়ে গেল...

—দেরিটা বিচ্ছিরি মানে...কাণ্ডমাণ্ড কিছু করে এলি নাকি?

—দেব এক থাপ্পড়...কাকু কাকিমা কিছু বলেনি তো?

অপলক চোখে ওর মুখটা আটকে নিয়ে অমিতা চাপা ঝাঁজে বলে উঠেছিল, ইডিয়েট না হলে তোর মতো কাপুরুষের সঙ্গে কোনো মেয়ে প্রেম করে কি করে বুঝি না, এবার থেকে কাকু কাকিমার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে দেরি করিস—

অমিতার এই ঝাঁঝালো মেজাজ অস্বাভাবিক কিছু না। হেমরাজ মোদীর মেয়েকে নিয়ে মিলন এর থেকে ঢের বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠলে অমিতা আরো ঢের বেশি খুশি হত। কিন্তু মিলন তা বলে কাকা কাকিমার কথা একেবারে না ভেবে পারে না। তাই আজ কাকিমার তেরছা কথা শুনে মিলন আর তাকে না ঘাঁটানোই নিরাপদ ভাবল। কাকুর দিকে ফিরে জিগ্যেস করল, বড়দির ট্রেন কটায়।

—সাতটায় রিচ করার কথা।

—ঠিক আছে, কাকিমাকে যেতে হবে না, আমি যাব'খন।

সময় মতোই স্টেশনে পৌঁছেছে। কিন্তু হাতে একটু বেশি সময় নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। কনট প্লেসের সুপার মার্কেটের সামনে এলা মোদীর অপেক্ষা করার কথা। দূর থেকে তার লাল গাড়ি চোখে পড়েছে।

মিলনকে কেন স্টেশনে যেতে হচ্ছে শুনে এলার কৌতূহল।—বড়দি মানে মজুমদার বাবুর বড় মেয়ে—অমিতার বড় বোন?

মিলন মাথা নেড়ে সায় দিয়েছে।

—সে কি বুড়োমানুষ নাকি, গাজিয়াবাদ তো দিল্লির নাকের ডগায়, তোমাকে যেতে হবে, একা রাম সিং গাড়ি নিয়ে গেলে হবে না?

—না, বাচ্চাকাচ্চা আছে, অসুবিধে হবে।

—ড্রাইভারকে তাহলে স্টেশনে যেতে বলে তুমি আমার গাড়িতে চলে এসো—দুজনেই স্টেশনে যাই, তোমার বড়দির কাছে বেশ একটা সারপ্রাইজ হবে।

মিলন ব্যতিব্যস্ত।—না না না, বড়দি আবার কাকা-কাকিমার মতোই কনজারভেটিভ —অমিতার মতো নয়—

এলার চোখে মুখে দুষ্টুমি।—হলেই বা, তুমি কি আমাকে লুকিয়ে বিয়ে করবে নাকি, তারা টের পাবে না? আমি যাবই—

আসেনি অবশ্য।

লোকাল ট্রেন কিছুটা এগিয়ে গিয়ে থামার আগেই মিলন একটা ফার্স্ট ক্লাসের দরজার কাছে বড়দি প্রমিতাকে দেখেছে। মিলন দ্রুত এগিয়ে গেল। ওকে দেখে বড়দি খুশি, বলল, আমি ঠিক ভেরেছিলাম তুই আসবি।

তার বড় মেয়ে বুলা নিজেই নামল। দ্বিতীয় মেয়ে ইলাকে মিলন নামিয়ে তার পাশে দাঁড় করিয়ে দিল। শেষে আড়াই বছরের ছেলেটাকে। তারপর গম্ভীর মুখে জিগ্যেস করল, আর আছে না এই তিন নম্বরেই শেষ?

বিলেত যাবার আগে মিলন মেয়ে দুটোকে দেখে গেছল। অবশ্য এখন অনেক

বড়সড় হয়েছে। ছেলেটাকে এই প্রথম দেখল। আর বড়দিকেও দেখতে বেশ মোটাসোটা গিন্নিবান্নি গোছের লাগছে। মিলনের কথায় হেসে ফেলে প্রমিতা বলল, চাঁটি খাবি একটা —সুটকেস দুটো কুলিকে নামাতে বল—

ছেলেটা মিলনের কোলে। দুই মেয়ের হাত ধরে প্রমিতা প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে মিলনের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে খুশিমুখে মন্তব্য করল, বিলেত থেকে চেহারাখানাকে আরো বেশ খোলতাই করে এনেছিস যে রে!

ফোঁস করে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে মিলন জবাব দিল, আর বোলো না, এই জন্যেই তো ওখানকার মেয়েগুলোর তাড়া খেয়ে চটপট পালিয়ে আসতে হল!

বড় মেয়ের দিকে একবার তাকিয়ে প্রমিতা কপট শাসন করল, এই—!

বুলা মামার দিকেই চেয়ে ছিল। বছর দশেক হবে ওর বয়েস।

ও আগেভাগে গিয়ে সামনে রাম সিং-এর পাশে বসল। পিছনে দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে বড়দি আর মিলন।

গাড়ি বড় রাস্তায় এসে পড়ার পরে বড়দির বিলেতের সমাচার শোনা বা মিলনের চাকরি সম্পর্কে কিছু আগ্রহ দেখা গেল না। উৎসুক মুখে ওর দিকে ফিরে জিগ্যেস করল, নমি আর শমি, এসে গেছে?

মিলন অবাক একটু।—না তো...তাদের আসার কথা নাকি?

প্রমিতা যেন আরো অবাক।—ওরা রওনা হচ্ছে চিঠি পেয়েই তো আমি সাত তাড়াতাড়ি চলে এলাম—বাবা-মাকেও নিশ্চয় লিখেছে, তুই থাকিস কোথায় যে খবরই রাখিস না!

মেজদি আর ছোড়দি আসছে শুনে মিলনের খুশি হবার কথা। সক্কলে একসঙ্গে হলে বাড়িতে আগে আনন্দের হাট বসত। এখনো অখুশি নয়। কিন্তু অবাক লাগছে এই কারণে যে তাদের আসার কথাও কাকা-কাকিমা ওকে কিছুই বলেনি। বড়দি যে আসছে তা-ও দু'ঘণ্টা আগে পর্যন্ত জানত না। সরগরম বাড়িতে অতীতের আনন্দস্মৃতি মিলনের একটা বড় পুঁজি। হঠাৎ মনে হল কোথায় যেন তাতে টান ধরেছে।...সে-কি শুধু অমিতার কারণে? নাকি ওর সঙ্গে এলার নিবিড় সম্পর্কটাও একটা কারণ? অবশ্য তার ধারণা, সম্পর্কটা কত নিবিড় কাকা-কাকিমা এখনো ভালো করে জানে না। কিন্তু কিছু আঁচ তো এতদিনে পেয়েইছে।

সোৎসাহে প্রমিতা আবার জানান দিল, নমি-শমির সঙ্গে তো এবারে কুশলও আসছে—

মিলনের হঠাৎ স্মরণে এলো না বড়দি আর কার আসার কথা বলছে। জিগ্যেস করল, কুশল কে?

—বাঃ ভুলে গেলি! প্রশ্নটা বড়দির যেন প্রত্যাশিত নয় খুব।—আমার দেওর, তোর জামাইবাবুর খুড়তুতো ভাই—আমার বিয়ের পরে একবার আমার সঙ্গে এসে ক'দিন থেকে গেছল না? সুনীল আর প্রশান্ত আসতে পারছে না বলে নমি-শমি ওকেই ধরে নিয়ে আসছে—এ তো আর গাজিয়াবাদ থেকে দিল্লি নয় যে যে-যার বাচ্চা নিয়ে একলা রওনা হয়ে পড়বে।

মিলন হঠাৎ নামটা শুনে ধরতে পারেনি, নইলে তার স্মৃতি-শক্তি কম কিছু নয়।

এবারে চেহারাসুদ্ধ মনে পড়ছে। কুশল বোস, বড়দির বিয়ের কিছুদিনের মধ্যে দিল্লি এসেছিল। এ-বাড়িতেই ছিল। বড়দির বয়সীই হবে। চারটারড অ্যাকাউনটেন্সি পড়ত। মিলন আর অমিতা সবে তখন স্কুলের গণ্ডি ছাড়িয়েছে। মেজদি নমিতা আর ছোড়দি শমিতা কলেজে পড়ছে। মিলন শুনেছিল, কুশল কোনো মস্ত বড়লোকের ছেলে, তার বাবা অর্থাৎ বড়দির খুড়শ্বশুর কলকাতার নাম-করা অ্যাটর্নীর ছেলে। অত বড় লোকের ছেলে হলেও কুশলদাকে মিলনের বেশ সাদামাটা মানুষ মনে হত, তার চালচলনে এতটুকু দেমাক দেখেনি। মিলনের সঙ্গে এক ঘরে থাকত, বয়সে মিলন পাঁচ ছ' বছরের ছোট হলেও তার সঙ্গে খুব খাতির হয়ে গেছল। মিলনই তার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দিল্লির দর্শনীয় যা কিছু সব দেখিয়েছে।

...সেই সময় কেন যেন মিলনের মনে হত, অদূর ভবিষ্যতে ওই কুশল বোসের সঙ্গে সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠতর হতে পারে। তখনকার মনের এই চিন্তাটা ছোড়দি শমিতাকে ঘিরে। কারণ মেজদি নমিতার সঙ্গে বয়েসের ফারাক বড় জোর বছর দেড়-দুই। অতএব তার বিবেচনায় ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটা ছোড়দি শমিতার সঙ্গেই ঘটা সম্ভব। আরো মনে হত, তখন অমিতার প্রায় বেপরোয়া ইয়ারকি ফাজলামো দেখে। সে-ও তখন মিলনের সঙ্গেই স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়ে বসে আছে। কুশল বোসকে দিল্লি দেখানোর পর্বে বেশির ভাগ সময়ে অমিতাও মিলনের সঙ্গে থাকত। কিন্তু ওকে সঙ্গে আসতে বললে ও কুশলদার সামনেই মুখঝামটা দিয়ে বলত, ছোড়দির কলেজ কামাই হলে কি এমন হবে—ছোড়দিকে সঙ্গে নিয়ে যা।

...কুশলদা একটু চা-রসিক ছিল। সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে কম করে দশ বারো বার চা খেত। অমিতা এক-আধ ঘণ্টা পরে পরে জিগ্যেস করত, কি, চা চাই নাকি?

কুশলদা মাথা নেড়ে সায় দিলে ও তখনি সকলকে ছেড়ে ছোড়দির উদ্দেশে হাঁক পাড়ত।—ছোড়দি! কুশলদার চা চাই—চট করে নিয়ে আয়!

মিলন তখন ভদ্রলোকের বিব্রত মুখ দেখত। আর ছোট বোনের ফাজলামো বোঝার পর ছোড়দি তাকে তেড়ে মারতে আসত। কয়েকদিন যেতে কুশলদাও সেয়ানা হয়ে উঠেছিল। অমিতা চায়ের কথা জিগ্যেস করলে জবাব দিত, তুমি নিজে হাতে করে দিলে —চাই।

মুখ মচকে অমিতা বলত, আমার হাতের চা কি সে-রকম স্বাদের হবে!

...সকলে মিলে এক ছুটির দিনে লাল কেল্লায় যাওয়া হয়েছিল। সকলে বলতে চার বোন মিলন আর কুশলদা। অমিতা সেদিন এমন কাণ্ড করেছিল যে বড়দিসুদ্ধু ওকে আড়ালে ডেকে ধমকেছে। আর ছোড়দি তো রেগে আগুন।...প্রথমে তো কে কোথায় বসবে তাই নিয়ে অমিতার মজার বিতণ্ডা। ড্রাইভার নিয়ে সাতজন। তাই অ্যামবাসাডার হলেও ঠাসাঠাসি হবেই। গাড়িটা যেন অমিতার আর সকলকে বসানোর দায়িত্বও তার। পিছনের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে প্রথমে বড়দিকে হুকুম করল, আগে তুই ওঠ্—বিয়ে হতে না হতে মুটোচ্ছিস, গুটিসুটি হয়ে বোস। বড়দি উঠতে হুকুম করল, মেজদি ওঠ্—। মেজদি ওঠার পর বলল, এবার ছোড়দি। এ পর্যন্ত সকলেই ভেবেছে সবশেষে জানালার পাশে অমিতা নিজে বসতে চায়। কিন্তু ছোড়দি ওঠার পর কুশলদার দিকে ফিরল, আর দাঁড়িয়ে কেন মশাই, উঠে পড়ুন—

কুশলদা একটু স্বল্পভাষী। তা বলে বোকা বা লাজুক মোটেই নয়। গম্ভীর মুখে অমিতার হাত ধরল, তারপর মিলনকে বলল, তুমি পিছনে উঠে পড়ো। অমিতাকে টেনে নিয়ে নিজে আগে ড্রাইভারের পাশে বসল, পাশে ওকে বসালো। বলল, আমি অতিথি মানুষ, বসাটা আমার ইচ্ছেমতো হবে।

...সকলেই হেসে উঠেছিল। কিন্তু ড্রাইভার রাম সিং-এরও হাসি-হাসি মুখ দেখে থেমেও যেতে হল।

...পরের রগড়খানা লালকেল্লায় ছুটির দিনের ভিড়ের সুযোগে। শীতের মৌসুমে লালকেল্লার দোকান-পাট জমজমাট। এক ফাঁকে অমিতা শুধু মিলনের কাছেই মতলবটা ফাঁস করেছিল। সেই ভিড়ের মধ্যে দোকানের জিনিস দেখার অজুহাতে এক সময় দেখা গেল মিলনের পাশে শুধু বড়দি আর অমিতার পাশে মেজদি। ভিড়ের চাপে চাপে ছোড়দি আর কুশলদা কেবল নিপাত্তা। লালকেল্লায় ঢোকার পর প্রায় আধঘণ্টা বাদে অমিতাই যেন এক জয়গায় ওই দুজনকে আবিষ্কার করল। সঙ্গে সঙ্গে ওর ঝাঁঝালো ধমক, আপনার মতলবখানা কি মশাই, ফাঁক বুঝে ছোড়দিকে নিয়ে দিব্বি হারিয়ে গেলেন?

ব্যাপার বুঝে ছোড়দি তো ওকে এই মারে আর সেই মারে।

মিলনের মনে আছে যে কটা দিন ভদ্রলোক ছিল ভারী আনন্দের মধ্যেই দিনগুলো কেটেছিল। আর সে-জন্য অমির ক্রেডিটই সব থেকে বেশি।

মেজদি নমিতার বিয়ের ছ'মাসের মধ্যে কাকু ছোড়দির বিয়ের খোঁজখবর শুরু করে দিয়েছিল। আর বড়দি তখন এই কুশল বোসকে একটু বাজিয়ে দেখতে ছাড়েনি। কুশলদা ততদিনে চারটারড অ্যাকাউনটেন্ট হয়ে বাপের অ্যাটর্নি অফিসেই নিজস্ব অডিট ফার্ম খুলে বসেছে। কিন্তু বিয়ের প্রস্তাবে কান পাতেনি। বড়দি সখেদে কাকিমাকে লিখেছিল, আশা করেছিলাম রাজি হবে, কিন্তু দেখা গেল এখন তার বিয়ে করার আদৌ ইচ্ছে নেই। কিন্তু পরে মিলনের সঙ্গে দেখা হতে বড়দি চুপিচুপি বলেছিল, মনে হয় ওর অমিকেই বেশি পছন্দ, বিয়ের কথা তুলতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে নাকি অমির কথাই জিগ্যেস করেছিল, স্কুল ফাইন্যাল কেমন পাশ করল, কোথায় কোন ইয়ারে পড়ছে ইত্যাদি। বড়দি মিলনকে সাবধানও করে দিয়েছিল, অমিকে ঠাট্টার ছলেও কিছু বলবি না, আমি তলায় তলায় লেগে থাকব—দেখা যাক।

এতদিনে মেজদি আর ছোড়দির বাহন হয়ে সেই কুশল বোস আবার আসছে। আর তার অডিট ফার্ম জাঁকিয়ে ওঠা সত্ত্বেও দিল্লির হোটেলে না থেকে কাকুর বাড়িতেই থাকছে। মিলনের তক্ষুনি মনে হল ভদ্রলোকের এবারের আসাটা তাৎপর্যশূন্য নয়। গলা খাটো করে জিগ্যেস করল, কুশলদা তাহলে আজও বিয়ে করেনি?

হাসি চেপে বড়দি তার দিকে ফিরল।—এত দিন বিলেতে থেকেও তুই একটা হাঁদা হয়ে ফিরেছিস নাকি?

এটুকুতেই বড়দির উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু আনন্দের বদলে মিলনের ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি।...অমিতার বর্তমানের মেজাজ আর তার চালচলন বড়দি মেজদি বা ছোড়দি কি জানে না? জানলে এতটা সাহস তারা করছে কি করে? মাঝখান থেকে অতিথি ভদ্রলোক না অপদস্থ হয়।

একটু বাদে বড়দির কথা-বার্তা থেকে বোঝা গেল অমির মেজাজের খবর তারা ভালোই রাখে। জিগ্যেস করল, বিলেত থেকে ফিরে অমিকে কেমন দেখছিস?

মিলন এক কথায় জবাব দিল, ভয়াবহ।

সঙ্গে সঙ্গে বড়দির মুখ শুকনো। নিচু গলায় বলল, তুই আসার পরেও বদলায়নি? একটুও হাসিখুশি দেখছিস না?

মিলন যা দেখছে সেটা দু'চার কথায় বড়দিকে বোঝানো মুশকিল। জবাব না দিয়ে মাথা নাড়ল শুধু, অর্থাৎ আশ্বস্ত হওয়ার মতো কিছু দেখছে না।

বড়দি ভিতরে ভিতরে ঘাবড়েছে বোঝা গেল। ঈষৎ অনুযোগের সুরে বলল, মা কিন্তু খুব আশা করেছিল তুই আসার পর অমির মতিগতি যদি একটু বদলায়।...ও হঠাৎ কেন এ-রকম হয়ে গেল সব শুনেছিস?

—কাকিমা বলেছে।

—তাহলে বল আমরা কি অন্যায়টা করেছি। অমির সব থেকে বেশি রাগ বাবার ওপর আর আমার ওপর—ও কি করে আশা করল আমরা কোনো বাধাই দেব না।...যাক, তুই ওকে একটু বোঝাতে চেষ্টা করেছিলি?

প্রসঙ্গটা কি-রকম অবাঞ্ছিত লাগল মিলনের। ওর তিন বছর দু'মাস বাদে দিল্লিতে পা দেবার পর কাকিমাও বলেছিল, ও আসার ফলে যদি আমির একটু সুমতি হয়, মেজাজ-পত্র ফেরে। কিন্তু অমিকে যদি এরা ঠিক-ঠিক চিনত তাহলে এ-রকম আশা করত না। এ-ছাড়া মিলনের মনের তলায় আরো একটা অশান্তির সম্ভাবনা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।...অমির ভালবাসার মানুষকে নাকচ করে দিয়ে এরা সকলেই ভাবছে অমির ভালোর জন্যে যা উচিত তা-ই করা হয়েছে।...কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের মেয়ে এলা মোদীর সঙ্গে মিলনের যে সম্পর্ক ঘটতে যাচ্ছে তাতে এদের সায় কতটুকু মিলবে? অমির মতো ওকেও কি এরা আসামীর একই কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে না?

জবাবের আশায় বড়দি উদগ্রীব হয়ে ওর দিকেই চেয়ে আছে। মিলন বলল, এ-সব কথা এখন থাক বড়দি, দু'দিন গেলে নিজেরাই সব বুঝবে।

শুনে প্রমিতার আরো গোমড়া মুখ। চাপা অসহিষ্ণু সুরে বলল, কিন্তু সে-রকম সময় হাতে পাচ্ছি কোথায়, নমি-শমিকে নিয়ে কুশল তো কাল পরশুর মধ্যেই এসে যাচ্ছে। অমি যদি ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার না করে তাহলে বাড়ির লজ্জা আমারও লজ্জা—

একটু কড়া জবাবই মিলনের মুখে প্রায় এসে গেছল। বলতে যাচ্ছিল, এ-রকম লজ্জার কারণ হতে পারে জেনেও ভদ্রলোককে হুট করে নিয়ে আসতে গেলে কেন —আগে নিজেরা এসে বোঝাপড়া করে গেলেই তো হত। বলল না। কারণ, এখন বলা না বলা সমান।

একটু বাদে প্রমিতা আবার ওর দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে জিগ্যেস করল, হ্যাঁরে, অমি এখনো নিজের ঘরে বসে ঘনঘন সিগারেট খায়?

মিলন ভেবে পেল না এই খবরও বোনেদের কানে গেছে যখন, তারা কি করে কুশল বোসকে একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে আসছে? সত্যি জবাবই দিল। বলল, কিছু দিন হল খেতে দেখছি না—

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্রমিতা সোজা হয়ে বসে বলল, এতক্ষণে যা-হোক একটা ভালো খবর দিলি।

প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য মিলন ঠাট্টার সুরে বলল, কিন্তু তোমাদের ব্যাপারখানা কি, তিন বোনই যে-যার হাসব্যান্ডকে বাতিল করে বাপের বাড়ি আসছ!

ভিতরের দুশ্চিন্তায় বড়দির রসিকতার মেজাজ নয় একটুও। বিমনা মুখে জবাব দিল, সবাই যে-যার অফিস নিয়ে ব্যস্ত...

বাড়ি ফিরতে সাড়ে সাতটা। মিলন গাড়ি থেকেই লক্ষ্য করল অমিতার ঘরে আলো জ্বলছে না। অর্থাৎ ও এখনো ফেরেনি।

কাকু আর কাকিমার নাতি নাতনিদের নিয়ে কিছুক্ষণ কাটল। এরই মধ্যে টেলিগ্রাম। টেলিগ্রাম শুনেই কাকু আঁতকে উঠেছিল। বড়দি বলে উঠল, কলকাতা থেকে নিশ্চয় নমি বা শমির টেলিগ্রাম।

তাই। নমিতা তার করেছে। আগামী কাল সকালের ওমুক গাড়িতে তারা দিল্লি পৌঁছচ্ছে। সঙ্গে কুশল। স্টেশনে যেন গাড়ি থাকে।

এই বার্তা পেয়ে কাকু বা কাকিমা কাউকেই বিশেষ অবাক হতে দেখল না মিলন। বড়দি এরই মধ্যে ফাঁক খুঁজে কাকা-কাকিমাকে কিছু বলে থাকবে। মেজদি বা ছোড়দির চিঠিও আগে পেয়ে থাকতে পারে। কাকুর মুখখানাই শুধু চিন্তাচ্ছন্ন একটু। বড়দিকে বলল, এক-আধ দিনের জন্য হলেও জয়ন্ত এলে ভালো হত।

জয়ন্ত বাড়ির বড় জামাই। বড়দির বর। কুশল বোস তারই খুড়তুতো ভাই।

কাকুকে চিন্তিত দেখলেই বড়দির ভয় ধরে এই বুঝি ব্লাডপ্রেসার চড়ল। তাড়াতাড়ি তাকে আশ্বস্ত করল, আমরা আছি, মিলন আছে, তুমি কিচ্ছু ভেবো না বাবা।

ভিতরে ভিতরে মিলনের অস্বস্তি বাড়ছে। এর মধ্যে সে কোথায় আছে ভেবে পাচ্ছে না। আরো ভেবে পাচ্ছে না, অমিতার মন-মেজাজ জানা সত্ত্বেও তাকে না বলে সকলে মিলে অমন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কুশল বোসকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসছে কি করে!

এক ফাঁকে বড়দিকে নিজের ঘরে ডেকে এনে মিলন ভিতরের দুশ্চিন্তা প্রকাশই করে ফেলল। জবাবে অবাক হবার মতোই কিছু শুনল।...সেই প্রথম বারে দিল্লি এসে কুশলের অমিতাকেই বিশেষ মনে ধরেছিল সেটা এতদিনের মধ্যেও কেউ বোঝেনি। বড়দি বুঝেছে মাত্র মাস তিনেক আগে। গাজিয়াবাদে বসে হঠাৎ খুড়ী শাশুড়ীর চিঠি পায় একটা। লিখেছে, ছেলের বিয়ে দেবার জন্য তারা বিশেষ ব্যস্ত কিন্তু এতদিনে তাদের ছেলে বিয়েতে রাজি হয়েছে। তার জন্যে মেয়ে দেখা হচ্ছে। খুড়ী শাশুড়ী জানতে চায় তার ছোট বোনের বিয়ে হয়ে গেছে কিনা, যতদূর জানে হয়নি—যদি না হয়ে থাকে তাহলে কুশলের সঙ্গে বোনের বিয়ে দিতে তারা রাজি আছে কিনা।

কি জবাব দেবে ভেবে না পেয়ে বড়দি মা-কে সবিস্তারে চিঠি লিখেছিল। এমন ভালো ছেলেটা হাতছাড়া হবে এ কে চায়? কিন্তু কাকিমাই বা কি জবাব দেবে? কাকুর সঙ্গে পরামর্শ করে জবাব দিয়েছে, কিছুদিনের মধ্যে মিলন এসে যাচ্ছে, তখন বড়দিও যেন দিল্লিতে এসে দুজনে মিলে অমিতাকে বুঝিয়ে মত করাতে চেষ্টা করে। ফলে বড়দিও কলকাতায় তার খুড়ী শাশুড়ীকে লিখেছে, শিগগীরই সে দিল্লি এসে বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলবে।

...কিন্তু এর সাত দিনের মধ্যে কুশল নাকি হঠাৎ গাড়িয়াবাদে এসে হাজির। তখনই তার মন বোঝা গেছে। দাদা বউদি অর্থাৎ জামাইবাবু আর বড়দির কাছে স্বীকারই করেছে,

সেবারে দিল্লিতে এসে অমিতাকেই তার খুব পছন্দ হয়েছিল। জামাইবাবু তখন বলতে ছাড়েনি, বোকাটা, তাহলে এতগুলো বছর দেরি করলি কেন?

কুশল হেসে জবাব দিয়েছে, সে ভবিতব্য মানে, ওখানে বিয়ে হবার হলে দেরি হলেও হবে। তার আগে নিজের অডিট ফার্মের উন্নতি আর নিজের পায়ে ভালো-মতো দাঁড়ানোটাই প্রধান লক্ষ্য ছিল। এখন ফার্মের অবস্থা খুবই ভালো, ওদিকে বিয়ের জন্য তার বাবা-মায়েরও বিষম তাড়া। ফলে মাকে দিয়ে সে-ই ওই চিঠি লিখিয়েছিল। তারপর ঈষৎ সংশয়ে বড়দিকে জিগ্যেস করেছে, এত দেরি করলাম কি রকম...তোমার বোন কি এনগেজড্ নাকি?

ছদ্ম কোপে জামাইবাবু বলেছে, না তো কি, সেই ষোল বছর বয়সে যাকে দেখেছিলি ছাব্বিশে তার চেহারাখানা কি-রকম হতে পারে তোর ধারণা আছে? দেখলে আমারই দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে—তা দিল্লিতে কি ব্যাটাছেলে নেই যে তাকে দেখে এখনো কেউ এগিয়ে আসবে না?

ছেলে অত বোকা নয় যে রসিকতা বুঝবে না। বিয়ে সত্যি ঠিক হয়ে গিয়ে থাকলে বউদি মা-কে অমন চিঠি লিখত না তাও মনে হয়েছে। এদিকে জামাইবাবুর ইশারায় এই সুযোগে বড়দি খুব হালকা চালে বোনকে নিয়ে সমস্যাটাও তার কাছে মোটামুটি ব্যক্ত করেছে। বলেছে, বছর আড়াই আগে এক পাঞ্জাবী এয়ার পাইলটকে অমিতার কিছুটা মনে ধরেছিল। কাকা-কাকিমা তাকে সরাসরি নাকচ করার ফলে মেয়ে বিয়েতে আর কান পাতছে না।...ভালোবাসা-টাসা কিছু নয়, বোনের এমনিতেই গোঁ একটু বেশি. অন্য বোনেরা কেউ কাছে নেই, মিলনও বাইরে, বাবার চাকরিতে বিষম খাটুনি—ফলে যে-যার নিজের মতো আছে।

কুশল বোস সচকিত হয়ে জিগ্যেস করেছে, সেই পাঞ্জাবী পাইলটের এখন খবর কি?

বড়দি জবাব দিয়েছে, সে কবে একটা বাজে মেয়েকে বিয়ে করে দেশের বাইরে চলে গেছে।

শুনে কুশল বোস নিশ্চিন্ত। বড়দিকে বলেছে অমিতাকে কারো কিছু বলার দরকার নেই, সে নিজেই দিল্লি এসে তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলে নেবে। বড়দির মনে হয়েছে নিজে কথা বলে অমিতার মন পাবে এমন আত্মবিশ্বাস ছেলেটার আছে।

পারলে কুশল বোস বড়দিকে নিয়ে তখনই দিল্লি আসে। কিন্তু বড়দির তখন আসার সুবিধে ছিল না। বড় মেয়েটার ক'দিন বাদে পরীক্ষা। ছেলেটার জ্বর। তাছাড়া এক-আধ মাসের মধ্যে মিলন আসছে, সেই উপলক্ষে সব বোনদেরই দিল্লি আসার কথা। সেটাই সব থেকে ভালো সময়।

কুশল কলকাতা চলে যাবার পর সমস্ত সমাচার জানিয়ে বড়দি দিল্লিতে আবার চিঠি লিখেছে। জবাবে কাকু মন্তব্য করেছে, ভালোই হয়েছে, নিজে কথা বলার দায়িত্ব নিয়েছে যখন আমাদের ঝামেলা কমলো...অমিকে রাজি করাতে পারলে খুব ভালো কথা।

সেই রাজি করানোর পর্বের প্রস্তুতি এখন।

অমিতা বাড়ি ফিরল রাত সাড়ে ন'টার পরে। বড়দির ছেলেমেয়েরা আর কাকু খেয়ে

দেয়ে শুয়ে পড়েছে। আর সকলের ওর ফেরার প্রতীক্ষা। অমিতাকে দেখেই অনুযোগের সুরে বড়দি বলল, বাবা খেয়ে নিতে বলছিল, আমরা সেই থেকে তোর জন্য বসে আছি- —আজ আসছি তুই জানতিস না?

অমিতা হেসেই জবাব দিল, জানতাম...দেরি হয়ে গেল।

মিলন লক্ষ্য করল, মুখের সেই টান-ধরা রূঢ় হাব-ভাবের ছিটেফোঁটাও নেই। প্রায় আগের মতোই ঢলঢলে সুন্দর। ওর এই পরিবর্তন মিলন বেশ কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছে।...অমির এই মুখখানা দেখার সঙ্গে সঙ্গে মিলনের কেন যেন মনে পড়ল, আগামী কাল ভোরের প্লেনে তার বস্ রাজা মোদী ছ'সাত দিনের জন্য জামসেদপুর চলে যাচ্ছে। সেখানে একটা বড় কাজের টেন্ডার খোলা হবে। বে-সরকারি খবর, কাজটা বীভারসই পাবে। পেলে সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফিরবে।...বড়দি আসছে জেনেও অমির আজ দেরি করে ফেরাটা কেন যেন মিলন খুব সাদা চোখে দেখতে পারছে না।

মুখে খুশির হাসি টেনে মিলন জানান দিল, কাল সকালের গাড়িতে মেজদি আর ছোড়দি আসছে।—কাকিমা, মেজদির টেলিগ্রামটা কোথায়?

ওদিকে র‍্যাক থেকে টেলিগ্রামটা নিয়ে মিনতি নিঃশব্দে ছোট মেয়ের হাতে দিলেন। ওটা পড়তে পড়তে অমিতার চোখের কোণ দুটো একটু চিকচিক করে উঠল কিনা মিলন ঠাওর করতে পারল না। পড়ার পর ওর ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস। বড়দির দিকে ফিরল। আলতো করে জিগ্যেস করল, তোদের কর্তাদের সব কি হল?

বড়দি মিনমিন করে জবাব দিল, কারোই তো এখন আসার সুবিধে হল না, ওদিকে কুশল নিজে থেকে ওদের চলনদার হয়ে আসতে রাজি, সুবিধে পেয়ে নমি শমি যে-যার বাচ্চা নিয়ে চলে আসছে।

অমির মুখে তরল হাসি, খুব ভালো করছে, তা কুশলবাবুও তো সস্ত্রীক এলেই পারতেন, একলা কেন...।

বড়দি খেয়াল করল কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু 'বাবু' শব্দটা মিলনের কানে বাজল। প্রথমবার যখন এসেছিল তখন অমিও তাকে কুশলদা-ই ডাকত।

অমির কথায় বড়দির আকাশ থেকে পড়া মুখ।—ও-মা, কুশল ঠাকুরপো আবার বিয়ে করল কবে যে সস্ত্রীক আসবে!

—তাই বুঝি, অমিতার তেমনি তরল হাসি, এত বড়লোকের ছেলে এতদিনে একটা স্ত্রী জোটাতে পারল না!

মুখখনা গিন্নিগোছের করে বড়দি জবাব দিল, মন করলে এত দিনে ওই বড়লোকের ছেলের এক-গণ্ডা বিয়ে হয়ে যেতে পারত, ছেলের বিয়েতে আপত্তি দেখে তার বাবা মায়ের তো রাতের ঘুম গেছে—

জিভ দিয়ে চুক-চুক একটু শব্দ করে অমিতা বলল, আ-হা, আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো এই রকমই—বাবা-মায়ের কষ্ট বোঝে না।...যাক, তোরা খেতে বোস, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে মুখ-হাতে জল দিয়ে আসছি।

পরদিন সকাল সাতটার মধ্যে চা-পর্ব শেষ। আটটার গাড়ি ধরতে আজও মিলনই স্টেশনে যাচ্ছে। নিজেই ড্রাইভ করবে। কারণ ড্রাইভার রাম সিং থাকে পুরনো দিল্লিতে। সেখান থেকে বাসে এসে সকাল আটটার গাড়ি ধরাতে হলে ওকে রাত থাকতে তৈরি

হতে হয়। খুব ঠেকে না পড়লে এই ধকলের মধ্যে তাকে ফেলা হয় না। মিলন আছে যখন, দরকারই বা কি। সে নিজেই বলে রেখেছে স্টেশনে গাড়ি নিয়ে যাবে। মেজদি আর ছোড়দির অনারে এই দিনটা ক্যাজুয়াল লিভ নেবে। বস্ এখানে নেই, তাকে ডাকাডাকি করারও কেউ নেই।

মিলনের খুব ভোরেই শেভ করা সারা। গরম জলে চানটা করে নেবার জন্য উঠতে যাচ্ছিল, বড়দি হঠাৎ অমিতার দিকে ফিরে জিগ্যেস করল, তোর স্কুল কটায়?

অমিতা ফিরে জিগ্যেস করল, কেন?

—ইয়ে, তুইও মিলনের সঙ্গে গেলে ভালো হত...।

তার দিকে কয়েক পলক চেয়ে থেকে অমিতা সাদামাটা সুরেই আবার জিগ্যেস করল, কি ভালো হত?

আমতা আমতা করে বড়দি জবাব দিল, কলকাতার গাড়ি এক-আধ ঘণ্টা লেটও তো আসে, ও একলা যাচ্ছে তাই বলছিলাম...

অমিতা বলতে পারত গাড়ি রাইট টাইমে আসছে কিনা টেলিফোনে জেনে নিলেই হয়। মিলন ভাবছিল ও তাই বলবে। কিন্তু একটু চুপ করে থেকে সকলকে প্রায় অবাক করেই অমিতা বলল, ঠিক আছে, আমারও একদিন স্কুল কামাই হলে কিছু ক্ষতি হবে না।...আমিও চট করে চানটা সেরেই নিই তাহলে—

উঠে পড়ল। বড়দির চোখে মুখে খুশির ঝিলিক। অখুশি কাকা-কাকিমাও নয়। ওই মেয়ে এত সহজে রাজি হয়ে যাবে কেউ ভাবেনি। পিছন থেকে কাকিমা জিগ্যেস করল, তোর জন্যেও গ্যাসে একটু জল বসিয়ে দেব তাহলে?

অমিতা ফিরল না। নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে জবাব দিল, আমি কবে আবার গরম জলে চান করি...।

দিল্লির ভরা শীতেও অমিতা বরাবর ঠাণ্ডাজলে স্নান করে এটা সত্যি কথা। কিন্তু তা বলে ঠাণ্ডার দিনেও সকাল সাতটায় স্নানের অভ্যেস নেই।

সময় ধরে মিলন গাড়ি বার করতে অমিতা এসে তার পাশে বসল। কাকা-কাকিমা আর বড়দি বারান্দায় দাঁড়িয়ে। সকলেরই হাসি-হাসি মুখ।

গাড়িটা বড় রাস্তায় এসে পড়তেই সামনের দিকে চোখ রেখে অমিতা আলতো করে জিগ্যেস করল, কি-রকম বুঝছিস?

গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে মিলন একবার ওর দিকে ফিরল। তারপর সামনের দিকে চোখ আবার। অমিটাকে সত্যি ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে আজ। পরনে কমলা রঙের শাড়ি, গায়ে ওই রঙের চওড়া বর্ডারের সাদা ব্লাউস, কপালের ছোট টিপটাও কমলা রঙের। আর্দ্র চুলের বোঝা পিঠের ওপর ছড়ানো। ইদানীং এক-দেড় মাসের মধ্যে আর না ছাঁটার ফলে ওই চুলের গোছা ঘাড় থেকে নেমে পিঠ ছুঁয়েছে। তেমনি নিস্পৃহ মুখে মিলন বলল, কি বিষয়ে কি বুঝব?

জবাবে অমিতা আগে আস্তে আস্তে তার দিকে ফিরল। না তাকিয়েও মিলন ওর মুখের রুষ্ট অভিব্যক্তিটুকু আঁচ করতে পারছে।

—দ্যাখ, ন্যাকামো করবি তো চাঁটি খাবি —কি বিষয়ে কিছুই বুঝছিস না—না? গলার স্বর পলকা অথচ ঝাঁঝালো।

—বাঃ, কি বলতে চাস আমি কি করে বুঝব—আমি কেবল তোর সুমতি দেখছি, আমি আসার সময় এরোড্রোমে রিসিভ করতে আসিসনি—এখন বোনেদের জন্য যাচ্ছিস।

অমিতা ওর দিকেই চেয়ে আছে। ঠোঁটে অল্প অল্প হাসি ভাঙছে।—বোনেদের জন্য যাচ্ছি না কুশল বোসের জন্য?

মিলন সানন্দে বলে উঠল, তাই যদি হয় সে-তো খুব ভালো কথা। বড়দি কুশলদার দারুণ প্রশংসা করছিল, তার অডিট ফার্মও এখন জমজমাট শুনলাম।

একবার তাকিয়ে দেখল অমিতাও এই প্রসঙ্গে বেশ মজা পাচ্ছে। ওর দু'চোখ এখন সামনের দিকে। কথার সুর আরো তরল।—ওই ভদ্রলোক এখনো তোর কুশলদা নাকি...তুই তো তিন মাসের বড় আমার থেকে, বড়দি যা ঘটাতে চায় তা ঘটলে তুই তো মানে বড় হয়ে যাবি—তখন কি ডাকবি?

চার বোনের মধ্যে এই মেয়ে যে সব থেকে বেশি বুদ্ধি ধরে মিলনের অন্তত তাতে একটুও সংশয় নেই। হেসেই জবাব দিল, বয়সে পাঁচ ছ' বছরের বড় যখন, তা ঘটলেও তোর মুখ চেয়ে ওই মানটুকু না হয় স্যাক্রিফাইস করা যাবে।...তা বড়দি কি ঘটাতে চায় তুই বুঝলি কি করে?

—আগে বুঝি নি। অমিতার চোখে মুখে চাপা কৌতুক।—সাত আট দিন আগে খামে মায়ের নামে বড়দির একটা চিঠি এসেছিল। মায়ের হাতে ওটা আমিই দিয়েছিলাম। মা সাধারণত ওদের চিঠি পেলে আর আমি কাছে থাকলে পড়ার পর সে চিঠি আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়—নয়তো মুখে বলে কি লিখেছে।...ওই চিঠিটা পড়তে পড়তে মা সুট করে আমার সামনে থেকে সরে গেল। তারপর কাল রাতের টেলিগ্রামে কুশল বোসও আসছে শুনে দু'য়ে দু'য়ে চার যোগ করতে আর অসুবিধে কি। তা ছাড়া, শুধু মেজদি ছোড়দি এলে বড়দি আমাকে স্কুল কামাই করে স্টেশনে যেতে বলত না।

ভিতরে ভিতরে মিলনের চাপা উৎকণ্ঠা এখন। বড়দি বলল আর ওমনি সুবোধ মেয়ের মতো স্কুল কামাই করে স্টেশনে যাচ্ছে এটা ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। এই আসার পিছনে নিজের কোনো আগ্রহ আছে তা-ও ভাবা যাচ্ছে না। কাকুর পরেই বড়দির ওপর রাগ অমিতার। সেই পাঞ্জাবী ছেলেকে বিয়ে করার ব্যাপারে আশা করেছিল বড়দির সুপারিশ পাবে। তার বদলে বড়দি নিজেই কাকার দিকে চলে গেছল। সেই রাগের শোধ এখন তুলতে চায় কিনা ভেবে পেল না। তবু অমিতার কথা শুনে উৎফুল্ল হবার চেষ্টা। বলল, যাক, বুঝেও এসেছিস যখন তোর সত্যি সুমতি হয়েছে বলতে হবে...বড়দি বা সকলেই তোর ভালো চায়, আর কুশলদাও ফেলনা মানুষ কিছু নয়।

সামনের দিকে চোখ রেখে অমিতা টিপটিপ হাসছে। একটু বাদে বলল, ধর, মেজদি বা ছোড়দি ফেলনা নয় তাদের এমন কোনো ননদকে যদি তোর জন্যে ধরে নিয়ে আসত —কি করতিস?

—বা রে! ভিতরের বিড়ম্বনাটুকু ছেঁটে দেবার চেষ্টা মিলনের।— আমার আর তোর ব্যাপার কি এক নাকি! আমার বেলায় পরের মেয়ে ঘরে আসছে আর তোর বেলায় পরের ঘর করতে যাওয়া—তাই তোর বেলায় সকলের দায়দায়িত্ব ঢের বেশি।...তাছাড়া পাকেচক্রে আমার একজন ঠিক হয়ে আছে, তোর বেলায় তো এখন আর তা নয়।

ওর দিকে ফিরে সঙ্গে সঙ্গে অমিতার প্রশ্ন, আমার বেলায় তা নয় তোকে কে বলল?

ভিতরে ভিতরে মিলন হোঁচট খেল একদফা। রাজা মোদীর মুখও সঙ্গে সঙ্গে মনে এলো। অমিতা যদি ভুল করেও একবার তার নামটা মুখে আনত, বস হোক আর যা-ই হোক মিলন ওকে ভালো করে সমঝে দিতে ছাড়ত না। তার দেদার মদ খাওয়ার কথা বলত, পাঁচটা খেলো মেয়ে নিয়ে ফুর্তির মেজাজের কথা বলত, সব থেকে বেশি বলত স্বামীর চরিত্রদোষে বউয়ের আত্মহত্যা করার কথা। কিন্তু তার সম্পর্কে কিছু বলার মতো আভাসও অমিতা এ-পর্যন্ত দেয়নি। জবাবে সে-রকম কোনো সম্ভাবনা ফুৎকারে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা মিলনের। বলল, সে-রকম কেউ থাকলে আমাকে অন্তত তোর বলার কথা। তাছাড়া সবদিক বিবেচনা করে ছাঁটাই-বাছাই করার মতো বুদ্ধি-বিবেচনা তোর আছে বলেই জানি।

অমিতা এবারে শব্দ করেই হেসে উঠল।—একবার পাঞ্জাবী ছেলে ঠিক করেছিলাম, তার পরেও আমার বুদ্ধি বিবেচনার ওপর এত আস্থা তোর?

—না হবে কেন, লোকে ঠেকেও তো শেখে।

—বেশ বেশ। অমিতা হাসতে লাগল।—আমার বুদ্ধি বিবেচনার ওপর এই বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রাখিস।

মিলন আর কথা বাড়ালো না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার উৎকণ্ঠা আরো বাড়ল বই কমল না।

স্টেশনে অমিতাকে দেখে মেজদি আর ছোড়দি যত না খুশি তার থেকে অবাক বেশি। মেজদি নমিতা বলে উঠল, তুই নিতে স্টেশনে এসেছিস, আমাদের কি ভাগ্যি রে?

ছোট বোনকে স্টেশনে দেখে ছোড়দি শমিতা ধরেই নিল ওর মনমেজাজ বদলেছে। সে সানন্দে বলে উঠল, ভাগ্যিটা আমাদের না কুশলবাবুর!

নমিতার সঙ্গে তার বছর চারেকের একটি ছেলে। আর শমিতার কোলে তার বছরখানেকের ফুটফুটে ছেলেটা। হাত বাড়িয়ে তাকে কোলে নিতে নিতে অমিতা হাসি মুখে বলল, ওরা ভাগ্য নিয়ে গবেষণা করুক, আমরা বাড়ি যাই চল—

মিলন এই হাসিখুশির মধ্যে কুশল বোসের মুখখানা ভালো করে লক্ষ্য করছে। ওই মুখে বিস্ময়ের থেকে আনন্দ ঢের বেশি। অনেকগুলো বছর আগে দিল্লিতে এসে তার যে মেয়েটাকে মনে ধরেছিল সে তখন বাড়িতে স্কার্ট-ব্লাউস পরত, আর বাইরে...

কতগুলো বছর বাদে শাড়ি-পরা সেই মেয়েকে এ-রকম দেখবে এ-যেন তার কল্পনার মধ্যেও ছিল না। কুশল বোসের ঠোঁটে স্মার্ট হাসি, দু'চোখ অমিতার দিক থেকে যেন ফেরাতে পারছে না। ছোড়দির ছেলেটাকে কোলে নেবার পর তার সঙ্গে চোখো-চোখি। প্রায় সেই আগের মতোই অমিতা ফড়ফড় করে বলে উঠল, হাঁ করে চেয়ে আছেন কি, চিনতে টিনতে পেরেছেন তো না কি?

কুশল বোস আর যা-ই হোক হাঁ করে ছিল না। কিন্তু অস্বীকার না করে তৎপর জবাব দিল, দিল্লির জল-বাতাসের এত গুণ জানতাম না...একটু অসুবিধেই হচ্ছিল।

তোষামোদের কথা হলেও বলার গুণে সেটা সকলের হাসির খোরাক হল। এই লোককে নিয়ে গেলবারে শমিতাকে অমিতা অনেক জ্বালিয়েছিল। এবারে তার শোধ নেবার পালা। কুশল বোসের দিকে চেয়ে শমিতা বলে উঠল, চেনার আশায় কলকাতা

থেকে দিল্লি পর্যন্ত ছুটে এসেছেন—তার মধ্যে এলেন দেখলেন আর চিনে ফেললেন তাই কখনো হয়! ঠিক ঠিক চিনতে চান তো আমাদের ওপরেই নির্ভর করুন—কি বলিস মেজদি?

মেজদি অর্থাৎ নমিতা হেসেই জবাব দিল, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বেশি চেনা-চিনির দরকার নেই—আগে বাড়ি চল।

...মিলন অমিতাকেও লক্ষ্য করছে। তার মুখে বিরক্তির আভাসও নেই। সত্যি ভারী সুন্দর লাগছে ওকে। তবু দেখা-সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গে এদের রসিকতার কথা শুনে মিলন ভিতরে ভিতরে স্বস্তিবোধ করছে না খুব। অমিতার এই মিষ্টি হাসি আর মিষ্টি মুখ দেখেও কুশল বোসের দিল্লি আসার পরিণাম অতটাই প্রাঞ্জল হবে এটা মিলন অন্তত ভাবতে পারছে না।

গাড়ি বাড়ির রাস্তায় ছুটেছে। মিলন চালাবে বুঝে কুশল বোস আগেভাগে সামনে উঠে বসেছিল। তাই ওরা তিন বোন পিছনে। শমিতার বাচ্চাটা এখনো অমিতার কোলে। একটু বাদে কিছু একটা মজার খোরাক পেয়ে নমিতা বাঁ হাতের পাঁচ আঙুলে অমিতার হাঁটুর ওপরে চাপ দিল। অমিতা মাঝে বসেছিল। কিছু না বুঝে ও বলে উঠল, কি বলবি মুখে বল, টেপাটিপি ভালো লাগে না।

নমিতা এবারে হেসেই বলে উঠল, ও কুশলবাবু, রিয়ার গ্লাস দিয়ে পিছনে এত কি দেখছেন?

কুশল বোস হেসেই পিছনে মাথা ঘোরালো। বলল, তোমাদের তিনজনের ছ'জোড়া চোখ এই রিয়ার গ্লাসের ওপর কেন তাই দেখছিলাম।

অমিতা বলল, রিয়ার গ্লাস দিয়ে আমি তো আমাদের পিছনের গাড়ি ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

অমিকে এ-রকম মুডে মিলন বিলেত থেকে ফেরার পর মাত্র একদিন দেখেছিল। এলা মোদীর সঙ্গে সেই এক বিকেল কাটানোর সময়। নিজেরই আশ্চর্য লাগছে কারণ ওর এই খুশির ভাবটা কৃত্রিম মনে হচ্ছে না। সামনে চোখ রেখে মিলন হেসে জানান দিল, আজ আপনার অনারে আমার অফিস কামাই, অমিরও স্কুল কামাই।

—বলো কি, আমি এত অনারেবল ম্যান! কুশল বোসের চোখে মুখে খুশির পলকা বিস্ময়।

নমিতা আর শমিতা দুজনেরই বুকের ওপর থেকে দুশ্চিন্তার বোঝা নেমে গেছে। গাড়ি দিল্লি স্টেশনে এসে থামার আগে পর্যন্ত তারা ভাবছিল, কুশল বোসকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে অমিতার কোন মূর্তি দেখবে কে জানে। ওর ইদানীং কালের চাল-চলন বড়দি বা মায়ের চিঠিতে জানতে বাকি নেই। বছরে একবার করে এসে নিজেরাও দেখে গেছে। এ-ভাবে বাবা মা-কে কষ্ট দিচ্ছে বলে ওর সঙ্গে ঝগড়া পর্যন্ত করেছে। কিন্তু অমিতার প্রায় নির্বাক ঠাণ্ডা চাউনিতে তারাও ঠাণ্ডা মেরে যেত।

কুশল বোস এবারে টুকটাক মিলনের খবর নিচ্ছে। বিদেশে কোথায় কোথায় ঘুরেছে, কোথায় কতদিন চাকরি করেছে, এখানে কি-রকম চাকরিতে ঢুকেছে, ইত্যাদি। শেষে বলেছে, এত ডিগ্রি আর অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে চাকরি করতে গেলে কেন, নিজে ব্যবসায় নেমে গেলে না কেন?

মিলন হাল্‌কা জবাব দিল, আপনার মতো টাকার জোর থাকলে ভাবা যেত, কাকুর দৌলতে যে-ভাবে শুরু করা গেছে তা-ই অনেক ভাবি।

বাড়িতে এর পরের কটা দিন আগের মতোই আনন্দের হাট। ছোট মেয়ের আচরণে এবার অনুপমবাবুও অনেকটা আশ্বস্ত আর ভিতরে ভিতরে আশান্বিত। এর মধ্যে অমিতা অবশ্য এক দিনের জন্যেও স্কুল ছুটি নিতে রাজি হয়নি। বড়দি মেজদির অনুরোধের জবাবে বলেছে, তিন-চার জন টিচার অ্যাবসেন্ট এখন, প্রিন্সিপালের মেজাজ-পত্র এমনিতে চড়ে আছে, ছুটি চাইতে গেলে রক্ষা নেই। কিন্তু স্কুল ছুটি হওয়া মাত্র বাড়ি ফিরেছে। বিকেলে বা সন্ধ্যার প্রোগ্রামে ও সানন্দে যোগ দিয়েছে। ওদিকে অফিসে এসে ডাইরেক্ট লাইনে মিলন রোজ প্রায় আধঘণ্টা ধরে এলাকে ঝোঝায়, কি জন্যে আসতে পারছে না, বা কি জন্যে এত ব্যস্ত। কলকাতা থেকে তাদের বাড়িতে যে মাননীয় অতিথি এসেছে তার কাঁধে অমিতাকে ঝোলানোর চেষ্টায় বাড়ির সকলে ষড়যন্ত্রে নেমেছে শুনে রাগের বদলে এলা বরং উৎসুক। এখন নিজেই ফোন করে খবর নেয়, অমিতা কতটা ঘায়েল হল। মনে যে খটকাই লেগে থাকুক, ফোনে এদিক থেকে মিলন কিছুটা ঘায়েল হওয়ার আশ্বাসই দেয়। বিকেলের প্রোগ্রামে কোনদিন কি মজার ব্যাপার ঘটল এলা খুঁটিয়ে জানতে চায়। শেষে রোজ একই কথা বলে, তোমার অন্য বোনেরা আর তুমি যদি ওদের ঘিরে থাকো অতিথি ভদ্রলোক তাহলে অমিতাকে ঘায়েল করার মোক্ষম সুযোগ পায় কি করে?

মিলনও একই জবাব দেয়, ওরা সকলে সেই সুযোগই খুঁজছে, কিন্তু মেয়ে তো কম চতুর নয় অমিতা, তাই ওকে ফাঁদে ফেলাও সহজ নয়। সেদিন ওই কথার উত্তরে হেসে বলেছিল, ঘায়েল হবার হলে এরই মধ্যে হবে—বিলেতে তোমার বাবা মা তোমাকে আগলে রাখলেও তার মধ্যেই আমি তোমাকে ঘায়েল করলাম কি করে?

সঙ্গে সঙ্গে এলার প্রতিবাদ, তুমি আমাকে ঘায়েল করেছ না আমি তোমাকে? গোড়ায় গোড়ায় তো ভিজে বেড়ালটির মতো ছিলে! ফোনে এলার খিলখিল হাসি।

যে প্রিয় বান্ধবী দু'দিন বাদে বউ হবে তাকে না বলা যায় কি। অমিতার সঙ্গে এলার আলাপ করিয়ে দেবার পর না-বলি না-বলি করেও অমিতার ব্যর্থ প্রেমপর্বের সমাচার এলাকে শুনিয়েছিল। এলা কাকুর ওপর রেগেই গেছল, বলেছিল, তোমার অমন ভালো মানুষ কাকা নিজের মেয়ের ওপর এত নিষ্ঠুর হয় কি করে! তার পরেই সভয়ে জিগ্যেস করেছে, তোমার আমার ব্যাপারেও ভদ্রলোক বাদ সাধতে আসবে না তো?

মিলন হেসেই আশ্বাস দিয়েছে, এলেও সেটা তুমি মানবে না আমি মানব?...আমার বরং তোমার বাবাকেই ভয়, তিনি না ভাবেন ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের মেয়েকে বিয়ে করে বড় হবার লোভ আমার।

—হুঁঃ, বাবা আর লোক চেনে না। তাছাড়া সেদিনও বাড়ি এসে রাজ্ ভাইয়া বাবার কাছে তোমার কত প্রশংসা করছিল, শুনে বাবা কত খুশি।

মিলনের কান-মন ভরেই উঠেছিল বটে।

এলা যা বলেছিল বড়দিরও মাথায় সেই একই কথা ঘুরপাক খাচ্ছিল। বিকেলে বা সন্ধ্যার পর সকলে মিলে প্রোগ্রাম করলে কুশল বেচারা অমিতার সঙ্গে বোঝাপড়া করার সুযোগ পায় কি করে? কিন্তু অমিতার চালাকিতেই সেটা হচ্ছে না কিনা বোঝা

যাচ্ছে না। কোনদিন স্কুল থেকে ফেরার সময় সকলের সন্ধ্যার শো-তো সিনেমা দেখার টিকিট করে নিয়ে আসছে, কোনদিন বাইরের নামী হোটেলে সকলের ডিনারের ব্যবস্থা বুক করে আসছে, কোনদিন বা আগেভাগে বেড়ানোর প্রোগ্রাম করছে। বোনেদের একজনও না বেরুনোর অজুহাত দেখালে সব আনন্দ নাকচ করার মতো করে বলছে, তাহলে কারো বেরুতে হবে না—বাড়িতে বসে আড্ডা দেওয়া যাক।

শেষে বড়দির সঙ্গেই কুশল বোসের কিছু যোগসাজস হল। অমিতা স্কুলে যাবার জন্য সবে তৈরি হয়েছে, বড়দির ইশারায় কুশল অমিতার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। তার পরেই মুখখানা ব্যাজার করে বলল, আসার দিন আমার অনারে তুমি স্কুল ছুটি নিয়েছিলে, কিন্তু মাত্র একদিনের জন্য অনারবল্ ম্যান হতে কার ভালো লাগে—ভেবেছিলাম আজ তোমাকে স্কুল বন্ধ করতে বলব।

—কেন, কি ব্যাপার? শুনে অমিতা অখুশি একটুও নয়, চোখে মুখে বরং সুচারু বিস্ময়।

—ব্যাপার কিছুই নয়, ফেরার সময় হয়ে আসছে...একদিন হোল ডে প্রোগ্রাম করার ইচ্ছে ছিল, একেবারে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত।

—আগে বলেননি কেন! অমিতার কাছেও এটা লোভনীয় প্রস্তাব যেন।—তা কাল হতে পারে, কাল শনিবার আমার স্কুল নেই।

এবারে কুশল বোসের খুশি মুখ।—তাহলে সকলকে বলে প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলি—কোনো নড়চড় হবে না তো?

শুধু ওকে নিয়ে সংশয় যেন। অমিতা হেসে জবাব দিল, নড়চড় হবে কেন, বেড়াতে আর কার না ভালো লাগে!

অমিতা স্কুলে চলে যাবার পর দশ মিনিটের মধ্যে তিন বোন আর মিলনের জটলা শেষ। এই অঙ্কে কুশল বোসের উপস্থিতি নিষ্প্রয়োজন। কি হবে বড়দি তাকে আগেই জানিয়ে রেখেছে।

সেদিন বিকেলে কাকু অফিস থেকে একলাই বাড়ি ফিরল। মিলন কাজে আটকে গেল। অর্থাৎ কাকু অফিস থেকে বেরুবার পরেই সে ট্যাক্সি নিয়ে এলার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে ছুটল। কুশল বোস আসতে মিলনের একটা সুবিধে হয়েছে। তাকে আর অমিকে নিয়ে তিন বোনের যত ভাবনা-চিন্তা' এর মধ্যে বীভারস-এর বড় সাহেবের মেয়ের সঙ্গে মিলনের ভাব-সাবের কথা তাদের শোনার সুযোগ হয়নি। বা কাকা কাকিমাও কিছু বলেনি। অমিতা বলবে না জানা কথা, কারণ গোড়া থেকেই এ ব্যাপারে সে ওর সহায়।

ষড়যন্ত্রের কথা শুনে এলা ছেলেমানুষের মতো খুশি। বলে উঠল, ইস, আমি আর তুমি যদি ওদের দুজনের সঙ্গে থাকতে পারতাম—

গোমড়া মুখ করে মিলন বলল, কাল শনিবারের ছুটির পর তোমাতে আমাতে বহুক্ষণ একসঙ্গে কাটাতে পারব সেটা তাহলে এমন কিছু আনন্দের নয়?

এলা হেসেই জবাব দিল, তোমার আমার ফয়েসলা তো হয়েই গেছে—ওদের কি ভাবে কি হয় দেখতাম।

...আজকের বিকেল থেকেই ষড়যন্ত্রের শুরু। অমিতা স্কুল থেকে ফেরার আগেই

নমিতা আর শমিতা স্কুটার নিয়ে মার্কেটিং-এ বেরিয়েছে। ফিরেছে সন্ধ্যার পর। বড়দি ততক্ষণ সবগুলো বাচ্চা সামলেছে। মিলন তো রাতের আগে ফেরেইনি। ফলে গাড়ি নিয়ে কাকু বাড়ি ফেরা সত্ত্বেও সেদিন বিকেলে আর বেড়াতে বেরুনো হয়নি। হতে পারত কুশল বোস যদি অমিতার ঘরে এসে সে-প্রস্তাব দিত। কিন্তু পরামর্শ অনুযায়ী তার সেটা দেবার কথা নয়। চুপচাপ ঘণ্টা দুই ঘরে বসে থাকার কথা। তাই ছিল। অমিতা কাউকে না পেয়ে তার ঘরে আসে কিনা সেটাও পরীক্ষার বিষয় ছিল। বড়দি লক্ষ্য করেছে অমিতা একবার মাত্র তার ঘরের দরজার কাছে এসেও ফিরে গেছে। কুশল বোস তখন বিছানায় শুয়ে গভীর মনোযোগে একটা বই পড়ছিল।

রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ মিলন আসতে বেজার মুখ করে কুশল বোস অমিতার ঘরে ঢুকল। পিছনে মিলন। ইজিচেয়ারটা দেখিয়ে অমিতা অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাল, বসুন।...অত মন দিয়ে কি পড়ছিলেন?

বিরস মুখে একটু হাসি টানার চেষ্টা করে কুশল বোস জবাব দিল, মন আর কোথায় দিলাম, সময় কাটছিল না, একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম, আর ভাবছিলাম আজ হঠাৎ সবাই আমাকে বর্জন করল কেন...তুমি কতক্ষণ ফিরেছ?

—বাঃ, আমি তো আমার সময়েই ফিরেছি, আপনার ঘরের দিকেও গেছলাম, বই পড়ছেন দেখে ফিরে এলাম—

হালকা চালে অমিতার ঘাড়ে কিছু দোষ চাপানোর মতো করে মিলন বলল, তিন বছর বাদে এসে অমির অনেক উন্নতি দেখছি কুশলদা, বুঝলে। আগে অসময়ে আমাকে কিছু পড়তে দেখলে কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিত—

মুখখানা হাসির মতো করে কুশল বোস মন্তব্য করল, তুমি ভাগ্যবান...। ইজিচেয়ারটার দিকে এগিয়ে গিয়েও না বসে অমিতার দিকে ফিরল।—তোমার কথামতো কালকের প্রোগ্রাম তো রেডি, এদিকে বউদি আর শমিতা তো নন-স্টার্টার দেখছি—

খবরটা অমিতার কাছে যেন খুব অপ্রত্যাশিত নয়। কুশল বোস আরো কি বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই নিস্পৃহ মুখে জিগ্যেস করল, তারা নন-স্টার্টার কেন?

—বাড়িতে এতগুলো বাচ্চা থাকবে—সব তোমার মায়ের ঘাড়ে ফেলে রেখে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাইরে কাটায় কি করে...

বিবেচনার বিষয়ই বটে, বিশেষ করে প্রমিতার ছোটটা আর শমিতার বাচ্চাটা একেবারেই কুচো। অমিতা সায় দিয়ে বলল, তা অবশ্য ঠিক, পাঁচ-পাঁচটাকে সামলাতে মায়ের কষ্ট হবে—তাহলে আমি মিলন মেজদি আর আপনিই যাব—

—কিন্তু মিলনবাবুও তো ব্যাগড়া দিচ্ছে, তার নাকি এ-সময়ে ভীষণ কাজ, ছুটি পাবে না।

তেমনি নির্লিপ্ত মুখ করে অমিতা মিলনের দিকে ফিরল।—তোর কাজ না এর থেকে জরুরি কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট?

মিলন পাল্টা জবাব দিল, আমাকে তোদের বোধহয় নেবার ইচ্ছেই নেই, আগে থেকে বললেও চেষ্টা করে দেখতে পারতাম—তার ওপর বস্ এখানে নেই, এর মধ্যে ডুব মারলে কাকুই গাল-মন্দ করবে।

অকাট্য যুক্তি বলেই অমিতা যেন এটা মেনে নিল। হাসি-ছোঁয়া দু'চোখ কুশল

বোসের মুখের ওপর।—তা হলে আর কি হবে, প্রোগ্রাম যখন করেই ফেলেছেন, আমি আপনি আর মেজদিই যাব—

সমস্ত দিনের প্রোগ্রাম শুনে মিলন একটু হা-হুতাশ করল।...কুশল বোস একটা প্রাইভেট লাকসারি মোটর ভাড়া করেছে, তার জন্য অ্যাডভান্সও করে এসেছে। সকাল ন'টা থেকে রাত ন'টা বা দশটা যতক্ষণ দরকার থাকবে। সকালের প্রোগ্রাম দিল্লি বেড়ানো। একটায় কোনো বড় হোটেলে লাঞ্চ আর কিছুক্ষণের বিশ্রাম। তিনটের শোয় সিনেমা। সেখান থেকে বেরিয়ে ডিনারের আগে পর্যন্ত আবার বেড়ানো। তারপর আর একটা কোনো বড় হোটেলে ডিনার। তারপর বাড়ি। একটা নামকরা হল্-এ ছ'জনের ছ'খানা সিনেমার টিকিটও কাটা সারা কুশল বোসের।

প্রোগ্রাম শুনে অমিতা খুশি। বলল, তার জন্য কোনো অসুবিধে হবে না—ওই ছবির তিনটে টিকিট এক মিনিটের মধ্যে বেচে দেওয়া যাবে।

কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল নমিতারও শারীরিক অবস্থা তেমন ভালো নয়। ভোররাত থেকেই নাকি তার ভীষণ গা ঘুলোচ্ছে, আর মাথায়ও অসহ্য যন্ত্রণা—রাতের খাওয়া কিছুই হজম হয়নি।

বড়দি বলল, না, এই শরীর নিয়ে নমির সমস্ত দিনের জন্য বেরুনোর কথাই ওঠে না—

মিলন আড়চোখে লক্ষ্য করল, মেজদি মুখখানা করুণ বিষণ্ণ করে বসে আছে। এ-দিকে অমিতা হঠাৎ নমিতাকেই একটা বে-খাপ্পা ধমক দিয়ে উঠল, যেতে পারবি না কাল বললেই তো হত!

নমিতা বড় বড় চোখ করে তার দিকে ফিরল, বাঃ, ভোররাতে শরীরটা হঠাৎ এ-রকম হয়ে গেল...আগে থেকে বলব কি করে?

মেজদির শরীর বিগড়নোর দরুণ অমিতার এতটুকু দুশ্চিন্তা দেখা গেল না। পরিতুষ্ট চাউনি কুশল বোসের দিকে ঘুরল।– কি, প্রোগ্রাম ক্যানসেল করবেন না আমাকে নিয়ে একলাই বেরিয়ে পড়ার সাহস আছে?

মিলনের মনে হল এ-ভাবে বলে অমি কুশল বোসের চক্ষু-লজ্জাটুকুই কাটিয়ে দিল। সে-ও হেসেই জবাব দিল, তোমার আপত্তি না থাকলে আমার সাহসের অভাব হবে কেন!

অমিতা বলল, আপত্তি দূরের কথা, বেরুবার মুখে প্রোগ্রাম ক্যানসেল করলে আমাকে আর পেতেন না। গাড়ি এসে পড়ল বলে, আমি চানটান সেরে রেডি হয়ে নিই —আপনিও দেরি করবেন না।

খুশি মেজাজেই ঘর ছেড়ে চলে গেল। বাকি তিন বোন আর কুশল বোস অমিতার এমন অপ্রত্যাশিত আগ্রহ দেখে নিজেদের মধ্যে খানিক মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। শুধু মিলনের মনে হল, ষড়যন্ত্রের ফাঁপানো বেলুনটা অমিতা এক খোঁচায় এমন চুপসে দিয়ে গেল যে গোটা ব্যাপারটা এখন একেবারে ছেলেমানুষি লাগছে।

এর পর রাতের যে অধ্যায় জানার জন্য তিন বোনের সঙ্গে মিলনও উদগ্রীব, তাতেও যেন বড় গোছের কিছু ছন্দপতন ঘটে গেল। রাত সাড়ে ন'টা দশটার জায়গায় তারা দুজনে ফিরল আটটার মধ্যে। বারান্দায় কেউ ছিল না বলে গাড়ি থেকে নামার সময়

কেউ ওদের দেখেনি। ওরা যে যার ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে টের পেল। অমিতার দিকে না গিয়ে বড়দি আগে তার দেওরের কাছে ছুটে গেল। মিলন তার একটু আগে ফিরে ওই ঘরেই বসে ছিল। কুশল বোসের সমস্ত মুখ থমথমে গম্ভীর।

ওই মুখের দিকে চেয়ে বড়দিও থমকে গেল একটু। জিগ্যেস করল, এরই মধ্যে ফিরলে...কি হল?

কারো দিকে না চেয়ে কুশল বোস জবাব দিল, আরো আগেই ফেরার ইচ্ছে ছিল, তোমার বোনের জন্য হয়ে উঠল না। কোটটা হ্যাঙারে ঝুলিয়ে আড়চোখে একবার মিলনের দিকে তাকাল।

এ-চাউনির অর্থ সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেল। ভিতরের ক্ষোভ প্রকাশ করার ব্যাপারে তার উপস্থিতিটাই বাধা। মিলন চুপচাপ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

মেজদি আর ছোড়দি বসার ঘরে অপেক্ষা করছিল। দুজনেই উৎসুক। অর্থাৎ কি হল?

মিলন বলল, কি হল বুঝতে পারছি না, আর যা-ই হোক কুশল বোসের সমাচার কুশল মনে হচ্ছে না।...তোমরা এখানে না বসে অমির ঘরে যাচ্ছ না কেন?

শমিতা জবাব দিল, ও তো এরই মধ্যে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে দেখলাম।

প্রমিতা এলো প্রায় মিনিট কুড়ি বাদে। ফর্সা মুখ রাগে ফেটে পড়ছে। জিগ্যেস করতে হল না, নিজেই বলে উঠল, ছি ছি ছি, অমি যা করেছে আমাদের মুখ একেবারে পুড়িয়ে দিয়েছে—বুঝলি? শ্বশুরবাড়ির লোকের কাছে এরপর মুখ দেখাব কি করে জানি না—অমি এমন আধুনিকতা দেখিয়েছে—বুঝলি?

কেউ কিছুই বুঝল না। সকলের মুখ কি করে পোড়ানো হয়েছে বড়দি আর বিস্তার করার সুযোগ পেল না। মিনতি ঘরে ঢুকতে সকলে চুপ। তাইতেই তাঁর কিছু সন্দেহ হল। জিগ্যেস করলেন, ওরা ফিরেছে দেখলাম, তোরা এখানে বসে আছিস...কি ব্যাপার?

প্রমিতা এই রাতে আর তার মায়ের মেজাজ খারাপ করে দিতে চাইল না। বলল, কিছু না, ওরা রাতের খাওয়া সেরে এসেছে, চল সব, মিছিমিছি রাত করে কি হবে, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ি।

মিনতি তবু সন্দিগ্ধ চোখে সকলকেই দেখে নিলেন একবার করে। গনগনে মুখে বড়দি ভিতরের দিকে চলে গেল। মায়ের চোখ এড়ানোর জন্য মেজদি আর ছোড়দিও উঠে পড়ল।

পরদিন রবিবার। এই দিনের চায়ের আসর একটু দেরিতেই বসে। অনুপমবাবু এসে অতিথিকে না দেখে জিজ্ঞাসু চোখে বড় মেয়ের দিকে তাকাতে সে বলল, কুশলকে সকালে চা করে দিয়েছি, খেয়ে বেরিয়ে গেছে, কি দরকার আছে বলল।

আর খালি অমিতার চেয়ার। মিলন মন দিয়ে কাগজ পড়ছে। কিন্তু আসলে কাগজটা সামনে ধরে রেখেছে শুধু। কাকু আবার বলল, অমি এলো না...?

এবারে ছোড়দি শমিতা জবাব দিল, ও তো এখনো পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে দেখলাম—

ছোট মেয়ের ইদানীংকালের আচরণ যেমনই হোক, এখনো সকলের আগেই ঘুম থেকে ওঠে। তাই জবাবটা খুব স্বাভাবিক লাগল না। আবার জিগ্যেস করলেন, এখনো ঘুমোচ্ছে...শরীর-টরীর খারাপ হয়নি তো?

কাগজের আড়াল থেকে মিলন এবার কাকিমাকে লক্ষ্য করছে। মুখ দেখে মনে হয়, সকালে তার সঙ্গে বড়দির কিছু কথা হয়েছে। সকলকে চা জলখাবার এগিয়ে দিতে দিতে গম্ভীর মুখে বলল, শরীর খারাপ হয়েছে কিনা কেউ তো আর ঘুম থেকে ডেকে তুলে জিগ্যেস করেনি—তোমরা খেয়ে নাও।

চায়ের পর মিলন নিজের কি দরকারে বেরিয়েছিল। ফিরতে সাড়ে এগারোটা। বারান্দায় কাউকে না দেখে পায়ে পায়ে অমিতার ঘরের দিকে এগলো। সে ঘরে নেই। সদা ওর ঘর গোছগাছ করছে। জানান দিল ছোড়দিমণি খানিক আগে খেয়েদেয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ভিতরের যে চিন্তাটা মিলন বরাবর বাতিল করতে চেয়েছে, বিনা কারণে সেটাই মনের তারে ঘা দিয়ে গেল।...জামসেদপুর থেকে কলকাতা হয়ে রাজা মোদীর আজই সকালের প্লেনে দিল্লি ফেরার কথা। ফোনে যোগাযোগ করে এক্ষুনি জানা যেতে পারে ফিরেছে, কিনা। মিলন সে-চিন্তাও বাতিল করল।

কুশল বোসও ফেরেনি তখন পর্যন্ত। খোঁজ নিতে বড়দি বলল, ফোনে জানিয়েছে ফিরতে দেরি হবে, লাঞ্চে তার জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই।

বড়দি ভয়ংকর গম্ভীর। কিছুটা গম্ভীর বাড়ির অন্য সকলেও। যা সকলে আশা করেছিল তা হয়নি। অমিতা কুশল বোসকে বাতিল করেছে। শুধু সেই কারণে সকলে এত গম্ভীর কিনা মিলনের সেই সংশয়। সেই এক ব্যাপারের পর অমিতা আগেও বিয়ের কথায় কান পাতেনি। এখনো যদি বিয়ে করবে না এমন কথাই কুশল বোসকে বলে থাকে তাহলে খুব অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু অমিতা এমন কিছুই করেছে যা বড়দির কাছে মানহানিকর মনে হয়েছে। গত রাতে বড়দি বলেছে, বাড়ির সকলের মুখ অমিতা একেবারে পুড়িয়ে দিয়েছে—শ্বশুরবাড়ির লোকের কাছে এরপর মুখ দেখাবে কি করে জানে না।

কৌতূহল সত্ত্বেও মিলন জিগ্যেস করল না কি ঘটেছে বা অমিতা কি করেছে। সময়ে অমিতার মুখ থেকেই সব শোনার ইচ্ছে।

কুশল বোস বেলা আড়াইটে নাগাদ ফিরল। মিলন তখন ড্রইংরুমে বসে। সেই ঘরেই ফোন। চোখাচোখি হতে ভদ্রলোকের সহজ হবার চেষ্টা, কিন্তু ঠোঁটে তির্যক হাসি। সে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে পিছনে বড়দিও এসেছে। তার দিকে ফিরে বলল, বউদি তোমাদের কিছু খরচ করাবো, কলকাতায় একটা এস. টি. ডি. ফোন করব—

বড়দি সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে জবাব দিল, এর আর বলার কি আছে, করো—

লাইন পেতে দেরি হল না। কথা শুনে বোঝা গেল কলকাতার বাড়িতে ফোন করছে। ব্যবসা সম্পর্কেই কারো সঙ্গে দু'চার কথা হল। তারপর এদিক থেকে বলতে শোনা গেল, তাহলে আমি আজকের বিকেলের ফ্লাইটেই রওনা হয়ে যাচ্ছি—না না, আজই যাব—এয়ার পোর্টে যেন গাড়ি থাকে।

ফোন রেখে বড়দির মুখোমুখি হল।—খুব দরকার পড়ে গেল বউদি, ট্রেনের টিকেট ক্যানসেল করে আজ বিকেলের ফ্লাইটেই আমাকে চলে যেতে হচ্ছে—

শুকনো মুখে বড়দি চুপচাপ শুনল। সে বেরিয়ে যেতে মিলনের দিকে ফিরে অস্ফুট ঝাঁঝে মন্তব্য করল, যাবে জানা কথাই, কিছু বলার আর মুখ রাখল না।

আর তিন দিন বাদে মেজদি আর ছোড়দিকে নিয়ে কুশল বোসের ট্রেনে ফেরার কথা। রিটার্ন রিজারভেশন করেই এসেছিল। মিলনের ধারণা, নিজের টিকিট ক্যানসেল করে এয়ার প্যাসেঞ্জ বুক করেই সে বাড়ি ফিরেছে। তা না হলে ফোনে নিশ্চিতভাবে বলতে পারত না বিকেলের ফ্লাইটে কলকাতা যাচ্ছেই।

সদাকে দিয়ে একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে কুশল বোস চলে গেল। বড়দি মেজদি ছোড়দি এমন কি কাকু-কাকিমাও নির্বাক।

একে একে আরো তিনটে দিন কাটল। সকলেরই নিরানন্দ মুখ যার জন্যে সেই মেয়ে অর্থাৎ অমিতা আবার আগের মতোই নির্লিপ্ত। তার সময়ে স্নান খাওয়া সেরে স্কুলে চলে যায়। ফেরে রাত ন'টা থেকে দশটার মধ্যে। এই ক'দিনের মধ্যেও এক রাতও বাড়িতে খায়নি।

মিলন কাকুর সঙ্গেই অফিসে যায়। কিন্তু সে-ও একটু রাত করেই ফেরে। এলা সহজে ছাড়তে চায় না। অমিতা কুশল বোসকে নাকচ করেছে শুনে একটুও দুঃখিত হয়নি। মন্তব্য করেছে, এ-রকম তো হতেই পারে, অমিতার যোগ্য বর কি গণ্ডায় গণ্ডায় হয় নাকি!

অফিসে এই তিন দিনের মধ্যে রাজা মোদীর সঙ্গে মুখোমুখি বসে কথা মাত্র একদিনই হয়েছে। সবটাই অফিসের কথা আর কাজের কথা। অন্য দু'দিন চোখোচোখি হয়েছে। মুচকি হেসে সদা ব্যস্ত রাজা মোদী ওর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়েছে শুধু। মিলনও হাসি মুখেই মাথা নেড়েছে। কিন্তু তার মনে হয়েছে রাজা মোদীর ওই মুচকি হাসির অর্থ কিছু আছে। বাড়িতে কিছু একটা প্রহসন ঘটে গেছে এ-যেন সে জানে। তার মুখের ওই হাসি দেখে আনন্দের বদলে মিলনের মনের তলায় দুশ্চিন্তা উঁকিঝুঁকি দেয়।

...আজ বিকেলের গাড়িতে মেজদি আর ছোড়দি কলকাতা রওনা হবে। ফেরার সময় চলনদার নেই, সেজন্য খুব একটা ভাবনাও নেই। বার্থ রিজার্ভ করা আছে। কলকাতায় যার-যার শ্বশুরবাড়িতে টেলিগ্রাম গেছে। তাদের কর্তারা স্টেশনে এসে তুলে নিয়ে যাবে। কলকাতা থেকে রওনা হবার আগেও এই ব্যবস্থাই ছিল। ছেলেমেয়েদের নিয়ে বড়দিও ওই গাড়িতেই যাচ্ছে। সে গাজিয়াবাদ নেমে যাবে।

সকালের চায়ের টেবিল থেকে সবার আগে উঠে গেছে অমিতা। তারপর কাকু। মিলনও উঠি-উঠি করছিল, বড়দির চোখের ইশারায় বসল। কাকিমা অন্যদিকে সরে যেতে বড়দি তার দিকে ফিরল।—আমরা আজ চলে যাচ্ছি তোর জানা আছে?

সাদা কথা কটাও যেন খুব সোজা সরল নয়। মিলন সহজ সুরেই জবাব দিল, না জানার কি আছে, কাকিমাকে তো বলেছি আমি তোমাদের নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলে দেব...তবে একসঙ্গে তিনজনেই চলে যাবে, এখান থেকে এখানে, তুমি আর ক'টা দিন থেকে গেলে পারতে।

মুখখানাকে বিরস করে বড়দি বলল, আমারও ঘরসংসার আছে, তবু থেকে যাবার কারণ থাকলে থাকতাম।...তা তোর ব্যাপারখানা কি?

এই একটা প্রসঙ্গই সব থেকে অবাঞ্ছিত। তবু আকাশ থেকেই পড়ল যেন।—আমার ব্যাপারখানা কি মানে?

—পড়াশুনা শেষ হল, ভালো চাকরি করছিস...বিয়ে করবি না?

মুখের হাসি আরো জোরালো করা ছাড়া উপায় কি? রসিকতার সুরে মিলন জবাব দিল, বিয়ের ছেলে তো তোমার হাতে আছে দেখলাম, মেয়েও আছে নাকি?

মেজদি নমিতা বলে উঠল, নিজেকে খুব চালাক ভাবিস তোরা—আমরা জানতে চাই তুই নিজের পছন্দে বিয়ে করবি না বাবা-মা বা আমরাও মেয়ের খোঁজ করব?

মুখ দেখে বোঝা না গেলেও মিলন বিপাকে পড়েছে সন্দেহ নেই।...এলা মোদীর সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কটা কতটা নিশ্চিত কাকু বা কাকিমার সঠিক জানার বা বোঝার কারণ ঘটেছে মিলন ভাবে না। দুজনের অন্তরঙ্গতার আভাস তারা অবশ্যই কিছু পেয়েছে। ...কাকু না হলেও কাকিমা নিশ্চয় মেয়েদের সে কথা বলেছে। আর তাই থেকেই এরা হয়তো কিছু ধরে নিয়েছে। মিলন বুদ্ধিমানের মতো নমিতার প্রশ্নের শেষের দিকটা এড়িয়ে গেল। তেমনি হেসেই বলল, তোমরা হঠাৎ আমাকে নিয়ে পড়লে কেন? আমি কি অমির মতো কোনো সমস্যা নাকি?...তাছাড়া তোমাদের দুজনের সময় দিন-কাল এক-রকম ছিল, কিন্তু ছোড়দির বেলাতেই তো কাকু পুরো দায়িত্ব নিজের হাতে রাখেনি —দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ আর আলাপ-সালাপ করার সুযোগ দিয়ে পছন্দের দায়িত্ব তাদের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছিল।

কথাটা মিথ্যে নয় আবার পুরোপুরি সত্যিও নয়। ছেলে পছন্দ অনুপম মজুমদারই করেছিলেন। কিন্তু ছেলের বাপই পুরো দায়িত্ব নিজের হাতে নেননি। তাঁর প্রস্তাব, ছেলে মেয়ে দুজনেই যথেষ্ট অ্যাডাল্ট আর শিক্ষিত। আলাপ-সালাপ করে ফাইন্যাল দায়িত্ব নিজেরাই নিক।...ছেলে তারপর দিল্লিতে তার আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে এসেছিল। দিন তিনেক ঘণ্টা-কতকের জন্য অনুপম মজুমদার নিজের গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ওদের ঘোরার আর বেড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

মিলনের কথার জবাবে ছোড়দি শমিতা বলল, আমার মতো ব্যবস্থা তোরও না-হয় করা যাবে—তুই রাজি কিনা বল?

এবারে মিলন গম্ভীর। জবাব দিল, এই মুহূর্তে আমি রাজি নই...তোমাদের মতো আমারও ভাবনাটা এখন শুধু অমিকে নিয়েই।

এই স্পষ্ট জবাবে তিন বোনের কেউ খুশি হল না। বড়দি তেরছা করে বলল, আর যা-ই করিস বাবা-মাকে দুঃখ দিস না।

মিলনের ভিতরটা কেন যেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। তবু হাসি মুখেই বলল, কাকু-কাকিমার অকারণে দুঃখ না পাওয়ার মতো মনের বল আছে বলেই জানি। আর সময় নেই, আমি অফিস থেকে আগেই ফিরব, তোমরা ভেবো না।

বেলা তখন পৌনে চারটে। চারটেয় উঠে পড়বে বলে মিলন তাড়াহুড়োর মধ্যে হাতের কাজ সারছিল। কাকুরও চারটেয় ওঠার কথা। ফোন বাজতে ব্যস্ততার মধ্যেই মিলন সাড়া দিল।

—অমিতা বলছি।

মিলন সচকিত একটু।—কোত্থেকে?

—স্কুল থেকে। মেজদি ছোড়দির সঙ্গে বড়দিও আজই চলে যাচ্ছে?

—হ্যাঁ।

—কটায় গাড়ি?

মিলন বলল।

—তুই নিয়ে যাচ্ছিস?

—হ্যাঁ...ওরা রওনা হবার আগে আজও তুই আসবি না?

—না, খুব চেষ্টা করলেও ছ'টার আগে ছাড়া পাচ্ছি না।

—কেন, তোর স্কুল তো সাড়ে চারটে পর্যন্ত?

ওদিক থেকে অমিতার হালকা হাসি।—তোর কাছে জবাবদিহি করতে আমার বয়ে গেছে। ছাড়লাম—

ফোন ছেড়ে দিল।

ঠিক চারটেয় ঘর থেকে বেরিয়ে দেখে কাকু লিফ্‌ট-এর কাছে দাঁড়িয়ে। দুজনে লিফ্‌ট-এ ঢুকতে যাবে, পিছন থেকে বাধা পড়ল, ওয়েট ওয়েট—!

রাজা মোদী হন্তদন্ত হয়ে আসছে। মুখে হাসি। লিফ্‌ট আটতলা থেকে নেমে এসেছে। ভিতরে আরো লোক আছে। মিলন আর অনুপম মজুমদারের সঙ্গে রাজা মোদীও উঠল। বলল, সরি টু ডিসটার্ব ইউ, লিফ্‌ট একবার নেমে গেলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে অসহ্য লাগে—

অনুপম মজুমদারের ঠোঁটে সৌজন্যের হাসি। সামান্য মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ সেটা বিরক্তিকরই বটে। রাজা মোদী কব্জির ঘড়িতে সময় দেখল। তারপর হাসি-মাখা চাউনি মিলনের মুখের ওপর। যে-রকম হাসি দেখে গত তিন দিনে মিলন অস্বস্তি অনুভব করেছে।

—গোইং টু সি অফ ইওর কাজিনস?

মিলন হকচকিয়ে গেল একটু। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে হেসেই মাথা নেড়ে সায় দিল।

নিচে নেমে লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে এসে তেমনি হেসে রাজা মোদী আবার বলল, মেয়েরা চলে যাচ্ছেন বলে মজুমদার সাহেবের খুব মন খারাপ নিশ্চয়—

মৃদু হেসে অনুপমবাবু মাথা নাড়লেন, না...বিয়ে দিয়েছি যখন যে যার ঘরে তো যাবেই।

রাজা মোদী সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকালো।—দ্যাট্‌স ভেরি মাচ্‌ রাইট্‌ সার, উইশ দেম অল এ হিলারিয়াস জার্নি ব্যাক্—বাই-বাই—

অনুপমবাবু ধন্যবাদ জানাবার আগেই হাল্‌কা মেজাজে হনহন করে নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। ঈষৎ বিস্ময়ে তিনি ভাইপোর দিকে ফিরলেন।—দিদিরা যাচ্ছে তুই-ই বলেছিলি বুঝি?

জবাব না দিয়ে মিলন আগে আগে নিজেদের গাড়ির দিকে চলল। কাকুর মুখের ওপর মিথ্যে কথা বলা সম্ভব নয়। অবশ্য এতেও কাকু ধরেই নিল, বোনেদের নিয়ে স্টেশনে যেতে হবে বলে ও বস্‌কে জানিয়ে চারটের সময় অফিস থেকে বেরুচ্ছে।

...কিন্তু রাজা মোদীকে মিলন কিছুই বলেনি। দরকার থাকলে একআধ ঘণ্টা আগে বেরিয়ে আসার স্বাধীনতা তার আছে।

গাড়ি বিশ তিরিশ গজ এগোতে মিলন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কাকু ফিরে আবার জিগ্যেস করল না।

অমিতার ওপরেই ভিতরে ভিতরে মিলনের রাগ হচ্ছে এখন। দিদিরা আজ চলে যাচ্ছে এ-খবর ও ছাড়া রাজা মোদীকে আর কে দিতে পারে? শুধু তাই নয়, এ ক'দিন রাজা মোদীর চোখে কৌতুক-ছোঁয়া-হাসি দেখে মিলনের ধারণা, বড়দির দেওয়া কুশল বোসকে বাতিল করার প্রহসনও অমিতা এই লোকের কাছে বলেছে।...দিদিরা চলে যাচ্ছে কিন্তু আজও ও স্কুল থেকে বাড়ি আসছে না...অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। এদিকে চারটের সময় হন্তদন্ত হয়ে রাজা মোদী অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল। সমস্ত সম্ভাবনা জুড়লে যা দাঁড়ায় তা মিলনের কাছে যেমন অবাঞ্ছিত তেমনি বিরক্তিকর।

বাড়ি পৌঁছবার পর রওনা হতে আর ঘণ্টা দেড়েক বাকি। দেখতে দেখতে সে সময় কেটে গেল। চলে যাচ্ছে বলে তিন দিদির এমনিতেই মন খারাপ। তার ওপর আরো মুখ ভার এই দিনেও ছোট বোনের আচরণ দেখে। আজও সময়ে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরবে না কেউ ভাবেনি। থেকে থেকে তিনজনেই ঘড়ি দেখেছে আর রাস্তার দিকে তাকিয়েছে।

কাকু কাকিমা ওদের প্রত্যাশা বোঝে নি এমন নয়। ঘড়ির কাঁটা দেখে চলা অভ্যাস কাকুর। সময় হতে আর এক মিনিটও দেরি বরদাস্ত করতে চাইল না। সকলকে তাড়া দিয়ে গাড়িতে তুলল।

গাড়ি বড় রাস্তায় পড়তেই বড়দি অন্য দুই বোনের উদ্দেশে বলল, অমির কাণ্ডটা দেখলি, স্কুলে যাবার আগেও একবার বলে পর্যন্ত গেল না যে আজও সময়ে ফিরবে না।

মিলন সামনে ড্রাইভারের পাশে বসেছে। মেজদির মন্তব্য কানে এলো, সময়ে ফিরলে আমাদের আক্কেল দেওয়া হয় কি করে—

এরপর ছোড়দি শমিতার মন্তব্য।—ওর কারো জন্যে আর এতটুকু টান নেই, দয়া মায়া সব গেছে—

কিন্তু স্টেশনে পৌঁছে গাড়ি থেকে নামবার আগেই যা দেখল তা তিন দিদি ছেড়ে মিলনও ভাবতে পারে নি। হাসি-হাসি মুখে অমিতা দাঁড়িয়ে। ওকে দেখে মিলনই সব থেকে বেশি খুশি হল বোধ হয়।

সকলের আগে বড়দিই সিঁড়ি ভেঙে তার কাছে গেল; পিছনে মেজদি আর ছোড়দি। বাচ্চাগুলো আনন্দে ছোট মাসিমণিকে জড়িয়ে ধরল। বড়দি বলল, তবু স্টেশনে এলি, আমরা ভাবলাম তোর সঙ্গে দেখাই হল না।

বাচ্চা কটাকে আদর করে অমিতা প্রত্যেকের হাতে একটা করে দামী চকোলেটের প্যাকেট দিল। তারপর বড়দির কথার জবাবে হেসেই বলল, আমি কবে আর তোমাদের ভাবনামতো চলেছি।

মাল-পত্র সব ঠিক-ঠাক মতো তুলে মিলন বড়দির পাশেই বসল। অন্য দুই দিদিও চুপচাপ তখন। মিলনের মনে হল তিনজনের কেউ খুব একটা সহজ হতে পারছে না। হালকা গলায় বলে উঠল, যে-যার কর্তার কাছে যাচ্ছ, ভিতরে আনন্দ অথচ বাইরে দেখাচ্ছ কত যেন মন খারাপ।

শুনে ছোড়দিই শুধু হাসল, বলল, তোর মাথায় তো বুদ্ধি একেবারে গিসগিস করছে—

মিলন বা অমিতা কারো দিকে না চেয়ে গম্ভীর মুখে বড়দি বলল, বাবার শরীর মোটে ভালো দেখলাম না, মা বলল, প্রেসার প্রায়ই ফ্লাকচুয়েট করে—বাবাকে চোখে চোখে রাখা দরকার।

আড়চোখে একবার অমিতার মুখখানা দেখে নিয়ে দরদের সুরে মিলন বলল, কাকুর শরীর তো ভালো যাচ্ছেই না, কিন্তু মনের অশান্তিতে কাকিমার শরীরও খুব ভালো যাচ্ছে না, চাপা মানুষ তাই বোঝা যায় না—

এমন সহানুভূতির কথা শুনে তিন দিদিই বড় বড় চোখ করে ওর দিকে তাকাল। বড়দি বলল, আমরা দূর থেকে কি করব...তোদের দুজনের ওপরেই ভরসা করে বসে আছি—

খোঁটাটা যে অমিতার উদ্দেশে সে ওর অন্তত বুঝতে বাকি থাকল না। তপ্ত চোখে মিলনের দিকে তাকাল, তারপর ধমকের সুরে বলে উঠল, দরদ দেখাতে এসেছিস, কার শরীর কত খারাপ আমি না বললে তোর বোঝার মন আছে? সপ্তাহের মধ্যে ক'দিন রাতে বাইরে থেকে খেয়ে আসিস—কোথায় যাস, কার সঙ্গে মিশিস?

মিলন ভিতরে ভিতরে প্রমাদ গণল। রক্ষা, তিন দিদিই একসঙ্গে হেসে উঠল। মেজদি কিছু না ভেবেই বলল, তুই বুঝলে আমরা না হয় মিলনের আশা ছেড়েই দেব—

তেমনি কপট রাগে অমিতা বলে উঠল, কেন, ওর ওপর বরাবর তোমাদের সকলের এত পক্ষপাতিত্ব কেন?

ট্রেন ছাড়ার প্রথম ঘণ্টা বেজে উঠল। অমিতাই আগে উঠে একে একে তিন দিদিকেই প্রণাম করল। বড়দির ওর ওপর রাগ এখনো পড়েনি, কিন্তু ছোড়দি বলেই ফেলল, এ কি রে, এত সুমতি তোর!

অমিতা গম্ভীর। বড়দির দিকে চেয়ে বলল, আবার কবে দেখা হবে না হবে তাই করে রাখলাম—দোষ নিও না, আশীর্বাদ রেখো।

বলেই নামার জন্য তর-তর করে এগিয়ে গেল। তিন বোনের মুখ চাওয়া-চাওয়ির ফাঁকে মিলনও নেমে এসে জানালায় দাঁড়াল।

গাড়ি স্টেশন প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে যেতে ওরা বেরিয়ে এলো। পাশাপাশি কার-পার্কিং-এর দিকে এগোতে এগোতে মিলন বলল, আমি গেলাম একটু ইয়ারকি করতে আর তাই বলে তুই একেবারে আমাকে পথে বসাচ্ছিলি?

—ইয়ারকি করতে? অমিতা সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে উঠল।—আমি বরাবর বলেছি আর কেউ না থাক আমি তোর দিকে আছি—আর তুই আমার সঙ্গেই লাগতে আসিস এত সাহস তোর?

—থাক বাবা থাক, ঘাট হয়েছে।

কার পার্কিং থেকে ভিড় কাটিয়ে ফাঁকা রাস্তায় পড়তে সাত আট মিনিট লেগে গেল। অমিতা তার পরেও গম্ভীর একটু। রাম সিং বাংলা তেমন না বুঝলেও মিলন গলা খাটো করে বলল, কুশল বোসকে বাতিল করেছিস তো বুঝলাম, কিন্তু কি হল...তাকে অপমানও করেছিস নাকি?

—সে তোদের তাই বলেছে?

—সে কিছুই বলেনি, শুধু বড়দি বলছিল সে আর কলকাতায় গিয়ে শ্বশুরবাড়িতে মুখ দেখাতে পারবে না—কি হল জানার জন্য সেই থেকে ছটফট করছি—এমন কি বললি তুই যার জন্যে সে একেবারে হাওয়ায় উড়ে কলকাতা চলে গেল?

অমিতার ঠোঁটের ফাঁকে হাসি স্পষ্ট হতে লাগল এবার। জবাব দিল, আমি কিছুই বলিনি, বাতিলও করিনি—সে-ই বরং আমাকে বাতিল করে পালিয়ে বাঁচল।

মিলন অবাক।—তার মানে?

মানেটা এবারে সবিস্তারেই শুনল। মিলন তারপর হাসবে না কি করবে ভেবে পেল না।

...যেদিন ভাড়াটে লাক্সারি কারে উঠে বড় রাস্তায় আসার আগেই অমিতা হেসে সানন্দে বলেছিল, আর কেউ এলো না বলে আমার কিন্তু ভালোই লাগছে, আপনার নিশ্চয় মন খারাপ হয়েছে?

এতটা সৌভাগ্য কুশল বোসের হিসেবের মধ্যে ছিল না। সে-ও সানন্দে মাথা নেড়ে জানাল মন খারাপ হয়নি। উল্টে খুশি হয়েছে বোঝানোর জন্য বলেছে, বাড়তি চারখানা সিনেমার টিকিটও আর বিক্রি করতে যাচ্ছি না—দু'দিকের চেয়ার খালি পড়ে থাক—

সঙ্গে সঙ্গে অমিতা বলল, টিকিট আপনাকে আমি বিক্রি করতে দিচ্ছি আর কি, পাশে অন্য লোক থাকলেই হাতলে হাত রাখার জন্য দশবার করে তার আমার হাতে হাত ঠেকানোর দরকার হয়—বিরক্তিকর—তাছাড়া দিল্লিতে টিকেট-ফিকেট বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়লে পুলিশে টানা-হেঁচড়ার দুর্ভোগ আছে।

গাড়ি বড় রাস্তা ধরে ছুটতেই প্রথম রাম-ধাক্কা খেয়ে উঠল কুশল বোস। ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে অমিতা দামী বিলিতি সিগারেটের ডবল প্যাকেট আর লাইটার বার করল। প্যাকেটটা খুলে তার দিকে এগিয়ে দিল।

সিগারেট নেবে কি, কুশল বোস তখনই খাবি খাচ্ছে। মাথা নেড়ে আমতা আমতা করে জানাল তার চলে না। অমিতা অবাকই প্রায়, সিগারেট চলে না সে-কি কথা! আমি তো বলতে গেলে চেন্ স্মোকার!

কুশল বোসের আহত মুখেও সংশয়ের ছোঁয়া। বলল, ইয়ে—এ ক'দিন তো খেতে দেখিনি!

অমিতার তাতেই হাসি পেল। বলল, বড়দের সামনে খাই না, তবে জানে সকলেই। ...মিলনকে দিয়ে আপনাদের আড়াল করে এ ক'দিনও ফাঁকমতো না খেয়ে পারি নি।

এরপর থেকেই কুশল বোস গম্ভীর একটু। কিন্তু অমিতার অন্তরঙ্গ কৌতূহলের অন্ত নেই। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাদের কলকাতার বাড়ির খবর জানতে চেয়েছে, ব্যবসার বৃত্তান্ত জানতে চেয়েছে, নিজের একটাই গাড়ি কি না সেই খোঁজও করেছে। আর মাঝে মাঝে একটা সিগারেট থেকে আর একটা সিগারেট ধরিয়েছে। এক-একটা দ্রষ্টব্য স্থানে গাড়ি থামিয়ে তাকে নিয়ে নেমেছে, দেখিয়েছে, বুঝিয়েছে—সিগারেট মুখে লেগেই আছে। অন্য মহিলা আর পুরুষ দর্শকরা সুন্দরী মহিলার সিগারেট টানা দেখছে সেদিকে অমিতার ভ্রূক্ষেপও নেই।

...বেলা একটার সময় ওকে নিয়ে কুশল বোস লাঞ্চ খেতে একটা বড় হোটেলেই ঢুকেছে। জিগ্যেস করেছে, কি খাবে?

অমিতা বলেছে, বেজায় তেষ্টা পেয়ে গেছে, আগে চটপট কোল্ড় বিয়ার আনতে বলুন, তারপর ঠিক করুন।

—বি-বি-বিয়ার! দ্বিতীয় দফা ধাক্কা খাওয়ার গলা কুশল বোসের।

—হ্যাঁ, কেন—আপনার বিয়ারও চলে না নাকি?

কুশল বোস মাথা নেড়েছে, চলে না।

দু'কাঁধ তুলে নিখুঁত কায়দায় অমিতা 'স্রাগ' করেছে। বলেছে, বিয়ার ছাড়া বাইরের বড় হোটেলে লাঞ্চ খেতে আসার কোনো মানে হয়! নিজেই তারপর বয়কে হুকুম করেছে, ওয়ান কোল্ড় বিয়ার—কুইক!

বয় বিয়ার এনে গেলাসে ঢেলে বাকি অর্ধেক বোতল টেবিলে রেখে গেছে। কুশল বোস খাবারের অর্ডার দিয়েছে। মেঘে-ঢাকা মুখ করে উঠে গেছে মুখ-হাত ধুতে। সেই ফাঁকে অমিতা উঠে ভরা গেলাসের বিয়ার সামনের বেসিনে ঢেলে দিয়ে এসেছে। কুশল বোসকে আসতে দেখে বোতলের বাকিটুকু গেলাসে ঢেলে নিয়েছে। খাবার না আসা পর্যন্ত অমিতার বিয়ার আর সিগারেট একসঙ্গে চলেছে। খাবার আসার পর দেখা গেছে কুশল বোসের ক্ষুধা তৃষ্ণা দুই গেছে। অমিতা যেন তা লক্ষ্যও করেনি। নিজে বেশ তৃপ্তি করে খেয়েছে।

এর'পর তিনটের সিনেমা শো। দু'দিকের দুটো করে সিট খালি, মাঝের দুটো সীটে ওরা দুজনে। কিন্তু সিনেমা দেখবে কি পানাহারের ফলে অমিতার ঘুমই পেয়ে গেছে। কুশল বোসের হাতের ওপর হাত রেখে আর তার কাঁধে একটু আধটু ঠেস দিয়ে একসময় ঘুমিয়েই পড়েছে। ইন্টারভ্যালের সময় সিগারেটের তেষ্টায় তন্দ্রা টুটেছে। উঠে পড়ে বলেছে, হল-এ স্মোকিং চলে না, আপনি বসুন আমি আসছি—

কুশল বোস কাছে নেই, বাইরে এসে তাই সিগারেটের প্যাকেট বার করারও দরকার হয়নি। ফিরে এসে বাকি ছবিটুকু অবশ্য দেখতে চেষ্টা করেছে। শেষ হতে মন্তব্য করেছে, দারুণ ছবি—তাই না?

কুশল বোস জবাব দিয়েছে, মন্দ না। বাইরে এসে প্রস্তাব করেছে, এবারে বাড়ি ফিরলে হয়—

শুকনো মাটিতে আছাড় খাওয়া মুখ অমিতার।—বাড়ি ফিরব মানে! বাড়িতে তো 'নো মিল' করে এসেছি! তাছাড়া এখন পর্যন্ত আপনাকে আমার ক্লাবই তো দেখাইনি —সেখানকার ফুডও ডিলিশাস—ওখানেই ডিনার হবে।

খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর বোবা-মূর্তি মানুষটাকে তাদের ক্লাবে ধরে এনেছে। ততক্ষণে রাত—সেখানকার আসর জম-জমাট। জুয়া নাচ মদ কি নেই ওখানে? কুশল বোসকে অমিতা প্রথমেই ড্রিংক-এর টেবিলে নিয়ে এলো। তার ড্রিংকও চলে না শুনে দস্তুরমতো হতাশ হল। তার জন্য সফট ড্রিংক-এর ব্যবস্থা করে নিজে পর পর দু'পেগ জঠরস্থ করল। দারুণ বিচ্ছিরি লাগছিল খেতে, কিন্তু উপায় কি! হেসে ঠাট্টাও করেছে, আপনার আর সন্ন্যাসী হতে কতটুক বা বাকি!

সেখান থেকে নাচের আসরে। লোকটা নাচতেও নারাজ বলে অমিতা প্রায় রাগই দেখালো। যাকে সামনে পেল তার সঙ্গেই নাচ শুরু করল। অন্য মেম্বাররা তার এই দিনের আচরণ দেখে অবাক যেমন খুশিও তেমনি। একে একে তিনজনের সঙ্গে পাঁচ

সাত মিনিট করে নেচেছে। এই মওকায় তারা ফাঁক-মতো ওকে একটু চেপেচুপে ধরতেও ছাড়েনি। অমিতার প্রাণের দায়, প্রশ্রয় না দিয়ে করে কি। এ-পর্যন্ত বলে অমিতা হেসে উঠে মিলনের দিকে ফিরেছে, তোর বস্ বাইরে তাই রক্ষে, সে থাকলে এতটা পারা যেত না।

শুনে মিলন বেশ ধাক্কাই খেল। কিন্তু কোনো মন্তব্য করল না।

...নাচের পর কুশল বোসকে খাবার টেবিলে টেনে এনেছে। একে নাচের ধকল, তার ওপর ওই তরল ছাইভস্ম পেটে গেছে, অমিতার খিদে পাবে না কেন? ক্লাবে অমিতাই হেস্টেস, কুশল বোস গেস্ট। তাই অমিতাই খাওয়ার অর্ডার দিয়েছে। আর এখানেও নিজে বেশ তৃপ্তি করে খেয়েছে। কিন্তু ওই লোকের তখনো ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে।

...তারপর বাড়ি। আর তারপর যা তাই।

কাকা-কাকিমা ড্রইংরুমেই বসে। সামনের দরজা খোলা। মিলন আর অমিতাকে ফিরতে দেখল। কিন্তু অমিতা গম্ভীর মুখে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। মিলন তাদের সামনে এসে জানান দিল, কোনরকম অসুবিধে হয়নি, ট্রেন ছাড়ার পর তারা ফিরেছে। আর বলেছে, আমরা পৌঁছনোর আগেই অমি স্টেশনে অপেক্ষা করছিল।

কাকু আর কাকিমা শুনল শুধু। মিলন তার ঘরে চলে এলো।

...সমস্ত বাড়িটাই খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগছে এখন। কিন্তু মিলনের কি-চ্ছু ভালো লাগছে না কেন? গাড়িতে বসে অমিতার কথা শুনতে শুনতে অনেকবার হেসে উঠেছিল। কিন্তু এখন ভিতরটা প্রায় অজানা অস্বস্তিতে ছেয়ে আছে।...কাকা-কাকিমাকে দেখে মনে হচ্ছিল তারা যেন ভারী অসহায়। তাদের কথা ভাবতে গিয়ে মনে হল, এই বাড়ির হাওয়া একদিন একেবারে অন্য রকম ছিল। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটা খুশির প্রজাপতি নেচে নেচে বেড়াতো। বড়দি মেজদি ছোড়দির বিয়ের পর হুল্লোড় কমেছে কিন্তু খুশির হাওয়ায় টান ধরেনি। তাদের বাপের বাড়ি আসার প্রতীক্ষার মধ্যেও আনন্দ ছিল। ...এখানকার বিগত স্মৃতির যে পুঁজি নিয়ে সে বিলেত গেছল সেটা কেমন করে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। মিলনের ভিতরটা হঠাৎ সেই অতীতের জন্য লালায়িত হয়ে উঠল। ...কাকু কাকিমার সেই তৃপ্ত পরিপূর্ণ মুখ আর কি দেখতে পাবে? সেই অমিতা কি একেবারে হারিয়ে গেল...আর সে নিজে...অতীতের সেই মিলন মজুমদার?

...মিলনের মনে হল অনেক কিছুই না ঘটলে ভালো হত। অমিতার জীবনে সেই এক পাঞ্জাবী ছেলে না এলে ভালো হত।...রাজা মোদী নামে কোনো মানুষের অস্তিত্ব না থাকলে ভালো হত। ও নিজে বিলেত না গেলেও এমন কিছু ক্ষতি হত না। তাহলে হয়তো এলা মোদীর সঙ্গে যোগাযোগ হত না। কিন্তু তাহলেও এই সব কিছুই না ঘটলে এ-বাড়ির সেই বড় কাছের অতীত এভাবে দূরে সরে যেত না।

আত্মস্থ হয়ে মিলন তাড়াতাড়ি সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করল।

## ছয়

মোদী কোর্টে হঠাৎই একটা শোকের ব্যাপার ঘটে গেল। রাজা মোদীর বাবা কিশোরীলাল

মোদী হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন। রাতে খবরটা পেয়ে কর্তব্যবোধে ভাইপোকে নিয়ে অনুপম মজুমদার ছুটে গেলেন। হেমরাজ মোদী নিজেই ফোন করেছিলেন। কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেছিলেন, মজুমদার বাবু, কিশোরীলাল আমাদের ছেড়ে চলে গেল। এই লোকের শোক যে কত বড় এটুকু থেকেই বোঝা গেছে। তাঁর মুখ চেয়ে আর রাজা মোদীর নির্লিপ্ত হাব-ভাব দেখে অনুপমবাবু পরের আনুষঙ্গিক ব্যবস্থারও তদারক করলেন।

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে যাওয়া পর্যন্ত মিলন দু'বেলা সেখানে যাতায়াত করল। অনুপমবাবুর সংশয় ছিল মাথা মুড়িয়ে ছেলে বাপের কাজ করবে কিনা। কারণ বাপের প্রতি আগেও তার খুব একটা ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখেনি কেউ, পরেও না। কিন্তু আচার-মাফিক রাজই করল সব—বিনা আপত্তিতে মাথাও কামালো। রাজা মোদী মিলনকে বলেছিল, আমি এ-সব কিছু বিশ্বাস করি না, কিন্তু যারা করে তাদের কষ্ট দিই কেন।...এগারোটা দিন ড্রিংক না করে কেমন থাকা যায় তাও তো দেখা হল।

শুধু রাজা মোদী কেন, এই আকস্মিক মৃত্যুর জন্য কারো মুখেই শোকের খুব একটা ঘন ছায়া দেখেনি মিলন। যা হবার হয়ে গেছে এখন মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি —এমনি ভাব। প্রাথমিক শোক সামলাবার পর কেবল হেমরাজ মোদী আরো একটু গম্ভীর। বিষণ্ণও। কাকুর মুখে শুনল, তিনি বলেছেন, আগে তাঁরই যাবার কথা, ছ'বছরের ছোট ভাইটা আগে চলে গেল। এরপর তিনি চোখ বুজলে অত বড় ইনডাস্ট্রির হাল রাজকেই ধরতে হবে—কিন্তু ছেলেটার মতিগতি ঠিক হল না বলেই দুশ্চিন্তা।

কিশোরীলালের নিজের ছোট ভাই পুষ্করমল আছেন। তাঁর দুই ছেলেও বীভারস-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। কিন্তু এদের অস্তিত্ব কিশোরীলালের থেকেও নিষ্প্রভ। হেমরাজের দুশ্চিন্তা স্বাভাবিক। বাড়িতে এ-সময় মিলন অমিতাকেও লক্ষ্য করেছে। তাকে শুধু একটু বেশি ঠাণ্ডা মনে হয়েছে ক'টা দিন। নিয়মিত স্কুলে গেছে, আর ছুটির পর সোজা বাড়ি ফিরেছে। মিলনের কেবল মনে হয়েছে ও-বাড়ির কাজকর্ম সম্বন্ধে কাকুর সঙ্গে ওর কথা-বার্তা অমিতা কান পেতে শোনে। বাপের তিন আনা শেয়ার এবার রাজা মোদী পাবে। এর ফল কি হতে পারে তা নিয়েও কাকুর ভাবনা। পরে অমিতা ঠাণ্ডা গলায় মিলনকে বলেছে, বাবা চাকরি করছে চাকরি করে যেতে বল, তার অত চিন্তা করে ব্লাডপ্রেসার বাড়ানোর দরকার কি!

মিলন হেসেই জবাব দিয়েছিল, কাকু কোম্পানিকে ভালবাসে তাই ভাবে, কিন্তু তোর তাতে আপত্তি কেন?

একে একে ছ'টা মাস কেটে গেল তারপর। মিলন রাজা মোদীর মতি-গতির পরিবর্তন তেমন কিছুই দেখেনি। বাপের একটি সন্তান, তাই তাঁর তিন আনা অংশের সবটাই রাজা পেয়েছে। তা সত্ত্বেও না। কিন্তু বীভারস-এর উঁচু মহলের ভিতরের বাতাস কিছু বদলেছে আর বদলাচ্ছে সে আভাস মেলে। পুষ্করমলের ছেলেদের আর পদস্থ জ্ঞাতিদের সব রাজা মোদীকে মাথায় তোলার প্রবণতা লক্ষ্য করছে মিলনও। আগেও তারা রাজা মোদীকে মাথায় তুলে রাখতেই চেষ্টা করত। এখন ভাবে, কোম্পানির সে-ই সর্বেসর্বা এখন। মাঝে পলিসির ফাইল পর্যন্ত রাজা মোদীর টেবিলে এনে ফেলা হচ্ছিল। বিরক্ত মুখে রাজই সেটা বন্ধ করেছে। বলেছে, এ-সব আমার কাছে কেন, এম. ডি. কি রিটায়ার করেছেন?

কাকা-ভাইপোতে এ নিয়ে আলোচনা হয়। অনুপমবাবুও ভবিষ্যৎ ভেবে বিষণ্ণ একটু। হেমরাজকে সরিয়ে সকলে মিলে যে রাজা মোদীকেই সবার ওপরে বসাতে চায় এ-রকম সন্দেহ তাঁর বহু দিনের। কিশোরীলাল চোখ বোজার ফলে এদের আরো সুবিধে হয়েছে। অনুপম মজুমদারের ধারণা, আসলে কোম্পানিটাকে এরা কেউ ভালবাসে না —রাজ-এর মতো খেয়ালি কাণ্ডজ্ঞানশূন্য একজন সর্বেসর্বা হয়ে বসলে শাসনও ঢিলে হয়, লুটেপুটে খাওয়ারও সুবিধে হয়। মিলনকে ঘুরিয়ে সাবধানও করেছেন একটু, একমাত্র কাজ ছাড়া তোর কোনো কিছুর মধ্যে না থাকাই ভালো।

অন্য সকলের সম্পর্কে কাকু হয়তো ঠিকই বলেছে, কিন্তু রাজ-এর সম্পর্কে তাঁর উক্তি মিলন মেনে নিতে পারেনি। বলেছিল, রাজ খেয়ালি হতে পারে কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানশূন্য খুব মনে হয় না কাকু।

অনুপম মজুমদার তার পরেও বিরূপ মন্তব্যই করেছেন। বলেছেন, এখন পর্যন্ত সে-রকম মনে হওয়ার মতো সে কিছু করেনি ঠিকই, কিন্তু যার চরিত্র-বল বলে কিছু নেই তার কাণ্ডজ্ঞানের ওপর আর কতটা ভরসা করা যেতে পারে।

খাবার টেবিলে বসে এ আলোচনার সময়ও অমিতা ছিল। বাবার কথা শুনে তার মুখে একটা আচড়ও পড়েনি। চুপচাপ উঠে চলে গেছে। পরে মিলনকে বলেছে বাবার সঙ্গে তর্ক করিস কেন, বাবা চেনে না বা বোঝে না এমন মানুষ দুনিয়ায় আছে নাকি?

মিলন চুপ মেরে গেছে। এ নিয়ে একটা কথাও বাড়ায়নি। কাকুর মন্তব্যের সঙ্গে সে নিজেও একমত নয়। রাজা মোদীর ব্যক্তিগত চাল-চলন বা চরিত্র যেমনই হোক, আংকল দ্য গ্র্যান্ডের ওপর তার অকপট শ্রদ্ধাই দেখে এসেছে। কিন্তু মদ আর মেয়েমানুষের অপবাদ এমনই জিনিস যে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে চরিত্রের হিসেব কেউ করে না—কাকুর আর দোষ কি। অন্যদিকে কাকুর কথাগুলো অমির যে অসহ্য লেগেছে তাতেও অস্বস্তি। রাজা মোদীর সঙ্গে অমিতার প্রচ্ছন্ন যোগ আছেই, এ-যাবত এ-রকম আঁচ মিলন অনেক পেয়েছে। সেটা যে ক্লাবের চেনা-জানা বা দেখা-সাক্ষাতের মধ্যেই শেষ এমন ভাবারও কারণ নেই। কেন নেই মিলন জানে না। তার মন অন্যরকম বলে। অমিতার মন বোঝার অবশ্য উপায় নেই। ও কিছুই বলে না বলে ভিতরটা আরো সন্দিগ্ধ মিলনের। কিন্তু রাজা মোদীর মন বুঝতে বাকি নেই। গাড়িতে বসে সেই একদিন হরিয়ানা থেকে ফেরার সময় অমিতার সম্পর্কে যে আগ্রহ লক্ষ্য করেছে সেটা আর যা-ই হোক সাধারণ চেনা-জানার ব্যাপার নয়। তারপর থেকে মিলনের এমনও মনে হয়েছে মালিক পক্ষের এমন এক জবরদস্ত মানুষ তার মতো একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট এনজিনিয়ারকে যে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো কাছে টেনে নিয়েছে সেটা ওর বিলেতি খেতাব দেখে নয় বা ভবিষ্যতে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের জামাই হয়ে বসতে পারে বলেও নয়। ও-সবের জন্য আলাদা মর্যাদা দেওয়া রাজা মোদীর ধাতে নেই। ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের প্রতি তার শ্রদ্ধা থাকতে পারে, কিন্তু কেয়ার কাউকেই করে না। তাহলে মিলনের প্রতি তার এই প্রীতির সবটাই অমিতার কারণে।

তবু এই প্রসঙ্গ মিলন যতটা সম্ভব এড়িয়েই চলে। কারণ ব্যাপারটা তার কাছেও খুব বাঞ্ছিত নয়। সেই সঙ্গে একটু দায়িত্ববোধও ভিতরে ভিতরে খোঁচা দেয়। ওদের দুজনকে নিয়ে অবাঞ্ছিত কিছু যদি মিলনের কাছে আরো বেশি স্পষ্ট হয়েই ওঠে, সবার

আগে কাকুকে তা জানাতে হবে। চাকরির খাতিরেও দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। কাকুর কথা না-হয় ছেড়েই দিল, তাকে সে নিজে বাবার থেকে ঢের বেশি ছাড়া কম ভাবে না। কিন্তু অমিকেও সে কম ভালবাসে না। চাকরি থাক আর যাক, তার কোন ক্ষতি মিলন কক্ষনো বরদাস্ত করবে না। কিন্তু আগবাড়িয়ে এ নিয়ে খোঁচাখুঁচি করে লাভ কি। তাতে কাকুর অশান্তি আরো বাড়বে ছাড়া কমবে না।

এদিকে অমির কথা ভেবেও কম অবাক লাগে না। হাসিখুশি কি প্রাণোচ্ছল মেয়ে ছিল একটা, আর কি হয়ে গেল। মিলনের ধারণা, আবারও অমিতা ঠিক আগের মতো হতে পারে। কিন্তু কি হলে যে হতে পারে ভেবে পায় না। অফিসে কাজের চাপ আছেই, ছুটি হলে এলারও ডাকাডাকি আছে। অমির সঙ্গে মন খুলে দু'দণ্ড কথা বলার সময় হয় না—কারণ ওরও স্কুল আছে, সন্ধ্যার পর সপ্তাহে তিন-চার দিন ক্লাব আছে। তবু যেটুকু সময় পায় নিজেকে ও নিজের মধ্যে গুটিয়েই রাখে। ইচ্ছে থাকলেও মিলন ওকে খোলাখুলি কথাবার্তার মধ্যে টেনে আনতে পারে না। কিন্তু আসলে সাহসে কুলোয় না।

...অমিতার ইদানীংকালের আচরণ আর চালচলন যেমনই হোক, তার বুদ্ধির ধার একটুও কমেছে মনে হয় না। ও কি রাজা মোদীর অতীত জানে না? বউয়ের আত্মহত্যার খবর রাখে না? টাকার জোর না থাকলে তার লম্বা জেল পর্যন্ত হয়ে যেতে পারত। তাছাড়া অমি কি ক্লাবে তাকে মদ খেতে দেখে না?

নিশ্চয় সব জানে, সব খবর রাখে, সব দেখে। তাই মিলনের আশা, ওই লোকটার দিক থেকে যত দুর্বলতাই প্রকাশ পাক, সব জেনেশুনে কোন রকম গোলমেলে প্রশ্রয় অমিতা তাকে কক্ষনো দেবে না, দিতে পারে না। আবার খুব সামান্য ব্যাপারে খটকাও লাগে।

যেমন, কুশল বোসকে ক্লাবে নিয়ে গিয়ে ওই কাণ্ড করার পর অমিতা বলেছিল, তোর বস বাইরে তাই রক্ষা, সে থাকলে এতটা পারা যেত না। আর যেমন, মিলন এই সেদিন রাতে ওর ঘরে গিয়ে বসেছিল। বাড়িতে থাকলে বই অমির সর্বক্ষণের সঙ্গী। হালকা গলায় মিলন বলল, তোর একটু উন্নতি হয়েছে দেখছি?

বই রেখে মুখের দিকে চেয়ে অমি বুঝতে চেষ্টা করল কি উন্নতি। বুঝল না। জিজ্ঞাসা করল, কি রকম?

—আজকাল আর তোকে মোটে সিগারেট খেতে দেখি না।

অমিতা চেয়ে আছে। ঠোঁটে সামান্য হাসির ফাটল ধরল। জবাব দিল, কি করি, তোদের এত অপছন্দ!

মিলন ফস করে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, অপছন্দটা আমার না যার কোন রকম ধোঁয়া সহ্য হয় না, তার? বলতে গিয়েও সামলে নিল। হেসে উঠল।—ভাগ্যি দেখে তোকে মাথায় তুলে নিতে ইচ্ছে করছে।

অমিতার চাউনি ঠাণ্ডা, গলার স্বরও। জবাব দিল, আমাকে মাথায় তুলে নিলে কতটুকু আর লাভ তোর—যাকে বুকে তোলার কথা তার কতটা কি করলি?

হাসি চেপে মিলন ঘটা করে বড় করে নিশ্বাস ছাড়ল।—কি আর করব, তুই মোটে গা করিস না...।

অমিতা ভুরু কোঁচকালো।—তুই একজনকে বুকে তুলবি আর আমাকে গা করতে হবে?

মিলন সঙ্গে সঙ্গে দু-হাত জোড় করে ফেলল, থাক বাবা থাক, মুখখানা যা হয়েছে তোর আর ঘাঁটাব না।

এই মুখের হদিস মাঝে মাঝে পায় বলেই মিলনের মনে হয়, বাইরের মেঘ কোনো যাদুবলে কেটে গেলে আবার ও ঠিক আগের মতো হতে পারবে। বিলেত থেকে এসে প্রথমে যা দেখেছিল তার থেকে ওর চেহারার শ্রী অনেক ফিরেছে। প্রায় আগের মতোই মিষ্টি লাগে। একই সঙ্গে ভিতরে একটু খিঁচ লেগেই থাকে। মেয়েদের সিগারেট খাওয়া মিলনও দু'চোখে দেখতে পারে না। কিন্তু অমির সিগারেট ছাড়াটা ভিতরে একটা জিজ্ঞাসার দাগের মতই নড়েচড়ে বেড়ায়।

নিজের ব্যাপারে মিলন নির্লিপ্ত বসে আছে এমন নয়। দিদিদের দিল্লি আসার প্রতিক্রিয়া এখনো বুকে চেপে বসে নেই। এলার সঙ্গে ইদানীং দেখা হলেই তাগিদ দেয়, আর কত দিন এভাবে চলবে—তোমার বাবাকে বলো?

গোড়ায় দু-এক মাস এলা বলেছে, কিশোরী কাকা মারা গেল, বাবার মন মেজাজ খুব খারাপ—এখন তার কাছে বিয়ে-টিয়ের কোন কথা নয়। ভাবনা কি, সময় বুঝে ঠিক বলব।

কিন্তু পরের ক-মাসের মধ্যে ওর আর বাবাকে বলার ফুরসত হয়ে উঠছে না। বলার জন্য কত দিন মন ঠিক করে তার ঘরের দরজা পর্যন্ত এসেছে। কিন্তু বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই ওর নাকি ভীষণ হাসি পায় আর লজ্জা করে। বাবা তো এখনো কচি খুকীই ভাবে ওকে।

—তাহলে তোমার মাকে বলো।

এলা মাথা দুলিয়ে প্রতিবাদ করে, মুখেও বলে, ধ্যেৎ, বাবাই সব। একদিন টুক করে তাকেই বলে ফেলতে হবে।

মিলনের ওকে একটু উসকে দেওয়ার চেষ্টা—আসলে বাবাকে বলতে তোমার ভয় করে।

এলা অবাক।—বাবাকে ভয় করে! বাবার সঙ্গে আমার কত ভাব তুমি ভাবতেই পারবে না। বাবা কত সময় এখনো ছোট্ট মেয়ের মতো আমাকে আদর করে, জানো!

এর মধ্যে একদিন এলা প্রতিজ্ঞা করে গেল, চোখ-কান বুজে বাবাকে এবার যা বলার বলেই ফেলবে। কারণ বাবা নাকি প্রায়ই মায়ের কাছে এখন মেয়ের বিয়ের কথা বলছে।

এই থেকেই ঘটনাস্রোত অকল্পিতভাবে ঘুরে গেল। ছুটির দিনের সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ প্রতিজ্ঞা রক্ষার মেজাজ নিয়েই এলা তার বাবার ঘরে ঢুকল। ছুটির দিনেও হেমরাজ একটা কাজের ফাইল দেখছিলেন। মেয়ে ঘরে ঢুকল টের পেয়ে মুখ তুলেই জিগ্যেস করলেন, কি মায়ি, কি চাই?

এলা ফস করেই জবাব দিয়ে ফেলল, বর চাই।

হেমরাজ হাঁ। ঠিক শুনলেন কিনা সন্দেহ। ফাইল ছেড়ে মেয়ের লাল মুখের ওপর চোখ এবারে।—কি চাই?

—বললাম তো, বর চাই।

—ইউ মিন বুন?

—নো ড্যাডি, আই মিন হাসব্যান্ড।

হেমরাজ আবার হাঁ কয়েক পলক। তারপর ঠোঁটের ফাঁকে হাসি খেলে গেল। পরক্ষণে গম্ভীর।—চাই যখন এনে দেওয়া যাবে, বিকেলে তোকে নিয়ে মার্কেটে বেরিয়ে দেখি কোন দোকানে ভাল মেলে।...তা কি-রকম বর তোমার খুব পছন্দ মায়ি?

বাবার রসিকতায় মেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর অনায়াসে বলল, আমার পছন্দের বর পাবে সে-রকম দোকান দিল্লিতে নেই—দোকানে যেতে হবে না—মজুমদার বাবুর ওখানে পেয়ে যাবে।

হেমরাজ মোদী আবার হাঁ। নড়েচড়ে বসলেন একটু। আলোচনা আর হাসি বা কৌতুকের ব্যাপার নয়, তবু মুখে কোনরকম রেখাপাত হল না। জিগ্যেস করলেন—আমাদের এনজিনিয়ার মজুমদারবাবু?

—হাঁ।

—সেখানে কাকে পাওয়া যাবে?

—মিলনকে।

সমস্ত কান-মন সজাগ এখন, কিন্তু এর পরেও হেমরাজ মোদীর মুখে তেমন কিছু বিস্ময় বা বিরূপ ভাব প্রকাশ পেল না। শুধু একবার নিবিষ্ট চোখে মেয়ের মুখখানা দেখলেন।—তাকে তুই বিয়ে করবি?

মেয়ে মাথা ঝাঁকালো। করবে।

—মিলন বলেছে?

—মিলন কেন বলবে, আমিই আগে বলেছি।

—কবে বলেছিস?

—অনেক দিন আগে। মেয়ে যেন ভারী মজার গোপন কথাটা বাপের কাছে ফাঁস করল—সেই দ্বিতীয়বার বিলেতে থাকতে।

—মিলন কি বলেছে?

—কি আবার বলবে, খুশি হয়ে রাজি হয়েছে—হবে না কেন, আমি কি কিছু খারাপ দেখতে?

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন।—খুব ভাল দেখতে বলেই তো যাকে বলবি সে-ই রাজি হয়ে যাবে।

—যাকে-তাকে বলতে যাব কেন, মিলনকে বলেছি, ব্যস।

আবারও আস্তে আস্তে আপত্তিসূচক ভাবে মাথা নাড়লেন হেমরাজ মোদী। গলার স্বর বিন্দুমাত্র চড়ল না। বললেন, মিলন খুব ভালো ছেলে আমি জানি, তুই অন্যায় কিছু করিসনি—কিন্তু মায়ি, আমি যে এক বন্ধুকে এক বছর আগে কথা দিয়ে ফেলেছি তার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব—তোর মা-ও জানে, জিগ্যেস করে দ্যাখ। তোর পছন্দও হবে খুব—

—কি সর্বনাশ! এলার দু'চোখ কপালে।—আমাকে কিছু না জানিয়ে তুমি একেবারে কথা দিয়ে বসে আছ! তাহলে শিগগীর এক্ষুনি তাদের জানিয়ে দাও আমি অলরেডি

এনগেজড়—মিলনকে ছাড়া আমি আর কাউকে বিয়ে করতে পারব না—তাহলে মরে যাব!

হেমরাজ মেয়েকে একটু দেখলেন আবার। গলার স্বর আরো কোমল করে বললেন, তুইও তো আমাকে আগে কিছু বলিস নি, মেয়ের বিয়ের কথা আমাকে তো ভাবতেই হবে। এখন কথার খেলাপ হলে আমিও মরে যাব মায়ি—সেটা তোর সহ্য হবে?

এলা ফাঁপরে পড়ে গেল। তার দু'চোখে ত্রাস। মুখে আকৃতি। তাড়াতাড়ি বাবার কাছে এগিয়ে এলো। পিঠে আর বুকে হাত রাখল।

—তুমি কক্ষনো এ-রকম বলবে না ড্যাডি।

—তাহলে কি করব তুই-ই বল্।

প্রাণপণে মেয়ে ভাবতেই চেষ্টা করল। সংকট-ত্রাণের উপায়ও মাথায় এসে গেল। বলল, এক কাজ করো ড্যাডি, এখন আর মিলনের সঙ্গে বিয়েটিয়ের কথা তুলেই কাজ নেই। এক বছর দু'বছর দরকার হলে পাঁচ বছর মিলন আমার জন্যে ঠিক অপেক্ষা করবে। তুমি যাদের কথা দিয়েছ তাদের জানিয়ে দাও, মেয়ে আপাতত বিয়ে করতে রাজি নয়।—দু'তিন বছরও দেরি হতে পারে—তারা তাহলে অত দিন আর হাঁ করে বসে থাকবে না, ঠিক ছেলের বিয়ে দেবে। নিজের বুদ্ধির তারিফ নিজেই করল। এক মুখ হেসে বলল, খুব ভাল প্ল্যান না ড্যাডি?

—খুব ভাল। তাই হবে। মেয়ে যেন তাঁর একটা ফাঁড়া কাটিয়ে দিল এমন মুখ। —কিন্তু তাহলে তোকেও এক কাজ করতে হবে মায়ি, তোর সঙ্গে আমার যা কথা হল মিলনকে তার কিছু বলবি না।—পাঁচ কান হলেই জানাজানি হয়ে যাবে—তাছাড়া মিলনের সঙ্গে এখন থেকে তুই আর বেশি দেখা-টেখাও করবি না—মনে থাকবে?

বাবার এ প্রস্তাব মেয়ের একটুও পছন্দ হল না। একে তো বিয়ে এখনকার মতো বন্ধ হয়ে গেল, তার ওপর দেখা পর্যন্ত না করে থাকবে কি করে! জিগ্যেস করল, দেখা কেন করব না ড্যাডি?

—কি বোকা মেয়ে রে তুই...আমি যাদের কথা দিয়েছি, তারা যখন শুনবে মেয়ে আপাতত বিয়ে করতে রাজি নয়—তাদের কি তখন তোর ওপর চোখ থাকবে না? বাবা কথা দেওয়া সত্ত্বেও তোর মতো ভালো মেয়ে বিয়ে করতে চায় না এটা কি খুব বিশ্বাস করার মতো কথা! হঠাৎ যদি তোদের মেলামেশা চোখে পড়ে যায়, আমি তাদের কাছে মিথ্যেবাদী হয়ে যাব না—আর লজ্জায় কি তখন আমার মাথা কাটা যাবে না—তখন কি আর আমার বাঁচার উপায় থাকবে?

মেয়ে আবার ফাঁপরে পড়ল। তবু বাবার আশংকা নাকচ করার চেষ্টা। বলল, দেখলেই বা, দিল্লিতে তো কত মেয়ে কত ছেলের সঙ্গে মেশে—তারা কি আমাকে চেনে?

—শুধু তারা কেন, তাদের ইষ্টিগুষ্টি যারা দিল্লিতে আছে সকলেই তোকে চেনে—তুই কি একখানা কম মেয়ে নাকি আমার!

মুখখানা বিপন্ন করে এলা ঘর ছেড়ে চলে গেল। হেমরাজ মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করলেন, তারপর ফোন তুলে নিলেন। নম্বর ডায়েল করলেন। ওদিক থেকে অনুপমবাবুই ধরলেন।

—একবার বাড়িতে আসতে হবে। দরকারি কথা আছে।

*গম্ভীর মুখে ফোন নামিয়ে রাখলেন।*

বড় কর্তার এ-রকম তলব খুব নতুন কিছু নয়। পরামর্শ করার বা কিছু নির্দেশ দেবার থাকলে ছুটির দিন-টিন ভাবেন না। সোজা ডেকে পাঠান। অফিস সংক্রান্ত কিছু জরুরি আর দরকারি কথা ভেবে অনুপমবাবু আধঘন্টার মধ্যে নিঃশঙ্ক চিত্তেই এসে হাজির হলেন।

হেমরাজ নিচের বসার ঘরে অপেক্ষা করছিলেন। কাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে মেয়ের চোখে পড়ুক চান না।

—বসুন।

অনুপমবাবু বসলেন। বড় কর্তার মুখের দিকে চেয়ে একটু অস্বাচ্ছন্দ্যও বোধ করলেন। চাউনিটা খরখরে লাগল।

একটুও ভনিতা না করে সোজা জিগ্যেস করলেন, আপনার ভাইপো মিলন আর আমার মেয়ে এলা গেলবারে আমরা বিলেত থাকতে দুজনের সঙ্গে দুজনের বিয়ে ঠিক করে বসে আছে...আপনি জানতেন?

বড় সাহেবের গলার এই স্বরের সঙ্গেও খুব পরিচিত নন, অনুপমবাবু আচমকা শুকনো মাটিতে আছাড় খেয়ে উঠলেন।—না তো...!

—আপনার ভাইপো দেশে ফিরে আসার পরেও জানতেন না?

মানী লোকের এটুকুতেই লাগার কথা। লাগছেও। এবারে বেশ স্পষ্ট জবাব দিলেন, না।

এর পরেও হেমরাজ মোদীর গলায় স্পষ্ট জেরার সুর, অপলক গম্ভীর চাউনি তাঁর মুখের ওপর।—আপনার কখনো কোন রকম সন্দেহ হয়নি? আপনার পরিবারকেও মিলন কিছু বলেনি?

স্বভাবের সংযম খোয়ালেন না অনুপম মজুমদার। কিন্তু জবাব আরো ধীর স্পষ্ট।—না। ...তবে মিলন যেদিন আসে, আপনার মেয়ে সেদিন ওকে রিসিভ করার জন্য এয়ারপোর্টে গেছলেন, তাই দেখে আমরা একটু অবাক হয়েছিলাম। আপনার মেয়েই আমাকে বলেছিলেন, দু'বার বিলেত গিয়ে মিলনের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব হয়েছে...সেই ভাব কত দূর গড়িয়েছে আমাদের ধারণা ছিল না।

হেমরাজ মোদী তখনো অপলক চেয়েছিলেন। চাউনিটা এবারে নরম একটু। বললেন, আমিও কিছুই জানতাম না। ভাবতেও পারিনি। আজ মেয়ে এসে সোজাসুজি বলল। সে আপনার ভাইপোকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না। হেমরাজের চাউনি আরো একটু তীক্ষ্ণ।—যাক, এখন আপনিও জানলেন আমিও জানলাম...এখন যা ঘটবার যদি ঘটে আপনি খুশি হবেন তো?

অনুপমবাবুর এমনিতে ব্লাডপ্রেসার হাই। অমায়িক সুরের কথা ক'টা শোনার সঙ্গে সঙ্গে লাল্‌চে মুখ। একটু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন। আজ প্রায় তিরিশ বছর হয়ে গেল বীভারস্-এর সঙ্গে যুক্ত তিনি। আর শুরু থেকে এই ওপরঅলাটির সঙ্গেই আছেন। কিন্তু এতকালের মধ্যে তাঁর কখনো অপমানিত বোধ করার কারণ ঘটেনি। আজ মাথা কাটা যাবার দাখিল। যত মোলায়েম করেই হেমরাজ কথাটা জিগ্যেস করুন, এমন একটা

পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠলে তিনি সেটা লোভনীয় ভাববেন কিনা এটুকুই যে যাচাইয়ের চেষ্টা তা বুঝতে একটুও সময় লাগল না।

সোজা তাকালেন। মনিবের বক্তব্য বুঝতে পেরেছেন এটাই আগে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বললেন, এটা বোধ হয় মনিব-কর্মচারীর কথা নয়, আর আপনি সত্যি কথাই শুনতে চাইছেন?

হেমরাজ চেয়েই আছেন। বিশ্বস্ত মানুষটার কথায় আঘাত লেগেছে এ-কথার পর বুঝতে পারছেন। সামান্য মাথা নাড়লেন। বললেন, এ-রকম বলছেন কেন, আপনার সঙ্গে তো বরাবর আমি বন্ধুর মতই ব্যবহার করেছি। মেয়ের কথা শুনে আমি বেশ ধাক্কা খেয়েছি বলেই...যাক্, কি বলবেন বলুন—

তেমনি ঠাণ্ডা গলায় অনুপমবাবু জবাব দিলেন, আমি খুশি হব না। আপনি মত দিলেও আমি বাধা দিতে চেষ্টা করব।

হেমরাজ এবারে নড়েচড়ে বসলেন একটু। মনের মতোই জবাব পেয়েছেন। তবু জিজ্ঞেস করলেন, কেন?

—আপনি বিচক্ষণ...কেন সেটা আপনি আমার থেকেও ভালো জানেন। শুধু অবস্থার ফারাক নয়, আচরণ সংস্কার অভ্যাস সবেতে আমাদের এত তফাৎ যেটা এখন ওদের চোখে পড়ছে না। ওরা কতদূর এগিয়েছে আমি জানি না, যতই এগোক এ একটা ঝোঁক ছাড়া আমি আর কিছু ভাবি না।...আপনিও ভাবেন না। তাই অত্যন্ত বিরক্ত হয়েই আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আর শোনার পর আমিও কম বিরক্ত হইনি এ আপনি বিশ্বাস করতে পারেন।

একটা হালকা নিশ্বাস ফেলে হেমরাজ হাসলেন একটু।—আমি খুশি হলাম অনুপমবাবু, আপনার মুখ থেকে আমি এ-রকমই শুনতে চেয়েছিলাম। অবস্থার ফারাক বলে নয়, আপনি আর যা বললেন সেই কারণেই এ-রকম বিয়ে আমি পছন্দ করি না, আর তা হতেও দেব না। আমি আপনার ভাইপোর একলার দোষ দিচ্ছি না, দোষ নিশ্চয় আমার মেয়েরও আছে—কিন্তু আমার মেয়ে অত্যন্ত সিম্পল, কোন কিছু তলিয়ে ভাবার ক্ষমতা ওর নেই—কিন্তু সেদিক থেকে আপনার ভাইপোর অনেক বেশি প্র্যাকটিক্যাল আর ইন্টেলিজেন্ট হবার কথা। তার কাজে আমরা খুশি, রাজ তার প্রশংসাই করে, তাকে জানিয়ে দেবেন তার উন্নতির রাস্তা ওই কাজের ভিতর দিয়েই। আমার মেয়েকে নিয়ে আমার খুব একটা প্রবলেম হবে না—ইফ হি ডাজন্ট ট্রাই টু ক্রিয়েট এনি। আমি আমার মেয়েকে বোঝাতেও পারব, ফেরাতেও পারব—আপনি আপনার ভাইপোর দিকটা দেখুন। হি মাস্ট্ নট সী মাই ডটার এনি মোর।

না, হেমরাজ তাঁকে আঘাত করতে চাননি বা করেননি। খুব স্পষ্ট মোলায়েম ভাবে সমঝে যাকে দিতে চেয়েছেন, সে মিলন। কিন্তু ওর সঙ্গে বুকের ভিতরটা তাঁর কোন্ তারে বাঁধা এই পরিস্থিতিতে পড়ে মালিক সেই হিসেব করে কথা বলতে যাবেন কেন? তাই মিলনকে যা বলেছেন তার সবটুকু আঘাত অনুপমবাবুর বুকেই লেগেছে। তবু তিনি এই লোকের দোষ ধরলেন না। এই আঘাত প্রাপ্য ভাবলেন।

নিঃশব্দে নমস্কার জানিয়ে তিনি উঠলেন। ভিতরটা কাঁপছে।

বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলা মোদীও কিছুমাত্র স্বস্তির মধ্যে ছিল না। তারও মাথায় আকাশ ভেঙেছে। বাবার সমস্যাটা সে ছোট করে বা তুচ্ছ করে দেখছে না। ড্যাডির মত মানী লোক তার চোখে এই বিশ্বসংসারে আর কেউ নয়। ড্যাডি যদি কাউকে কথা দিয়ে ফেলে থাকে তাহলে মুশকিলের কথাই। এই মুশকিল আসানের উপায় সে মাথা থেকে বার করেছে, আর ড্যাডিও মোটামুটি তাতে রাজি হয়েছে। আরো একটা দুটো দরকার হলে চারটে পাঁচটা বছরও না-হয় ও অপেক্ষা করতে পারবে। শুনলে মিলনের মাথায়ও আকাশ ভেঙে পড়বে হয়তো কিন্তু এদিকে ব্যাপার যা তারও অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় কি। নিজের ওপর রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছিল এলার। দোষ সবটাই ওর ছাড়া আর কার? বাবাকে বলার জন্য মিলন তো সেই কতদিন ধরেই তাগিদ দিচ্ছে। কেন ও এতদিন এমন বোকার মত কাটিয়ে দিল, কেন দ্বিতীয়বার বিলেত থেকে ফিরেই ড্যাডিকে খোলাখুলি সব জানিয়ে রাখল না! তাহলে তো আর এমন মুশকিলে পড়তে হত না।...আর ড্যাডিরই বা দোষ কি, মেয়ে বড় হয়েছে, বিয়ের ব্যবস্থা তো করবেই—সে কি ভাবতে পারে তার মেয়ে তলায় তলায় এমন এক কাণ্ড বাঁধিয়ে বসে আছে! যাক, সবই না হয় হল, কিন্তু ড্যাডির কথামতো মিলনের সঙ্গে দেখাও না করে থাকবে কি করে? কারো চোখে না পড়ে এ-ভাবে মেলামেশার রাস্তা তো একটা করতেই হবে।

নিচে ড্যাডি তখন কার সঙ্গে কথা কইছে বা কি কথা কইছে এলার কোন কল্পনার মধ্যেও নেই। অনেকক্ষণ ছটফট করার পর হঠাৎ মনে হল ও এখনো এমন বোকার মত বসে আছে কেন, টেলিফোনে মিলনের সঙ্গে কথা কইছে না কেন? মিলনের বুদ্ধি তো আর কারো থেকে কম নয় কিছু, সমস্যার কথা শুনে তার মাথায় কিছু ভালো প্ল্যান আসতেও পারে। ফোনে তো আর কারো দেখে ফেলার ভয় নেই।

ফোন একটা ওর ঘরেই আছে। মনে হওয়া মাত্র এলা ছুটে এসে রিসিভার তুলে নম্বর ডায়েল করল।

এদিক থেকে মিনতি ধরলেন। এ ক'মাসে গলা মোটামুটি চেনা হয়ে গেছে। মিলনকে ডেকে দিলেন।

এ-দিক থেকে সাড়া পেয়েই ওদিক থেকে এলা প্রথম কথাই বলে উঠল, মিলন—সর্বনাশ হয়ে গেছে!

এ মেয়ে অল্পেতেই সর্বনাশ দেখে, তাই মিলন একটুও না ঘাবড়ে হালকা সুরেই জিজ্ঞাসা করলে, কার সর্বনাশ—তোমার না আমার?

—তোমার আমার দুজনারই।

মিলন তবু রসিকতা করে জবাব দিল, আমার সর্বনাশ তো ঢের আগেই হয়ে গেছে, তোমারটা বলো।

—ইয়ারকি নয়, খুব মাথা ঠাণ্ডা করে শোনো, আমার মাথা এখন আগুন গরম, শুনলে তোমারও তাই হবে—বাবার কাছে আজ কথা তুলেছিলাম—এদিকে বাবা কি কাণ্ড করে বসে আছে তুমি ভাবতেই পারবে না!

মিলন তক্ষুনি সচকিত। তাড়াতাড়ি এদিক-ওদিক দেখে নিল একবার। গলা খাটো করে জিজ্ঞেস করল, দাঁড়াও দাঁড়াও, বাবার সঙ্গে আজ কি কথা হয়েছে—আমাদের বিয়ের কথা?

—হ্যাঁ—।

—তোমার বাবা আপত্তি করেছেন?

—আঃ, না! আগে শোনই না!

এরপর মিলন চুপচাপ শুনে গেল। এক একবার হুঁ হাঁ করে সাড়া দিচ্ছে। যত শুনছে ততো গম্ভীর। ওদিক থেকে এলা মোদী সবিস্তারে সমস্যার কথা জানাল। ও তার কি সমাধান করেছে তা-ও বলল।

মিলন চুপ। কানে রিসিভার।

—কথা বলছ না কেন?

—তুমি তোমার বাবার কথা বিশ্বাস করেছ?

—বা রে, ড্যাডির কথা বিশ্বাস করব না! এলার অসহিষ্ণু বিস্ময়।—এর মধ্যে অবিশ্বাসের কি আছে?

—আমি একবর্ণও বিশ্বাস করিনি।

—ও...হাউ ডেয়ার ইউ! তার বাবাকে কেউ, বিশেষ করে মিলন অবিশ্বাস করতে পারে এটা কল্পনার বাইরে।

—শোন এলা, এটা কোন সাহস দুঃসাহসের কথা নয়—এক মিনিট, এক মিনিট ধর তো...

রিসিভার থেকে মুখ সরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। কাকুর গাড়িটা গেট দিয়ে ঢুকছে। তক্ষুনি মনে পড়ল ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হেমরাজ মোদী কাকুকে জরুরি কথা আছে বলে এই ছুটির দিনে বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছিল। গাড়িটা চোখে পড়তে মিলন রিসিভারটা টেবিলের ওপর রেখে কয়েক পা এগিয়ে এসে নিঃশব্দে সামনের দরজা দুটো ভেজিয়ে দিল। কাকুকে কি জন্যে ডাকা হয়েছে সেটা জলের মতো স্পষ্ট এখন। তা যদি হয় কাকু এক্ষুনি ওর খোঁজ করবে। এলার সঙ্গে কথা শেষ করার আগে কাকুর মুখোমুখি হতে চায় না। সামনের দরজা খোলা থাকলে কাকু বারান্দায় উঠেই ওকে ফোনে দেখতে পাবে।

মিনতি বারান্দার একদিকেই ছিলেন। গাড়ির শব্দে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। নিজের ঘরের সামনে অমিতা দাঁড়িয়ে। একটু বেরুনোর ইচ্ছে ছিল। কিন্তু অত রোদের তাতে বেরুবে কিনা ভাবছিল। গাড়ির শব্দে তার এদিকে চোখ গেল। অবশ্য হেমরাজ মোদীর বাবাকে ডেকে পাঠানোর খবর সে রাখে না।

অনুপমবাবু গাড়ি থেকে নামলেন। আস্তে আস্তে পা ফেলে সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠছেন।

দেখা মাত্র মিনতি আর অমিতা দুজনেরই মানুষটাকে কেমন অসুস্থ মনে হল। সমস্ত মুখ অস্বাভাবিক লালচে লাগছে। মিনতি চকিতে এগিয়ে এলেন।—কি হল, হঠাৎ শরীর খারাপ লাগছে নাকি?

অনুপমবাবু তাঁর মুখের দিকে একবার তাকালেন শুধু। জবাব না দিয়ে বারান্দার একটা চেয়ারে বসে পড়লেন।

অমিতা পায় পায় একটু কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। বাবার এই মুখ তারও খুব অস্বাভাবিক লাগছে।

পর পর কয়েকটা বড় নিশ্বাস ফেলে নিজেকে একটু সংযত করতে চেষ্টা করলেন অনুপমবাবু। বুকের ভিতরটা এখনো টনটন করছে। তার পর ধারালো গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, মিলন কোথায়?

মিনতি বললেন, ফোনে কথা কইছে। জবাবের সঙ্গে সঙ্গে সামনের দরজা বন্ধ লক্ষ্য করলেন।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে অনুপমবাবুও ওই দিকে ঘাড় ফেরালেন। বৈঠকখানার সামনের দরজা বন্ধ দেখে ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠলেন, দরজা বন্ধ করে কার সঙ্গে কথা কইছে—ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের মেয়ের সঙ্গে? একবারে মালিকের মেয়েকে ঘরে আনার সখ তার—রাজকন্যা রাজত্ব সব চাই—কেমন? গলার স্বর হঠাৎ কত উগ্র হয়ে উঠল খেয়াল করলেন না।

অদূরে অমিতা নির্বাক দাঁড়িয়ে। মিনতি হতবাক কয়েক মুহূর্ত। এই মানুষের মুখে এ-রকম কথা কমই শুনেছেন। বিশেষ করে মিলনের প্রসঙ্গে। তাড়াতাড়ি আরো কাছে এগিয়ে এলেন।—এ-সব কি বলছ? তোমার শরীর তো ভাল না দেখছি—

অনুপম মজুমদার ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠলেন, আমার শরীর খারাপ হলে কার কি ক্ষতি? আমাকে নিয়ে কার মাথাব্যথা?

এ রকম পরিস্থিতিতে মিনতির আত্মস্থ হতে সময় লাগে না। মুখের দিকে চেয়ে চুপচাপ লক্ষ্য করলেন একটু। তারপর মেয়েকে বললেন, এক গেলাস ঠাণ্ডাজল নিয়ে আয় তো—

নিজেও চট করে ও-পাশের ঘরে ঢুকে গিয়ে একটা তোয়ালে নিয়ে এলেন। অমিতা জলের গেলাস হাতে সামনে এসে দাঁড়াল।

অনুপমবাবু বললেন, কিছু দরকার নেই, আমার জন্য ভাবতে হবে না, ঢের বড় ভাবনা সামনে—

জবাব না দিয়ে মিনতি জলের গেলাসটা মেয়ের হাত থেকে নিলেন। তোয়ালের খানিকটা জল ঢেলে ভিজিয়ে নিলেন। তারপর ভেজা দিকটা দিয়ে বেশ করে স্বামীর তপ্ত মুখখানা মুছে দিলেন। ঘাড়ের দিকটাও। বাকি জলটুকু সামনে ধরলেন, খেয়ে নাও।

এবারে আপত্তি না করে অনুপমবাবু জল খেলেন। গেলাসটা হাতে নিয়ে মিনতি জিজ্ঞাসা করলেন, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছুটির দিনে হঠাৎ কেন ডেকেছিলেন—কি বললেন?

ক্ষুব্ধ গলায় অনুপমবাবু জবাব দিলেন, কি আর বলবেন, ভাইপোর লোভ দেখে ঘুরিয়ে অপমান করে ছেড়ে দিলেন—

ওদিকের দরজা দিয়ে মিলন সামনে এগিয়ে এলো। কাকু-কাকিমার দুজনের কথা তারও কানে গেছে। থমথমে মুখ। অমিতা তার দিকে চেয়ে আছে। মিলন তাদের দু'-হাতের মধ্যে এসে দাঁড়াল।—হেমরাজ মোদী তোমাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে অপমান করল? আমার জন্য?

ভাইপোর মুখের ওপর এবারে আর ঝাঁজ দেখালেন না অনুপমবাবু। শুধু গম্ভীর। সোজা চোখে চোখ রেখে জবাব দিলেন, অপমান করার মতো কাজ করলে অপমান করবে না কেন?

মিলন আরো একটু কাছে এলো। গলার স্বর তারও অবিচল।— তোমাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে কি বলেছে? অপমানই যদি করে থাকে সেই অপমানের জবাবে কিছু অপমান তাহলে তারও পাওনা হবে— তোমার অপমান বরদাস্ত করার ছেলে আমি না সেটা বুঝবে —তার মুখের ওপর আমি রেজিগনেশন ছুঁড়ে দিয়ে আসব—নিজের জোরে অমন চাকরি আমি জোটাতে পারব, সেই যোগ্যতার রাস্তায় তুমিই আমাকে তুলে দিয়েছ—তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো।

শুনে অনুপমবাবু দস্তুরমত বিরক্ত।—তুই চাকরি ছাড়লেই ফুরিয়ে গেল! তোর থেকে সে আমাকে আলাদা করে দেখে?

—ও...। মিলন থমকালো দুই এক মুহূর্ত।—এই জন্যেই বা ভাবনার কি আছে। আমি কালকের মধ্যেই রেজিগনেশন পাঠিয়ে দিচ্ছি আর এ বাড়ি ছেড়েও চলে যাচ্ছি। এই ব্যক্তিগত ব্যাপারে অন্তত ম্যানেজিং ডাইরেক্টর তোমাকে আলাদা করে দেখুক সেটাই আমি চাই, তুমি মিথ্যে কষ্ট পেও না।

শোনামাত্র চোখে মুখে আর্ত বিস্ময় অনুপমবাবুর।—তুই এ-কথা বলতে পারলি? তুই আমাকে ছেড়ে চলে যাবি?

—তোমাকে ছেড়ে যাবার কথা উঠছে কেন? তোমার থেকে বড় আমার চাকরিও না, আমার বিয়েও না। কোম্পানির কোয়ারটার্স-এ থাকছি না এটাই ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বুঝবে, আর আমার কোন দায় যে তোমার নয় সেটাই তার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হবে।...আর তার পরেও সে দেখবে, তার মেয়ে যদি চায়, সে বা অন্য কেউ এ বিয়ে আটকাতে পারছে না। যাক, সে তোমাকে কি অপমান করেছে আমাকে স্পষ্ট করে বলো।

ভাইপোর এই মূর্তি দেখবেন তাও আশা করেননি অনুপমবাবু। আসলে প্রয়োজনে নিজেও তিনি কম স্পষ্টভাষী নন। কথা কাটাকাটির ফলে ব্যাপারটা অন্য দিকে গড়াচ্ছে বুঝেই নিজেকে সংযত করলেন। যদিও রাগের মাথায় ও বলল, কেউই এ বিয়ে আটকাতে পারবে না, তবু হেমরাজের অনুকূলে তাঁর নিজেরও যে স্পষ্ট মতামত কিছু আছে সেটা ওকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

—বোস।

মিলন তাঁর সামনেই চেয়ার টেনে বসল।

মিনতির এক্ষুনি এ আলোচনা পছন্দ হচ্ছিল না। অমিতার ভাবলেশশূন্য ঠাণ্ডা মুখ। এবার ধীর গলায় অনুপমবাবু বললেন, হেমরাজ মোদী আমাকে ডেকে আমার মন বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। অর্থাৎ মালিকের মেয়ে ঘরে আনার লোভ আমারও আছে কি নেই। আমি এর মধ্যে নেই বুঝে যা বলার তোকেই বলেছেন। আমি তা-ও শুনতে চাইনি, তোকে আমি আলাদা করে দেখি না বলে আমার তা-ও অপমানকর মনে হয়েছে।

ভেতর বিগড়েছে মিলনেরও। স্পষ্ট করেই জবাব দিল, তাহলে এবার থেকে আমাকে একটু আলাদা করেই দেখো কাকু, তা না হলে মিথ্যে কষ্ট পাবে—লোকের মুখ আমি বন্ধ করব কি করে? তারা আমার লোভের দিকটা বড় করে দেখলে আমি কেয়ার করি না, কারণ তা সত্যি নয়। শুধু তোমাকে না জড়ালেই হল—মোট কথা, তার মেয়ে সরে না দাঁড়ালে এ বিয়ে হবে।

অনুপমবাবুর গলার স্বর আবার অসহিষ্ণু একটু। বললেন, তুই সরে দাঁড়ালেই সে সরে দাঁড়াবে।

—আমার সরে দাঁড়াবার কোনো কারণ নেই কাকু, আমি জ্ঞানত কোনো অন্যায় করছি না।

গলা আরো চড়ল অনুপমবাবুর।—কিন্তু হেমরাজ নিষেধ করেছেন, ইউ মাস্ট নট্ সি হার এনি মোর—

মিলনের জবাবও তেমনি স্পষ্ট।—তাঁর ইচ্ছেয় দুনিয়াটা চলছে না এটা তাঁর জানার সময় হয়েছে তাহলে।

এই জবাব শুনে অনুপমবাবু ভিতরে ভিতরে আরো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। যদিও তিনি জানেন, ভাইপো তাঁকে অপমান করছে না বা অসম্মান করছে না। একটা বড় প্রত্যাশায় ঘা পড়ছে বলেই ও সেটা না মেনে যুক্তির রাস্তা আঁকড়ে ধরছে। একটু গুম হয়ে থেকে বললেন, হেমরাজের কথা থাক, আমার বিবেচনায় নিজের মেয়ের দিক ভেবে সে একটিও অন্যায় কথা বলেনি। যাক, অনেক বিদ্বান আর বুদ্ধিমান ভাবিস নিজেকে —এবার আমার দুটো কথা কানে যাবে?

অপ্রতিভ মুখে মিলন জবাব দিল, এ-ভাবে বলছ কেন কাকু, আমার কাছে হেমরাজের থেকে তুমি ঢের বড়।

অনুপমবাবুর ভিতরটা একটু কোমল হয়ে আসছিল। কিন্তু তা প্রকাশ করলেন না। উল্টে তেমনি আহত মুখে বললেন, ওটা মুখের কথা, সেটা সত্যি হলে অতটা এগোবার ঢের আগে তোর আমার কাছে আসার কথা, আমাকে বলার কথা। তবু শোন, যেখানে মিশ খাবার কথা নয় সেখানে সে-চেষ্টা করতে গেলে শেষে একটা গাধা বনে ফিরে আসতে হবে। তোর আগেও এমন চেষ্টা অনেকে করেছে—শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছে। সে-রকম ক্ষমতা থাকলে ওদের মতো বড়ও হতে পারিস, নিজে মোদী হয়ে ওদের সঙ্গে মিশে যেতে পারবি না—আর হাজার চেষ্টা করলেও ওই হেমরাজ মোদীর মেয়ে ভেতর থেকে মজুমদার হতে পারবে না। এই জন্যেই আমার এত আপত্তি। ক্ষুব্ধ মুখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন অনুপমবাবু।—যা বললাম একটু ভেবে দ্যাখ্‌গে।

মিলন নিজের ঘরে চলে আসার আধঘণ্টা বাদে অমিতা এসে তার ঘরের পর্দা সরালো। বাইরে থেকে নিস্পৃহ মুখে জিজ্ঞাসা করল, কি রে, ভিতরে আসব না মাথা এখনো গরম?

—আয়। মাথা খুব ঠাণ্ডা।

অমিতা ভিতরে এসে দাঁড়াল। দু' চোখে কৌতুক চিকচিক করছে। ওর দিকে চেয়েই মিলনের মনে হল, ও যেন সমস্ত ব্যাপারটাই বেশ উপভোগ করছে। তার পরেই মনে হল, এই মেয়ের খুশি হবারই কথা। আর সেটা নিজের বাবার ওপর অনেক দিনের জমা রাগের কারণে। কাকুর বিবেচনায় নিজের মেয়ের সঙ্গে সুদর্শন সিং-এর বিয়ে আর ভাইপোর সঙ্গে হেমরাজ মোদীর মেয়ের বিয়ে একই রকমের অবাস্তব। কাকু এটা খুব স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে। আর মিলনকে নিয়ে পরের ব্যাপারটায় কাকুর আরো সংকট কারণ এর সঙ্গে স্বয়ং মনিব যুক্ত। অমিতা ভিতরে ভিতরে মজা পেতেই পারে।

—ভাবলি?

মিলন ফিরে জিজ্ঞাসা করল, কি ভাববো?

—যেখানে মিশ খাবার কথা নয় সেখানে সে-চেষ্টা করে গাধা বনতে রাজি আছিস কিনা—বাবা যে ভেবে দেখতে বলল?

শুধু মজা নয়, মিলনের মনে হল, চাপা ক্রূর আনন্দে ওর মুখখানা গনগন করছে। ও যেন এ-রকম কিছু দেখার জন্যেই দিন গুনছিল। মিলন ঠাণ্ডা সুরেই জবাব দিল, ভাবার কি আছে, কাকুর কথা মানতে হলে যার যার জাত-কাঠের বাইরে কাউকেই আর ঘরে আনা চলে না। বিলেতে কত মেয়ে আর পুরুষ জাত-কাঠ ছেড়ে অন্য দেশের পুরুষ আর মেয়ের সঙ্গে ঘর বেঁধে দিব্বি চালিয়ে যাচ্ছে—এ-তো আমার নিজের চোখে দেখা।

অবিশ্বাসের ঢঙে অমিতা তাকাল ওর দিকে।—বলছিস?

—না বলার কি আছে, তোর বেলায়ও আমি কাকিমাকে বলেছিলাম কাকু কাজটা ভাল করেনি।

—আ-হা, কত বিবেচনার শরীর তোর! অমিতার চোখে মুখে চাপা আনন্দ ঠিকরে পড়ছে।—তা আমাকে ছেড়ে এখন নিজের ভাবনা ভাব।...তুই যতটা জোরের সঙ্গে বাবার সঙ্গে কথা বলে এলি অতটা জোর কি তোর প্রেমিকারও আছে ভাবিস? নাকি এ চিন্তা এখনো মাথায় ঢোকেনি?

মিলন থমকালো একটু। কাকুকে ও যা-ই বলে আসুক, এলার মনের দিকটা সব থেকে আগে ভাবার বিষয় বটে। একটু চুপ করে থেকে বলল, আসলে এলা খুব সিম্পল মেয়ে, বাবার সঙ্গে এ নিয়ে কোন রকম ক্ল্যাশের ব্যাপার দাঁড়িয়ে যেতে পারে ভাবেইনি। ...আর বাবাকে বিশ্বাসও করে খুব, বাবা ওর সঙ্গে কোন রকম ভাঁওতাবাজি করতে পারে এ ওর কল্পনার মধ্যেই নেই—

অমিতা বাধা দিল, তার বাবা ভাঁওতাবাজী করেছে?

চাপা রাগে মিলন জবাব দিল, করেছে নয় কি মেয়েকে বুঝিয়েছে, এতদিন তাকে বলা হয় নি বলে না জেনে সে আর এক পার্টিকে পাকা কথা দিয়ে ফেলেছে, এখন কথার খেলাপ হলে অপমানে তার বাঁচা দায় হবে।

—এলা কি বলেছে?

—বিশ্বাস করেছে। বাবাকে পরামর্শ দিয়েছে, মেয়ের এখন বিয়ে করার ইচ্ছে নেই ওই পার্টিকে এ-কথা জানিয়ে সময় কাটিয়ে দিতে হবে—দরকার হলে, এলা এক বছর দু' বছর চার বছরও অপেক্ষা করবে। অন্য পক্ষ হতাশ হয়ে সরে গেলে তখন এখানেই বিয়ে হবে। তার পাকা মাথার বাবাটি আপাতত তাতেই রাজি হয়েছে—কিন্তু নানা কারণ দেখিয়ে মেয়েকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বা মেলামেশা করতে নিষেধ করে দিয়েছে।

—বাঃ! তারপর? এ-সব তুই কবে জানলি?

—আজই ফোনে।...তারপর আর কি, আমি এলাকে সোজাসুজি বলেছি তার বাবা তাকে ভাঁওতা দিচ্ছে, আসলে এ-রকম বিয়ে সে বরদাস্ত করতে চায় না। আমার কথা শুনে এলা রীতিমত শক্‌ড—প্রথমে বিশ্বাসই করতে চায় না। তারপর বাপের ওপর রেগেছে—শিগ্‌গীরই যেভাবে হোক আমার সঙ্গে দেখা করবে কথা দিয়েছে।

অমিতার চোখ মুখ এমন কি গলা দিয়েও তপ্ত ব্যঙ্গ ঝরল।—ওর সঙ্গে দেখা হলে তবে ফয়েসলা?

মিলন বলল, তার আগে আর কি করে হবে?

অমিতা এগিয়ে গিয়ে খাটের ওপর তার পাশ ঘেঁষে বসল।—তোর বুদ্ধি আর বীরত্ব দেখে তোকে ধরে আগের মতো একটু আদর করতে ইচ্ছে করছে। তার পরেই তপতপে মুখ।—ইডিয়েট কোথাকার, কবে সময় করে বাপকে লুকিয়ে ও আসবে তারপর ফয়েসলা করবি—এত বড় দিল্লি শহরে দেখা করার ব্যবস্থা তুই নিজে করতে পারিস না? এই মুরোদ নিয়ে তুই হেমরাজ মোদীর মেয়েকে বিয়ে করবি? ফয়েসলার কি আছে—নিয়ে যেদিকে চোখ যায় চলে গেলে অ্যাডাল্ট্ মেয়েকে ধরে কেউ কাটবে, না তোকে খুন করবে?

ঝাঁঝের কথাগুলো সবই কানে গেল বটে, কিন্তু এত কাছ থেকে অমিতাকে দেখে কিছু যেন ব্যতিক্রম চোখে পড়ল। যা আগেও হঠাৎ-হঠাৎ চোখে পড়েছে বা মনে হয়েছে। ...অমিতাকে রোজই দেখছে বটে, কিন্তু কত দিনের মধ্যে ভাল করে লক্ষ্য করেনি জানে না। ওর টান ধরা মুখে এখন বেশ পেলবতা এসেছে, তাতেই বেশ ঢলঢল দেখাচ্ছে...ছাঁটা চুল আরো অনেকটা বেড়ে আবার কাঁধ বেয়ে পিঠের আধা-আধি ছড়িয়েছে।

—হাঁ করে আমাকে দেখছিস কি?

পরিস্থিতির গুরুত্ব ভুলে মিলন হেসেই জবাব দিল, অনেক দিন খেয়াল করিনি, তোকে হঠাৎ বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে।

কি কথা থেকে কি কথা। অমিতা আবার ঝাঁঝালো সুরেই বলল, আমাকে সুন্দর দেখালে তোর সমস্যা মিটবে?

—তা মিটবে না। তা বলে তুই যেভাবে মেটাতে চাস সেভাবেই মিটবে না। তুই নিজের সাহস আর বুদ্ধি দিয়ে কি করা উচিত না উচিত ভাবছিস...কিন্তু এলাকে ওর মতো করেই দেখতে হবে। আমার মুখে যা শুনেছে তাতেই প্রচণ্ড নার্ভ টেনশনে ভুগছে —ও কি এ-রকম গোলমেলে অবস্থায় কখনো পড়েছে? কিছু ভাবিস না, ওর মতো মেয়েকে নিয়ে যেভাবে এগনো যায়, মাথা ঠাণ্ডা রেখে সে-ভাবেই এগোব।

যুক্তিটা অমিতা অস্বীকার করতে পারল না।

একটু চিন্তা করে মিলন জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু এরপর আমার আর এখানে থাকা চলে না...কি বলিস?

কিছু না বলে অমিতা ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল শুধু।

মিলন আবার বলল, কাকু কাকিমা খুব দুঃখ পাবে জানি, আমি তাদের ছেলেই। কিন্তু ছেলে হলেও এ পরিস্থিতিতে সরে যাওয়া উচিত।...এখানে থাকলে এরপর আমি যা-ই করব তার আঁচড় কাকুর গায়ে পড়বে, যেটুকু হয়ে গেল তাইতেই প্রেসার চড়েছে মনে হয়। এখান থেকে সরে গেলে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কাকুকে কোন কিছুতে টানবে না—ধরে নেবে কাকুরও অবাধ্য হয়ে আমি কোম্পানির কোয়ারটার্স ছেড়ে চলে গেছি। কি বলিস?

অমিতা একটা পা অল্প অল্প দোলাচ্ছে আর বেশ আয়েস করেই দেখছে ওকে। তক্ষুনি সায় দিল।—আমিও তাই বলি।

সায় পেল বটে। কিন্তু মন থেকে খুশি বা নিশ্চিন্ত হতে পারল না। মিলনের মনে

হল, এও অমিতার নিজের বাবা-মায়ের ওপর অনেক দিনের জমা ক্রোধের ফল। ও এখন ধম্ম দেখছে।

কিন্তু মিলনের মাথায় এখন রাজ্যের চিন্তা। ও সব নিয়ে বেশি ভাবার সময় নেই। উত্তেজিত মুখে ঘরে একবার পায়চারি করে নিয়ে বলল, এখন বীভারস-এ আমি থাকব কি থাকব না সেটা নির্ভর করে রাজা মোদীর ওপর—এলার ব্যাপারটা সে জানে, অনেক সময় তাই নিয়ে ঠাট্টা-তামাশাও করে। এখন সেও যদি কাকু বা হেমরাজ মোদীর মতেই সায় দেয় আর ওকেই দোষী ভাবে তাহলে চাকরি ছাড়তেই হবে।...কিন্তু তাহলে কাকুকে যা বলেছি রাজা মোদীকেও তাই বলে আসব...এলা যদি আমাকে ছাড়তে না চায় তো ওদের কোন দিক থেকেই কিছু সুরাহা হবে না—এ বিয়ে হবে। কালই আমি রাজ-এর সঙ্গে সোজাসুজি কথা বলব।

অমিতা আলতো করে বলে বসল, কাল তাকে তুই পাচ্ছিস কোথায় —সে এখানে আছে?

মিলন একপ্রস্থ ভ্যাবাচাকা খেয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল। কোম্পানির কাজে কাল সন্ধ্যার ফ্লাইটে রাজা মোদী বম্বে চলে গেছে, এই গণ্ডগোলের মধ্যে পড়ে মিলন ভুলেই গেছল। ছ'সাত দিন পরে ফিরবে তা-ও জানে।...রাজ-এর খবর অমিতা কারো থেকে কম রাখে না এ একেবারে স্পষ্ট।

কিন্তু জবাবের অপেক্ষা না রেখেই অমিতা উঠে ঢিমেতালে দরজার দিকে এগলো। বেরুল। চোখের আড়াল হল।

মিলনের দুই ভুরুর মাঝে আপনি ভাঁজ পড়ল একটু।...ওর নিজের স্বার্থের সব থেকে বড় যোগ এখন রাজা মোদীর সঙ্গে। তার মতামত আর বিবেচনার ওপর এখন অনেক কিছু নির্ভর করছে। কিন্তু তা বলে...

উঠে গিয়ে অমিকে আবার ধরে নিয়ে আসবে? এনে ওর মুখখানা ভাল করে দেখবে?

দরজার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েই রইল।

## সাত

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মিলন চুপচাপ বেরিয়ে গেল। দিল্লির মতো জায়গায় পয়সা ফেললে হোটেলে পছন্দমতো একটা ঘর পাওয়া সমস্যা কিছু নয়। কিন্তু হাতে কিছু টাকার জোর এখন থাকা দরকার। চাকরির পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে সেটাই শুধু সমস্যা নয়। এলা যদি এর মধ্যে বাপের অমতে বিয়ে করতে রাজি হয় তাহলে টাকা যে কত লাগবে ঠিক নেই। অত বড়লোকের মেয়েকে মিলন একেবারে সাদামাটাভাবে রাখতে পারবে না। তাহলে এলা শুধু কষ্টই পাবে না, পাঁচজনে পাঁচরকম কথাও বলবে। মিলনের গত সাত আট মাস মাইনের সবটাই বলতে গেলে ব্যাঙ্কে জমেছে। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে কাকিমার সামনে এনে ধরেছিল, কাকুর কাছে আনতে সাহসে কুলোয়নি। কিন্তু কাকিমাও ধমকেই দিয়েছে। বলেছে, ব্যাঙ্কে নিজের নামে জমা করে দে গে যা, ফুটোনি করে ওড়াস না।

ফুটোনির ধাত নয় মিলনের। অমিটা পুরনো মেজাজে থাকলে সিনেমা দেখে বা

রেস্টুরেন্টে খেয়ে কিছু খরচ হতে পারত। তা-ও হয়নি। নিজের অফিসে যাতায়াতের খরচ পর্যন্ত নেই। সখ করে বাজার থেকে কিছু কিনে আনলেও কাকুর ঠাণ্ডা ধমক খেতে হয়। বলে, বাজে খরচ করিস কেন, এটাই টাকা জমানোর সময়। ফলে মাস-মাইনের প্রায় সবটাই জমেছে। তবু দেখেশুনে একটা মাঝারি হোটেলে পছন্দমত ঘর ঠিক করল। বে-হিসেবী খরচের সময় এটা নয়।

বিকেলে এসেও কাকা-কাকিমাকে কিছু বলল না। এক ফাঁকে অমিতাকে শুধু জানাল। কোথায় কোন হোটেলে ঘর ঠিক হয়েছে অমিতা শুনল। তারপর খানিক চেয়ে থেকে বলল, কিন্তু তোর চোখ-মুখের অবস্থা এ-রকম কেন...যাবার আগে কেঁদে-টেঁদে ফেলবি মনে হচ্ছে।

সত্যি খুব বিচ্ছিরি লাগছে মিলনের। ঘর ঠিক করে ফেলার আগে পর্যন্ত এত খারাপ লাগেনি। সেই সঙ্গে ভিতরে একটা আক্রোশ ক্রমাগত ফুলে ফেঁপে উঠছে। আক্রোশ হেমরাজ মোদীর ওপর তো বটেই, আবার কেন যেন কিছুটা অমিতার ওপরেও। ও উসকে না দিলে মিলন এত তড়িঘড়ি কিছু করত না হয়তো। অমিতা ওর ভালো-মন্দ নিয়ে কতটা মাথা ঘামাচ্ছে সন্দেহ আছে। কাকু কাকিমা যত দুঃখ পাবে ওর বোধহয় ততো আনন্দ। নইলে রাজ বম্বে থেকে ফিরে এলে তারপর বাড়ি ছাড়ার পরামর্শ দিত। রাজ এ ব্যাপারে কি বলে আগে শুনে নিতে বলত। মিলনের তাই করা উচিত ছিল কিনা বুঝছে না। স্বাভাবিক হবার চেষ্টায় কাকিমার কাছ থেকে দু'বার করে খাবার চেয়ে খেল, সদা বেরিয়ে গেল লক্ষ্য করে কাকিমাকে দিয়ে তৃতীয় দফা চা করিয়ে খেল। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা যত ঘুরছে বুকের তলার ধুকপুকুনিও ততো বাড়ছে।

সন্ধ্যা পার করে দিয়ে বসার ঘরে এলো। কাকু টিভির খবর দেখছে। কাকিমাও সেখানে বসে। মিলন সোজা এসে প্রথমে কাকুকে প্রণাম করল, তারপর কাকিমাকে। দুজনেই তারা সচকিত।

মিলন এই মুহূর্তে আর কোন আবেগের প্রশ্রয় দিতে রাজি নয়। তবু গলা কাঁপছে একটু।—শোন কাকু, তোমাকে তো বলেছি, আমি তোমাদের ছেলে—ছেলেই থাকব—কিন্তু এখানে থাকব না—অন্তত যত দিন বীভারস-এ চাকরি করছি ততদিন না। বীভারস-এর চাকরি যদি রিজাইন করতে হয় তাহলে সেদিনই আমি তোমাদের কাছে চলে আসব—তখন আর আমার কোন রকম সংকোচ থাকবে না। কিন্তু তার আগে আমার জন্যে তোমার গায়ে এতটুকু আঁচড় পড়ুক আমি চাই না।

অনুপম মজুমদার একটি কথাও বললেন না। আস্তে আস্তে আবার টিভির দিকে চোখ ফেরালেন। কোথায় যাচ্ছে, কখন যাচ্ছে তাও জিজ্ঞেস করলেন না। মিনতি জিজ্ঞাসা করলেন, আজই যেতে হবে?

—হ্যাঁ কাকিমা।

—খেয়ে যাবি তো?

—বাঃ, খেয়ে যাব বইকি!

এবারে কাকিমার চোখও টিভির দিকে। মিলন নিজের ঘরে চলে এলো। কপালে ঘাম। একটা কঠিন কর্তব্য সমাধা হল। এত সহজে সেটা হবে ভাবিনি।...এই মুহূর্তে বুকের ভেতরটা একেবারে শূন্য লাগছে। মনে হল, ও চলে যাবে কাকু-কাকিমাও যেন এ-জন্যে অনেকটা প্রস্তুত ছিল। যাক, তার ভাবার কিছু নেই। জিনিসপত্র গোছগাছ করার

খুব বেশি কিছু নেই। বেডিং-এর ব্যবস্থা হোটেল থেকেই হবে। শুধু ছোট বড় দুটো সুটকেস, একটা অফিস ব্যাগ আর একটা টুকিটাকির কিট ব্যাগ।

খাবার টেবিলে অনুপমবাবু কিছুটা আত্মস্থ। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করলেন। মিলনের খাওয়া শেষ হতে দেখলেন। মিনতি সমস্তক্ষণই নির্বাক। সদাই পরিবেশন করছে, আর কি হল ভেবে না পেয়ে থেকে থেকে সকলকেই দেখছে। অমিতা এখনো খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। খাওয়ার থেকে ও বাবাকে আর মিলনকে বেশি লক্ষ্য করছে।

অনুপমবাবুই প্রথম কথা বললেন। কিছু বলবেন বলেই অপেক্ষা করছিলেন। মিলনের মুখের ওপর দু'চোখ।—তাহলে কাল তুই ফার্স্ট আওয়ারে অফিসে তোর চেঞ্জ অফ অ্যাড্রেস জানিয়ে দিচ্ছিস?

মিলন তাই ঠিক করে রেখেছে। মাথা নেড়ে সায় দিল।

এর পরের কথায় কাকুর ভিতরের উষ্মা চাপা থাকল না। এতটুকু গলা না চড়িয়ে আবার বললেন, হেমরাজ মোদী তাতেই ধরে নেবে বা বিশ্বাস করবে তোর সঙ্গে আর আমার কোন সম্পর্ক থাকল না?

ঈষৎ ক্ষোভের সঙ্গে মিলন জবাব দিল, তা যদি না নেয় তো হেমরাজ মোদীকে বলে দিও ওই ব্যাপার নিয়ে বনিবনা হল না বলে তুমি আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ।

অনুপমবাবুর চাউনি এবারে কঠিন। অসহিষ্ণু দু'চোখ একবার স্ত্রীর মুখ ঘুরে আবার মিলনের দিকে ফিরল।—চাকরিতে আমার এত মায়া ভাবিস যার জন্যে এ-বয়সে তার কাছে আমাকে মিথ্যে কথা বলতে হবে?

মিলন তক্ষুনি সংকুচিত।—মাপ করো কাকু, তাহলে যা সত্যি তাই বলো—তোমার অবাধ্য হয়ে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে গেছি। আর এ-ও বলে দিতে পারো এরপর চাকরিও ছাড়ব কিনা সেটা পরে ভাবব।

অনুপমবাবু উঠলেন। মুখ-হাত ধুয়ে ঘরে চলে গেলেন। একটু বাদে তাঁর ঘরের আলো নিভতে দেখা গেল। অর্থাৎ শুয়ে পড়লেন।

মিলন নিজের ঘরে এসে প্রস্তুত হল। ফোনে একটা ট্যাক্সি আনিয়ে নিল। কাকিমা তখন পর্যন্ত খাবার টেবিলে নিশ্চল বসে। মিলন প্রণাম করতে নিঃশব্দে পিঠে হাত রাখলেন শুধু।

অমিতা বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছিল। মিলন বাইরে আসতে সঙ্গে সঙ্গে বারান্দার সিঁড়ি পর্যন্ত এলো।

মিলন বলল, চলি—

—আয়। অমিতার দুই ঠোঁটে টিপটিপ হাসি।—আমিও একটু আশীর্বাদ করি। সাবালক হ'।

মিলন সোজা তাকালো ওর দিকে। এই প্রথম একটা তির্যক উক্তি বেরিয়ে এলো তার মুখ দিয়েও। বলল, তাতে তোর খুব সুবিধে না-ও হতে পারে–আমার যা-ই হোক না কেন, তোর ভালোর জন্য আর কাকুর মুখ চেয়ে হয়তো আমিই তোর এক-নম্বর শত্রু হয়ে উঠতে পারি।

হনহন করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ট্যাক্সিতে উঠল।

একে একে সাতটা দিন কেটে গেল। মিলন রোজ নিয়মিত অফিসে এসেছে। দরকার মতো সাইটেও ঘোরাঘুরি করেছে। কাকুও ঘড়ি ধরে অফিসে আসছে জানে। কিন্তু সামনাসামনি দেখা হয়নি। কাকু এর মধ্যে একদিনও ওকে ঘরে ডাকেনি। ডাকেনি বলেই স্বস্তি। অমিতাও এ ক'দিনের মধ্যে খোঁজ নেয়নি, বা অফিসেও টেলিফোন করেনি।

সমস্ত কাজের মধ্যে একজনের জন্যেই মিলন মজুমদার উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করেছে। সে রাজা মোদী।

আট দিনের দিন অর্থাৎ পরের সোমবার সে এলো। কিন্তু ভয়ানক ব্যস্ত। তার ঘরে লোকের ভিড়। অধীর প্রতীক্ষার দরুন মিলন কাজে মন দিতে পারছে না। লাঞ্চের পর তাকে নিরিবিলিতে পাবে ভাবল। লাঞ্চের পর তার ঘরের সামনে মুখোমুখি দেখা হল। ওকে দেখে রাজা মোদী থমকে দাঁড়াল।—হ্যালো—নট নাও—আংকল দ্য গ্র্যান্ড তার ঘরে জোর তলব পাঠিয়েছে।

চলে গেল। জোর তলব অনেক কারণেই হতে পারে। এতদিন সে না থাকার দরুন অনেক জরুরি কাজও আটকে থাকতে পারে। আবার মিলনের মনে হল, এই জোর তলবটা পারিবারিক অর্থাৎ ওর আর এলার কারণেও হতে পারে। কিন্তু ওকে দেখেই রাজা মোদী ও-কথা বলল কেন? সে কি বুঝতে পেরেছে মিলন তার প্রতীক্ষাতেই দিন গুনছে?

উদগ্রীব প্রতীক্ষার মধ্যে দিয়ে ঘড়ির কাঁটা ঘুরেই চলল। তার দেখা নেই। দেখা মিলল যখন, তখন বিকেল পাঁচটা কুড়ি। পায়ে পায়ে আবার রাজা মোদীর ঘরের দিকে এগুলো। কিন্তু আধা-আধি যাবার আগেই তাকে হন্তদন্ত হয়ে বড় সাহেবের ঘর থেকে বেরুতে দেখল। চোখোচোখি হতেই রাজা মোদী তড়বড় করে বলে উঠল, সরি মাই ডিয়ার, এতক্ষণ আটকে রেখে আংকল দ্য গ্র্যান্ড আমার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে—এখন আবার বেরুতে হবে, জোর অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, আজ আর তোমাকে এক মিনিটও সময় দিতে পারছি না। নিজের ঘরেও ঢুকল না, লিফট-এর দিকে ধাওয়া করল।

মিলন চুপচাপ দাঁড়িয়ে খানিক।...হেমরাজ মোদী যদি ওর সম্পর্কে তেমন কিছু বলে থাকেন তাহলে রাজ-এর চোখে মুখে কি কিছুই প্রকাশ পেত না? এই ব্যক্তিগত ব্যাপারটা নিয়ে মিলন হেমরাজের আগে ও-ই রাজা মোদীর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। বিলেতে থাকতে এলাই প্রথমে কবে কিভাবে প্রস্তাবটা দিয়েছিল, আর অত বড়লোকের মেয়ে বলে মিলন গোড়ায় কত ভাবে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেছিল সব খোলাখুলি বলার ইচ্ছে। এলার চিঠিপত্রগুলো তাকে দেখানো চলে না, মুখে আভাস দিলেও এলার ভালবাসার গভীরতা বোঝানো যেতে পারত। রাজ-এর মুখ দেখে মনে হল কালও নিরিবিলি সাক্ষাতের সুযোগ পাবে কিনা সন্দেহ।

পরদিন সকাল এগারোটা নাগাদ অফিসে নিজের ঘর থেকে মিলন রাজা মোদীকে ফোন করল। খুব ব্যস্ত না থাকলে একবার আসতে চায়।

ও-দিক থেকে জবাব এলো, খুব ব্যস্ত। ফ্রী হলে আমিই তোমাকে ডেকে নেব—ডোন্ট ওয়ারি।

মিলন কিছুটা হতাশ হয়ে ফোন রেখে দিল। তারপরেই মগজে একটা চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগল।...ডোন্ট ওয়ারি বলল কেন! ওয়ারি করার মতো কিছু ঘটেছে—রাজা মোদী কি তাহলে জানে? মিলনের ছটফটানি বেড়েই গেল।

একটু একটু করে লাঞ্চ টাইম এসে গেল। ডাক এলো না। মিলন ভাবল লাঞ্চের পরে নিরিবিলিতে ডাকবে। কিন্তু লাঞ্চের পরেও ঘড়ি দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে উঠল। সময় কেটেই চলল। আবার ফোন করার জন্য রিসিভার তুলেও ছেড়ে দিল। বিরক্ত না করাই ভালো। বলেছে নিজেই ডাকবে। কিন্তু শেষে মিলন হাল ছেড়ে দিল।

ঠিক পাঁচটা বেজে দু' মিনিটে টেবিলের ফোন বেজে উঠল। সাড়া দিতে ওদিকে রাজা মোদীর গলা।—আমি ঘড়ি ধরে ঠিক তিন মিনিটের মধ্যে নেমে যাচ্ছি,—ইউ গেট ডাউন অ্যান্ড ডোন্ট্ মিস্ মাই কার।

বেশ কয়েক মিনিট হতভম্বের মতো বসে থেকে মিলন হন্তদন্ত হয়ে নিচে নেমে এলো। তার সামনেই লম্বা লম্বা পা ফেলে রাজা মোদী তার বিলিতি গাড়িটার দিকে যাচ্ছে। পিছন থেকে না ডেকে মিলন গাড়ির পাশেই ধরল তাকে। একটু সময় নিয়ে নিরিবিলিতে বসে কথা বলার সুযোগ খুঁজছিল মিলন, তার মধ্যে এ-ভাবে গাড়িতে ডেকে পাঠানোর অর্থ কি ভেবে পেল না।

রাজা মোদী ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখল একবার। কিছু না বলে চাবি লাগিয়ে গাড়ির দরজা খুলল। নিজে স্টিয়ারিং-এ বসে বাঁদিকের দরজা খুলে দিল।—গেট ইন, কুইক।

মিলন ব্যস্তসমস্ত হয়ে পাশের সীটে উঠে বসল। রাজা মোদীর চোখে মুখে হাসি টসটস করছে। মিলনের হঠাৎ মনে হল যা আশা করছিল এটা যেন তার থেকে অনেক ভাল হল।

সামনে গাড়ির ভিড়। হাল্কা শিস দিতে দিতে রাজা মোদী পাশ কাটাচ্ছে। এরই মধ্যে আড়চোখে মিলনকে একবার দেখে নিল। গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করল, ক'রাত ঘুমোওনি?

মিলন সচকিত। এই এক কথা থেকেই বুঝে নিল লোকটার কিছুই অজানা নেই। ...কে বলেছে? ওর জ্যাঠা আংকল দ্য গ্রেট না আব কেউ? যে-ই বলুক, মুখখানা খুশি খুশি—অকরুণ নয় বোঝা যায়। উল্টে মজার কিছু ঘটেছে বলেই ভিতরে ভিতরে উৎফুল্ল যেন।...কে বলে থাকতে পারে? ইচ্ছে না থাকলেও যে মুখ মিলনের সামনে এগিয়ে এলো সেটা অমিতার।...কাল জ্যাঠার ঘর থেকে বেরিয়ে রাজা কোথায় তার 'জোর অ্যাপয়েন্টমেন্ট' রাখতে হন্তদন্ত হয়ে চলে গেছল?

যা ভাবছে সেটা অবাঞ্ছিত আজও। এই লোকের সঙ্গে বাড়ির কোনো মেয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এখনো কাম্য নয়। মনের ভাবনা চেপে রাজা মোদীর কথার জবাবটা বুদ্ধিমানের মতোই দিল। বলল, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে নির্ভাবনায় ঘুমুলেই পারতাম।...সব কানে গেছে তাহলে?

—সব সব। বম্বে বসেই ট্রাংক কল-এ সব খবর পেয়েছি।

মিলন আবার সচকিত।..ট্রাংক কল!...তোমার জ্যাঠার?

—ধীরেসে জনাব—ধীরেসে—দ্যাটস মাই অ্যাফেয়ার—দিল্লি থেকে আমাকে ট্রাংক-কল করার লোকের অভাব নেই—রোজই একটা দুটো করেছি—একটা দুটো ধরেছি। বাট্ ফর ইওর স্যাটিসফ্যাকশন ইওর সুইটহার্ট অ্যান্ড মাই সুইট্ কাজিন এলারও ফ্র্যানটিক টেলিফোন পেয়েছি একদিন। হাতে স্টিয়ারিং, সামনে চোখ, মুখে রহস্য-ঘন হাসি। বলল, রেগে গিয়ে সুইট্ কাজিন নিজের বাপকে ভণ্ড মিথ্যেবাদী পর্যন্ত বলেছে। ফোনে মেয়েটা

কেঁদেই ফেলবে মনে হচ্ছিল। আমি দিল্লি ফিরলেই সব ও-কে হয়ে যাবে বলতে তবে একটু ঠাণ্ডা।

বুকের ওপর থেকে একটা জগদ্দল পাথর সরে যাচ্ছে মিলনের। ভিড় ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পড়েই রাজা মোদী জিজ্ঞেস করল, কোন্ দিকে যাব...আই মিন কোন্ হোটেলে অ্যাপার্টমেন্ট নিয়েছ?

আবারও খাবি খাবার দাখিল মিলনের। বাড়ি ছাড়ার খবরও রাখে তাহলে! অবশ্য অফিসে চেঞ্জ অফ অ্যাড্রেস বাড়ি ছাড়ার পরদিনই জানিয়ে দিয়েছে—কিন্তু এত ব্যস্ততার মধ্যে সেটা এই লোকের চোখে পড়েছে এমন হতে পারে না। ওটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেকশনে পড়ে থাকার কথা। হেমরাজকে কাকু অবশ্যই বলে থাকবে। ফলে আবার সেই একই অস্বস্তি, এ লোককে কে বলেছে?

—আমার ওখানে যাবে?

—না তো কোথায়?

হোটেলের নাম বলল। কিন্তু রাজ ওই সস্তার হোটেলের নামও শোনেনি। চিনতে পারল না। মিলন বলল, চল আমি বলে দিচ্ছি।

পরিস্থিতি অনুকূল সন্দেহ নেই। কিন্তু কার কল্যাণে এত অনুকূল ভেবে পাচ্ছে না। হতে পারে এলাও এর মধ্যে কাকার বাড়ি ছেড়ে আসার খবর জেনেছে। মোদীদের জ্ঞাতিরাও কেউ কেউ জানে। না শোনার কথা নয়। রাজ হয়তো তাদের মুখে শুনেছে। কিন্তু মন থেকে সায় পাচ্ছে না। আবারও অমিতার মুখ এগিয়ে আসছে। কাল যদি দেখা হয়ে থাকে তার কাছে শোনারই কথা। কিন্তু এর মধ্যে অমিতা জড়াক এ সে একটুও চায় না। কাকুর প্রতি তার এটুকু কর্তব্যবোধ আছেই।

জায়গায় এসে গাড়ি থামল। ভুরু কুঁচকে আগে হোটেলের বাইরেটা দেখল রাজা মোদী। পছন্দ হয়নি বোঝাই যায়। নেমে গাড়ি লক্ করল। মিলনের পাশাপাশি দোতলায় তার ঘরে এলো। দরজা খুলে ব্যস্ত মুখে মিলন তাকে ভিতরে নিয়ে এলো। রাস্তার দিকের জানালা দুটো খুলে দিল।

রাজা মোদী বসল। ভুরু কুঁচকে ঘরের চারদিক দেখছে। আর একটা চেয়ার টেনে মিলন তার মুখোমুখি বসল।

—এই তোমার ঘর?

—কেন...খারাপ?

—ওয়ার্থলেস! রাজা মোদীর নিজেরই যেন আত্মসম্মানে ঘা পড়েছে।—কেন, এ-রকম ঘরে থাকার মতো মাইনে পাও তুমি?

একটু সংকোচের মধ্যে পড়ে গিয়ে মিলন জবাব দিতে গেল, তা না...হঠাৎ বড় খরচের মধ্যে পড়ে যেতে পারি ভেবে—

পছন্দের ব্যাপার না হলে রাজা মোদী অল্পতেই অসহিষ্ণু। কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলে উঠল, খরচের মধ্যে পড়লে তার ব্যবস্থা হবে।...তাছাড়া হোটেলেই বা থাকার দরকার কি তোমার? অত ফরেন কোয়ালিফিকেশনের জোরে তুমি শুরু থেকেই সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট এনজিনিয়ার বীভারসের—ইউ মে ইজিলি ক্লেম রেসিডেনসিয়াল কোয়ার্টার্স—সেটা ফার্নিশ করে দেওয়াও কোম্পানির দায়িত্ব। তাছাড়া তোমার কাকার ফুল-টাইম

গাড়ি ছিল বলে এতদিন কথা ওঠেনি—ইউ সুড গেট এ কার ট্যু। সব দাবি করে তুমি কালই লেখো, আমি দেখছি।

মিলনের সব ফাঁড়া কাটার মতো দিন কিনা এটা কে জানে! হাসতে লাগল। বলল, তোমার গাড়িতে ওঠার আগে পর্যন্ত আমার চাকরিটা শেষ পর্যন্ত টিকবে কি টিকবে না তাই ভেবে পাচ্ছিলাম না—

রাজা মোদী সঙ্গে সঙ্গে ধমকের সুরে বলে উঠল, ননসেন্স! তুমি কি কারো পার্সোন্যাল চাকরি করছ নাকি—ইউ আর অ্যান ইম্পর্ট্যান্ট ম্যান অফ দি কম্প্যানি অ্যান্ড ফর দি কম্প্যানি।

শুনে মিলনের পরিতুষ্ট মুখ।—ঠিক আছে, ও সব যখন হয় হবে—আগে কি খাবে বলো?

—সাম স্যান্ডউইচ অ্যান্ড গুড টি।

—টি...?

—কেন, এখানে ভাল চা-ও পাওয়া যায় না নাকি?

—না...বলছিলাম হার্ড ড্রিংক-এর অর্ডার দেব কিনা। বক্তব্য স্পষ্ট করে মিলন বলল, চাও তো স্কচ আছে কিনা খোঁজ নিতে পারি—আর এখানে না থাকলেও আনিয়ে দেওয়া যায় বোধ হয়।

জবাবে মুখের দিকে চেয়ে রাজা মোদী হঠাৎ যেন কৌতুকের খোরাক পেল কিছু। মিটি মিটি হাসতে লাগল। কিন্তু মনের কথা মনে চেপে ফিরে জিগ্যেস করল, তোমার ও-সব চলে?

তেমনি হেসেই মিলন জবাব দিল, চলে বলতে অভ্যেস কিছু নেই, তবে অতিথি বুঝে একটু আধটু নিয়ে কম্প্যানি দিতে আপত্তি নেই।

ঘটা করে ডাইনে বাঁয়ে মাথা দোলাল রাজা মোদী। বড় করে একটা নিশ্বাসও ছাড়ল।—নো মাই ডিয়ার, দোজ্ সুইট ডেজ আর গন।...আমি আজ কত মাসের মধ্যে ড্রিংক করি না খবর রাখ?

মিলন সত্যি অবাক।—ড্রিংক করো না?

—নো! মুখ দেখে মনে হল খুব মজাদার গোপনীয় কোনো ঘটনাই ফাঁস করতে চলেছে। তারপর বেশ রসিয়ে জবাব দিল, একজন মহিলার সঙ্গে শর্ত হয়েছিল আমি মদ খাওয়া ছাড়লে সে সিগারেট খাওয়া ছাড়বে। সো বোথ অফ আস আর টিটো নাও। হাসি উপচে উঠছে, সামনে ঝুঁকল একটু।—গেট মি?

ভিতরে ভিতরে মিলন বড়-সড় ধাক্কাই খেয়ে উঠল একপ্রস্থ। সেটুকু গোপন করার তাগিদে তাড়াতাড়ি উঠে রুম সার্ভিসকে ডেকে দুজনের স্যান্ডউইচ আর চায়ের অর্ডার দিয়ে ফিরে এলো।

কিন্তু এই লোকের চোখকে ফাঁকি দেওয়াও খুব সহজ নয়। রাজা মোদী তখনো মিটিমিটি হাসছে। বলল, শুনেই তুমি অমন ধড়ফড় করে উঠলে কেন—অথচ তোমার কাজিন যে তোমাকে কত ভালবাসে আর তোমার জন্য কত পারটার্বড তা বোধ হয় জানোই না।

তার সমস্যার মধ্যে এই প্রসঙ্গ এভাবে এসে পড়ল বলে মিলন আরো বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেল। রাজা মোদীর চোখে হাসি চিকচিক করছে। তেমনি রসিয়ে বলল, অ্যাজ

পার আওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট বম্বে থেকে সময় ধরে তোমার কাজিনকে ক্লাবে আমিই টেলিফোন করেছিলাম—তোমার খবরটা প্রথমে সে-ই আমাকে দিয়েছে। আর কাল সন্ধ্যায় তো তোমার জন্যে তাকে দারুণ ওয়ারিড দেখলাম—অফ কোর্স আই অ্যাসিয়োর্ড হার অ্যাবাউট ইউ। মুখের দিকে চেয়ে রাজা মোদী ভুরু কোঁচকালো হঠাৎ।—ইউ লুক এমব্যারাসড়...হোয়াই?

মিলন একটু সময় নিয়ে আস্তে আস্তে জবাব দিল, আমার কাজিনের ওখানে তার বাবা বলে একজন জাঁদরেল কনজারভেটিভ লোক আছে সেটা তুমি ভালই জানো নিশ্চয়?

—সো হোয়াট? হোয়াট ডু আই কেয়ার সো লং সী অ্যাজন্ট? রাজা মোদী রাগতে গিয়েও হেসে উঠল।—যাক, আমার কেস এখনো সাত হাত জলের তলায়, লেডিজ্ আর অলওয়েজ আনপ্রেডিকটেবল—আমি ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে চলেছি—ডোন্ট্ মেনশন মি আনলেস সী ডাজ। ইউ আর মাই গুড ফ্রেন্ড তাই বলার লোভ সামলাতে পারলাম না।

বেয়ারা চায়ের ট্রে আর স্যান্ডউইচ দিয়ে গেল। একটা স্যান্ডউইচ তুলে নিয়ে রাজা মোদী নিজের প্রসঙ্গ বাতিল করে অন্য কথায় এলো।—অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, নাউ হোয়াটস ইওর প্রবলেম—আংকল দ্য গ্র্যান্ড তোমার সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি নয়, এই তো?

মিলন বলল, তোমার গোড়া থেকে একটু জানা দরকার...দ্বিতীয় বার বিলেত গিয়ে এলা নিজে প্রথমে—

বাধা পড়ল।—অ্যাভয়েড প্রিলিমিনারিজ, এলার যে পোজিশন তাতে সে এগিয়ে না এলে তুমি তার নাগাল পেতে পারো না—দ্যাট ইজ কোয়াইট আন্ডারস্টুড—আই নো সী ইজ কমিটেড টু ইউ—দেন্ হোয়াট? আংকল দ্য গ্র্যান্ড রাজি না হলে সে কি করবে?

—এলা তার বাবাকে বলতে তিনি কি বলেছেন আর তারপর আমার কাকাকে ডেকে কি বলেছেন শুনেছ?

—এভরিথিং এভরিথিং। তাহলে তুমি শোন, আমি বলি। রাজা মোদীর দু'চোখ হাসিতে টসটস করছে।—আমি দু-জন লেডির কাছে তোমার ব্যাপারে প্রমিস-বাউন্ড —দ্যাট আই উইল ট্রাই আটমোস্ট টু সেটল থিংস—ইউ নো হু আর দে।—তাই কাল এসেই আমি আমার আংকল দ্য গ্র্যান্ডকে এক ডোজ দিয়েছি, আর আজ এসে তার থেকেও স্টীফ আর এক ডোজ দিয়েছি, আই অ্যাম এ টাফ ফাইটার, ইউ নো!

—উনি রাজি হয়েছেন?

—নোপ্! হি রাদার ফ্লেয়ারড আপ—বাট্ ডোন্ট বদার, আই হ্যাভ গিভন্ হিম এ বিট্ অফ মাই মাইন্ড, সো-লং ইউ ট্যু আর উইলিং, নো ওয়ার্লডি ক্যান্ স্টপ ইট। এলার সঙ্গে এর মধ্যে আমি সেভাবে কথা বলার সময় করে উঠতে পারিনি—তোমার সঙ্গে পাকা কথা-বার্তা হয়েছে তো?

একটু চুপ করে থেকে মিলন জবাব দিল, সেই তুমি যেদিন বম্বে গেছলে তার পর দিন ফোনে কথা হয়েছিল। বলল, ওর বাবা ওকে আমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

এই একই কথা শুনে অমিতা ওকে ইডিয়েট বলেছিল। রাজা মোদীও প্রায় সেই গোছের বিরক্ত।—হাউ অ্যাবসার্ড! নিষেধ করেছে বলে এতগুলো দিন তোমরা এমনি

কাটিয়ে দিলে! অলরাইট, আমি অ্যারেঞ্জ করছি—টুমরো ইউ উইল নো হোয়েন অ্যান্ড হোয়্যার টু মিট হার—এও আবার তোমাদের কাছে একটা প্রবলেম!

দেড়খানা স্যান্ডউইচ খেয়ে আর চায়ের পেয়ালা শেষ করে ঘড়ির দিকে চেয়েই রাজা মোদী চটপট উঠে পড়ল। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। যাবার তাড়া দেখে মিলনের মনে হল আজও তার কোনো জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। কার সঙ্গে সেটা আঁচ করা যাচ্ছে। মিলনের একটুও ভালো লাগছে না।

পরদিন। অফিসে বসে বেলা প্রায় তিনটের সময় মিলন প্রথমে কাকার টেলিফোন পেল।—একবার আসবি?

—এক্ষুনি যাচ্ছি কাকু।

এ ক-দিনের মধ্যে এই প্রথম ডাক। একটা চাপা অস্বস্তি নিয়ে এলো। ঘরে আর তৃতীয় কেউ নেই। কাকুর মুখ থমথমে।

—বোস্।

মিলন তার মুখোমুখি বসল। ভিতরে উৎকণ্ঠা। মুখের দিকে চেয়েই মনে হয়েছে কাকুর ব্লাডপ্রেসার চড়েছে।

এ ক'দিন কেমন ছিল না ছিল অনুপম মজুমদার একবারও সে খোঁজ নিলেন না। চোখে চোখ রেখে বললেন, রাজা তার জ্যাঠাকে প্রায় আলটিমেটাম দিয়েছে যে দুজনেই যখন চায় এ বিয়ে দিতে হবে। আজও বলেছে। কিন্তু হেমরাজ মোদীকে এতটুকু টলাতে পারেনি। যাক, সে তাদের ব্যাপার আর তোদের ব্যাপার। কিন্তু হেমরাজ মোদী আজও আমাকে তাঁর ঘরে ডেকেছিলেন, সেইজন্যেই তোকে আসতে বলেছি। ক্ষোভে আর একটা চাপা যন্ত্রণায় কাকুর গলার স্বর টনটন করছে।

মিলন উৎকর্ণ।

—হেমরাজ তাঁর ভাইপোকে নিজের আপত্তির সঙ্গে সঙ্গে আমার কথাও বলেছিলেন...বলেছিলেন আমিও তাঁর মতই কনজারভেটিভ এবং এ বিয়েতে আমারও আপত্তি আছে। তার জবাবে রাজা মোদী জ্যাঠাকে দাবড়ানি দিয়ে বলেছে, মজুমদারবাবুর সংস্কার তাকে হার্টলেস করেছে—হি হ্যাড বিন ক্রুয়েল টু হিজ ওউন ডটার অ্যান্ড স্পয়েলড হার লাইফ। থমথমে চাউনি মিলনের মুখের ওপর আটকে আছে।—আমার এই হার্টলেস ক্রুয়েল চরিত্রটাও তাহলে রাজা মোদীকে তোর জানানো দরকার হয়েছিল?

মিলন স্তব্ধ খানিকক্ষণ। তারপর খুব স্পষ্ট করেই জবাব দিল, আমি রাজা মোদীকে এ-কথা বলিনি।

রাগে দুঃখে হয়তো বা বিতৃষ্ণায়ও অনুপমবাবুর মুখ আরো লাল।—তুই বলিসনি, তাহলে ধরে নিতে হবে আমিই বলেছি? ঠিক আছে, যা...

বিশ্বাস করল না জানা কথাই। একটা প্রচণ্ড যন্ত্রণা নিয়ে মিলন নিজের ঘরে চলে এলো। অমিতার নামটা ঠোঁট পর্যন্ত এসেছিল, কিন্তু উচ্চারণ করতে পারেনি। পারেনি বলে নিজের ওপরেই ক্ষোভ। অমিতার ভালোর জন্যেই পারা উচিত ছিল।

ছুটির খানিক আগে আবার টেলিফোন। একজন অপরিচিতের গলা। মিলন মজুমদার কিনা জেনে নিয়ে একটু ধরতে বলল।

—মিলন?

—হ্যাঁ—এলা।

ওদিক থেকে এলার ফিসফিস চাপা গলা।—শোন, বেশি কথা বলার সময় নেই, ড্যাডি দিনে তিনবার করে ফোন করছে আমাকে—বিকেল ঠিক ছ'টায় কোথায় আমার সঙ্গে দেখা হবে শুনে নাও।

একটা পরিচিত জায়গাই বলে দিল। যেখানে দুজনের আগেও দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে, তার পরেই রিসিভার নামিয়ে রাখল। এদিক থেকে কিছু শোনার আগেই এভাবে ফোন রাখার অর্থ না বোঝার কারণ নেই।

মিলন ঠিক সময় সেখানে উপস্থিত। এলা এলো। দেখা হল। কথাও হল।

ভয়ে আর উত্তেজনায় দশ মিনিটও ওর সঙ্গে থাকল না। আর তার পর থেকেই রাজ্যের অশান্তি আর ছটফটানি মিলনের। ও যেন এক বিষম অনিশ্চয়তার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। খেতে পারছে না, ঘুমোতে পারছে না, দু'দিন যাবৎ অফিসের কাজেও মন দিতে পারছে না। চিন্তা করে কোন কূল-কিনারা পাচ্ছে না বলেই আরও অনিশ্চয়তার গভীরে ডুবে যাচ্ছে।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পর হোটেলে ফিরল। মাথাটা আজও ফেটে যাচ্ছে। সামনে চোখ যেতেই দেখে অমিতা লবির একটা চেয়ারে বসে। মিলনকে দেখে ভুরু কুঁচকে উঠে দাঁড়াল।

মিলন অকূল পাথার থেকে ভেসে ওঠার মতই একটা অবলম্বন পেল। এই মুহূর্তে ওর থেকে বেশি কাম্য আর বোধ হয় কেউ না।

কাছে এসে রাগত সুরে অমিতা গলা খাটো করে বলল, একটা অসভ্য জায়গা, হাঁ করে সব গিলছে তো গিলছেই—তুই এত অফিস করছিস, প্রেম করা শেষ হয়ে গেল নাকি?

মিলন ওর হাত ধরল। বলল, জায়গার আর দোষ কি। আশ্চর্য, নিজের রসিকতায় একটু হাসতেও পারল।—আগে ঘরে চল্।

অমিতা হাত ছাড়িয়ে নিল। তেমনি চাপা রাগের সুরে বলল, থাক, এতগুলো শকুনির চোখের সামনে আর হাত ধরে নিয়ে যেতে হবে না! দিল্লী শহরে এর থেকে ভালো হোটেল আর খুঁজে পেলি না!

অমিতাকে নিজের ঘরে এনে দরজা দুটো আবার ভেজিয়ে দিল। আলো জ্বালাই ছিল, জানালা দুটো খুলে দিল। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝলক ভালো লাগল। কান মাথা সব গরম হয়ে আছে। ওকে বসতে বলে কোটটা খুলে খাটের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বাথরুমে ঢুকে বেশ করে মুখে কানে মাথায় জল চাপড়ে দিল। তিন দিন ধরে রাতেও দুই একবার এমনি জল চাপড়াতে হচ্ছে।

মুখ মুছে একটু ঠাণ্ডা হয়ে অমিতার সামনে বসল।—কি খাবি?

—কিছু না।

—কিচ্ছু না?

—তুই যা খাবি খা, আমি কিছু না। রাতে ক্লাবে ডিনার আছে।

শোনা মাত্র মিলনের যে অনুভূতিটা বড় হয়ে উঠল সেটা রাগ। রাগ এই অমিতার

ওপরেই। সেদিন অফিসে কাকুর কথা মনে পড়ে গেল। কাকু তাকে মিথ্যেবাদী ভেবেছে, যতদূর হীন ভাবা যায় ভেবেছে। ওর সামনে চেয়ারটা আরো টেনে নিয়ে বসল।—তোর জন্যে কাকুর কাছে আমি কত নিচে নেমে গেছি তার ঠিক নেই।

—আমার জন্যে! সে-কি রে! তোর ব্যাপারের মধ্যে আবার আমি এসে ঢুকলাম কি করে?

মিলনের মেজাজ সত্যি তিরিক্ষি আবার।—কাকুরও আমাদের ব্যাপারটায় আপত্তি আছে শুনে রাজা হেমরাজ মোদীকে দাবড়ানি দিয়ে বলেছে, মজুমদারবাবুর সংস্কার তাকে হার্টলেস করেছে—হি হ্যাড বিন ক্রুয়েল টু হিজ ওউন ডটার অ্যান্ড স্পয়েলড হার লাইফ। ...অফিসে কাকু সেদিন আমাকে তার ঘরে ডেকে বলল, তার এই হার্টলেস ক্রুয়েল চরিত্রটাও তাহলে রাজা মোদীকে জানানো আমার দরকার হয়েছিল। আমি কিছুই বলিনি বলতেও বিশ্বাস করল না—কাকুর চোখে সেদিন আমি শুধু ঘৃণাই দেখেছি।

অমিতা থতমত খেল একটু। তারপর রাগের সুরেই বলে উঠল, আমার জীবন স্পয়েলড হয়েছে এ কথা আমি কক্ষনো কাউকে বলিনি। ক্লাবের কারো মুখে শুনে নিজেরই ওই রকম ধারণা হয়েছে, সুদর্শন বলে থাকতে পারে—সে-ও ওই ক্লাবের মেম্বার ছিল—দাঁড়া, সবেতে বেশি বেশি মাতব্বরি বার করছি! রাগের মুখেই হাসি আবার।—তুই এখনও আমাকে এত ভালবাসিস নাকি রে—অ্যাঁ? বাবা এমন কথা বলল আর আমার জন্যে তুই তা-ও হজম করে গেলি!...দাঁড়া, তোব জন্যে কি করা যায় দেখি—

—আমার জন্যে দয়া করে আর কিছু করতে হবে না—দয়া করে নিজের পায়ে কুড়ুলটি দিস না!

—কুড়ুল! অমিতা দু'চোখ বড় বড় করে ফেলল।

হ্যাঁ, এই অমিতা ইচ্ছে করলেই আবার আগের মতো হতে পারে। মিলন দেখছে। হতে পারে কেন, হচ্ছেই।

অমিতা তেমনি হেসে হেসে বলল, যাক, নিজের ভাবনায় তোর পিঠ তো বেঁকে আছে দেখছি, আর আমার ভাবনা নিয়ে মাথা গরম করিস না, নিজের ভাবনা আমি নিজেই ভাবতে পারব। কি খবর বল্, এলা এসেছিল?

এবারে মিলনের খেয়াল হল, নিজের মাথায় সমস্যার বোঝা নিয়ে সত্যি বাজে সময় নষ্ট করছে। মাথা নাড়ল। বলল, এসেছিল। আর তারপর থেকে আমি খাবি খাচ্ছি। আজ তোকে দেখে বাঁচলাম।

—কি ব্যাপার...খারাপ খবর নাকি কিছু?

—খুব ভাল খবর। আর সেই জন্যই আমার এত চিন্তা।

—আঃ, খুলে বল্ না? এলা এসে কি করল—কি বলল।

—ভাঁওতাবাজী করেছে বলে নিজের বাপের ওপর খুব রাগ করল। বলল, বিয়ে কে ঠেকায় দেখবে। কিন্তু বাবা যখন এমন করছে তার কাছ থেকে এক পয়সাও নেবে না—আর আমাকেও এখানকার চাকরি এক্ষুনি ছাড়তে হবে। তার রাজ্ ভাইয়া এটা চায় না, তবু আমার এখানে চাকরি করা ও বরদাস্ত করবে না।

—তোকে নিয়ে কোথাও চলে যাবে বলছে?

—তাহলেও তো বুঝতাম। মিলনের জবাবে এবারে স্পষ্ট হতাশা।—লন্ডনে বা বাইরে আর কোথাও চলে গেলে ওকে ভালো রাখার মতো একটা চাকরিও যোগাড় করা যেত। কিন্তু এলা দিল্লী থেকে এক পা-ও নড়বে না। বাবার চোখের ওপর থাকবে। আমাকে বিয়ে করে তাকে আক্কেল দেবে। দেখবে বাবা কত গোঁ ধরে থাকতে পারে। আমাকে বলল, যত শিগগীর সম্ভব রেজিস্ট্রি অফিসে নোটিস দিতে—তারপর অশোকায় খুব ভালো দেখে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করতে।

শেষটুকু শুনে অমিতা হাঁ।—অশোকায় ভাল দেখে অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া! তোর এ মাইনেয় কুলোবে কি করে?

অসহায় সুরে মিলন বলল, তাহলে বোঝ সে কোন্ বাস্তবের ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়ায়—বাপের থেকে এক পয়সা নেবে না, আমাকে চাকরি ছাড়তে হবে—তারপর কিনা অশোকায় অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিতে হবে! আমার তিন হাজার টাকা মাইনেতেও যে সাত দিন অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে অশোকায় থাকা যায় না এ জ্ঞানটুকুও নেই!

অমিতা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল খানিক। তারপর হেসে উঠল। ফুলে ফুলে হাসতেই থাকল। শেষে মিলনের বিষণ্ণ মুখ দেখে হাসি সামলে রুমালে মুখ মুছে বলল, তোর সমস্যা বুঝেছি—

—এই শেষ নয়, আরো আছে শোন্। বাবার ওপর তো এত রাগ, কিন্তু রাজ ভাইয়ার ওপরেও এখন তার দারুণ রাগ। সে কোন্ সাহসে তার বাবাকে মুখের ওপর অমন যা-তা বলে, বাবার গোঁ একটু বেশি, তা বলে সে কত ভাল লোক রাজ ভাইয়া তা কি জানে না! বাবা যেদিন রাজের সঙ্গে যাচ্ছেতাই কথা কাটাকাটি করে বাড়ি ফিরল সেদিন তার মুখ দেখে এলার নাকি কান্নাই পাচ্ছিল। বিয়ে নিয়ে বাবার সঙ্গে ওর ঝগড়া হতে পারে কিন্তু বাবাকে ও কারো থেকে কম ভালবাসে নাকি? তাছাড়া বাবা যে ভাঁওতাই দিয়েছে তাই বা এত জোর দিয়ে বলা যায় কি করে, মেয়ে বড় হয়েছে—কথা তো কাউকে দিয়ে থাকতেও পারে—নইলে মেয়ের যত দিন খুশি অপেক্ষা করতে রাজি হল কেন? যে রাজ্ ভাইয়া বাবার মতো মানুষকেও অত কষ্ট দিতে পারে তাকেই বা বিশ্বাস করা যায় কি করে! বলতে বলতে কান্না পাওয়ার দাখিল মিলনের।—তাহলে বল, কার ভরসায় আমি কিসের মধ্যে গিয়ে পড়ছি।

অমিতা এবারে আর হাসল না। চুপচাপ লক্ষ্য করল খানিক। জিগ্যেস করল, ঘাবড়ে গেছিস না প্রেমও চটে গেছে?

—প্রেম চটবে কেন! ঘাবড়েছি। নইলে ও এত সহজ এত সরল যে উল্টে আরো ভাল লেগেছে। কিন্তু ভিতরটা যার এই রকম তাকে সামলাবার মতো মুরোদ কোথায় আমার? আর বাপের অমতে এমন মেয়ের বিয়ে হবেই বা কি করে? দু'দিন না যেতে হয়তো ওই বাপের জন্যেই কান্নাকাটি শুরু করে দেবে—তখন আমি কোন দিক সামলাবো!

খানিক চুপ করে থেকে অমিতা জবাব দিল, এই যখন ব্যাপার, বিয়ে তখন বাপের মতেই হবে।

—ঐ বাপ মত দেবে?

অমিতার ভিতরে যেন কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, সোজা পথে মত না দিক, বাঁকা পথে দেবে। অমিতার মুখখানা এখন কঠিনই একটু।—ভাবিস

না, ফয়েসলায় যে নেমেছে সে-ও খুব সহজ লোক নয়।

সঙ্গে সঙ্গে সেদিন রাজা মোদীর কথা ক'টা মনে পড়ল মিলনের। রাজ বলেছিল, আমি দুজন লেডির কাছে তোমার ব্যাপারে প্রমিসবাউন্ড দ্যাট আই উইল ট্রাই আটমোস্ট টু সেটল থিংস...আই অ্যাম এ টাফ ফাইটার, ইউ নো!...সেই দুজন মহিলার একজন এলা, আর একজন অমিতা।

অমিতা উঠে পড়ল। এই মুখ দেখে মিলনের মনে হল, আজই রাজা মোদীর সঙ্গে এই প্রসঙ্গে তার কথা হবে। ওর কথা শুনে স্বস্তি বোধ করছে একটু। বেশ জোর দিয়েই বলেছে, তাহলে বাপের মতেই ওদের বিয়ে হবে—সোজা পথে না হয় বাঁকা পথে হবে।

অমিতাকে নিচে নামিয়ে দিয়ে ফিরে এলো। অন্য দিনের তুলনায় একটু হালকা লাগছে বটে, কিন্তু মাথা থেকে দুশ্চিন্তা যাচ্ছে না।...এলার মতো মেয়েকে পেতে হলে তার বাবার ওই বিশাল বিত্তের গণ্ডীর মধ্যে ঢুকেই পেতে হবে—এই রূঢ় বাস্তবটা নিজের চোখে ধরা পড়ছে বলেই হয়তো দুশ্চিন্তার কারণ। আর অমিতা নিশ্চিত প্রত্যয়ে যা বলে গেল, অর্থাৎ সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথটা কি ভেবে পাচ্ছে না বলেও হতে পারে।

আবার দুই কারণেই হতে পারে।

পরের দু'দিনের মধ্যে সকলের সব ভাবনা-চিন্তা অন্য দিকে ঘুরে গেল। পরদিন দেখা গেল ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হেমরাজ মোদী অফিসে অনুপস্থিত। তার পরদিনও তাই। এটা নতুন কিছু নয়, ভদ্রলোক হঠাৎ-হঠাৎ টুর প্রোগ্রাম করেন। কোথায় যাচ্ছেন বা ক'দিনের জন্য যাচ্ছেন তাঁর পার্সোন্যাল স্টাফ জানে আর কিশোরীলাল মারা যাবার পর শুধু রাজা মোদী জানে। মিলন এ-সম্পর্কে খোঁজ নেবার কোন প্রয়োজনবোধ করেনি। শুধু আশা করেছে, বাপের অনুপস্থিতিতে এলার ফোন পাবে, কোথাও দেখা করার তাগিদ আসবে। দুজনের পরামর্শ করার এই সুযোগ এলা নিশ্চয় ছাড়বে না। কিন্তু দ্বিতীয় দিনেও তার ফোন না পাওয়াতে ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল।

তৃতীয় দিন সকালের দিকে রাজা মোদী দরজা ঠেলে তার অফিস ঘরে ঢুকল। বসল না। একটা পা চেয়ারে তুলে দিয়ে একটু আয়েস করে দাঁড়াল। মিলনের মুখখানা ভালো করে দেখাটাই যেন আসার উপলক্ষ।

—খবর রাখ কিছু?

মিলন উদ্‌গ্রীব।—কি খবর?

—আংকল দ্য গ্র্যান্ড গুজরাট গেছে। আমাকে কিছু বলে যায়নি। সঙ্গে আন্টি গেছে আর এলা গেছে। বাড়িতে ফোন করেছিলাম। কবে পর্যন্ত ফিরবে কেউ বলতে পারে না। দশ মিনিট আগে আমার কাকা পুষ্করমল অফিসে এসে তার চিঠি পেয়েছে। ডাকে নয়, গুজরাট থেকে মেসেঞ্জারের হাত দিয়ে পাঠিয়েছে। লিখেছে খুব ক্লান্ত, কিছুদিন এখন তার বিশ্রাম দরকার। কবে পর্যন্ত ফিরবে ঠিক নেই। তাই যে ক'দিন থাকবে না, সব দেখাশুনার ভার যেন সে নেয়, আর ভ্রাতিদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করে। বিশেষ প্রয়োজন হলে তাকে যেন ট্রাংক কলে জানানো হয়।...ক্যান ইউ গেস এনিথিং?

রাজা মোদীর ঠোঁটের ফাঁকে হাসি। ধারালো চাউনি। মিলনের চোখে চোখ। ঝাঁঝালো গলায় বলল, খুব ঘাবড়ে গেলে যে—গুজরাট কি অনেক দূর নাকি! হাসছে।—আংকল দ্য গ্র্যান্ড মাঝে মাঝে বড় ছেলেমানুষের মতো কাজ করে—তিন দিনের জন্যেও কোথাও

যেতে হলে আমাকে সব কাজের ভার দেয়, বুঝিয়ে যায় কি করতে হবে না হবে— এবারে ভাইয়ের হাতে ভার দিয়েছে। কিন্তু লম্বা ছুটি নেবার কথা সেই ভাইকেও আগে থাকতে কিছু বলে গেল না। ইজ্‌ন্ট্‌ দ্যাট্‌ ওয়াণ্ডারফুল?

হাসতে হাসতে চলে গেল। কিন্তু রাজের এই চেহারা মিলন এতদিনের মধ্যে দেখেনি। তার মুখের ওই হাসি মজা পাওয়ার হাসি আদৌ নয়। সে-ও এরপর আর চুপ করে বসে থাকবে না মিলন যেন তা খুব স্পষ্ট অনুভব করছে।...পুষ্করমল আর যাই হোক দাপটের মানুষ নন। নিজের যেটুকু দায়িত্ব তাই পালন করতে পিঠ বেঁকে যায়। তাঁর ভরসা রাজ্‌ আর নিজের দুই ছেলে। ছেলে দুটোও রাজের অনুগত। অন্যান্য জ্ঞাতিরাও তাই। এখানে কাজে লাগার শুরুতেই যে চাপা অশান্তির আভাস কাকু মিলনকে দিয়েছিল তা এদের নিয়েই। ভিতরে ভিতরে এরা কেউ আর হেমরাজ মোদীর প্রভুত্ব চায় না। রাজা মোদী হাল ধরুক তাই চায়। কাকুর অবশ্য ধারণা, তাতে সকলের স্বাধীনতা যেমন বাড়বে লুটেপুটে খাবারও তেমনি সুবিধে হবে। আর এতদিন দেখেশুনে মিলনের ধারণা, রাজা মোদী আঙুল নাড়লেই বীভারস-এর সে বিশিষ্টতম মানুষ হয়ে বসতে পারে। নাড়েনি বলেই যেমন চলার চলছে। কিন্তু এবারে হেমরাজ যে-রাস্তায় চলা শুরু করলেন তার ফল কোন্‌ দিকে গড়াবে?

ক্লান্তি-টান্তি মিলনও বিশ্বাস করেনি। আপাতত মেয়ে নিয়ে সরে গেলেন।...এবং এটা এত আকস্মিক যে এলা তাকে একটা খবর দেবারও ফুরসৎ পায়নি। হয়তো ট্রেনে চাপার আগে পর্যন্ত ও জানতে পারেনি কোথায় কত দিনের জন্যে যাচ্ছে। কেন যাচ্ছে তা পরেও বুঝেছে কিনা সন্দেহ। একটা দুর্জয় ক্রোধে মিলন বহুক্ষণ স্তব্ধ।...রাজ বলে গেল, গুজরাট কি অনেক দূর নাকি...কিন্তু মিলন যদি এলাকে চিনে থাকে—গুজরাট তাহলে খুব কাছেও নয় আর। এলার মধ্যে শঠতাও নেই প্রবঞ্চনাও নেই। সে যা সে তা-ই। অবকাশ পেলে, আর সকলের চোখের আড়ালে নিয়ে গেলে, ওই বাপের তার মনের ওপর দখল নিতে খুব বেগ পেতে হবে না। দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলতে পারলে হয়েই গেল। মিলন অনেক ভেবেছে। ভালবাসার যে দাগ একটা ছেলে বা একটা মেয়েকে মরিয়া করে তুলতে পারে—সেই দাগ এলার মনের ওপর পড়েনি। হয়তো হেমরাজের ধারণাই ঠিক...মেয়ে যা করেছে বা করতে চেয়েছে সেটা মোহ। তার বেশি কিছু নয়।

মিলন মজুমদার রাগে ফুঁসছে, কারণ [illegible]লের চোখে ও হাসির পাত্র কৌতুকের পাত্র ব্যঙ্গের পাত্র হয়ে উঠবে ভাবছে।

একটা দুটো করে দিন কাটতে লাগল। মিলনের বার বার ইচ্ছে করছে, এখানকার চাকরি ছেড়ে-ছুড়ে অন্য কোথাও চলে যায়। কিন্তু সেটাও কাপুরুষের পালানোর মতো হাস্যকর ঠেকবে সকলের চোখে। বিশেষ করে রাজা মোদীর চোখে, কাকু কাকিমার চোখে, অমিতার চোখে। তা ছাড়া এলার সম্পর্কে সব ফয়েসলা হয়ে গেছে—এই বা ধরে নেয় কি করে! প্রতিটা দিনের প্রতিটা মুহূর্ত দুর্বহ হয়ে উঠছে তার কাছে।

দিন পনেরো বাদে হঠাৎ একদিন রাজা মোদীকে ডুব দিতে দেখল। চার পাঁচ দিনের জন্য নিপাত্তা। মিলন খোঁজ নিলে হয়তো জানতে পারত, কোথায় গেল। অনুপস্থিতিটা অফিসের কাজে না অন্য কোন কারণে, খোঁজ নিল না। অফিসের কাজে কোথাও গিয়ে

থাকলে সে নিজেই ওকে বলে যেত। খবর না নেবার আরো কারণ, আপাতত সে সকলের চোখের আড়ালে থাকতে চায়। অফিস থেকে বেরিয়ে অনির্দিষ্টের মত ঘোরাঘুরি করে একটু রাত করে হোটেলে ফেরে। অমিতা যদি আসে ফিরে যাবে। তার অনুকম্পাও কাম্য নয়।

পাঁচ দিন বাদে রাজা মোদীর আবার ওর অফিস ঘরে পদার্পণ। তার উধাও হবার মতো এ আসাটাও আকস্মিক। মিলনের বুকের তলায় কিসের দাপাদাপি শুরু হয়েছে। রাজ্ হাসছে মিটিমিটি।—সেদিন তোমার হোটেলে আমি বলেছিলাম সো-লং ইউ ট্যু আর উইলিং নো ওয়ার্লড্ ক্যান স্টপ্ ইট।...কিন্তু একজন যদি ভ্যাসিলেট করে, ভাবে, তার ভুলও হয়ে থাকতে পারে—দেন্ হোয়াট্?

মুহূর্তে সমস্ত উত্তেজনার অবসান। অনিশ্চয়তার অবসান বলেই বোধ হয় ইচ্ছে করলে মিলনও এখন রাজা মোদীর মতো হাসতে পারে। চোখে চোখ রেখে চুপচাপ একটু। তারপর বেশ স্পষ্ট করে জবাব দিল, তাহলে নিজেকে আমি ভাগ্যবান ভাবব!

—রাইট! রাজা মোদী দারুণ উৎফুল্ল।—ইয়েস ইউ আর এ ম্যান্— অ্যান্ড ইউ হ্যাভ জাজমেন্ট। যাক, আমাকে তুমি নিশ্চিন্ত করলে। আমি ভাবছিলাম প্রেমের ব্যাপারে তুমি একটা দুর্বল মানুষ।

কি হয়েছে বা এ-কথা কেন মিলন জিজ্ঞাসা করল না। আশ্চর্য হালকা লাগছে। কিন্তু ক্রোধ একটুও কমেনি। বলল, রাজ, তুমি আমাকে বন্ধুর মর্যাদা দিয়েছ, তাই তোমাকেই বলছি। এরপর এখানে আমাকে অনেকেই বিদ্রূপের চোখে দেখবে, অতি লোভী করুণার পাত্র ভাববে—তাই আমি ঠিক করেছি এখান থেকে চলে যাব।

দু'চোখ গোল করে রাজা মোদী চেয়ে রইল খানিক।—চলে যাবে মানে বীভারস্ থেকে রিজাইন করবে?

—হ্যাঁ।

—ননসেন্স ননসেন্স! একটু আগে তোমাকে আমি শক্তপোক্ত জাজমেন্টের মানুষ ভাবছিলাম। রাজা মোদী খেঁকিয়েই উঠল। রাগে তার সমস্ত মুখ লাল।—করুণার পাত্র কে কাকে ভাবে তুমি শিগগীরই দেখতে পাবে—বুঝলে? তুমি চড়চড় করে এখন কত ওপরে উঠবে নিজেই জানো না—আই অ্যাম রা-জ মাইন্ড ইউ—মগজ থেকে সেন্টিমেন্টের হাওয়া সব বার করে দাও—দেন ওয়েট অ্যান্ড সি। গটগট করে চলে গেল।

এমন দাপটের কথার অর্থ মিলন বুঝতে পারল না। শুধু মনে হল বড় রকমের ঝড় আসছে একটা। কিন্তু যে উপলক্ষে এ-রকম সম্ভাবনা মিলনের তা-ও বাঞ্ছিত নয়। ...এলা মোদী এত সহজে তার জীবন থেকে সরে যেতে সে-যে কত নিশ্চিন্ত এখন সেটা বোধ হয় রাজ্ এখনো বুঝছে না। তার বিশ্বাস, ভাগ্য প্রসন্ন বলেই ভবিষ্যতের একটা অনিবার্য বড় অঘটন এড়ানো গেছে। আবার দিন কাটতে লাগল। মাসও ঘুরে গেল। এর মধ্যে দু'বার হেমরাজ দিল্লীতে এসেছেন। দু'তিন দিন করে অফিসও করেছেন। মিলন খবর পেয়েছে শুধু। মুখ দেখেনি। আবার খবর পেয়েছে, এম.ডি. চলে গেলেন।

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মিলন একটা সোনার জলে ছাপা কার্ড পেল। দেখার মত কার্ড বটে। মস্ত বড়—আইভরি ফিনিশ্ড। তাতে রুপোলি বুটি। গুজরাটের বাসভবনে হেমরাজ মোদীর বিনীত আমন্ত্রণ। অমুকের ছেলে অমুকের সঙ্গে অমুক দিন

তাঁর একমাত্র কন্যা এলার বিয়ে। উপস্থিত থাকলে কৃতার্থ হবেন। অমুক দিনের তারিখটা দেখল মিলন। সেই শুভ দিন বলতে গেলে এসেই গেছে। মাঝে আর মাত্র দু'দিন আছে।

অফিসে সেদিন বেশ একটু সাড়াই পড়ল। ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের একমাত্র মেয়ের বিয়ে, তাই স্বাভাবিক। সমস্ত পদস্থ কর্মীরাই পত্র পেয়েছেন। সকলেরই যাবার ইচ্ছে।

ফোন বেজে উঠল। রাজা মোদীর গলা। মুখ না দেখেও মনে হল কৌতুকে টগবগ করছে সে। জিগ্যেস করল, নেমন্তন্নর চিঠি পেয়েছ?

—আজ পেলাম।

—যাচ্ছ?

—তোমার কি মনে হয়?

—গেলে বেশ হত কিন্তু। যাক, অতটা জোর করছি না।...আমরা মোদীরা সক্কলে যাচ্ছি, এত বড় একটা আনন্দর ব্যাপার, যাব না কেন?

—নিশ্চয় যাবে।

—গুড! ফোন কেটে দিল।

পরদিন। বিকেলের দিকে টেলিফোন বাজল। অমিতা। তার গলায়ও কৌতুক টসটস করছে মনে হল। মিলনের সাড়া পেয়ে বলল, বাবা আজ তার ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের মেয়ের বিয়েতে রওনা হয়ে গেল।

—যাবেন তো বটেই।

—তোর খবর কি?

—খুব ভাল।

—মুখখানা দেখতে ইচ্ছে করছে।

—টেলিফোনেই দ্যাখ।

—কেন, হোটেলে কখন ফিরবি?

—অনেক দেরি হবে, অফিসের অনেকেই বিয়ের উৎসবে নেমন্তন্ন পেয়ে চলে যাচ্ছেন—তাই আজ থেকেই দারুণ চাপ।

এবারে অমিতার সুরেলা হাসি কানে এলো। তারপর হঠাৎ থেমে জিগ্যেস করল, মাঝে চাকরি ছাড়ার মতলব করেছিলি শুনলাম?

মিলন তেমনি হালকা গলায় জবাব দিল, হ্যাঁ, মতিচ্ছন্ন হয়েছিল।

—এখন মতি স্থির?

—খুব।

—নিজেকে লাকি ভাবতে পারছিস?

—খুব।

—গুড।

বেশ শব্দ করে হেসে অমিতা ফোন নামিয়ে রাখল।

## আট

বিলেতে থাকতে মিলন মজুমদার দুই একটা ছবিতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ধস নামতে দেখেছে। তাতে আচমকা ভূমিকম্পে সমৃদ্ধির অকালমৃত্যু দেখেছে। পরের ছ'মাস দিল্লীর বুকে বসে মিলন মজুমদার যা দেখেছে তা ছবি নয়, ছবির মতোও কিছু নয়। ও-সবের থেকে ঢের বাস্তব। কিন্তু এই বাস্তবের প্রতিক্রিয়া বড় অদ্ভুত। কারণ পরের ছ' মাসে মিলন মজুমদার বীভারস-এর মতো বিশাল কোম্পানিতে বিপর্যয়ের ধস নামানোর একটা অনাপোস প্রস্তুতি দেখছে। ভূমিকম্প ঘটানোর নিঃশব্দ তৎপরতা দেখছে।

ধস নামবে বা ভূমিকম্প ঘটবে সেটা মিলন চট করে বুঝতে পারেনি। ছ' মাসের মধ্যে চাকরিতে নিজের এত তড়িঘড়ি উন্নতি দেখে অবাক হচ্ছিল। আবার অকারণে একটু অস্বস্তিও বোধ করছিল। ওকে ঠেলে ওপরে তোলার পিছনে অমিতার হাত আছে কিনা এমন সংশয়ও উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছল।...কিন্তু তা নাও হতে পারে। কারণ রাজা মোদী বলেছিল, করুণার পাত্র কে কাকে ভাবে তুমি শিগগীরই দেখতে পাবে—চড়চড় করে তুমি কত ওপরে উঠবে নিজেই জানো না—আই অ্যাম রাজ মাইন্ড ইউ। বৃথা আস্ফালন করেনি। ওকে ওপরে তোলার সেই খেলাই দেখাতে শুরু করেছে সে।

ওর ব্যাপারে রাজ রাজার মতই উদার হয়ে উঠেছে। চার মাস আগে তাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট এনজিনিয়ার থেকে এনজিনিয়ার করা হয়েছিল। পনেরো শো টাকা মাস ভাড়ার কোয়ার্টার্স দেওয়া হয়েছে তাকে। ভাড়া কোম্পানি গুনবে। কোম্পানির খরচে হালফ্যাশনের কায়দায় বাড়ি ফার্নিশ করা হয়েছে। নিজস্ব নতুন গাড়ি পেয়েছে। আর এই ছ-মাসের মাথায় সে রিজিওন্যাল চার্জে এসে গেল। প্রমোশন অর্ডার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হেমরাজ মোদী সই করেছেন। কিন্তু এর পিছনে কার হাত সেটা মিলন ছেড়ে সকলেই জানে। এ-রকম কোন পোস্ট ছিল না। তার জন্য করা হল। মর্যাদা আর মাইনে দুই-ই কাকার ওপরে। যদিও কাকার কনস্ট্রাকশান সাইডের সঙ্গে এই মেকানিক্যাল সাইডের যোগ কিছু নেই।

প্রথম বারের প্রমোশনের চিঠি পেয়েই মিলন অফিসে কাকাকে প্রণাম করতে এসেছিল। তিনি শুধু বলেছিলেন, জানি। ভালো কোয়ার্টার্স পেয়েছিস তা-ও শুনেছি। একটু চুপ করে থেকে জিগ্যেস করেছিলেন, বাড়িতে আসছিস না কেন, তোর কাকিমা কি দোষ করল?

মিলন হেসেই ফিরে জিগ্যেস করেছিল, কাকিমা কি দোষ করল মানে—তুমি কি দোষ করেছ?

—সেটা তুই জানিস।

ভিতরে ভিতরে মিলন একটু উষ্ণই হয়ে উঠেছিল। জবাবও দিয়েছে।—আমি জানি তুমি আজও আমাকে ছেলের মতো স্নেহ করো সেটা জানলে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর খুশি হবেন না—তাই ইচ্ছে থাকলেও তোমার কাছে ছুটে যেতে পারি না। হেমরাজ মোদী তাঁর মেয়ের দিকে হাত বাড়ানোটা আজও আমার লোভ আর স্পর্ধা ভাবেন।

—তাহলে তিনি তোর এই প্রমোশনে সই করলেন কেন?

—করেছেন কারো চাপে পড়ে।

ধীর গম্ভীর স্বরে অনুপম মজুমদার বলেছেন, কারো বলতে রাজা মোদীর—সে-ই

বা হঠাৎ তোর এত আপনার জন হয়ে পড়ল কি করে? যাক, ভাল দিনে এ-সব তর্ক থাক।...সেই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে যখন আমার দিক থেকে আর কোন প্রবলেম নেই। হেমরাজ খুশি হবেন কি হবেন না আমার তাতে মাথাব্যথা নেই—বাড়ি গিয়ে কাকিমাকে প্রমোশনের খবর জানাস।

মিলন গেছল। কাকিমার সস্নেহ ব্যবহারে কোন রকম আড়ষ্টতা ছিল না। তবু মিলন স্বস্তি বোধ করেনি খুব। কোথায় একটু চিড় খেয়ে গেছে যা ওর কাছে বাঞ্ছিত নয় আদৌ। অমিতা সেদিন বাড়ি ছিল না। সে আসতে পারে কাকু হয়তো তাকে বলেই নি।

কিন্তু এবারের প্রমোশনটা পেয়ে অর্থাৎ রিজিওন্যাল চার্জে এসে মিলন নির্দ্বিধায় এসে কাকুকে প্রণাম করতে পারল না। কারণ এর মধ্যে সেই বিপর্যয়ের ধস নামানোর প্রস্তুতিটা মিলনের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাজা মোদী ওকে নিজের মুখে কিছু বলেনি। কিন্তু তার সঙ্গে মিলনের খাতির দেখে অন্য মোদীরা—বিশেষ করে পুষ্করমলের দুই ছেলেও ওকে খুব খাতির করে। বিশ্বাস করে। প্রস্তুতিটা তারাই ফাঁস করেছে।...কোম্পানির লিগ্যাল অ্যাডভাইসারের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে নাকি। দশ আনার মালিকেরা সব একদিকে। তারা জোট বেঁধে স্থির করেছে ছ-আনার মালিক হেমরাজকে এবার ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে হবে।

প্রত্যেকবারের জেনারেল মিটিং-এ পাঁচ বছরের মেয়াদে তিনি বিনা বাধায় ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হয়ে আসছেন। সবার আগে রাজা মোদীর অনুমোদন মিলেছে। এবারের মেয়াদ ফুরোতে আরো তিন বছর বাকি। কিন্তু বোর্ড অফ ডাইরেক্টরের রেজোলিউশনে মেয়াদ শেষের আগেই তাঁকে সরানো যাবে না এমন কোন লেখা-পড়া নেই। এখন সেই ব্যবস্থাই হতে যাচ্ছে। লিগ্যাল অ্যাডভাইসারের গ্রীন সিগন্যাল পেলেই অন্য সব ডাইরেক্টরের সইয়ে বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস-এর মিটিং ডাকার নোটিস যাবে।

এতটা জানার পর মিলন নিজেও কম অস্বস্তির মধ্যে ছিল না। কাকুরও তাকে বিপক্ষ দলের একজন ভাবা স্বাভাবিক। কিন্তু মিলন এ-জন্যে প্রস্তুত ছিল না। সে হঠাৎ ধস নামতে দেখেছে। ছবিতে মিলন আচমকা ভূমিকম্প দেখেছে, কিন্তু ধস নামানো বা ভূমিকম্প ঘটানোর প্রস্তুতি কখনো দেখেনি।

যদিও পনেরো মাস আগে এই কোম্পানিতে ঢোকার সময়েই এই গোছের কিছু সম্ভাবনার আভাস কাকু তাকে দিয়ে রেখেছিল। এতদিন সেটা হয়নি কারণ রাজা মোদী তা হতে দেয়নি। ফলে অন্য সব জ্ঞাতিদের ইচ্ছে থাকলেও ছয় আর তিন ন-আনার বিরুদ্ধে সাত আনার লড়াই চলে কি করে? কিন্তু এখন রাজা মোদী নিজেই প্রধান উদ্যোক্তা।

এই দ্বিতীয় এবং মস্ত প্রমোশনের খবর মিলন আগেই জেনেছিল। না, রাজা মোদী কিছু বলেনি। তার অনুগতরা জানিয়েছে। প্রমোশনের অর্ডার বেরুনোর আগের দিনই পাঁচ দিনের টুর প্রোগ্রাম ফেলে সে কানপুরে চলে এলো। সেখানেই টেলিগ্রামে তাকে সুখবর পাঠানো হল। পাঁচ দিন বাদে দিল্লি ফিরে শুনল, কাকু দু' দিন অফিসে আসছে না। অফিসে নাকি জানিয়েছে শরীর অসুস্থ।

মিলন প্রথমে ফোনে খবর নেবার কথা ভাবল। তারপর ঠিক করল ফোন নয়, বিকেলে বাড়িতেই যাবে।

কিন্তু লাঞ্চের পরেই কাকিমার টেলিফোন। বলল, তোর কাকুর শরীরটা ভাল নয়, প্রেসারের নামা ওঠা বাড়ছে, তোর সঙ্গে কথা আছে বলছিলেন...একবার আসার সুবিধে হবে?

মিলন জবাব দিল, আমি অফিসের কাজে কানপুর গেছলাম, আজই ফিরেছি। কাকু দু'দিন অফিসে আসছে না শুনে ছুটির পর যাব ঠিক করেছিলাম, তার আগে ফোন করলেই যখন এভাবে না বলে হুকুম করলে না কেন?

কাকিমার একটু হাসি এলো। তারপর জবাব।—বড় হলে ছেলেকেও কি সব সময় হুকুম করা যায় রে...!

—এ তো ছেলেও নয়, কেমন?

—আমি তোর রাগের কি করলাম!...আসিস।

ফোন ছেড়ে মিলন খানিকক্ষণ গুম হয়ে থাকল। কিন্তু ফুরসত এখন তারও কম। টেবিলে গুচ্ছের ফাইল ঠিকি হয়ে আছে। ওঠার অবকাশ পেল যখন, প্রায় সন্ধ্যা। উঠল। নিজেই ড্রাইভ করে এলো। আগে অমিতার ঘরে উঁকি দিল। কেউ নেই। তারপর কাকার ঘরে। কাকিমাও সেখানেই।

—আয়। অনুপমবাবু বিছানাতেই আধশোয়া। মিনতিকে বললেন, ওর খাবারটা এখানেই নিয়ে এসো।

—হবে'খন। মিলন কাকার খাটের এক পাশে বসল।—কি ব্যাপার, প্রেসার অত বাড়ছে কমছে কেন?

—কি জানি হঠাৎ খুব বেড়ে গেছ্‌ল আবার বেশিরকম কমেও যাচ্ছিল। এখন একটু ভালই আছি। ডাক্তার অবশ্য আরো দিন দুই শুয়ে থাকতে বলছে।

—তাহলে আর কথা কি। তাই থাকবে।...হঠাৎ এ-রকম হল কেন, বেশি ভাবনা চিন্তা করছ তো?

—তা তো একটু করতেই হচ্ছে। তুই অফিস থেকে এলি আগে কিছু মুখে দিয়ে নে না?

মিলন কাকিমাকে বলল, আনো। তারপর উঠে ঘরের অ্যাটাচড় বাথ-এ গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে এলো। খেতে খেতে কাকিমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, অমি কোথায়?

—জানি না।

অনুপমবাবু তক্ষুনি সখেদে বলে উঠলেন, ওর কাছে তো আমি মরেই গেছি—শরীর খারাপ অফিসে যাচ্ছি না জেনেও যখন খুশি বাড়ি ফেরে, আর তারপরেও মায়ের কাছে খোঁজ নেয়—এ ঘর মাড়ায় না।

মিলনের সত্যি খারাপ লাগল। কেন রাত করে ফেরে বাড়ির মধ্যে এখন কেবল সে-ই জানে। তবু, আজও রাজা মোদীর সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা মিলনের এতটুকু কাম্য নয়। তাই বলল, ওকে আমি যাচ্ছেতাই করে বকব এবার।

—হুঃ, অনুপমবাবুর মুখে ব্যঙ্গ ঝরল।—সকলেরই বকাবকির ধার ধারে ও! যাকগে, তোর প্রমোশনের অর্ডার আজ এসে পেলি?

—হ্যাঁ। তবে অফিস থেকে টেলিগ্রামে আগেই খবর জানিয়ে দিয়েছিল।

অনুপমবাবুর নিস্পৃহ মুখ।—খুশির কথা।...তবে তোর এবারের এই প্রমোশনটা নিয়ে হেমরাজ হেসে হেসে এমন একটা কথা বলল যেটা আমার শুনে খুব খারাপ লেগেছে।

মিলনের খাওয়া থেমে গেল।—কি বললেন?

বলল, সব কি-পোজিশনে ওরা নিজেদের লোক বসাচ্ছে, আপনার ভাইপোকেও ওরা নিজেদের লোক ভাবছে।

ঈষৎ তপ্ত গলায় মিলন বলল, কিন্তু এবারের অর্ডারও তো তিনিই সই করেছেন। অন্য দলের লোক ভেবে তা না করলেই পারতেন—

—তিনি তোকে অন্য দলের লোক ভাবছেন এ-কথা বলেন নি, বলেছেন ওরা ভাবছে। আর তাঁর সই করাটা ফরম্যাল ব্যাপার, রিকমেনডেশন এলে করাই রীতি। তাছাড়া এ-সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে সে মাথা ঘামায় না।

কাকুকে শোনানো মানেই অন্য দলের লোক ভাবা হচ্ছে। এ বিতণ্ডার মধ্যে না গিয়ে মিলন ক্ষুব্ধ গলায় বলে উঠল, আমিও মানুষটা তাঁর কাছে অতি তুচ্ছ—এত তুচ্ছ যে তিনি আমাকে মানুষই ভাবেন না—তাহলে আমাকে নিয়ে তাঁর এই ভাবনা কেন?

অনুপমবাবু মিলনের জল খেয়ে রুমালে মুখ মোছা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর একেবারে প্রসঙ্গ বদলে ঠাণ্ডা মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, দিন-কতকের জন্য তোর আমার কাছে এসে থাকার সুবিধে হবে?

—কেন? ফিরে প্রশ্নটা চাপা হলেও প্রায় রুক্ষ।

—আমার শরীর খারাপ হলেও এসে থাকতে পারিস না?

—একশোবার পারি। কিন্তু এখন ভাল আছ নিজের মুখেই বললে, সে-যাক, এখন আমি যদি বলি বাবা-মাও তো ছেলের কাছে এসে দিনকতক থাকে—কাকিমা আর অমিকে নিয়ে দু-পাঁচ দিন আমার কোয়ার্টার্সে এসে থাকতে পারো না? তার পরেই মুখে ক্ষুব্ধ হাসি।—পারো না, তার কারণ, শুনলে হেমরাজ ভাববেন, তুমিও অন্য দলে ভিড়ছ।

অনুপমবাবু ধীর ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে রইলেন খানিক। তারপর জবাব দিলেন, আমি কার দলে সেটা সকলেই জানে।...ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে সরানোর একটা ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে সেটা তোর জানা আছে?

—শুনেছি।

—প্রথম যখন তুই কাজে ঢুকিস তখন তোকে এ রকম আভাস দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন শুনেও আমাকে কিছু বলিসনি তো?

সত্যি জবাব দিলে কাকু দুঃখ পাবে জেনেও মিলন চুপ করে থাকতে পারল না। বলল, আমি কোন শোনা কথার মধ্যে মাথা গলানো দরকার বোধ করিনি। তাছাড়া তখনকার থেকে এখনকার পরিস্থিতির কিছু তফাৎ হয়ে গেছে কাকু।

অনুপমবাবু দুঃখের থেকে আঘাতই বেশি পেলেন।—কি তফাৎ হয়েছে—তোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বদলেছে? এই তফাৎটা হয়েছে বলেই আমার যন্ত্রণা।...ওরা শরিকে শরিকে লাগুক কারো কিছু বলার নেই, কিন্তু হেমরাজ তোর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিল না বলে রাজা মোদী এমন ক্ষেপে উঠল কেন? আসলে তোকে সামনে রেখে ওরা নিজেদের মতলব হাসিল করতে যাচ্ছে কেন? উত্তেজনা সামলাবার জন্য দম নিলেন একটু।

মিলন লক্ষ্য করল কাকুর মুখ আবার লাল হয়ে উঠছে। তাড়াতাড়ি বলল, এ সব কথা থাক কাকু, যা-ই ঘটুক তাতে তোমার আমার কোন হাত নেই। মাঝখান থেকে তোমার ব্লাডপ্রেসার চড়ছে।

কাকিমা তার কথায় সায় দিল। বলল, ওকে ডেকে এনে মিছিমিছি এসব কথা কেন! কিন্তু কাকা মাথা নাড়ল।—না, হেমরাজের সব কথা ওর শোনা দরকার। প্রেসারের চাপে ঈষৎ লাল দু'চোখ মিলনের দিকে ফেরালেন।—তোর প্রমোশনের দিন তার ওই কথার জবাবে আমি তাকে বলেছিলাম, তুই নিজের স্বার্থে কোন রকম দলাদলির মধ্যে যাবার ছেলে নয়। শুনে তেমনি হেসেই বলল, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসেবে আমার আরো তিন বছর অন্তত থাকার কথা, কিন্তু দশ আনার জোরে ওরা আমাকে আগেই সরাতে চায়।...আমার অংশ আমি যদি তাদের কিনে নিতে বলি আর ওরা যদি রাজি হয়, খুব কম টাকা পাব না। তাই দিয়ে নতুন করে কিছু করার হিম্মত আমার আছে, বাজারে আমার নিজস্ব কানেকশন্স যা আছে ওদের সকলের মিলে তা নেই। আপনার ভাইপোকে জিগ্যেস করবেন তো এবারের এই প্রমোশনের পরে সে যা পাবে সেই টাকাই যদি তাকে দিই, সে আমার সঙ্গে জয়েন করতে রাজি আছে কিনা।

প্রচণ্ড রাগে মিলন ফুঁসে ওঠার তাড়না সংযত করল। কাকিমার মুখে বিস্ময়ের আঁচড় দেখল। অর্থাৎ খবরটা কাকিমাও এই প্রথম শুনল। নিজেকে আরো একটু সামলে মিলন বেশ স্পষ্ট করেই জবাবটা দিল। বলল, কাকু, এটা তুমি বিশ্বাস করতে পারো এলার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি সেজন্য এখন অন্তত আমার এতটুকু খেদ নেই, কারণ আমি অন্য বিশ্বাসে ভুল করেছিলাম। আর ওর বেলায় অন্তত তোমার ধারণাই ঠিক ছিল। কিন্তু হেমরাজ মোদীকে তুমি স্পষ্ট জানিয়ে দিতে পারো, মানুষ হিসেবে আমাকে তিনি সকলের চোখে হেয় করেছেন আর অপমান করেছেন, তাইতেই এ কোম্পানি ছেড়ে আমি চলে যেতাম যদি রাজা মোদী আমাকে জোর করে আগলে না রাখত। এখন তিনি বুঝে নিন এই অফার এলে আমি কি করব।...তবে কাকু, এও তুমি জেনে রেখো, এই অফার তাঁর কাছ থেকে কোন দিনও আসবে না, এই গণ্ডগোলের মধ্যে আমি কতটা উপলক্ষ সেটা যাচাই করার জন্যে তোমাকে তিনি এ কথা বলেছেন।

অনুপমবাবু এ-কথার জবাব দিলেন না। বড় করে একটা ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেললেন শুধু। মিলনের ভিতরটা তখন পর্যন্ত তেতেই আছে। কিন্তু কাকুর মুখের দিকে চেয়ে আর কথা বাড়ালো না, উঠে পড়ল।—তোমাকে দেখতে এসে এ সব কথার মধ্যে তুমি জোর করেই ঢোকালে কাকু। কেমন থাকো কাল আবার খবর নেব।

## নয়

প্রস্তুতি-পর্ব শেষ। এবারে আট-ঘাট বেঁধে নামার পালা। তাও শুরু হল। মিলন কোন ব্যাপারে মুখ খোলে না, মন্তব্য করে না। কেবল চোখ-কান সজাগ তার। প্রতিটি খবর কানে আসে। অন্য মোদীদের চাপা উত্তেজনা দেখে। শুধু রাজা মোদী যেমন—তেমনি। জরুরি মিটিংয়ের দাবী জানিয়ে ডাইরেক্টরদের প্রথম চিঠি গেল ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের কাছে। সকলের মুখপাত্র হয়ে রাজাই ওই চিঠি সই করেছে। হেমরাজ মিটিং ডাকলেন না। তার বদলে রাজাকে ডাকলেন। সেই সমাচার রাজার মুখেই শুনেছে মিলন।

আংকল দ্য গ্র্যান্ড তাকে সোজা প্রশ্ন করেছে, কি জন্যে জরুরি মিটিং ডাকতে হবে —কি সকলের বক্তব্য?

রাজার জবাব, জেনে-শুনে জিজ্ঞাসা করার কি অর্থ?

আবার প্রশ্ন।—আমার বিরুদ্ধে সকলের কি অভিযোগ?

—সেটা মিটিংয়েই ফয়েসলা হবে।

মাস গড়িয়ে গেল। হেমরাজ মিটিং ডাকলেন না।

মিলন বোঝে কাকুও সব জানে। এ নিয়ে একটি কথাও বলে না। কিন্তু মুখ সর্বদা লাল দেখে। ব্লাডপ্রেসার চড়ে আছে কোন ভুল নেই। মিলন একদিন তার শরীর নিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই কাকু থামিয়ে দিয়েছে।—ভাল আছি, চিন্তা করতে হবে না।

পরের মাসে ডাইরেক্টরদের দ্বিতীয় চিঠি গেল। একই দাবী।

বিকেলের দিকে পুষ্করমলের ছোট ছেলে হন্তদন্ত হয়ে মিলনের ঘরে এসে চুপি চুপি জানালো, আপনার কাকাকে এম.ডি. তাঁর ঘরে ডেকে পাঠিয়েছেন। কেন, আপনার কাকার কাছ থেকে জেনে নিতে পারবেন?

মিলন মাথা নাড়ল।—উনি নিজে থেকে না বললে জানা সম্ভব নয়।

ছেলেটা মনে মনে একটু বিরক্ত হয়েই চলে গেল তাও বুঝল।

ঠিক পাঁচটায় অনুপমবাবু মিলনের ঘরে এলেন। মুখ বেশ লাল। বললেন, শরীরটা ভাল লাগছে না, বাড়ি যাব—তুই আসতে পারবি?

সঙ্গে বাড়ি যেতে বলাটা শরীর ভালো লাগছে না বলে নয় জেনেও মিলন তক্ষুনি উঠল। কাকুর সঙ্গে লিফটে নামল। রাম সিংকে পিছনে গাড়ি নিয়ে আসতে বলে তাঁকে নিয়ে নিজের গাড়িতে উঠল। দুজনে পাশাপাশি বসে। মিলন ড্রাইভ করছে। কারো মুখে একটি কথাও নেই।

বাড়ি। নিজেই দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে অনুপমবাবু হনহন করে বারান্দায় উঠতে যাচ্ছিলেন। মিলন তাড়াতাড়ি পেছন থেকে এসে ধরল। কাকু বাধা দিল না, কিন্তু এও পছন্দ হচ্ছে না বোঝা যাচ্ছে। গাড়ির শব্দে মিনতি বেরিয়ে এসেছিলেন। তিনিও তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন।

ওদিকের দরজায় অমিতা। সে বেরুনোর জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। বাবাকে এভাবে ধরে নিয়ে আসতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

অনুপমবাবু একেবারে ড্রইংরুমে এসে বসলেন। মিলন কাকিমাকে বলল, ডাক্তারকে একটা ফোন করো।

—কিছু দরকার নেই। বিরক্ত মুখে অনুপমবাবু বাধা দিলেন।—এসে দেখবে প্রেসার কিছু বেড়েছে—আর কি দেখবে? ওষুধ কি খেতে হবে জানোই তো, নিয়ে এসো, খাচ্ছি।

মিলন কি বলতে গিয়ে দরজার দিকে তাকালো। অমিতা ঘরে ঢুকেছে। কাছে এলো না, একটু দূরেই দাঁড়িয়ে রইল। মিলন কাকিমাকে বলল, তবু ডাক্তার এসে একবার দেখে যাক।

সঙ্গে সঙ্গে অনুপমবাবু আরো বিরক্ত।—বলছি তো দরকার নেই। বোস, তোকে দুই একটা খবর দেবার আছে।...বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস-এর মিটিং ডাকার জন্য আজ ওরা আবার চিঠি দিয়েছে—জানিস?

মিলন মাথা নাড়ল। জানে।

মিনতি ওষুধ এনে দিতে একটুও খেয়াল না করেই তিনি জল দিয়ে খেয়ে নিলেন। গম্ভীর অসহিষ্ণু চাউনি মিলনের মুখের ওপর স্থির।—কি করে জানিস, এরা যা করছে আগে থেকে তোকে জানাচ্ছে?

এমন প্রশ্ন আর কেউ করলে অপমানকর মনে হত। এখনও ভিতরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। শরীর অসুস্থ না থাকলে ওর জবাবও মোলায়েম হত না। যতটা সম্ভব নিজেকে সংযত করে শুধু বলল, পুষ্করমলের ছোট ছেলে এসে বলে গেছল, তোমাকে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ডেকেছিলেন তাও বলেছে। তা না হলে যেচে শোনার আগ্রহ আমার নেই। অমিতার দিকে ফিরে আর একটু সহজ হতে চেষ্টা করল, বলল, অমি বোস না—

অমিতা কিছু না বলে তেমনি দাঁড়িয়েই রইল।

মেয়ের দিকে একবার তাকিয়ে চাপা বিরক্তিতে অনুপমবাবু বললেন, কোথায় যাবার জন্য তৈরি হয়েছিস গেলেই হয়, আমার জন্য আটকে থাকার কি আছে, শরীরে নতুন করে কিছু হয়নি।

বাবার দিকে সোজা তাকিয়ে অমিতা বলল, আমি এসে দাঁড়িয়েছি বলে তোমার কিছু অসুবিধে হচ্ছে?

সঙ্গে সঙ্গে বাবার তপ্ত জবাব, আমার আবার কি অসুবিধে হবে—আমার সুবিধে অসুবিধে বলে কিছু নেই।

—মিলন যা বলছে শুনছ না কেন, আগে ডাক্তার না ডেকে এ সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন?

অনুপমবাবু আবারও তেতে উঠলেন—কেন ঘামাচ্ছি তোর সেটা বোঝার কথা নয় —এ সব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ডাক্তার গুলে খেলেও কিছু হবে না—আমার শরীরের ভাবনায় অস্থির সকলে!

মিলন সামাল দিতে চেষ্টা করল, আচ্ছা, কি বলছিলে বলো—হেমরাজ তোমাকে ডেকেছিলেন কেন?

উত্তেজনা সামলে এবারে একটু ঠাণ্ডা মুখেই জবাব দিলেন, সরল মনে দুটো কথা বলার লোক পায় না তাই ডেকেছিল—নইলে আমি আর কি করতে পারি। একটু থেমে আরো শান্ত মুখে বললেন, আসলে এভাবে বার বার চিঠি দিয়ে তাকেই মিটিং ডাকার চাপ দিয়ে সকলে মজা দেখছে। আর দোষটাও তার ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা, নইলে পনেরোজন ডাইরেক্টরের মধ্যে তিনজন একত্র হয়েই মিটিং-এর নোটিস দিতে পারে। হেমরাজ এবারেও মিটিং না ডাকলে তাই করবে জানা কথা। তারপর রেজোলিউশন করে সরাবে।

মিলন একটু কৌতূহল চাপতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, তিনি তাঁর ছ' আনা শেয়ার বেচে দেবার কথা ভাবছিলেন তার কি হল?

—আমি সে-কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। আজ এ ব্যাপারে তার অন্য মেজাজ। বলল, শেয়ার বেচতে যাব কোন্ দুঃখে, ওরাই আবার একদিন হাতে পায়ে ধরে ডাকবে আমাকে। বলল, এত বড় ইন্ডিয়ার অবস্থাখানা দেখলেন না—অতগুলো দলের যে যার স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে পারছে মিলেমিশে থাকতে? আমার ছ' আনা ঠিক থাকলে বাকি চোদ্দ জন

ডাইরেক্টরের মধ্যে খাওয়া-খাওয়ি লাগল বলে। দশ আনা ভাগের চোদ্দজন মাতব্বর কদিন মিলেমিশে থাকবে? বড় করে একবার দম নিয়ে তিনি বলে গেলেন, সেই জন্যেই তোকে বলছি, কাজ করছিস করে যা, কোন দলে ভিড়িস না, রাজা মোদীকে যত বন্ধুই ভাবিস, শক্ত হাতে হাল ধরতে এলে তাকেও শেষ পর্যন্ত কেউ বরদাস্ত করবে না—তখন তার খাতিরের লোকের ওপরেই সকলের আক্রোশ বাড়বে—এ সব কোম্পানিতে বিভ্রাট বাঁধলে এ রকমই হয়। তখন আর পরামর্শ দেবার জন্য আমি থাকব না, হেমরাজকে সরালেই আমি রিটায়ার করব ঠিক করেছি।

এই সংকল্পের কথা শুনে সকলেই এক দফা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। মিলন গুম হয়ে রইল। ওর রাজা মোদীর দলে ভেড়ার কটাক্ষ বরদাস্ত করতে পারছিল না। আবার এও জানে, ওকে বাড়িতে ডেকে এনে এ-কথা বলা হচ্ছে স্নেহের টানে। কিন্তু হেমরাজ চলে গেলে কাকুও থাকবে না শুনে একটা চাপা ক্ষোভে ভিতরটা অস্থির হয়ে উঠল। এ রকম অবুঝ হলে সে কি করতে পারে? রাজা মোদীকে সে পছন্দ করে সত্যি কথাই, আর কাকু যে নিজের আবেগের সবটুকু ওই হেমরাজের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বসে আছে! কিন্তু এই নিয়ে এখুনি তর্ক চলে না।

কাকুর পরের কথায় মিলন একটু সচকিত। হেমরাজ নাকি আজও সেই পুরনো প্রসঙ্গ তুলেছে। বলেছে, একটা কথা কিছুতে আমার মাথায় আসে না অনুপমবাবু, অন্য সকলের স্বার্থ বুঝতে পারি, কিন্তু রাজ কেন এমন ক্ষেপে গিয়ে এভাবে ওদের দলে ভিড়ে গেল! ও আমাকে অতটা শ্রদ্ধা না করলে, ভাল না বাসলে কবেই তো আমাকে সরে যেতে হত। এবারে ওকে এভাবে কে তাতালে?...যত গোঁয়ারই হোক, ও তো একটুও বোকা নয়। আমার মেয়ের আমি পছন্দমতো বিয়ে দিলাম, মেয়েও তাতে শেষ পর্যন্ত আপত্তি করল না—ও অবশ্য ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাকে শাসিয়েই গেছল, বলেছিল, এলা আর আপনার ভাইপো দুজনে দুজনকে ভালবাসে—এ বিয়ে না দিলে ও-ই গণ্ডগোল বাঁধাবে—কিন্তু আমার মেয়ে স্বেচ্ছায় অন্যত্র বিয়ে করতে রাজি হল দেখেও ও এমন ক্ষেপেই থাকল কেন? মেয়ে তো মোটামুটি সুখেই আছে! তবু সব দিক ছেড়ে গণ্ডগোলটা সে এই দিকে টেনে আনল কেন?

মিলন নিজের অগোচরে অমিতার দিকে তাকাল একবার। নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ মুখে ও কাকুর দিকেই চেয়ে আছে।

সকলেই চুপচাপ। একটু বাদে অমিতা যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল। মিলনকে সামান্য একটু চোখের ইশারা করে ও বেরিয়ে গেল।...কাকুর মুখ বেশ লাল এখনও। তার আসল খেদ কোথায় মিলন বোঝে। এই এক ব্যাপারের সঙ্গে ওর নামটা অন্য দলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু মিলন কি করতে পারে। ও তো অন্যায় কিছু করেনি। কেবল হেমরাজ সম্পর্কে তার ভিতরটা এখনো তিক্ত কঠিন। উঠে অমিতার ঘরে এলো।

বাইরে যাবার পোশাকেই ও চিৎপাত হয়ে খাটে শুয়ে আছে।

মিলন জিজ্ঞাসা করল, বেরুবি না?

—নাঃ। বাবার শরীরটা সত্যি খারাপ দেখছি। তুই এক কাজ কর, যাবার সময় ডাক্তারকে একবার খবর দিয়ে যা।

শুধু সেই সন্ধ্যায় নয়, পরের আরো চার পাঁচ দিন অমিতা বাড়ি থেকেই বেরুলো

না। স্কুলেও গেল না। বাবার ব্লাডপ্রেসার বেশিরকম চড়া। সমস্ত মুখ কাঁধ বুক বেশির ভাগ সময় লাল। সর্বদা গম্ভীর। ও সামনে গেলে কিছুই বলে না। মা ভাল কথা বললেও মেজাজ।

দু'দিন ওকে স্কুলে যেতে না দেখে মাকে বলল, আমার জন্য কারো ঘরে আটকে থাকার দরকার নেই, ওকে স্কুলে যেতে বলো।

জবাবে মা চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে ছিল। তাইতেই বাবার রাগ।—অমন হাঁ করে চেয়ে আছ কেন?

মিনতি ঠাণ্ডা মুখে আস্তে আস্তে মেয়ের দিকে ফিরলেন।—তোকে বলতে হবে, না শুনতে পেয়েছিস?

তখনই ডাক্তার হাজির। বিরক্ত মুখে অনুপমবাবু তাকেও শোনালেন, রোজ রোজ প্রেসার দেখে হবে কি, ই-সি-জিতেও তো কিছু পেলেন না। আঙুল তুলে নিজের মাথা দেখালেন, আমার সব রোগ এখানে—বুঝলেন?

ডাক্তার হেসে জবাব দিলেন, আপনি কো-অপারেট করলে ওখান থেকেও রোগ তাড়ানো কিছু কঠিন নয়—অত ভাবেন কেন?

—আমি ভাবি না, আমার কপাল আমাকে ভাবায়।

ডাক্তারও শুনেছে, অফিসের গণ্ডগোলের কারণে এমনটা হয়েছে। মিনতি আর অমিতাকে আড়ালে ডেকে সমঝে দিয়েছে, অফিস সংক্রান্ত কোন কথা নয়, কোন উত্তেজনা নয়।

এই কারণেই মিলনকে এখন আসতে নিষেধ করেছে অমিতা। তাকে দেখলে অফিস নিয়ে উত্তেজনা বাড়ে মিলনও জানে। অমিতা ফোনে খবর দেয়। নয়তো মিলন ফোনে খবর নেয়। কিন্তু অনুপমবাবু ওদিকে তাকে না দেখেও উদগ্রীব। রোজই দুই একবার করে জিজ্ঞেস করেন, মিলন আসে না কেন, যা হবার হয়ে গেছে? খবর আছে কিছু?

অমিতা জানায়, খবর কিছু নেই। সাইটে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে বলে খুব ব্যস্ত, তাই সময় পায় না।

—তাহলে খবর কিছু নেই তোকে কে বলল?

—রাতে টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা হয়।

পাঁচ ছ'দিনের মাথায় অমিতা অফিসে মিলনকে ফোন করল। ওর গলা পেয়েই মিলন জিজ্ঞেস করল, আজ কেমন?

—খুব খারাপ। ওপরের প্রেসার দুশো তিরিশ, নিচের একশো কুড়ি।

—ডাক্তার?

—রোজই আসছে।

—তাহলে আজ আসি একবার?

অমিতা নিষেধ করল, বলল, না। মেজাজও আজ বেশি খারাপ। ঘুরে ফিরে মাকে তোর কথা বলছে।

—বকাবকি করছে?

—না। ভিতরে ভিতরে কপাল চাপড়াচ্ছে। মাকে বলছে এই রকম দিগগজ হয়ে আসার জন্য এত সাধ করে তোকে বিলেত পাঠানো হয়েছিল! যে লোকের টাকায় তুই

এমন লায়েক হয়ে ফিরলি সে-ই তোর শত্রু হয়ে বসল—আর কাকার মুখের দিকেও তুই তাকালি না! আবার তোরও যে হাত কিছুতে নেই তা-ও বোঝে—আসলে তোকে আর এলাকে সামনে রেখে এই ব্যাপারটা ঘটল বলে এত রাগ—তুই জড়িয়ে না পড়লে এতটা দুঃখ হত না।

এদিক থেকে মিলন সক্ষোভে বলে উঠল, তাহলে আমি কি করব? চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যাব?

হঠাৎ হালকা সুর অমিতার।—তোর মুরোদ জানা আছে। কিছু করতে হবে না, চুপচাপ বসে থাক।

ফোন ছেড়ে দিয়ে অমিতা খাটে শুয়ে ঘরের ছাদের দিকে চেয়ে রইল।

আরো ঘণ্টাখানেক বাদে বাইরে বেরুনোর জন্য তৈরি হয়ে বাবার ঘরে এলো। অনুপমবাবু উঁচু জোড়া বালিসে শুয়ে।

মিনতি অবাক একটু। বাবার অসুখ দেখে মেয়ে এ ক'দিন স্কুলে গেল না, বেরুলোও না—এদিকে আজ সকাল থেকে শুধু বেশি শরীর খারাপ নয়, অনেক বেশি অসহিষ্ণুও —অথচ আজই মেয়ের বেরুনোর দরকার হয়ে পড়ল। মিনতির চোখে মুখে স্পষ্ট বিরক্তি।

অমিতা বুঝল। মুখ ফুটে কিছু জিজ্ঞাসা না করা সত্ত্বেও চাপা ঝাঁঝে মাকে বলল, বেরুনো দরকার বলেই বেরুতে হচ্ছে—আর সেটা বাবার জন্যেই। ফিরতে একটু দেরি হতে পারে, ডাক্তারকে ফোনে বোলো বিকেলে যেন আর একবার এসে দেখে যায়।

চলে গেল। শুধু মিনতি নয়, মেয়ের কথা শুনে প্রথমে অনুপমবাবুও অবাক একটু। বাবার জন্যেই কেন বেরুনো দরকার কেউ ঠাওর করতে পারলেন না। কয়েক মুহূর্ত পরেই অনুপমবাবুর গলা দিয়ে সখেদ ব্যঙ্গ ঝরল একপ্রস্থ। বললেন, হুঁঃ, বাবার জন্য কিছু সেবা-টেবা বা কেনা-কাটার ব্যবস্থা করতে গেল বোধহয়—নয়তো কোনো বড় ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করতে! নিজেরাই ঠিক থাক তোরা, বাবার জন্যে কাউকে ভাবতে হবে না!

চাকরিতে যতই পদস্থ হয়ে উঠুক, মিলনের চোখের সামনে ভবিষ্যতের পাকা ভিতে বার বার ফাটল ধরছে। চার দিকের আঁট বাঁধুনি কি-রকম নড়বড়ে ঠেকছে।... বীভারস্-এর সংকট আর এড়ানো যাবে মনে হয় না। ফলে কাকু যদি চাকরি থেকে সত্যি সরে দাঁড়ায়, তার পরেও মিলন স্বচ্ছন্দে এই কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত থাকে কি করে? তাহলে দিদিরা বা আত্মীয়-পরিজনেরা কে কি বলবে সেটা বড় কথা নয়, সেই সম্ভাবনার কথা ভাবতে গেলে নিজের চোখে নিজেই সে ছোট হয়ে যাচ্ছে। কাকু বা কাকিমা তার জন্যে কোনদিন এতটুকু আঘাত পেতে পারে এমন সম্ভাবনা কখনো কল্পনাতেও ছিল না। বাস্তবে আজ তাই ঘটতে চলেছে। তারা জানে এত বড় অশান্তির মূল কারণ সে। শুধু তারা নয়, হেমরাজ মোদীও তাই ভাবে।...রাজা মোদী তাকে আলটিমেটাম দিয়েছিল, মিলনের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে না দিলে সে-ই আংকল দ্য গ্র্যান্ডের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। তার সেই শত্রুতার খেলাই শুরু হয়েছে এখন।

কিন্তু আর কেউ না হোক মিলন নিজে জানে সে এই খেলার উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য নয়। রাজা মোদীকে সে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে, এলার অন্যত্র বিয়ে হয়েছে বলে তার

এতটুকু খেদ নেই। এটুকু যে-মেয়ের মনের জোর, বিয়ে তার সঙ্গে হলে ভবিষ্যতে সেটা আরো বড় অশান্তির কারণ হত। অমিতার কাছেও মিলন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই মনোভাবই ব্যক্ত করেছে। তারপরেও রাজা মোদী এতবড় অশান্তি ঘটাতে যাচ্ছে কেন?

...মিলনের ধারণা ক্ষমতার লোভে। তার পারিষদরা অনেক দিন ধরে তাকে এই লোভের দিকে ঠেলে দিতে চেষ্টা করেছে। বাপ কিশোরীলাল মারা যাবার পর একলা তিন আনার মালিক হয়ে বসার ফলে এই লোভের বশীভূত হওয়া আশ্চর্য কিছু নয়। আর দ্বিতীয় যে কারণটা মনের তলায় উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে তাতে আরো বেশি অস্বস্তি। ...রাজা মোদী ওকে বলেছিল, ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের মেয়ের সঙ্গে মিলনের বিয়ের ব্যাপারে সাহায্য করবে বলে দুটি মহিলার কাছে সে প্রমিস-বাউন্ড।...তাদের একজন স্বয়ং এলা, আর একজন অমিতা। অমিতার কাছে প্রতিশ্রুতির খেলাপ হয়েছে বলেই কি তার এই বেপরোয়া দাপট? প্রেমের ইতিহাসে অনেক রকম পাগলামির নজির আছে। এও কি তাই? অমিতাকে তার ক্ষমতা দেখাতে চায়?

...এই দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা মিলন উড়িয়ে দিতেই চায়। কিন্তু মন থেকে সেটা সরানো যাচ্ছে না। কারণ নিছক লোভের বশে যদি রাজা মোদী তার আংকল দ্য গ্র্যান্ডের সঙ্গে এই যুদ্ধে নেমে থাকে তাহলে মিলনের প্রতি তার এমন নেকনজরের হেতু খুঁজে পাওয়া ভার। ছ'মাসের মধ্যে ওকে উন্নতির এত বড় মুকুট পরানোর দরকার কি ছিল?

যত ভাবছে ততো অশান্তি।...দ্বিতীয় কারণটা সত্যি বলে এই বড় চাকরির ভবিষ্যৎ আরো নড়বড়ে। অমিতার দিকে ওই লোকের হাত বাড়ানো মিলন মজুমদার কখনো বরদাস্ত করবে না। করতে পারে না। করলে কাকু-কাকিমার প্রতি সেটাই সব থেকে বড় বিশ্বাসঘাতকতা হবে। কোনো লোভেই এত বড় অপদার্থ মিলন মজুমদার হতে পারবে না।...কিন্তু অমিতা কি এত বোকা! বাবা-মায়ের ওপর আক্রোশে জেনে-শুনে এমন আগুনে ঝাঁপ দেবে? সম্ভাবনাটা নাকচ করতে গিয়েও পারে না। টুকটাক অনেক কথা মনে আসে।...রাজা মোদী কোনরকম ধোঁয়া সহ্য করতে পারে না, অমিতা সিগারেট খাওয়া ছেড়েছে। দেদার মদ খেত যে সে মদ না খেলে আর একজন সিগারেট খাবে না। ...অমিতার চোখে মুখে আবার সেই লাবণ্য ফিরে এসেছে, ছাঁটা-চুল বেড়ে আবার পিঠে নেমে এসেছে...অমিতা আবার এমন বদলে গেল কোন্ জাদুমন্ত্রে?

ভাবনার বাষ্প বেড়েই চলেছে মিলনের। প্রেম কি সত্যি এত অন্ধ? মদ খাওয়া ছাড়লেই একটা মানুষের চরিত্রের সব দাগ মুছে গেল?...কিন্তু অমিতার মতো এত বুদ্ধিমতী মেয়ে যদি এমন অন্ধ আবেগের প্রশ্রয় দেয় তাহলে মিলন তা ঠেকাবেই বা কি করে? ওর এখন আর কারো পরামর্শ শুনে চলার মতি নয়। অন্য দিকে মিলন নিজের ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছায় হোক, কেমন করে যেন রাজা মোদীর হাতের মুঠোর মধ্যে চলে যাচ্ছে। কিন্তু আর কিছুই যদি না পারে, কাকু-কাকিমার মুখ চেয়েও ওকে ওই মুঠো থেকে বেরিয়ে আসতে হবে—চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কাকু-কাকিমার কাছে ফিরে যেতে হবে।

টেবিলের ফোন বেজে উঠল। বিরক্তিকর। চাকরিতে নতুন দায়িত্ব হাতে নেবার পর ফোনেরও বিরাম নেই। রিসিভার তুলে সাড়া দিল।

—হ্যালো, মিলন...?

শোনা মাত্র মিলন নিঃশব্দে মস্ত একটা ঝাঁকুনি খেয়ে উঠল। ফোনের অন্য প্রান্ত থেকে এলার গলা। প্রাণপণে মিলনের আত্মস্থ হবার চেষ্টা।—কথা বলছি...

—আমি এলা...এর মধ্যে এত বড় হয়েছ যে চিনতেও পারছ না? এবারের কণ্ঠস্বর তেমন মোলায়েম নয়।

—চিনতে পেরেছি, তবে আশা করিনি। বলো...কেমন আছ?

—ভালো। তুমি?

—খুব ভালো।

—শুনে খুশি হলাম। ওধার থেকে এলার বক্রোক্তি।—তবে বিশ্বাস করতে পারলে আরো খুশি হতাম।

—বিশ্বাসও করতে পারো। হঠাৎ ফোন কেন...?

এলার গলা এবারও নরম নয়।—তোমার সঙ্গে আমার দরকারি কথা আছে, অফিস থেকে কখন বেরুচ্ছ?

—ছ'টার আগে নয়। কিন্তু কি ব্যাপার?

—টেলিফোনে বলার হলে বলতাম।

—ও, কোথায় দেখা করতে বলছ?

—লুকিয়ে দেখা করার আর দরকার নেই, ছ'টার পরে আমি তোমার কোয়ার্টার্স-এ যাচ্ছি।

বলেই শব্দ করে রিসিভার নামিয়ে রাখল। এটুকুতেও মিলন ও-ধারের অসহিষ্ণুতার আঁচ পেল।

যতটা সম্ভব মিলন নির্লিপ্ত থাকতে চেষ্টা করল। কিন্তু ভিতরে কৌতূহল কিছু আছেই। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে হাতের কাজ শেষ হয়েছিল। তবু ছ'টার এক মিনিট আগে ও টেবিল ছেড়ে উঠল না।

কোয়ার্টার্সএ পৌঁছুতে ছ'টা পনের। এলা তখন পর্যন্ত আসেনি দেখে স্বস্তি বোধ করল। কারণ আসতে আসতে মিলনের কিছু মনে পড়েছে। ও আসার আগে তার জন্য একটু সময় দরকার।

এসে আলমারি খুলে দশ মিনিটের মধ্যে কাজটুকু সেরে নিল।

এলা এলো পৌনে সাতটায়। সামনের ঢাকা বারান্দায় একপ্রস্থ বসার ব্যবস্থা আছে। সেখানেই বসে মিলন শুধু এক পেয়ালা চা খাচ্ছিল। বারান্দায় জোরালো আলো জ্বলছে, এলার সেই লাল গাড়ি একেবারে সিঁড়ির গোড়ায় এসে থামতে মিলন উঠে সামনে এগিয়ে এলো। হাসছে অল্প অল্প।

তার দিকে চেয়েই এলা হালকা পায়ে সিঁড়ি ক'টা পার হয়ে এলো। মিলন হেসেই অভ্যর্থনা জানালো, এসো, দীনের কুটীর আজ ধন্য হল...কিন্তু একলা যে?

এলা হয়তো ঠিক এই অভ্যর্থনা আশা করেনি। আর মুখ দেখে মনে হল মিলনের ওই সহজ হাসিটুকুও অকৃত্রিম ভাবছে না। আজও সে সহজ সরল মেয়ে। হাসি পেলে হাসে রাগ হলে রাগ দেখায়। এই মুহূর্তে মুখখানা প্রসন্ন নয় আদৌ। জবাব দিল, নেমন্তন্ন কোরো, তখন দুজনে আসব, আজ আমি বেড়াতেও আসিনি কোনরকম জবাবদিহি করতেও না—

মিলনের বেশ লাগছে এই মুখখানা দেখতে। সেজেছেও সুন্দর। হেসেই বলল, তাহলে মনে হচ্ছে আমি যেন তোমার কাছে কিছু অপরাধ করেছি? যাক, এসে আমাকে সম্মানিত করেছ যখন, আগে বোসো—

রাগ রাগ মুখে এলা এগিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসল। মিলন তার মুখোমুখি চেয়ারটায়।—আগে বলো কি খাবে, চা না কফি?

—দরকার নেই।

—আর কিছু?

—কি-চ্ছু না!

—বেশ, তাহলে দু'মিনিট বোসো, তোমার বিয়ের নেমন্তন্নের চিঠি পেয়েছিলাম, যাবার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু গেলে তোমারই সব থেকে খারাপ লাগত বলে যাইনি...তোমার জন্য কিছু উপহার রেখেছিলাম যা তোমার খুব পছন্দ হবে জানি—নিয়ে আসি।

এলা কিছু বলতে গিয়েও থমকালো। মিলন ভিতরে চলে গেল।

প্রায় তখুনি ফিরল। হাতে সুন্দর ফিতেয় বাঁধা ছোট একটা প্যাকেট। সেটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে হেসে বলল, মনে হয় এরই জন্য তুমি কষ্ট করে এসেছ—

এলা সামান্য ভুরু কুঁচকে প্যাকেটটার দিকে তাকাল। তারপর ওটা হাতে নিয়ে জিগ্যেস করল, কি আছে এতে?

—খুলে দেখো।

দেখল। প্যাকেট খুলতে এক গোছা খামের চিঠি বেরুলো। সব কটাই এলার লেখা। মিলন বিলেতে থাকতে প্রতি পনের বিশ দিন অন্তর এলা তাকে চিঠি লিখতই। তখন সে নিঃসংশয়ে জানত ওদের বিয়ে হবে। তাই চিঠিগুলোতেও খুব যে একটা সংযমের লাগাম ছিল এমন নয়।

এলার অত ফর্সা মুখ টকটকে লাল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বিড়ম্বনা সামলে আস্তে আস্তে বলল, মিলন, আমি যাকে বিয়ে করেছি তার কাছে তোমার কথা খুব একটা গোপন করার দরকার হয়নি, তোমার সঙ্গে বিয়ে হবে ধরে নিয়ে তোমাকে দিল্লি থেকে প্রায়ই চিঠি-পত্রও লিখেছি এ-ও তাকে বলেছি,—তার আগে বাবাও তাকে কিছু বলে থাকবে। যাক্‌গে, এ-সব চিঠির জন্যে আমি কিছু দুশ্চিন্তায় পড়িনি—

মিলন ঈষৎ বিস্মিত।—তুমি এই চিঠিগুলোর জন্য আসনি?

—না। আমি জানতাম তুমি কোনো ছোট কাজ করতে পারো না—ইউ আর গ্রেট। তবু এগুলো ফেরত দিলে বলে ধন্যবাদ।

মিলন ঠাণ্ডা জবাব দিল, তোমরা সকলেই জানো আমি একটা তুচ্ছ মানুষ। যাক, তাহলে কি জন্যে এসেছ?

বড় লোকের আদুরে মেয়ের রাগ রাগ ভাবটা আর নেই। বোঝাবার মতো করে বলল, মিলন, আমার বাবার এত আপত্তি দেখে আর আমাকে যে-ভাবে বোঝালো তাতে আমি সত্যি ঘাবড়ে গেলাম, তার ওপর শুনলাম, যে কাকাকে তুমি এত ভালবাসো তারও এ-বিয়েতে একটুও মত নেই। যাই হোক, আমার ওপর তোমার খুব রাগ থাকতে পারে, কিন্তু—

মিলন তেমনি ঠাণ্ডা গলায় বাধা দিল, তোমার ওপর আমার একটুও রাগ নেই—

এলার দু'চোখ তার মুখের ওপর থমকালো।—এ তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বলো?

—বলি।

মুখের ওপর এলার চাউনি উষ্ণ হয়ে উঠছে।—তাহলে আমার বাবার সঙ্গে তোমরা এইভাবে লেগেছ কেন?

—আমরা বলতে আমি আর কে?

—কে তুমি জানো না? রাজ ভাইয়া—বাবা তার মেয়ের জন্য যা ভালো ভেবেছে করেছে, তার জন্য তোমরা তার পিঠে ছুরি বসাতে যাচ্ছ?

মিলনের ভিতরটা তেতে উঠছে।—তাহলে তুমি তোমার বাবার হয়ে এই কথা বলতে এসেছ?

—আমি তোমার এখানে এসেছি বাবা জানেও না—আমি তাকে ভালবাসি তাই নিজে থেকেই তোমাকে এই কথা বলতে এসেছি।

—তাহলে শোনো, তেমনি ঠাণ্ডা গলায় মিলন বলে গেল, যা হতে যাচ্ছে আমার তাতে একটুও হাত নেই—আর সেটা আমার জন্য তা-ও আমি বিশ্বাস করি না—তোমার বাবার বিরুদ্ধে তোমার রাজ ভাইয়াকে আমি কোনদিন একটি কথাও বলিনি, বরং বলেছি, আমাদের বিয়ে হলে ভবিষ্যতে আরো বড় অশান্তি হত, সেদিক থেকে তুমি আমি দুজনেই রক্ষা পেয়েছি।

এলা বিমূঢ় একটু।—তাহলে রাজ ভাইয়া এরকম করছে কেন?

—সেটা তাকেই জিগ্যেস করো।...হয়তো এখন তার এত বড় কোম্পানির প্রধান হবার ইচ্ছে।

এলার চোখে অবিশ্বাস, কথায়ও।—তাহলে রাজ ভাইয়া তোমাকে চাকরিতে সকলের মাথার ওপর তুলে দিয়ে তোমাকে দলে টানছে কেন—তোমার কাকার সঙ্গেও তোমার খটাখটি লাগিয়ে দিল কেন?

সব থেকে দুর্বল জায়গায় ঘা পড়ল। তবু মাথা গরম না করে মিলন জবাব দিল, আমি কোনদিন কারো দলে নেই, আর কাকা এখনো আমার সকলের থেকে শ্রদ্ধার মানুষ ভালবাসার মানুষ—তার সঙ্গে খটাখটি লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে বুঝলে এখনো তোমাদের এই সকলের মাথায়-তোলা চাকরি আমি ছুঁড়ে ফেলে দেব!

এলার চোখ মুখ আবার লাল হয়ে উঠতে লাগল।—বাবা তাহলে আমাকে মিথ্যে কথা বলেছে—মিথ্যে বুঝিয়েছে বলতে চাও?

—তোমার বাবা তোমাকে কি বলেছেন কি বুঝিয়েছেন তা নিয়েও আমি মাথা ঘামানো দরকার বুঝছি না।

—ও! চেয়ার ছেড়ে এলা উঠে দাঁড়াল। ফুঁসেও উঠল।—আমার বাবা পর্যন্ত এখন তাহলে এত তুচ্ছ হয়ে গেছে তোমার কাছে—আর তুমি বলছ তোমার একটুও রাগ নেই? আমি আর তোমার কোনো কথা বিশ্বাস করি না—বুঝলে? রাজ ভাইয়াকে আমি বলব তুমি বলেছ কোম্পানির হেড হবার লোভে সে এই কাজ করছে—দেখি সে কি বলে!

হনহন করে সিঁড়ির দিকে এগলো।

—শোনো।

তেমনি গনগনে মুখে এলা ঘুরে দাঁড়াল।

চিঠির প্যাকেটটা হাতে করে মিলন কাছে গিয়ে ওটা বাড়িয়ে দিল। এলা প্রায় ছোঁ মেরে ওটা নিয়ে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। এক মিনিটের মধ্যে তার লাল গাড়ি অন্ধকারে মিশে গেল।

মিলন ওই বারান্দার চেয়ারে এসেই বসল। মনের অবস্থা এমন যে খুব দ্রুত কিছু চিন্তা করতে পারছে না। কিন্তু থেকে থেকে একটা কথাই মনে হয়েছে, কাকুর দূরদৃষ্টি মিথ্যে নয়, বাপ-অন্ত-প্রাণ এই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলে সে সত্যি বিপাকে পড়ত।

কতক্ষণ বিমনা ছিল খেয়াল নেই। হঠাৎই সচকিত। বারান্দার শেষ সিঁড়ি পেরিয়ে অমিতা দাঁড়িয়ে। মিলন ঘাবড়েই গেল।—তুই হঠাৎ এ-সময়ে, কাকু কেমন আছে?

—যেমন দেখে এসেছিলি...ভালো না। অমিতা এগিয়ে এলো। ছ'মাসের মধ্যে এ-বাড়িতে আগে আর মাত্র দু'দিন এসেছে। মিলন নিজস্ব এই কোয়ার্টার্স-এ উঠে এসেছিল সেই দিন, আর মাঝে এক দিন। অতএব বাড়ি দেখার কৌতূহল নেই। সেখানেই একটা চেয়ার টেনে বসল।

মিলন বলল, কাকুর শরীর ভালো না, তার মধ্যে তোর তাহলে রাত করে বেরুনোর কি দরকার ছিল?

মেজাজ বিগড়ে ছিল বলে মিলন কথাগুলো একটু ধমকের সুরেই বলেছে। জবাবে অমিতা তাকে ঘটা করে দেখল একটু। তারপর আলতো করে জবাব দিল, সেই জন্যেই বেরুলাম।

—সেই জন্যে মানে?

—তোর আর বাবার মনে এত অশান্তি, সেই জন্যে।...তা তুই একলা বারান্দায় এত মনমরা হয়ে বসে আকাশ-পাতাল কি ভাবছিলি?

মিলন বুঝল অমিতা তার প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেল।...কাকুর বা তার অশান্তি দূব করার জন্য অমিতা নিশ্চয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা এখানে আসেনি। সাজ দেখেও তাই মনে হয়। রাগ চেপে জবাব দিল, আকাশ-পাতাল ভাবার কিছু কারণ ঘটেছে...খানিক আগে এলা এসেছিল।

অমিতা এবারে সত্যিকারের অবাক। একটু বাদে দু'চোখে কৌতূহল উপচে উঠল। —সে কি রে—সেই জন্যে তোর এত মন খারাপ?

প্রায় রুক্ষ স্বরে মিলন জবাব দিল, আমি তোর মতো মূর্খের স্বর্গে বাস করছি না যে ওই মেয়ে সরে গেল বলে মন খারাপ করে বসে থাকব—তোকেও বলেছি আর রাজা মোদীকেও বলেছি আমি রক্ষা পেলাম।

অমিতা বড় বড় চোখ করে খানিক চেয়েই রইল তার দিকে। তারপর আলতো করে জিগ্যেস করল, আমি মূর্খের স্বর্গে বাস করছি কি রকম?

রাগ করে মিলন বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল। জবাব দিল না।

চাপা হাসিতে অমিতার দু'চোখ চিকচিক করছে।—তা এলা আজ হঠাৎ এসেছিল কেন, তোর কাছে জবাবদিহি করতে?

—না। মিলন ওর দিকে ফিরল।—সে তার বাপের মেয়ে, সব কিছুর আগে তার

বাপের সুখ-দুঃখের চিন্তা।...এজন্যে ওকে এখন আমি তোর থেকে বেশি নির্বোধ ভাবি না।

অমিতা রাগ দেখাতে গিয়ে হেসে ফেলল।—তোর যে বেজায় সাহস দেখি রে আজ, যা মুখে আসে তাই বলছিস...তা বাপের সুখ-দুঃখের চিন্তা নিয়ে এলা তোর কাছে কেন, পুরনো ভালোবাসার দোহাই দিয়ে তোকে দলে টানার জন্য?

—না। ওরা ধরে নিয়েছে রাজা মোদী আমাকে দলে টেনে প্রমোশন দিয়ে সকলের মাথায় তুলছে, এমন কি এত যে আপনার জন কাকা, তার কাছ থেকেও আমাকে পৃথক করেছে—আপিসে যে গণ্ডগোলের ঝড় উঠেছে তার সব-কিছুর মূলে আমি—আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে হেমরাজ মোদী রাজি হয়নি সেই রাগে রাজা মোদী তাকে সরাতে যাচ্ছে, আর কাকুরও আপত্তি ছিল বলে আমাকে মাথায় তুলে তার ওপরেও শোধ নিচ্ছে।

মুখখানাকে যথাসম্ভব নিরীহ করে অমিতা বলল, এ আর এমন কি বেশি বলেছে, আমিও এটাই সত্যি বলে জানি...গণ্ডগোলের শুরু তো তোকে নিয়েই—

—এক কণাও সত্যি নয়। মিলন সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝিয়ে উঠল, এখানকার চাকরিতে ঢোকার আগেই কাকুর মুখে শুনেছি জ্ঞাতিদের মধ্যে হেমরাজকে সরানোর ষড়যন্ত্র চলছে। রাজা মোদী গা করেনি বলেই এত দিন তা হয়নি। আমার ধারণা, বাপ মারা যেতে তিন আনা অংশের মালিক হবার পর কোম্পানির সর্বেসর্বা হয়ে বসার লোভে সে এই কাজ করছে—আমি এ কথা এলাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছি, আরো বলেছি, কাকুকে জব্দ করার জন্য আমাকে মাথায় তোলা হচ্ছে বুঝলে এ চাকরির মায়া আমি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাকুর কাছে ফিরে যাব!

রাগে আর উত্তেজনায় মিলনের সমস্ত চোখ মুখ লাল। অপলক ওই মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে অমিতা শব্দ না করে বড় নিঃশ্বাস ফেলল একটা। গলার স্বরে ঠাণ্ডা কৌতুক, একটা কথার জবাব দে, হেমরাজ যদি মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে অতটা বেঁকে না বসত আর এলাও যদি বাপের কথায় অন্যত্র বিয়ে করতে রাজি না হত, তাহলেও বাবা-মায়ের এ বিয়েতে শেষ পর্যন্ত আপত্তিই থেকে যেত। তাদের...বিশেষ করে বাবার মুখ চেয়ে তুই এলার মতো সরে দাঁড়াতে পারতিস?

—না! তাহলেও কাকুকে কেউ জব্দ করতে চাইলে তা বরদাস্ত করতাম না!

—আ-হা, কি বিবেচনা তোর, বাবা তাহলে সব থেকে বেশি জব্দ হয়ে থাকত তোরই কাছে, আমি যদ্দুর বুঝেছিলাম, বাবা তাহলে চাকরিই ছেড়ে দিত...এখন সেই বিয়ে হল না বলে কাকুর জন্য এত মায়া তোর...কিন্তু তুই কত বাধ্য ছেলে, চাকরিতে বড় হবার কত আশা তোর, বাবার কি এখনো তা জানতে বুঝতে বাকি আছে বলছিস?...হেমরাজের সঙ্গে তার সব থেকে বিশ্বস্ত মানুষ বাবাকেও জব্দ করার জন্যেই যে তোর এত তড়ি-ঘড়ি *প্রমোশন*—বাবা এ-ও ভাবছে না তোকে কে বলল?

নাগালের মধ্যে না পেলে যে যন্ত্রণা নিজেকেই দহন করে তেমনি একটা যন্ত্রণার অনুভূতিতে মিলনের সমস্ত মুখ কালো হয়ে উঠছে। ওর মুখ দু'চোখে আগলে রেখে তেমনি প্রায় গম্ভীর টিপ্পনীর সুরে অমিতা আবার বলল, ছেলেবেলা থেকে তোর বিরাট বড় হবার আশা, যেমন ভেবেছিলি হেমরাজ মোদী তেমনি আনন্দ করে তোর সঙ্গে *মেয়ের বিয়ে দিলে এত বড় কোম্পানীতে তোর পোজিশনখানা কি হত সে-চিন্তা কোনো*

দিন মনে আসেনি এ-কথা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারিস?...আর সর্বেসর্বা হবার লোভ থাকলে রাজা মোদীর তোকে সাপোর্ট করার থেকে শত্রুতাই করার কথা এটা তোর উর্বর মস্তিষ্কে একবারও ঢুকল না?

...বিলেতে থাকতে অনেক বড় স্বপ্নই মাথায় ঘুরপাক খেত সত্যি কথাই, যদিও এলাকে পাওয়াটাই সব থেকে বড় লাভ ভাবত। কিন্তু অমিতা শেষে যা বলল সে-চিন্তা সত্যি মনে আসেনি। লোভ থাকলে রাজা মোদীর সাহায্যের বদলে শত্রুতাই করার কথা। তবু এ-কথা শোনার পর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠার সুযোগ পেল। ঝলসেই উঠল প্রায়।—তাহলে তুই বলতে চাস, আর কাউকে ক্ষমতা আর দাপট দেখাবার জন্য রাজা মোদী এ লড়াইয়ে নেমেছে?

অমিতার দু'চোখ বড় বড় আবার।—আর কাউকে বলতে...? ব্যাটাছেলে না মেয়েছেলে?

—আর কাউকে বলতে কে তুই খুব ভালোই জানিস। সব জেনেশুনে ও-রকম চরিত্রের একটা লোককে এ-ভাবে আসকারা দিতে লজ্জা করে না তোর?

কার কথা বলছে অমিতার এতক্ষণে বোধগম্য হল যেন। ফলে গলা দিয়ে বিস্ময় ঝরল।—ও-রকম একটা লোকের চরিত্রের সব দিক তোর জানা হয়ে গেছে তাহলে!

—শুধু আমায় কেন, জানা সকলেরই হয়ে গেছে, শুধু তোরই মতিচ্ছন্ন হয়েছে বলে আগুন নিয়ে খেলছিস। যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে একটা মেয়ে আত্মহত্যা করে বেঁচেছে, আর তার পরেও যে-লোক টাকার জোরে দাপটের সঙ্গে আর পাঁচটা বাজে মেয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় তাকে কি বলে তুই প্রশ্রয় দিস—কাকু একবার যা করেছে তোর ভালো চায় বলে করেছে, তার জন্য আজ সে এমন শত্রু হয়ে গেল?

এর পরেও অমিতার মুখে রাগের চিহ্নও নেই। সেই থেকে ও-যেন কেবল মজাই পাচ্ছে। আলতো করে বলল, বাবার থেকে এখন বড় শত্রু তো তুই-ই দেখছি।...যশোদা মোদীর আত্মহত্যা নিয়ে তুই আগেও একদিন কি যেন বলছিলি...তা মেয়েটা কি ধরনের যন্ত্রণা নিয়ে আত্মহত্যা করেছে তোর জানতে কিছু বাকি নেই তাহলে?...আর দাপটের সঙ্গে যে বাজে মেয়েগুলোকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় তাদেরও খবর রাখিস? ভালো ভালো —অমিতা শব্দ করে হেসে উঠল একটু—তা তোর এখন কি ইচ্ছে?

—আমার ইচ্ছে শুনবি? আমার ইচ্ছে আমি কালই কাকু-কাকিমাকে জানিয়ে দিই কি-জন্যে কি-ভাবে তুই কুশল বোসকে দিল্লি থেকে তাড়িয়েছিস—আর চিঠিতে কলকাতায় ওই লোককেও খোলাখুলি লিখে দিই তুই তার সঙ্গে কি-রকম ভাঁওতাবাজী করেছিস!

দু'চোখ বিস্ফারিত করে অমিতা ওর দিকে চেয়ে রইল শুধু। মিলন আরো তেতে উঠল, দেখছিস কি? যা বললাম বুজতে অসুবিধে হচ্ছে?

একটা রুদ্ধ নিঃশ্বাস বুক খালি করে বেরিয়ে এলো যেন।—নাঃ, হাড়ে হাড়ে বুঝছি, আর সেই জন্য তোকেই দেখছি। চোখে মুখে হাসি উপচে পড়ছে অমিতার, কিন্তু হাসছে না।—রাগের ভেতর দিয়ে তোর যা টান দেখছি আমার ওপর, এত কাছের সম্পর্ক না হলে তোকে নিয়েই আমাকে বিপদে পড়তে হত দেখছি!

মিলন চেঁচিয়ে ধমকে উঠল, অমি! আমি ইয়ারকি করছি না—কাকুর শরীরের কথাও একবার ভাববি না?

—ভাবছি বলেই যা করার করছি। চেয়ার ছেড়ে অমিতা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। দুই ঠোঁটে হাসি ছুঁয়ে আছে।—আমার ব্যাপারে বাবা অনেক আগেই হাল ছেড়ে বসে ছিল—তার শরীরের জন্য আমার থেকে তুই বেশি দায়ী।...যাকগে, যা-কে নিয়ে এত ভাবনা, তার চরিত্রের খেলা দেখতে এখনো কিছু বাকি আছে তোদের।...চলি, আর ভাবিস না, রাতে ভালো করে ঘুমোতে চেষ্টা করিস।

মিলন নির্বাক দাঁড়িয়ে ওকে চলে যেতে দেখল। অন্ধকারে মিশে যেতে দেখল। তারপরেই ছ'সাত মাস আগে দিল্লির স্টেশনে ট্রেনের ভিতরে ওর সেই এক সন্ধ্যার আচরণ আর কথাগুলো কেন যেন মনে পড়ে গেল।...ট্রেন ছাড়ার সময় হতে অমিতা বড়দি মেজদি ছোড়দিকে একে একে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলেছিল, আবার কবে দেখা হবে না হবে ঠিক নেই—দোষ নিস না, আশীর্বাদ রাখিস।...মিলনের তক্ষুনি মনে হয়েছিল, ওর ওই আচরণ আর কথাগুলোর কিছু অর্থ ছিল। আর আজও মনে হল, অমিতার এই হাব-ভাবের বা ওকে আর কাকুকে নিশ্চিন্ত করার কথাগুলোর মধ্যে বিশেষ কোনো তাৎপর্য আছে।...কি তা ভেবে পাচ্ছে না বলেই নিশ্চিন্ত হবার বদলে ছটফটানি বাড়ছে।

## দশ

পরের কটা দিন অমিতার কথা আরো বেশি মনে পড়েছে। হাওয়া যে-দিকে গড়িয়েছে তাতে নিশ্চিন্ত থাকার মতো কোনো জোরই পাচ্ছে না। উল্টে অফিসে মিলনের সর্বক্ষণ একটা চাপা অশান্তির মধ্যে কাটছে। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অন্য ডাইরেক্টরদের দাবির জবাবে এবারও মিটিং ডাকেননি। ডাকবেন না জানা কথাই। কিন্তু এবারে অন্য ডাইরেক্টররা ক'জনে মিলে মিটিং-এর নোটিস দিয়েছে। এই মাসেরই আট দিন বাদে সেই মিটিং-এর ডেট ফেলা হয়েছে। এ-ও অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও মিলন আশা করেছিল নিশ্চিন্ত থাকার মতো কিছু ঘটবে।

তার মধ্যে বিপর্যয় ঘটানোর এই শেষ প্রস্তুতি, এই নোটিস। তাতে প্রথম স্বাক্ষর রাজা মোদীর।

...কিন্তু তারপর আজ চার দিন হল রাজা মোদীর পাত্তা নেই। অফিসে আসছে না। বাড়িতেও নিপাত্তা। অন্য ডাইরেক্টররা সকলেই বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। হাল ধরবে যে এ-সময় সে নিখোঁজ কেন? মিলনের কাছেই এসে বার বার তারা খোঁজ নিচ্ছে তার কোন হদিস মিলল কিনা। না, মিলন কিছুই জানে না। কিছুই বুঝছে না। অমিতাকে জিগ্যেস করলে হয়তো জানা যেতে পারে। ফোনে তার সঙ্গে রোজই কথা হচ্ছে। কিন্তু অমিতা-ও এ-ব্যাপারে আশ্চর্য রকম চুপ।

মিলনের অন্য দিকের অশান্তি কাকার কারণে। কাকুর ব্লাডপ্রেসার বেড়েই চলেছে খবর পেয়েছে। কিন্তু ফোনে সে যতবার তাকে দেখতে যেতে চায় অমিতা পরিষ্কার নিষেধ করে।—কাকুর ভাল চাইলে তোর এখন না আসা ভাল। আসার হলে নিজেই বলব। সব ঠিক হয়ে যাবে, ভাবিস না—

ছ'দিনের দিন এক তাজ্জব কাণ্ড। হেমরাজ মোদী মিলনকে তাঁর ঘরে ডেকে

পাঠালেন। প্রথম যেদিন চাকরিতে বহাল হল সেদিন ছাড়া সে আর তাঁর ঘরে ঢোকেনি। অফিসের কাজেও কোনো নির্দেশ এযাবৎ তাঁর কাছ থেকে আসেনি। মিলন হন্তদন্ত হয়ে ছুটল। কাল বাদে পরশু সেই ধস নামানোর মিটিং। সে-পর্যন্ত হেমরাজ মোদীই ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। রাজা মোদীর পাত্তা এখনো মেলেনি বটে, কিন্তু পুষ্করমলকে চিঠিতে জানিয়েছে, তার কিছুদিনের নিরিবিলি বিশ্রাম দরকার, তাই নার্সিং হোমে আছে। কোথায় কোন্ নার্সিং হোমে লেখেনি। সকলেই আশা করছে আজ কালের মধ্যেই এসে যাবে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের এমন খোশ মেজাজ দেখবে মিলন আশা করেনি। সাদর আহ্বান জানালেন, এসো—সীট ডাউন প্লীজ। তোমার কাকার অসুখ শুনেছি, ক'দিন অফিসেও আসছেন না, আমিও এ ক'দিন এত ব্যস্ত ছিলাম—খবর নেবার সময় পাইনি। অফিসে আসতে না পারলে উনিই সাধারণত ফোনে আমাকে জানান—কিন্তু কোনো ফোনও পাইনি, কেমন আছেন এখন?

—তেমন ভাল না। প্রেসার খুব হাই।

—সে তো বরাবরই হাই। গলায় নিখাদ দরদ ঢেলে হেমরাজ মোদী বললেন, তার ওপর আবার এত ভাবনা-চিন্তা করেন। আমাদের এই বয়সে কি আর অত ভাবনা-চিন্তার ধকল পোষায়। যাকগে, আর ইউ ভেরি বিজ্‌ই নাও? মিলন ঘাড় নেড়ে খুব ব্যস্ত নয় জানাতে তিনি আবার বললেন, তাহলে চলো আজ আমি একটু ফ্রি আছি—তাঁকে দেখে আসি। তুমি রেডি হয়ে নাও, আমি দশ মিনিটের মধ্যে নিচে নামছি।

মিলন খানিকটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে বেরিয়ে এলো। হেমরাজ হুট্ করে গিয়ে হাজির হলে কাকুর কি রিঅ্যাকশন ভেবে পাচ্ছে না। আবার তাঁর সঙ্গে ওকে দেখলেই বা কি হবে? তাড়াতাড়ি ফোন করল একটা। অমিতাই ধরল। শুনে অমিতাও আশ্চর্য ঠাণ্ডা গলায় বলল, নিয়ে আয়। আমি বাবাকে বলে রাখছি। অবাক হওয়া দূরে থাক, অমিতা যেন জানতই ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের এমন একটা সদিচ্ছা হবে। ফোন ছেড়ে দিল।

অনুপমবাবু ঘরের শয্যায় থাকতে রাজি হলেন না। বসার ঘরে এসে বসলেন। বললেন, সোফাতে বসে অনেক আরাম পাব।

প্রেসার এখনো চড়া। তার ওপর হেমরাজ স্বয়ং আসছেন দেখতে। দুই কারণেই মুখ বেশ লাল এখনও।

এলেন। তিনিই বাইরের বারান্দার সিঁড়ি টপকে আগে উঠে এলেন। পিছনে মিলন। বসার ঘরে পা দিতে অনুপমবাবু সসম্ভ্রমে সোফা ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন, হেমরাজ বাধা দিলেন। বললেন, উঠতে হবে না, বসুন। নিজেও একটা চেয়ারে আয়েস করে বসলেন।
—প্রেসার নিয়ে এমন গণ্ডগোলে পড়লেন কেন, বেশি ওয়ারি করতেন বুঝি?

অনুপমবাবু সখেদে জবাব দিলেন, না...আমি ওয়ারি করে আর কি করব। কাল বাদে পরশু ওরা তাহলে মিটিং ডাকছে?

হৃষ্ট বদনে হেমরাজ মাথা নাড়লেন, ডাকলেও আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই —আর ওয়ারি-টোয়ারি নয়, চটপট সেরে উঠুন, এখন অনেক কাজ।

এই সংকটের সময় অনেক কাজটা কি অনুপমবাবু বা মিলন কারো মাথায় ঢুকল না। প্রসন্ন মুখে হেমরাজ ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। মিলন দাঁড়িয়েই ছিল, তাকে বসতে ইশারা করলেন। মিনতি দরজার আড়ালে। দরজার এ-ধারে হাত-

দুই ভিতরে অমিতা দাঁড়িয়ে। ওর এ-ভাবে এসে দাঁড়ানোটা মিলনের কাছে খুব স্বাভাবিক লাগছে না। ভাবল, কাকুর পাছে উত্তেজনা বাড়ে সেই জন্যেই এসেছে। অমিতা চুপচাপ হেমরাজের দিকেই চেয়ে ছিল। তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হতে হেমরাজ জিজ্ঞেস করল, আপনার মেয়ে?

অনুপমবাবু মাথা নেড়ে সায় দিলেন। মেয়ে ঘরের মধ্যে এসেছে এটা তিনি এই প্রথম লক্ষ্য করলেন।

হেমরাজ আবার অমিতার দিকে ফিরতে সে দু'হাত জুড়ে নমস্কার জানাল। মিলনের চোখে কেন যেন এ-ও স্বাভাবিক ঠেকল না।

হেমরাজ সহাস্যে মাথা ঝাঁকালেন, বললেন, অনেক দিন আগে দেখেছিলাম বোধ হয়, ভারী সুন্দর মেয়ে হয়েছে তো!

অনুপমবাবু হাসলেন একটু। সৌজন্যের খাতিতেও অমিতার ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসির রেখা দেখা গেল না। মিলনের বিস্ময় বেড়েই চলেছে। সপ্রতিভ মেয়েটা বাইরের লোকের সামনে এসেও এমন চুপচাপ কেন? মনে হচ্ছে না অকারণে দাঁড়িয়ে আছে। মিলনের নিজেরই অস্বস্তি লাগছে। এরপর কোম্পানির গণ্ডগোলের প্রসঙ্গ উঠবেই, কিন্তু হুট্ করে উঠে চলেই বা যায় কি করে? বিশেষ করে হেমরাজ নিজে যখন ওকে বসতে বলেছেন।

অনুপমবাবু সবিনয়ে বললেন, একটু চা-টা আনার অনুমতি করুন।

—কিছু না, নাথিং—আমি যখন তখন কিছু খাই না আপনি তো জানেন। আপনাকে দেখতে এলাম, আর জানাতে এলাম, আর কোন ভাবনা মাথায় রাখবেন না।—সব ঠিক হয়ে গেছে—এ জীবনে কেউ আর হেমরাজের সঙ্গে লাগতে আসবে না—আমি একলাই এখন বীভারস-এর ন' আনার মালিক।

অনুপমবাবু বিমূঢ়। ভুল শুনছেন, না লোকটা ভুল বকছে বুঝতে পারছেন না। কি বলছে, ফিরে জিগ্যেস পর্যন্ত করতে পারছেন না। ওদিকে একই অবস্থা মিলনের। তার চোখে মুখে রাজ্যের বিস্ময়।

হেমরাজ জোরেই হেসে উঠলেন।—খুব অবাক হয়ে গেছেন তো? রাজ্ এসে প্রস্তাবটা দিতে আমি নিজেই কি কম অবাক হয়েছিলাম। বিশ্বাস করতে পারিনি, ভেবেছিলাম, মওকা পেয়ে ঠাট্টা করতে এসেছে। সেদিন রাত নটায় সোজা আমার বাড়িতে আমার ঘরে এসে বলল, আংকল দ্য গ্র্যান্ড, ভেবে দেখলাম তোমাকে সরিয়ে কোম্পানিটার বারোটা বাজাই কেন, তার থেকে তুমি আমার তিনআনা শেয়ার কিনে নাও—অফ কোর্স প্রপার প্রাইস-এ, তারপর তুমিও বাঁচো আমিও বাঁচি—বীভারস্ও বাঁচুক।

সকলের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে হেমরাজ হাসিমুখে বলে গেলেন, আমার তার পরেও বিশ্বাস হচ্ছিল না, ও জানাল ওর ডিসিশান পাক্কা—নিচে তার অ্যাটর্নি বসে আছে—তাকে ডেকে কি খসড়া হবে করা হোক—সব সেটল্ হয়ে যাবার আগে কেউ যেন কিছু না জানতে পারে। আর বলল, সব সেট্ল আর লেনদেন না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমার বাড়িতেই গা-ঢাকা দিয়ে থাকছি—সব জায়গা চষে বেড়ালেও কেউ এখানে আমার খোঁজ করবে না।...আমি বললাম, তুই আমার সঙ্গে থাক, তোর শেয়ার বিক্রি করার দরকার কি? তাতে রাজি নয়, টাকা-পয়সা যা পাবে কুড়িয়ে নিয়ে শিগ্গীরই ইউরোপ চলে যাবে,

আপাতত এ ছাড়া আর কিছু তার মাথায় নেই।...গতকাল সব লেন-দেন সই-সাবুদ রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেল।

বিকেলের পড়ন্ত আলোয় হেমরাজের মুখখানা ভারী কোমল দেখাচ্ছে। গলার স্বরও তেমনি। অনেকটা নিজের মনেই বললেন, রাজ্ ইজ রা-জ—আনপ্রেডিক্টবল—বাট্ গ্রেট্।

অনুপমবাবু তার পরেও নির্বাক খানিকক্ষণ। সংকটের মুখে এমন অভাবিত কিছু ঘটতে পারে কল্পনাও করা যায় না। তাঁরই বুক থেকে যেন জগদ্দল পাথর নেমে গেল একটা। মাথাটাও অদ্ভুত হালকা লাগছে। ভাইপোর দিকে তাকালেন একবার। সে নিশ্চল বসে আড়চোখে অমিতাকে দেখছে। রাজা মোদী সম্পর্কে হেমরাজের শেষের মন্তব্যটুকু অনুপমবাবুরও বুক পর্যন্ত পৌঁছেছে। আস্তে আস্তে বললেন, এখানকার সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে ছেলেটা একলা এখন বিদেশে ঘুরে বেড়াবে—সেখানেই থাকবে।

—না বাবা, একলা নয়, তার সঙ্গে আমিও যাচ্ছি, আমিও থাকব।

ঘরের মধ্যে একটা বাজ পড়লেও কেউ বোধহয় এত চমকে উঠত না। সকলের চোখ অমিতার দিকে। কথাগুলো সেই বলল। স্থির, শান্ত।

অনুপমবাবুর গলা দিয়ে স্বর বেরুতে চায় না।—তুই সঙ্গে যাবি...থাকবি...কি বলছিস তুই?

—হ্যাঁ বাবা, তোমার শরীর ভালো ছিল না বলে বলিনি। এরপর তুমি শিগগীরই সেরে উঠবে জানি, তাই এখন বললাম। জবাব দিয়ে একটু ঘুরে সোজা হেমরাজের দিকে তাকাল, দু'চোখ তাঁর মুখের ওপর স্থির। বলল, আমি আপনাকে দু'চারটে মাত্র কথা জিজ্ঞাসা করব বলে বিনা অনুমতিতে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। অপরাধ নেবেন না...আমার জন্যে নয়, আপনার জবাবের ওপর অনেকের ভুল ভাঙা না ভাঙা নির্ভর করেছে।

এত বড় কোম্পানির মেজাজী ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হেমরাজ মোদী স্থান কাল ভুলে অমিতার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর আত্মস্থ একটু। ডাকলেন, এদিকে এসো মায়ী।

অমিতা পায়ে পায়ে তাঁর কাছে এগিয়ে এলো। অনুপমবাবু বিমূঢ়। দরজার আড়ালে মিনতিও।

খুব নরম গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, কি বলবে মায়ী?

তেমনি ঠাণ্ডা গলায় অমিতা বলে গেল, রাজের স্ত্রী যশোদা আত্মহত্যা করেছিলেন, তাঁর কলঙ্ক ঢাকার জন্যেই রাজ্ সমস্ত দুর্নাম নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল কিনা আপনি সব থেকে ভাল জানেন। কারণ আপনিই যশোদাকে পছন্দ করে আর তাঁর অতীত না জেনে তাঁকে ঘরে এনেছিলেন। বিয়ের পরেও যশোদা সংযত ছিলেন না—আপনাদের কাছে সব গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যেতেই যশোদা মোদী আত্মহত্যা করেছিলেন কিনা?

ঘরের মধ্যে বাতাসও নিশ্চল বুঝি। হেমরাজ সন্তর্পণে ভারী নিশ্বাস ফেললেন একটা। আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন। বললেন, সব সত্যি।...বউয়ের কলঙ্ক ঢাকার জন্যেই রাজ্ নিজেকে দুর্নামের ভাগী করেছে, সেই সঙ্গে আমাকেও সে লোকের ধিক্কার থেকে রক্ষা করেছে। কিন্তু মায়ী এ-সব কথা তুমি জানলে কি করে?...রাজ্ তোমাকে বলেছে?

অমিতা জবাব দিল, সে নিজে থেকে বলেনি, আমাকে তার বলার দরকার হয়েছিল। ...আর একটা কথা, আপনি এরপর আপনার চেনা-জানা একে একে তিনটি মেয়ের সঙ্গে

রাজের বিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন, তারা কেউ রাজ্‌কে অপছন্দ করেনি, বিয়ের আশায় তারা রাজ্‌-এর ক্লাবে যাতায়াত করত—এও সত্যি কিনা?

অমিতার মুখের দিকে চেয়ে থেকে হেমরাজ আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন। বললেন, এও সত্যি, লোকে না বুঝে রাজ্‌-এর দুর্নাম দিয়েছে, কিন্তু তারা কেউ খারাপ মেয়ে ছিল না। একটু থেমে আরো কোমল গলায় বললেন, এখন বোধহয় বুঝতে পারছি তাদের একজনকেও রাজ্‌-এর কেন পছন্দ হয়নি।

দুজনের চোখ দুজনের মুখের ওপর। হেমরাজ আবার বললেন, এবারে তুমি আমার একটা কথার জবাব দাও মায়ী...রাজ্‌ আমাকে এত ভালবাসে, কিন্তু এলার বিয়ে হয়ে যাবার পরেও সে আমার ওপর অমন ক্ষেপে উঠেছিল কেন...তোমার বাবার আর আমার ওপর রাগ করে তুমি তাকে উসকে দিয়েছিলে? আমি রাগ করব না, ঠিকঠিক বলো—

মিলন উৎকর্ণ। অনুপমবাবু বিমূঢ়। বাইরে মিনতিও তাই।

মৃদু শান্ত গলায় অমিতা বলল, রাজ্‌ আমাকে আর এলাকে কথা দিয়েছিল মিলনের সঙ্গে বিয়ে যাতে হয় সে দেখবে। তা হল না দেখে শুধু আমার কাছে কথার খেলাপ হল বলে সে এই ক্ষমতা দেখাবার লড়াইয়ে নেমেছিল।...আমি উসকে দিইনি, আপনার কথা ভেবে আর বাবার শরীর খারাপ হচ্ছে দেখে আমিই তাকে ফিরিয়েছি।

প্রসন্ন হাসিতে হেমরাজের সমস্ত মুখ ভরে গেল। বললেন, ও ছোঁড়া এখন মেজাজে আছে তাকে বলে লাভ নেই—তুমি শুধু জেনে রেখো মায়ী, যে তিন আনা অংশ সে আমার কাছে বেচে দিল তা উপহার হিসেবে তার নামেই তোলা থাকবে—আমি সে-রকম লেখাপড়া করে রাখব।...তুমি শুধু দেখো, ও যেন তার আংকল দ্য গ্র্যান্ডির কাছে ফেরে আর তারপর সমস্ত বীভারস-এর হাল ধরে।

ধীর পায়ে অমিতা ভিতরের দরজা দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। সূর্য অনেকক্ষণ ডুবেছে। সব ঘরে ঘরে আলো জ্বলেছে। বাইরের বারান্দায়ও। হেমরাজ মোদী চলে গেছেন। অনুপমবাবু মিনতি আর মিলন তখনো বসার ঘরে বসে।

ফটকের কাছে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল কেউ টের পায়নি। উপর্যুপরি তিনটে হর্নের শব্দ শুনে তিনজনেরই চমক ভাঙল। মিলন উঠে দাঁড়িয়ে পায়ে পায়ে বারান্দায় এসেই থমকে দাঁড়াল। সেখানেই ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘরের দুজনকে অস্ফুটস্বরে জানান দিল, রাজের গাড়ি...

কথা শেষ হবার আগেই ভিতরের দরজা দিয়ে অমিতা ঘরে ঢুকল। বেরুনোর জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছে। পরিমিত সাজ পোশাক প্রসাধনও করেছে। কিন্তু তেমনি স্থির শান্ত। মাকে বলল, আমি একটু বেরুচ্ছি। বাবার দিকে তাকাল।—এবারও তুমি খুশি হবে না হয়তো...কিন্তু মানুষ বিচার করলে ঠকবে না এটুকু ভরসা দিতে পারি।

মিলনের কাছে এসে অমিতা আর একবার দাঁড়ালো। ঠোঁটে সামান্য হাসির ছোঁয়া। খুব চাপা গলায় বলল, চিন্তা নেই, চাকরিতে তুই আরো বড় হবি।...বাবা-মা তোকে তাদের ছেলে ভাবে, এর পরেও তাই যেন ভাবে সে-চেষ্টা করিস।

অমিতা সিঁড়ির দিকে এগলো। নিজের অগোচরে মিলন আরো খানিকটা এগিয়ে এসেছে। দেখল, বারান্দার সিঁড়ি ধরে নেমে অমিতা গাড়ির কাছে যেতে রাজ্ দরজা খুলে দিল। অমিতা তার পাশে বসল। মিলনকে দেখে এক মুখ হেসে রাজ্ মাথা ঝাঁকাল। তারপর চোখের পলকে গাড়িটা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

অনুপমবাবু উঠলেন। নিজের ঘরের দিকে এগোলেন। পিছনে মিনতি। একবার থেমে বারান্দায় মিলনের দিকে চেয়ে বললেন, আজ পারিস তো থেকে যা...।

কাকিমা পারিস তো বলল, থেকে যাবি বলল না। কাকু কিছুই বলল না। অমিতার কথাগুলো কানে এখনো খট্‌খট্ করে বাজছে।

পায়ে পায়ে মিলন বারান্দার চেয়ারগুলোর কাছে ফিরে এলো। বারান্দার আলোটা ভাল লাগল না। নিভিয়ে দিল। একটা চেয়ারে বসল। চুপচাপ বসেই থাকল।...খুব বড় রকমের তফাৎ কিছু হয়ে যায়নি। যেমন চলছিল উনিশ বিশ তেমনি চলবে। মিলনের অনেক বড় হবার প্রত্যাশা ছিল। অনেকটা হয়েছে। হয়তো আরো হবে। আরো পাবে। কিন্তু বুকের ভেতরটা টনটন করছে। কিছু সে হারিয়েছে, যা বাইরের কোন ঐশ্বর্য দিয়ে ফিরে পাওয়া যায় না।

...মিলন মজুমদার তার অতীত খুইয়ে বসেছে।

---

# মেঘের মিনার

শ্রী দিলীপ মুখোপাধ্যায়
প্রীতিভাজনেষু

বন্ধু, একজন সাধারণ লোক অসাধারণ হয়ে উঠতে চেয়েছিল। এই চাওয়াটা রোগের মতো আর শোকের মতো তার কাঁধে চেপে বসেছিল। তাই একমনে বসে সে একটা সিঁড়ি তৈরি করে চলেছিল। অঢেল টাকার সিঁড়ি, প্রচণ্ড ক্ষমতার সিঁড়ি, অশেষ প্রতিপত্তির সিঁড়ি। এই সিঁড়ি ধরে সে লক্ষ্যে পৌঁছুবে। তারপর? তারপর নিজের বিশ্বাসের ওপর শক্ত দুটো পা ফেলে দাঁড়িয়ে সে অজস্র সুখ কিনবে আর অফুরন্ত শান্তি কিনবে। এই করে খুব সাধারণ মানুষটা অসাধারণ হয়ে উঠবে।

...কিন্তু সেই বিশ্বাসের বাসাটা ঠিক কোথায় বলতে পারো বন্ধু? আর ওই অজস্র সুখ আর অফুরন্ত শান্তির দোকান দুটো? যাক, এ নিয়ে আর আমি মাথা ঘামিয়ে মরি কেন, এখন সব তোমার কল্পনা আর আবিষ্কারের মুখে ঠেলে দেওয়া যেতে পারে। তুমি তো রসদের জন্য হাঁ করে বসেই ছিলে। কিন্তু যা-ই করো, দোহাই বন্ধু, একজন সাধারণ মানুষকে তুমিও যেন অসাধারণ করে তুলো না। কেবল, সবই জ্বলে পুড়ে সত্যি ছাই হয়ে যায় কিনা, পারো তো এই সন্ধানটুকু রেখে যেও। বোধ হয় যায় না, নইলে তোমাকে এই দুর্বলতার রসদ যোগানোর তাগিদ কেন?

যাক, আর লিখব না। কেবল রাজা আহমেদ আর রমা চন্দর জন্যে যে দায়িত্বটুকু তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে এসেছি সেটুকু যথাযথ করে দিও, আর সময় পেলে আমার সেই ছানিপড়া বুড়ো শিল্পীর চোখ অপারেশনের সময় একটু খবর নিও।

—শুভ্রেন্দু নন্দী পড়ার পর চিঠিটা হাতে নিয়ে রমা চন্দ পাথরের মতো বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর রাখল ওটা। আনন্দবাবুর মনে হল ওর কালো মুখে আর কালো চোখে কিছু যেন সংকল্পের আলো জমাট বাঁধছে। একটিও কথা না বলে তিনি আর এক মানুষের দিকে ঘুরে তাকালেন।

হাত তিনেক দূরে শিরদাঁড়া টান করে বসে আছে রাজা আহমেদ। ও যদি হঠাৎ একদফা হেসে ওঠে, অবাক বা বিরক্ত হওয়া দূরে থাক, আনন্দবাবু একটু বোধহয় স্বস্তি বোধ করতেন। এই রকমই বেসামাল কিছু করে বসা স্বভাব লোকটার। কিন্তু তার বদলে স্বভাব-বিরুদ্ধ উৎসুক গাম্ভীর্যে ও টেবিলের চিঠিটার দিকে তাকাচ্ছে, আর আনন্দবাবুর দিকে আর রমার দিকে। ব্যাপারটার অনেকখানি এখনো যেন বোধের অতীত ওর। রাজা নাম, আর বাঙালী মুসলমান হলেও বাংলা বা অন্য কোনো অক্ষরের সঙ্গে ওর যোগাযোগ নেই। চিঠিখানা পেলে দুমড়ে মুচড়ে গিলে ফেলে কিছু বোঝা যায় কিনা দেখতে চেষ্টা করতে পারে যেন।

চিঠিতে যে রসদের কথা লিখেছেন শুভ্রেন্দু নন্দী সে-সবও আনন্দবাবুর সামনে টেবিলের ওপর পড়ে আছে। শক্তপোক্ত লম্বা বোর্ডফাইল একটা। যে-রকম ফাইলে আপিসের কাগজ-পত্র দুটো ফুটো করে গুঁজে রাখা হয়, অবিকল সেইরকম। কিন্তু ওতে আপিসের বা টাকা পয়সার হিসেব পত্র কিছু নেই। তারিখ বসানো ছাড়া-ছাড়া কতগুলো দিনের হিসেব আছে শুধু। পাতাগুলো সব খোলা আর দুদিক ফুটো করে গোঁজা।...যে দিনগুলো বিশেষ কিছু ছাপ নিয়ে সদ্য সদ্য পিছনে চলে গেল, হয়তো কারখানায় বসে নয়তো কোনো হোটেলে খেতে বসে সেই সব দিনের এক-একটা ভাববর্জিত কথার অক্ষরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। পরপর কোনো দশটা পাতা এক রকমের নয়। আনন্দবাবু জানেন, বাঁধানো খাতায় বা ডায়রিতে নিয়মিতভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে দিনপঞ্জী লেখা

বন্ধুটির ধাত বা স্বভাব নয়। অত ধৈর্যও নেই।

শুভ্রেন্দু নন্দীর বাড়িতে কিছুকাল আগে ওই ফাইলের হদিশ আনন্দবাবু পেয়েছিলেন। আর ভিতরে ভিতরে ওটার ব্যাপারে একটু উৎসুকও ছিলেন। কিন্তু কি আছে ওতে কে জানে, তাই বিনা অনুমতিতে ওর দিকে হাত বাড়াতে সঙ্কোচ বোধ করেছিলেন। মনের ইচ্ছেটা শুভ্রেন্দু নন্দী টের পেয়েছিলেন বোধহয়। হালকা সুরে একদিন বলেছিলেন, ওগুলো তোমার সাহিত্যের খোরাক নয় বন্ধু, ওগুলো সব ছোট বড় এক একটা আয়না, যে আয়নায় এক একদিনের শুভ্রেন্দু নন্দীকে এক-একভাবে দেখা যেতে পারে, চেনা যেতে পারে। তখন দেখতে পাইনে বলে শুধু লিখে রাখি, পরে দেখতে বেশ মজা লাগে।

ভিতরে ভিতরে আনন্দ চক্রবর্তী আরো বেশি সন্ধিৎসু হয়ে উঠেছিলেন। তাগিদের সুরে বলেছিলেন, এত হেঁয়ালি মাথায় ঢোকে না, আরো একটু খোলাখুলি বলো—

সোফা ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে একটা চক্কর খেয়ে নিয়েছিলেন শুভ্রেন্দু নন্দী। এটা তাঁর স্বভাব, হয়তো বা ভিতরের অস্থিরতার প্রতিফলন। কথার মাঝে উঠে দুই-একবার পাক খেয়ে নেন। পকেট হাতড়ে সিগারেট না পেয়ে কোণের টেবিলে ভায়োলিনের বাক্সটার ওপর বারকয়েক টোকা মেরে আবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

বনের ছাড়া বাঘ দেখেছ?

আনন্দ চক্রবর্তী হকচকিয়ে গেছলেন। সঠিক না বুঝেই জবাব দিয়েছেন, সিনেমায় দেখেছি।

ওতেই হবে। কেমন নির্দয় নিষ্ঠায় তারা শিকারের জন্য ওঁত পেতে বসে থাকে দেখেছ?

তাও দেখেছি বোধহয়। অস্বস্তি বোধ করলেও তেমন না ভেবেই জবাব দিয়েছেন আনন্দবাবু।

আরো একটু সামনে ঝুঁকে শুভ্রেন্দু নন্দী বলে উঠেছেন, কিন্তু সেই বাঘ যখন বাঘিনী খোঁজে বা পাল্টা শিকারের জাল গুটি গুটি তাকে ছেঁকে ধরতে আসছে টের পায়— তখন?

কি তখন?

তখন নাকের ডগা দিয়ে হরিণ লাফিয়ে গেলেও তার চোখে পড়ে না।...আমি সেই একাগ্র লক্ষ্যের নির্দয় জীব, সেটাই আমার আসল পরিচয়, আর, এই কাগজে লেখা দিনের ছবিগুলো সেই পরিচয়ের এক-একটা আশ্চর্য ব্যতিক্রম। কথাগুলো গুরুগম্ভীর চাপা, প্রায় অকরুণ। চাউনিটাও অদ্ভুত স্থির।

শুনে আনন্দ চক্রবর্তীর ঔৎসুক্য আরো বরং বেড়েছিল। কাল রাত জেগে ফাইলের কাগজগুলো কতবার পড়েছেন ঠিক নেই। স্নায়ুতে ধাক্কা লাগার মতো এক একটা চিত্রও আছে বটে, তবে বেশির ভাগই ওঁর সেই 'নির্দয় নিষ্ঠার' এক-একটা ব্যতিক্রমের ঘটনা। কখনো বাঘিনী খোঁজার তাগিদের ব্যতিক্রম, কখনো বা পাল্টা শিকরের জালে জড়িয়ে পড়ার। চিঠিতে সেই নির্দয় নিষ্ঠার লক্ষ্যটাও নিজেই লিখে গেছেন—টাকার সিঁড়ি ক্ষমতার সিঁড়ি প্রতিপত্তির সিঁড়ি ধরে নিজের বিশ্বাসের ওপর শক্ত দুটো পা ফেলে দাঁড়াতে হবে —তারপর অজস্র সুখ কিনতে হবে আর অফুরন্ত শান্তি। এই লক্ষ্যের সঙ্গে দুনিয়ায় আর

কোনো কিছুর আপোস নেই।

রমা চন্দর দু'চোখ টেবিলের ওই ফাইলের দিকে ঘুরতে দেখে সংকোচ কাটিয়ে আনন্দবাবু বলে ফেললেন, তোমাকে নিয়েও দুই একটা ব্যাপার লেখা আছে ওর মধ্যে...ঠিক কি না দেখে নিতে পারো...

রমার আজ চব্বিশ বছর বয়স হলেও আনন্দবাবু সেই সাত-আট বছর বয়সের ফ্রক-পরা সময় থেকে দেখে আসছেন ওকে। আনন্দবাবুর উনচল্লিশ এখন, কম্ করে পনের বছরের ছোট। রমা বরাবরই তাঁকে কাকা বলে ডাকে, বছর তিনেক হল নিজের কাকার থেকেও বেশি আত্মজন ভাবে তাঁকে। সেই কারণেই একটু সংকোচ বোধ করেছিলেন আনন্দবাবু। কিন্তু জাত-লেখক তিনি, কারো নিভৃতের পর্দা সরাতে চাইলে সংকোচ সিকেয় তুলে রাখতে পারেন। এই মুহূর্তটা খোয়া গেলে ফিরে আবার ধরা যাবে কিনা কে জানে।

রমা চন্দর কানে কথাগুলো গেছে কিনা বোঝা গেল না। ভেবেছিলেন, শোনামাত্র ও একটু ধড়ফড় করে উঠবে। অন্তত অস্বস্তি বোধ করবে। কিন্তু তার বদলে ঘুরে চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে রইল একটু। কিন্তু আসলে ও যেন আনন্দ কাকুকে দেখছে না, আর দৃষ্টিটাও কাছে নেই খুব। তারপর সামান্য মাথা নাড়ল, অর্থাৎ দেখার দরকাব নেই কিছু। একটু থেমে অস্ফুট জবাব দিল, মিথ্যে লেখার লোক নন উনি—

আনন্দবাবুর আবারও মনে হল, কালো মেয়েটার দুই কালো চোখের গভীরে কিছু যেন আশার আলো আর সংকল্পের আলো জমাট বাঁধছে।

মোটা পাজামা আর আধময়লা হাফসার্ট-পরা রাজা আহমেদ দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। ওই ঘড়ির সঙ্গে কোনো অগোচব নির্দেশের যোগ যেন।

চললে?

বিড়বিড় করে রাজা আহমেদ জবাব দিল, হ্যাঁ সার, পৌনে ন'টা বাজে, কারখানায় যাব।

আনন্দ চক্রবর্তী ভালো করে একদফা দেখে নিলেন ওকে, কিন্তু চোখে মুখে রসিকতার একটা আঁচড়ও খুঁজে পেলেন না।...ওদের শ্রেণীর মিকানিকদের সকাল ন'টা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত ঘড়ি-ধরা ডিউটি ছিল. আসতে যেতে পাঁচমিনিট সময়ের হেরফের বরদাস্ত করতেন না ওদের মালিক। সেই ন'টাই বাজতে চলল, তাই ওর ছোটার তাড়া।

ফাজলামো করছে কিনা আনন্দবাবু নিঃসংশয় নন। বললেন, গিয়ে কি করবে?

থমথমে মুখ রাজা আহমেদের, আর ছোট ছোট চোখ দুটোর গভীরেও যেন ক্রুর খেদ একটু। বলল, তা কি জানি, এ-মাস ছেড়ে সাহেব কত মাস আর কত বচ্ছরের তলব আগাম দিয়ে গোলাম বানিয়ে রেখে গেলেন, হাজিরা দিইগে—

রমা ধমকে উঠল, রাজা—!

রাগ করো আর যাই করো বহিন্জি, এ শালা কার পরোয়া করে? টাকা কে চেয়েছিল —তার বদলে সাহেব একটা মুখের হুকুম খসিয়ে গেলেন না কেন?

উদ্গত আবেগ চাপতে চেষ্টা করে ও হনহন করে ঘরের বাইরে চলে গেল। মুহূর্তের

মধ্যে কি ভেবে নিয়ে আনন্দবাবু ওকে ডেকে থামালেন, রাজা দাঁড়াও, আমরাও বেরুব। রমাকে বললেন, চলো, ঘুরে আসি একটু—

দোরগোড়ায় আনন্দবাবুর পুরনো গাড়ি দাঁড়িয়েই ছিল। রঙপালিশ ওঠা ঝরঝরে দশা গাড়িটার। একদা শুভ্রেন্দু নন্দীই জলের দরে গাড়িটা গছিয়েছিলেন বন্ধুকে। রূপে নয়, গাড়িটা গুণে ভুলিয়ে ছিল আনন্দবাবুকে। নিজের হাতে একটা পুরনো গাড়ির খোল-নলচে বদলে শুভ্রেন্দু নন্দী তাঁর হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। গাড়ি যখন হলই বাইরের ভোলটাও একটু বদলে গাড়িটা ঝকঝকে করে নেওয়ার ইচ্ছে ছিল আনন্দ চক্রবর্তীর। বন্ধু বলেছিলেন, না, ওই রকমই থাক, যে দিন পড়েছে গাড়ি চড়াটাই অপরাধ প্রায়, বাইরেটা যত দীন দশা হবে তত নিরাপদ।

সেই দীন-দশা আরো প্রকট এখন।

ড্রাইভার নেই, নিজেই চালান, রাজা আহমেদ সোজা ড্রাইভারের আসনে গিয়ে বসল। অর্থাৎ সে থাকতে আর কারো চালাবার প্রশ্ন ওঠে না। অগত্যা আনন্দবাবু আর রমা পিছনে। এ সময়টা পথে অন্য গাড়ি আর ট্রাম বাসের ভিড় খুব। গাড়ি বেগেই চলেছে। রাজা আহমেদের নিপুণ দুটো হাত আপনি কাজ করছে, মুখে কথা নেই। পিছনে দুজনই চুপচাপ।

সামনের দিকে চোখ রেখে রাজা ডাকল, সার—

বলো।

বলার আগে কান পেতে কিছু শুনল যেন।—আপনার গাড়ির ডিফারেনসিয়াল আর কাটিং শ্যাফ্ট-এ আওয়াজ দিচ্ছে, চেক্ করে নেওয়া দরকার। গ্যারেজে পাঠিয়ে দেবেন।

রমা চন্দ নিঃশব্দে আনন্দবাবুর দিকে তাকাল। কাজের গাফিলতির দরুন লোকটা কোনো এক মাসে পুরো মাইনে পেয়েছে কিনা সন্দেহ।

আনন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কোন গ্যারেজে দেব? পিছন থেকে তীক্ষ্ণ চোখে লোকটার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছেন।

নানডি অটো হাউসে, জমি তো আর কেউ খেয়ে নেয়নি...মালিক আপনার গাড়ি মেরামতের লেবার চার্চ নিতেন না, এখনো লাগবে না, পার্টস যা লাগে কিনে দেবেন।

...এক নিরক্ষর মিকানিকের ভাবলেশশূন্য ক'টা কথা যে বুকের এমন গভীরে প্রবেশ করতে পারে আনন্দ চক্রবর্তীর যেন জানা ছিল না।

রাস্তাটা বাঁক নিয়ে একটা বস্তির পিছনে এসে মিশেছে। সেখানে প্রায় বিঘে খানেক জমির ওপর একটা মোটর গ্যারাজের কারখানা। মস্ত বড় বড় তিনটে টিনের শেড ছিল এখানে। মোটা মোটা কাঠের খুঁটির ওপর সেগুলো দাঁড়িয়ে ছিল। তার ভিতর দিয়ে তিন ঘরের একটা ছোট দালান। তার মধ্যে এয়ার কুলার লাগানো বড় ঘরটা মালিকের আপিস ঘর আর পরের দুটো কর্মচারীদের। যন্ত্রপাতি বসানো দুটো শেডের নীচে যাবতীয় মেরামতির কাজ হত, আর পাশের তৃতীয় শেড গ্যারাজ হিসেবে ভাড়া দেওয়া হত। ষাট টাকা মাস-ভাড়ায় পঁচিশটি গাড়ি থাকত সেখানে।

কারখানায় ঢোকার মুখে মস্ত দুটো লোহার থামের মাথায় অর্ধ বৃত্তাকারের মেটাল সাইনবোর্ড—নানডি অটো হাউস।...এখন এই সাইনবোর্ডটাই আছে শুধু। আর আছে মাস-

ভাড়ায় গাড়ি রাখার বিচ্ছিন্ন শেডটা।

আর যা আছে তার সবটাই আগুনের ক্ষুধা নিবৃত্তির ধ্বংসাবশেষ। স্নায়ুতে ধাক্কা লাগার মতো বীভৎস, পীড়াদায়ক। কাঠের খুঁটিগুলো পুড়ে অঙ্গার, বিশাল জ্বলন্ত টিনের শেডের খানিকটা কালিবর্ণ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। মেশিনগুলোর পোড়া কাঠামোর দিকে তাকালে ভিতরটা সিরসির করে।

...একটা গাড়ির শুরু থেকে শেষ—যাবতীয় কাজ হত এখানে। তিন রকমের ওয়ার্কশপ ছিল এরই ভিতরে। সামনে মিকানিকাল ওয়ার্কশপ—ছোট বড় অজস্র রকমের যান্ত্রিক গোলযোগ ছেড়ে এনজিন রিং বা বোর করার দরকার হলেও গাড়ি নিয়ে খদ্দেরের অন্যত্র ছোটার দরকার হত না। তারপর বডি ওয়ার্কশপ—এখান থেকে অ্যাক্সিডেন্টের তুবড়নো ভিতর বার দুমড়নো গাড়িও মেরামতের পর রং-পালিশ আর তক-তকে গদি সীট্-এর শোভায় ঝকমকে হয়ে বেরুতে দেখেছেন আনন্দবাবু। আর ওই কোণে ছিল মিটার সহ ইলেকট্রিকাল ওয়ার্কশপ।...এখানে সবই ছিল, সদ্য-বর্তমানে কিছুই নেই। এখানে সবই হত, এখন কিছুই হয় না।

বিশাল কারখানার চার ভাগের তিন-ভাগ দগ্ধ একটা শব পড়ে আছে যেন।

একটু আগে রাজা আহমেদ আনন্দবাবুকে এখানে তার গাড়ি মেরামতের জন্য পাঠাতে বলছিল।

স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে দেখছেন আনন্দ চক্রবর্তী। তাঁর পাশে রমা চন্দ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। তাদের কাছ থেকে হাত পাঁচ ছয় তফাতে রাজা আহমেদ।

রাজা আহমেদ আনন্দবাবুর দিকে ফিরল আস্তে আস্তে। অদ্ভুত ঠাণ্ডা অথচ অদ্ভুত কঠিন মুখ। কোটারের দুই খুদে চোখে একটা ক্রূর খেদ চিকচিক করছে।

—সাহেব মুখের হুকুমটাও খসিয়ে গেলেন না, আপনি দিলেও হবে—দেবেন?

কি হুকুম?

ঠাণ্ডা নির্দয় গলায় রাজা আহমেদ বলল, এখানে এই পোড়া মাটিতে কয়েকটা তাজা মাথা নামিয়ে দিই...

আনন্দবাবু অস্বস্তি বোধ করলেন, কাদের কথা বলছ...জানো নাকি কিছু?

ও বলল, অত জানাজানির কি আছে, চারটে মাথা নামালে একটা দুটো অন্তত ঠিক হবে...

অর্থাৎ একটা দুটো দোষীর মাথা নামাতে গিয়ে বাড়তি কয়েকটা নির্দোষ মাথা যায় তো যাক। অন্য সময় হলে আনন্দবাবু হয়তো হেসেই ফেলতেন। ব্যাটা তাড়ি গিলে এসেছে কিনা সেই সন্দেহও হতে পারত।

কিছু বলার আগে চাপা গলায় রমা চন্দই ধমকে উঠল ওকে, কি যা-তা বকছ?

ক্রূর খেদ মেশানো ছোট ছোট চোখ দুটো রমার দিকে ফিরল। দুনিয়ার সকলের ওপর বিশ্বাস খুইয়ে লোকটা যেন সমস্ত যন্ত্রণা আর সমস্ত ক্ষোভ এই রমণীর মুখের ওপর উজাড় করে দিতে চাইছে। বিড়বিড় করে বলল, আমি তো আজন্ম যা-তাই বকে এলাম—তুমি বোবা মেরে আছ কেন? তুমি কিছু বলছ না কেন? এখানে এসেও মুখ সেলাই করে দেখছ কি?

রমা চন্দ চুপচাপ ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল একটু। বিমনা দৃষ্টিটা আস্তে আস্তে

আনন্দবাবুর দিকে ফিরল তারপর। তারও একটু বাদে ওই দগ্ধ ধ্বংসাবশেষের দিকে।

আনন্দবাবুর এই তৃতীয় দফা মনে হল, কালো মেয়েটার কালো দুই চোখের গভীরে সেই দুর্বোধ্য সংকল্প আর আশার আলো তেমনিই চিকচিক করছে।

আর তাইতে প্রায় শ্রী-হীনা মেয়েটার মুখখনা যেন ভারী কমনীয় দেখাচ্ছে।

নানড়ি অটো হাউস।

চার-চাকা গাড়ি মেরামত ইত্যাদির এত বড় কারখানা আর এ তল্লাটে নেই। শুধু এই এলাকার নয়, বৃহৎ কলকাতার বহু জায়গার গাড়ির মালিকেরা এই কারখানাটিকে চিনেছে। অনেক বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের মোটর, জিপ, ভ্যানও এখানে আসে। এক-একসময় এত আসে যে এই বিরাট পরিসরেও জায়গা হয় না, রাস্তার দুধারে সারি সারি গাড়ির মিছিল দাঁড়িয়ে যায়। বিকল গাড়ি যারা পাঠায় তারা জানে চার্জ এখানে কিছু বেশি লাগে, কিন্তু চুরি জোচ্চুরি বাটপাড়ির কারবার নেই, অজ্ঞ মালিককে সতের গণ্ডা ভাঁওতার জালে পড়ে ছটফট করতে হবে না। টাকার জোর থাকলে বিশেষজ্ঞ মালিকটির হাতে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। ওখানকার মেমো ইত্যাদিতে ছাপা অক্ষরে লেখা, 'নানড়ি অটো হাউস ফর কোয়ালিটি সার্ভিস'। গাড়ির মালিকের এই বিজ্ঞাপনে মোটামুটি বিশ্বাস করে।

বেশ কিছুদিন ধরে রমা চন্দর মনে হচ্ছিল কারখানার হাওয়ার তলায় তলায় কি একটা অদৃশ্য অশান্তি থিতিয়ে উঠছে। কলকাতা আর কলকাতার চার পাশে বহু বড় বড় কল-কালখানা মিল বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে অবশ্য এক ধরনের অশান্তি সর্বত্রই প্রকট হয়ে উঠেছে। সে-সব জায়গায় দেনা-পাওনার ফারাক আর তাই নিয়ে দলগত সংঘাত লেগেই আছে। ফলে অনেক জায়গায় অনেক মর্মান্তিক ঘটনাও ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু সেই হাওয়া অটো হাউস পর্যন্ত গড়াবার সম্ভাবনাতেই যে উতলা বোধ করছিল রমা চন্দ —ঠিক তা নয়। কারণ সেই সব শিল্পক্ষেত্রের গোলযোগ বৃহৎ ব্যাপার। দশ বিশ পঞ্চাশ হাজার থেকে শুরু করে লাখ লাখ মানুষের চাওয়া-পাওয়ার সংগ্রাম সে-সব জায়গায়। এখানে সমস্ত বিভাগের কর্মচারীদের জুড়লে একশর বেশি হবে না। প্রাইভেট মোটর গ্যারাজের তুলনায় এটা বিপুল সংখ্যা বটে, কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে কিছুই নয়। অথচ রমা চন্দ্রর মনে হত অদৃশ্য অশান্তির হাওয়াটা যেন ওই গোছেরই। সে-রকম জোরালো কারণ কিছু থাক বা না থাক, অশান্তির অজুহাত দিনে দিনে যেন একটা অদৃশ্য বুনটে জোরালো হয়ে উঠছে।

ইদানীং রমা চন্দ সব থেকে বেশি উতলা বোধ করত মালিকের মুখখানা দেখে। মালিককে সাহেব বলে ডাকে সকলে। অপরের সঙ্গে কথা বলার সময় রমা চন্দও তাই বলে। সামনাসামনি 'সার' বলে অভ্যস্ত।

সাহেবের মুখখানা সুশ্রী, কমনীয়, কিন্তু তাঁকে ভয় বা সমীহ করে না কারখানায় এমন একটি প্রাণীও ছিল না বোধহয়। যেখান দিয়ে হেঁটে চলে যেতেন, সেখানকার কর্মীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠত। কারো সামনে এসে দাঁড়ালে বুকের তলায় ধুকপুকুনি শুরু

হয়ে যেত। রমা চন্দও তার ব্যতিক্রম নয় খুব। সুশ্রী সুপুরুষ কোনো ভদ্রলোকের এমন ঠাণ্ডা গম্ভীর মুখ আর বুঝি জীবনে দেখেনি। গোড়ায় গোড়ায় ঘরে ডাক পড়লে ভিতরে ভিতরে ঘামতে থাকত। কিন্তু ওই মুখ হামেশা তাকেই সব থেকে বেশি দেখতে হয়। ক্রমশ অহেতুক ভয়টা কমেছে। আনন্দ চক্রবর্তীর একান্ত সুপারিশে বি. এ. ফেল মেয়ে পাঁচ বছর আগে টাইপিস্ট হয়ে ঢুকেছিল। মাইনেও তখন বর্তমানের তিন ভাগের এক ভাগ। লং-হ্যান্ড ডিক্‌টেশন নিয়ে চিঠি টাইপ করে আনার পর প্রথম দিনেই তিনটে বানান ভুল বেরুল তার থেকে। শুভ্রেন্দু নন্দী সেগুলোর তলায় লাল পেন্সিলের দাগ দিয়ে আবার টাইপের আদেশ দিলেন। পরের দিন রমা চন্দ কাজে এসে দেখে তার টেবিলে দামী ইংরেজি ডিকশিনারি একখানা। লজ্জায় আর সংকোচে সেদিন আর মালিকের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেনি।

বানান ভুল আর কোনদিন হয়নি। তিন মাস না যেতে মালিকের হুকুম হয়েছে সন্ধ্যায় শর্ট-হ্যান্ড ক্লাসে অ্যাটেন্ড করতে হবে, কারণ তাঁর স্টেনোগ্রাফার দরকার। রমা চন্দ পরদিনই শর্ট-হ্যান্ড ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। সেই খরচ মালিক দিয়েছেন। ভদ্রলোক সব-দিকের সমস্ত ব্যবস্থাই এই গোছের নীরবে করে থাকেন।

এক বছরের মধ্যে সে পাকা স্টেনোগ্রাফার হয়ে উঠেছিল। পারিবারিক অভাব অনটন ছাড়াও বুকের তলায় একটা চাপা ক্ষত নিয়ে এখানকার কাজে যোগ দিয়েছিল রমা চন্দ। সে জানত অযোগ্যতার দরুন এখান থেকে চলে যেতে হলে তার পায়ের নীচে মাটি থাকবে না। পড়াশুনায় মন ছিল না বটে, কিন্তু নিরেট মেয়ে নয় আদৌ। বরং চটপটে আর বুদ্ধিমতীই বলত সকলে। রূপের একটু-আধটু জোর থাকলে ও মাথা খাটিয়ে অন্য কোনো ভবিষ্যতের পথ সুগম করে নিতে পারতো।

নিজের দু'পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা ছিল, সংকল্প ছিল। কিন্তু সেই চাপা ক্ষতটা তার আস্থাও অনেকখানি কেড়ে নিয়েছিল। বাইরের চালচলনে বোঝা যেত না, কিন্তু একটা অহেতুক ভয় অনেক সময়েই ছেঁকে ধরত তাকে। সেটা পীড়াদায়ক বটে, কিন্তু সেই ভয়ই আবার অনেকখানি সফলতার দিকে এগিয়ে দিয়েছে তাকে। তাকে নিষ্ঠা শিখিয়েছে।

এই পাঁচ বছরে রমা চন্দ আর এক মেয়ে। একশ তিরিশ টাকায় ঢুকেছিল, এখন পায় আটশর ওপর। মাইনে বাড়ানোর কথা মুখ ফুটে কোনো সময় বলতে হয়নি। ঢোকার সময় অবশ্য আনন্দকাকু বলেছিলেন, মাইনে পত্র নিয়ে এখন মাথা ঘামিও না, শুধু লেগে থাকতে চেষ্টা করো। তুমি কাজের মেয়ে এটুকু প্রমাণ করতে পারলেই সুদিন আসবে।

এসেছে। আরো হয়তো অনেক আসবে। রমা চন্দ এখন মালিকের প্রাইভেট সেক্রেটারি, স্টেনোগ্রাফার, আর কারখানার অনেক ব্যবস্থার সুপারভাইজারও। প্রয়োজনে অ্যাকাউন্টেন্টকে সাহায্য করে, কোন কোম্পানির বড় বিল আটকে থাকলে মালিকের নির্দেশে সশরীরে তাগিদ দিতে যায়, তেমন দরকার পড়লে ইনকামট্যাক্স আপিসেও ছোটে। বাইরের কাজে বেরুতে হলে সর্বদাই গ্যারাজের কোনো না কোনো গাড়ি মজুত তার জন্যে। নিজেই গাড়ি চালাতে পটু এখন। ওর ছেড়ে এখানকার অতি সামান্য মিস্ত্রীদেরও অবশ্য ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে। রমা চন্দর মনে মনে আশা অদূর ভবিষ্যতে ওরও নিজস্ব গাড়ি হবে একটা। আশা কেন, হবেই। মালিকের দরাজ অন্তঃকরণের খবর সে এখন ভালই রাখে। কত ভাঙা-চোরা তোবড়ানো গাড়ি বা খুব পুরনো অচল গাড়ি

পেলেই শুভ্রেন্দু নন্দী জলের দরে কিনে নেন সেটা। তাঁর নির্দেশ মতো মেরামতি আর খোল-নলচে বদলের পর সেই গাড়ি আবার যখন ঝকঝকে হয়ে রাস্তায় বেরোয়, পাঁচ সাত গুণ বেশি দামে অনায়াসে বিকোয় সেটা। শুধু এই করেই বছর গেলে কত লাভ হয় মালিকের সে-শুধু বুড়ো অ্যাকাউন্টেন্ট আর রমা চন্দই জানে। আনন্দকাকুর মতো এমনি একটা গাড়ি সেও চাইলেও পাবে আর মালিক ওর থেকে এক পয়সাও লাভ নেবে না।

কিন্তু রমা চন্দ্রর তাড়া নেই। আরো কিছু দিন যাক। আরো কিছু মাইনে বাড়ুক। ...একজনের নাকের ডগা দিয়ে নিজের একখানা ঝকঝকে গাড়ি চালিয়ে যাবে আসবে একদিন। সেই একজনের বিমূঢ় মুখখানা কল্পনা করেও এক ধরনের হিংস্র আনন্দ উপভোগ করেছে। রমা চন্দ সেই দিনের অপেক্ষায় আছে।

...বছর খানেক আগের কথা। পাঁচশ পঁচিশ টাকা মাইনে পাচ্ছিল তখনো। কাজের চাপ বেড়েই চলেছে। ডিকটেশন নেওয়া আর টাইপ করা ছাড়াও শুভ্রেন্দু নন্দীর সেক্রেটারির কাজ শুরু হয়েছিল তখন। অতএব তাঁর ঘরে যাওয়া আসা দ্বিগুণ বেড়েছিল। কাজের তন্ময়তার মধ্যেও ভদ্রলোক তখন অনেক সময় চুপচাপ ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন। অবশ্য পরে অনুভব করেছে এটা নিবিষ্ট চিন্তার ব্যাপার কিছু। কিন্তু তখনো মনে মনে ভয় ধরত। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখত মাঝে মাঝে। ইস্, চেহারাটা যদি আর একটু সুন্দর হত ওর। শুভ্রেন্দু নন্দী শিগগীরই হয়তো একজন সেক্রেটারি নেবেন। নিলে মেয়ে সেক্রেটারিই নেবেন বলে ধারণা। এ ধারণাটা কেন রমা চন্দ জানে না।...ওর বিশ্বাস, মালিক মাত্রেই সুশ্রী আর চকচকে সেক্রেটারি বহাল করে থাকে। প্রৌঢ় ছেড়ে বুড়োদের পর্যন্ত বেশির ভাগ এই স্বভাব। এই মালিক তো মাত্র কাকুর বয়সী —বড় জোর উনচল্লিশ। কানের নীচের চুলে পাক না ধরলে তাও মনে হত না। না, শুভ্রেন্দু নন্দী একজন সুশ্রী সেক্রেটারি বহাল করলে রমা চন্দ দোষ ধরতে পারে না। কাজের সঙ্গে সঙ্গে চোখ প্রসন্ন রাখতেও সকলেই চায়। কিন্তু এই নিয়ে ভিতরে ভিতরে একটা চাপা অস্বস্তি ছিলই রমা চন্দর। কেমন ধারা মেয়ে আসবে, ওর সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবে কে জানে।

এর কিছুদিনের মধ্যেই শুভ্রেন্দু নন্দীর কি একটা ডিকটেশন নিচ্ছিল। এয়ার-কুলার লাগানো ঘরের ভারী দরজা ঠেলে ভিতরে এলেন সুমিত্রা বোস। মহিলার বাপের পদবী এটা। মিলিটারী স্বামীর ঘরে এসে হয়েছিলেন সুমিত্রা দেব। স্বামী ছিলেন মিলিটারী অফিসার। যুদ্ধে সেই ভদ্রলোকের অকাল বিয়োগের ফলে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ভালো টাকাই মহিলার হাতে এসেছিল। একমাত্র ছেলের লেখাপড়া আর যাবতীয় খরচ বহনও সরকারের দায়িত্ব। বিধবা হবার বছর দেড়েক বাদে ঘটনাচক্রে সুমিত্রা দেব হয়ে গেলেন সুমিত্রা নন্দী নানডি অটো হাউসের মালিক শুভ্রেন্দু নন্দীর স্ত্রী। কিন্তু এই বিয়েও তিন বছরের বেশি টেকেনি। কাগজে-কলমে ছাড়াছাড়ি হয়েছে। ফলে আবার তিনি সুমিত্রা বোস। আনন্দকাকুকে জেরা করে এই বিয়ের অনেক খবরই রমা চন্দ জেনে নিয়েছিল। সে পরের প্রসঙ্গ।...বছর চৌত্রিশ হবে মহিলার বয়েস এখন, কিন্তু চেহারা আর স্বাস্থ্য এখনো বোধকরি অনেক তরুণীর ঈর্ষার কারণ।

ভদ্রমহিলা একা নন। তার পিছনে আর একটি মেয়ে। রমার বয়সীই হবে, কি ওর

থেকে সামান্য ছোট। রমার চব্বিশ এখন, তখন তেইশ। রীতিমত সুশ্রী মেয়েটা, সুবিন্যস্ত বেশবাস, সপ্রতিভ হাসি হাসি মুখ। তুলনামূলক বিচারে রমার অস্তিত্ব নিষ্প্রভ বলা যেতে পারে।

শুভ্রেন্দু নন্দীর ডিকটেশন দেওয়া থামল, রমার হাতের পেনসিলও।

শ্রীমতী বোস সহজ অন্তরঙ্গ মুখে পরিচয় করিয়ে দিলেন, মিস্টার নন্দী—মিস শকুন্তলা চ্যাটার্জী।

সুচারু দুই হাত বুকের কাছে তুলে মেয়েটি মিষ্টি মুখে নমস্কার জানালো। শুভ্রেন্দু নন্দীর হাতে ফাইল, মাথা নেড়ে নমস্কারের জবাব দিলেন। সামনের চেয়ারটায় বসতে ইঙ্গিত করলেন। ঠাণ্ডা দু'চোখ একবার মেয়েটার মুখ থেকে বুকের দিকে নেমে এলো।

শ্রীমতী বোস চেয়ার নিয়েই শুরু করলেন, শকুন্তলা ডিসটিংশনে বি. এ. পাশ, এর কথাই সেদিন তোমাকে—

রমার দিকে চোখ পড়তে কথাটা আর শেষ করলেন না। ইচ্ছে করেই করলেন না। শুভ্রেন্দু নন্দীর দিকে আবার ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, খুব ব্যস্ত নাকি?

মহিলা আশা করেছিলেন হয়তো তাঁকে দেখেই রমা চন্দ উঠে চলে যাবে। সাধারণত তাই গিয়ে থাকে। সুমিত্রা বোসের এই গম্ভীর প্রশ্নের তাৎপর্য, ওকে যেতে বলা হোক।

কিন্তু মালিকটি তা বললেন না। জবাবে সামান্য মাথা নাড়লেন শুধু। তারপর রমার দিকে ফিরলেন, গো অন—

ডিকটেশন সম্পূর্ণ করতে লাগলেন। এতদিন বাদে রমা চন্দর অভ্যস্ত হাত যেন হোঁচট খেতে লাগল। মাঝে মাঝে এক-একটা শর্ট-হ্যান্ড অক্ষর কাটাকুটি করতে হচ্ছে। ভিতরে ভিতরে বেশ নার্ভাস হয়ে উঠেছে। মহিলা ওর দিকে সদয় চোখে তাকাচ্ছেন না।

চিঠি শেষ করে শুভ্রেন্দু নন্দী হুকুম করলেন, থ্রী কপিজ প্লীজ, ওয়ান ফর দি পার্টি, ওয়ান ফর দি অ্যাকাউন্টেন্ট অ্যান্ড ওয়ান ফর ইয়োর পারসোন্যাল ফাইল—

রমা চন্দ উঠে চলে এলো। পারসোন্যাল ফাইলের ব্যাপারটা বোঝা গেল না।—কারণ এ রকম কোনো ফাইলের হদিশ তার জানা নেই। কিন্তু এ নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই, তিন কপি বলেছেন, নিজের ঘরে এসে টাইপ মেশিনে সেই অনুযায়ী কাগজ চাপাল। কিন্তু হাত আর চলছে না। রাজ্যের অবসাদ যেন। ওই রূপসী মেয়েকে এখানে আনার পিছনে সুমিত্রা বোসের উদ্দেশ্য জলের মতো স্পষ্ট।

ঠিক দশ মিনিট বাদে দরজা খোলর আভাস পেয়ে চকিতে ফিরে তাকাল।

সুমিত্রা বোসের পিছনে শকুন্তলা চ্যাটার্জীও বেরিয়ে এলো। সুমিত্রা বোসের সঙ্গে চোখাচোখি হতে নিঃশব্দে এক-প্রস্থ থতমত খেয়ে উঠল রমা চন্দ। সুমিত্রা বোসের অপ্রসন্ন চাউনি ওর মুখের ওপর যেন ঝাপটা মেরে গেল। সে হঠাৎ ওই মহিলার এই গোছের বিরক্তির পাত্রী হয়ে উঠল কি করে জানে না। মহিলা এ-যাবৎ মানুষের মধ্যেই গণ্য করেননি তাকে।

ঘন্টাখানেক বাদে আবার টাইপ করা চিঠি নিয়ে ওই ঘরে ঢুকতে হয়েছে। চিরাচরিত নির্লিপ্ত গাম্ভীর্যে শুভ্রেন্দু নন্দী পড়ে সই করে দিয়েছেন। কপি পাঠানো বা ফাইল করা সম্পর্কে আর কোনো নির্দেশ আসেনি।

সেই রাত্রিটা প্রায় বিনিদ্র কেটেছিল রমা চন্দর। থেকে থেকে নিজের ওপরেই রাগ হয়েছে। যার খুশি চাকরি হোক যে খুশি আসুক, ওর চাকরিটা তো আর কেউ কেড়ে নিচ্ছে না। যা হয়েছে যথেষ্ট হয়েছে, এর বেশি তার মতো বি. এ. ফেল মেয়ের যোগ্যতায় হয় না?

...কিন্তু ঘুম ভিন্ন বস্তু। সেধে আসে, সাধাসাধি করে তাকে আনা যায় না। অস্বস্তির বোঝা বাড়তেই থাকল, সমস্ত রাতটাই প্রায় বিনিদ্র কাটল। পরদিন কারখানায় এসে একটু-আধটু চটুল ভাব লক্ষ্য করেছিল কারো কারো। বিশেষ করে রাজা আহমেদের। ওটা শয়তানের ধাড়ী। ওকে একলা পেয়ে এক ফাঁকে বলেছিল, দু'নম্বর বহিন্‌জি আসছে কারখানায়?

রমা চন্দ জবাব দেয়নি। গম্ভীর মুখে কাজে মন দিতে চেষ্টা করেছিল।

বিড়ি খাওয়া কালো ঠোঁটের একটা ভঙ্গি করে রাজা আবার বলেছিল, পাঠকবাবু জিগেস করছিল, আর বলছিল, সব ডিপার্টমেন্টে মেয়ে পাওয়া যায়, শুধু আমাদের লাইনের কাজে ছাড়া—

রমা চন্দ রুষ্ট নেত্রে মুখ তুলে তাকাতেই প্রস্থান করেছিল। এক নম্বর মিকানিক বিমল পাঠকের নাম করে যা বলে গেল তা নিশ্চয় ওর নিজেরই কথা। বিমল পাঠক অত আজে-বাজে বকার লোক নয়। মিকানিকদের মধ্যে এই রাজা আহমেদের সাহস দেখে গোড়ায় গোড়ায় অবাক লাগতো। সমস্ত কর্মচারীর মধ্যে ওই একমাত্র ব্যতিক্রম যে সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে বোকা মুখ করে কোনো কাজের গাফিলতির ব্যাপারে এটা-সেটা বলে দিতে পারে। এক নম্বর মিকানিক বিমল পাঠক ওদের সকলের মুরুব্বি, সে-ই আগলে রাখে ওকে। রাগ করে এ-পর্যন্ত অন্য মিকানিকরা ওকে কারখানা থেকে তাড়াতে চেয়েছে, কত সময় সাহেবের কাছে নালিশ করেছে। মালিক শাসন করেছে, মাইনে কেটেছে, গলা ধাক্কা দিয়ে এক-একসময় বার করেও দিতে বলেছে। ওর থেকেও ঢের কম অপরাধে চাকরি চলে যেতে দেখেছে রমা চন্দ—কিন্তু রাজা আহমেদ ঠিকই বহাল তবিয়তে টিকে আছে। অবশ্য তার পিছনে বিমল পাঠকের সুপারিশের জোর ছিলই।

রমা চন্দ পরে রাজার মুখে সাহেবের পুরনো দিনের গল্প শুনেছে। তখন লোকটার প্রতি অমন গুরুগম্ভীর মালিকের দুর্বলতার কারণও আঁচ করেছে।

...কাজে মন বসছিল না। ক্যাঁচ করে একটা মিষ্টি আওয়াজ হতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। দোরগোড়ায় টুলে-বসা বেয়ারাকে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতে দেখল। পরক্ষণে বেরিয়ে এসে ওর দিকে তাকাল। এটুকুই যথেষ্ট। সাহেবের তলব বুঝে নিয়ে রমা চন্দ উঠে এলো। বুকের ভিতরটা অকারণেই ধুকপুক করে উঠল একটু।

শুভ্রেন্দু নন্দীর পরনে কালি-লাগা প্যান্ট, গায়ে সেই রকমই হাঁটুলম্বা আলখাল্লা একটা। অর্থাৎ মেরামতের তদারকে যাচ্ছেন, দরকার হলে নিজেও সেই কাজে হাত লাগাবেন। দরকার হামেশাই হয়। এক বিমল পাঠক ভিন্ন আর কারো কাজ চোখ বুজে পাস করে দেন না। সেই দায়িত্বও পাঠকেরই। কিন্তু মোটর পার্টস-এর দোকানে বড়সড় সওদার কাজ থাকলে পাঠককেই বেরুতে হয়—তাছাড়া ট্রায়েলেও বেরোয়। মোট কথা পাঠকের অনুপস্থিতির সারাক্ষণই প্রায় গ্যারাজে থাকেন শুভ্রেন্দু নন্দী।

লম্বা আলখাল্লার বোতম আঁটতে আঁটতে মুখ তুলে ওর দিকে তাকালেন। তারপর চেয়েই রইলেন। রমা চন্দ যেন ফাঁপরে পড়ল একটু।...সেই বিমনা গোছের চাউনি নয়, তাকেই দেখছেন, তাকেই লক্ষ্য করছেন।

ডিকটেশন নেওয়া বা টাইপ করা ছাড়াও এখন আর যে-সব কাজ করছ—কোনো অসুবিধে হচ্ছে।

রমা চন্দ মাথা নাড়ল। অসুবিধে হচ্ছে না।

চালিয়ে যেতে পারবে?

ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠল কেমন। তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল। পারবে।

সেক্রেটারি হিসেবে এখন থেকে কি পাবে না পাবে অ্যাকাউন্টেন্টকে লিখে দিয়েছি। দেখে নিও।

লম্বা মানুষটা ওর গা ঘেঁষেই বেরিয়ে গেলেন। রমা চন্দ নিজের জায়গায় এসে বসল। অ্যাকাউন্টেন্টের কাছে যাবে কি, ভিতরে যেন উত্তেজনার স্রোত বইছে একটা।

...সুখবরটা দিতে সেই সন্ধ্যাতেই আনন্দবাবুর কাছে ছুটে গেছল। কিন্তু খবরটা আনন্দকাকু আগে থাকতেই জানেন দেখা গেল। ওকে দেখে অবশ্য খুশি খুব।

আশান্বিত মুখে রমা চন্দ জিজ্ঞাসা করছে, মিস্টার নন্দী নিজেই বলেছেন বুঝি?

না। মুচকি হেসেছেন আনন্দকাকু।—সুমিত্রা বোস বলেছেন।...তোমার ওপর কিন্তু খুব রাগ মহিলার।

সুমিত্রা বোস বলেছেন শুনে যেমন অবাক, রাগ শুনেও তেমনিই অবাক। বলেছে, কেন, আমি কি করলাম?

তোমার জন্যেই তার বন্ধুর মেয়ের চাকরি হল না।...কাল রাতেই আমার কাছে এসেছিলেন। বললেন, ওই কাজ করে আর ওখানকার ওই সব লোকের সঙ্গে মিশে ভদ্র ব্যবহারও ভুলেছে আপনার বন্ধু। আনন্দকাকু রমাকেই জিজ্ঞাসা করলেন,...কি রকম ব্যবহার করেছে তুমি জানো নাকি কিছু?

একটি মেয়েকে নিয়ে যেতে দেখেছিলাম শুধু; আর কিছু জানি না।

সেই মেয়ে দেখতে ভালো?

রমা চন্দ মাথা নাড়ল, ভালো।

তাহলে রাগ তো হবেই।

দ্বিধা কাটিয়ে রমা জিজ্ঞাসা করেছিল, কি বলেছেন?

আনন্দ চক্রবর্তী সাহিত্যিক মানুষ, খুব একটা আলগা সংকোচ নেই। তাছাড়া বন্ধুর কারখানায় বহাল হবার পর থেকে ওর সঙ্গেও কথাবার্তা আগের থেকে সহজ হয়ে এসেছে। বন্ধুর সঙ্গে শুধু গল্প করার জন্যেই অনেক সময় তিনি কারখানায় হাজির হন। তখন রমারও খবর নেন। হেসে জবাব দিয়েছেন, যা বলেছেন শুনলে আবার তুমি রেগে যাবে। মোট কথা, তোমাকে সেক্রেটারির চেয়ারে বসিয়ে দেওয়াটা মহিলা খুব সরল চোখে দেখেননি—যত সব হেড কেস-এর ব্যাপার, ও-সবে মাথা না ঘামিয়ে মন দিয়ে কাজ করে যাও।

সেক্রেটারির চেয়ারে বসানোটা রমা চন্দর নিজের কাছেই এক মস্ত বিস্ময়। কিন্তু আর এক মহিলা সেটা সরল চোখে দেখেনি শুনেই ওর কালো মুখে রক্ত উঠে আসার

দাখিল হয়েছিল। ছি ছি, ভদ্রমহিলার মাথাই খারাপ বলতে হবে। বয়সে কম করে পনের বছরের বড়, আর ওই রকম একটা মানুষ—তাঁর সম্পর্কে কিনা যাচ্ছেতাই কথা। ভাবতেও সংকোচ, কিন্তু রমা চন্দর এও মনে হয়েছিল, সে-রকম লোক হলে এই বয়েসেও হয়তো অনেক রূপসী এসে গড়াগড়ি যেত সামনে।

সঙ্গে সঙ্গে একদিনের ছোট একটা ঘটনাও মনে পড়ে গেছল। চাকরিটা তখন পর্যন্ত ছ'মাসেরও পুরনো হয়নি। এক সন্ধ্যায় আনন্দ চক্রবর্তীর বাড়ি গিয়ে দেখে কারখানার মালিক বসে আছেন সেখানে। বাইরে সপ্রতিভ হলেও মনে মনে খুশি হয়েছিল। আনন্দকাকু হাসি মুখে ঘরে ডেকেছিলেন, এসো এসো—বস্‌কে দেখে ঘাবড়ে গেলে নাকি? আপিসে যেমন পাথরপানা গম্ভীর এখানে সে-রকম দেখেনি শুভ্রেন্দু নন্দীকে। সেই রকমই স্বল্পভাষী বটে, কিন্তু মিষ্টি মিষ্টি হাসছিলেন ভদ্রলোক।

এ-রকম সুযোগ জীবনে আর ক'বার আসে। তাছাড়া আরো পাঁচ বছর আগের কথা, বুদ্ধি আর কত। ঘরে ঢুকে রমা বেশ সপ্রতিভ মুখেই বলে বসেছিল, ঘাবড়াব কেন, আপিসে যা-ই হোন, এখানে তো ইনিও কাকা।

কি জবাবটাই না পেয়েছিল ফিরে। রমা চন্দ জীবনে ভুলবে না। ঠোঁটের ফাঁকে তেমনি একটু হাসি লেগে ছিল ভদ্রলোকের। মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে বলেছিলেন, নো ম্যাডাম, সম্পর্ক পাতিয়ে কোনো বাড়তি 'প্রি-কশন' নেওয়ার দরকার নেই তোমার —ইউ আর পারফেক্টলি সেফ অ্যাজ ইউ আর।

ওই শোনার পর একটা ছুতো খুঁজে পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই পালিয়ে এসেছিল। রাগে ক্ষোভে দুঃখে চোখে জল আসার দাখিল। সম্ভব হলে চাকরিটা মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে আসত। দু-তিনদিন পর্যন্ত নিজের চুল টেনে ছিঁড়তে ইচ্ছে করেছে। কেন এ-ভাবে অন্তরঙ্গ হতে চেষ্টা করেছিল—ঠিক হয়েছে, খুব আক্কেল হয়েছে। মনে থাকবে, চিরকাল মনে থাকবে। মনে আছেও।

...তারপর ওই আনন্দকাকুর মুখেই শুভ্রেন্দু নন্দীর জীবনের কিছু কথা শুনেছিল রমা চন্দ। শুনে কতক্ষণ যে স্তম্ভিত হয়ে বসে ছিল সে ঠিক নেই। এমনও ঘটে মানুষের জীবনে! কোনোরকম বিতৃষ্ণা দূরে থাক, সেই থেকে এই মানুষ যেন পুরুষকারের জীবন্ত প্রতীক তার কাছে। শোনার পরে ওর নিজের নিভৃতের ক্ষতটাও যে পল্‌কা মনে হয়েছে তুলনায়। নিজের কথা মনে হলে রমা চন্দ হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এই মানুষ তাও পারে না বলেই বিশ্বাস।

...ছ'বছর হল আনন্দকাকুর স্ত্রী নেই। বাইরে বেশ সুশ্রী আর স্বাস্থ্যবতী ছিলেন মহিলা। ভিতরে ভিতরে হার্ট বিকল হয়ে গেছল কেউ টের পায়নি। বলা নেই কওয়া নেই একদিন চোখ উল্টে দিলেন। ভালো রকম চিকিৎসা করারও সুযোগ পাননি আনন্দকাকু। এই খেদের কথা অনেক দিন তাঁর মুখে শুনেছে।

ভদ্রলোককে বড় নিঃসঙ্গ ভাবত রমা। যদিও তাঁর একটা ছেলে আর একটা মেয়ে আছে, আর সাহিত্যে নাম-ডাক আছে। কিন্তু এতবড় কারখানা আর এত টাকা সত্ত্বেও শুভ্রেন্দু নন্দীর মতো নিঃসঙ্গ মানুষ আর বোধকরি দুনিয়ায় নেই। কেউ কাছে আসতে চাইলেও নির্লিপ্ত মুখে ইনি তাকে ঠেলে সরিয়ে দেবেন। কতদিন মনে হয়েছে আইনগত ছাড়াছাড়ির পরেও তো সুমিত্রা বোস অনায়াসে ভদ্রলোকের কাছে যাওয়া আসা করেন,

চেহারা-পত্র মহিলার এখনো সুন্দর, এখনো আঁট—আবার তাঁদের মিলন হয় না? এই চিন্তা বহুবার ওর মনে উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে। হলই বা বিচ্ছেদ, আবার মিলন হতে বাধা কোথায়।

হলে ও-ই বোধ হয় সব থেকে খুশি হয়। কিন্তু তা যে আর কোনোদিনও হবার নয়, তাও কেমন করে যেন অনুভব করতে পারে। ওই মানুষ নিজের চার দিকে যেন একটা অটুট নিঃসঙ্গতার বর্ম এঁটে বসে আছেন। সেটা ভেঙে কাছে এগোনোর ক্ষমতা সুমিত্রা ঘোসেরও নেই।

...পাঁচ বছরে ভয় অনেকটা ভেঙেছে রমা চন্দর। কোনো কাজ শুভ্রেন্দু নন্দী ঠিক করছেন না মনে হলে সাহস করে কপাল ঠুকে নিজের মতামত ব্যক্ত করে ফেলেও দেখেছে অঘটন কিছু ঘটে না কিন্তু ভয় গেলেও সমীহ না করে পারে না। গত এক বছরে তো অনেকটাই সান্নিধ্যে এসেছে। কিন্তু ওই নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্বের সামনে যেন সহজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাও কঠিন। সে-রকম দরকার হলে ভদ্রলোক নিজের গাড়িতে ওকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছে। ফিরতে কোনোদিন বেলা হলে বা রাত হলে কোনো বড় হোটেলে তাঁর মুখোমুখি খেতে বসে কত সময় অহেতুক অস্বস্তিও বোধ করেছে। তখন আবার একেবারে উল্টো অনুভূতি। মনে হয়েছে, এই লোকের বেপরোয়া দুরন্ত দিকটা এখনো চিনতে বাকি, জানতে বাকি।

সেই চেনার সঙ্গে নিজেকে জড়ানোর সুখকর অলীক কল্পনা রমা চন্দর নেই। তবু এ-রকম অদ্ভুত অস্বস্তি বোধ করে কেন জানে না। ওই গোছের নিরিবিলি সান্নিধ্যে এলে মনে হয় মানুষটা বাইরে যত ঠাণ্ডা ভিতরে তার বিপরীত। মনে হয়, বাইরে যত কঠিন ভেতরে তার অনেক গুণ বেশি। মনে হয়, হঠাৎ যে-কোনো অস্থিরতার রোষে ওই অটুট নিঃসঙ্গতার আবরণটা খসে গেলে বা কোনো দুঃসাহসিকা সে-চেষ্টায় এগোলে এই মানুষই বুঝি যে-কোনো মেয়ের প্রতি নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে।...মনে হয়, বয়সের ঘাটতিটা তখন রক্ষাকবচ নয়, রূপের ঘাটতিও না।

পরে অবশ্য নিজের ওপরেই রাগ হয়, আর নিজেকে আরো তুচ্ছ আরো নগণ্য মনে হয় রমা চন্দর। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকেই ভেঙচি কাটতে ইচ্ছে করে। ওই তো রূপের ছিরি, তা নিয়ে আবার ভয়-ভাবনা! যদিও মনে মনে জানে, রূপ যেমনই হোক, এই পাঁচ বছরে এই চেহারাতেও শ্রী এসেছে একটু, আর স্বাস্থ্য অনেকটাই ফিরেছে। এই পরিবর্তনটুকু ইদানীং বিশেষ করে অনুভব করে এক নম্বর মিস্ত্রি বিমল পাঠকের জ্বালায়। লোকটা কাজ ফেলে দিনের মধ্যে কতবার কত ছুতোয় যে সামনে এসে দাঁড়ায় ঠিক নেই। ও ঘর ছেড়ে ওদের কাজের দিকে এলে হাসি মুখে এগিয়ে আসে। ছুটির দিনে এখন মাঝে মাঝে আবার বাড়িতেও হানা দিচ্ছে—মুখে সপ্রতিভ দুষ্টু দুষ্টু হাসি। রমার দিক থেকে তেমনি পাল্টা আমন্ত্রণের আঁচ পেলে এই হৃদ্যতা তড়িঘড়ি কোন্ পথে গড়াতে পারে সেটা ভালোই জানা আছে।

ভদ্রলোকের ছেলে, মজবুত স্বাস্থ্য, ম্যাট্রিক থার্ড ডিভিশনে পাশ হলেও নিজের কাজে পাকা লোক বিমল পাঠক। ওভার-টাইম নিয়ে রমার থেকে বেশি ছেড়ে কম রোজগার করে না। দস্তুরমতো সাহসীও বটে। ওদের রাশভারী সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে দিব্বি বিনীত অথচ খোলাখুলি আলোচনা করে কারখানার লোকদের জন্য এরই মধ্যে কম আদায়

করল না। না...বিমল পাঠককে ইদানীং খুব খারাপ লাগছিল না রমা চন্দর, কিন্তু ভিতরের ক্ষতটা এখনো মিলায়নি বলেই নিজেকে যতটা সম্ভব আগলে রেখেছে। আবার ভুল করতে ভয় তার। বিমল পাঠককে কাছেও ডাকে না, এড়িয়েও চলে না।

কারখানার হাওয়া বদলাচ্ছে। খুব আস্তে আস্তে প্রায় অলক্ষ্যে যেন একটা পরিবর্তন আসছে। এর মূলেও কারখানার পয়লা নম্বরের মিকানিক বিমল পাঠক। তারই ঠাণ্ডা অথচ সক্রিয় চেষ্টায় কাজের মানুষগুলো যেন নড়ে চড়ে সজাগ হয়ে উঠছে। তাদের আচরণে এক একটা দাবির জোর স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

রমা চন্দর তাতেও খুব একটা আপত্তি নেই। মেহনতী মানুষ বলেই সর্বদা মাটিতে মিশে থাকবে কেন। কিন্তু যে মানুষগুলো মালিককে এতকাল শ্রদ্ধা করত আর তার থেকে বেশি করত ভয়—তাদের কারো কারো আচরণ এখন যেন দুর্বিনীত হয়ে উঠেছে। শুভ্রেন্দু নন্দীর মুখের ওপর না হোক, আড়ালে আবডালে যে-সব অশালীন উক্তি করে, শুনলে কেমন উতলা বোধ করে রমা চন্দ। মনে হয় এটা সবে শুরু, এই হাওয়া অনেকদূর গড়াতে পারে। বড় বড় প্রতিষ্ঠানে এই হাওয়া লেগেই আছে—কিন্তু একজনের মালিকানার কারখানায় সেই হাওয়া কেউ আশা করে না।

শুভ্রেন্দু নন্দীর ঠাণ্ডা কঠিন মুখে আরো যেন কঠিন আঁচড় পড়ছে দিনকে দিন। তাঁর ধারণা, কর্মচারীদের কাজের মান অবনতির দিকে নামছে ক্রমশ। তাদের পাওনা গণ্ডার দিকে যত মন কাজে মন নেই তত, সেটা রমা চন্দও অনুভব করতে পারে। শুভ্রেন্দু নন্দী হঠাৎ-হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে দু-পাঁচ জনকে এদিক-ওদিকে দাঁড়িয়ে জটলা করতে দেখেন।

ঠাণ্ডা মুখে তাদের সামনে এসে দাঁড়ালে সচকিত হয়ে ওঠে অবশ্য। আসছেন টের পেলে আগেই পালায়। এর মধ্যে তিনি অনেকের কাজের ত্রুটি ধরেছেন, অনেককে ওয়ার্নিং-ও দিয়েছেন। তাদের হয়ে বিমল পাঠক সুপারিশ করতে আসে। মালিক বক্তব্য শোনেন চুপ-চাপ মুখের দিকে চেয়ে, কোনোরকম মন্তব্য করেন না। মুখ দেখে বোঝা যায় না, কিন্তু রমা চন্দর মনে হয় বিমল পাঠকও বদলাচ্ছে ভিতরে ভিতরে।

...গত সাত মাসের মধ্যে বারকয়েক ওদের অভিযোগ আর দাবি মেনে নিয়েছেন শুভ্রেন্দু নন্দী। সেই রাগে তাঁর ক্ষোভ বাড়ছে কিনা রমা ঠিক বুঝে ওঠে না। বিমল পাঠক বলে, তাই। কর্মচারীরা কিছু চাইলেই নাকি মালিকের মেজাজ বিগড়োয়। এটা নাকি চন্দ্র সূর্যের মতোই সত্যি। দাবি আদায় করতে এলেও মালিকের সম্পর্কে ঠিক একই সুরে কথা বলত বিমল পাঠক।

কিন্তু রমা চন্দ অতটা সত্য ভাবতে পারছে না। গত কয়েক মাসের মধ্যে জনাকতক লোক নিয়ে বিমল পাঠককে বার কয়েক তাদের সাহেবের ঘরে এসে দাঁড়াতে দেখেছে। সে মুখপত্র সকলের। নিজের স্বার্থ ছেড়ে সর্বদা সে সকলেরই স্বার্থর কথাই বলে।

প্রথমবার এসেছিল অগ্নিমূল্যের বাজারে সকলের মাইনে বাড়ানোর দাবি নিয়ে। শুভ্রেন্দু নন্দী চুপচাপ তাকে লক্ষ্য করেছেন খানিক। বলেছেন, ভেবে দেখব।

দেখেছেন। যতটা দাবি করা হয়েছিল ততটা না হোক, মাইনে সকলেরই কিছু বেড়েছে।

কিছুদিন না যেতে জনাকতক লোক পিছনে নিয়ে আবার এসেছে। সকাল ন'টা

থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত ডিউটি—এটা ছ'টা পর্যন্ত হওয়া উচিত আর তারও মাঝে এক ঘন্টা টিফিন আর বিশ্রামের সময় থাকা উচিত। ছ'টার বেশি কাজে আটকে থাকলেই ঘন্টা হিসেবে ওভারটাইম ছাড়া কেন কাজ করবে তারা। আর, বছরে একটা বোনাস দিতে হবে। দাবির কথা মুখেই বলেনি শুধু, কি চায় না চায় লিখেও এনেছে।

শুভ্রেন্দু নন্দী জিজ্ঞাসা করেছেন, ওভারটাইম আর বোনাস পাও না তোমরা?

বিমল পাঠক জবাব দিয়েছে, সাতটার পর বেশি কাজ হলে ওভারটাইম মেলে—এক-আধ ঘন্টার জন্য কিছুই হয় না। আর বোনাস মালিকের খেয়াল খুশি মতো হয়ে আসছে—বিধিবদ্ধ হিসেবমতো এটা তাদের প্রাপ্য। সঙ্গে সঙ্গে কাগজে লেখা বিধিবদ্ধ হিসেবটাও দেখিয়ে দিয়েছে।

তার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে শুভ্রেন্দু নন্দী বলেছেন, কারখানা এখন থেকে ছ'টায় বন্ধ হবে, তার বাইরে কাজ হলে ঘন্টা ধরে ওভারটাইম পাবে। বোনাস সম্পর্কে বিবেচনা করে দেখব। দাবির কাগজ বিমল পাঠকের হাতেই থেকেছে, মালিক ঈষৎ অসহিষ্ণু পদক্ষেপে নিজের ঘরে চলে গেছেন।

সময়ে বোনাসও মিলেছে। বলা বাহুল্য সেটা চাহিদার সঙ্গে মেলেনি। কিন্তু অন্যান্য বারের তুলনায় বেশি ছাড়া কম পায়নি কেউ। তবু বিমল পাঠক বা তার অনুগত কয়েকজন তুষ্ট নয়। পাঠক ঘোষণা করেছে মালিকের কথায় বিশ্বাস করার এই ফল। সামনের বারে তারা এর ফয়েসলা করবে। ব্যাপার দেখে শুনে রমা চন্দর মনে হয়েছে মালিকের বিরুদ্ধে একটা ক্ষোভ পুষ্ট করে তোলাই যেন ওই জনাকয়েকের আসল লক্ষ্য।

তৃতীয় দফা যে দাবির মুখপত্র হয়ে এসেছে বিমল পাঠক, শুনে রমা চন্দ ভিতরে ভিতরে শঙ্কাই বোধ করেছে। যোগ্যতা অনুসারে সমস্ত কর্মচারীর বেতন নতুন করে নির্ধারণ করতে হবে, গ্রেড আর স্কেল বেঁধে দিতে হবে, রবিবার ছাড়াও বছরের বরাদ্দ ছুটি ঠিক করে দিতে হবে—সে ছুটি ভোগ না করলে কর্মচারীকে সেই সময়কালের জন্য দ্বিগুণ বেতন দিতে হবে, আর কারখানার বাৎসরিক লাভের একটা মোট হিসেবও পেশ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী কর্মচারীদের বোনাস দিতে হবে। এ-সব ব্যবস্থা মেনে না নিলে যে অশান্তি দেখা দিতে বাধ্য তার সব দায় মালিককেই বহন করতে হবে। এ-সব ব্যাপারে শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ ফয়েসলাই কাম্য।

রমা চন্দ সশঙ্কে লক্ষ্য করেছে, এই ফিরিস্তি হাতে পেয়েও শুভ্রেন্দু নন্দীর ঠাণ্ডা মুখে একটা উত্তেজনার রেখা পড়েনি। তিনি যেন জানতেন এই রকম কিছু একটা আসছে। অন্যদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বিমল পাঠকের মুখটাই খুব ভালো করে দেখে নিয়েছেন। সে চাউনি দেখে রমা চন্দ অস্বস্তি বোধ করেছে, কিন্তু বিমল পাঠক নির্বিকার।

মালিক জিজ্ঞাসা করেছেন, এ-রকম ব্যবস্থা কোনো মোটর গ্যারাজে আছে?

বিমল পাঠক জবাব দিয়েছে, সে-খোঁজ আমরা নিতে যাব কেন, আমাদের তো ছোটখাট ব্যাপার নয় সার, এ তল্লাটে আর এতবড় গ্যারাজ কোথায়?

এ তল্লাটে না থাক, অন্য তল্লাটে আছে। কলকাতায় এর থেকে ঢের বড় গ্যারাজও আছে। কারা কি করছে খবর নিয়ে দেখি, পরে জানাব।

পাঠক বলেছে, আপনি কি করবেন সাতদিনের মধ্যে জানতে পেলে ভালো হত।

শুভ্রেন্দু নন্দী বলেছেন, না পেলে তোমরা কি করবে সেটাও চিন্তা করে রাখ।

সেটাই যেন প্রত্যক্ষ সংঘাত। বিমল পাঠক দিনে দিনে অমন বেপরোয়া হয়ে উঠছে কেন রমা চন্দ ভেবে পায় না। সে যেন কিছুদিনের মধ্যেই এখানকার অনেকের কাছে বেশ গণ্যমান্য লোক হয়ে উঠেছে। কারখানার বাইরে কারা সব তার কাছে আসে শুনেছে রাজার মুখে—আর সে তখন কাজ ফেলে ব্যস্তসমস্ত হয়ে চলে যায় তাদের কাছে, অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে। কে তারা, কোথা থেকে আসে কেন আসে জানে না, রাজা আহমেদ শুনেছে তারা নাকি কোথাকার মস্ত মস্ত লোক সব।

মস্ত মস্ত লোকেরা নান্ডি অটো হাউসের হেড মিকানিক বিমল পাঠকের কাছে কেন আসে রমা চন্দ বুঝে ওঠে না। জিজ্ঞাসা করারও সাহস নেই বিমল পাঠককে।

...একদিন শুনল, কারখানায় দুই একদিনের মধ্যেই কর্মচারীদের কি মিটিং হবে একটা। আর তাতেও ওই মস্ত লোকেরা বক্তৃতা করতে আসবে। সেই কারণে কারখানার সর্বত্র চাপা উত্তেজনা একটা। মিটিং নাকি কারখানার কাজের সময়ের মধ্যেই হবে।

সাহেবের ঘরে ডাক পড়ল বিমল পাঠকের। রমা চন্দ সন্ত্রস্ত। সে সেক্রেটারি, কেউ এলে মালিক না বলা পর্যন্ত ঘরে থাকাই তার প্রতি নির্দেশ।

বিমল পাঠক এলো।

শুভ্রেন্দু নন্দী জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মিটিং কবে?

পরশু সার।

মিটিং কোথায়?

এখানেই—

কিন্তু আমার কম্পাউন্ডের মধ্যে কোনো মিটিং হবে না বা কোনো বাজে লোক এখানে ঢুকবে না।

বিমল পাঠকও স্পষ্ট সুরে বলল, বাজে লোক কেউ আসবে না। আমাদের কারখানায় আমাদের মিটিং করার অধিকার আছে কিনা তাই বলুন।

না।

কিন্তু সার একটু বিবেচনা করে দেখলে পারতেন, আমরা সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি।

বাইরে করো। আর, সকলকে জানিয়ে দিতে পারো যে, যে যতক্ষণ বাইরে থাকবে তার ততক্ষণের মাইনে কাটা যাবে। এর নড়চড় হবে না।

বিমল পাঠক বলে গেল, ঠিক আছে, সকলকে জানিয়ে দেবো। আপনি মাইনে কাটুন।

দুশ্চিন্তায় ভিতরটা ছেয়ে ছিল রমা চন্দর। ঘন্টাখানেক বাদে কারখানার ভিতরেই একটু নিরিবিলি জায়গায় ধরে নিয়ে এলো বিমল পাঠককে। বুঝিয়ে বললে যদি তার কথা শোনে। সে ডাকছে শুনে এই মেজাজ সত্ত্বেও বিমল পাঠক তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসেছে। মাঝের ক'দিন এই লোকটাকে এড়িয়েই চলেছে।

মিষ্টি উদ্‌বেগে রমা জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার বিমলবাবু? হঠাৎ কি হল বলুন তো?

হেসেই জবাব দিল, কি আর, মালিকের পাখা গজিয়েছে। উৎসুক একটু।—আপনাকে পাঠিয়েছেন বুঝি?

না না! আমার নিজেরই ভয় ধরেছে বলে এলাম—এত বছরের মধ্যে এ-রকম

ব্যাপার তো কখনো দেখিনি!

বিমল পাঠকের হাসিমাখা দু'চোখ তার মুখের ওপর নড়ে চড়ে স্থির হল। বলল, এখনই কি দেখলেন, সবে তো শুরু। কিচ্ছু ভয় নেই, আমাদের সঙ্গে থাকুন।...মোট কথা, আপনার প্রাপ্য থেকে আপনি বেশি পান ভাবেন না তো?

কমও তো পাইনে, বাইরের লোক এনে গণ্ডগোল পাকিয়ে কি লাভ হবে?

বিমল পাঠক হাসছে।—না পেতে পেতে আমাদের এই দশা হয়েছে, সবেতে ভয়। ...এখন আপনি আমাদের দিকে আছেন কিনা সেটা বলুন দেখি?

জবাব দেবার ফুরসৎ মিলল না। মুখ তুলে বিমল পাঠককে হঠাৎ সামনের দিকে রূঢ় দৃষ্টিতে তাকাতে দেখে সেও ঘাড় ফেরালো। মুখের স্বাভাবিক হাসিটুকু মিলিয়ে গেল রমা চন্দর।

দু-নম্বর শেডের সামনে শুভ্রেন্দু নন্দী দাঁড়িয়ে। এদিকেই চেয়ে আছেন।

পরমুহূর্তে বিমল পাঠক এ-রকম একটা কাণ্ড করতে পারে কল্পনার বাইরে। সাহেবকে দেখিয়ে হাত বাড়িয়ে হাসি মুখে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, কিছু ঘাবড়াবেন না—সকলে একসঙ্গে এগোলে কারোই এতটুকু ক্ষতি হবে না। যান, পরে কথা হবে—

রমা চন্দ ফিরে চলল। এই শেষের আচরণের দরুন লোকটার ওপর রাগই হচ্ছে। মালিককে দেখিয়ে ইচ্ছে করে এই কাণ্ড করল। কি ভাবলেন উনি ভগবান জানে। আবার অস্বস্তিতে ভিতর ছেয়ে আছে। বিমল পাঠক হঠাৎ এত বদলে গেল কি করে ভেবে পেল না—এই কিছুদিন আগেও তো মালিকের চোখের মণি ছিল। চাইলে ও কি না পেত। ঠিক সেই কারণেই অশ্রদ্ধাও করতে পারছে না আবার। নিজের স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে লোকটা সকলের স্বার্থ দেখছে।

শুভ্রেন্দু নন্দী ততক্ষণে নিজের ঘরে চলে গেছেন। একটু বাদেই তাঁর ঘরে ডাক পড়ল। অস্বস্তির ছায়াটা লেগেই আছে—মালিককে দেখিয়ে বিমল পাঠক কেন ওর পিঠ চাপড়েছে রমা চন্দর বুঝতে সময় লাগেনি। লোকটা শুধু দুঃসাহসী নয়, প্যাঁচালোও বটে। নিজেকে নিজে দেখতে পাচ্ছে না রমা, মনে হচ্ছে লালচে মুখ নিয়ে সে মালিকের ঘরের দিকে এসেছে।

কাম ইন্ ম্যাডাম! শুভ্রেন্দু নন্দী গম্ভীর, কিন্তু দরাজ গলা।—বিমল পাঠক তোমাকে পছন্দ করে শুনেছিলাম...হি ইজ এ স্ট্রং বাট মিস-গাইডেড ফেলো...যাক, ওই পছন্দের ব্যাপারে তোমার দিকের খবর কি? গাম্ভীর্য সত্ত্বেও মুখ দেখে মনে হল কিছু কৌতুকের খোরাক পেয়েছেন ভদ্রলোক।

পরিবর্তনের হাওয়া তো রমা চন্দর গায়েও লেগেছে। ভয়ের বদলে ভিতরে ভিতরে তেতে উঠল। সংযত সুরেই বলল, সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু এখন আমি আপনার সেক্রেটারি হিসেবেই ওর সঙ্গে কথা বলতে গেছলাম।

ফানি! শুভ্রেন্দু নন্দীর চোখে মুখে আর গলার স্বরে নির্ভেজাল বিস্ময়।—একজন ওয়ার্কম্যান কারখানার মধ্যে দাঁড়িয়ে সেক্রেটারির পিঠ চাপড়ে কথা বলে! হাউএভার, সেক্রেটারি হিসেবে কি কথা ছিল তোমার?

অপমানে বিবর্ণ মুখ রমা চন্দর। জবাব দিল, সকলের স্বার্থে গণ্ডগোল এড়ানোর

কথা। আমি তাকে সেই অনুরোধ করছিলাম।

তারপর?

কি তারপর?

তোমার অনুরোধ সে শুনবে আশা করো?

জানি না।

শুভ্রেন্দু নন্দী মুখের দিকে চেয়ে আছেন। তেমনি গম্ভীর, কিন্তু চোখ দুটোয় যেন কৌতুক চিকচিক করছে। বললেন, আমি জানি। শুনবে না—বাট্ ডোন্ট ওয়ারি ম্যাডাম, গণ্ডগোল কিছু হবে না, হি উইল বি সরি বাই ডে আফটার টু-মরো। ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসির আভাস, হাতের পেন্সিলটা টেবিলে ঠুকছেন আস্তে আস্তে। দু'চোখ তার মুখের ওপর আটকে আছে তেমনি।—আনন্দর মুখে তোমার একবারের দুর্ভোগের গল্পটা শোনা আছে, ডোন্ট বি এ ভিকটিম সেকেন্ড টাইম—হি ইজ নট ইওর ম্যান, ট্রাই টু পুট ইওর ট্রাস্ট সাম-হয়্যার এল্‌স্—দ্যাটস্ অল্।

রমা চন্দ বেরিয়ে এলো। ভিতরটা রাগে কাঁপছে। অথচ অসহায়। একবার ভাবল ওই পাঠকের কাছেই ছুটে চলে যায়। তাকে এই কথা বলে তার সঙ্গে হাত মেলায়। কিন্তু সেটা আরো বোকামি হবে। তাছাড়া লোকটা সত্যিই প্যাঁচালো, নইলে সময় বুঝে কাঁধে হাত দিত না।

রাগ আনন্দ চক্রবর্তীর ওপরেও হচ্ছে।...ওর জীবনের সেই চরমতম অপমানের কথা বলে বন্ধুর দয়ার উদ্রেক করে তার চাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছে জানতো না। ও-সব না বলে শুধু অনুরোধ করলে কি এই লোক চাকরি দিত না? এই পাঁচবছর যাবৎ ভবিষ্যত গড়ার ব্যস্ততায় আর সার্থকতায় যন্ত্রণা অনেকখানি জুড়িয়েছিল, কিন্তু সেই অপমান আবার যেন নতুন করে বিঁধছে ওকে। ভিতরে ভিতরে নতুন করে কাটা-ছেঁড়া শুরু হয়েছে।

ও-রকম ঘটনা হামেশাই ঘটছে, কিন্তু উনিশ বছরের যে-কোনো মেয়ের জীবনে সেটা এক বিপর্যয়ের ব্যাপার। আনন্দ কাকুর মামাতো ভাই ছিল একজন, নাম সুখেন্দ্র। এখনো আছে। আনন্দ কাকুর থেকে বছর দশ এগারো ছোট হবে। অবস্থাপন্ন ঘরের চৌকস ছেলে—কলেজে পড়তেই সাহিত্যিক দাদার ভক্ত ছিল খুব। প্রায়ই আসত। রমা তখন স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ে। তার বাপ গরিব, আনন্দ কাকুর বাড়ির নীচের তলার দুখানা ঘর নিয়ে রমারা থাকে তখন। সুখেন্দ্রর সঙ্গে তখন থেকেই ভারী ভাব তার। সে এসেছে টের পেলে ছুটে না এসে পারত না। আর ওই ছেলেও সাহিত্যের ঝোঁকে অত ঘন ঘন সে-বাড়ি আসত না অন্য কোন টানে, তাও অনুমান করতে পারত। তখন কাকীমা অর্থাৎ আনন্দ কাকুর স্ত্রী জীবিত। ওদের দুজনের এই মেলামেশার তাগিদটা তিনি পছন্দ করতেন না রমা সেটা অনুভব করতে পারত।

কাকীমা মারা গেলেন। রমা তখন কলেজে পড়ছে—বি. এ. ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবে। আর সুখেন্দ্র নতুন চাকুরিতে ঢুকেছে। তার এ-বাড়িতে যাওয়া আসা তখন আরো বেড়েছে। আর দু'জনের নির্বিঘ্ন মেলামেশাটাও। কাকু অনেক সময় ঘরে থাকতেন না বা নিজের কাজে ডুবে থাকতেন। সুখেন্দ্র ক্রমে দুঃসাহসী হয়ে উঠছিল। কাকার ছেলেমেয়ে দুটো আড়াল হলে মুহূর্তের মধ্যে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেত। কারো দেখে

ফেলার সম্ভাবনা নেই জানলে সহজে ছাড়তে চাইত না। গোড়ায় গোড়ায় রমা ভয়ে আর উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপত, শেষে তারও নেশা ধরে গেছল বুঝি। ও-ছেলের অনুনয়ে এক-একদিন কলেজ কামাই করেছে।

...আনন্দ কাকু কিছু আঁচ পেতেন কি না কে জানে। অনেক সময় দেখতেন ওরা দুজনে গল্প করছে বা হাসাহাসি করছে। কিন্তু কিছু বলতেন না। একদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, সুখেন কি বলে, তোকে বিয়ে করবে তো?

লজ্জায় অধোবদন হয়ে রমা শুধু মাথা নেড়েছিল। করবে। দুটো দিন আর কাকুর মুখের দিকে তাকাতে পারে নি।

...একদিন। সেদিনও বিকেলের দিকে ওদের দুজনকে সামনের বারান্দায় দেখে আনন্দ কাকু নিজের ঘরে ঢুকলেন। একটু বাদে টেলিফোন বেজে উঠল। সাড়া দিয়ে বেশ জোরেই কাকে যেন বললেন, আগামী কাল দুপুরের পর থেকে তিনি বাড়ি থাকছেন না, পাবলিশারের কাছে যাচ্ছেন।

সাধারণত আনন্দ কাকু টেলিফোনে অত জোরে কথা বলেন না, কারো ওপর বিরক্ত মনে

পরের দিন।

রমা জানত সুখেন্দ্র আসবে। আসবে বলেনি কিন্তু গত দিন মুখ দেখেই বুঝেছিল। আরো কি বুঝেছিল সে-ই জানে। আনন্দ কাকুর ছেলে মেয়ে দুটোই স্কুলে তখন। রমার ভয় ভয় করছিল, আবার উন্মুখ হয়ে অপেক্ষাও করছিল।

বেলা তখন তিনটে। আনন্দ কাকু দুটো নাগাদ বেরিয়ে গেছেন, রমা তখন আড়ালে। আনন্দ কাকুর ছেলে মেয়ে সাড়ে চারটের আগে স্কুল থেকে ফিরছে না।

সুখেন্দ্র এলো।

রমা তখন জানলায় দাঁড়িয়ে। হাসি চেপে চোখের একটা ইশারা করে সুখেন্দ্র দোতলায় উঠে গেল। রমা এই অপেক্ষাতেই ছিল অথচ বুকের ভিতর কাঁপুনি। আগে এ-রকম কখনো হয়নি। মুখে স্বাভাবিক হাসি টেনে দোতলায় এসে রমা চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপিস পালানো হয়েছে বুঝি?

নিশ্চয়। আপিস পালানো হবে সে তো কালই বুঝেছ। জবাব দেবার ফাঁকে দরজা দুটো ভেজিয়ে দিল।

ও কি?

বন্ধই থাক না, বেড়লটা হাঁ করে দেখছে দেখছ না! ও কি! অত ঘাবড়াবার কি আছে—

হাত বাড়িয়ে খপ করে ওকে বুকে টেনে নিল। তারপর ক্ষেপেই যেতে লাগল যেন। নিজের পা দুটোর ওপর ক্রমশ জোর হারাচ্ছে রমা। চৌকিটার ওপর বসে পড়ল। কিন্তু ও-যেন নাছোড় দস্যু একটা।

...চূড়ান্ত বিপর্যয়ই ঘটে যেত কিছু। রমা বাধা দেবার শক্তিও হারিয়েছে।

দরজায় টকটক শব্দ।

ইলেকট্রিক শক খেয়ে ছিটকে চৌকি থেকে নেমে এলো দুজনেই। বেশবাস ঠিক করে রমা চুলের গোছা পিছনে সরাবার আগেই দরজা খুলে গেল।

আনন্দ কাকু দাঁড়িয়ে।

রমা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরদিন। সকালের দিকে আনন্দ কাকু বলে গেলেন, আমি ওদের বাড়ি কথা বার্তা কইতে যাচ্ছি।

ফিরে এলেন। থমথমে মুখ। খানিক বাদে ওকে দোতলায় ডেকে পাঠালেন।

সামনে আসতে আনন্দ কাকু ঠাস ঠাস করে ওর দুগালে দুই চড় বসিয়ে দিলেন।

পরে শুনেছে সুখেন্দ্রর বাবা মা প্রস্তাব শুনে ক্ষেপে উঠেছিল। আনন্দ কাকুকেই গালাগাল করেছে তারা। আর সুখেন্দ্র তাকে আড়ালে ডেকে বলেছে, একটা ফ্লার্টিং গার্লের সঙ্গে ফ্লার্ট করা যায়, তাঁকে বিয়ে করা যায় না, তার ওপর ওই তো চেহারা। আনন্দ কাকুর সেই দুটো চড় আজও আশীর্বাদ ভাবে রমা চন্দ।

❀

একটা গোলযোগের আশংকা করেই মিটিং-এর দিনে দুপুরের দিকে আনন্দ কাকুকে একবার আসতে বলেছিল রমা চন্দ।

কারখানায় পা দিয়ে রমা প্রথমে একটু নিশ্চিন্ত হয়েছিল। শুনেছে মিটিং আজ হবে না, অন্য একদিন হবে। বুড়ো অ্যাকাউনটেন্টের খবর, বাইরের লোক যারা ঘোঁট পাকাতে আসত এখানে, তাদের মধ্যে দলাদলি শুরু হয়ে গেছে। ফলে এখানকার কর্মচারীদের মধ্যেও ভাগাভাগি। তারা কেউ মিটিং-এর স্বপক্ষে কেউ বিপক্ষে। গতকাল রবিবার সত্ত্বেও কাজের চাপে অ্যাকাউনটেন্ট ভদ্রলোক আপিসে এসেছিলেন। এসে দেখেন কর্মচারীরা অনেকেই এখানে জটলা করছে, বাইরের ছেলেও কিছু ছিল—তারা তর্ক করছে, একদল আরেক দলকে শাসাচ্ছে। আর আপোসের চেষ্টায় বিমল পাঠক গজরাচ্ছে। কি নিয়ে দলাদলি অ্যাকাউনটেন্ট সেটা বলতে পারলেন না। শেষে মন্তব্য করলেন, রাজনীতির হাওয়া লেগেছে তো, সর্বত্রই দলাদলি আর মারামারি—এখানেই বা ব্যতিক্রম হবে কেন?

রমা চন্দর কানে অবিশ্বাস্য ঠেকছিল। রাজনীতি বোঝে না, কিন্তু মাত্র একটা দিনের মধ্যে এ-রকম ওলট-পালট ব্যাপার হয়ে যায় কি করে। তখুনি মালিকের কথা মনে পড়েছে, বলেছিলেন, ডোন্ট ওয়ারি ম্যাডাম, গণ্ডগোল কিছু হবে না, হি উইল বি সরি বাই ডে আফটার টু-মরো।...হতেও পারে রাজনৈতিক দলাদলি, একদল তো আর এক দলকে ছিঁড়ে খাচ্ছে, কিন্তু কেবলই মনে হচ্ছে এর পিছনে হয়তো বা মালিকের কারসাজিও কিছু আছে—নইলে অমন কথা পরশু বলেছিলেন কি করে? কিন্তু মালিকের মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। তিনি নির্লিপ্ত নিরুত্তাপ।

গোলযোগ নেই অথচ সমস্ত কারখানা একবারে থমথমে যেন। আর বিমল পাঠকের দিকে চেয়ে মনে হয়েছে, যে কোনো মুহূর্তে সে বুঝি একটা ঝড় বইয়ে দিতে পারে। আবার তার সামনে এসে কিছু বলার বা জিজ্ঞাসা করার সাহস নেই রমা চন্দর।

একটা গাড়ির বনেট খুলে রাজা আহমেদ তার ওপর ঝুঁকে আছে আর গুনগুন করে একটা গান ভাঁজছে। সমস্ত কারখানার মধ্যে ও-ই মূর্তিমান ব্যতিক্রম। রমার মনে হল লোকটা হাসছেও আপন মনে। দিনমানেই নেশা করে কারখানায় এলো নাকি! আর

একবার তো এই অপরাধে দশ হাত নাকে খৎ দিতে হয়েছিল। সাহেব শেষ পর্যন্ত হয়তো ওকে তাড়াতো কিন্তু ওর মুরুব্বি বিমল পাঠকের সদয় কৌশলে শাস্তিটা নাক খৎ-এর ওপর দিয়েই গেছে। সাহেবের সামনেই বিমল ওকে কয়েক ঘা চড়-চাপড় মেরে ওই শাস্তি দিয়েছে।

রমা কাছে এগিয়ে এলো। অন্য দুই একজন দূরে দূরে কাজ করছে। রাজা আহমেদ সোজা হয়ে দাঁড়াল। আপন মনে হাসছিল ঠিকই। কাজ কিছুই করছে না।

হাসছ যে?

কারখানার ঠাণ্ডা ভাবখানা দেখে কেমন হাসি পেয়ে গেল মেমসাহেব।

রমা ভুরু কুঁচকে তাকাল। ও হঠাৎ-হঠাৎ ওকে মেমসাহেব বলে ডেকে বসত। একদিন দাবড়ানি খেয়ে নাক কান মলে প্রতিজ্ঞা করেছে আর বলবে না।

থুড়ি মেম—আ-মর—বহিনজি। এরকম আনন্দের দিনে সব ভুল হয়ে যাচ্ছে।

আনন্দ কেন?

এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল, তুমি চট্ করে কিছু বোঝ না, তোমাকে মেমসাহেবই বলা উচিত—মিরজাফরের বংশধর না আমি? অ্যাদ্দিন নিজেব ভুলে মেরে দিয়েছিলাম, আজ মনে পড়তে কি আনন্দ।

দ্রুত চিন্তা করছে রমা চন্দ।—মিরজাফরের কাজ কিছু করেছ তাহলে?

করিনি আবার! এই তো সেদিন সাহেবের বাড়ি বসে তাঁর কাছে পাঠকজীর রসের ব্যাপারটা বলে এলাম, আ-হা পাঠকজী আমার গুরুজি, কত সময় কত উপকার করেছে —আমাকে জাহান্নমে পচে মরতে হবে।

নেশাই করেছে মনে হচ্ছে, চোখ দুটো লাল-লাল। হাসছেও বেশি। ভালো করে আর এক দফা ওর মুখখানা দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, পাঠকজীর কি ব্যাপার বলে এলে?

হাসতে হাসতে রাজা আহমেদ সামনের দিকে ঝুঁকল একটু। সঙ্গে সঙ্গে নাকে গন্ধ এলো রমা চন্দর।—ওই যে তোমার জন্যে একটু হাঁক-পাক করছে। সেদিন পাঠকজী আমাকে বলছিল, তোর বহিনজি কালো হলেও অপছন্দের নয়, আর বেশ বুদ্ধিমতী—

রাজা আহমেদ!

একটু জোরেই ডেকে উঠেছিল রমা চন্দ, ওদিকের লোক দুটো ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। রাজা আহমেদ বোকা মুখ করে হাসি গিলতে চেষ্টা করল। বলল, বা রে, তোমার অত রাগের কি হল বহিনজি, তুমি তো কিছু বলোনি—

ঠিক তক্ষুনি ভিতর থেকে বেয়ারা এসে একটু দূরে দাঁড়িয়েই সাহেবের তলব জানাল ওকে। রাজা আহমেদের ভ্যাবাচাকা মূর্তি।—এই খেলে যা, আবার আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন। হতচকিত করুণ চাউনি বহিনজির দিকে।

হঠাৎ সংকটটা যেন রমারই। চকিতে পিছন ফিরে দেখল বেয়ারা চলে গেছে। এই মেজাজের ওপর সাহেব ওকে এই অবস্থায় দেখলে চাবকে তাড়াবে। অস্ফুট ঝাঁঝে বলে উঠল, সরে যাও শিগ্‌গীর, দেখতে পেলে তোমার আজকেই শেষ। এতবার ওয়ার্নিং খেয়েও শিক্ষা হল না, কারখানায় মদ গিলে এলে।

ধুরন্ধর পাজি এই অবস্থাতেও বুঝে নিল কে সামাল দেবে।—তুমি সত্যিকারের মেম সাহেব বহিনজি—

ছুটে পালাল।

রাগে জ্বলতে জ্বলতে ভিতরে ঢুকল রমা চন্দ। কেন যে ওকে বাঁচানোর তাগিদ বোধ করল হঠাৎ কে জানে। ওরই মুখ থেকে শুনে মালিক সেদিন বিমল পাঠকের পছন্দ করার কথা বলে ব্যঙ্গ করেছিল। বাঁচানোর বদলে ব্যাটাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে একেবারে বিদায় করার ব্যবস্থা করলেই ভালো হত। কিন্তু ওর থেকেও বেশি রাগ বিমল পাঠকের ওপর। সাহেবের কানে যাবে আশা নিয়েই ওকে ওই সব কথা বলেছিল, নইলে এ-সব কথা আর যাই হোক রাজা আহমেদকে বলার কথা নয়।

ওদের ঘরের শেষে মালিকের ঘর। দরজা ঠেলে রমা চন্দ ভিতরে ঢুকল। শুভ্রেন্দু নন্দী মন দিয়ে ফাইল দেখছেন—বিমল পাঠকের ফাইল আর আরো চারজনের। ঘন্টাখানেক আগে ওগুলো চেয়ে নিয়েছিলেন। দলাদলি করে যে ক'জন মাতব্বর ভাগ হয়ে গেছে বলে অ্যাকাউনটেন্টের রিপোর্ট, তাদের ফাইলগুলোই শুধু বাচাই করে নিয়েছেন শুভ্রেন্দু নন্দী। সাহেবের উদ্দেশ্য কি রমা জানে না। জানে না বলেই আরো বেশি উদ্‌বেগ।

রাজা আহমেদকে ডেকেছিলেন...সে নেই। হাত দুই তফাতে দাঁড়িয়ে রমা চন্দ জানান দিল।

শুভ্রেন্দু নন্দী মুখ তুলে তাকালেন একবার। তারপর আবার ফাইলে মন দিয়ে বললেন, আমারই ভুল হয়েছে, ও আজ আসবে না বলে গেছল।

রমা মনে মনে অবাক একটু। আসবে না বলেছিল অথচ এসেছে। ...হয়তো নেশা করার পর না আসার কথাটা আর মনে ছিল না। কিন্তু মদ খেলে এ-রকম ভুল ওর সহজে হয় না।

—নোট নিতে হবে।

রমা চন্দ বেরিয়ে এলো। নিজের টেবিল থেকে ডিকটেশনের খাতা আর পেনসিল তুলে নিল। মনের তলায় একটা অজ্ঞাত আশংকা ভিড় করে আসছে। কিন্তু পা বাড়িয়েও দাঁড়িয়েই থাকতে হল।

এদিকেই আসছেন পাশাপাশি দুজন। আনন্দ চক্রবর্তী আর সুমিত্রা বোস...আনন্দ কাকু আসবেন জানাই ছিল, অন্য জনও মাঝে-মাঝে এসে থাকেন। তবে গত তিন চার মাসের মধ্যে তাঁকে দেখেনি।

আনন্দ কাকু ওর সামনে থেমে যেতে কয়েক হাত এগিয়ে সুমিত্রা বোসও দাঁড়িয়ে গেলেন। নির্লিপ্ত অবহেলায় তাকালেন ওর দিকে। মহিলার এখানে আবির্ভাব কোনো সময় সুবাঞ্ছিত মনে হয় না রমা চন্দর। কিন্তু এলে প্রতিবারই চোখ দুটো তাঁর দিকে আটকে যায়ই। ভাবে এই বয়েসে মহিলার চেহারা আর শরীরের বাঁধুনি বটে। ক'মাস বাদে দেখে আজ যেন আরো তাজা মনে হল।

আনন্দ কাকু ফিসফিস করে বললেন, হাওয়া তো ঠাণ্ডাই মনে হচ্ছে?

রমা চন্দ মৃদু জবাব দিল, ঠিক বুঝছি না।

তাঁরা এগিয়ে গেলেন। তাঁদের পিছন পিছন সে-ও দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল।

মুখ তুলে শুভ্রেন্দু নন্দী দুজনকেই দেখলেন। ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য অভ্যর্থনার হাসি দেখা গেল কি গেল না—তোমারা জোড় বেঁধে কোত্থেকে?

আনন্দ চক্রবর্তী খুশি মুখে সরল জবাব দিলেন, ওপরঅলা জুড়ে দিলে তুমি আটকাবে কি করে?...এত দিন বাদে আমার গাড়িটা বিগড়েছে, তোমার এখানে আসব বলে ট্যাক্সির অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলাম—শ্রীমতীর বিশাল গাড়িখানা আমাকে চাপা না দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে গেল, ব্যস্—

শ্রীমতীর বিশাল গাড়ি কথা ক'টা খট করে কানে লাগল রমা চন্দর।...মাস তিনেক আগে একটা ঝকঝকে ছোট গাড়ি থেকে নামতে দেখেছিল ওঁকে। আজ শুনছে বিশাল গাড়ি। অথচ তার আগে অনেক দিন ট্যাক্সিতে আনাগোনা করতে দেখেছে। চেহারায় আর হাবভাবে অবস্থা হঠাৎ বেশ ফিরেছেই মনে হয়।

বোসো। শুভ্রেন্দু নন্দী শ্রীমতীর দিকে তাকালেন।—তুমিও এদিকেই আসছিলে তাহলে?

কক্ষনো না! তোমার বন্ধু, তাই সদয় হলাম।

হাসি মাখা দৃষ্টিটা রমার মুখের ওপর পড়তে মহিলা গম্ভীর একটু। সুন্দর দুই ভুরুর মাঝে সামান্য কুঞ্চন রেখা পড়ল। তাদের কথা-বার্তার মাঝে এই মেয়ের অবস্থান যেন অপরাধ। হাতের ব্যাগ দুলিয়ে সুচারু মন্থর ভঙ্গিতে এগিয়ে দেয়ালের গায়ে সোফায় ওপর ধুপ করে বসলেন। শুভ্রেন্দু নন্দীর দু-চোখ তাঁর দিকেই, রমার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন নন।

আনন্দ কাকু তাঁর পাশের চেয়ার নিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, তোমার কারখানার হাওয়া গরম শুনছি...কোনোরকম গোলযোগের আশঙ্কা নেই তো?

রমা চন্দ নিঃশব্দে ফাঁপরে পড়ল যেন। যে লোক বুদ্ধি করে গাড়ি বিগড়নোর কথা বললেন তিনি এমন বে-ফাঁস প্রশ্ন করবেন, ভাবেনি।

যা ভেবেছিল তাই। শুভ্রেন্দু নন্দী সোজা হয়ে বসলেন একটু। জবাব না দিয়ে ফিরে জিজ্ঞাসা করলে, হাওয়া গরমের এখবর তোমাকে কে দিল?

রমা চন্দর বাঁচোয়া। কিন্তু অবাকও একটু। ওর বদলে পিছনে আঙুল দেখিয়ে আনন্দ কাকু জানালেন, আসার সময় গল্পে-গল্প শ্রীমতী বলছিলেন—

শুভ্রেন্দু নন্দীর মুখখানা এখনো গম্ভীর বটে, কিন্তু চোখ-জোড়া স্পষ্টই হাসছে। সুমিত্রা বসুর সমস্ত মুখখানা যেন দুই চোখে আগলে নিয়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, তুমিই বা কারখানার গরম হাওয়ার খবর জানলে কি করে—তোমাকে খবরাখবর দেবার লোক এখানেও মজুত আছে তাহলে?

শ্রীমতী বসুর বিরক্তিসূচক ভ্রূকুটি।—আমার দায় পড়েছে খবর নিতে। তোমার ওই নেশাখোর পেয়ারের মিস্ত্রী রাজা না বাদশা—কবে যেন ও-ই বলছিল নেশার ঝোঁকে—তোমার জন্য ওকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছিল।

শুধু চোখে নয়, শুভ্রেন্দু নন্দীর মুখেও হাসি ঝিলিক দিয়ে গেল এক প্রস্থ। আর কথাতেও কৌতুক ঝরল।—নেশার ঝোঁকে রাজা আহমেদ আজকাল তোমার ওখানে গিয়ে হাজির হচ্ছে নাকি?

মুহূর্তে ঝাঁঝালো মূর্তি সুমিত্রা বসুর। কিছু একটা জবাব দেবার মুখেও রমার দিকে চেয়ে থমকে গেলেন। এর সামনে কিছু বলতে যাওয়া মর্যাদাহানিকর।

টেক্ ডাউন প্লীজ!

আচমকা মালিকের ভারী অসহিষ্ণু কণ্ঠস্বর শুনে রমা চন্দ থতমত খেল একদফা। তাড়াতাড়ি এগিয়ে সামনে চেয়ার টেনে বসল। সঙ্গে সঙ্গে খাতা পেনসিল রেডি।

সেই চিরাচরিত ঠাণ্ডা কঠিন মুখ শুভ্রেন্দু নন্দীর। গড়গড় করে যা বলে গেলেন শুনে রমা চন্দর হাত থেমে যাওয়ার দাখিল। শুভ্রেন্দু নন্দী ঝড়ের বেগে বলে চলেছেন। অপরাধের লম্বা বিবরণ সহ প্রধান মিকানিক বিমল পাঠকের বরখাস্তের নোটিস। যত তাড়াতাড়িই বলুন ঠেকে যাওয়ার কথা নয় রমা চন্দর। কিন্তু ও বিশ্বাস করতে পারছে না বলেই আটকে যাচ্ছে। অজ্ঞাত আশংকায় ভিতরটা ছেয়েছিল, কিন্তু এ-রকম হতে পারে ভাবে নি।

আবেদন জানাল, রিপিট প্লীজ!

বাধা পেয়ে একটা অসহিষ্ণু দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শুভ্রেন্দু নন্দী শেষেরটুকু পুনরুক্তি করে আবার তেমনি দ্রুত বলে চললেন। বিমল পাঠকের বিরুদ্ধে প্রমাণসহ তেল-চুরির অভিযোগ, মাল কেনার ব্যাপারে কারচুপির অভিযোগ, কাজে গাফিলতির অভিযোগ, অবাধ্যতার অভিযোগ, আর সব শেষে কারখানার অন্যান্য কর্মচারীদের নীতিভ্রষ্ট করার অভিযোগ।

ওয়েট সার...

মাথার মধ্যে একটা বিষম প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে বলেই যথাযথ অনুসরণ করে উঠতে পারছিল না রমা চন্দ।

শুভ্রেন্দু নন্দী থমকে তাকালেন। রুক্ষ চাউনি।—হোয়াটস ইওর স্পীড?

পরডন সার?

আই সে হোয়াটস ইওর স্পীড?

ট্যু হানড্রেড।

পার আওয়ার?

মুখে এক ঝলক রক্ত উঠে এলো রমা চন্দর। চোখে চোখ রেখে সংযত স্বরে জবাব দিল, পার মিনিট সার।

গো অ্যাহেড।

চিঠি শেষ হল। তারপর আরো চারখানা চিঠি তেমনি দ্রুত তালে ডিক্‌টেট করে গেলেন। সেই চারখানাও অন্য চারজনের বরখাস্তের নোটিস। নির্বাক আনন্দ কাকু শুভ্রেন্দু নন্দীর মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছেন। অন্য চারজনের বিরুদ্ধে শুধু কাজে গাফিলতি অবাধ্যতা আর অন্য কর্মচারীদের নীতিভ্রষ্ট করার অভিযোগ। বিমল পাঠকের বিরুদ্ধেও শুধু যদি ওই ক'টি অভিযোগ থাকত তা হলেও কথা ছিল—কিন্তু চুরির অভিযোগ যুক্ত হওয়ায় রমা চন্দর ভিতরটা যেন জ্বলে যেতে লাগল। প্রতিশোধ নিতে গিয়ে মানুষটা এ স্তরে নামতে পারে, ভাবতে পারে না।

ডিক্‌টেশন নেওয়া শেষ। রমা চন্দ চেয়ার ঠেলে উঠতে যাচ্ছিল, অপ্রত্যাশিত বাধা পড়ল। পিছন থেকে ছিটকে উঠে এলেন সুমিত্রা বোস। অগ্নিমূর্তি একেবারে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর।—এ সবের অর্থ কি? তেল চুরি আর মাল চুরির কারচুপি তুমি প্রমাণ করতে পারবে?

রমা চন্দ হতভম্ব। আনন্দ চক্রবর্তীও।

অবিচল ঠাণ্ডা মুখ শুভ্রেন্দু নন্দীর।—দেখা যাক, বিমল পাঠাককে আমি জেলে পাঠাতে চেষ্টা করব।

আরো ক্ষিপ্ত ঝাঁঝে সুমিত্রা বোস বলে উঠলেন, ও। জেলখানা একেবারে হাতের মুঠোয় তোমার—কেমন? আমি জানতে চাই ওদের তুমি তাড়াবে কেন? রাগে না ভয়ে?

তুমি জানতে চাওয়ার কে?

সুমিত্রা বোসের এমন ক্ষিপ্ত বিকৃত মূর্তি রমা চন্দ কল্পনাও করতে পারে না। চোখ মুখ দিয়ে যেন জ্বলন্ত তাপ ঠিকরোচ্ছে তাঁর।—আমি জানতে চাওয়ার কে। আগুন নিয়ে খেলা করার খুব সাধ? বীরত্ব দেখাতে চাও? ওদের তুমি চেনো না? নোটিস পেলেই মুখ বুজে ওরা চলে যাবে ভেবেছ? ওরা শোধ নিতে জানে না?

শুভ্রেন্দু নন্দী চেয়ারের গায়ে শরীরটাকে একটু ছেড়ে দিয়ে চেয়ে রইলেন খানিক। তারপর স্পষ্ট বিদ্রূপের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার জন্যে তোমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে খুব?

হচ্ছে। তুমি একটা—

থেমে গেলেন। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিটা রমার মুখের ওপর ঠোক্কর খেল এক দফা। চেষ্টা করে নিজেকে সংযত করলেন একটু।—তোমার কাজ শেষ হয়েছে?

রমা চন্দ বিমূঢ় মুখেই বসে ছিল বটে। পরক্ষণে সচকিত! কিন্তু ওঠার আগেই গুরু গম্ভীর বাধা আবার। জবাব দিলেন শুভ্রেন্দু।—নো! সী মে স্টে, তোমার কিছু বক্তব্য থাকে তো চট করে সেরে নাও, আই অ্যাম বিজ-ই।

এটুকুই শেষ আঘাত যেন। অপমানেরও শেষ। সুমিত্রা বোস আর একটা কথা বললেন না। থমকে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন একটু। দুই চোখে শুধু এক পশলা আগুন ছিটিয়ে হন হন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রমা চন্দ আর আনন্দ চক্রবর্তী স্তব্ধ নির্বাক খানিকক্ষণ। এতটুকু শব্দ না করে রমা আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠল। আনন্দ চক্রবর্তীও যেন আত্মস্থ হলেন। দ্বিধান্বিত মুখে বন্ধুকে বললেন, তুমি সত্যি ওদের ডিসচার্জ করে দেবে?

টেবিলের কাগজপত্রের দিকে চোখ শুভ্রেন্দু নন্দীর। মুখ তুললেন না, ভুরুর মাঝে ভাঁজ পড়ল একটা দুটো।—হুঁ।

এসব ব্যাপার সামান্য থেকে পোলিটিক্যাল গেম হয়ে দাঁড়ায়...আর একটু ভেবে দেখলে হত না?

সঙ্গে সঙ্গে অসহিষ্ণু অভিব্যক্তি একটা। তাকালেন তাঁর দিকে। সংযত গম্ভীর জবাব দিলেন, আমি কেন কি করছি খুব ভালো করে জানি আনন্দ। সরোষে রমা চন্দর দিকে ফিরলেন, গো অ্যান্ড গেট্ দেম ডান, কুইক প্লীজ!

ঘর থেকে বেরিয়ে সে এসে টাইপে বসল। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। খাতা দেখে দেখে টাইপ করে চলল। এখনো আশা করছে আনন্দ কাকু আরো কিছু বলবেন আরো একটু বোঝাবেন। আশা করছে শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে মালিক মত বদলাবে। রাগ গিয়ে বুকের তলায় ভয় চেপে বসছে রমা চন্দর। সুমিত্রা বসু কারখানার কেউ হোক বা না হোক, মিথ্যে ভয় দেখায়নি। বরখাস্তের নোটিস এরা একজনও বরদাস্ত করবে না—মালিকের রায় মাথা পেতে মেনে নেবে না।

...কিন্তু তার কাছে সব থেকে বিস্ময় ওই এক রমণী। সুমিত্রা বোস। কিছু একটা

গণ্ডগোলের আভাস পেয়েই আজ কারখানায় এসেছিলেন সন্দেহ নেই। মাঝের তিন চারটে মাস তাঁর দেখাই মেলেনি। তাঁর দিন-যাপন জটিলতা মুক্ত নয়। রমা চন্দর কাছে এও স্পষ্ট। আনন্দ কাকুর কাছে শুনেছে, ডিভোর্সের পরেও মহিলা প্রায়ই যে কারখানায় আসতেন সেটা টাকার তাগিদে। বাড়িতেও যেতেন, কিন্তু বাড়িতে মালিককে পাওয়া না পাওয়া অনিশ্চিত ব্যাপার।...এই ক'মাসের মধ্যে সেই মহিলা ছোট-বড় সৌখিন গাড়ি হাঁকিয়ে চলা-ফেরা করছেন। সে যাক, কিন্তু সেই তাঁরই কিনা ওই শুভ্রেন্দু নন্দীর বিপদের আশঙ্কায় এত উদ্‌বেগ, এত ক্রোধ, এত ক্ষিপ্ততা। রমা চন্দর মনে হয়েছে উদ্‌বেগই সব থেকে বেশি। স্বচক্ষে না দেখলে এ বিশ্বাস করা যেত না। মহিলা যা-ই হোন আর যেমনই হোন, রমা চন্দ এই প্রথম মনে মনে তাঁকে একটু শ্রদ্ধা না করে পারছে না।

টাইপ শেষ। উঠে দাঁড়াল, কিন্তু পা যেন নড়তে চায় না। চিঠিগুলো নিয়ে ওই ঘরে ঢুকল আবার। আনন্দ কাকু তখনো চেয়ারে গা ছেড়ে বসে আছেন।

চিঠিগুলো ভালো করে পড়েও দেখলেন না শুভ্রেন্দু নন্দী। ঘসঘস করে সই করে দিলেন। শুধু এটুকু শেষ করার অপেক্ষায় ছিলেন যেন, কাগজগুলো ওর দিকে ঠেলে দিয়ে মুখ তুললেন।—অ্যাকাউনটেন্টকে এদের মাইনে রেডি রাখতে বলা হয়েছিল—নোটিস আর মাইনে একসঙ্গে দিয়ে দাও।

রমা চন্দ অসহায় মুখে বেরিয়ে এলো। আর কিছু ভাবার নেই। আর কিছু করার নেই।

হুকুম পালন করল। বেয়ারা দিয়ে একে একে ডেকে পাঠাল ওদের। প্রথমে বিমল পাঠককে। টাকার খাম আর বরখাস্তের খাম একসঙ্গে হাতে দিল।

খাম থেকে নোটিসটা বার করে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে নিল বিমল পাঠক। তারপর ক্রুর কুটিল চোখে রমা চন্দর মুখখানাই ভালো করে দেখে নিল। অথচ আশ্চর্য, রমা চন্দর মনে হল, এতবড় একটা বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে এ-যেন লোকটা জানত। সমস্ত মুখে একটা আলগা কালচে ছাপ পড়ে গেছে একদিনের মধ্যেই। দরজার দিকে পা বাড়িয়েও আবার ঘুরে দাঁড়াল।

দাঁতে দাঁত ঘষে বলে গেল, এর ফয়েসলা হবে...তাকে বলে দেবেন।

অপর চারজনেরও একই মূর্তি। তারাও শাসিয়ে গেল, দেখে নেব।

সব মিলিয়ে দশ মিনিটের ব্যাপারও নয়। রমা চন্দ শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন।

পিঠে হাতের স্পর্শ পেয়ে চমকে ফিরে তাকাল। আনন্দ কাকু। মৃদু স্বরে বললে, ব্যাপারগতিক ভালো বুঝছি না, দেখ এখন কি থেকে কি গড়ায়—

চলে গেলেন।

একটু বাদে সচকিত আবার। শুভ্রেন্দু নন্দী ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। পরনে সেই কালি-লাগা কাজের প্যান্ট আর আলখাল্লা। ধীর অথচ বড় বড় পা ফেলে কাজের তদারকে চললেন। ব্যক্তিত্বের এক অনড় প্রতীক যেন মানুষটা।

রমা চন্দও চেয়ার ছেড়ে উঠল আস্তে আস্তে। বাইরের আঙিনায় এসে দাঁড়াল। ওই মানুষকে ওদিকে যেতে দেখে বুকের ওপর হাতুড়ির ঘা পড়ছে। দূর থেকে দেখল, এক নম্বর শেডে ঘুরে ঘুরে মালিক কাজ দেখছেন। যেখানে খানিক আগেও বিমল পাঠক সর্বেসর্বা ছিল।...মোটর চলছে, ডাইনামো চলছে, ওয়েলডিং-এর কাজ হচ্ছে, হাতুড়ি

আর যন্ত্রপাতি ঠোকাঠুকির শব্দ আসছে—তা সত্ত্বেও রমা চন্দর মনে হয়েছে সমস্ত পরিবেশ মূক স্তব্ধ।

হাত দুই ওপরে তোলা একটা মেরামতির গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মিকানিকদের সঙ্গে কথা বলছেন শুভ্রেন্দু নন্দী। একজন ব্যস্তসমস্ত লোককে গাড়িটার নীচে কিছু একটা পাততে দেখা গেল।...মালিক এগিয়ে গিয়ে সেটার ওপর বসে পড়লেন, তারপর চিৎ শোয়া অবস্থায় গাড়ির নীচে ঢুকে গেলেন। মিস্ত্রীরা তটস্থ সব। নিঃশব্দে তারা যন্ত্রপাতি এগিয়ে দিতে লাগল।

এই ক'বছরের মধ্যে মালিককে গাড়ির নীচে শুয়ে কখনো কাজ করতে দেখেনি রমা চন্দ। এমন কি ইদানীং বিমল পাঠকও গাড়ির নীচে ঢুকত না। নিজের অগোচরেই পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো সে। পাঁচ-পাঁচটা লোককে এ-ভাবে বিদায় করার জন্য মনে মনে অন্তত এই মানুষের ওপর রমা চন্দ সদয় নয় একটুও। তারও বদ্ধ ধারণা, ওরা চুপ করে থাকবে না, বিপদ আসছে।

...কিন্তু তবু, এই মানুষ যেন পুরুষের প্রতীক, পুরুষকারের প্রতীক। তাঁর রাগ তাঁর ক্ষোভ তাঁর অসহিষ্ণুতা আর তাঁর কাজের ধারা সবই অপোসশূন্য সবল পুরুষের।

ঠিক ছ'টায় বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে চলে গেলেন শুভ্রেন্দু নন্দী। প্রতিদিন যেমন যান। কিন্তু আজ কারখানার গুমোট বাতাস যেন একটা মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

সেদিন আর কারো ছ'টায় কর্মস্থল ছেড়ে যাওয়ার তাড়া নেই। বাইরের উঠোনে সকলেই রমা চন্দকে ঘিরে আছে। এমন কি বুড়ো অ্যাকাউনটেন্ট আর ক্লার্কও যেতে পারেনি। সকলেরই প্রশ্ন, সাহেব যা করলেন তার ফল কি দাঁড়াতে পারে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কারো মনে ভয়, করো মনে সংশয়। কেউ বলছে, ওদের সকলের পিছনেই মস্ত মস্ত পাণ্ডা আছে—গণ্ডগোল বাধল বলে। পাণ্ডারা সব কারা কেউ ভালো করে জানে না—তারা যে সহজ লোক নয় এটুকুই জেনে রেখেছে। কারো মন্তব্য, ওই পাঁচজনের মধ্যে হঠাৎ মতবিরোধ ঘটল বলেই সাহেব এতটা সুবিধে পেলেন—দু'জন একজনের গেলে কথা ছিল, সব একসঙ্গে চাকরি খুইয়ে এখন আবার সব একজোট হতে পারে। ওই পাঁচজনের অনুরাগীবৃন্দ যারা, তারা মুখ গম্ভীর করে দাঁড়িয়ে আছে, শুনছে।

দেখতে দেখতে সাতটা বেজে গেল, তখনও পর্যন্ত কারো নড়ার নাম নেই। রমা চন্দও ঘড়ি দেখতে ভুলেছে। সে কারো কথায় সায় দেয়নি বা নিজের মতামত ব্যক্ত করেনি। কেবল শুনছে।

হঠাৎ সচকিত সকলে। আবছা অন্ধকারে মালিকের গাড়িটাই আবার এসে দাঁড়ালো। গাড়ি থেকে নেমে শুভ্রেন্দু নন্দী আঙিনায় এসে দাঁড়ালেন। সকলেই অপ্রস্তুত, সকলেরই বিড়ম্বিত মুখ। রমা চন্দ কি যে করবে ভেবে না পেয়ে বোকার মতো দাঁড়িয়েই রইল। এরই মধ্যে ভদ্রলোক আবার ঘুরে আসতে পারেন এ কে ভেবেছে।

একে একে অনেকের ওপর দিয়ে ঘুরে মালিকের দুই চোখ তার মুখে এসে স্থির হল। অপলক, কঠিন। সকলকে ছেড়ে আসল অপ্রত্যাশিত আসামী যেন সে-ই। গলার স্বরটুকুও ভয়াবহ গম্ভীর। জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার? অ্যাকশন পলিসি ডিসকাস

করছ? আর ইউ ইন ইট্ ট্যু?

শুকনো গলায় রমা জবাব দিল, না সার...এমনি আলোচনা হচ্ছিল।

হোয়াই? কিসের আলোচনা? কেন আলোচনা? লালচে দেখাচ্ছে সমস্ত মুখ।—ভয়ানক আঘাত পেয়েছ তোমরা সকলে, কেমন?...আর তুমি বোধহয় সব থেকে বেশি? নাও আস্ক দেম টু কুইট্ অ্যান্ড কুইট্ ইয়োরসেল্ফ্ প্লীজ!

কান সকলেরই আছে, কাউকে বলতে হল না। চোখের নিমেষে আঙিনা ফাঁকা। ভয়ে কি আচমকা একটা আঘাত পেয়ে জানে না, রমা সোজা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল একটু, তারপর পায়ে পায়ে পথে নেমে এলো। অপমানে আর নিষ্ফল রাগে একটু দ্রুতই হাঁটতে লাগল। ওই ব্যক্তিত্বের সামনে কেউ মুখ খুলতে পারেনা, সে-ও পারেনি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আর কেউ এত জ্বলছে কিনা সন্দেহ। সুমিত্রা বোসের মতো তারও মনে হচ্ছে, ধরাকে সরা ভেবেছে লোকটা, যা-খুশি করছে, যা-খুশি বলছে। চাকরির ওপর নিজেকে এতখানি নির্ভর করতে হয় বলেই হুট করে পাঁচ-পাঁচটা লোকের এভাবে চাকরি চলে যাওয়াটা কিছুতে বরদাস্ত করতে ইচ্ছে করছে না।

থমকালো একটু, হাঁটার গতি শ্লথ হল। আবছা অন্ধকারে অদূরের বাঁকের মুখে যে লোকটা দাঁড়িয়ে তাকে চিনতে দেরি হল না। রাজা আহমেদ।

ওকে দেখেই ভিতরটা সক্রিয় হয়ে উঠল কেমন।...ও এ-সময় এখানে দাঁড়িয়ে কেন? ছুটি নিয়েও সকালে মদ গিলে কারখানায় এসেছিল কেন? নিজেকে মিরজাফরের বংশধর বলেছিল কেন? মোট কথা লোকটার চালচলন একটুও সুবিধের মনে হচ্ছে না তার।

পায়ে পায়ে রমা চন্দ তার দিকেই এগোলো।

❀

অন্ধকারে নিঝুম কারখানার দিকে চেয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছেন শুভ্রেন্দু নন্দী। দারোয়ান দুটো আলো নিভিয়ে তালা-টালা বন্ধ করে আড়ালে সরে গেছে। মালিকের রকমসকম দেখে বিলক্ষণ ঘাবড়েছে ওরাও। এ অবস্থায় কেউ কারো অস্তিত্ব জাহির করতে চায় না।

...মিষ্টি একটা বাজনার আওয়াজ যেন কত দূরের থেকে কানে ভেসে আসছে শুভ্রেন্দু নন্দীর। মিষ্টি অথচ করুণ, ভায়লিনের বাজনা। বাজাচ্ছে যে, অন্ধকার ফুঁড়ে যেন তার মুখখানাই খুঁজছেন শুভ্রেন্দু। ছেঁড়া পাজামা, লম্বা জীর্ণ-কালো কুর্তা গায়ে, এক-মুখ কাঁচাপাকা দাড়ি, একটা পা খোঁড়া, আধ-বুড়ো মানুষ।...হ্যাঁ, অনেক—অনেক দূর থেকে লোকটা কাছে এগিয়ে আসছে যেন।

—তেমার এমন দিন থাকবে না বাবা, তুমি অনেক বড় হবে, ঢের বড় হবে, বাজনা বাজিয়ে কি অন্য কাজ করে দুনিয়াদার জানে—কিন্তু অনেক বড় হবেই তুমি—কেউ তোমাকে রুখতে পারবে না। আজকের তারিখ বসিয়ে এ-কথা তুমি লিখে রাখো—না মেলে তো শোহনলালের নামে কুকুর পুষো।

...এক পা জখম এক্স মিলিটারী জোয়ান ভিখিরি শিল্পী শোহনলাল বলেছিল কথাগুলো।

...আবার কার গলা শুনছেন শুভ্রেন্দু নন্দী? অন্ধকারে আবার কোন এক বুড়োর মুখ খুঁজছেন?

এ্যায়সা দিন নহী রহেগা সুভেন্ বাবু, ঘাবড়াও মাৎ! মদ খেলে সেই লোকটার মুখে হিন্দী বুলিও বেরুত। —তোমার দিল, তোমার হিম্মৎ আমি বুঝে নিয়েছি—তোমার নিজেরই মস্ত কারখানা হবে একদিন দেখে নিও, এর থেকে ঢের বড়—বহুৎ আদমিকো রোটি মিলগা উঁহাসে—রুপয়া তুমকো লেনে হোগা, লেনেই পড়েগা— !...

বুড়ো রফিক আহমেদ বলেছিল।

শুভ্রেন্দু নন্দীর এই মোটর মেরামতের কারিগরী শিক্ষার আর কাজের প্রথম আর শেষ গুরু, মেরুদণ্ড দুমড়নো ঝাঁঝরা ফুসফুস...রাজা আহমেদের বাবা রফিক আহমেদ।

...একেবারে শিশুকাল থেকে কলকাতার কোনো এক নামী মিশনারি স্কুলের হস্টেলে থেকে পড়ত এক ছেলে। তার নাম শুভ্রেন্দু নন্দী। শৈশবের জ্ঞানোন্মেষের আগে সে কোথায় কার কাছে থাকত স্মরণ নেই। সাধারণত অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেরাই পড়ত সেই স্কুলে। বাঙালীর সংখ্যা সেখানে সীমিত। হস্টেলে অত ছোট বয়সের বাঙালী ছেলে সে একাই। তাই মিশনারী স্কুলের কর্তাব্যক্তিদের একটু বিশেষ নজর ছিল তার ওপর।

ছেলেটাও জানত তার বাপের বড় অবস্থা। নাম রমেন্দ্র নন্দী। কোনো এক মস্ত ফার্মের সেল্‌স অফিসার। ভারতবর্ষের সবত্র সেই সংস্থার শাখা ছড়ানো। বাবাকে সেই সব জায়গায় ঘুরতে হত। বাবার মুখে শুনেছে জন্মের বছর খানেকের মধ্যেই তার মা স্বর্গে চলে গেছে। তার ধারণা স্বর্গে চলে গেছে মানে আকাশের ওধারে কোথাও চলে গেছে। এই হস্টেলে আসার আগে বাইরের কোন মিশনের এক বিদেশিনী মহিলার তত্ত্বাবধানে থাকত মনে আছে।

একটু বড় হতে বাবা তাকে কলকাতায় এনে এই স্কুলে আর হস্টেলে দিয়েছে। সেই শিশুকাল থেকে ছেলেটা নিঃসঙ্গ। এখানে সমবয়সী প্রায় নেই-ই। যা-ও আছে তাদের সঙ্গে বনিবনা হয় না। সেই সময় থেকেই ভিতরটা একরোখা তার। একটু বেশি বয়সের ছেলেরা মাতাব্বরি করতে এলে খটাখটি লেগে যেত। রাতে এক-একদিন ঘুম আসতে চাইত না। বিছানায় শুয়ে জানালা দিয়ে তখন আকাশ দেখত। তারা দেখত। ভাবত ওগুলোর মধ্যে একটা হয়তো মা। আকাশের ওধারের ঘর ছেড়ে এসে তারা হয়ে মিটি মিটি দেখে তাকে।

একমাত্র সঙ্গী বাবা! কলকাতায় থাকলে বাবা ঘুরে ফিরে আসতেন। আর বড় ভালও বাসতেন তাকে। অভাব কাকে বলে শুভ্রেন্দু জানত না। হস্টেলের ফাদারের কাছে বাবা টাকা দিয়ে রাখতেন। দাবি অসঙ্গত না হলে ফাদার হাসি মুখে ওর চাহিদা মেটাতেন। আর বাইরে থেকে ঘুরে এলে বাবা ওর জন্য কত কি নিয়ে আসতেন ঠিক নেই। তার জগতে বাবার মতো ভালো লোক আর নেই। অমন আর হয় না। বছরের দু'বার লম্বা ছুটি হত স্কুলের। গরমের ছুটি আর এক্সমাসের ছুটি। সেই ছুটির আশায় উন্মুখ হয়ে থাকত ছেলেটা। কারণ ছুটি হলে বাবা আসবেই আর তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুবে। সেইসব ছুটিতে বাবার সঙ্গে কত নতুন নতুন জায়গায় ঘুরেছে ঠিক নেই। এই করেই ছোট বয়সে বাইরের বড় দুনিয়াটাকে সে অনেকখানি চিনে ফেলেছে। বাবার সঙ্গে একবার সিলোন আর একবার গোয়া পর্যন্ত ঘুরে এসেছে।

ছেলেটা মনের মতো একজন সঙ্গী পেয়েছিল উঁচু ক্লাসে উঠে। তার নাম আনন্দ চক্রবর্তী। লক্ষ্ণৌ না কোথায় থাকত তার বাবা মা। ছেলেকে সাহেব স্কুলে পড়িয়ে মানুষ করতে না পারলে তার বাবা-মায়ের নাকি মন ভরছিল না। ক্ষুব্ধ আনন্দ নিজেই বলত এই কথা। ক্ষুব্ধ কারণ, সেখানকার অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে ইংরেজী স্কুলে বা এই মিশনারি হস্টেলে অনেকদিন পর্যন্ত মন বসেনি এই ছেলেরও। কোনোদিন বসেছে কিনা সন্দেহ।

শুভ্রেন্দুর ভারী ভালো লেগে গেছল আনন্দ চক্রবর্তীকে। পাছে হস্টেল ছেড়ে চলে যায় সেই আশঙ্কায় সর্বদা সঙ্গ দিত তাকে, যা চাইত তাই খাওয়াত। তখন বড় হয়েছে, তাই বাবা তার হাতেই চুপিচুপি কিছু টাকা দিয়ে রাখতেন। আনন্দর খেলাধূলায় তেমন মন ছিল না, শুভ্রেন্দু জোর-জবস্তি করেই তাকে খেলার আসরে টেনে নামাত।

আনন্দর হাব-ভাব স্বভাব দেখে মজাই লাগত শুভ্রেন্দুর। বাবা মা শখ করে সাহেবী স্কুলে দিয়েছেন বটে কিন্তু অমন ভেতো বাঙালী আর বুঝি দেখেনি। সর্বদাই বাড়ির জন্য মন খারাপ, ইংরেজী বই ছেড়ে বাংলা বই পড়ার দিকে ঝোঁক বেশি। চুপি চুপি বাংলা কবিতা লিখে ওকে দেখিয়ে ছোটদের মাসিক কাগজে পাঠায়। দৈবাৎ একটা দুটো কবিতা ছাপাও হয়ে গেছে। দুই বন্ধুরই তখন খুশি ধরে না। এরপরে ছোট ছোট গল্পও লিখতে লাগল আনন্দ। একমাত্র সমঝদার পাঠক শুভ্রেন্দু নন্দী। বন্ধুকে শোনানোর তাগিদে একের পরে এক গল্প লিখে যেত আনন্দ চক্রবর্তী। স্কুলের একেবারে শেষ ক্লাসে পড়তে একবার যা-একটা গল্প ছাপা হয়ে গেছল।

স্কুলের পাট শেষ হতে বেদনাদায়ক ছাড়াছাড়ি। তখন আবার আনন্দ চক্রবর্তীই বেশি ভক্ত হয়ে পড়েছে শুভ্রেন্দু নন্দীর। ছেলেটার বুদ্ধি সাহস গোঁয়ারতুমি—সবই প্রশংসার চোখে দেখত সে। কোনো কিছু করব বললে করে ছাড়ত, সে যত কঠিন কাজই হোক না কেন। আর একটা বড় আকর্ষণ, টাকা পয়সার ওপর দখলটাও ওই ছেলের অনেক বেশি। ওর থেকে ঢের বেশি টাকা হাতে পেত সে। আর দিলদরিয়া মেজাজে খরচও করত। ওই বয়সে বাবার কাছ থেকে অমন দেদার টাকা হাতে পাওয়া শুভ্রেন্দু এ তার কাছে বিস্ময়ও আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলার মতোও। বাবা তাকেও নিতান্ত কম টাকা পাঠাতেন না, কিন্তু শুভ্রেন্দুর বাবা যা দিতেন তার তুলনায় কিছুই নয়।

স্কুলের পর শুভ্রেন্দু গেল এনজিনিয়ারিং পড়তে। আর আনন্দ চক্রবর্তী শেষ পর্যন্ত কলকাতার এক সাদামাটা কলেজেই থেকে গেল। সাহেব স্কুলে পড়িয়ে ছেলেকে চৌকস বানানোর চেষ্টাটা একেবারে ব্যর্থ তার বাবার। ছেলের ঘাড়ে তখন সাহিত্য আর কবিতার ভূত ভালো-মতোই চেপে বসেছে। অতদিন সাহেব স্কুলে পড়ার পরেও এ ছেলে এনজিনিয়ার ডাক্তার বা নিদেন পক্ষে ব্যারিস্টারও হতে চাইবে না সেটা তার বাবার চিন্তার বাইরে ছিল। এতদিন টাকাগুলোই জলে ফেলেছেন ভাবলেন তিনি।

ছাড়াছাড়ি হলেও সেটা একেবারে অলঙ্ঘনীয় নয়। শিবপুর থকে শুভ্রেন্দুর যখন-তখন আসার সুযোগ হত না। পড়ার চাপ খুব, নিয়মেরও কড়াকড়ি। ফুরসত পেলে আনন্দই চলে যেত তার কাছে। একজন আর একজনকে ছাড়তে চাইত না তখন। একজন আর একজনকে এগিয়ে দেওয়ার ফাঁকেও ঘন্টা-দু'ঘন্টা কেটে যেত।

সুযোগ-সুবিধে করে নিয়ে শুভ্রেন্দুও যে এক-আধ সময় কলকাতায় চলে আসত

না, তা নয়। আসার ঝোঁক চাপলে ওকে ঠেকাবে কে। তখনো আগের মতোই সেই একরোখা মেজাজ। আগের থেকে আরো বেশি বেপরোয়া বরং। সে এলে আনন্দর কলেজও মাথায় উঠত। বিশেষ করে ভেকেশনের সময় বাবার সঙ্গে বেরুনোর আগে দিন কয়েক সে আনন্দর সঙ্গে থেকে যেতই। আনন্দ মেসে থাকে, হস্টেলে থাকা পোষায় না তার—সেখানে নানারকম কড়াকড়ি—কবি-সাহিত্যিকদের পিছনে ঘোরারও অসুবিধে। ছোট-ছোট মাসিক সাপ্তাহিকে আনন্দর গল্প আর কবিতা কিছু কিছু ছাপা হচ্ছে তখন। বন্ধু পড়বে বলে আনন্দ সেই সব লেখা গুছিয়ে রেখে দিত। শুভ্রেন্দু পড়ত। বলত, আমার ভালো লাগে না এ-সব পড়তে অথচ শুধু তোমার লেখা হলেই বেশ লাগে।

কলকতায় এলে শুভ্রেন্দুর পকেটে অনেক টাকা থাকত। নানা জায়গায় রসনা তৃপ্তি করে খেত দুজনে, খেলা দেখত, সিনেমা থিয়েটার দেখত।

...একবার ভেকেশনে বাবার সঙ্গে বেরুবার আগে শুভ্রেন্দু আসতে খুব বড় হোটেলে খাওয়ার লোভ হয়েছিল আনন্দর। চাইনিজ না কি বলে সেই খাওয়া। সন্ধার আগে সেই রকমই এক জায়গায় খেতে ঢুকেছে।

মাঝে মাঝে বিমনা হয়ে কান পেতে শুভ্রেন্দু যেন কি শুনছে মনে হল। সেও শুনল। বাইরে কোথায় ভায়লিন বাজাচ্ছে কে— ভারী করুণ অথচ মিষ্টি রেশ ভেসে আসছে একটা। ঘরের ডিম আলোর সঙ্গে সেই সুর যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

পেট ভরে খেয়ে দু'জনে নীচে নামল। তখন সবে রাত হয়েছে। কর্মব্যস্ত লোকালয় থেকে এ-জায়গাটা বিচ্ছিন্ন। বাইরে থেকে বাজনাটা আরো স্পষ্ট হয়ে কানে আসছে। বাইরেটা নির্জন, আবছা অন্ধকার। এই পরিবেশে সেই বাজনা যেন ভারী অদ্ভুত একটা মোহজাল বিস্তার করে চলেছে।

...অদূরে একটা বেদীর মতো জায়গায় বসে কালো আলখাল্লা-পরা এক মূর্তি নিবিষ্ট মনে বাজিয়ে চলেছে। আবছা অন্ধকারে ভালো করে তার মুখ ঠাওর হচ্ছে না।

পায়ে পায়ে দুজনেই সেদিকে এগিয়ে গেল। আরো অবাক তারপরে। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, এক-গাল কাঁচা-পাকা দাড়ি পাজামা আর কালো আলখাল্লায় তালি-মারা এমন এক শীর্ণ হতভাগা মূর্তির মানুষ বসে বসে এ-রকম বাজাচ্ছে—এ-যেন অবাক কাণ্ড। শিল্পী দেখে দু'জনে দুজনের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

ওরা দাঁড়াতে লোকটা ফিরে তাকালো একবার। বাঁ-হাতে আর কাঁধে ভায়লিন, ডান হাতে ছড়ি। সেটা তুলেই একবার কপালে ছোঁয়ালো তারপর আবার বাজাতে লাগল। সামনে কেউ এসে দাঁড়ালে ওই রকম স্বল্প অভিনন্দন সেরে আবার বাজাতে থাকে। তবে লোক কমই সামনে এসে দাঁড়ায়।

বেদীর ওপর তার সামনে কিছু খুচরো পয়সা দেখা গেল। দুই একজন লোক ওই হোটেল থেকে বেরুবার মুখে টলতে টলতে এসে সিকিটা আধুলিটা ফেলে দিয়ে গেল দেখল ওরা। পেটে সে-রকম তরল পদার্থ পড়লে অনেক সময় অনেকের দয়ার উদ্রেক হয়।

ব্যাপার বুঝে শুভ্রেন্দু নন্দী বাজনাদারের গা ঘেঁসে বেদীর ওপর বসে গেল। আনন্দ ঠায় দাঁড়িয়েই আছে, দুজনের বসার মতো জায়গা নেই। লোকটা বাজিয়েই চলেছে। সমঝদার শ্রোতা পেতে তার বাজনা খুলছে আরো। সুর যেন উত্তাল হয়ে উঠল। আনন্দর হাই উঠছিল, কিন্তু শুভ্রেন্দু স্থাণুর মতো বসে।

থামল এক সময়। তার পরেও কারো মুখে কথা নেই খানিকক্ষণ। বাজনা থেমেছে কিন্তু সুর থামেনি যেন। আবছা অন্ধকার আর তার বাতাস যেন সুরে সুরে ভরাট হয়ে গেছে।

বাজনা ভালো লাগল বাবুজী?

শুভ্রেন্দু বলল, খুব। এমন হাত তোমার...এখানে বসে বাজাও কেন?

অনেকক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইল লোকটা, তারপর টেনে টেনে বলল, আর কোথায় বাজাব। সামনের পয়সাগুলো আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করল একটু। বলল, বাবুরা যখন খেয়ে দেয়ে হালকা হয়ে ফেরে, তখন কিছু কিছু দিয়ে যায়—খোঁড়া পা নিয়ে আমি ঘুরে ঘুরে বাজাতে পারি না।

ব্যথিত বিস্ময়ে শুভ্রেন্দু তার পায়ের দিকে তাকালো। অন্ধকারে বোঝা গেল না কিছু। হঠাৎ তারপর একটা কাণ্ডই করল সে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা দশ টাকার নোট বার করে লোকটার পয়সাগুলোর ওপর রাখল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি?

—শোহনলাল।

সামনে দশ টাকার নোট দেখে সে বিস্মিত। তারপর চাউনিটা কেমন সন্দিগ্ধ। এ-রকম প্রাপ্তির অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম বোধ হয়।—এত দিচ্ছ কেন বাবুজী?

' শুভ্রেন্দু হাসল। তার স্নায়ুগুলো যেন বাজনার রেশে ভরাট হয়ে আছে। বলল, তুমি যা ভাবছ তা নয়, আমরা খেয়েছি বটে কিন্তু হাল্‌কা হবার মত কিছু খাইনি। আমার কাছে আছে, দিচ্ছি। তুমি এ-রকম বাজাতে শিখলে কি করে?

শোহনলাল আবার ভালো করে শুভ্রেন্দুকে দেখে নিল। আস্ত একটা দশ টাকার নোট দেওয়াটা পাগলামি কিনা বুঝছে না। জবাব দিল, একসময় গুরু ছিল বাবুজী, সে অনেক দূরে—লাদাকের কাছে। তাঁর কাছে অল্পই শেখার সুযোগ পেয়েছি। এখন কিরকম বাজাই নিজেও জানি না, ভিতর থেকে যেমন আসে তেমনি বাজিয়ে যাই, তোমার ভালো লেগেছে শুনে বড় ভালো লাগল বাবুজী। কেউ তো বলে না। দিল শরিফ থাকলে ভিক্ষের মতো করে কিছু দিয়ে যায়। আস্ত বাজনা কেউ শোনে না।

শুভ্রেন্দু এক লাইনও কবিতা লেখেনি কোনোদিন, অথচ যা বলল শুনে আনন্দ পর্যন্ত অবাক একটু। শুভ্রেন্দু বলল, তোমার বাজনা শুনতে শুনতে আমার বুকের ভিতর কেমন একটা যন্ত্রণা শুরু হল, সেটা বাড়তে থাকল, তারপর আস্তে আস্তে আবার মিলিয়ে যেতে লাগল। তুমি ভালো না বাজালে এ-রকম হল কি করে?

শোহনলাল আবার একটু চেয়ে দেখল ওকে। তারপর বলল, তোমার ভিতরে কিছু চাপা যন্ত্রণা আছে বাবুজী?

জানি না। লোকটার সম্পর্কে সত্যিই জানার আগ্রহ তার—তোমার কথা বলো, লাদাকে থাকতে মানে, সে-তো একেবারে সীমান্তের পাহাড়ী জায়গা?

লোকটা মাথা নাড়ল, তাই। দশটা টাকা পেয়ে হোক বা দরদী ছেলেটাকে পেয়ে হোক, নিজের কথাই বলল।...যুদ্ধের জোয়ান ছিল। একেবারে কাঁচা বয়সে ফৌজের কাজে ভিড়ে গেছল। কিন্তু বাড়ি ঘর ছেড়ে বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগত বলে একজনের কাছে এই বাজনা শিখতে শুরু করেছিল। তার বাবা ওস্তাদের আসরে ভাল তবলা বাজাত। ছেলেবেলা থেকে তারও একটু আধটু সুর জ্ঞান ছিল।...ক্যাম্পে মন টিকত না

শোহনলালের, রাতে মাঝে মাঝে পালিয়ে এদিক-ওদিক চলে যেত, ধরা পড়লে বিষম শাস্তি, তবু পালানোটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছল।

তারই ফল এই ভাঙা পা। ওপরঅলা পালানোর এই সামান্য সুখটুকুও বরদাস্ত করল না। এক দুর্যোগে পা পিছলে পাহাড় থেকে পড়ে ডান পায়ের হাঁটু পর্যন্ত দুমড়ে গুঁড়িয়ে গেল। ডিউটির জখমী সৈনিক আজীবন সরকারী-ভাতা পায়, ক্যাম্প পালানো আহত সৈনিকের শেষ পর্যন্ত জেল হল না এটুকুই ভাগ্য। শুকনো বড় একটা নিশ্বাস ফেলে শোহনলাল বলল, তারপর নানা জায়গায় ভেসে ভেসে এই যা দেখছ বাবুজী।

পরদিনও আবার সন্ধ্যায় আনন্দকে নিয়ে শুভ্রেন্দু শোহনলালের কাছে এসেছে। না, সেদিন আর হোটেলে খেতে বসেনি। শোহনলালকে ধরার জন্যেই এসেছে। আনন্দকে বলেছে, ওর বাজনা শুনে আমার বুকের ভিতর কেমন হচ্ছিল জানো না। পরের দিনও এসেই দশটা টাকা বার করে দিয়েছে।

শোহনলালের বিড়ম্বিত মুখ। জিজ্ঞাসা করল, তুমি ছেলেমানুষ বাবুজী, এত টাকা পাও কোথায়?

বাবার টাকা। আমাকে তুমি বাজনা শেখাবে?

কাঁচা-পাকা দাড়ি-ভরা মুখে লোকটা হাসল।—তোমার বেহালা আছে।

কিনে নেব।

শেখাতে পারি, কিন্তু শিখবে কোথায়, এখানে বসে?

সে দেখা যাবে। বাজনা শোনাও।

পর দিন আপিসে বাবার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে শুভ্রেন্দু জানিয়ে দিয়েছে, এবারে সে আর কোথাও যাচ্ছে না, আনন্দর সঙ্গে আনন্দর মেসে থাকছে। গেল না বটে, কিন্তু বেড়ানোর টাকাটা বাবার কাছ থেকে আদায় করে নিয়ে এলো। একটা ভিখিরি মানুষের কাছে বাজনা শেখার এত আগ্রহ আর উৎসাহ দেখে আনন্দ চক্রবর্তী তাজ্জব। পয়সা ফেলে ইচ্ছে করলেই তো ও-ছেলে রইস বাজনাদারের কাছে যেতে পারে!

ভরপুর উত্তেজনায় নতুন দামী বেহালা কেনা হল। তারপর সেটা নিয়ে শুভ্রেন্দু ছুটল তার ভিখিরি ওস্তাদের কাছে। আর তারপরের একটা মাস আনন্দ বিকেলের দিকে প্রায় নিঃসঙ্গ। তার ভায়লিন নিয়ে শুভ্রেন্দু ট্যাক্সি চেপে রোজ যায় শোহনলালের কাছে। এক একদিন এক এক জায়গায় শেখার জায়গা বেছে নেয়। শোহনলালকে নিয়ে দূরে দূরে চলে যায়। নিজে খাবার কিনে এনে যত্ন করে খাওয়ায় তাকে। টাকা দেয়। নিতে না চাইলে জোর করে তার আলখাল্লার ভিতরে গুঁজে দেয়। আর মেসে তার বাজনা শিক্ষার দাপটে মেসের বাসিন্দাদের কান ঝালাপালা। আনন্দকে ধরে তারা পাঁচ কথা শোনায়, ঠাট্টা ঠিসারা করে। কিন্তু শুভ্রেন্দুকে নিষেধ করা বা বাধা দেবার মতো জোর আনন্দর নেই। উল্টে বন্ধুর কানে কোনো কথা না যায় এই ভাবনা তার।

কলেজ খুলতে বেহালা নিয়ে শিবপুর চলে গেল। এবারে বাবার মারফৎ কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পাকা ব্যবস্থা করেই প্রতি শনিবার শুভ্রেন্দু আনন্দর মেসে চলে আসত আর সোমবার ভোরে চলে যেত। শোহনলাল তখন ওর সব থেকে বুকের কাছের মানুষ বোধহয়। মাসে খুব কম হলেও ষাট সত্তর টাকা করে দিত তাকে। আর আনন্দকে দু'দিনের থাকা খাওয়ার খরচার ঢের বেশিই পুষিয়ে দিত।

অলক্ষ্যে বসে ওপরঅলা তখন ওর জীবনের তারে সম্পূর্ণ ভিন্ন মিড় টানছিলেন। এমন এক অনাগত সর্বনাশা প্রলয়ের মুখে ও দাঁড়িয়ে আছে কে জানত! সেই প্রলয়ের সুর কেউ শোনেনি।

এনজিনিয়ারিং কলেজের দ্বিতীয় বছরের পরীক্ষার জন্য তোড়জোড করে পড়াশুনা শুরু করেছিল শুভ্রেন্দু নন্দী। এদিকে একটা মাস কেটে গেল, কলেজের মাইনে বাকি, বোর্ডিং ফী বাকি কিন্তু বাবার টাকার পাত্তা নেই। না টাকা আসছে না বাবার দেখা মিলছে। বাইরে গিয়ে থাকলে একটা দুটো চিঠি অন্তত পাওয়ার কথা। তাও পাচ্ছে না। জীবনে এ রকম কখনো হয়নি। টাকা প্রতি মাসে বরং সময়ের আগেই এসে গেছে।

চিন্তিত হয়ে বাবার এখানকাব আপিসে টেলিফোন করে যে খবব পেল মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার দাখিল। টেলিফোনের ওধারে রমেন্দ্র নন্দীর ছেলে কথা বলছে শুনে আপিসের লোকও অবাক। তাদের বক্তব্য চিফ সেলস অফিসার রমেন্দ্র নন্দী পনের দিন আগে স্ট্রোক হয়ে তাঁর কলকাতার নিজস্ব বাডিতে পবিবার-বর্গের সামনেই মারা গেছেন। এর মধ্যে তাঁরই ছেলে এনজিনিয়ারিং কলেজ থেকে বাবার খবর নিচ্ছে এ কেমন তাজ্জব কথা।

পাগলের কথা শুনল যেন শুভ্রেন্দু নন্দী। আপিসের লোকেব ভুল কোথাও হয়েইছে কিংবা আর কোনো রমেন্দ্র নন্দী হবে। কিন্তু চুপচাপ বসেই বা থাকে কি করে? ভুল হলে টাকাই বা আসছে না কেন? বাবার কোনো খবব নেই কেন? উদ্বেগে অস্থির হযে কলকাতায় ছুটে এলো। আসার সময বুদ্ধি কবে বাবার ফোটোখানা সঙ্গে নিযে এলো। বাবার ফোটোখানা সর্বদাই তার ঘরের টেবিলে বসানো থাকত। ফোটো সঙ্গে আনাব কারণ ভিতরে ভিতরে বাবার জন্য তার বিষম ভয় ধরেছে।

আপিসে খবর নিতে গিয়ে বুকে এক অভাবিত শেলের আঘাত নিয়ে ফিরে এলো। হ্যাঁ, ফোটোর ওই লোকই তাদেব চিফ সেলস অফিসার ছিলেন, রমেন্দ্র নন্দী—তিনি কলকাতার নিজের বাসভবনে স্ত্রী এবং দুই ছেলের সামনে স্ট্রোক হয়ে মাবা গেছেন। স্ত্রী এবং সেই ছেলেরা রমেন্দ্র নন্দীব প্রাপ্য নেবার ক্লেমও সই করে পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে ধূমকেতুর মতো এ ছেলেটা কোত্থেকে এসে নিজেকে রমেন্দ্র নন্দীর ছেলে বলে ঘোষণা করছে আপিসের লোক ভেবে পাচ্ছে না। প্রবঞ্চক কিনা এমন সন্দেহও হয়েছে কারো কারো, কিন্তু মুখের দিকে চেয়ে আবার তাও মনে হয়নি।

যাই হোক তাদের জেরার কবল থেকে ছাড়া পেয়ে শুভ্রেন্দু নন্দী রাস্তায় নেমে এসেছে। নির্বাক, বিমূঢ়, কিন্তু বুকের তলায় কি-যেন দুর্বোধ্য যন্ত্রণা। ও কে তাহলে? শুভ্রেন্দু নন্দী কে? ও কি একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে কিছু? তার এতকালের পরিচয়টা তাহলে কি? রমেন্দ্র নন্দী যদি তার কেউ নয় তাহলে শুভ্রেন্দু নন্দীকে কি চেন?

ঠিকানা দেখে দেখে সেই বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছে—যেটা নাকি রমেন্দ্র নন্দীর নিজস্ব বাড়ি। ছেলেদের কাউকে দেখল না, কে দেখা করতে চায় খবর পেয়ে একজন মহিলা নেমে এলেন। বিধবা। মুখে শোকের ছাপ তখনো। বেশ কমনীয় আর সুন্দর মুখ। কিন্তু আশ্চর্য, ওব মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়েই তাঁর চাউনিটা ধার-ধার হয়ে উঠল কেমন।—কি চাই?

...রমেন্দ্র নন্দী।

তিনি নেই। মারা গেছেন।...তুমি কে?

পকেট থেকে ফোটো বার করল শুভ্রেন্দু। তার হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে তখন। জিজ্ঞাসা করল, এই রমেন্দ্র নন্দীর বাড়ি কিনা এটা এবং তিনিই মারা গেছেন কিনা।

মহিলার সমস্ত মুখ যেন বিতৃষ্ণায় ছেয়ে গেল, চাউনি আরো অকরুণ ধারালো। ফোটোটা একপলক দেখে নিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? এখানে কেন এসেছ? কে পাঠিয়েছে তোমাকে? কে তুমি?

...আমি নিজেকে রমেন্দ্র নন্দীর ছেলে বলে জানতুম এতকাল। শুভ্রেন্দু জবাব দিল। অপলক চোখে দেখছে তাঁকে।

আর একটি কথা না বলে ভদ্রমহিলা হন হন করে ভিতরে চলে গেলেন।

শুভ্রেন্দু নন্দী আবার রাস্তায়।

দুর্বোধ্য যন্ত্রণাটা এবারে চোখের সামনে আকার নিয়েছে। যা বোঝবার ওই মহিলাই বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। এই দুনিযায় সে এক ভ্রষ্ট আগন্তুক। রমেন্দ্র নন্দী তার জন্মদাতা হতে পারে, কিন্তু তার বেশি আব কেউ নয়, কিছু নয়। কিন্তু তাঁর এতদিনের এত স্নেহ-মমতা ভালবাসা? ওকে নিয়ে বেড়ানো? ওর সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য এত উদারতা? এ কেমন কবে হয়—কেমন কবে হতে পাবে?

চলতে চলতে আনন্দর কাছে চলে এসেছে শুভ্রেন্দু নন্দী। অকপটে সবই বলেছে তাকে।

শুনে আনন্দও স্তম্ভিত। মুখে তাবও কথা সরেনি একটিও। যা শুনল বিশ্বাস কববে কি করবে না জানে না।

...রাতটা তার ওখানেই ছিল। সকালে উঠে আনন্দ দেখে শুভ্রেন্দু নেই।

দিন দুই বাদে তার খোঁজে শিবপুর এসেছে। সেখানে ছাড়া আর কোথাও তার থাকার জায়গা নেই। কিন্তু শুভ্রেন্দু নন্দী সেখানেও নেই। শুনল, গত পরশুই জিনিসপত্র নিযে সে হস্টেল ছেড়ে চলে গেছে। কোথায গেছে কেউ জানে না।

শুভ্রেন্দু নন্দী কোথাও যায়নি। যাবার মতো কোনো জায়গা নেই তার। এই কলকাতাতেই খেলেছে, এখানেই কাটিয়েছে। কিন্তু কোনো চেনা মানুষের জগতে আর তাকে দেখা যায়নি। রীতিমতো ভালো ছাত্র ছিল। প্রোফেসররা ভালোবাসত। তাদের কাছে সব খুলে বললে কোনো দরদী হয়তো ওর জন্যে কিছু করতে পারত। বলেনি। নিঃশব্দে চলে এসেছে। সে হারিয়ে গেছে।

শুভ্রেন্দু নন্দী তার পর থেকে এই দুনিয়াটাকে ঘৃণা করেছে, অথচ আশ্চর্য যে মানুষ সব কিছুর জন্যে দাযী সেই রমেন্দ নন্দীকে একদিনের জন্যেও ঘৃণা করতে পারেনি। অদৃষ্ট তাঁকে আর এক দুনিয়ায় টেনে নিয়ে গেছে। না নিলে জীবন এ-রকম হত না, কোনো খেদ থাকত না—এটা সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছে। জ্ঞান হবাব পর থেকে এ-পর্যন্ত দেখে একটা মানুষ সম্পর্কে এত ভুল হতে পারে না। বাবা তাকে ভালো না বেসে পারে না। ওই মহিলাকে মনে পড়েছে। সেখানে বাবার জীবন সুখে কেটেছে এ সে বিশ্বাস করে না। তাই বাবার বিচারও সে করে না।

...কিন্তু তবু যন্ত্রণা। তবু দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা। নিজেকে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারলে তবে যেন রাগ যায়, বিতৃষ্ণার শেষ হয়।

শৌখিন জামা-কাপড় জিনিস-পত্র অনেক ছিল। বাবা তো সবকিছুই ঢেলে দিয়েছিল। একে একে সবই বেচতে হয়েছে। কিছু চুরিও গেছে। আগলে রেখেছে একমাত্র ভায়লিনটা। তাই নিয়ে ভিখিরি শিল্পী শোহনলালের কাছে এসেছে। তার কাছেও গোপন করেনি কিছু। শুধু তার কাছেই যেন আশা করেছে কিছু। কিছু নেবার জন্য তার কাছেই হাত বাড়িয়েছে। বলেছে, আর তো আমার টাকা নেই, আর কি তুমি আমাকে শেখাবে?

তার ভিখিরি গুরু হেসে কেঁদে অস্থির। বলেছে, শেখাবো। তোর দিল পুড়ছে, কলজে পুড়ছে—তোর মতো বাজনা কে বাজাবে? আমার সবটুকু তোকে দেবো। তুই আমার কাছে থাকবি, যতদিন দরকার আমি তোকে ভিক্ষে করে খাওয়াব। তুই অনেক বড় হবি, এত বড় দিল কখনো মিথ্যে হয় রে বোকা?...আর বলেছে, মানুষের জন্মের আবার দাগ থাকে নাকি রে, অমানুষ হলে তবেই দাগ থাকে।

হ্যাঁ, ওই ভিখিরি গুরুর নোঙরা বস্তিতেও রাত কাটিয়েছে মাঝে মাঝে। একবার পেলে আর সহজে ছাড়তে চায়নি। দিন রাতে অনেকবার করে তার কথাগুলো আওড়েছে, মানুষের জন্মের দাগ থাকে না, অমানুষ হলে তবেই দাগ থাকে।

•

জীবনের আর এক অধ্যায় শুরু এক অবাঙালী মালিকের মোটর গাড়ি সারাইয়ের কারখানায়।

কিন্তু শুভ্রেন্দু নন্দীর জীবনে সেখানকার নায়ক মালিক নয়, নায়ক তাড়িখোর অকাল বার্ধক্যে কুব্জ মুসলমান মিস্ত্রী রফিক আহমেদ। রাজা আহমেদের বাবা রফিক আহমেদ।

প্রথম ছ'মাস শুধু জলখাবারের বিনিময়ে শিক্ষানবিশির সুযোগ পেয়েছিল শুভ্রেন্দু। কেউ জানে না সেই জলখাবারটুকুই তার চব্বিশ ঘন্টার রসদ তখন। কারখানার মালিককে জানতে দেয়নি বুঝতে দেয়নি। তবে মাঝে-সাঝে রফিক আহমেদ নিজের খাবারের ভাগ দিত তাকে। সেও না জেনেই দিত। শরীরের বাঁধুনিটা এমনই ছিল যে এতবড় দৈন্যও খানিকটা ঢাকা পড়ে থাকত। কোনো পয়সাঅলা বড়লোকের ছেলে যেন শখ করে এই মেহনতীর কাজ শিখতে এসেছে।

ছ'মাস বাদে মাসে তিরিশ টাকা অর্থাৎ দিনে এক টাকা মাইনে বরাদ্দ হয়েছে তার জন্য। সেই বাজারে আর শুভ্রেন্দুর সেই অবস্থায় তিরিশটা টাকা বড় কম নয়। এও রফিক আহমেদের বিশেষ চেষ্টার ফল। মাত্র ছ'মাসের মধ্যে ছেলেটাকে এত বেশি কাজ শিখতে দেখে আর তার মাথা দেখে সে অনেক সময় তাজ্জব বনে যেত। একটা এনজিনিয়ারিং পড়া ছেলে এসে এই কাজে লেগেছ এ কি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পেরেছে।

কিন্তু বরাবরই কেমন সন্দেহ হয়েছে, এ ভদ্রলোকের ছেলে, কোনো বিপাকে পড়ে এখানে এসেছে, সমস্ত রকম ভাবেই এ ছেলে ওদের থেকে স্বতন্ত্র। কতদিন তাকে ধরে খোঁজাখুঁজি করেছে, তুমি নিশ্চয় ঘর পালানো ছেলে। এত মেহনত না করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও!

অবাঙালী মনিবের চোখে পড়তেও সময় লাগেনি। কে কেমন কাজ করছে সেদিকে তার শাণিত দৃষ্টি। রফিক আহমেদ পাকা কারিগর কিন্তু ওকে দিয়ে আর কাজ চলছে না। রাতের তাড়ির নেশা ওর সকালেও ভালো করে ভাঙতে চায় না। এর ওপর প্রায়ই জ্বর হয়। পিঠের শিরদাঁড়া দুমড়ে বেঁকে গেছে। অতএব সমস্ত রকমের দায়িত্ব নেবার

মতো একটা লোক তার হয়েছে। ছেলেটার সব দিকে চোখ, সমস্ত কাজে সমান মনোযোগ।

এক বছরের মধ্যে শুভ্রেন্দুর মাইনে হয়েছিল একশ টাকা। চাপ দিলে আরো বেশি হতে পারত, কিন্তু শুভ্রেন্দু ওতেই সন্তুষ্ট তখনকার মতো। অবশ্য ভালো কাজ করলে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এ আশ্বাসও মনিব তাকে দিয়েছে। ওদিকে রফিক আহমেদও যোগ্য সাগরেদ পেয়ে হাত-পা প্রায় গুটিয়ে ফেলেছে। তার প্রধান কাজ এখন উঠতে বসতে চতুর্থ পক্ষের ছেলে রাজা আহমেদকে ঠেঙানো।

দশ টাকা মাইনের বছর বারো বয়সের ছেলেটাকে এখানে ফাইফরমাস খাটার কাজে লাগিয়েছে রফিক আহমেদ। ওর মা রফিককে ছেড়ে চলে গেছে সেই রাগের খানিকটাও ছেলেটার ওপর বর্তেছে। আবার নিজেই বলেছে রফিক আহমেদ, তাড়ির নেশার সময় খিচ খিচ করলে চেলাকাঠ দিয়ে সে মার মারত বিবিটাকে, সহ্যই বা করবে কি করে। আবারও একটা নিকে করার ইচ্ছে ছিল তার, ওর মতো মিস্ত্রী নাকি একবার হাত বাড়ালে তিনটে মেয়ে ধরে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু শরীরটা ভেঙে পড়ছে বলে আর সে-চেষ্টা করেনি।

বাপের হাতে রাজার পিটুনি খাওয়ার কারণ, কাজে মন নেই ওর একটুও। ও কোনোদিন ভালো মিস্ত্রী হতে পারবে না। তাড়ি খাওয়ার পরে এই শোক আরো বেশি উথলে উঠত। তখন বেধড়ক পিটুনি। ভদ্দরলোকের ছেলের এত কাজে মন আর ওই নবাবের বাচ্চা কিনা—ইত্যাদি। ভদ্রলোকের ছেলে বলতে শুভ্রেন্দু নন্দী।

রফিক আহমেদ একেবারে আকাশ থেকে পড়েছিল আর তারপর একেবারে জাপটে-মাপটে ধরেছিল শুভ্রেন্দুর বাজনা শুনে। মালিকের অনুমতি পেয়ে কারখানাতেই থাকত সে। সংকোচ কাটিয়ে রাতে প্রথম যেদিন বাজাতে বসল, তাড়ি খেয়ে রফিক আহমেদ সেখানেই পড়ে ছিল। হ্যাঁ, তাড়ির নেশাও ছুটে গেছল নাকি তার। পরদিন তাড়ি না খেয়েই বাজনা শুনেছিল। আর তারপর নতুন করে আবার ধরে পড়েছিল, ও কে, কোত্থেকে এসেছে সব বলতে হবে। শুভ্রেন্দু কিছু কিছু বলেছিল। এনজিনিয়ারিং পড়ার কথা বলেছে আর বাবা হঠাৎ চোখ বুজতে এই হাল, বলেছে। শোহনলালের মতো একেও তখন কাছের মানুষ মনে হত শুভ্রেন্দু নন্দীর।

রফিক আহমেদ তখনি মন্তব্য করছে, তুমি অনেক বড় হবে সুভেন বাবু। বড় হওয়া বলতে ও কি বুঝেছিল শুভ্রেন্দুর ধারণা নেই। বুকের সেই তাপটুকুই বড় জিনিষ মনে হয়েছিল।

কারকানার কাজে বড় হওয়ার দিকে ও তাকে ঠেলেছে বটে। মালিককে সব বলে ওর আরো মাইনে বাড়িয়েছে। মালিক তার এক কথায় কেন অমন দরাজ হয়ে উঠেছিলেন রফিক আহমেদ তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। একজনের উন্নতির ফলে তার যে দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে জানত না।

প্রায় তিন বছর ছিল শুভ্রেন্দু সেখানে। রফিক আহমেদের ফুসফুস তখন ঝাঁঝরা, প্রায় বিকল অবস্থা। শুভ্রেন্দুর দুশ্চিন্তার শেষ নেই লোকটার জন্য, কিন্তু রফিক আহমেদ বেপরোয়া। তার শাসনে পড়ে ওষুধ খায়, আবার লুকিয়ে তাড়িও গেলে। রাগারাগি করলে বলে, তাড়ি না খেলে বেহেস্ত যে অনেক দূর দূর লাগে সুভেন বাবু—

মালিক ওকে জবাব দিতে চাইল। শুভ্রেন্দুর কথায় ওকে অনেক টেনেছে, আর পারে না। অনেকদিন ধরেই সেই অবাঙালী মালিক এই মতলব আঁটছিল। বলেছে, ওর ছেলেটা যদি কাজ শেখে তাকে বরং দেখতে রাজী আছে। কিন্তু শুভ্রেন্দু স্পষ্ট জবাব দিয়ে এসেছে তাহলে সে-ও থাকবে না। বলেছে, ও যতদিন বেঁচে আছে তার মাইনের অর্ধেক ওকে দিলে আপত্তি হবে না।

খবরটা কারখানার লোকই রফিককে দিয়ে থাকবে। এমন দিলের মানুষও আছে দুনিয়ায় মূর্খ শ্রমিকদের কাছে এ যেন এক বিস্ময়। তাই বলেছে, আনন্দের চোটে রফিক সেদিন তাড়ি না খেয়ে পারেনি। তারপর রাতে বার বার সেই পুরনো ঘোষণায় ওর কান ঝালাপালা করেছে—অ্যায়সা দিন নহী রহেগা সুভেন বাবু—

তারপর বড় আশ্চর্য প্রস্তাব করেছে একটা রফিক আহমেদ। তার কিছু টাকা আছে। প্রায় ন'শ টাকা। নিজে কারখানা করবে একদিন এই আশায় তিল তিল করে জমিয়েছে। তাড়ির নেশা না থাকলে টাকা আগে ঢের বেশি জমত। আল্লার নামে শপথ করেছিল নেশা করে ওই জমানো তহবিল ভাঙবে না। কিন্তু কারখানা করা জীবনে আর হল না, অতএব এ টাকা সুভেনবাবুকে নিতে হবে, ওর কারখানা হবেই একদিন এ সে দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছে—এই টাকা তখন লাগবে। বিনিময়ে শুধু রাজা আহমেদকে কাছে টেনে নিতে হবে—তার সমস্ত ভার নিতে হবে।

শুভ্রেন্দু নন্দীকে শেষ পর্যন্ত রাজী করিয়ে ছেড়েছিল রফিক আহমেদ।

আরো তিন বছর পরের কথা। শুভ্রেন্দু নন্দীর বয়স তখন উনত্রিশ পেরুতে চলেছে।

মোড়ের দোকানে দাঁড়িয়ে শস্তা দামের সিগারেট কিনছিলেন ছোট কারখানা নানডি অটো হাউসের মালিক শুভ্রেন্দু নন্দী। পরনের খাকী ট্রাউজার তেলকালিতে বিবর্ণ, গায়ের ছেঁড়া জালি গেঞ্জির দশাও তাই। এ ছাড়া হাত পা বাহু মুখের অনেকটাই গাড়ির তেল-কালিতে মাখা। এর থেকে আসল মানুষটাকে চিনে নেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। কারখানায় যতক্ষণ অবস্থান তার, মুখের এই তেলকালিও থাকবেই ততক্ষণ। মালিকের এই কর্মমগ্ন মূর্তি অনেক খদ্দেরও পছন্দ করত।

আনন্দ চক্রবর্তী পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। কালি-ঝুলি মাখা একটা লেবার সিগারেট ধরাতে ধরাতে তাঁর দিকে বক্র চোখে চেয়ে আছে সেটুকুই শুধু লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি তখন ভিন্ন জগতের মানুষ, অন্যমনস্কের মতো ভিন্ন জগতেই বিচরণ করছিলেন।

মশাই শুনছেন।

ঘুরে দাঁড়ালেন। ভুরু কুঁচকে তাকালেন। তাঁকে দেখে একটা লোক বাজে রসিকতার চেষ্টায় এগোচ্ছে মনে হল।

এগিয়ে আসতে আসতে লোকটা বলল, দু'মিনিট দয়া করে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট খেয়ে যান না।

লোফারের ইয়ারকি ধরে নিয়ে আনন্দ চক্রবর্তী ভ্রূকুটিটা আরো জোরালো করতে

যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই হাঁ। তখনো চিনে উঠতে পারছেন না, অথচ চেনা-স্মৃতির কোন একটা অদৃশ্য দড়িতে যেন জোর হ্যাঁচকা টান পড়েছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন। আপাদমস্তক দেখলেন। বিস্ফারিত চাউনি। সত্যি দীর্ঘকালের একটা যবনিকা চোখের সামনে উঠতে যাচ্ছে কিনা ভেবে পাচ্ছে না।

শুভ্রেন্দু?

—জি। সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়াগুলো তার মুখের ওপরেই ছাড়লেন শুভ্রেন্দু নন্দী।

কি আশ্চর্য—তুমি এই বেশে এখানে! এর পরেও যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না আনন্দবাবু।

ডেকে অসুবিধে করলাম?

কি যে বলো। আবারো ওই মূর্তি একবার না দেখে নিয়ে পারলেন না।

এখানে কাজ-টাজ করছ কিছু?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বাবুর যদি অপমান না লাগে তো একটু সঙ্গে এলে খুশি হই।

কথা শুনেও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাচ্ছেন আনন্দ চক্রবর্তী। এই সেই শুভ্রেন্দু নন্দী বিশ্বাস হয় না যেন।—কোথায়? এই কাছেই কাজ করো বুঝি? চলো চলো—কি কাণ্ড, কতকাল বাদে—রাতারাতি হঠাৎ কোথায় যে উবে গেলে একেবারে—। পাশাপাশি চললেন। পুরনো আবেগ ভিতর থেকে ঠেলে উঠছে অথচ সেই সঙ্গে কোথায় যেন অস্বস্তি একটু। তার পিছনে পিছনে অস্বস্তি চেপে মুখ বুজেই পথটুকু অতিক্রম করলেন।

কারখনার সামনে ছোট সাইন বোর্ডে লেখা 'নানডি অটো হাউস'। থমকে দাঁড়িয়ে দেখলেন সাইনবোর্ডটা আনন্দবাবু। সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তিটা যেন কমে এলো একটু। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নিজেরই কারখানা নাকি?

ইয়েস সার। আই অ্যাম দ্যা সোল *প্রোপ্রাইটর, চিফ এনজিনিয়ার, চিফ মিকানিক,* চিফ সুপারভাইজার, অ্যান্ড চিফ অফ এভরিথিং। ঘাড় না ফিরিয়ে এবং হাসি চেপে শুভ্রেন্দু নন্দী গড়গড় করে বলে গেলেন।

অদূরে একটা অল্পবয়সী লোক একটা ভাঙা ঝরঝরে গাড়ির সামনে বসে খুব মন দিয়ে লম্বামতো কি একটা পার্টস-এর ওপর ঠুক-ঠাক হাতুড়ি পিটছিল।

এই রাজা! হঠাৎ ক্রুদ্ধগর্জন করে উঠলেন শুভ্রেন্দু নন্দী।—ডিফারেনসিয়াল নিয়ে তোকে ঘাঁটাঘাঁটি করতে কে বলেছে—ওই হাতুড়ি দিয়ে দেবো একেবারে মাথার ঘিলু বার করে?

লোকটা চমকে ফিরে তাকাল, তারপর উঠে অন্য একটা ভাঙা গাড়ির দিকে চলে গেল। শুভ্রেন্দু নন্দী নিজেই একটা টুল এনে সামনে পেতে দিলেন। তারপর সোজাসুজি এই প্রথম তাকালেন আনন্দ চক্রবর্তীর মুখের ওপর।—বসার সময় হবে?

আনন্দ চক্রবর্তী তাড়াতাড়ি বসে পড়লেন। ঢোক গিলে হাসতে চেষ্টা করে বললেন, তোমার ধরন-ধারণ বদলেছে দেখছি—ও কি, মাটিতে বসলে যে! আর একটা কিছু—

ব্যস্ত হয়ো না বন্ধু, আমার বেশ দেখছ না, আপাতত এটাই যোগ্য আসন, একটু বাদে তো ওই গাড়ির নিচে ঢুকব। তারপর বলো, সাহিত্য চলছে?

ওই কুকর্মটুকুই চলছে কেবল।

টান হয়ে বসে শুভ্রেন্দু নন্দী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, অনেক দিন তো হয়ে গেল —বই-টই ছেপেছ কিছু?

দ্বিধান্বিত হাসি মুখে আনন্দ চক্রবর্তী জবাব দিলেন, খানদশেক ছাপা হয়েছে, দুটো প্রেসে আছে...তাছাড়া একটা বইয়ের তো ছবিও হয়ে গেছে...

—বলো কি হে! সত্যি! যথার্থই খুশি। আর একটু কাছে এগিয়ে এলেন।—এ গ্রেট ম্যান দেন—অ্যাঁ?

আনন্দ চক্রবর্তীও হাসছেন। বন্ধুকে জানাতে ভালো লাগছে কারণ একসময় তাঁর সাহিত্যের প্রতি এর দরদ ছিল।...কিন্তু সেই মানুষকেই বলছেন কিনা জানেন না। জানার আগ্রহ, জানার লোভ। কিন্তু এই মূর্তি থেকে আসল মানুষটাকে বোঝার উপায় নেই।

শুভ্রেন্দু মুখের দিকে চেয়ে আছেন। তিনিও সেই পুরনো বন্ধুকেই খুঁজছেন বোধ হয়।—বিয়ে করেছ?

মাথা নাড়লেন।—একটা ছেলেও আছে।

বউ সুন্দরী?

হেসে জবাব দিলেন, নিজেই একদিন দেখবে এসো। বলার পর ভিতরে ভিতরে কেন যে একটু বিব্রত বোধ করলেন জানেন না। এতগুলো বছরের ব্যবধান চট করে যেন ঘুচতে চাইছে না।

রাজা আহমেদ দু'হাতে দু'ভাঁড় চা এনে সামনে ধরল। হাত বাড়িয়ে শুভ্রেন্দু নন্দী একটা ভাঁড় নিলেন, তারপর ওকে ধমকে উঠলেন, ব্যটা মুখখু, ওখানে এই চা চলবে কিনা দেখে বুঝছিস না? ভাগ!

রাজা আহমেদ সেই ভাঁড় নিয়ে প্রস্থান করল। আনন্দ চক্রবর্তী তাকে ফিরে ডাকতে পারলেন না। কিন্তু মুখে একটু জোর দিয়ে বললেন, এতকাল বাদে দেখা অথচ তুমি আমাকে এ-ভাবে ঠাসছ কেন সেই থেকে...কোনো দোষ করেছি?

ভাঁড় হাতে শুভ্রেন্দু নন্দী সকৌতুক চেয়ে রইলেন একটু। কালিমাখা মুখখানা একটু যেন কোমল হল। বললেন, না—আমারই স্বভাব খারাপ হয়েছে। কত যে খারাপ হয়েছে সেটা এরপর যদি মাঝে মাঝে দেখা হয়, বুঝতে পারবে।

দেখা হয়েছে। বাড়ি আসতে বলা সত্ত্বেও শুভ্রেন্দু নন্দী আসেনি। অথচ তাঁকে আনার জন্য আনন্দ চক্রবর্তী খুব একটা জোর জুলুম করতে পারেননি। কোথায় একটা অদৃশ্য বাধা। আগের মতো সহজ হবার জন্যে উন্মুখ, অথচ হয়ে উঠতে পারেন না। এই না পারাটা নিজের বিবেকে লাগে। বন্ধুকে বাড়ি আসার কথা মাঝে মাঝেই বলেন অবশ্য। শুভ্রেন্দু নন্দী বলেন, সময় হয়নি, আর সময়ও পাইনে, তবে একবার যখন যাওয়া শুরু করব তখন তাড়াতে চাইবে।

তিনি কারখানায় আসেন মাঝে মাঝে। কতদিন গাড়ির নিচে শুয়ে বন্ধুকে কাজ করতে দেখেছেন। সেই অবস্থাতেই সামনে বসে গল্প করেছেন। ওই কর্মদৃপ্ত মূর্তি দেখে ক্রমে আবার একটা আকর্ষণ অনুভব করেছেন তিনি। কারখানার দ্রুত ভোল বদলাচ্ছে, দিন বদলাচ্ছে তাও অনুভব করছেন। কাজ বাড়ছে, লোক বাড়ছে। কিন্তু বন্ধুর কাজের নিবিষ্টতায় কোনোরকম ছেদ নেই।

দু'বছর পরে একদিন।

আনন্দবাবু লিখছিলেন। স্ত্রী এসে বললেন, সুন্দর গাড়ি চেপে কে যেন এলেন তোমার কাছে। মনে মনে স্ত্রীটি আশা করছিলেন, কোনো ছবির প্রযোজক হবে বোধহয়।

এসেছেন শুভ্রেন্দু নন্দী।

এ আর এক মূর্তি। হ্যাঁ, এই মূর্তিতে সেই আগের মানুষকে অনেকখানি চেনা যায়। ফিটপাট বেশবাস। পুরুষকারের অভিব্যক্তি।

আনন্দ চক্রবর্তী হৈ-হৈ করে উঠলেন। পরিচয়-পর্বের পরে তাঁর স্ত্রীও অনুযোগ করলেন, কতদিন ধরে আপনার কথা শুনছি, এতদিনে সময় হল?

হাসি মাখা দুই চোখ মেলে শুভ্রেন্দু নন্দী খুঁটিয়ে দেখে নিলেন তাঁকে। এ-রকম ভাবে দেখলে যে-কোনো মহিলার অস্বস্তি বোধ করার কথা। জবাব দিলেন, নিজের এই বোকামির জন্যে বড় আফশোস হচ্ছে ম্যাডাম। আই অ্যাম সরি ফর মাইসেল্‌ফ।

মনের তলায় কেন যে আবার একটু বিড়ম্বনার আঁচড় পড়ল আনন্দ চক্রবর্তী জানেন না। এই গোছের নিখাদ সরলতার পিছনে অনেকখানি বিশ্বাসের প্রশ্ন।...একদিন দুরন্ত বেপরোয়া ছিল যে ছেলেটা, মাঝের এতগুলো অজ্ঞাত বছরের অন্ধকার ঠেলে তার ভিতরটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন না বলেও হতে পারে।

প্রায় ঘন্টা দেড়েক ছিলেন সেদিন শুভ্রেন্দু নন্দী তাঁর বাড়িতে। অনেক গল্প করেছেন, আর চলে আসার সময় বলে গেছেন তাঁব নতুন বাড়ি হয়েছে, অবিলম্বে সস্ত্রীক সেখানে না গেলে সম্পর্ক থাকবে না। আসার দিন তারিখ সময়ও ঘোষণা করে গেছেন।

চলে যেতে স্ত্রী খুশি হয়ে মন্তব্য করেছিলেন, একটা মানুষের মতো মানুষ মনে হয়...আমি তো ভাবতেই পারিনি এ-রকম লোক তোমার এই বন্ধু।

আনন্দ চক্রবর্তী জবাব দেননি। স্ত্রীর প্রশংসারত মুখখানা লক্ষ্য করছিলেন তিনি। আর মনে মনে একটু যেন নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন, পিছনের গ্লানির অধ্যায়টা স্ত্রীও তাঁর মুখে শুনেছেন, কিন্তু বন্ধু যতক্ষণ ছিল সে প্রসঙ্গ হয়তো তার মনেও পড়েনি। মনে মনে তাই আসা করছেন আনন্দ চক্রবর্তী, বন্ধুরও সুন্দর ঘর হবে একদিন, আর যে আসবে পুরুষকারে দৃপ্ত ওই মানুষটাকে নিয়েই খুশি হবে হয়তো—সব জানলেও পিছনের ওই গ্লানির অধ্যায় নিয়ে মাথা ঘামবে না।

সেই দিন তারিখ সময় মেনে নিয়ে শুভ্রেন্দু নন্দীর বাড়িতে দুজনেই এসেছেন। সুন্দর ছোট্ট বাড়ি। পরিমিত আসবাব ছবির মতো সাজানো। দুজনে ঘুরে ঘুরে দেখলেন, মালিকের রুচির প্রশংসা করলেন। আনন্দবাবুর স্ত্রী বললেন, এবারে বাকি কাজটুকু সেরে ফেলুন, গৃহিণী নিয়ে আসুন।

হাসি-মাখা চাউনি শুভ্রেন্দু নন্দীর। জবাব দিলেন, বড় দেরিতে দেখা হল যে ম্যাডাম, তবু এখনো রাজী আছি, ওটাকে বাতিল করে চলে এসো না।

স্ত্রীটি থতমত খেলেন। আনন্দ চক্রবর্তীও যেন ধাক্কা খেলেন একটু। তাঁর কেমন মনে হল, ঠাট্টা বটে, কিন্তু এই লোক ইচ্ছে করলে যে-কোনো বাঞ্ছিতজনকে টেনে নিয়ে আসতে পারে বোধহয়। হা-হা শব্দে হেসেই উঠলেন তিনি।

তাঁর স্ত্রী মাত্র দুদিনের আলাপে এরকম অভ্যর্থনা বা সম্ভাষণে অভ্যস্ত নন, তবু

হেসেই ফেললেন।—আপনি খুব সাংঘাতিক লোক তো!

খুব সাংঘাতিক। অমায়িক মুখে সায় দিলেন শুভ্রেন্দু নন্দী, সময় সময় নিজেও আমি নিজেকে ভয় করি ম্যাডাম। আই ফিয়ার মি বিকজ্ আই ফিয়ার হিম নট—হিম বলতে তোমাদের ভগবানকে।

কথাটা আনন্দ চক্রবর্তীর কানে লেগে থাকল। মানুষের মনস্তত্ত্ব নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটি পেশা বলেই বোধ হয়। অদ্ভুত লোকটার মুখের দিকে চেয়ে তাঁর স্ত্রী কি দেখছেন, জানেন না।

পাশের দিকের ঢাকা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন সকলে। বাড়ির পরেই রাস্তা, রাস্তার ওধারে অনেকটা ফাঁকা জমি, রাস্তাটা ওই জমি বেষ্টন করে দূরের একটা বাড়ির পাশ ঘেঁষে গেছে। দুটো বাড়ির মাঝে ওই ফাঁকা জমি সংলগ্ন বাড়ির দিকে চেয়ে আনন্দ চক্রবর্তী উৎফুল্ল হঠাৎ। স্ত্রীকে ঘন ঘন আঙুলের ইশারায় কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, আরে এখানে তো আমরা এসেছি আরো—ওটা সুমিত্রা দেবের বাড়ি না?

বাড়িটা লক্ষ্য করে মহিলা বিস্ময়সূচক আবেগ দমন করে মন্তব্য করলেন, তাই তো...!

নিঃশব্দে আর এক মানুষের ভিতরে ভিতরে কি প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল দুজনের কল্পনার বাইরে। সেই অল্পক্ষণের জন্য দুজনের কারোই তাঁর দিকে লক্ষ্য ছিল না। পিছন থেকে শুভ্রেন্দু নন্দী বললেন, ওটা তো কেনো বোসেদের বাড়ি শুনেছিলাম—

আনন্দবাবু সায় দিয়ে জানালেন, তাই।...ও বাড়িরই একটি মহিলা সুমিত্রা দেব, সেই দেবটি ছিলেন মিলিটারি অফিসার, বছর চারেক আগে যুদ্ধবীর হিসেবে তিনি দেবলোকে পাড়ি দিয়েছেন—মহিলা বাপের বাড়িতেই থাকেন।

বন্ধুর মুখখানা হঠাৎ অত গম্ভীর হয়ে গেল কেন আনন্দ চক্রবর্তী অথবা তাঁর স্ত্রী ঠাওর করে উঠতে পারলেন না। কিন্তু ভদ্রমহিলার মনে তখন আরো কিছু রসালো প্রসঙ্গ উদয় হয়েছে। স্বামীর দিকে চেয়ে হেসে টিপ্পনী কাটলেন, আরো একটু বলো? এইখানেই শেষ করলে যে বড়ো—

আনন্দবাবু জবাব দিলেন, সেটা তোমার মাথা ঘামানোর ব্যাপার, তুমি বলবে।

শুভ্রেন্দু নন্দী মাঠের ওধারে ওই বাড়িটার দিকেই চেয়ে ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কি?

আনন্দবাবু হাসিমুখে বললেন, ওই মহিলা মানে সুমিত্রা দেব আমার একটু ভক্ত, আমার লেখা তাঁর ভালো লাগে। তাই মাঝে মাঝে বাড়ি আসেন, আলোচনা করেন, এবারে ক্লাবের থিয়েটারে আমার একটা গল্প অভিনয় করা হবে স্থির করে ফেলেছেন—কিন্তু আমার স্ত্রীর ধারণা আসলে উনি আমারই ভক্ত—লেখা-টেকার নয়। আমার বই থিয়েটার করছেন শোনার পর ধারণাটা আরো পেকে উঠছে।

আনন্দর স্ত্রী প্রতিবাদ করলেন, ধারণা কি রকম? খাঁটি সত্যি। শুভ্রেন্দুর দিকে ফিরলেন, বুঝলেন—আমি ওই মহিলার একেবারে চক্ষুশূল যাকে বলে—হাব-ভাবে অনেক কিছু বুঝিয়ে ছাড়েন—এতবড় একটা লেখকের কিনা এমন একটা ভোঁতা বউ—ইংরেজি সাহিত্য পড়ে না, ইংরেজি কবিতা পড়ে না—এমন কি ছাপা হবার আগে স্বামীর লেখার ম্যানাসক্রিপ্ট পর্যন্ত পড়ে না শুনে তো মুখের দিকে চেয়ে যেন চিড়িয়াখানার জীব

দেখছিলেন একদিন। স্বামীর মুখের ওপরে একটা তির্যক কটাক্ষ হেনে বললেন, আপনার মুখোমুখি বাড়ি যখন, আপনি মশাই মহিলার চোখ দুটো ওর দিকে থেকে সরিয়ে নিজের দিকে টানুন তো! হেসে উঠলেন, বেশ সুন্দরী কিন্তু, ঠকবেন না।

জবাব না দিয়ে শুভ্রেন্দু নন্দী হাসি মুখেই ঘরে ঢুকে গেলেন। এই প্রসঙ্গ ওঠার পর থেকে তাঁর হাবভাবের পরিবর্তনটুকু এদের কারো চোখে পড়ল না।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছিল তখন। চা জলখাবারের পাট চুকে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হল। অতিথিদের সঙ্গে করে শুভ্রেন্দু সামনের ছোট ঘরটায় এলেন। সেখানে ছোট্ট একটা চৌকি পাতা, তার ওপর সুন্দর গালচে বিছানো। চৌকির ওপর ভায়লিনের বাক্স। এখানে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই কেমন মনে হয় সমস্ত বাড়ির মধ্যে এই ঘরটাই গৃহস্বামীর সব থেকে বেশি প্রিয়।

ঘরের সামনে জানালা। জানালাটা খুললেই মাঠের ওধারে সেই বাড়ি—যে বাড়িতে আনন্দ চক্রবর্তীর ভক্ত সুমিত্রা দেব থাকেন। জানালা খোলা থাকলেও আবছা অন্ধকারে অতিথিদের সেদিকে চোখ গেল না।

ভায়লিন দেখেই আনন্দবাবু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, এ-পাট এখনো রেখেছ নাকি? সঙ্গে সঙ্গে একটা মানুষের মুখ মনে পড়েছে তাঁর। —সেই শোহনলালের সঙ্গে আর দেখা হয়?

সপ্তাহে একদিন করে দেখা হয়।

ওই হোটেলেটার সামনে বসে এখনো?

হ্যাঁ, যত টাকাই পাক, ওখানে না বসলে তার ভাত হজম হয় না। বলতে বলতে চৌকিতে বসে বাক্স থেকে ভায়লিনটা বার করলেন শুভ্রেন্দু নন্দী। পিছনের মোটা তাকিয়ায় ঠেস দিলেন।

বেশ আগ্রহ নিয়েই আনন্দবাবু আর তাঁর গৃহিণী শুনতে বসলেন। এই বাজনার গল্প মহিলার শোনা ছিল।

চোখ বুজে ভায়লিনে একটু ছড়ি ঘসে টানা কয়েকটা শব্দ বার করলেন শুভ্রেন্দু নন্দী, তারপর হঠাৎ হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে ঘরের আলো নিভিয়ে দিলেন।

বাজনা শুরু হল। কোনো ইংলিশ মিউজিক হবে। কতগুলো বিচিত্র সুরের একটা ঝড় যেন আত্মসংহারের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চলেছে। তার অনুরণন কানের ভিতর দিয়ে বুকের ভিতরে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। বোঝা যাক না যাক স্তব্ধ বিস্ময়ে শোনার মতো। স্থান কাল ভুলেছেন আনন্দবাবু আর তাঁর স্ত্রী।

আধঘন্টা বাদে বাজনা থামল। ছোট্ট ঘরখানা যেন সুরে সুরে ভরাট।

আলো না জ্বেলে বন্ধুর উদ্দেশ্যে ভারী গলায় শুভ্রেন্দু নন্দী বললেন, বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াও, তোমার ভক্ত সুমিত্রা দেবকে তাদের সামনের বারান্দায় দেখা যায় কিনা দেখো। অবশ্য তিনি এ-সময় বাড়ি থাকলে তবেই তোমার আশ মিটতে পারে।

হঠাৎ এ-রকম একটা কথা শুনে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অবাক। সঙ্গে সঙ্গে জানালা দিয়ে তাকালেন, কিন্তু এখান দিয়ে সামনের বারান্দা চোখে পড়ে না। একসঙ্গেই চৌকি ছেড়ে উঠলেন দু'জনে। আনন্দবাবু পাশের বারান্দায় গেলেন, পিছনে তাঁর স্ত্রী। মিনিট দুইয়ের মধ্যে দুজনেই ফিরে এলেন, আনন্দ চক্রবর্তী মুখ খোলার আগে উৎফুল্ল বিস্ময়ে

মহিলা বলে উঠলেন, সত্যিই তো দাঁড়িয়ে আছে! অন্ধকারে ভালো মুখ দেখা গেল না, আমরা গিয়ে দাঁড়াতে ঘরে চলে গেল, ঘরের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম সুমিত্রা দেব!

অন্ধকারে বেহালা রেখে শুভ্রেন্দু নন্দী পাশের ঘরে চলে এলেন। হাসছেন অল্প অল্প। পিছনে বাকি দুজনও হাজির। আনন্দ চক্রবর্তী ছদ্মগাম্ভীর্যে ভুরু কুঁচকে বেশ খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছেন বন্ধুকে। তাঁর মিসেসটির আর ধৈর্য থাকল না।—ডুবে ডুবে জল খাচ্ছেন নাকি। কি ব্যাপার মশাই?

শুভ্রেন্দু নন্দী সাদাসিধে জবাব দিলেন, কি আর—সুমিত্রা দেব শুধু আনন্দের ভক্ত নন সেটা তোমাকে বুঝিয়ে দিলাম। এখন কিছুটা নিশ্চিন্ত তো?

সে কথা কানে না তুলে আনন্দবাবুর স্ত্রীটি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি রোজ আপনার বাজনা শোনেন?

শোনেন।

আনন্দবাবু বললেন, কিন্তু এ-সময় তো প্রায়ই ক্লাবে থাকেন তিনি! আজ তুমি বাজনা শোনানোর জন্যে ঘরে আছ জানতেন নাকি?

আমি রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটার আগে বাজাইনে। এক আধদিন মাঝ রাতেও বাজাই, তখনো ঘুম ভেঙে তাঁকে বারান্দায় উঠে আসতে দেখেছি।

আনন্দ গৃহিণী দ্বিগুণ উৎসুক।—বাজনা শেষ করেই উঠে এসে দেখে নেন বুঝি? আলাপ হয়েছে তো?

শুভ্রেন্দু মৃদু হেসে আর সেই সঙ্গে অল্প অল্প মাথা নেড়ে জবাব দিলেন, এখন পর্যন্ত ভাবালাপ চলছে।

কি রকম?

আমি বাজনা নিয়ে বসলে উনি বারান্দায় এসে দাঁড়ান। এটা প্রায় একটা নিয়মের মধ্যে বলতে পারো। এছাড়া সকালে কারখানায় বেরুবার সময় বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকেন —ফেরার সময়ও মাঝে মাঝে দেখি। তিনি দেখেন, আমিও দেখি। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলে আমিও তাই করি।

মহিলা বললেন, আপনি কোনো কাজের নন মশাই, চলুন এক্ষুনি আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। তাঁর তর সয় না যেন, স্বামীর দিকে ফিরলেন, কি বলো, যাবে?

আনন্দবাবু বললেন, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু ও নিজে আলাপ করেনি কেন?

বন্ধুর দিকে ফিরলেন, কি হে, বলবে কিছু না মুখ সেলাই করে থাকবে? তোমার স্বভাব আমি জানি বলেই এত সংযমের কারণটা জিজ্ঞাসা করছি। এ-রকম তপস্বীটির মতো ভাবালাপে খুশি থাকার মেজাজ তো তোমার নয়—গো অন্, কুইক!

শুভ্রেন্দু মাথা নাড়লেন, আজ আর কোনো কথা নয়। তার দিকে ফিরলেন।—ম্যাডাম তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, চোখ টানার কাজ আমার ছ'মাস আগে সারা এবং আনন্দরও মন্দ কপাল। শুধু মন্দ নয়, তুমিও এই তপস্বীটির নজরে পড়ে যাওয়ার ফলে ডবল মন্দ কিনা জানি না।

যাবার আগে বন্ধুকে আড়ালে বলে দিলেন, কাল কারখানায় এসো, কথা আছে।

আনন্দ চক্রবর্তী পরদিন দুপুরের নিরিবিলিতে হাজির। কারখানা তখন এত বড়টা হয়নি, বড় হওয়ার প্রতিশ্রুতিটুকু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অবশ্য।

তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদের ফুরসৎ দিচ্ছেন না শুভ্রেন্দু। ঘরে এনে বসিয়ে এবং মুখোমুখি নিজে বসেই প্রথমে জিজ্ঞসা করলেন, সুমিত্রা দেবকে কতদিন জানো?

আনন্দ চক্রবর্তী তক্ষুনি বুঝে নিলেন কোন্ প্রসঙ্গ বিস্তারের তাড়নায় তাঁকে আসতে বলা হয়েছিল। জবাব দিলেন, তা বেশ কয়েক বছর হবে।

শুভ্রেন্দু জিজ্ঞাসা করলেন, কি রকম ভক্ত তিনি তোমার—মানে তোমার স্ত্রী যা বললেন কাল তার মধ্যে সত্য আছে? বন্ধুর মুখে পলকা চপলতার চিহ্ন নেই।

পাগল! হাসতে লাগলেন, পুরুষদের একটু নেড়ে দেখার স্বভাব আছে বটে মহিলার —সে-জন্যই আমার স্ত্রীর ও-রকম ঠাট্টা—কিন্তু সব-দিক বিবেচনা করলে আমি সেটা খুব দোষের দেখি না—পুরুষ মানুষের ওপর সুমিত্রা দেবের কিছু আক্রোশ থাকাটা অস্বাভাবিক নয়।

কি রকম?

অতঃপর কান পেতে শুনে গেলেন, কি-রকম।

সুমিত্রা বোস নিজে পছন্দ মতো বিয়ে করে সুমিত্রা দেব হয়েছিলেন। ওই বোস বাড়িটা ভয়ানক কনজারভেটিভ—তাঁর মা আর বড় দাদা খুব পুজো আহ্নিক করেন। এই গোছের বিয়েতে তাঁদের তেমন মত ছিল না। যাই হোক, বাধাও দেয়নি কেউ। কিন্তু সুমিত্রার সঙ্গেই মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে তার মিলিটারি অফিসার স্বামীর প্রচণ্ড মনোমালিন্য শুরু হয়ে গেল। তার প্রধান কারণ প্রবাসে কর্মক্ষেত্রে মিলিটারি অফিসারদের সামাজিক জীবনযাত্রা। সুমিত্রার ধারণা জন্মে গেল, কাজের বাইরে এরা একেবারে ভিন্ন মানুষ। কেবল পার্টি আর মদ আর ফাঁক পেলে এক অফিসারের অন্য অফিসারের বউয়ের সঙ্গে বিতিকিচ্ছিরি দহরম-মহরম। সুমিত্রার স্বামী জোর করে তাঁকে মদ ধরিয়েছিল। আর বিদেশে নিজেকে আগলে রাখতে প্রাণান্ত অবস্থা হয়েছিল তাঁর। কিন্তু স্বামী সে-সব শুনলে হাসে, বলে, মেলামেশা করো না—কি আছে এতে। সে নিজেও এই মেলামেশার বাড়াবাড়ি কম করে না, বিশেষ করে অবাঙালী অফিসারদের বউদের সঙ্গে। ফলে তাদের স্বামীরাও ওঁর দিকে বড় বেশি ঘেঁসতে চায়। একবার এক মস্ত সুপিরিয়র অফিসার এসেছিলেন। কিছু দিন ছিলেন সেখানে। আধবয়সী পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। সকলে তাঁর তোয়াজ তোষামোদে শশব্যস্ত। সুমিত্রা বুঝেছিলেন ওই ওপরওয়ালাটির বিশেষ অন্তরঙ্গ দৃষ্টি তাঁরই দিকে। সেটা টের পেয়ে তাঁর স্বামীর ভারী আনন্দ। এক পার্টিতে তিন মিনিট 'লাইট অফ'-এর খুশির মহড়া ছিল। সেই অন্ধকারে বাঘের মতো কে তাঁর আষ্টেপৃষ্ঠে দখল নিয়েছিল সেটা বুঝতে বাকি থাকেনি।

...জোর করে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার সে কি প্রাণান্ত চেষ্টা সুমিত্রার। মাত্র তিনটে মিনিটের মধ্যে পুরুষ কতবড় লম্পট দস্যু হয়ে উঠতে পারে ধারণা ছিল না। নখ-দন্তে ওঁর সমস্ত মুখ বিদীর্ণ করার জন্য যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল লোকটা। ওই তিনটে মিনিটের মধ্যেই আরো কি ঘটে যেতে পারত কে জানে। তাঁর হাতের মুঠোয় একগোছা দাড়ি উপড়ে উঠে আসতে তবে মুক্তি পেয়েছিল।

আলো জ্বলার পর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে দেখেন প্রায় দশ গজ দূরের এক সোফায়

বসে আছে স্বামীর সেই পাঞ্জাবী ওপরওয়ালা। দাড়িতে হাত বুলোচ্ছে আর ওঁকেই দেখছেন। চাউনিটা প্রসন্ন নয় আদৌ। সুমিত্রা আর একমুহূর্তও অবস্থান করতে চাননি সেখানে। বাড়ি ফেরার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিল। ছোকরা অফিসাররা সব হাঁ হাঁ করে এগিয়ে এসেছে। তাদের পিছনে সেই পাঞ্জাবী অফিসার। গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করেছেন, কি হল ম্যাডাম, শরীর অসুস্থ বোধ করছ নাকি?

জবাবে সুমিত্রা তাঁর মুখের ওপর নিজের চোখের এক পশলা আগুন ছড়িয়েছেন।

পরদিন কাজ থেকে ফিরে থমথমে মুখে স্বামী ওঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কাল রাতের পার্টিতে তুমি আমাদের কম্যান্ডিং অফিসারকে অপমান করেছ?

সুমিত্রা ঝলসে উঠেছেন।—সে কি করেছে সে খবর নেবার দরকার নেই—না?

—না! স্বামীর সাফ জবাব, এ লাইনের লোকের স্ত্রীদের অত সামান্যয় গায়ে ফোসকা পড়লে চলে না, বুঝলে? আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়েছি, তুমিও ক্ষমা চাইবে, আজ রাতেই তোমাকে নিয়ে যাব কথা দিয়েছি।

ব্যস, সেই বিকেলেই সুমিত্রা কলকাতায় চলে এসেছেন। একলা কলকাতায় এসে স্বামীকে আলটিমেটাম দিয়েছিলেন, স্ত্রীকে পেতে হলে যে-ভাবে হোক ওই চাকরি ছেড়ে আসতে হবে। তিনি আসেননি। উল্টে যাচ্ছেতাই করে শাসিয়েছেন। এক বছরের মধ্যে সেই স্বামী যুদ্ধে মারা যান। কাগজে তাঁর বীরত্বের কথা ছাপা হয়েছিল, ছবিও বেরিয়েছিল। কিন্তু সুমিত্রা তার পরেও তাঁকে ঘৃণাই করেছেন। শ্বশুর বাড়ির মানুষেরাও আর তাঁর সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক রাখেনি। রাখতে চাইলেও সুমিত্রা তাঁদের ছেঁটেই দিতেন।

শুভ্রেন্দু জিজ্ঞাসা করেছেন, এসব কথা সুমিত্রা নিজে তোমাকে বলেছেন?

হ্যাঁ, এ-সব বলতে তাঁর অত সঙ্কোচ নেই, আমাকে খোলাখুলি সব বলে তিনি চেয়েছেন, মিলিটারি অফিসারের চরিত্রের মুখোশ খুলে দেবার মতো আমি যেন কিছু লিখি। ওঁর কাছ থেকে নরমগরম তথ্য পেয়ে লিখেছিও কিছু, আর ওই জন্যেই তিনি এত খুশি আমার ওপর। তাঁর মতে বাংলাদেশে একজনই আছে, যে এই সব নোংরামি ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করতে পারে—সে আনন্দ চক্রবর্তী।

তারপর?

আনন্দবাবু হেসে জবাব দিলেন, তারপর আর কি—ক্লাব-ট্লাব নিয়ে আছেন। মেয়েও কম জোটেনি সেখানে, ফলে পয়সাঅলা লোকের আনাগোনা খুব। সেটা বরদাস্ত করতে খুব অসুবিধে হচ্ছে বলে মনে হয় না।

চুপচাপ খানিক তাঁর মুখখানাই পর্যবেক্ষণ করে শুভ্রেন্দু জিজ্ঞাসা করলেন, ওই পয়সাঅলাদের কাউকে মনে ধরেনি এ পর্যন্ত?

আনন্দ চক্রবর্তী দ্বিধান্বিত একটু। তারপর বলেই ফেললেন, মনে এ পর্যন্ত অনেককেই ধরেছে, অন্তত আমাদের সেই রকমই ধারণা, কিন্তু ফল তো কিছু দেখি না...আর আশ্চর্য কি জানো, বাঙালীর মধ্যে একমাত্র আমাকেই যা একটু-আধটু পছন্দ করে—নইলে দেবীটির অন্তরঙ্গ মেলামেশা বেশির ভাগ অবাঙালীর সঙ্গে।...মোহন ভাট তো ওঁর জন্য ক্ষেপে উঠেছিল, আয়েঙ্গার দিনকতক স্বপ্ন দেখে বেড়ালো— আর এই কিছুদিন হল সব থেকে বেশি ঘা খেয়েছে কাপুর, এরা সকলেই পয়সাঅলা লোক, তার

মধ্যে কাপুরকে মিলিয়নেয়ার বলতে পারো, আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যা হবার ওর সঙ্গেই হয়ে গেল, নিজের স্ত্রীকে কাপুর ডিভোর্স করে-করে—কিন্তু তারপর হঠাৎ কি করে ভেস্তে গেল জানি না, বুক ঠাণ্ডা করতে লোকটা আপাতত লণ্ডনে উড়ে গেছে।

শুভ্রেন্দু নন্দী জিজ্ঞাসা করলেন, এসব খবরই বা তোমাকে কে দিলে—তিনি নিজেই।

—তুমি যে জেরা শুরু করে দিলে দেখছি! আনন্দবাবু হাসলেন, ক্লাবে আমাকে আর আমার স্ত্রীকে মহিলা মাঝে মাঝে ধরে নিয়ে যায়—এ-সব সুসমাচার আপনিই কানে আসে, তাছাড়া মহিলারও মনে মুখে লাগাম নেই খুব, নিজেই হড়বড় করে অনেক কথা বলেন আর হাসেন।

শুভ্রেন্দু নন্দী চুপচাপ ভাবলেন একটু, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তো মনস্তত্ত্ব টনস্তত্ত্ব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করো, হোয়াট্‌স্ দি রং উইথ হার?

আনন্দবাবু জবাব দিলেন, অনেক ভেবেছি কিন্তু খুব একটা হদিশ পেয়েছি মনে হয় না।...এক হতে পারে ওদের পরিবার ভয়ানক রক্ষণশীল, মেয়ের চালচলন বাড়ির কেউ পছন্দ করেন না, বাপের উইলের জোরে দু'খানা ঘর নিয়ে আছেন মহিলা...হতে পারে নিজের ভিতরেও একটুখানি বংশগত সংস্কার আছে, যা শেষ পর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। স্বামীর অভাবে ঘনিষ্ঠভাবে কারো সঙ্গে মেলামেশা করাটা হুট করে তাদের ঘরণী হয়ে বসার মতো ঝামেলার ব্যাপার নয়।

শুভ্রেন্দু নন্দী মাথা নাড়লেন, আই ডোন্ট থিংক সো। দেয়ার আর রিজনস...

আনন্দ চক্রবর্তী বললেন, আরো একটা কারণ থাকতে পারে অবশ্য, আর সেটাই বেশি সম্ভব।...ওঁর স্বামীর ব্যাপারটা একটা রোগের মতো মাথায় থেকেই গেছে হয়তো, সেই শোধ নিচ্ছে। পুরুষদের যতটা সম্ভব এগিয়ে দিয়ে তারপর ছটফটানি দেখে, এমনও হতে পারে।...আর সেই জন্যেই বলছি, তুমিও ঘায়েল হবার জন্য পা বাড়াচ্ছ সেটা আমার খুব পছন্দ হচ্ছে না।

শুভ্রেন্দু নন্দী ঠাট্টার জবাব দিলেন না। শেষের এই কারণটা অনেকখানি সম্ভব মনে হল তাঁর। বললেন, আমি পা বাড়াব কি বাড়াব না সেটা পরের কথা, তুমি আমার সঙ্গে একটু যোগাযোগ করে দাও তো।

—একদিন ক্লাবে গেলেই হয়।

শুভ্রেন্দু মাথা নাড়লেন, না ক্লাবে না। তোমার বাড়িতে আরেঞ্জ করো।

গত চার মাসের একটানা একটা নীরব প্রহসন নিঃশব্দে কোন স্তরে পৌঁছেছে আনন্দ চক্রবর্তীর ধারণা নেই। হোটেল ছেড়ে শুভ্রেন্দু নন্দী মোটা টাকার এই নতুন বাড়িটাতে উঠে এসেছেন যখন, তখনো বাড়ির সমস্ত কাজ শেষ হয়নি। সেখানে তাঁর বাজনামুগ্ধ এক বিবাহিত বিদেশিনীর ভাবাবেগে অতিষ্ঠ হয়েই এই বাড়িটা ভালো রকম সম্পূর্ণ হবার আগেই চলে এসেছিলেন।

সেই বিদেশিনীও এক বিচিত্র চরিত্রের মেয়ে। আসলে মাথাই খারাপ মেয়েটার, কিন্তু বেশ মজাদার গোছের খারাপ। বছর বত্রিশ বয়েস। নাম রোসেলিন। দীর্ঘাঙ্গী এবং একটু বেশি মাত্রায় সবল মেয়ে। গায়ের রং তামাটে। বেশ সুশ্রী মুখ আর কালো টানা চোখ। সেই টানা চোখের কোণ দিয়ে পুরুষকে যাচাই বাছাই করে। স্বামীর নাম জিম ব্যাডকক।

দশাসই চেহারার পুরুষ। দশ আর আট বছরের একটা ছেলে একটা মেয়ে তাদের। রাগ হলেই বা মেজাজ বিগড়ালে ওদের মা মনের সাধে পেটে ছেলে-মেয়ে দুটোকে। কিন্তু পেটার আগে আগলাতে না পারলে ছেলে-মেয়ে দুটো শুভ্রেন্দুর ফ্ল্যাটে পালিয়ে আসে। রোসেলিন সেখানেও তাড়া করে ওদের। শুভ্রেন্দু বাধা দিলে তার পরেও মারমুখী হয়। স্বামীটি কোন এক বড় ফ্যাক্টরীর চিফ ফোরম্যান। মোটা মাইনে পায়। তবু ওদের অভাব লেগেই আছে, কারণ সন্ধ্যার পর কর্তা গিন্নি দেদার মদ গেলে। সেই মদের টেবিলেই নৈমিত্তিক বচসা লেগে আছে দু'জনের। সেই বচসা প্রায়ই হাতাহাতি মারামারিতে এসে শেষ হয়।

প্রথমে ওরা, বিশেষ করে রোসেলিন ফ্ল্যাট থেকেই তাড়াতে চেষ্টা করেছিল শুভ্রেন্দুকে। কারণ, তাঁর বাজনা ওদের নাকি ভয়ানক ডিসটার্ব করে। নেশা মাটি করে দেয়। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া মারামারি জমতে দেয় না। শুভ্রেন্দুকে এ খবর দিয়েছে ওদের দশ বছরের ছেলেটা। কিন্তু এই বাজনার কারণেই শুভ্রেন্দুর অনুরাগিনী হয়ে পড়ল রোসেলিন। যত সবলই হোক মেয়েই তো। হাতাহাতি মারামারিতে তার মরদের সঙ্গে পেরে উঠত না। মারটা তাকে খেতে হত। কিন্তু একাধিক বার দেখা গেল,স্বামীর বেপরোয়া হয়ে ওঠার মুখে ঝমঝম করে শুভ্রেন্দুর বাজনা বেজে উঠেছে! স্বামীটি প্রথমে অশ্লীল কটূক্তি করে ওঠে বাজনাদারের উদ্দেশ্যে—তারপর বসে পড়ে। সেই নেশার মধ্যেও বাজনা শুনে চুপচাপ।

এই থেকেই রোসেলিন ব্যাডককের দৃষ্টি ভালো করে আকৃষ্ট হয়েছে শুভ্রেন্দুর প্রতি। বাজনার সমজদার হয়ে উঠেছে সে-ও। যখন তখন গল্প করতে বসে। শুভ্রেন্দুর কোনো কথায় রাগ হলে তেড়ে মারতে যায়, আর খুশি হলে জাপটে মাপটে ধরে চুমু খায়। ছেলে মেয়েরা কেউ দেখল কি দেখল না তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। ব্যাডকক শুভ্রেন্দুকে বলেছে তার স্ত্রীর মাথায় ছিট আছে। সেই ছিট-এর দাপট শুভ্রেন্দুর ওপর বেড়েই চলেছে।

রোসেলিন বলে, চারটে পুরুষ তার সর্বনাশ করেছে। প্রথম তিনজন হল গিয়ে তার অফিস-বস্। ভালো স্টেনোগ্রাফার ছিল সে, মোটা মাইনেও পেত। কিন্তু ওই পুরুষগুলো ওকে ক'বার করে নার্সিং হোমে অপারেশনে পাঠিয়ে সব দিক খেয়েছে। আর সর্বনাশের কারণ চতুর্থ পুরুষটা হল গিয়ে তার স্বামী জিম। সব্বার থেকে বড় লম্পট ওটা। রোসেলিনের এতবড় শরীরটা যেন ওর কাছে ছেঁড়া-খোঁড়ার জিনিস একটা। তিন বছরের মধ্যে দুটো ছেলে মেয়ে এনে ছাড়লে। বেগতিক দেখে রোসেলিন শেষে অপারেশনটা করিয়ে তবে নিশ্চিন্ত। নইলে এতদিনে আরো পাঁচ সাতটা এসে হাজির হত।

দেখতে দেখতে শুভ্রেন্দুর গুণমুগ্ধ হয়ে উঠতে লাগল রোসেলিন। তার উৎপাতে বাজনা বন্ধ হবার দাখিল। বাজাতে বসলেই সে এসে হাজির। কোনো কোনো রাতে মদের গেলাস হাতে নিয়েই ঘরে ঢুকে পড়ে। পিছন পিছন তার স্বামীও ধাওয়া করে। তার ঘরেই দু'জনের মধ্যে ঝগড়া লেগে যায়।

শুভ্রেন্দু মেয়েটাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, এরকম কোরো না। এ-ঘরে এত বেশি এসো না। স্বামীকে নিয়ে ঝামেলায় পড়বে শেষে।

রোসেলিনের সাফ জবাব, ওকে গুলি করে মেরে ফেলার একটা ব্যবস্থা করো না।

চমৎকৃত হয়ে শুভ্রেন্দু জিজ্ঞাসা করেছেন, তারপর?

জবাবে রোসেলিন উঠে এসে জাপটে ধরে কয়েকটা আসুরিক চুমু।—তারপর এই।

উৎপাত বাড়তেই থাকল। ওর আর ওর চুমুর ভয়ে অনেক সময় ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকতে হত শুভ্রেন্দুকে। দমাদম দরজায় ঘুষি লাথি মারবে তখন। গালাগাল করবে। দরজা খুললে হেসে আটখানা। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরবে, তারপর নাজেহাল করবে।

শুভ্রেন্দু বলেছেন, ব্যাডকক কখনো এই কাণ্ড দেখে ফেললে দুজনেকেই খুন করবে।

রোসেনিলের জবাব, খুন শুধু তোমাকে করবে, আমাকে নয়—দ্যাট রাসকেল, লাভস মি, অ্যান্ড উই ক্যাননট্ গো উইদাউট ইচ আদার।

—তাহলে তাকে ছেড়ে এখানে এভাবে আস কেন তুমি?

—হাউ সিলি। রোসেলিন হেসে সারা।—আসব না তো কি, হি ইজ্ এ হাসব্যান্ড অ্যান্ড ইউ আর এ লাভার—এ লাভার ইজ্ ফার মোর চার্মিং—

সেই থেকেই মুক্তির পথ খুঁজছিলেন শুভ্রেন্দু নন্দী। শেষ হবার আগেই এ বাড়ি কিনে চুপি সারে উঠে এসেছেন।

এখানেও রাত্রিতে বাজাতেন। অনেক সময় বারান্দায় বসেও বাজাতেন। বাজনা শুরু হবার খানিকক্ষণের মধ্যে দেখতেন ছোট্ট মাঠটার ওধারের বাড়ির দোতলার বারান্দায় একটি মেয়ে এসে দাঁড়ান। প্রতি রাতেই এইরকম হয়। ঘরে বাজালেও একসময় বাইরে এসে দেখেন মেয়েটি দাঁড়িয়ে। রাতের সুর যেন ওই জায়গাটিতে টেনে নিয়ে আসে তাঁকে। আবার ঝামেলায় পড়ার সম্ভাবনায় শুভ্রেন্দু নন্দী গোড়ায় কয়েকদিন বিরক্ত হয়েছিলেন। মেয়েদের ঝামেলা নেই এমন জায়গাই কি নেই দুনিয়ায়!

কিন্তু দিনের আলোয় মেয়েটিকে দেখার পর থেকেই বড় আশ্চর্য ভাবে বিরক্তিটা গেল। নিজের গাড়িতে কারখানায় বেরুবার সময় প্রত্যহ ওই মেয়েকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। ওঁদের বাড়ির পাশ ঘেঁষেই রাস্তা। শুভ্রেন্দুর গাড়ির গতি আপনা থেকেই শিথিল হয় একটু। স্টিয়ারিং ছেড়ে দু'চোখ আপনা থেকেই দোতলার বারান্দায় উঠে আসে। চোখোচোখি হয়। রমণীর এমন নিঃসংকোচ অথচ নির্লিপ্ত মনোযোগ আর দেখেছেন কিনা শুভ্রেন্দু নন্দী জানেন না। প্রত্যহ নিয়মিত তাই ঘটতে লাগল। সেই একই অভিব্যক্তিশূন্য মনোযোগ। ঘোর যে একটু একটু করে উল্টে তাঁরই লাগছে। রোসেলিন আর কিছু না পারুক, একটা যন্ত্রণার লোভনীয় স্বাদ এনে দিয়েছে। নিরিবিলি রাতে বারান্দায় বসে তিনি বাজান, আর অন্ধকারে ওই বারন্দায় দাঁড়িয়ে আর একজন শোনেন। রোসেলিনের বেলায় যা কখনো মনে হয়নি, এবারে তিনি তাই করতে লাগলেন। খুব সচেতনভাবেই শুভ্রেন্দু নন্দী যেন বাজনার সেতুপথে দু' বাড়ির মাঝের ব্যবধানটুকু ঘুচিয়ে ফেলতে চান। এটাই একটা নেশার মতো হয়ে দাঁড়াল। ঠিক আগের মতো আর কাজে মন দিতে পারেন না। ফলে নিজের ওপর অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন। সকালে কারখানায় বেরুনোর সময় তাঁর গাড়ির গতি ওই বাড়ির সামনে এসে এত ধীর মন্থর হয় যে লোকের চোখে পড়লে দৃষ্টিকটু ঠেকবে। কিন্তু বারান্দার রমণী পরোয়া করে না, আর শুভ্রেন্দু নন্দীরও অন্য কোনোদিকে হুঁশ থাকে না।

ক্রমে ওই রমণীকে ঘিরে একটা বাসনা যেন যন্ত্রণার মতো সমস্ত সত্তায় পাক খেতে লাগল। হাড়-পাঁজর দুমড়নো সেই যন্ত্রণা এক একসময় দুঃসহ মনে হয়। আসল সর্বনাশটা যে তাঁর রোসেলিনই করে দিয়ে গেছে জানতেন না। যন্ত্রণার দায়ে এবার কি সেই পাগল মেয়ের কাছেই ছুটে যেতে হবে নাকি। নিজের উদ্দেশেই কটূক্তি করে ওঠেন শুভ্রেন্দু নন্দী।

...একদিন। মহিলা নিজের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে শুভ্রেন্দু নেমে এলেন। ছোট মাঠ ভেঙে হেঁটেই চললেন। ওদিকের রাস্তায় পড়তে মহিলার দৃষ্টি তাঁর দিকে ঘুরল। অপলক চেয়ে রইলেন, গাড়িতে দেখলে যেমন চেয়ে থাকেন। শুভ্রেন্দু নন্দী আশা করলেন, আজ তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাবেন, একটা ডাক শোনার জন্য দুই কান উৎকর্ণ। কিন্তু মহিলা ডাকলেন না। শুধু চেয়ে রইলেন। সুন্দর মুখে আগ্রহের একটা আঁচড়ও দেখলেন না তিনি। কি আশ্চর্য, মনে মনে থমকে যান, এ-ও কি রোসেলিনের মতো অস্বাভাবিক নাকি!

সেই রাতে বাজনা নিয়ে বসেছিলেন সাড়ে এগারোটায়। শেষ করেছেন রাত্রি আড়াইটেরও পরে। গোঁ-ভরে বাজিয়েই গেছেন। হাতছানি দেওয়া সুরের অনেকরকমের মূর্ছনা তুলেছেন। ওই বারান্দার রমণী মূর্তিটিকে সুরের জালে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলার মতোই যেন গোঁ তাঁর। মনে হয়েছিল, বেঁধে ফেলতে পেরেছেন।

মহিলা দাঁড়িয়েই ছিলেন শেষ পর্যন্ত।

ঘড়ি ধরে ঠিক ছ'টায় আনন্দ চক্রবর্তীর বাড়িতে এলেন শুভ্রেন্দু নন্দী। সুমিত্রা বোসেরও ছ'টায় আসার কথা সেখানে। বন্ধু টেলিফোনে খবর দিয়েছেন, বলেছেন, ঠিক ঘড়ি ধরে এসো, তোমার রমণীটি কিন্তু সময়ের ব্যাপারে পাংচুয়াল। তাঁকে দেখামাত্র আনন্দবাবুর স্ত্রী ঠাট্টা ঠিসারা শুরু করে দিলেন। বললেন, আমার তো হাড়ে বাতাস লাগল, কিন্তু আপনার কি দশা হবে ভেবে চিন্তা হচ্ছে।

ঠাট্টার জবাবে রসিকতা শুভ্রেন্দুও করেছেন। বলেছেন, পুরুষের হাতী মশা দশ দশা—সুবিধে বুঝলে মশা হতে আপত্তি নেই।

আনন্দবাবু আরো স্থূল রসিকতা করেছেন, মশা হয়ে গালে বসবে?

শুভ্রেন্দু মাথা নেড়েছেন, সেটা রিস্কি হবে, অনেকে নিজের গালে চড় বসায়, নাকের ডগায় বসব। নিজের নাক কেউ থ্যাবড়া করতে চায় না।

শ্রীমতী চক্রবর্তী মুখ লাল করে স্বামীকে ধমকেছেন, তোমরা এখন এই রকম কথা বার্তা চালাবে নাকি?

—নিশ্চয়, আনন্দবাবু জবাব দিয়েছেন, ওই মহিলাকে নিয়ে নিজের স্বামীকে সন্দেহ করেছ তুমি। সন্দেহ সহ্য হয় কিন্তু তাকে অন্য পুরুষের ঘাড়ে চাপানো অসহ্য।

ছ'টা ছেড়ে সাড়ে সাতটা বেজে গেল রাত, সুমিত্রা বোসের দেখা নেই। আনন্দবাবু আর তাঁর স্ত্রী অপ্রস্তুত। সুমিত্রা বোসের বাড়িতে টেলিফোন করা হল, ক্লাবে টেলিফোন করা হল, মহিলা নি-পাত্তা। শেষে রেগে গিয়ে আনন্দ চক্রবর্তী বললেন, তোমারও যেমন,

মনে ধরার মতো আর মেয়ে পেলে না—ইচ্ছে করেই আসেনি, আমি তোমার কথা বেশ ভালো করেই বলে রেখেছিলাম। বাজনা শোনানোর লোভও দেখিয়েছিলাম।

বলেছিল...আসবে?

খুব চেষ্টা করবে বলেছিল। বিরস মুখে আনন্দবাবু মন্তব্য করলেন, নেমন্তন্ন পেলে কে আর লাফিয়ে ওঠে—এই রকমই বলে। আসতে না পারলে আগে থাকতে টেলিফোন করার কথা ছিল।

আনন্দ চক্রবর্তী নিজস্বভাবে মহিলার কাছে অনেকটাই সুপারিশ করে রেখেছিলেন বটে। বলেছিলেন, এমন বিচিত্র মানুষ তাঁর সাহিত্য জীবনে দুটি দেখেননি। বন্ধু কত ভালো ছাত্র ছিল, আর দারিদ্র্যের কত বড় বিপাকে পড়ে কি থেকে আবার কত বড়টি হয়েছেন তাও ফলাও করে বলেছেন। বলেছেন, বন্ধু নিজেকে মিস্ত্রী বলে পরিচয় দেয়, সেটা যে কত বড় গর্বের তা একমাত্র তিনিই জানেন। শুধু, যে নিগূঢ় আর নির্মম কারণে তাঁকে পথে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল, সেটুকুই বলে উঠতে পারেননি। টেলিফোন ছেড়ে সামনাসামনির আলাপেও সে-সব বলা সম্ভব নয়। শুভ্রেন্দু নন্দীর প্রশংসা আনন্দ-গৃহিণীও পঞ্চমুখে করেছেন।

সুমিত্রা বোস চুপচাপ শুনে গেছেন। তারপর নির্লিপ্ত মন্তব্য করেছেন, ভদ্রলোক সুন্দর বাজান...প্রায়ই শুনি। ঠিক আছে চেষ্টা করব যেতে।

রাত পৌনে আটটার সময় গাড়ি হাঁকিয়ে শুভ্রেন্দু নন্দী বাড়ি চলে এলেন। আসার সময় দেখলেন সুমিত্রা বোসের ঘরে আলো জ্বলছে। ইচ্ছে হল, সোজা ওই ঘরে গিয়ে হাজির হন। সেটা সম্ভব নয়। নিজের দোতলার বারান্দায় এসে ঘরের ভিতরে মহিলাকেও দেখতে পেলেন। ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে আধসোয়া। দেহের অণুতে অণুতে প্রায় জিঘাংসু একটা ইচ্ছা দাপাদাপি করে বেড়াতে লাগল শুভ্রেন্দু নন্দীর।

বাক্স থেকে ভায়লিনটা বার করে আবার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ছড়িতে ছাড়া-ছাড়া সুর টানলেন কয়েকটা। ওদিকের ঘরের আলোয় স্পষ্ট দেখলেন মহিলা এদিকে ফিরলেন। সোজা হয়ে বসলেন একটু। তারপর ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠলেন। তারপর বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

শুভ্রেন্দু নন্দী বাজাচ্ছেন না। কয়েক সেকেন্ডের এক-একটি সুরের মূর্ছনা তুলে আবার ছেড়ে ছেড়ে দিচ্ছেন। এই রকম বাজনার স্পষ্ট এবং অসহিষ্ণু একটা ভাষা আছে।

একটু বাদে সুমিত্রা বোস ভিতরে চলে গেলেন। শুভ্রেন্দু যেন অপেক্ষা করছেন। হ্যাঁ, একটু বাদে বাইরের গেটের আলোয় মন্থর গতিতে তাঁকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেখা গেল। তারপর আবছা অন্ধকার। শুভ্রেন্দু নন্দী সেই অন্ধকার বিদীর্ণ করে দেখতে চেষ্টা করছেন।...মাঠ বেষ্টন করা রাস্তা ধরে এদিকেই আসছে মহিলা। খুব শিথিল পদক্ষেপ।

বাজনার তারে আর একটু সুরের ঝংকার উঠল। এই ধীর গতি যেন পছন্দ নয়।

...আবছা রমণীমূর্তি স্পষ্ট হচ্ছে একটু একটু করে। না, বাজনার ঘায়ে তাঁর এদিকে আসার গতি দ্রুত হয়নি একটুও।

শুভ্রেন্দু নন্দীর বারান্দার নিচে এসে দাঁড়ালেন সুমিত্রা বোস। শুভ্রেন্দু ঝুঁকে দেখলেন, তারপর বাজনার তারেই যেন শেষ অমোঘ আমন্ত্রণ বেজে উঠল। কোন্ গৎ

কোন্ সুর বাজছে শুভেন্দু নিজেও জানেন না। যে-রকম করে বাজালে এবং যা বাজালে না এসে উপায় নেই—সে-রকম করে বাজাতে চাইছেন, তাই বাজাতে চাইছেন।

সুমিত্রা বোস ভিতরে ঢুকলেন। সিঁড়ি ধরে আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে লাগলেন। শুভ্রেন্দু নন্দী ভায়লিন হাতে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ালেন। এবারের আমন্ত্রণটা তাঁর বাজনা ছেড়ে দু'চোখের গভীরে এসে ছড়াতে থাকল। মুখে কথা নেই।

ওপরে উঠে আসতে আসতে ঈষৎ বিড়ম্বিত স্মিত মুখে নমস্কার জানালেন সুমিত্রা বোস। শুভ্রেন্দুর দু'হাত জোড়া, সামান্য মাথা নাড়লেন তারপর ছড়িসুদ্ধ হাতটা দুলিয়ে তাঁকে ঘরে অভ্যর্থনা জানালেন। নিজের কণ্ঠস্বরের ওপর বিশ্বাস নেই। আনন্দ চক্রবর্তীর ওখানে না যাওয়ার সমুচিত প্রতিফল হিসেবে এখানে টেনে নিয়ে আসতে পেরেছেন—সেই অসহিষ্ণুতা হয়তো গলার স্বরে গোপন থাকবে না।

নিজে আগে ঘরে ঢুকলেন, পিছনে সুমিত্রা। আবার ঘুরে মুখোমুখি হতে অল্প হেসে সুমিত্রা বললেন, আমার নাম সুমিত্রা বোস। আপনার নাম আপনার সাহিত্যিক বন্ধু আনন্দ চক্রবর্তীর মুখে শুনেছি। তাঁর বাড়িতে আজ আপনার সঙ্গে আলাপ করতে যাওয়ার কথা ছিল, আমারও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল...ভদ্রলোক অনেক করে বলেছিলেন, কিন্তু কিছুতে আর হয়ে উঠল না।

...কেন হয়ে উঠল না? যেন খুব কাছের কেউ না যাওয়ার কৈফিয়ত তলব করছে।

সোজা চোখের দিকে তাকালেন সুমিত্রা বোসও। যে সামান্য আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছিল সেটুকুও গোটানো হয়ে গেল যেন। নিস্পৃহ জবাব দিলেন, শেক্সপীয়রের একটা ড্রামা নিয়ে ওরা এমন মেতে উঠল যে ছাড়া পাওয়া গেল না।...আপনি গেছলেন নাকি?

হ্যাঁ, প্রায় দু'ঘন্টা অপেক্ষা করে চলে এসেছি। গভীর দুটো চোখ তাঁর মুখের ওপর অপলক তেমনি।

আই অ্যাম সো সরি! টেলিফোনে জানাতেও ভুলে গেলাম, এত ঝামেলা ক্লাবের ব্যাপারে...। এদিক ওদিক তাকালেন, সহজ কিন্তু ভারী নিরীহ অভিব্যক্তি।—আপনার স্ত্রী কোথায়?

কয়েক পলক চেয়ে থেকে সরলতার অকৃত্রিম অভিনয় দেখলেন শুভ্রেন্দু নন্দী।

ইচ্ছে করেই আনন্দর ওখানে যাওয়া হয়নি, আর স্ত্রী আছে কি নেই জেনেই এই প্রশ্ন। অদূরের ওই বাড়িতে গত চার মাস যাবৎ এই মেয়ে চোখ বুজে কাটালেও এ প্রশ্নটা স্বাভাবিক লাগত না। রক্তের মধ্যে একটা ওঠা-নামা শুরু হয়ে গেল শুভ্রেন্দু নন্দীর। রোসেলিন ব্যাডকক তাকে অনেক জড়িয়ে ধরেছে, অনেক চুমু খেয়েছে, কিন্তু এ-রকম অনুভূতি এই প্রথম। ভায়লিন আর স্টিকটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন।

তার পরের যেটুকু শেক্সপীয়রের নাটকও পিছনে পড়ে থাকবে। এটুকু বুঝি শুধু শুভ্রেন্দু নন্দীর দ্বারাই সম্ভব। আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন। গম্ভীর। চোখে চোখ রেখে বললেন, তিনি ছিলেন না, এই মাত্র এলেন।

জবাব শুনে থতমত খেয়ে সুমিত্রা বোস এদিক ওদিক তাকালেন। কিন্তু শুভ্রেন্দু নন্দীর হাত দুটো ততক্ষণে তাঁর দুই কাঁধের ওপর। সুমিত্রা বোস চেষ্টা করেও নড়াতে পারলেন না। একটা তপ্ত স্পর্শ কাঁধের ওপর। শুভ্রেন্দু নন্দী আবার বললেন, তিনি ওদিকে নয়, এখানে।...চার-চারটে মাস কাটাবার পরে আনন্দর ওখানে মিথ্যে সময় নষ্ট না করে

আজ তিনি এখানেই চলে এসেছেন। তিনি এত স্পষ্ট আর এত বুদ্ধিমতী আমি জানতুম না।

মুহূর্তে স্তব্ধ, রক্তবর্ণ মূর্তি সুমিত্রা বোসের! দুই চোখে বিস্ময়ের নীরব তরঙ্গ। ...ছাড়ুন!

কিন্তু তার আগেই কথাটা ডুবে গেল। পুরুষের দুই সবল বাহু অমোঘ আকর্ষণে তাঁকে টেনে নিয়ে এত কালের সমস্ত রুদ্ধ আগল ভেঙে দিয়ে যেন তাঁর কাছ থেকেই তাঁকে কেড়ে নিতে লাগল। সুমিত্রা বোসের বাধা দেবার শক্তি নেই।

নিজের গড়া একটা প্রতিরোধের অবসান যেন, একটা যুগের অবসান যেন। ছেড়ে দিলেন।

বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে আছেন সুমিত্রা বোস। সমস্ত মুখ আরক্ত। শাড়ির আঁচল খসে মাটিতে পড়ে গেছল। নিজের অগোচরে কাঁধে তুললেন সেটা। চেয়েই আছেন। বড় করে দম নিলেন বার দুই। কিন্তু চোখের পলক পড়ে না। সামনে যে দাঁড়িয়ে সে কেমন মানুষ জানেন না, তিনি শুধু পুরুষ দেখছেন। দেখছেন আর নিজের চোখে আগুন ঝরাতে চাইছেন। কিন্তু তাও পেরে উঠছেন না।

❀

...যৌবন বাস্তবের এই শুভ্রেন্দু নন্দী দুর্নিবার ঝড় যেন একখানা। একটি রমণীকে তিনি অনায়াসে নিজের দুরন্ত ইচ্ছার বেগে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন।...আর সমর্পণের বন্যায় নিজেও অনেকটাই ভেসে গেছলেন। এটাই জীবনের বোধ কবি সব থেকে বড় ভুল তাঁর। নিজেকে অনেকখানি ধরে রাখলে সম্ভবত তাব পরিণামে বড় কোনো ক্ষত সৃষ্টি হত না।

সুমিত্রার আচরণে খটকা লাগতে শুরু করেছিল মাস ছয় বাদে। শুভ্রেন্দু নন্দীর কাজের ব্যস্ততা বরদাস্ত করতে রাজী নন তিনি। যেদিন বলে দেন অতটার সময় আসতে হবে—আসতেই হবে। না এলে যথার্থই চটে যান। শুভ্রেন্দু বোঝাতে চেষ্টা করেন, আরে আমি হলাম গিয়ে মিস্ত্রী মানুষ, আমার অত ঘড়ি ধরে সময় ধরে হুকুম তামিল করার উপায় আছে!

মিস্ত্রী শুনলেই সুমিত্রা আরো রেগে যান, এ-রকম শুনলে শিক্ষা-দীক্ষার অভাব মনে হয়।—অসভ্যের মতো ওই কথাটা বলে ভাবো বুঝি খুব বাহাদুরী হল, না?

শুভ্রেন্দু রাগ করেন না, হাসেন। সুমিত্রার রাগ ভালো লাগে, তার লাল মুখ মিষ্টি লাগে। বলেন, আলবত আমি মিস্ত্রী আর তুমি মিস্ত্রীর যোগ্য বউ—বুকের তলার দু'দুটো বিকল এনজিন দুজনে কেমন ঠিক করে ফেললাম দেখলে না?

কিন্তু কথার মাথায় সুমিত্রা ভুলতে চান না। এই পুরুষকে তিনি মায়াবদ্ধ করতে পেরেছেন সেটা পরিষ্কার। কিন্তু সেটা তাঁর দেহের মায়া কিনা নিজের কাছেই সেই সংশয়। এই দেহের প্রতি লোকটার দুরন্ত তৃষ্ণা। তাই তাঁর স্পষ্ট কথা, আগে আমি, পরে তোমার কাজ—এ ভুলেছ কি পস্তাবে বলে দিলাম।

শুভেন্দু নন্দী তক্ষুনি দখল নিতে এগিয়ে আসেন—এই গোছের কোনো আমন্ত্রণের

জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিলেন। বলেন, নিশ্চয় আগে তুমি—আমি পস্তাতে শুরু করেইছি।

কিন্তু রাগতে গিয়ে রাগ টেকে না শেষ পর্যন্ত। এমনি জোর করে কেড়ে নিয়ে দখল নেবার ব্যাপারে লোকটার অফুরন্ত ক্ষমতা। নাজেহাল হয়ে বলেন, অসভ্য কোথাকারের—

সেদিনও এই গেছের কিছু একটার পরে শুভ্রেন্দু লক্ষ্য করলেন সুমিত্রা চুপচাপ তাঁর দিকে চেয়ে কি যেন দেখছেন। চাউনিটা হঠাৎ কেমন যেন স্বাভাবিক লাগল না শুভ্রেন্দুর। কেমন সন্দিগ্ধ আর খরখরে চাউনি।—কি দেখছ?

তোমাকে। সোজাসুজি কিছু একটা ফয়েসলা করার জন্যেই যেন কাছে এগিয়ে এলেন, আচ্ছা একটা কথা ঠিক ঠিক বলো তো, তোমার জীবনে আমি ক'নম্বর মেয়ে?

প্রশ্ন শুনে শুভ্রেন্দু হতচকিত কয়েক মুহূর্ত। দু'হাত বাড়িয়ে তাঁকে আরো কাছে টেনে পাল্টা রসিকতা করলেন, তোমার জীবনে আমি কত নম্বর পুরুষ?

ভুরু কুঁচকে সুমিত্রা জবাব দিলেন, দু'নম্বর।

কেন, মোহন ভাটি, আয়েঙ্গার, বলরাম কাপুর—এরা? শুভ্রেন্দু যেন সহজে ছাড়বার পাত্র নন।

ওঃ...! সুমিত্রা অপ্রত্যাশিতভাবে তেতে উঠলেন এতেই—তলায় তলায় এত সব খবর নেওয়া হয়েছে? তারা সব অপদার্থ, নইলে তুমি আমাকে পেলে কি করে?

মজাই লাগছে শুভ্রেন্দু নন্দীর। মুখে ছদ্ম গাম্ভীর্য।—তার মানে আমি তাদের থেকে পদার্থ?

কিছুটা। সুমিত্রা সেটা অস্বীকার করলেন না। কিন্তু নিজের প্রশ্নের উত্তরও তাঁর চাই। ফের জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি জবাব এড়ালে যে? আমি কত নম্বর?

এক নম্বর।

মিথ্যেবাদী।

মিথ্যেবাদী কেন?

তেমন কারণ হাতড়ে পাচ্ছেন না সুমিত্রা।—তোমার যা দস্যুর মতো চরিত্র, আমার বিশ্বাস হয় না।

শুনে শুভ্রেন্দু নন্দী অখুশি হননি। কিন্তু সত্যিই যে স্ত্রীর মনের পর্দায় একটা কাঁটার আঁচড় পড়েছে সে-সম্পর্কে গোড়ায় অন্তত আদৌ সচেতন ছিলেন না। টের পাবার পর ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। কাঁটাটা সত্যি বিঁধছে, ক্ষত সৃষ্টি করছে বুঝতে পারেন।

তাই তাঁর ওপর স্ত্রীর দখলের হাতটা যেন একটু একটু করে কঠিন হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া জীবনের আভিজাত্য সম্পর্কে সুমিত্রার ধারণা অন্য রকম। স্বামী কারখানার মালিক সেটা মন্দ শোনায় না, কিন্তু মোটর গ্যারাজের মালিক শুনলে স্নায়ু ধাক্কা খায়। অভিজাত শ্রেণীর কালচারের দিকটা তাঁকে দেখানো শোনানো বোঝানোর জন্য গোড়ায় গোড়ায় ক'দিন ক্লাবে ধরে নিয়ে গেছেন, কিন্তু উঁচু মহলে লোকটা যেন বে-মানান। আবার নিজে যখন-তখন কারখানায় এসে উপস্থিত হয়েও ধাক্কা খেয়েছেন সুমিত্রা। তেল-কালি মেখে যারা কাজ করছে, স্বামীও তাদের একজন—সেটা বরদাস্ত করা কঠিন। এ-জন্যে রাগ

করেন, এরও একটা বিহিত করতে চান। ঝাঁঝালো স্বরে বলেন, মাইনে দিয়ে যাদের রেখেছ তারা করবে এ-সব, তুমি কেন?

একদিনের ঘটনায় মুখ লাল সুমিত্রার। লাল শুধু নয়, অপমানে একেবারে তাঁর মাথা কাটা গেছে যেন। লোকটার এত দম্ভ ভাবেন নি। বাড়ি থেকে ফোনে জানিয়ে দিয়েছিলেন, বলরাম কাপুর ফিরেছেন বিদেশ থেকে, মিস্টার নন্দীর সঙ্গে আলাপ করার জন্য উৎসুক—তাঁকে নিয়ে সুমিত্রা কারখানায় আসছেন। শুভ্রেন্দু খুশি মেজাজে পাল্টা অভ্যর্থনা জানিয়েছেন, নিশ্চয় এসো।

ইতিমধ্যে নতুন ছোট্ট আফিস বিলডিং হয়েছে কারখানার, মালিকের ঘরে এয়ার কুলারও বসানো হয়েছে সুমিত্রার তাগিদে। ফলে কারখানার চেহারা অনেক সভ্য-ভব্য হয়েছে। কিন্তু প্রায় মিলিয়নেয়ার কাপুরকে সেখানে এনে সুমিত্রার যেন মাথায় রক্ত ওঠার দাখিল। শুভ্রেন্দু নন্দী তখন সেই ময়লা আলখাল্লা গায়ে গাড়ির নীচে শুয়ে নিজের হাতে কাজ করছেন। পাশে সেইরকম বেশে দাঁড়িয়ে অন্য মিস্ত্রীরা সাহেবের কাজ দেখছেন। ছোট আর বড় মিস্ত্রী—এইটুকুই শুধু তফাৎ যেন।

সুমিত্রার সন্দেহ অমূলক নয়। শুভ্রেন্দু নন্দী তখন ইচ্ছেকরেই ওই কাজে মগ্ন ছিলেন। কাপুরের সঙ্গে তাঁর পুরুষাকারের তফাতটা স্ত্রীর চোখে পড়ুক এই হয়তো চেয়েছিলেন। কিন্তু সুমিত্রা উল্টে রাগে ঝলসাতে লাগলেন নিজেকে। তার মানসম্ভ্রম নিয়ে লোকটার এতটুকু মাথা ব্যথা থাকলে কক্ষনো এ-রকম করতে পারত না—কক্ষনো না। পরে এই নিয়ে ভালো রকমের বচসাও হয়ে গেল দুজনের।

...প্রথম জীবনে একজনকে নিজের ইচ্ছের সুতোয় বেঁধে রাখতে চেয়েছিলেন মহিলা, পারেন নি। সেই সুতো এবারে শেকল করে তুলতে চাইলেন। এই চাওয়ার মধ্যে যুক্তি নেই, বুদ্ধি বিবেচনার বিচার নেই। শেকল—শেকলই। ফলে প্রতিটি স্বাধীন পদক্ষেপে হোঁচট খেতে লাগলেন শুভ্রেন্দু নন্দী। স্ত্রী সর্বদাই ঘড়ি ধরে কারখানা থেকে তাঁকে নিজের দখলে টেনে আনতে চান।

শুভ্রেন্দু বিরক্ত হন। যতক্ষণ সম্ভব মুখ বুজে সহ্য করেন। কিন্তু সহিষ্ণুতা তাঁরও প্রবল নয় আদৌ। বলেন, দেখ, তোমাকে চাওয়ার ঢের আগে আমি নিজের শক্ত দুটো পায়ের ওপর দাঁড়াতে চেয়েছি, অর্থ চেয়েছি, প্রতিপত্তি চেয়েছি। এ-সব না থাকার অর্থ কি তোমার ধারণা নেই—এই চাওয়ার সঙ্গে আমার কোনো কিছুর আপোস নেই, তাই আমার কাজে বাধা দিতে চেষ্টা করলে তুমি ভুল করবে।

জবাবে সুমিত্রা জ্বলে উঠেছেন, ভুল আমি করছি না তুমি? তোমার থেকে ঢের ঢের অর্থ আর প্রতিভাশালী লোককে আমি বাতিল করেছি তুমি জানতে না? আমি কি চাই সে-খবর নেবার দরকার বোধ করো না, কেমন?

তিক্ত বিরক্ত শুভ্রেন্দু নন্দী মুখের ওপর বলেন, তুমি কি চাও নিজেই জানো না।

একটা বড় রকমের সংঘাত দানা বাঁধছে শুভ্রেন্দু নন্দী সে আঁচ পেতেন। কিন্তু স্বীকার করতে চাইতেন না। ভাবতেন, স্ত্রীর মতিগতি বদলাবে, তাঁকে একটু বুঝতে পারলে আর কোনো ক্ষোভ থাকবে না। মানুষের শুভ বুদ্ধির ওপর তিনি বিশ্বাসী।

সুমিত্রাকে সঙ্গে করে একদিন তাঁর ভিখিরি গুরু শোহনলালের কাছে এলেন। শোহনলালের গল্প স্ত্রীর কাছে করেছেন অবশ্য, কিন্তু সেদিন কোথায় কার কাছে যাওয়া

হচ্ছে সে সম্পর্কে কিছু বলেননি। হোটেলের সামনে সেই বেদীর ওপরেই সমাসীন শোহনলাল। কাছে আসতে সামনে ঝুঁকে দেখতে চেষ্টা করল।

চিনতে পারছ না?

ও তুই! আয় আয়। গলার স্বর শুনেই হঠাৎ খুশিতে আটখানা। কি রকম ঝাপসা দেখছি চোখে আজকাল...কতদিন আসিস নি কেন!...সঙ্গে কে?

আমার বউ।

অ্যাঁ, মা-লক্ষ্মীকে নিয়ে এসেছিস এইখানে! শোনামাত্র নির্জীব মানুষটা বিষম ব্যস্ত। —তুই একটা আস্ত পাগল, মাকে এখন আমি কোথায় বসতে দিই! বেদীর কোণে সরে গিয়ে বলল, এইখানে বস মা, বস, আজ আমার কি আনন্দ—

ভিখিরি বেহালা বাদকের সেই চেহারা দেখেই গা ঘিনঘিন করছিল সুমিত্রার। যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকেই তার নোংরা জামা কাপড়ের বিচ্ছিরি গন্ধ আসছে একটা। বুড়োর খুশি বা আনন্দ আবেদন রেখাপাতও করল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হোটেলটার দিকে তাকাচ্ছেন। মত্ত অবস্থায় দুই একজনকে বেরুতে দেখছেন সেখান থেকে। হঠাৎ সেই মিলিটারি অফিসারের স্মৃতি যেন নতুন করে আবার বিষাক্ত করে দিল ভিতরটা। চাপা রূঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, এইখানে খেতে এসে লোকটার সঙ্গে তোমার আলাপ বলেছিলে না?

শুভ্রেন্দু মাথা নাড়লেন, তাই। স্ত্রীর মুখ দেখে অবাকই লাগছে একটু।

তার মানে তুমি মদ খেতে?

কি থেকে কি। অবাক প্রথম। তারপর চাপা ধমকের সুরে শুভ্রেন্দু বললে, মাথা খারাপ নাকি।

কথাটা শোহনলালেরও কানে গেছে। হাঁস-ফাঁস করে বলে উঠল, না গো মা, ও হীরের টুকরো ছেলে...অনেক দিন তো বিয়ে হয়েছে, এখনো টের পাওনি? আমার এই ছেলেকে তো একদিনেই চেনা যায়, আমি প্রথম দিনেই চিনেছিলাম—তোমার চোখ আমার থেকেও খারাপ নাকি গো, অ্যাঁ? নিজের রসিকতায় বুড়ো শেষে নিজেই হেসে উঠল।

সুমিত্রা তার কথা শুনলেন, কিন্তু একটি কথা বললেন না। ওই লোক তাকে এখানে এমন একজনের কাছে নিয়ে এসেছে সেই রাগে জ্বলছেন। তাছাড়া ওই হোটেল, যেখান থেকে মদ খেয়ে টলতে টলতে লোক বেরুচ্ছে। ঢোকার মুখেও কেউ কেউ লোভী চোখে তাকাচ্ছে এদিকে। গটগট করে একলাই ফিরে চললেন সুমিত্রা। শোহনলাল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল সেই দিকে। শুভ্রেন্দু নন্দী বিরক্ত, ক্রুদ্ধও। শোহনলালকে জিজ্ঞাসা করলেন, চোখে ঝাপসা দেখছ কেন?

কি জানি, ছানি-টানি পড়বে বোধহয়। কিন্তু মা কোথায় চলল—ওকে ডাক্!

সে জবাব না দিয়ে শুভ্রেন্দু বললেন, আমি ডাক্তারের ব্যবস্থা করে তোমাকে দেখাতে নিয়ে যাব।

তা তো দেখাবি, কিন্তু মা যে চলে যায় দেখিস না? শোহনলাল আগের মতোই ব্যস্ত আর বিরক্ত।

কুড়িটা টাকা তার পকেটে গুঁজে দিয়ে শুভ্রেন্দু দ্রুত সেই দিকে এগিয়ে গেলেন।

হ্যাঁ, সেই রাতেই জীবনে সব থেকে বড় ভুলটা তিনি করে বসলেন। ওই বৃদ্ধ ভিখিরির সঙ্গে বুকের ভিতরের সম্পর্ক সুমিত্রাকে দেখানোর আগ্রহে নিজের জীবনের সব থেকে বড় ক্ষতটা সুমিত্রার কাছে অনাবৃত করে ফেললেন। জন্মের যে অধ্যায় সকলের চোখে কলঙ্ক, সেটাই অনায়াসে ব্যক্ত করে ভিখিরি শিল্পীর আশ্রয় দেবার উদারতার কথা বললেন। শুধু আশ্রয় নয়, সেই সঙ্গে এই সুরসৃষ্টির আশ্রয়টুকু না পেলে কোথা থেকে কোথায় ভেসে যেতেন সে কথাও বললেন।

আবেগের মুখে বলেছেন। কিন্তু তারপরেই সচকিত। সুমিত্রা নির্বাক, স্তব্ধ। তাঁর মুখ থেকে যেন সমস্ত রক্ত সরে গেছে। যা শুনছেন বা শুনলেন তা যেন বোধের অতীত। সঙ্গে সঙ্গে শুভ্রেন্দুর ভিতরটাও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।—কি হল?

সুমিত্রা চেয়ে আছেন, যেন নতুন করে দেখছেন মানুষটাকে।—এ-সব তুমি আমাকে আগে বলোনি কেন?

চাপা অথচ কঠিন বিদ্রূপের সুরে শুভ্রেন্দু জিজ্ঞাসা করলেন, আগে বললে তুমি আমার জীবনে আসতে না, এই তো? আমার জন্মের দাগটা তোমার কাছে খুব কুৎসিত লাগছে—না?

সুমিত্রা জবাব দিলেন না। তাঁর ফ্যাকাশে মুখে আবার রক্ত ছড়াতে লাগল।

এবারে দ্রুত সংঘাতের মুখোমুখি এসে দাঁড়াচ্ছেন দুজনে, শুভ্রেন্দু নন্দী তার আভাস পাচ্ছেন। অতি তুচ্ছ কারণে বা অকারণে সুমিত্রা কটূক্তি করে ওঠেন, বকাবকি করেন। জীবনটাকে যেন তাঁর এক দুঃসহ নগ্নতার মধ্যে টেনে আনা হয়েছে। শুভ্রেন্দুরও মেজাজ ঠাণ্ডা নয় খুব, সময় সময় উল্টে গর্জে ওঠেন। কথায় কথায় সুমিত্রা বলেন, তোমাকে আমি এক ফোঁটা বিশ্বাস করি না। শুভ্রেন্দু জবাব দেন, বিশ্বাস কি বস্তু তোমার জানা থাকলে তো!

এরই ওপর আর এক দিন আবার এক অপ্রত্যাশিত অঘটন। শুভ্রেন্দু নন্দী সুমিত্রাকে মার্কেটে নামিয়ে দিয়ে কারখানার কি সব কেনাকাটার ব্যাপারে বেরুবেন। কিন্তু মার্কেটে নেমে দাঁড়াতেই কোথা থেকে ছুটে এলো এক শ্বেতাঙ্গী মেয়ে। হোটেলে থাকা-কালীন সেই অবুঝ প্রেমিক আর বাজনার ভক্ত শুভ্রেন্দু নন্দীর। রোসেলিন ব্যাডকক এতদিন বাদে হঠাৎ তাঁকে দেখে সেই দিনমানে তাঁকে জাপটে ধরে একাকার কাণ্ড। নানডি, ও মাই ডিয়ার ডিয়ার, কতদিন বাদে দেখলাম তোমাকে, কোথায় পালিয়ে ছিলে বলো শিগ্গীর।! আমি তোমাকে কত যে খুঁজেছি জানো না—

সুমিত্রার দিকে একনজর তাকিয়েই পরিস্থিতি বুঝে নিলেন শুভ্রেন্দু নন্দী। নিজেকে ওর হাত থেকে ছাড়াতে গিয়ে ঘেমে উঠেছেন। খুব শিগ্গীরই দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আর স্তোক বাক্যে শ্বেতাঙ্গ রোসেলিনকে সরিয়ে গাড়িতে উঠলেন। গম্ভীর মুখে উঠে বসলেন সুমিত্রাও, তাঁর মাথায় তখন আগুন জ্বলছে।

গাড়ি চালাতে চালাতে শুভ্রেন্দু জিজ্ঞাসা করলেন, আবার উঠে এলে যে?

তোমার সঙ্গে একটু গল্প করতে সাধ হল বলে।...এর পরেও তোমাকে বিশ্বাস করতে বলো?

বলি।

আর ওই মেয়েটা?

পাগল।

পাগল তোমার জন্যেই বোধহয়?

নিজের অদৃষ্টে পাগল। তোমারও ওই ভয় আছে, একটু সাবধান হওয়া দরকার।

দু'চোখে সুমিত্রা আগুন ছড়ালেন। তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন, গাড়ি থামাও।

থামল। নেমে হন হন করে হেঁটে চললেন তিনি।

জীবনের এই অধ্যায়ও দ্রুত সমাপ্তির দিকে গড়াচ্ছে সেটা বোধহয় স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলেন শুভ্রেন্দু নন্দী। আবার এক বিষণ্ণ গাম্ভীর্যের খোলসের মধ্যে ঢুকে পড়ছেন তিনি। কারখানা থেকে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে রাতে ফিরে স্ত্রীকে ঘরে দেখতে পান না বড় একটা। সুমিত্রা যখন খুশি বেরিয়ে যান, যখন খুশি ফেরেন। ফিরতে প্রায়ই অনেক রাত হয় তাঁর। তার পরেও বিচ্ছিন্নই থাকেন, আলাদা ঘরে শোন। দু'জনের বাক্যালাপও বন্ধই প্রায়।

পাকাপাকি বিচ্ছেদের একটা উপলক্ষ দরকার ছিল, তাও সেই উপলক্ষও এসে হাজির একদিন।

আনন্দ চক্রবর্তীর স্ত্রী মারা গেলেন। ভদ্রলোক সত্যিই শোকে স্তব্ধ বেশ কিছু দিন। সেই শোক শুভ্রেন্দুকেও ছুঁয়ে গেছে। কিন্তু তার প্রকাশ নেই। এই তিনটি মাসের মধ্যে লেখকের প্রতি অতিমাত্রায় দরদী হয়ে উঠতে লাগলেন সুমিত্রা নন্দী। সময়ে অসময়ে তাঁর বাড়িতে চলে যান, বহুক্ষণ কাটিয়ে আসেন, বিকেলে গেলে রাত পর্যন্ত থেকে আনন্দবাবুকে খাইয়ে-দাইয়ে নিজে খেয়ে তারপর ফেরেন।

সমাচার কুশল নয় আদৌ, বন্ধুর মুখ থেকে সে-আভাস আনন্দ চক্রবর্তী অনেক আগেই পেয়েছেন। এখন এই ব্যাপার দেখে বিড়ম্বনার একশেষ। সুমিত্রাকে কিছু বলতে গেলে তিনি ফুঁসে ওঠেন।— আমি আসি বলে আপনার অসুবিধে হয়?

আনন্দবাবু বলেন, আমার কপাল পুড়েছে, কিন্তু ও-বেচারার অসুবিধে করছেন কেন!

সুমিত্রা কঠিন জবাব দেন, তাঁর কপাল আরো বেশি পুড়েছে। ও-রকম লোক আপনার মতো মানুষের বন্ধু হয় কি করে বুঝি না।

আনন্দ চক্রবর্তী সত্যি বিপাকে পড়লেন যেন, শুভ্রেন্দুও ভুল বুঝছেন কিনা জানেন না। টেলিফোনে সেদিন বন্ধুকে বললেন, কি হে, তুমি কি চোখ বুজেই থাকবে, আমার যে এদিকে প্রাণান্ত দশা।

শুভ্রেন্দু জবাব দিয়েছেন, দশাটা যদি সত্যিই অসহ্য মনে হয় তো তাড়িয়ে দাও, আমি তার পায়ে বেড়ি দিয়ে রাখব কেমন করে। কথা ক'টা বলেই রিসিভার নামিয়ে রেখেছেন।

সেই দিনই আনন্দ চক্রবর্তী সুমিত্রাকে কি বলেছেন জানেন না। অগ্নিমূর্তিতে ঘরে ফিরলেন সুমিত্রা। শুভ্রেন্দু তখন নিজের মনে বাজাচ্ছিলেন, সুমিত্রা জ্বলতে জ্বলতে ঘরে ঢুকলেন। ওই বাজনাটা তাঁকে জীবনের একটা মস্ত ভুলের মধ্যে টেনে নামিয়েছে, তাই এটাও চক্ষুশূল এখন।—ভণ্ডামি রাখ, আনন্দবাবুকে তুমি কি বলেছ?

শুভ্রেন্দু বাজনা থামালেন। জবাব না দিয়ে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন শুধু।

নীরবতার ফলে আরো যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন সুমিত্রা। গলার স্বর অস্বাভাবিক চড়িয়ে বলে উঠলেন, আমি জানতে চাই আমার সম্পর্কে তুমি আনন্দবাবুকে কিছু বলেছ কি না?

বলেছি। তোমাকে তাড়িয়ে দিতে বলেছি।

চোখের আগুনে কাউকে ভস্ম করা যায় না, তবু যেন সেই চেষ্টাই সুমিত্রা করলেন। ঘৃণা আর বিদ্বেষের এক বিকৃত মূর্তি।—ইউ ফুল, ইউ বাস্টার্ড...!

শেষের শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে কি যেন ওলট-পালট হয়ে গেল শুভ্রেন্দু নন্দীর। বাজনাটা ঠেলে সরিয়ে আস্তে আস্তে উঠে এসে দু হাতের দুটো শক্ত থাবা তাঁর কাঁধের ওপর বসিয়ে দিলেন। রমণীর দুই চোখে নিজের দুটো চোখ বিঁধিয়ে দিয়ে অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন,—কি বললে?...কি বললে তুমি?

ছাড়ো! ডোন্ট টাচ মি!

স্নায়ুতে স্নায়ুতে একটা অসহ্য দাপাদাপি শুরু হয় গেছে শুভ্রেন্দু নন্দীর। ছাড়লেন না। হাতের দুই থাবা কাঁধের ওপর চেপে বসল আরো। তারপর আচমকা চৌকিটার কাছে ঠেলে নিয়ে এলেন সুমিত্রাকে, বাধা দেবার আগেই ওটাব ওপর আছড়ে ফেললেন তাঁকে। সশব্দে দরজা দুটো বন্ধ করে দিলেন।

...নিভৃতে নারী পুরুষের এই মিলন নির্মম হিংস্র নিষ্ঠুর।

পরদিন বিকেলে আবার দেখা দুজনার। শুভ্রেন্দু আগেই কারখানা থেকে ফিরেছেন। সুমিত্রা সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঠাণ্ডা, কঠিন।—আমি ডিভোর্স সুট ফাইল করতে যাচ্ছি। তোমার কনটেস্ট করার ইচ্ছে আছে?

না।

তোমার জন্মপ্রসঙ্গ এই ক্ষেত্রে একটি মাত্র শর্তে গোপন রাখতে রাজী আছি।...তুমি মাসে দেড় হাজার টাকা করে খরচ বাবদ দেবে আমাকে—কারণ এরপর আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকতে হবে আমাকে।

শুভ্রেন্দু নন্দীর সমস্ত মুখ বিবর্ণ প্রায়।—দেবো।

থ্যাঙ্ক ইউ।

বিচ্ছেদ হয়ে গেল। সুমিত্রা নন্দী এবার সুমিত্রা বোস।

তাঁর ভিতরটাও যেন রাতারাতি বদলে গেছে। এখন আর কথা বলতে অসুবিধে হয় না। এই একটা মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলার কাজ যেন এখনো শেষ হয়নি। আনন্দ চক্রবর্তীর কাছে গিয়েও যা মুখে আসে তাই বলে গালাগালি করেন এই লোককে। আর সেই বিস্ময়, অমন লোক তাঁর মতো মানুষের বন্ধু হল কি করে। যখন খুশি ফ্যাক্টরিতে আসেন সুমিত্রা। মাসের বরাদ্দ টাকা ছাড়াও থোকে থোকে আরো টাকা আদায় করে নিয়ে যান। বলেন, আমার দরকার, দিতে হবে। না দিলে আমাকে অন্য রাস্তায় টাকাটা আদায় করতে হবে।

শুভ্রেন্দু নন্দী দিয়ে দেন।

আনন্দবাবুকে মহিলা বলেন, আপনার বন্ধু আমার সব কেড়ে নিয়েছে, তাকে আমি

একটা দিনের জন্যেও শান্তিতে থাকতে দেবো না।

...রমা চন্দ এখানে চাকরি নেবার ফলে তাকেও বিষদৃষ্টিতে দেখেন। এ সম্বন্ধেও আনন্দবাবুকে বলেছেন, লোকটার চরিত্র জেনেও একটা মেয়েকে এ-ভাবে সর্বনাশের মুখে ঠেলে দিলেন? আপনাদের পুরুষ মানুষদের কি বিবেক বলে কিছু নেই।

আনন্দবাবু পারতপক্ষে জবাব দেন না। সেটাও পছন্দ নয় সুমিত্রার।

কিন্তু কিছুকাল হল সুমিত্রা বোসের টাকা আদায়ের ঝোঁকটা গেছে। শুভ্রেন্দু নন্দী এর কারণ অনুমান করতে পারেন। উনি জানেন, প্রায় মিলিয়নেয়ার কাপুরের সঙ্গে রমণীটির কিছু একটা বোঝাপড়া হয়েছে। অজস্র টাকার ওপর অনায়াস দখল এসেছে তাঁর। ঝকঝকে তকতকে গাড়িতে তিনি আসেন। টাকা আর তিনি শুভ্রেন্দু নন্দীর কাছে চান না। কিন্তু মানুষটার প্রতি তাঁর আচরণ যেন আরো নির্মম, আরো হিংস্র।

...আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে সেই সন্ধ্যায় রমা চন্দ বাড়ি ফিরেছে। কি এক অজ্ঞাত ভয়ে তার ভিতরটা আচ্ছন্ন।

...কারখানার এক নম্বর মিকানিক বিমল পাঠককে এবং সঙ্গে আরো জনাকতককে শুভ্রেন্দু নন্দী বরখাস্ত করেছেন। বিমল পাঠক বা অন্য বরখাস্ত কর্মীরা কেউ সহজ মানুষ নয়। যদিও বিমল পাঠকের সঙ্গে ওই অন্য কর্মীদের আর সদ্ভাব নেই—তাদের আচমকা বিচ্ছেদটা সকলের কাছেই বিস্ময়কর ঠেকেছিল।

...ওদের সকলকে বরখাস্ত করার সময় শুভ্রেন্দু নন্দী ঘড়ি ধরে ছ'টা পর্যন্ত কারখানায় কাজ করেছেন, তারপর নিঃশব্দে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। আবার যে ফিরে আসবেন কেউ ভাবেনি—রমা চন্দ আর অ্যাকাউন্টেন্টকে ঘিরে কারখানার বহু কর্মী জটলা করছিল। সেই সময় আবার এসে কঠিন অনুশাসনে শুভ্রেন্দু নন্দী সকলকে কারখানা এলাকা থেকে একরকম তাড়িয়েই দিয়েছেন। সব থেকে বেশি দুর্ব্যবহার করেছেন রমা চন্দর সঙ্গে।

একটা চাপা রাগ নিয়েই রমা চন্দ পথ ভাঙছিল। মালিকের অপমানসূচক কথাগুলো জ্বলতে জ্বলতে মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। বিমল পাঠকের সঙ্গে হাত মেলানোর কথাও মনে হচ্ছিল থেকে থেকে। মোড়ের মাথায় রাজা আহমেদকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে, তারপর তার দিকে এগিয়ে গেছে।

রাজা আহমেদও দূর থেকেই লক্ষ্য করেছে তাকে। কাছে আসতে জিজ্ঞাসা করল, কি বহিনজি? রাজা আহমেদের শুকনো মুখ। হাবভাব যে সচকিত।

রমা বলেছে, এ দিকে এসো।

তাকে নিয়ে খানিকটা ব্যবধানে এসে বলেছে, সকালে তুমি নেশা করে কারখানায় এসেছিলে অথচ সাহেবকে বলেছিলে আসবে না। ...ছুটি নিয়েছিলে, তার ওপর নেশা করেও তুমি কারখানায় এসেছ। ...কেন?

রাজা আহমেদ সাধাসিধে জবাব দিল, সাহেবের জন্য মনে একটু ভাবনা ছিল বহিনজি।

রমা আবার জিজ্ঞাসা করল, সকালে তুমি নিজেকে মিরজাফরের বংশধর বলেছিলে কেন?

ও জবাব দিয়েছে, বিমলবাবু আমার অনেক উপকার করেছে, কিন্তু আমিই তার চুরি ধরিয়ে দিয়েছি।

চুরি? চোখে চোখ রেখে রমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।—সত্যিই বিমলবাবু চুরি করত নাকি?

ও আল্লার কসম খেয়ে বলেছে, চুরি করত। গ্যারাজে যারা মাস ভাড়ায় গাড়ি রাখত, প্রায় রাতেই তাদের সেই সব গাড়ি থেকে কিছু কিছু তেল চুরি করে বিক্রী করা হত। রাজা আহমেদ নিজেই বিমল পাঠকের এ তেল চুরির দোসর ছিল। সাহেবের কাছে রাজা আহমেদ নিজেই এই সত্য স্বীকার করেছে। আর মাল কেনার ব্যাপারে যে চুরি হতো সেটা মাল যারা বেচেছে তারাই সাহেবের কাছে কবুল করেছে— অবশ্য এ-খবরটাও তাদের কাছ থেকে রাজা আহমেদই আগে সংগ্রহ করে সাহেবকে জানিয়েছিল। বলেছে, বিশ্বাস করো বহিনজি, সাহেবের দিল জখম হচ্ছে দেখেই রাজা বান্দা আর ঠিক থাকতে পারল না। ছোট বেইমানি অনেক করেছি, কিন্তু এ-রকম বেইমানি কি করে সহ্য করব!

রমা চন্দ স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। অপলক চোখে লোকটাকে যেন নতুন করে নিরীক্ষণ করেছে আবার। তারপর মন্তব্য করেছে, নিজেকে মিরজাফরের বংশধর বলছ কেন রাজা, তুমি খুব ভালো কাজ করেছ। একটু থেমে জিজ্ঞাসা করেছে, বিমল পাঠকের সঙ্গে তার দলের বাকি ওই ক'জনের হঠাৎ এ-রকম ঝগড়া বেঁধে গেল কি করে?

একটু চুপ করে থেকে রাজা আহমেদ জবাব দেবে কি দেবে না ভেবেছে হয়তো। তারপর বলেছে, সাহেবের টাকায় কাজ হয়েছে। বাইরে থেকে যে দু'তিন জন লোক মাতব্বরি করছিল, আসলে তারা ভাঁওতাবাজ। জোরদার কোনো পার্টির কেউ নয়। বিমল পাঠকই তাদের যোগাড় করে এনেছিল। সাহেবের টাকা খেয়ে তারা সরে যেতে বোঝা গেছে বিমল পাঠকের আসল মাতব্বর বা আসল মুরুব্বি ওই বাইরের লোকেরা নয়। কারখানার লোকেরা সেটা কি ভাবে বুঝেছিল রাজা আহমেদ সঠিক জানে না।

রমা চন্দ বাড়ির পথ ধরার আগে রাজা আহমেদ বলেছে, বহিনজি, সাহেব ওখানে একলা থাকল আমার একটুও ভালো লাগছে না। ছাঁটাই যারা হয়েছে তারা কেউ সহজ লোক নয়। যাক, তুমি ভেবো না বহিনজি, রাজা আহমেদের জান থাকতে কেউ সাহেবের গায়ে আঁচড় কাটতে পারবে না, সাহেব যত রাগই করুক আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি।

চলে গেছে।

কিন্তু রমা চন্দর দুশ্চিন্তা বেড়েই চলেছে।

এর পরেও ক'টা দিন থমথমে আবহাওয়া কারখানায়। শুভ্রেন্দু নন্দী একমনে আপিসের কাজ করেন, কারখানার প্রধান মিকানিকও তিনিই। কোনোদিন ছ'টায় বেরোন কারখানা থেকে, কোনাদিন সাতটা বা তারও পরে। কিন্তু প্রতিটি লোককে ঠিক ছ'টায় ছুটি দেন। ছুটি পেয়ে কেউ আর সাহস করে দু' দণ্ডও কারখানায় অপেক্ষা করে না। তখন দারোয়ান দুটো ছাড়া আর কেউ থাকে না।

রমা চন্দ রোজই কারখানা থেকে বেরুবার আগে রাজাকে ইশারা করে দিয়ে যায়, সাহেবকে যেন একলা না ছাড়ে। সম্ভব হলে সাহেব না বেরুনো পর্যন্ত নিজেও থেকে

যেত। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। শুভ্রেন্দু নন্দীও বোধহয় কিছু বিপদের আঁচ করছেন, নইলে রাজাকে গাড়িতে তুলে নিতে আপত্তিই বা করেন না কেন?

এদিকে রমা চন্দর ভয়টা বাড়ছেই—বাড়ছেই। ভয় ওই মালিকের জন্য। সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে কারখানা থেকে বেরিয়ে খানিকটা তফাতে এ-দিক ও-দিক দু-চারজন অচেনা মুখ দেখছে রোজই। মালিকের এটা চোখে পড়ে কিনা কে জানে। ওরা নিজেদের মধ্যে জটলা করে, আড়ে আড়ে কারখানার দিকে তাকায়। কারখানা ছুটি হয়ে গেলে ওদের বিচ্ছিন্নভাবে দূরে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে।

এটা অহেতুক মানসিক ভয় কিনা জানে না। কারণ কর্মখাস্ত যারা হয়েছে একদিনও তাদের কারো মুখ দেখা যায়নি। তবু রমা চন্দর মন বলে, ওই অচেনা মুখগুলোতে যেন কিছু একটা অভিসন্ধি লেখা।

অভিসন্ধিটা বদ্ধমূল হল সেদিন বাড়ি ফেরার সময়। বাড়ির দরজার কাছে বিমল পাঠক দাঁড়িয়ে। দিনের আলো মুছে গেছে তখন। কে দাঁড়িয়ে আছে প্রথমে ঠাওর করতে পারেনি। চেনার পর চমকেই উঠেছিল হয়তো। আর সেটুকুও বিমল পাঠকের চোখ এড়িয়েছে মনে হয় না। সামলে নিয়ে সহজভাবেই বলতে চেষ্টা করেছে, কি ব্যাপার বিমল বাবু? এখানে দাঁড়িয়ে।

চাকরি নেই, কিন্তু বিমল পাঠকের বেশবাসের চাকচিক্য যেন আগের থেকে বেড়েছে। আর সেই সঙ্গে ছোট দুই চোখের ধারও বেড়েছে। জবাব দিল, আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল।...ভিতরে একটু বসার সুবিধে হবে?

আসুন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডাকতে হল লোকটাকে। ঘরের দরজা খুলে বসতেও দিতে হল। বুকের তলায় কেন যে টিপটিপ করছে রমা জানে না।

বাজে ভনিতায় সময় নষ্ট না করে বিমল পাঠক সোজাসুজি বলল, সেদিন আপনাকে আমি আমাদের সঙ্গে হাত মেলাতে বলেছিলাম। শুধু আপনাকে নয়, সকলকেই সকলের স্বার্থে হাত মেলাতে বলেছিলাম। সেটা করলে মালিকের বাছাই করে ছাঁটাই করার মতো সাহস হত না।

মনোভাব গোপন করে রমা চন্দ বলল, আপনি কি জন্যে হাত মেলাতে বলেছিলেন? তারা আপনাকে ছাড়ল কেন?

—তারা ভুল করেছে। ভয় পেয়ে ভুল করেছে। না বুঝে ভুল করেছে। সে ভুল শুধরোবার সময় এখনো আছে। সে-জন্য আপনার সাহায্য সব থেকে বেশি দরকার।

—আমি কি করতে পারি?

—আমি যা করেছি তাই করতে পারেন। ওদের বোঝাতে পারেন। সাহস করে সাহেবকেও আলটিমেটাম দিতে পারেন। মোট কথা ওই অটো হাউস ও-ভাবে চলতে দেওয়া হবে না—আপনি নিজের কোনো ক্ষতির ভয় করবেন না—ক্ষতি আপাতত যদি হয়ও তার সবটুকু পুষিয়ে দেবার দায়িত্ব নিচ্ছি।

রমা চন্দ ফস করে বলে বসল, আপনার ক্ষতি কেউ পুষিয়ে দিচ্ছে মনে হয়?

—হ্যাঁ দিচ্ছে। আপনারও দেবে। পিছনে সঙ্গতির জোর না থাকলে আমি আপনার কাছে এ প্রস্তাব নিয়ে আসতাম না।

ঠাণ্ডা মাথায় রমা চন্দ জিজ্ঞাসা করল, পিছন থেকে এতবড় জোরটা আপনাকে কে দিচ্ছে জানতে পারি?

—তার দরকার নেই। আপনি শুধু আমাকেই বিশ্বাস করতে পারেন। আজ দু'দিন আমি ওখানে নেই বলে আপনার কাছে আমার বিশ্বাসের দাবিও শেষ হয়েছে এটা আমি ভাবি না। ভবিষ্যতেও কোন্ আশায় আছি আমি একটুও আপনার জানা নেই ধরে নিচ্ছি না।

রমা চন্দর কানের কাছটা গরম ঠেকছে। ভয় গিয়ে রাগই হচ্ছে তার। লোকটার ইঙ্গিত অস্পষ্ট নয় একটুও। কিছুকাল আগে হলেও খুব খারাপ লাগত না। বিপরীত বিমুখতায় ভেতরটা চিড়বিড় করে উঠল আজ। বলে উঠল, কি আপনি আশা করেন আমার কাছ থেকে বুঝতে পারছি না। তা ছাড়া বিশ্বাসের কথা যে বলছেন, আপনার তো চুরির দায়ে চাকরি গেছে—সেটাই আপনার বিরুদ্ধে আসল অভিযোগ।

বিমল পাঠক থতমত খেল একটু প্রথম। তারপর চোখের তারায় কুটিল উষ্মা ঝরল যেন এক প্রস্থ। বলল, আপনি রুখে দাঁড়ান, আপনার বিরুদ্ধে ওই রকম অভিযোগ আসবে।

না, রমা চন্দ বিশ্বাস করল না তবু। রাজা আহমেদ নেশা করে, ইয়ারকির ছলে অনেক বাজে কথাও বলে। কিন্তু ও ব্যাপারে ওকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছে। সম্ভব হলে লোকটাকে এখন উঠে যেতে বলতে পারলে বলত। তা পারা গেল না। তার প্রত্যাশার জবাবটাই দিল। বলল, যাক, আপনাদের ব্যাপারে আমি কোনোদিন ছিলাম না, এখনো নেই, আর ক্ষমতা যতদিন আছে নিজের দায়িত্ব নিজেই নিতে পারব।

বিমল পাঠক বলল, ওখানকার ক্ষমতা অন্তত খুব বেশিদিন থাকবে না। আমি আপনার ভালোর জন্যেই বলছি।...এই মালিকের আমি একদিন ডান হাত ছিলাম, এখন আপনাকে ডান হাত ভাবছেন তিনি। আপনি আর কিছু না পারেন, তার মুখের ওপর প্রতিবাদ জানিয়ে চাকরিটা ছুঁড়ে দিয়ে আসতে রাজী হলে আমি আগেই আপনাকে এর থেকে বেশি মাইনের চাকরিতে ঢোকার ব্যবস্থা করে দেবো।

বলে কি লোকটা! রাতারাতি এত ক্ষমতা পেল কোথা থেকে রমা চন্দ ভেবে পেল না।

বিমল পাঠক আবার বলে গেল, আপনার জন্যে আমার দুশ্চিন্তা হয়, ওই মানুষটাকে আপনি চেনেন না। তার মতলব ভালো না। আপনি আমাদের দিকে এলে আমি আপনাকে এমন একজনের কাছে নিয়ে যেতে পারি যিনি আপনাকে সব বলবেন।

কে? কে এমন একজন? রমা চন্দর চোখের সামনে হঠাৎ সুমিত্রা বোসের মুখখানা এসে হাজির হল কেন? না, ওর ভুলই হচ্ছে বোধহয়—এমন একটা বাজে লোকের সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক থাকতে পারে। তেতেই উঠল এবার, বলল, দেখুন বিমল বাবু, আপনি এরপর আমার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নিয়ে মাথা না ঘামালেই খুশি হব। উঠে দাঁড়াল।—আমি ভয়ানক ক্লান্ত এখন।

উঠে দাঁড়াল বিমল পাঠকও। ছোট চোখ জোড়া পলকে ক্রূর হয়ে উঠল। আপনি তাহলে আমার কোনো প্রস্তাবে রাজী নন?

—না, আপনি যা বলেছেন সেটা কোনো প্রস্তাব নয়। আপনি আগে নিজের ভালো করুন, তারপর আমার ভালোর কথা ভাববেন।

—ও...। ব্যঙ্গভরা মুখটা কুৎসিত হয়ে উঠল এবার।—সাহেবের প্রশ্রয় পেয়ে মেজাজ তাহলে খুশি এখন? কিন্তু আমি বলে গেলাম ওই সাহেবের দিন ঘনিয়ে এসেছে, আর প্রাণের দায়ে তখন তোমাকে এই অধমের কাছেই আসতে হবে সেটা তুমি খুব ভালো করে জেনে রেখে দিও রমা দেবী।

এক ঝটকায় ঘর ছেড়ে প্রস্থান করল বিমল পাঠক।

রাগ ঠাণ্ডা হতে দুশ্চিন্তায় ছটফট করতে লাগল রমা চন্দ। একবার ইচ্ছে হল পরামর্শের জন্য আনন্দ চক্রবর্তীর কাছে ছুটে যায়। একটা দুরভিসন্দি আছেই ওদের। কিন্তু আনন্দ চক্রবর্তী বাইরের লোক, তিনি এ সবের বাড়তি গুরুত্ব দেবেন কি লঘু করে দেখবেন কে জানে। তাছাড়া ঠাণ্ডা মাথায় আরো কি ভাবার অবকাশ দরকার।

সন্দেহটা শুভ্রেন্দু নন্দীকেও না জানিয়ে পারেনি। পরদিনই বিমল পাঠকের কথা বলেছে, কারখানার সামনে যে-সব অচেনা মূর্তি দাঁড়িয়ে থাকে তাদের কথাও বলেছে।

শুভ্রেন্দু সামান্য হেসে বলেছেন, রাজার মুখে শুনেছি আমার জন্যে তোমার বিষম ভয়, আর ওই জন্যেই গোঁয়ারটাকে তুমি আমার সঙ্গে লাগিয়ে রেখেছ। বাট আই হেট ফিয়ার মাই ডিয়ার, তুমিও মিথ্যে ভয় পুষো না। বিমল পাঠক ইজ প্লেইং এ লস্ট গেম, তাকে যদি চিনে থাকো ভালো কথা।

অনেকদিন বাদে যেন মানুষটার কোমল মুখ দেখেছিল রমা চন্দ, আর দরদ-ছোঁয়া কথা শুনেছিল।

কিন্তু ইচ্ছে করলেই বা চেষ্টা করলেই ভয় জিনিষটা ছেঁটে দেওয়া যায় না। উল্টে একটা অজ্ঞাত ভয় যেন পেয়েই বসছিল তাকে। মন বলছিল, হবেই কিছু একটা। ভয়ানক কিছুই হবে।

কি কারণে রাজা সেদিন ফ্যাক্টরিতে আসেনি। নেশার ব্যাঘাত ঘটছিল বলে আচ্ছা করে নেশা করে ডুব দিয়েছে কিনা রমা জানে না। পরে খেয়াল হল, প্রায়ই ও কারখানা কামাই করছে আজকাল। অথচ সাহেব এ নিয়ে কিছু বলেন না বা ওর খোঁজও করেন না।

রাত সাড়ে সাতটার পরে কারখানা থেকে বেরুতে গিয়ে শুভ্রেন্দু নন্দী থমকে দাঁড়ালেন। গেটের পাশের শেডের কাছে দাঁড়িয়ে রমা চন্দ।

কি ব্যাপার, বাড়ি যাওনি?

রমার দ্বিধাগ্রস্ত মুখ।—রাজাটা আজও আসেনি সার—কি হল ভাবছিলাম...

আসবে না জানি, এক কাস্টমারের ড্রাইভার অসুস্থ, দিন কয়েকের জন্যে আমিই ওকে তার গাড়ি চালানোর জন্য পাঠিয়েছি।—কিন্তু ও নেই বলে তুমি দাঁড়িয়ে আছ নাকি?

রমা চন্দ জবাব দিয়ে উঠতে পারল না। শুভ্রেন্দু নন্দী বিরক্ত যেন একটু। আবছা অন্ধকার ফুঁড়ে ওর মুখখানা ভালো করে দেখলেন। দাঁড়িয়ে থাকার যথার্থ কারণটা অনুমান করতে চেষ্টা করলেন। অল্প হাসি দেখা গেল মুখে। বুঝলেন, রাজা আসেনি তাই শুভ্রেন্দু নন্দীর জন্যেই দুশ্চিন্তা মেয়েটার, ওই অচেনা লোকগুলোর কেউ যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর।

এসো। গাড়ির সামনের দরজা খুলে দিলেন।

শুভ্রেন্দু নন্দী গাড়ি চালাচ্ছেন। রমা চন্দ চকিতে এদিক-ওদিক তাকাল। কিন্তু অচেনা মুখগুলো আজ দেখা গেল না। গড়ির আওয়াজে অন্ধকারে কোথায় সেঁধিয়ে আছে কিনা কে জানে।

বেশ খানিকটা পথ এগোবার পর শুভ্রেন্দু নন্দীর মুখের হাসি স্পষ্ট হল। গম্ভীর ঠাট্টার সুরে বললেন, বিপদ যদি কিছু হয়ই তুমিও আমাকে রক্ষা করতে পারো ভাবো তাহলে?

আমতা আমতা করে রমা চন্দ বলতে চেষ্টা করল, ঠিক তা না সার, কেবল মনে হচ্ছিল দুজন থাকলে তবু একটু—কি যে বলবে ভেবে পেলো না। লজ্জাও পাচ্ছে। মনে হল মানুষটা হাসছেন আর বেশ মজা পাচ্ছেন।

একটা বড় রেস্তোরাঁর সামনে গাড়ি থামল। ওকে সঙ্গে করে শুভ্রেন্দু নন্দী ভিতরে ঢুকলেন। রাতের পুরো খাবারের অর্ডার দিলেন দুজনার। কারখানার কাজে বেরিয়ে এরকম মুখোমুখি বসে আগেও খেয়েছ। কিন্তু নিরিবিলি কেবিনে বসে আজ হঠাৎ কেমন একটা অস্বস্তি শুরু হল রমা চন্দর।

সারাক্ষণের মধ্যে মানুষটা তিনটে কথাও বললেন না। অথচ খেতে খেতে অনেকবার ওকে লক্ষ্য করেছেন। রমা চন্দর রূপ নেই, বুকের তলায় এই গোছের অস্বস্তির জন্য ও আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

খাওয়া শেষ করে আবার ওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে বেশ স্পিডেই রওনা হলেন শুভ্রেন্দু নন্দী।...কারখানা ছাড়িয়ে খানিকটা আসার পরেই এই মানুষের জন্য অজ্ঞাত ভয়টা কেটে গেছল। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে মুখ ফুটে নিজের বাড়ি ফেরার কথাটা বললেই হত। অথচ কেন যেন বলে উঠতে পারেনি।

ওকে নিয়ে সোজা নিজের বাড়িতে চলে এলেন শুভ্রেন্দু নন্দী। হাতে ধরে দোতলায় উঠে এলেন। বেশ নির্লিপ্ত স্বাভাবিক মুখ। কিন্তু রমা চন্দ ভিতরে ভিতরে ঘামতে শুরু করেছে। হঠাৎ বিমল পাঠকের কথাগুলো মনে পড়ল। সে বলেছিল, মানুষটাকে আপনি চেনেন না। তাঁর মতলব ভালো না। চেনাবার জন্য কার কাছে যেন নিয়েও যেতে চেয়েছিল তাকে।

বড় ঘরটার পাশের সেই ছোট ঘরটাতে এসে হাত ছেড়ে দিলেন। হাতটাও যেন অসাড় রমা চন্দর। অনুচ্চ সুরে বললেন, বোসো। এবারে একটু সংগীত চর্চা হোক।

চৌকির এক কোণে জড়সড় হয়ে বসল রমা চন্দ। শুভ্রেন্দু নন্দী কেস থেকে ভায়লিন বার করলেন। তিনি তখনো বসেননি।

...বাজনার শুরু থেকেই ভিতরে আবার কাঁপনি শুরু হল রমা চন্দর।

কারখানার মালিক খুব ভালো বেহালা বাজান এটা তার শোনা ছিল। আনন্দকাকু বলেছে, রাজা আহমেদ বলেছে। কিন্তু গান-বাজনার সঙ্গে রমা চন্দর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না বলে তেমন আগ্রহ বোধ করেনি কোনোদিন।

...বাজনার শুরুতেই গা ছম-ছম করে উঠল। ছড়ির লম্বা লম্বা টানে ঘরের মধ্যে আচমকা একটা আর্তনাদ মূর্ত হয়ে উঠল। আর তারই মধ্যে যেন থেমে থেমে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলেছে আর একটা ধীর সুরের রেশ। একটা অস্থিরতার আবর্তের মধ্যে যেন স্থিরতার পদযাত্রা।

প্রথমে ঘুরে ঘুরে বাজাচ্ছিলেন, তারপর চৌকিত বসেছেন। রমা চন্দর পাশ ঘেঁষে একেবারে। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়েছেন। পাশের বড় ঘরের আলো খানিকটা অবশ্য এ-ঘরে এসে পড়েছে, কিন্তু রমা চন্দর অস্বস্তিটা আস্তে আস্তে কোথায় তলিয়ে যেতে লাগল নিজেও জানে না। একটা তন্ময়তার মধ্যে ডুবে যেতে লাগল সে।...ডুবেই গেল। আবছা অন্ধকারে অপলক চোখে মানুষটাকে দেখছে খেয়াল নেই।

বাজনা থামল একসময়ে। এক ঘন্টার ব্যবধানে কি এক যুগের ব্যবধানে জানে না। তারপরেও অনুভূতি সচেতন নয়। অভিভূতের মতো বসেই ছিল।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল হঠাৎ।

...ওর কাঁধের ওপর একখানা হাত। আবছা আলোয় মানুষটা পাশে দাঁড়িয়ে।

অপর হাতখানাও অন্য কাঁধে উঠে এলো। আরো একটু কাছে টেনে আনলো তাকে। লম্বা মানুষ, সামান্য ঝুঁকে দেখতে লাগল। নির্মিমেষে দেখছে। একটা তপ্ত নিশ্বাস সোজা তার মুখের ওপর এসে পড়ল।

রমা চন্দ কাঁপছে থরথর করে। ভয়ানক জল তেষ্টা পাচ্ছে তার। আবছা অন্ধকারে তারও দু'চোখ মানুষটার মুখের ওপর উঠে এসেছে। কিন্তু নিস্পন্দ পঙ্গু যেন। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। একটা সর্বনাশের মুহূর্ত বুঝি আসন্ন।

খুব মৃদু অথচ ভরাট একটা কণ্ঠস্বর ওকে যেন আত্মস্থ করে দিল খানিকটা। শুভ্রেন্দু নন্দী বললেন, ইউ হ্যাফ স্টার্টেড লাইকিং মি...দ্যাট্‌স ব্যাড...আই অ্যাম অ্যান্ ওল্‌ড ম্যান। ইউ আর এ জেম, তোমার আলোয় যার ঘর ভরে উঠতে পারে এমন কাউকে বেছে নাও, একবার দুঃখ পেয়েছ, আর দুঃখ ডেকে নিও না। নিজে না পারো আমি আনন্দকে বলে দেবো, হি উইল গেট্ ইওর ম্যান...তোমাদের সামনের পথ আমি সুন্দর করে দেবো, কিছু ভেবো না—জাস্ট গেট ইওর ম্যান অ্যান্ড লিভ এভরিথিং টু মি। রাত হল, চলো তোমাকে এবার পৌঁছে দিয়ে আসি।

আবার গাড়ি ছুটেছে।

রমা চন্দ মুখ বুজে পাশে বসে আছে। ভিতরটা তার কোন জাদু মন্ত্রে অদ্ভুত ভরাট হয়ে গেছে। অথচ আশ্চর্য, কেন যেন আবার কান্নাও পাচ্ছে।

সকালের ভাঁজ করা কাগজটা খুলেই আনন্দ চক্রবর্তী অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন, কি সর্বনাশ! তার পরেই কাগজ ফেলে তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে গলিয়ে গাড়ি বার করার জন্য নিচে নেমে এলেন।

রমা চন্দর খুঁটিয়ে কাগজ পড়ার মতো অত ধৈর্য নেই কোনোদিন। বড় হরফের বড় খবরের মাথাগুলো পড়া হলেই তার কাগজ পড়া শেষ। কিন্তু আজ কাগজখানা খুলেই সেও একটা আর্তনাদ করে লাফিয়ে উঠল। নিজের চোখ দুটোকেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না যেন। সামনের বড় ছবিটা দেখেছে শুধু আর তার ওপরের ক'টা অক্ষর। তারপরেই কাগজ ফেলে পড়ি-মরি করে ছুটেছে।

রাস্তায় লোক ধরে না। সেই ভিড় ঠেলে ঠেলে সামনে এগোতে পারলে নানডি অটো হাউসের কারখানা এলাকা।

বৃত্তাকারের সাইন বোর্ডটা আছে। তার ও-ধারে চোখ পড়া মাত্র দেহের সমস্ত স্নায়ু একসঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কা খাবে একটা।

সামনে কারখানা নয়, কারখানার বিশাল একটা ভস্মীভূত কংকাল। চৌদ্দ আনা দগ্ধ হয়ে গেছে, বাকি দু'আনা হয়নি বলেই যেন আরো বিকট, বীভৎস!

...যেখানে মাস ভাড়ায় লোকের গাড়ি থাকত সেই বিচ্ছিন্ন শেডটা ছাড়া আর সব-কিছু অঙ্গার হয়ে গেছে। অর্থাৎ আগুনের গ্রাসের লক্ষ্য ছিল শুধু ওই কারখানাটা। সেটা সে গ্রাস করেছে।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে শুভ্রেন্দু নন্দী বেশ নিবিষ্ট মনে দৃশ্যটা দেখছেন। তাঁর শান্ত মুখে একটা আঁচড় পড়ছে না।

এমন সময় লক্ষ্য করলেন তাঁর পাশে বোবা মূর্তির মতো আনন্দ চক্রবর্তী দাঁড়িয়ে। আর তাঁর পাশে স্তব্ধ চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে কালো মেয়ে রমা চন্দ। ভিড়ের মধ্যে দু'হাত কোমরে তুলে দাঁড়িয়ে আছে রাজা আহমেদও।

...ওদের সকলের বুকের তলায় কি হচ্ছে সেও যেন দেখার বস্তু। ঘাড় ফিরিয়ে শুভ্রেন্দু নন্দী তাই যেন দেখতে লাগলেন।

এত বড় সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মনের অবস্থা নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য প্রায়। রিক্ত সর্বস্বান্ত হয়ে পথে পথে ঘুরছিলেন যখন, তখন থেকে বিত্ত বৈভব আর ক্ষমতার স্বপ্ন দেখে এসেছেন। এই একটি মাত্র লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে এগিয়েছেন। এরই ওপর জীবনের সুখ শান্তির নির্ভর।

...সেই বিত্ত সেই বৈভব আর সেই ক্ষমতার আসনে বসেছিলেন। অথচ লক্ষ্যকেন্দ্র যেন দূরেই সরে যাচ্ছিল। আজ বিত্ত পুড়েছে, বৈভব পুড়েছে, ক্ষমতা পুড়েছে, কিন্তু একদিনের সেই রিক্ত নিঃস্ব ছেলেটার সঙ্গে আজকের এই হৃতসর্বস্ব মানুষটার কি আশ্চর্য তফাৎ। এই আগুনের সঙ্গে সঙ্গে সেই হাহাকার পুড়েছে, অসহিষ্ণুতা পুড়েছে, দম্ভ পুড়েছে, সুখস্বপ্নের মোহ পুড়েছে। আজ এই সর্বনাশের মুখোমুখি এসে এই প্রথম যেন তিনি নিজের শক্ত দুটো পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। কি এক আত্মিক বিশ্বাসে ভরপুর যেন হঠাৎ তিনি। এই বিশ্বাসের আয়নায় জীবনের অর্থ তাৎপর্য বড় বিচিত্রসুন্দর মনে হচ্ছে তাঁর।

আনন্দবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হল শুভ্রেন্দু নন্দীর। হাসতেও পারেন, কিন্তু এ-সময় এখানে দাঁড়িয়ে হাসলে লোকে পাগল ভাববে। বললেন, আমি শেষ রাতে টেলিফোনে খবরটা পেয়ে এসেছিলাম। দরোয়ান দুটোর কিছু হয়নি রক্ষা...।

আনন্দবাবু সাহিত্যিক। এই শান্ত মুখখানা অদ্ভুত নতুন ঠেকল তাঁর চোখে। দরোয়ানের নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ততা বোধটুকুও। মুখে কথা সরে না। তবু জিজ্ঞাসা করলেন, ফায়ার ইনসিওরেন্স করা ছিল?

শুভ্রেন্দু নন্দী নিরুদ্বিগ্ন মুখে মাথা নাড়লেন, ছিল না। তারপর গম্ভীর কৌতুকের সুরে বললেন, ফায়ারের আবার ইনসিওরেন্স হয় নাকি, না তাতে আগুন নেভে! রমা চন্দর দিকে চোখ গেল। কালো মুখের দু'গাল বেয়ে ধারা নেমেছে। আনন্দবাবুর

দিকে ফিরে শুভ্রেন্দু নন্দী বলে উঠলেন, কি কাণ্ড...তোমার খুকীর কান্না থামাও দেখি আগে।

একটু বাদেই বন্ধুকে ওর পাশে দেখতে পেলেন না আনন্দবাবু। রমাকে নিয়ে সেখান থেকে তাঁর বাড়ি এলেন একসময়। সেখানেও নেই। দুপুরে বিকেলে রাতে টেলিফোন করলেন, কেউ ধরল না, টেলিফোন বেজেই গেল।

গলদঘর্ম হয়েও ছ'সাত দিনের মধ্যে আর ধরা গেল না। যেন হাওয়ায় মিশে গেছে লোকটা। তারপর মাত্র গত পরশু সন্ধ্যায় নিজেই টেলিফোন পেলেন, একবার এসো, খুব দরকারী কথা আছে তোমার সঙ্গে।

আনন্দবাবু ছুটে গেলেন। আরো অবাক, লোকটা বেশ খোশমেজাজে আছে। জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় ছিলে এতদিন?

আমার সেই ভিখিরি গুরুর কাছে। তাকে নিয়ে একটা ছোট্ট হোটেলে ক'টা দিন বেশ কাটালাম হে—ওখানে থাকলেই তো তোমাদের জ্বালাতনে অস্থির হতে হত।...বুড়োর চোখে ছানি পড়েছে, হাসপাতালে ভর্তি করে সব ব্যবস্থা করে দিয়ে তবে ছুটি।...অবশ্য এর মধ্যে এদিকেরও কিছু কাজ সারতে হয়েছে।

আনন্দ চক্রবর্তী হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

শোনো, আমি এবারে একটু বেরুব, তার আগে তোমাকে গোটাকতক কাজের ভার দেবো।

খট করে কানে লাগল আনন্দবাবুর।—বেরুবে মানে?

মানে বেরিয়ে পড়ব।

ক'দিনের জন্য?

তা কি করে বলব?

কবে বেরুবে?

ঠিক করিনি।

কোথায় যাবে?

শুভ্রেন্দু নন্দী হাসতে লাগলেন। এই মুখে এমন হাসিও বুঝি আনন্দবাবু আর দেখেন নি। জবাব পেলেন, সেটাও অনিশ্চিত এখন পর্যন্ত।

ঈষৎ রাগত সুরেই আনন্দবাবু বলে উঠলেন, দেখ, পাগলামো কোরো না—তুমি শক্ত হয়ে দাঁড়ালেই আবার সবই ডবল হয়ে ফিরে আসবে।

শুভ্রেন্দু নন্দী হাসছেন মৃদু মৃদু। বললেন, ডবল ছেড়ে কতগুণ হয়ে ফিরে এসেছে জানো না বন্ধু।...যাক, কাজের কথা শোনো। এই কাগজ-পত্রগুলোর সাক্ষীর জায়গায় তুমি সই করে রমাকে আর রাজা আহমেদকে দেবে। ভাড়ার গ্যারাজটা ঠিক আছে, ওর থেকে মাসে যা আসবে ওরা দু'জন আধা-আধি ভাগ করে নেবে। ওই সমস্ত জমি আমার বিশ বছরের লিজ নেওয়া আছে, ইচ্ছে করলে ওরা দু'জনে সেখানে ছোটখাট একটা কারখানাও ফেঁদে বসতে পারে।

...আর এই ড্রাফটটা রমাকে দেবে, আর তুমি ওর একটা খুব ভালো বিয়ের ব্যবস্থা করবে।

আনন্দ চক্রবর্তী নির্বাক। তাঁর সামনে রমার নামে বিশ হাজার টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ একটা।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আনন্দবাবু জিজ্ঞসা করলেন, তুমি এসব কাণ্ড করছ কেন...এর পরেও আবার পোলিটিক্যাল হামলা কিছু হতে পারে ভাবছ—তাই সরে যেতে চাইছ?

শুভ্রেন্দু নন্দী আকাশ থেকে পড়লেন যেন।—পোলিটিক্যাল। যা ঘটেছে তার মধ্যে রাজনৈতিক হামলার নামগন্ধ আছে ভাবছ নাকি তোমরা সব?

নেই? অবাক আনন্দ চক্রবর্তীও।

একটুও না।

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শুভ্রেন্দু নন্দী ছোট একটা শুকনো নিশ্বাস ফেলে অনেকটা যেন নিজের মনেই বললেন, সুমিত্রা আমাকে ছেড়েও ছাড়তে পারল না, আশ্চর্য। আমাকে না পাওয়ার বিকৃত রাগে আর যন্ত্রণায় বিমল পাঠকের মতো অমন ভালো মিকানিকটাকেও নষ্ট করে ফেলল...।

আনন্দ চক্রবর্তী স্তব্ধ বিমূঢ়ের মতো বসে।

সমস্ত দিন কি এক অজ্ঞাত আশংকায় ছটফট করে আনন্দ চক্রবর্তী পরদিন অর্থাৎ গত সন্ধ্যায়ও ছুটে এসেছেন আবার। বাড়িটার সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ। বাইরে তালা ঝুলছে। শুভ্রেন্দু নন্দী চলে গেছেন।

সেখান থেকে কি ভেবে আনন্দ চক্রবর্তী সোজা চলে এসেছেন সুমিত্রা বোসের ফ্ল্যাটে। তিনি সামনের ওই বাড়িতে থাকেন না, অন্যত্র থাকেন। সেই ফ্ল্যাটের মোটা ভাড়াও কাপুর দিয়ে থাকে।

নিঃশব্দে দোতলায় উঠে এলেন।

...তাঁকে দেখে আনন্দ চক্রবর্তী চমকেই উঠলেন। এই ক'দিনের মধ্যে যেন এক চেনা রূপসীর প্রেত দেখলেন তিনি। বিবর্ণ মুখ, চোখের কোলে কালি, অবিন্যস্ত চুলের বোঝা—পরনের শাড়িটাও তেমন পরিষ্কার নয়। মেঝের এক কোণে মূর্তির মতো বসে আছেন।

আনন্দবাবুকে দেখে হঠাৎ যেন অতি আপনার জন কাউকে পেলেন। বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন একেবারে। উত্তেজিত বিকৃত কণ্ঠে বলে উঠলেন, এ-রকম হবে আমি জানতাম না, আমি কাউকে এ-কাজ করতে বলিনি, বিমল পাঠককে আপনারা ধরুন, তাকে পুলিসে দিন—আমি সাক্ষী দেবো।

আনন্দ চক্রবর্তী চেয়ে আছেন। দেখছেন। সুমিত্রা কাঁপছেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, এ কাজ করতে বলেননি, কিন্তু কি বলেছিলেন?...শুভ্রেন্দু নন্দীর সব শান্তি কেড়ে নিতে?

নিমেষে অরাক রক্তশূন্য বিবর্ণ মুখ সুমিত্রার।

খুব ধীর স্বরে আনন্দ চক্রবর্তী আবার বললেন, তার বদলে ঢের ঢের বড় শান্তি নিয়ে চলে গেছে লোকটা।...আর সকলকে কত আশীর্বাদ করে গেছে জানেন না...বোধহয় আপনাকেও।

দাঁড়িয়ে থাকা আর সম্ভব হল না, পিছনের দেয়াল হিঁচড়ে আবার মাটিতে বসে পড়লেন সুমিত্রা বোস।

বাড়ি ফিরে আনন্দ চক্রবর্তী শুনলেন রাজা আহমেদ একটা চিঠি আর একটা প্যাকেট রেখে গেছে।

লেখক আনন্দ চক্রবর্তী এবারে কিছু লিখতে পারেন। সেটা কোনো সাধারণ মানুষের কথা হবে কি অসাধারণ মানুষের, তিনি জানেন না। বন্ধুর চিঠির জবাব তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন, এখনো দেখতে পাচ্ছেন। সুমিত্রা বোসের বুকের ভিতরটা জ্বলে জ্বলে কোনোদিন ছাই হবে না, অনির্বাণ শিখায় শুধু জ্বলবেই।

এই মুহূর্তে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রাজা আহমেদ। সামনের দিকে চেয়ে সে অস্তিত্বের একটা অগ্নিদগ্ধ কংকাল দেখছে না, সে এইখানেই নতুন কারখানার একটা স্পষ্ট স্বপ্ন দেখছে।

কলো মেয়ে রমা চন্দর কালো চোখের গভীর থেকে আশার আলো উপচে উঠছে। সে ভাবছে, দুনিয়াটা এমন কি বড়, কত আর বড়, একটা হারানো মানুষকে খুঁজে বার করে আবার কাছে টেনে আনা যাবে—নিশ্চয় যাবে—যাবেই।

...সবই জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায় কিনা, চিঠিতে সেই সন্ধানটুকু শুভ্রেন্দু নন্দী রেখে যেতে অনুরোধ করেছিলেন।

এই সন্ধান আনন্দ চক্রবর্তী এখন রেখে যেতে পারেন।

# বাসকশয়ন

ডাঃ অমল চক্রবর্তী

শ্রদ্ধাভাজনেষু

ফোমের গদির ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে শুয়েছিলেন জয়ন্ত বোস। তাঁর চোখের সামনে একটা খোলা খবরের কাগজ। বাঁ পাশে সানমাইকা টপ-এর চকচকে ছোট টেবিলে আরো খানকতক ইংরেজি-বাংলা খবরের কাগজ পড়ে আছে। সেগুলোর পাশে সৌখিন একটা বড় অ্যাশপট। ডান দিকের ছোট সেন্টার টেবিলে চায়ের ট্রে। আধঘণ্টা আগে মনোহর মাহাতো পেয়ালায় চা ঢেলে দিয়ে গেছে। লেবু চা। সাহেবের দুধ-টুধ চলে না। সকাল থেকে বেলা দশটা এগারোটার মধ্যে বার তিনেক এই লেবু চা খেয়ে অভ্যেস।

মনোহর দূর থেকে লক্ষ্য করছে সেই চা-ও প্রায় তেমনিই পড়ে আছে। বড় জোর দু-তিন চুমুক খাওয়া হয়েছে। সাহেবের মুখ খোলা খবরের কাগজের আড়ালে। পায়ে পায়ে মনোহর মাহাতো সাহেবের মাথার দিকে চলে এলো। এদিক থেকে মুখ দেখা যাচ্ছে না। মিনিটখানেক সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে যা বোঝার ঠিকই বুঝে নিল। সাহেব চা খাচ্ছেন না। চুরুট টানছেন না। এমন কি সামনে ধরা ওই খবরের কাগজটাও পড়ছেন না।

পায়ে পায়ে আবার ডান দিকেই এসে দাঁড়াল সে। একটু ঝুঁকে ট্রে-টা হাতে তুলে নিতে নিতে অনেকটা নিজের মনেই বলল, চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, বদলে দিই...

সাহেবের মুখের সামনে থেকে খবরেব কাগজ সরে গেল। আড়মোড়া ভেঙে একটু সোজা হয়ে বসে ওর দিকে তাকালেন। সিগারটা মুখ থেকে নামিয়ে সামনের দিকটা দেখে নিলেন। নিভে আছে। পাশের অ্যাশপটের ওপর ওটা রেখে তার দিকেই ফিরলেন আবার। মোটা ফ্রেমের চশমা। সামনের দিকটা সোনার। পুরু কাচের ওধারে চোখ দুটো ছোট দেখায় একটু। কিন্তু আসলে ছোট নয়। ওই দুটো চোখ এখন চিকচিক করছে। যেন খুব হাল্কা একটু হাসির ছোঁয়া লেগে আছে। সাহেবের মতো এমন ঝকঝকে একজোড়া চোখ মনোহর মাহাতো আর দেখেনি। কারো দিকে তাকালে ভিতরসুদ্ধু দেখে নিতে পারেন যেন। অথচ আশ্চর্য, অমন তকতকে চোখের ওপর চোখ রাখলে সাহেবের মনের হদিস মেলা দূরে থাক, মনোহর মাহাতো তলকূল খুঁজে পায় না। অবশ্য যত পেয়ারের মানুষই হোক বেশিক্ষণ তার চোখের ওপর চোখ রাখা শক্ত। আপনা থেকেই নেমে আসে। সাহেব সামনে এসে দাঁড়ালে বা কোনো কথা বললে সোজা তাঁর দিকে ফিরে তাকনোটা নিয়ম। তা না হলে সাহেব তেতে ওঠেন। সেই নিয়ম রক্ষার তাগিদেই মনোহর মাহাতোর খুদে চোখ জোড়া এখন সাহেবের মুখের ওপর।

চায়ের ট্রে ওর হাতে। খোলা কাগজ কেটে টেবিলটার ওপর রেখে জয়ন্ত বোস বললেন, আর চায়ের দরকার নেই। তারপরেই যে প্রশ্নটা করে বসলেন তার জন্য বেচারা একটুও প্রস্তুত ছিল না।

—এবারে তোর ভোট আছে?

এক প্রশ্ন দু'বার করতে হয় না। মনোহর ঠিকই শুনেছে। কিন্তু কি জবাব দেবে হঠাৎ ভেবে পেল না। ঢোক গিলে সামনের খোলা খবরের কাগজটার দিকে তাকাল একবার। বিজ্ঞাপনের পাতা। বাংলা তো পারেই, মোটামুটি ইংরেজিও পড়তে পারে মনোহর মাহাতো। সাহেব ব্যবসায়ী মানুষ, খবরের থেকে বিজ্ঞাপন বেশি পড়েন। বিজ্ঞাপন পড়তে পড়তে হঠাৎ ভোটের ব্যাপার মাথায় এলো কেন তাঁর বুঝে উঠল না। চারদিকে ভোট ভোট রব উঠেছে একটা। ভোটাভুটি নিয়ে কাগজে কি-সব লেখা হচ্ছে তাও

দেখেছে। কিন্তু হিজিবিজি ব্যাপার তার মাথায় ঢোকে না। তাও এখানকার নয়, দিল্লির ব্যাপার। সেখানে লোকসভা না কি আছে, সেখানে কারা বসবে তাই নিয়ে এখানকার লোকের মাথা গরম কেন তাও তার কাছে স্পষ্ট নয়।

সাহেব এ-রকম জিজ্ঞাসা করে বসবেন জানলে ব্যাপারখানা কি একটু দেখে শুনে রাখত। ভোট আছে কি নেই সে নিজেই জানে না। কিন্তু সাহেবের কাছে জানে না বলাটা দস্তুর নয়। বুদ্ধি খাটিয়ে জবাব দিল, আছে বোধহয় সাব, গেলবারে তো ছিল, তার আগের বারেও ছিল...।

ছিল ঠিকই, কোথাকার ভোট কিসের ভোট অতশত জানে না। ভোট যখন একই ব্যাপার হবে হয়তো।

কিন্তু বেচারা এটুকুতেও রেহাই পেল না। সাহেবের চাউনিতে কি রকম মজার ছোঁয়া লেগে আছে যেন। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কাকে ভোট দিচ্ছিস?

মেজাজ ভালো থাকলে সাহেব তার সঙ্গে বেশ খোসগল্প করেন, এটা ওর বড় রকমের গর্বের ব্যাপার। এখানে প্রশ্রয় মেলে বলেই বাড়ির আর সব চাকর বেয়ারা বা খানসামার কাছে উঁচু মাথা ওর। কিন্তু এ আবার সাহেবের কোন দিশি রসিকতা বুঝে উঠল না। অন্তত তিন বারের ভোটের কথা মনে আছে মনোহরের। ভোটের দিনে সাহেবের তলব পড়েছে। হাতে কতগুলো নকসা-আঁকা একটা কাগজ দিয়ে বলেছেন, ভোট দিয়ে আয়গে যা—

কোন নকসার ওপর ভোটের ছাপ মারতে হবে সাহেব নিজেই বলে দিয়েছেন। দু'বার জোড়া বলদের ওপর ভোটের ছাপ মেরে বাক্সে ফেলে দিতে বলেছেন, গেলবারে বলেছিলেন গোরু-বাছুরের ওপর ছাপ দিতে। জোড়া বলদ বা গাই-বাছুর কোন দলের চিহ্ন সেটা অবশ্য মনোহর ভালোই জানে। জোড়া বলদ যাদের গাই-বাছুরও তাদেরই। একটা বাতিল করে আর একটা ধরা হয়েছে।

ঠোঁটের ডগায় জবাবটা এসেই গেছল মনোহর মাহাতোর। বলতে যাচ্ছিল, গোরু-বাছুরের দলকে। বলল না। আজ সাতাশ-আঠাশ বছর হয়ে গেল সাহেবকে দেখছে। তার মতে এমন বুদ্ধিমান মানুষ এই দুনিয়ায় আর দুটি নেই। তাঁরই সঙ্গে এতকাল ঘর করেছে মনোহর, তাকেই বা নিরেট বলে কে? মাথায় কোনো ব্যাপার ঘুরপাক না খেলে হঠাৎ এ-রকম শুধোন কেন সাহেব? ফস্ করে জবাব দিয়ে বোকা বনতে রাজী নয় মনোহর। তাঁর হাসি-হাসি মুখের দিকে চেয়ে সবিনয়ে বলল, আপনি যেমন হুকুম করবেন।

হুকুম কিছু করলেন না। জয়ন্ত বোস খোলা কাগজটা হাতে তুলে নিলেন আবার। এবারে ভালো করে তাঁকে আর একটু দেখে নেবার সুযোগ পেল মনোহর। কোনো একটা বিজ্ঞাপনের ওপর চোখ। সেই চোখে এখনো মজার ছোঁয়া লেগে আছে। ঠোঁটের ফাঁকেও।

ট্রে-হাতে মনোহর চলে গেল। সাহেবের এইরকম হাব-ভাব দেখলেই ওরও কৌতূহল উপচে ওঠে। তাঁর ভিতরটা আঁতি-পাতি করে দেখে নিতে ইচ্ছে করে। সাহেব ওর কাছে এক বিশাল রহস্যময় মানুষ। ওকে ভালোবাসেন। আর এত বিশ্বাস বোধহয় কাউকে করেন না। অথচ এতকাল, এই সাতাশ-আটাশ বছর ধরে এত কাছে তাঁকে দেখার পরেও এই মানুষ ওর জানা-বোঝার বাইরেই থেকে গেলেন। এ-জন্যে ওর খেদ

কম নয়। নিজের মগজের ধারের অভাব ভাবে। সর্বক্ষণ সজাগ থেকে আর সম্ভব-অসম্ভব কত রকম চিন্তা করে মগজের ধার বাড়ানোর চেষ্টা করেছে, করছে। মুখের দিকে তাকালে সাহেবের কি দরকার বুঝে নিতে পারে। পছন্দ-অপছন্দ বুঝে নিতে পারে। খুশি-অখুশির মাত্রা বিচার করতে পারে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। এটুকুর ওধারে আর যেন কিছুতে চোখ চলে না।

এর বেশি আর কিছুই জানতে পারে না, বুঝতে পারে না। অথচ তার বদ্ধ ধারণা অনেক জানার আছে, অনেক বোঝার আছে। ওর ভোঁতা বুদ্ধি বলেই কিছু জানতেও পারছে না, বুঝতেও পারছে না।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই মনোহর টেলিফোন হাতে ফিরল আবার। খুব স্বস্তি বোধ করছে না। কার টেলিফোন জানে। ওপর থেকে নিচে টেলিফোন। তিন তলা থেকে দোতলায়।

সাহেবের চোখের সামনে তখনো খবরের কাগজ। পাশের ছোট টেবিলে টেলিফোনটা একটু শব্দ করে রাখল মনোহর মাহাতো। প্লাগটা সুইচে ঠেলে দিল। রিসিভারটা তুলে সঙের মতো দাঁড়িয়ে রইল একটু। তারপরে ভয়ে ভয়েই আধভাঙা আওয়াজ বার করল গলা দিয়ে।

—বউদিমণি...

জয়ন্ত বোস খোলা কাগজটা কোলের ওপর ফেলে হাত বাড়িয়ে রিসিভার নিলেন। ব্যস্ত মুখে মনোহর মাহাতো এই ঢাকা বারান্দার নিচের চেয়ার-টেবিলগুলো শব্দ না করে গোছগাছ করতে লাগল। সাহেবের ভারী গলা কানে এলো।

—হ্যাঁ...বলো।

—এসো...

—না, কিছু ব্যস্ত না, এসো।

তিন বারই সাহেবের গলা। ওদিক থেকে বউদিমণি কি বললেন সেটা সহজ অনুমান-সাপেক্ষ। মনোহর মাহাতোর পায়ের তলায় থাবা নেই বেড়ালের মতো। কিন্তু দ্রুত চলা ফেরা করলেও এতটুকু শব্দ হবে না। সাহেব রিসিভার নামানোর আগেই চোখের পলকে সরে গেল সেখান থেকে। সোজা সিঁড়ির সামনে।

দোতলা আর তিন তলার সিঁড়ির সামনে টানা কোলাপসিবল গেট। দুটো সিঁড়ির মুখ-জোড়া মস্ত একখানা। সেটা গুটিয়ে দিলে এক তলা থেকে তিন তলা পর্যন্ত অবারিত। আর টেনে দিলে গোটা বাড়ি থেকে এই দোতলাটাই শুধু আলাদা হয়ে গেল। সিঁড়ি থেকে আড়াই হাত মতো জায়গা ছেড়ে তিন বছর আগে এই গেটটা বসানো হয়েছে। এটা বন্ধ থাকলেও এক তলা থেকে দোতলায় উঠে বাঁক নিয়ে গেটের ওপাশের জায়গাটুকু পেরিয়ে আবার তিন তলায় উঠে যাওয়া যায়। তিন তলা থেকে এক তলায় নেমে যেতেও কোনো অসুবিধে নেই। গেট বন্ধ থাকলে শুধু দোতলার এলাকায় কারো পা ফেলার উপায় নেই। এমন কি, তিন তলায় সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে এক তলা থেকে কে দোতলায় উঠে এলো বা দোতলা থেকে কে এক তলায় নেমে গেল তাও দেখার বা বোঝার জো নেই। দোতলা থেকে তিন তলার সিঁড়ির রেলিং-এর ওপর থেকে আগাগোড়া শৌখিন পার্টিশন বসানো হয়েছে।

তিন বছর আগে সাহেবের ফরমাশ মতো বাইরের কনট্রাক্টর এসে এই কোলাপসিব্‌ল গেট আর সিঁড়ির রেলিং-এর ওপর পার্টিশন বসিয়ে দিয়ে গেছে। মনোহর তখনো হাঁ করে চেয়ে চেয়ে ব্যাপারখানা দেখেছে। আর মাঝে মাঝে বউদিমণির মুখখানা দেখেছে। কেন এ-সব হচ্ছে কিছুই মাথায় ঢোকেনি। বউদিমণিকে দেখে মনে হয়েছে, কিছু একটা ঘটতে চলেছে। অথবা ঘটেই গেছে। তাঁকে জিগ্যেস করা না করা সমান। জবাব দেবেন না। মুখের দিকে চুপচাপ খানিক চেয়ে থেকে সরে যাবেন। সেটুকুই তিরস্কারের মতো।

তাছাড়া এ-বাড়িতে কাউকে কিছু জিগ্যেস-টিগ্যেস করা দস্তুর নয়। হুকুম এলে তামিল করতে হবে। তা না হলে শুধু দেখে যেতে হবে। তার থেকে কিছু বোঝা গেল তো গেল। বাড়ির অন্য চাকর বেয়ারাগুলোর অবশ্য অত ধৈর্য নেই। তাদের মুরুব্বি মনোহর দাদা। এ-সব কেন হচ্ছে তারা তাকে জিজ্ঞাসা করেছে। জানলে বলে দিত। জানে না যে এও ওদের চোখে খুব সম্মানের ব্যাপার নয়। ফলে বাড়ির যেমন ধাত তারও সেই রকমই আচরণ। ওদের কৌতূহলের জবাবে ছোট গোল গোল চোখ দুটো পাকিয়ে চেয়ে ছিল শুধু। তাইতেই ওরা বুঝে নিয়েছে সব-কিছু জানার আগ্রহ অবাধ্যতার সামিল।

সমস্ত বাড়ি থেকে এই দোতলাটা সুরক্ষিত করার প্রয়োজনে কোলাপসিবল গেট আর রেলিং-এর ওপর পার্টিশন বসানো হচ্ছে এমন সম্ভাবনাটা কেন যেন কারো মনে আসেনি। সামনে আর পাশে দু-রাস্তার মুখে এই বিশাল বাড়ি। সামনের রাস্তাটা বড়, পাশের রাস্তা অপেক্ষাকৃত ছোট। পাশের রাস্তা ধরে পিছনের দিকে এলে এ-বাড়িতে ঢোকার দরজা। সামনের এক তলায় ঢোকারও বিশাল ফটক আছে। কিন্তু সেটা এ-বাড়ির বাসিন্দাদের চলা-ফেরার এখতিয়ারের মধ্যে নয়। সমস্ত এক তলার পাঁচ ভাগের চার ভাগ জুড়ে ব্যাংক। কোনো মস্ত ব্যাংকের জমজমাট ব্র্যাঞ্চ এটা। এই বাড়ি চোখের সামনে হতে দেখেছে মনোহর মাহাতো। ওই ব্যাংকই বাড়ি তুলে দিয়েছে। এক তলাটা তারা নিজেদের দরকার মতো করে নিয়ে সাজিয়েছে। এমন ঝকঝকে ব্যাংক এ-তল্লাটে কম আছে। দোতলা তিন তলা সাহেবের পছন্দমতো হয়েছে। এক তলায় পিছন দিকের দরজা ঘেঁষা লম্বাটে হল আর তার পাশের একটা ছোট ঘর শুধু সাহেবের দখলে। দোতলা, তিন তলার সবটাই।

জমি অনেক আগের কেনা। বাড়িটা হয়েছে বছর সাত-আট আগে। ওই এক তলার জন্যে ব্যাংক থেকে ভাড়া আসে মাসে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা করে। বাড়ি তুলতে ব্যাংক যে-টাকা খরচ করেছিল তা ওই ভাড়া থেকেই সুদে আসলে শোধ হয়ে গেছে। মাসের শেষে থোকে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকাই এখন সাহেবের নামে জমা পড়ে।

এই বড় লোকের এলাকায় চুরি ডাকাতি রাহাজানির ঘটনা বড় একটা শোনা যায়নি। ব্যাংকের দরজায় দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই বন্দুক হাতে প্রহরী মোতায়েন। তাছাড়া ও-দিক থেকে এ-দিকের দোতলা বা তিন তলায় ওঠার কোনো রাস্তাই নেই। ঢুকতে হলে এক তলার এই পাশের রাস্তার দরজা। সেখানে তো বাড়ি তৈরির সময়েই কোলাপসিব্‌ল গেট বসানো হয়েছে। সেই গেট আর দরজা বন্ধ করলে এক তলা দিয়ে একটা মাছিও ভিতরে ঢুকতে পারবে কিনা সন্দেহ। তাই দোতলায় আবার এ-রকম একটা কোলাপসিব্‌ল বসানো হচ্ছে দেখে অন্য চাকর বেয়ারা ছেড়ে মনোহর মাহাতো নিজেও

কম অবাক হয়নি। এক তলার হল্‌-ঘরে চাকর বেয়ারারা থাকে, পাশের ছোট ঘরে ড্রাইভার দুটো। এদের সকলের চোখ এড়িয়ে বাড়িতে এমন কে ঢুকতে পারে যার জন্য দোতলায় এই ব্যবস্থা দরকার?

বিস্ময়ের আরো একটু কারণ, এর মাত্র দিন কতক আগে ছোট ছেলে নিয়ে বউদিমণি তিন তলায় উঠে গেছেন। কোনোরকম ঝগড়াঝাঁটির ব্যাপার হয়নি। এতটুকু মন কষাকষির আঁচও কেউ পায়নি। তার মধ্যে অমন নিঃশব্দে বউদিমণিকে তিন তলায় উঠে যেতে দেখে সকলেই ভিতরে ভিতরে কিছুটা সচকিত। এই ওঠাটা যে পাকাপাকি ব্যাপার তাও সকলের মনে হয়েছে। কারণ, এর মাত্র দিন কয়েক আগে সাহেবের হুকুমেই দোতলার গ্যাস প্ল্যান্ট তিন তলা পর্যন্ত টেনে দেওয়া হয়েছে, আর তিন তলার বাথরুমগুলোতেও ইলেকট্রিকে গরম-ঠাণ্ডা জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ বউদিমণির হেঁসেলসুদ্ধু আলাদা হয়ে গেছে। অবশ্য সাহেব দিনে বরাবরই বাইরে লাঞ্চ করে থাকেন, আর রাতেও হামেশাই বাইরে ডিনার-টিনারের ব্যবস্থা থাকে। তবু ব্রেকফাস্টের সময় বা ছুটির দিনে ছোট ছেলেকে নিয়ে সাহেব আর বউদিমণি একসঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া সারতেন। তাঁদের বড় ছেলে থাকে দেরাদুনে, সেখানকার মিলিটারি কলেজে না কোথায় পড়ে। এ ছাড়া মাঝে মাঝে বাড়িতেও লাঞ্চ বা ডিনারের পার্টি দিতেন সাহেব। কারণ তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব অনেক সময় বাড়িতেই খেতে চাইতেন।

জিভের স্বাদ-জ্ঞান আছে যার সে-ই চাইবে। সাহেব যদি কায়া, মনোহর মাহাতো তার ছায়া। ফলে এই সাহেবের দৌলতে নামজাদা হোটেলের খাওয়াও তার বরাতে কম জোটে নি। কিন্তু বউদিমণির হাতের রান্নার সঙ্গে কোনো কিছুর তুলনা হয় না। দিশি বিলিতি চায়নিজ ফ্রেঞ্চ—কত রকমের যে জানেন ঠিক নেই। এ-সব জানা এমনি হয়নি। দস্তুরমতো স্কুলে গিয়ে হাতে-কলমে শিখে শিখে এতসব রপ্ত করেছেন। কলকাতায় যে রকমারি রান্না শেখানোর স্কুল আছে, আর তার জন্য ছাপার হরফের নানারকম বই আছে, তাও মনোহরের জানা ছিল না। দেখে শুনে অবাক লাগত তার, মজাও লাগত। নানা রকমের মাছ মাংস আর রান্নার যাবতীয় কাঁচা জিনিসপত্র নিয়ে প্রায়ই বউদিমণি কোথায় চলে যান, গোড়ায় গোড়ায় ঠাওর করতে পারত না। ফিরতেন যখন, হাঁ করে দেখত কাঁচা আর কিছু নেই, সব রান্না করা। পরে রূপার মুখ থেকে ব্যাপারখানা শুনেছিল সে। ও যেমন সাহেবের খাস লোক, রূপাও প্রায় তেমনি বউদিমণির খাস তাঁবের মেয়ে। মনোহরের বিবেচনায় পাজির পা-ঝাড়া একটা। যাক, রূপাই বলেছিল দিদিমণি ও-সব নিয়ে রান্নার স্কুলে রান্না শিখতে যান। অনেক টাকা দিতে হয় তার জন্য, বই-পত্র পড়তে হয়।

বউদিমণিকে কোনোদিনই খুব একটা চালাক মেয়ে ভাবত না মনোহর মাহাতো। আজও ভাবে না। কিন্তু তাঁর কতগুলো সহজ বিবেচনা আছে, সেটা অস্বীকার করা যায় না। স্কুল থেকে রান্না করা জিনিসপত্র এনে প্রথমেই সাহেবের ডিশে তুলে দিতেন না। সে-সবের ভাগ পেত রূপা মনোহর, বাড়ির অন্য খানসামা চাকর বেয়ারারাও। বউদিমণি নিজেও খেতেন আর ছোট ছেলে বাসুবাবুর পাতেও দিতেন। এক-একটা রান্নায় দিনকতক ধরে দস্তুরমতো হাত পাকাবার পর তবে একদিন সাহেবের ডিশে ধরে দিতেন।

সাহেব কোনো ব্যাপারে খুব একটা উচ্ছ্বাস দেখাবার মানুষ নন। নতুন রান্না খেয়ে

কেমন লাগত, সেটা তাঁর মুখ দেখে বুঝে নিতে হত। আর বউদিমণি ছেড়ে মনোহরেরও বুঝে নিতে অসুবিধে হত না। খেতে খেতে সাহেব মুখ তুলে বড়জোর বলতেন, এটা আবার কবে শিখলে?

বউদিমণি জবাব বড় দিতেন না, হালকা করে মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন শুধু।

তা বাড়িতে লাঞ্চ বা ডিনার পার্টি থাকলে বউদিমণি একলা হাতেই প্রায় সব করতেন। খানসামাটা উজবুকের মতো দাঁড়িয়ে থাকত শুধু। মাঝে মাঝে টুকটাক হুকুম তামিল করত। ফাঁক পেলেই মনোহর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখত কি হচ্ছে না হচ্ছে। তখনই বউদিমণিকে সব থেকে ভালো লাগত। মনে হত তাঁর যেন দু'খানা নয়, দশখানা হাত।

সাহেবের অন্তরঙ্গজনেরা নতুন নতুন খাবারের লোভে হোটেল ছেড়ে অনেক সময় বাড়িতে খেতে চাইত। কোনো গণ্যমান্য অতিথিকে বিশেষ আপ্যায়নের দরকার হলেও, সাহেব সময় সময় তাঁকে বাড়িতে খেতে ডাকতেন। বউদিমণিকে শুধু বলতেন, অমুক লোক খাবেন, একটু দেখো।

ওই থেকেই যা বোঝবার বউদিমণি বুঝে নিতেন। আর বেশি বলার দরকার হত না। আর বন্ধুবান্ধব এলে তো খাবার টেবিলে বেশ হৈ-চৈ পড়ে যেত। অবশ্য টেবিলে বসার আগেই কিছু বাড়তি খুশির রসদ পেটে চালান যেত তাঁদের। হরেক রকমের বিলিতি হুইস্কির বোতল একটা স্পেশাল আলমারিতে সাজানোই থাকে, যে যা খেতে চায় ঘরে মজুত। হুকুমমতো এ-জিনিস সার্ভ করার ভারও মনোহরের ওপর। একমাত্র তার সাহেবকেই সে কক্ষনো বেশি খেতে দেখেনি। বেশি কেন, এড়াতে পারলে খানই না বড়। সাহেবের ওকে বলাই আছে। অন্য সকলকে যখন বড় একটা করে দেবে, সাহেবের তখন ছোট একটা। সোডা মিশিয়ে নিয়ে গেলে কেউ চট করে ধরতেও পারেন না। অন্য সকলের বড় তিন-চারটে করে শেষ হয়ে গেলেও সাহেব সেই ছোট একটা নিয়েই বসে থাকেন। বেশি পীড়াপীড়ি করলে বড়জোর আর একটা ছোট আসে তাঁর জন্য। তাও শেষ পর্যন্ত শেষ করেন না। অজুহাত দেখান, গ্যাসট্রিক ট্রাবল্ আছে, ও-সব বেশি চলবে না। কিন্তু এই সাতাশ-আঠাশ বছরে মনোহর কক্ষনো সাহেবের পেটের কোনো গোলযোগ দেখেছে মনে পড়ে না।

সাহেব ছাড়া বাদবাকি সকলেই রং-ধরা মেজাজ নিয়ে খাবার টেবিলে এসে বসত। ফলে খোশ-গল্প যখন শুরু হত, চাকর-বেয়ারা খানসামা সামনে কে আছে, না আছে অত খেয়াল থাকত না তাঁদের। পঞ্চমুখে বউদিমণির রান্নার তারিফ করতেন তাঁরা। একবার সেই পাজামা সাহেব তো বলেই বসলেন, বউদির রান্না খেলে মনে হয় স্বয়ং দ্রৌপদী বসে আছেন আপনার ঘরে।

দীপেন গুপ্তকে পাজামা সাহেব বলত মনোহর। যেমন আসরই হোক, পাজামা পাঞ্জাবি ছাড়া আর কিছু তাঁকে পরতে দেখেনি কখনো। সাহেবের চিঠি নিয়ে দুই-একবার তাঁর আপিসে আর বাড়িতেও গেছে। সব জায়গায় ওই সাদা পাজামা আর সাদা পাঞ্জাবি।

পাজামা সাহেবের কথা শুনে মুখ টিপে হেসে তার সাহেব যা বলেছিল, মনে পড়লে কানের কাছটা এখনো গরম ঠেকে মনোহরের। মেদিনীপুরের মানুষ সে, রামায়ণ মহাভারতের গল্প তো তারও মোটামুটি জানা।

...সাহেব বলেছিলেন, মন্দ উপমা দাওনি, তবে এই দ্রৌপদীর অভাব শুধু এক ব্যাপারে...পাঁচজনের বদলে একজন।

শুনে সবাই হৈ-হৈ করে উঠেছিল। মিনমিনে ধরসাহেব পর্যন্ত আমেজ-লাগা চোখে বউদিমণিকে একবার দেখে নিয়ে বলেছিলেন, খুব অন্যায় কথা, আপনি একটু উদার হলে এই অভাবটুকুও নিশ্চয় দূর করা যেত।

...আর সাহেব বলেছিলেন, আমি উদার হতে রাজী আছি, উনি দ্রৌপদী হবেন কিনা চেষ্টা করে দেখো।

টেবিলে যাকে বলে হাসির হুল্লোড় একেবারে। সকলকে ছেড়ে একটু দূর থেকে বউদিমণির মুখখানাই আড়চোখে দেখে নিচ্ছিল মনোহর। বউদিমণিকে ফর্সা কেউ বলবে না। বড়লোকের ঘরে ঘষলে মাজলে যেটুকু রূপ খোলে তাই। কিন্তু রং যা-ই হোক, মুখখানা যে মিষ্টি—এ সকলকেই মানতে হবে। এতখানি বয়সেও দিব্বি তাজা স্বাস্থ্য। অবশ্য সাহেবের স্বাস্থ্যও খুবই ভালো। এই পঞ্চাশেও চল্লিশের অনেক নিচে মনে হয়। হবে না কেন, এ-বয়সেও সাহেব নিয়মিত যোগব্যায়াম করেন, প্রাণায়াম করেন। কিন্তু বউদিমণিকে দেখলেও পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস মনে হয় না একটুও। পাশাপাশি দাঁড়ালে বড়জোর সমান বয়সী মনে হয় দুজনকে। বউদিমণি তো বলতে গেলে কালোই। সাহেবের রং ফর্সা। দুজনকে পাশাপাশি রেখে কখনো তুলনা করেনি মনোহর। বউদিমণির টানা টানা চোখ আর কোমরের নিচ-ঘেঁষা একমাথা কুচকুচে কালো চুল দেখতে মনোহরের আগেও ভালো লাগত, এখনো লাগে। একেবারে গোড়ায় যখন সাহেব তাঁকে ঘরে নিয়ে এলেন, বউদিমণির চাউনিটা এত ঠাণ্ডা অবশ্য ছিল না তখন। ওই চোখে তখন অনেক রকমের চাপা দুষ্টুমি উঁকিঝুঁকি দিতে দেখেছে। কিন্তু সে-রকম ছেলেমানুষি কতদিন আর থাকে। বউদিমণিকে এ-রকম দেখেই অনেক কাল ধরে অভ্যস্ত তারা।

খাবার টেবিলের সেই হাসাহাসি আরো জমে উঠত কিনা বলা যায় না। গায়ের রং যেমনই হোক, বউদিমণির লালচে মুখ দেখেছিল মনোহর। আর সেই একদিনই মৃদু অনুযোগের সুরে সাহেবকে বলতে শুনেছিল, কি করছ, চারধারে সব দাঁড়িয়ে আছে—

অভ্যাগতরা যে-মেজাজে ছিলেন কারো হয়তো কানেও যায়নি। কিন্তু সাহেবের কানে ঠিকই গেছে। বউদিমণির দিকে থমকে তাকিয়েছেন তিনি। তারপর মনোহর আর বেয়ারা খানসামার দিকে। কিন্তু মনোহর তো আর বোকা নয়। সে তার আগেই ব্যস্ততার ভান করে অন্য দিকে সরে গেছে।

এই গোছের আনন্দের দিনগুলো একেবারেই গেছে। সাহেবের বিয়ের পরে সেই প্রথম কিছুকালের কথা বাদ দিলে বউদিমণি বরাবরই চুপচাপ মানুষ। ছোট ছেলে নিয়ে দোতলা ছেড়ে তিন তলায় উঠে যাবার ছ-সাত মাস আগে থেকে আরো যেন ভয়ানক চুপচাপ দেখা গেছে তাঁকে। সেই সময় রান্নার স্কুলে যাওয়া ছেড়ে কিচেনেও ঢুকতেন না।

...তারপর হঠাৎ একদিন দোতলার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেঁটে দিয়েই যেন ছোট ছেলেকে আর রূপাকে নিয়ে তিন তলায় উঠে গেলেন তিনি। দিনের বেলা। সাহেব তখন বাড়িতেই। ওখানে ওই ঢাকা বারান্দার নিচেই বসে। অন্য সব দিনের মতোই নির্বিকার। কি-সব কাগজপত্র নিয়ে বসেছিলেন। মুখ তুলে দেখলেনও না।

মনোযোগে একটু যা ব্যাঘাত হয়েছিল সাহেবের ছোট ছেলে সামনে এসে দাঁড়াতে। তার তখন ছ'বছর মাত্র বয়েস। বাপের কাছে এসে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, বাবা, আমরা তিন তলায় থাকব কেন?

ছেলেদের, বিশেষ করে এই ছোট ছেলেকে সাহেব ভালোবাসেন না এমন কথা মনোহর বলতে পারে না। বড় ছেলে সেই আট-ন'বছর বয়েস থেকেই বাইরে। ফলে এখন তার হাব-ভাব মতিগতি একটু অন্যরকম। এখানে এলেও বাপের কাছে খুব বেশি ঘেঁষে না। ছোট ছেলেটাও মায়ের বেশি নেওটা, কারণ বাপকে কতক্ষণ আর কাছে পায়। তাহলেও বাপের আদর কাড়ার লোভ আছে।

সাহেব হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে বলেছিলেন, তোর ইচ্ছে না হলে থাকবি না—

—তাহলে মা তিন তলায় থাকবে কেন?

—তিন তলাটা একেবারে খালি পড়ে থাকে, তাই।

সাহেবের কোনো কথা বা কাজের বিচার বিশ্লেষণ করে না মনোহর। কিন্তু শুনে একটুও ভালো লাগেনি তার। বাসুবাবু অবিশ্বাস করেনি। তাকে মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে শুনেছে, মাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারি না. আমি মায়ের কাছেই থাকব।

মনোহরের তখনো স্থির বিশ্বাস সাহেবের ইচ্ছে মতোই এই ব্যবস্থা হয়েছে। এ-বাড়িতে তাঁর ইচ্ছেটাই সব। তিনি যা বলেন, যা করেন, তাই হয়ে থাকে। আজ পর্যন্তও বউদিমণিকে সাহেবের অবাধ্য হতে দেখেনি কখনো।

উনি তিন তলায় উঠে যাবার কিছুদিনের মধ্যে দোতলার এই কোলাপসিবল গেট। রেলিং-এর মাথার ওই পার্টিশন। দেখে বাড়ির লোকেরা সকলেই নির্বাক। তখনো ফাঁক মতো বউদিমণির মুখখানা ভালো করে খুঁটিয়ে দেখেছিল মনোহর। কিন্তু ওই ঠাণ্ডা মুখে একটা আঁচড়ও পড়তে দেখেনি। যেন এই রকমই হবার কথা।

তিন বছরে ওই কোলাপসিবল গেটও সকলের চোখে সয়ে গেছে। সেদিন কিছু না বুঝলেও এখন মনোহর মাহাতো অনেক কিছু বুঝতে পারে, অনেক কিছু আঁচ করতে পারে। আজ তার ফলেই ওর বুকের তলায় রাজ্যের অস্বস্তি। সাহেবকে অতটা ভালো না বাসলে এমন হত না। বাইরের দিক থেকে তাকালে এখনো খুব অস্বাভাবিক কিছু কারো চোখে পড়ে না। এখনো বউদিমণি সাহেবের পছন্দমতো ভালো-মন্দ কিছু রান্না করলে রূপার হাত দিয়ে নিচে পাঠিয়ে দেন। সাহেব তাঁর সময় মতো তৃপ্তিভরে দিব্বি সে-সব খান। বাড়তি থাকলে ওরা ভাগ পায়। এখনো দরকার পড়লে সাহেব বউদিমণিকে নিচে ডেকে পাঠান—যা বলার বলেন। বউদিমণি ঠিক আগের মতোই চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে শোনেন। তারপর মাথা নেড়ে সায় দেন। আর দরকার পড়লে বউদিমণিও আসেন। যা বলার বলে চলে যান।

...কিন্তু মনোহর মাহাতো তো আর পাঁচজনের মতো বাইরের লোক নয়। আর পাঁচটা কাজের লোক বাইরে থেকে যেটুকু দেখেশোনে বোঝে, ওর দেখা-শোনা বোঝার সুযোগ তার থেকে ঢের বেশি। দোতলায় এই কোলাপসিবল গেট আর সিঁড়ির রেলিং-এ পার্টিশন বসানোর কারণ আঁচ করতে বেশি সময় লাগেনি। কারণ মেয়েছেলে। আগে যে বাঙালী মেমসাহেবরা তাঁদের পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে এ-বাড়িতে আসতেন, বউদিমণি তিন তলায়

উঠে যাওয়ার পর থেকে আর ওই গেট বসানোর পর থেকে তাদের একলা আসা-যাওয়া দেখছে মনোহর। মাঝে পাজামা সাহেবের বোন মিস গুপ্তর আনাগোনা বেড়েছিল খুব। তাঁকে দেখলেই তার সাহেব একটু বেশি ব্যস্ত আর চঞ্চল হয়ে উঠতেন। অনেক সময় সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন আবার সঙ্গে নিয়ে বেরুতেন। মিস মেমসাহেবটি দেখতে ভালো মনোহর অস্বীকার করতে পারবে না। লম্বা ফর্সা দোহারা চেহারা। তেল পড়ে না বলেই মাথার চুলগুলো লালচে দেখায় হয়তো। ফর্সা মুখ সর্বদাই কেমন ফ্যাকাশে। আর কি-রকম যেন টলটলে দুটো চোখ। চাউনি কখনো ধারালো, চোখে চোখ পড়লে অস্বস্তি হয়। আবার কখনো ফ্যালফ্যালে। তখন চোখাচোখি হলে মনে হবে কিছুই দেখছেন না। মোটকথা, সব মিলিয়ে মেয়েছেলের অমন ধার-ধার চেহারা মনোহরের অন্তত পছন্দ নয়।

তাঁকে শেষ দেখেছিল মাস তিনেক আগে। মস্ত একটা হাসপাতালে। সাহেবকে সেদিন সে-ই ড্রাইভ করে নিয়ে গেছল। সব মিলিয়ে তিনটে ড্রাইভার বাড়িতে। কিন্তু গাড়ি দু'খানা। একটা গাড়ি ব্যবহার করেন বউদিমণি আর বাসুবাবু। তাঁদের একজন ড্রাইভার। আর একজন সাহেবের আপিসের। কাজে-কর্মে ছোটাছুটির সময় সে-ই সাহেবের গাড়ি চালায় এখন। বাড়ির আদি ড্রাইভার মনোহর মাহাতো। বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ হবে বয়স তার। সাহেবের কাছে এসেছিল সতের বছর বয়সে। তার বছরখানেক বাদে সাহেবই টাকা পয়সা খরচ করে তাকে ড্রাইভিং-এ ভর্তি করে দিয়েছিলেন। টানা আঠের-উনিশ বছর সে একলাই এ-বাড়ির ড্রাইভারি করেছে। এখন বাকি দুজন ড্রাইভার, চাকর বেয়ারা খানসামা সকলের মাথার ওপর বসে বাড়ির সব কিছু দেখাশুনা করাটাই যেন কাজ তার। এরা সকলে তাই ভাবে আর মনে মনে হিংসে করে।

আসল কাজখানা কি সে সেই জানে। বিশ্বাস বা নির্ভরতার প্রশ্ন যেখানে, সেখানে সাহেব শুধু ওকে ছাড়া আর কাউকে চেনেন না। তাঁর ব্যক্তিগত বিলাস ব্যসনের ব্যাপারেও একমাত্র সে-ই সাক্ষী। সেই কতকাল থেকে সাহেবের সঙ্গে তার যেন একটা না-বলা চুক্তি হয়ে আছে। চোখে দেখবে, কানে শুনবে, হুকুম তামিল করবে—কিন্তু সব-কিছুই কাকপক্ষীর অগোচর থাকবে। সাহেব কোনোদিন মুখে তাকে কিছু বলেননি বা নিষেধ করেননি। কিন্তু সে এই রকমই ধরে নিয়েছে, বুঝে নিয়েছে।

...মস্ত একটা ফুলের তোড়া কিনে সাহেব সেদিন কোথায় চলেছেন মনোহর প্রথমে বুঝতেও পারেনি। গাড়ি চালাতে চালাতে সামনের আয়নায় দুই একবার তাঁর মুখখানা লক্ষ্য করেছে। হাসি-হাসি অথচ নির্বিকার মুখ দেখে মনে হয়েছে ওই ফুলের তোড়া মিস গুপ্ত মেমসাহেবের কাছেই যাবে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে ঠিকই ভেবেছে, সাহেবের মুখ দেখে কতগুলো ব্যাপার খুব সহজেই আঁচ করে নিতে পারে। কিন্তু এ-জন্যে যে হাসপাতালে এসে ঢুকতে হবে তা একবারও ভাবেনি।

পিছনের হুকুম মতো সে গাড়িটা হাসপাতালের কম্পাউন্ডে ঢুকিয়ে দেবার পরেও মনে মনে অবাক হচ্ছিল। মস্ত ফুলের তোড়া হাতে সাহেব নেমে টকটক করে ভিতরে চলে গেলেন। ফিরলেন প্রায় আধ-ঘণ্টা বাদে। মনোহর তখন নেমে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। দূর থেকে সাহেবকে ফিরতে দেখে আপনা থেকেই সামনের দালানের দোতলার দিকে চোখ গেল তার। আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের চোখে একটা ঝাঁঝালো ধাক্কা খেল যেন।

...দোতলার বারান্দার কার্নিশের সামনে দাঁড়িয়ে লালচে চুল মিস গুপ্ত মেমসাহেবের ধার-ধার মুখ। অতটা দূর থেকে দেখেও মনে হয়েছে চাউনি ফ্যালফ্যালে নয় একটুও, উল্টে দস্তুর মতো ঝাঁঝালো।

সাহেব কাছে আসতেই মনোহর তাড়াতাড়ি পিছনের দরজা খুলে দিল। কোনোদিকে না তাকিয়ে তিনি গাড়িতে উঠে বসলেন। গাড়ি চালাবার পরেও মনোহর আড়চোখে একবার দোতলার দিকে তাকিয়েছে। মহিলা তেমনি দাঁড়িয়ে। কিন্তু মনোহর কি করবে, সাহেব নিজে থেকে না দেখলে সে-তো আর ডেকে দেখাতে পারে না।

মনে মনে অবাকই হচ্ছিল সে। মিস মেমসাহেব হাসপাতালে কেন? হঠাৎ কি অসুখ করল তাঁর? কিন্তু এ-ও কাউকে জিজ্ঞাসা করার নয়।

...সাহেবের মতি-গতি বা রুচি বোঝা ভার। ইদানীং মাঝে মাঝে আর যে মহিলাটি বাড়িতে আসছিলেন তিনি পাজামা সাহেবের স্ত্রী মিসেস গুপ্ত। হয়তো বা এককালে রূপসীই ছিলেন ইনি। পাজামা সাহেবের বয়েস যদি বড়জোর চল্লিশ হয়, এঁর আর কত হবে? কিন্তু দেখলে মনে হয় ঝরে পড়ল বলে। হাড়ের কাঠামোর ওপর শুধু ধপধপে একটা চামড়া বসানো যেন। এমনি রোগা। এই মহিলার আসার মধ্যে রস-কষের ব্যাপার কি থাকতে পারে মনোহরের মাথায় আসে না।

ইদানীং সব থেকে বেশি আসছেন ধর সাহেবের বউ মিসেস ধর। গুপ্ত সাহেব অর্থাৎ পাজামা সাহেব, তাঁর হাড় চামড়া মোড়া বউ আর তাঁর কটা-চুল ধার-মুখ বোন মিস গুপ্ত মেমসাহেবের সঙ্গে মিনমিনে ধর সাহেব আর তাঁর বউয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কিছু আছে, এতদিনে মনোহর সেটা বুঝে নিয়েছে। সম্পর্কটা ঠিক কি তা অবশ্য এখনো জানে না। তা চোখে দেখে যদি কাউকে পছন্দ করতে হয়, ক'জনের মধ্যে মনোহরের মতে মিসেস ধরকেই সব থেকে বেশি পছন্দ হওয়ার কথা। বেশ ফর্সা, সামান্য মোটার দিক ঘেঁষা, হাসিখুশি ঢলঢলে মুখ। কটকট করে তাকাতে পারেন, সুন্দর করে ভুরু কোঁচকাতে পারেন, আবার হেসে সোফায় গড়াতেও পারেন। আর গুনগুন করে গান করেন যখন, মনোহরও দূর থেকে কান না পেতে পারে না।

ঘরের পর্দা সর্বদাই আর টানা থাকে না। বাইরের অন্ধকারের আড়াল থেকে মনোহর মাহাতো ফাঁক মতো মোটামুটিভাবে সকলকেই দেখে নিয়েছে, বুঝে নিয়েছে। তাছাড়া এঁরা এলে ঘরের বাইরে মোতায়েন থাকতেই হয় তাকে। চা কফি কোলড় ড্রিঙ্ক হার্ড ড্রিঙ্ক-এর তাগিদে হামেশাই ঘরেও ঢুকতে হয়। মিসেস ধর সফ্ট ড্রিঙ্ক-এর ধার ধারেন না। পাজামা সাহেবের সঙ্গে এক-একদিন তাঁকে পাল্লা দিয়ে হুইস্কি টানতেও দেখেছে।

মাঝে মাঝে বউদিমণির ওপরেই রাগ হয়ে যায় মনোহরের। কোলাপসিবল গেট বসানো হোক আর সিঁড়ির রেলিং-এর ওপর পার্টিশন উঠুক, তিনি কি এত বোকা যে কারা আসছে কারা যাচ্ছে বা কে কতক্ষণ থাকছে—কিছুই টের পান না? গোড়ায় সে-ই বরং একটু দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটাত, এই বুঝি বউদিমণি ওকে ডেকে এ-ব্যাপারে জেরা করতে বসেন। কিন্তু তা কখনোই করেননি। জেরা করলে ফল হত না অবশ্য। মনোহর মুখ বুজেই থাকত। বউদিমণির ওপর তার মায়া আছে, তা বলে সাহেবের সঙ্গে নেমকহারামি করতে পারত না। তবু অস্বস্তি তো হতই।

মেয়েদের ব্যাপারে সাহেবের মতি-গতি বউদিমণির থেকেও হয়তো ভালো জানা

আছে তার। প্রথম যখন সাহেবের কাছে এসেছিল তখন নিজের বয়েস সতের-আঠের, সাহেবের তেইশ। তখন থেকেই অনেক কাণ্ডকারখানা দেখেছে। এই বউদিমণিকে ঘরে আনার ব্যাপারেই তো বেশ একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠেছিল। মোটকথা, মেয়েছেলে হল গিয়ে সাহেবের কাছে অনেকটা নেশার মতো। কাজে-কর্মে ডুবে আছেন, হঠাৎ নেশা চড়ল তো চনমন করে উঠলেন। নেশা গেল তো আবার কাজে ডুব। সাহেবের মতো জাঁদরেল পুরুষেরই এ-রকম নেশা মানায়।

এ-ব্যাপারে মনোহর মাহাতো জীবনে একবারই শুধু বিষম ফাঁপরে পড়ে গেছল। ক'টা দিন বেশ সংকটের মধ্যেই কেটেছিল তার। সে-কথা মনে হলে আজও ভারী লজ্জা পায়। সাহেবকে অবিশ্বাস করেছিল বলে পরে কতবার যে নিজের নাক-কান মলেছে ঠিক নেই।

বছর পনের আগের কথা। মনোহরের তখন আটাশ-ঊনত্রিশ বয়েস। এর ক'বছর আগে থেকে কিছুই যেন আর ভালো লাগে না। সাহেবের কাজ ওর ধ্যানজ্ঞান, কিন্তু তাতেও ত্রুটি হত। মনটা যেন কোথায় উড়ে উড়ে যেত। হাড়ে-পাঁজরে একটা যন্ত্রণা লেগে থাকত। তখন অন্য বাড়িতে থাকতেন সাহেব। সে-ও অনেক ভাড়ায় মস্ত ঝকঝকে ফ্ল্যাট বাড়ি। সামনেই মস্ত বড় হল একটা। সেই হল-এর দেয়ালে মস্ত একটা ক্যালেন্ডার ঝোলানো ছিল। সেই ক্যালেন্ডারে প্রায় প্রমাণ সাইজের একটা মেয়ের ছবি। ঘাগরা পরা দেহাতী মেয়ের ছবি। তার মাথার ঝাঁপিতে বেসাতি। ভরা বয়েস। সর্ব অঙ্গে যৌবন ঠিকরে পড়ছে। একটা বাহু আর হাত মাথার ঝাঁপিতে। ফলে নিটোল বুকখানা যেন আর কাঁচুলির শাসন মানছে না। হাসছে। যে তাকাবে তার দিকেই চেয়ে আছে। ঝকঝকে দাঁতের সারি দেখা যাচ্ছে।

স্থান-কাল ভুলে মনোহর মাহাতো ক্যালেন্ডারের ওই মেয়ের দিকে চেয়ে থাকত। কোনো কোনো দুপুরের নিরিবিলিতে টানা এক-দেড় ঘণ্টা ঠায় ওটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। কিন্তু হাড়-পাঁজরের গুমরনো ভাবটা তাতে আরো বাড়ত বই কমত না।

ফ্যাসাদে পড়ে গেল একদিন। হল-এর ও-মাথায় দাঁড়িয়ে বউদিমণি। কখন এসেছেন মনোহর টের পায়নি। চোখাচোখি হতে তাড়াতাড়ি সামাল দিতে চেষ্টা করল। বলল, ভাবছি এটা অন্য কোথাও সরিয়ে রাখি, হল-এ কেউ এলেই ক্যাট ক্যাট করে চোখে পড়ে—

হাঁ না কিছুই না বলে বউদিমণি চলে গেলেন। মনোহরের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। বউদিমণি নিতান্ত সাদা-মাটা বলেই, আর কেউ হলে ঠিক একটা কিছু ভেবে বসে থাকত।

কিন্তু দুটো দিন না যেতে আবার গলদঘর্ম দশা তার। ডাক পড়তে নিশ্চিন্ত মনেই সাহেবের ঘরে ঢুকেছিল। ডাক তো হামেশাই পড়ে।

কিন্তু সাহেবের প্রথম প্রশ্ন শুনেই থতমত খেল এক দফা। ওর বাবা-মা নেই সাহেব জানেন। দেড় বছর আগে পরে তাদের দেহান্ত ঘটেছিল, আর সাহেবের কাছ থেকে দু'বারই মোটা টাকা নিয়ে সে তাদের শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষ করে ফিরে এসেছে।

সাহেব জিগ্যেস করলেন, দেশে এখন কে আছে তোর?

তাৎপর্য না বুঝেই মনোহর জবাব দিয়েছে, কাকার পরিবার আর একজন বিধবা দিদি—

সাহেব পাঁচখানা একশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিলেন ওর দিকে।—ধর। কাল-পরশুর মধ্যে দেশে গিয়ে বিয়ে-থা করে এক মাসের মধ্যে বউ নিয়ে ফিরবি। তোর মাইনে এখন দিলাম না, দিলেই খরচ হয়ে যাবে—এলে পাবি।

টাকা নিয়ে পালিয়ে বাঁচল মনোহর। তারপর বউদিমণির মুখের দিকে তাকাতে পারে না আর। বউদিমণি মুখ টিপে হেসেছিলেন। আর বলেছিলেন, বিয়ে সকলেই করে, তোর অত লজ্জা কিসের? আমাদের খেয়ালের দোষে বরং দেরি হয়ে গেছে।

বিয়ে-থা করে মাসখানেকের মধ্যেই সে ফিরেছে আবার। কিন্তু বউকে সঙ্গে করে নয়, একলা। তার কেবলই মনে হয়েছে, গাঁয়ের সোজা সরল বউটা বিচ্ছিরি রকমের বে-মানান হবে এখানে। এছাড়া আরো কি যেন অস্বস্তি। সাহেব জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বউকে নিয়ে এলি না?

মুখ কাঁচুমাচু করে ও জবাব দিয়েছে, দিদি আর কাকা-কাকিমা ছাড়লে না।

চার মাস না যেতে বউয়ের জন্য মন উসখুস আবার। ভালো করে কাজে-কম্মে মন দিতে পারে না। কারণটা সাহেবই কি করে বুঝে ফেললেন যেন। আবার কিছু টাকা দিয়ে বললেন, যা, এবারে বউকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবি।

মনোহরের বয়স তখন ঊনত্রিশ আর ওর বউ দুর্গার উনিশ। কালো-কোলোর ওপর বেশ সুশ্রী চেহারা। বউ আনার ব্যাপারে এই কারণটাই একটা অস্বস্তির মতো মাথায় চেপে বসল তার। অন্য মেয়ে বউদের বেলায় সাহেবের মতি-গতি দেখে সে হেসেছে। সাহেবকে পুরুষ সিংহ ভেবেছে। কিন্তু দুর্গার দিকেও যদি চোখ যায় সাহেবের! দুর্গাকে যে এরই মধ্যে সাংঘাতিক ভালোবেসে ফেলেছে মনোহর। অবশ্য বউদিমণি আছেন বাড়িতে। কিন্তু বউদিমণি কি ওই জাঁদরেল সাহেবের লাগাম ধরার মানুষ? সাহেবের ঝোঁক চাপলে কোনো বাধাই টেকে না, সব কুটোর মত উড়ে যায়।

এ-সব চিন্তা রোগের মতো। একবার পেয়ে বসলে কুরে খাবে। কিন্তু সাহেবের এবারের হুকুম অমান্যই বা করে কি করে? আবার দুর্গাকে সতর্ক করার জন্য সাহেবের নামে পাঁচ কথা বলেই বা কি করে! বিয়ের পরে ওর কাছে তো সাহেবকে ভগবানের মতো বিরাট শক্তিশালী একজন বানিয়ে দিয়ে এসেছিল। কিন্তু স্বয়ং ইন্দ্রও যে মেয়ে-ছেলের লোভ সামলাতে না পেরে অহল্যার সর্বনাশটি করে এসেছিল সে-কথা তো আর বলেনি! রাজ্যের অস্বস্তি বুকে চেপেই দুর্গাকে নিয়ে এসেছিল সে। কিন্তু এসেই জানান দিয়েছিল, মাত্র পাঁচ দিনের কড়ারে দুর্গাকে আনা হয়েছে। কাকা-কাকিমা আর দিদির হুকুম মতো ওকে আবার দেশেই রেখে আসতে হবে। সেখানে শীগগীরই কি-সব উৎসব পার্বণ আছে।

কিন্তু রোগ একবার মাথায় চেপে বসলে পাঁচটা দিনও কম যন্ত্রণার ব্যাপার নয়। বউ দেখে সাহেব বলেছেন, বেশ বউ হয়েছে। বউদিমণিও তাই বলেছেন। কিন্তু সাহেব যদি নাক সিঁটকোতেন তাহলে বরং খুশি হত।

ওর মাথায় সব-খোয়ানোর বিপর্যয়। ভালো কথাও ভালো মনে নেবে কি করে? বউদিমণি ওদিকে বেনারসী শাড়ি দিয়েছেন দুর্গাকে, বেশ দামী এক ছড়া হারও দিয়েছেন খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও আদর যত্ন করেছেন। তখন একটা গাড়ি। দুর্গাকে কলকাতার শহর দেখনোর জন্য এক ছুটির দিনের দুপুরে আর একদিন সন্ধ্যার পর গাড়িও ছেড়ে

দিয়েছিলেন। দুর্গা আনন্দে আটখানা। সে পারলে আরো কিছুদিন অন্তত এখানে থেকেই যেতে চায়। ওর আনন্দ দেখে মনোহরের মাথায় রক্ত চড়ে।

এক বিকেলে দুর্গা নিজে থেকে দোতলায় চলে এসেছিল। বউদিমণি তখন কি কাজে বেরিয়েছেন। সাহেব তাঁর ঘরে। বউদিমণি বাড়ি নেই জেনেও দুর্গা ওপরে উঠে আসায় মনোহর রেগে আগুন। সাহেবের অগোচরে হিড়হিড় করে নিচে টেনে এনে ঘরের দরজা বন্ধ করেই ঠাস করে এক চড়। বেচারা জানেও না দোষটা কি করল।

যাক, পাঁচটা রাত কাটলে কাঁধ থেকে যেন ভূত নেমে গেল মনোহরের। আবার দেশে রওনা হওয়ার আগে তার ইশারায় দুর্গা সাহেব আর বউদিমণির পায়ে মাথা রেখে প্রণাম সারল। আর তখনই সেই বিষম লজ্জাটা পেল মনোহর। সাহেব দুর্গাকে বললেন, ও ব্যাটা তোকে দেশে ফেলে রাখছে কেন? তুই আমার মা, যখন ইচ্ছে হবে চলে আসবি।

এবপর কতবার যে মনোহর নিজের নাক কান মলেছে ঠিক নেই। আর দুর্গার সেই চড়টা ওর গালে ডবল হয়ে ফিরে এসেছে। বউকে এরপর কলকাতায় নিজের কাছে এনে রাখার কথাও মনে হয়েছিল। কিন্তু এক মাস দেড় মাসের মধ্যেই দিদির চিঠিতে জানল দুর্গার পেটে ছেলে এসেছে। পরে ছেলেসুদ্ধ বউ নিয়ে সাহেবের বাড়িতে থাকাটা আর সম্ভব ভাবেনি। দু'বছর না যেতে আরো একটা ছেলে হয়েছে তার। আর তৃতীয়বার ছেলে হবার আগে কি একটা কালব্যাধিতে পেয়ে বসল বউটাকে যে পেটে ছেলে নিয়েই চোখ বুজল। মনোহর মাহাতো দেখতে পর্যন্ত যেতে পারেনি। একবার দিদির চিঠি এলো বউয়ের অসুখ। আর একবার টেলিগ্রাম এলো সব শেষ। মনোহর মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে ছুটে গেছল। একটা বড় ডাক্তার পর্যন্ত দেখানো হয়নি বলে কাকা-কাকিমা আর দিদির ওপর অভদ্রের মতো রাগ করেছে। পনের ক্রোশ দূর থেকে বড় ডাক্তার আনা কতটা সম্ভব রাগের মাথায় তা ভাবেনি।

বউটাকে ভালই বাসত। এখনো একটু মিষ্টি স্মৃতি মনে লেগে আছে। ফের বিয়ে-থাওয়ার ব্যাপারে মাথা গলায়নি। এক-আধ সময় ইচ্ছে হত না এমন নয়। দেশ থেকে দিদির তাগিদ ছিলই। কিন্তু সংসার কি জিনিস জানা হয়েছে। সে-রকম যন্ত্রণা-টন্ত্রণা আর হত না। কাজে-কর্মে দিন চলে গেল। শক্তসমর্থ হলেও বয়েস তো দু'কুড়ি চারে গড়িয়েছে। ছেলে দুটোর ওপরেও খুব একটা টান নেই। ওরা দেশের স্কুলে-টুলে পড়ছে। ওদের জন্য মাসের শেষে দিদির কাছে টাকা পাঠিয়েই কর্তব্য শেষ।

যাই হোক, বাড়িতে পুরুষ-সঙ্গী ছাড়াই মেয়েছেলের আসা দেখছে বলেই বউদিমণির ওপর রাগ নয় তার। সাহেবের চরিত্রের এ-দিকটা বউদিমণির একেবারে না জানা না চেনার কথা নয়। মনোহরের অস্বস্তি অন্য কারণে। তার কেবলই মনে হয় কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল দানা বেঁধে উঠছে। আজ নয়, প্রায় এই তিন বছর ধরেই। দোতলায় শুধু কোলাপসিবল গেট বসেনি, এক তলায় সাহেবের নাম খোদাই করা সোনালি পাতটাও বদলানো হয়েছে। আগে ওতে শুধু সাহেবের নাম লেখা ছিল। এখনো তাই আছে। কিন্তু নামের নিচে লেখা হয়েছে ফার্স্ট ফ্লোর। তার মানে লোককে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া, সেকেন্ড ফ্লোর অর্থাৎ তিন তলার সঙ্গে সাহেবের কোনো সম্পর্কই নেই। এরই বা দরকার হল কেন? সেই থেকেই মনোহর মাহাতো কিছু বুঝছে না। না বুঝলেই তার যত অশান্তি। আর ইদানীং কেবলই মনে হচ্ছে, সত্যিকারের অশান্তি কিছু থিতিয়ে আছেই।

আত্মস্থ হয়ে তিন তলার সিঁড়ির দিকে তাকাল মনোহর। বউদিমণির ঠাণ্ডা গলা কানে এলো। মানুষটা যেমন ঠাণ্ডা, গলার স্বরও তেমনি। বাসুর স্কুল আছে, তাকে খেতে বসিয়ে দিতে বলে নিচে নামছেন মনে হল। আসছেন বলে সাহেবকে এতক্ষণ বসিয়ে রাখলেন কেন জানে না। তিন তলার সিঁড়ির বাঁকে তাঁর দর্শন মিলতে বোঝা গেল। স্নান সেরে মাথা-টাথা আঁচড়ে নেমে এলেন। বউদিমণির এই মূর্তিটি ভালো লাগে মনোহরের। পরনে চওড়া লালপেড়ে সাদা জমিনের পাতলা দামী শাড়ি। প্রায় কোমর ছোঁয়া একপিঠ ভেজা-ভেজা কুচকুচে কালো চুল। কপাল ছোটর ওপর জ্বলজ্বলে সিঁদুর টিপ। সিঁথিতেও আগুনের শিখার মতো সিঁদুরের আঁচড়।

❀

বউদিমণিকে দেখে মুখে একটু খুশির ভাব ফোটাতে চেষ্টা করল মনোহর। অর্থাৎ তাঁর অভ্যর্থনার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছে।

যশোধরা ওর দিকে তাকালেন শুধু একবার। দোতলায় নেমে সোজা বারান্দার দিকে চলে গেলেন। সাহেব ঢাকা বারান্দায় বসে কাগজ পড়ছেন, মনোহর টেলিফোনে সেটা আগেই জানিয়েছিল। সে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। পিছন থেকে বউদিমণির ওই কুচকুচে কালো ছড়ানো চুলের বোঝা আরো ভালো লাগছে। দিনকে দিন বউদিমণির চুলের চেকনাই বাড়ছে যেন।

হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে ওপরের সিঁড়ির দিকেই তাকাল আবার মনোহর। ওর স্নায়ুগুলো সব এমনিতেই সজাগ। সিঁড়ির বাঁকের ও-ধার থেকে রূপা গলা বাড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতে টুক করে সরে গেল। ভুরু কুঁচকে মনোহর এদিকে সরে এলো। ওকে না দেখলে ওই পাজী মেয়েও চুপিচুপি নেমে আসত।

হল্ আর ওই ঢাকা বারান্দার মাঝের পাতলা শৌখিন পর্দাটা গোটানো। কাজের ছুতোয় মনোহর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। কিন্তু চোখ দুটো ওইদিকে।...বউদিমণি কাছে গিয়ে দাঁড়াতে সাহেবের মুখের সামনে থেকে কাগজ সরলো।...সাহেব যেন একটু ভালো করে দেখে নিলেন বউদিমণিকে। সাহেব চেয়ে আছেন, তাই বউদিমণিও চেয়ে আছেন। এটা নিয়ম। এটা বউদিমণির ওদের থেকেও ভালো রপ্ত হয়ে গেছে। এ-জন্যে আগে আগে বউদিমণিকে দস্তুরমতো সাহেবের ধমক খেতে হয়েছে। অন্যত্র মন দেখলে ঝাঁঝালো সুরে সাহেব বলে উঠতেন, আমি কার সঙ্গে কথা বলছি? এদিকে তাকাও!

পুরনো দিনের কথা। এখন সাহেব যে মেজাজেই থাকুন বউদিমণি চুপচাপ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে পারেন। চেয়েই আছেন। হঠাৎ বউদিমণি ঘাড় ফিরিয়ে এদিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে কাজের অছিলায় মনোহর হল্-এর অন্যত্র সরে গেল। গেল বটে, কিন্তু একটা অদম্য কৌতূহলে পা দুটো তার বশ মানতে চাইছে না। এদিকেই এগুতে চাইছে। এ-বাড়ির সঙ্গে মনোহর এমনি মিশে গেছে যে কাছে থাকলেও খেয়াল করার কথা নয়। অথচ বউদিমণি কাছে কেউ আছে কি নেই ঘুরে দেখে নিলেন।

নেবানো চুরুটটা ধরিয়ে নিয়ে জয়ন্ত বোস আবার তাকালেন। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির রেখা।—আসছ বলে নিচে নামতে যে আধ ঘন্টার ওপর লেগে গেল!

মুখের দিকে চেয়ে যশোধরা বুঝে নিলেন, এটা রাগ বা বিরক্তির কথা নয়। বললেন, চানটা সেরে এলাম, গরম লাগছিল—তাছাড়া তুমি তো বললে ব্যস্ত নও!

চুরুটে বড় টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ার ফাঁকে তির্যক চোখে লক্ষ্য করছেন জয়ন্ত বোস। ব্যতিক্রম কিছু চোখে পড়ছে না। বরাবরকার মতোই বাধ্য, নরম সরম। স্নান সেরে এই বেশে সামনে এসে দাঁড়ানোর ফলে অনেক দিন বাদে তাঁর যে ভালো লাগছে সেটা মুখে বলার দরকার হল না। চুরুট মুখে তাঁর দিকে আর একটু ঘুরে বসলেন। পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিলেন একবার। এ দেখাটা স্থূল পর্যায়ের। কিন্তু জোরালো পুরুষের বেলায় এই জন্তু-ভাব মেয়েরা অপছন্দ করে ভাবেন না। অবশ্য তাঁর আচরণ তাঁরই, কারো পছন্দ-অপছন্দের ধার ধারেন না। চুরুট নামালেন। চোখ এখন মহিলার মুখের ওপর। ঠোঁটের হাসি চোখেও চিকচিক করছে। দুইয়েরই নাম বাসনা।

এ-চাউনি যশোধরা চেনেন। এই হাসিও। কিন্তু আগে ঠিক ধরতে পারেন না যেন, এতখানি স্পষ্ট হবার পর হঠাৎ বুঝতে পারেন। ফলে থতমত খান, শামলা মুখে রঙের ছোঁয়া লাগে। চকিতে হল-এর দিকটা দেখে নিলেন একবার। ওখানে কেউ নেই। চোখে চোখ রেখে হাসলেন তিনিও। বললেন, বয়েস তো অনেক হল, আর কেন!

না, ব্যতিক্রম কিছু দেখছেন না জয়ন্ত বোস। ওটা তাঁর চিন্তার ভুল! আগের মতোই ভালো লাগছে। মিষ্টি লাগছে। যশোধরা নামে কোনো মহিলা যদি এঁর থেকে ঢের বেশি রূপসী হত, ঢের বেশি তীক্ষ্ণ হত, তাহলেও নিজের জীবনের ছক খুব বেশি রকমফের হত ভাবেন না জয়ন্ত বোস। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে বাধা আসত, ঝড় উঠত, শান্তি ব্যাহত হত। সামনে যে দাঁড়িয়ে, তাঁর তুলনায় আগে অনেক সময় সে-ও বেশি কাম্য মনে হত অবশ্য। তাঁর নিজের মধ্যে যে চমক তার সবটাই পুরুষের চমক। পুরুষকারের চমক। ঘরের রমণীটির মধ্যেও তেমনি কিছু চমক দেখার লোভ থাকা স্বাভাবিক। এই অতিসাধারণ মহিলাটির মধ্যে সে-রকম চমকের ছিটে-ফোঁটাও নেই। কিন্তু এখন আর খেদও নেই। চমক না থাকাটাই বরং তাঁর মতো মানুষের পক্ষে শুভ হয়েছে।...তিন বছর আগে হঠাৎ যে চমক তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, আর যে-কোনো মহিলা হলে তার হৃৎপিণ্ড সুদ্ধ ধড়ফড় করে উঠত, আর তারপর পরিণামে তুমুল একটা কিছুই হয়তো ঘটে যেত। এই মহিলা স্তব্ধ বিমূঢ় মুখে খানিক চেয়ে ছিল তাঁর দিকে। কিন্তু শেস পর্যন্ত সহিষ্ণুতায় ফাটল ধরেনি। বিশ্বাসে চিড় খায়নি। আগেও যেমন তাঁর অবাধ্য হতে জানত না, তখনও তাই। তার পরেও তাই। মনে মনে তখন একটা চরম ফয়েসলার জন্যও প্রস্তুত ছিলেন জয়ন্ত বোস। কিন্তু তার কোনো দরকারই হয় নি।

রূপের লোভ তাঁর এখনো নেই এমন নয়। বরং বেশি মাত্রাতেই আছে। হোটেল রেস্তোরাঁর মোগলাই খানায় রুচি থাকলেও মাঝে মাঝে মুখ বদলাতে ইচ্ছে করে। তখন ঘরের সুক্ত শাকচচ্চড়ি আর হালকা মাঝের ঝোল বেশ উপাদেয় লাগে। বাইরের রূপের চটক থেকে সেই মেজাজ নিয়েও মাঝে মাঝে ঘরের দিকে চোখ ফেরান তিনি। তখন এই অতি সাধারণ একজনের সাদা-মাটা ঠাণ্ডা সহিষ্ণু রূপটুকুও ভালোই লাগে তাঁর।

নিজের কোনো দরকারি কথা নিয়েই এসেছে, অথবা কোনো ব্যাপারে পরামর্শ নিতে। কিন্তু তিনি কিছু জিজ্ঞাসা করেননি বলেই এখনো কিছু বলেনি। তিনি জিজ্ঞাসা করলে তবে বলবে। ফোনে বলেছিল, একটু দরকার ছিল। তিনি বলেছেন, এসো। এরপর

জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত দরকারি কথাটাই আগ বাড়িয়ে না বলার ধৈর্যটুকু যশোধরার ঠিক আগের মতোই আছে দেখছেন জয়ন্ত বোস। ধৈর্যের এই রূপটুকু মাঝে মাঝে বেশ উপভোগ করেন তিনি।

ইচ্ছে করেই এখনো ও-দিকে ঘেঁষলেন না তিনি। হাসছেন। যেন কোনো মজার কথাই শুনলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, কার অনেক বয়েস হল, তোমার না আমার?

হাসছেন অল্প অল্প যশোধরাও। দাঁতের আভাস ঝিকমিক করছে। টকটকে সিঁদুর টিপের একটু আভা যেন শামলা গাল ছুঁয়ে আছে। বললেন, তোমার আমার দুজনেরই।

নড়েচড়ে আর একটু সোজা হলেন জয়ন্ত বোস।—আমার কত?

হালকাভাবে সামান্য ভুরু কুঁচকে যেন নতুন করে একটু দেখে নেবার দরকার হল যশোধরার।—পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে।

—আর তোমার?

—পঁয়তাল্লিশ বোধহয়।

হৃষ্ট বদনে জয়ন্ত বোস নিজের কাঠামোটাই দেখে নিলেন একবার। —কিন্তু লোকে আমাকে চল্লিশও ভাবে না, আর তোমাকে তো ছত্তিরিশ-সাঁইত্রিশের বেশি ভাবেই না।

ছেলেমানুষি কথা শুনলেন যেন যশোধরা। —না ভাবলে বয়েস আটকে থাকে?

জয়ন্ত বোসের দু'চোখ এবার আপনা থেকেই তাঁর মুখে, দাঁতের ফাঁকে, বুকে, বুকের নিচে বার দুই ওটা-নামা করল। বললেন, বয়েস তো আটকেই আছে। আমি না হয় রেগুলার যোগ-ব্যায়াম আর আসন-টাসন করি—তুমি কি করো?

এবারে হেসেই উঠলেন যশোধরা। ওপরে-নিচের দাঁতের সারি ঝকঝক করে উঠল একবার। বললেন, আমি খালি খাই-দাই আর ঘুমোই—কেমন মুটিয়ে যাচ্ছি দেখছ না?

জয়ন্ত বোস দেখছেন। রমণীর ওই দেহ বরাবরই সামান্য মোটার দিক ঘেঁষা। কিন্তু তাঁর চোখে ওটুকু কখনো শ্রীশূন্য মনে হয়নি। ওই দেহের অন্ধিসন্ধি জানা তাঁর। কোথাও এতটুকু মেদের চিহ্ন মাত্র নেই। এ কি করে সম্ভব জয়ন্ত বোস কখনো ভাবেন নি। দশ বছর আগের যৌবন যেন একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে। ভিতরটা হঠাৎ চনমন করে উঠল জয়ন্ত বোসের। মনে হল অনেক দিনের উপোসী তিনি। এ-রকম মনে হলে এই অতিসাধারণ মুখশ্রীর রমণীটির মধ্যেও কতগুলো বিশেষ রূপ চোখে পড়ে তাঁর। যেমন ওই সরল হাসি, সরল কথা-বার্তা, দাঁতের সারি—আর সব মিলিয়ে এক ধরনের অকপট অনুগত মাধুর্য। অথচ এই শ্রী সম্পর্কে রমণী নিজে সচেতন নয় একটুও। এ যেন আপনি ঝরে।

বললেন, দাঁড়িয়ে কেন, বোসো না—

—তবু ভালো এতক্ষণে খেয়াল হল! দু'পা এগিয়ে এসে সামনের গদী-আঁটা চেয়ারটা টেনে নিলেন। কিন্তু বসলেন মোটা হাতলটার ওপর। একটা পা মাটিতে, অন্য পা মাটি থেকে তিন আঙুল ওপরে।

লোভের সময় অসময় নেই জয়ন্ত বোসের। দেখছেন। যে বসল, এ-রকম করে বসার আলগা শ্রীটুকু সম্পর্কেও সে সচেতন নয়। জয়ন্ত বোসের ধারণা, সচেতন ঘরের পুরুষের লোভ সম্পর্কেও নয় খুব। ফলে হঠাৎ কোনোরকম হামলার মধ্যে পড়ে গেলে ধড়ফড় করে ওঠে। তারপর বোঝে। তখন মুখের দিকে চেয়ে থাকে। হাসে অল্প অল্প। চোখ দিয়ে যেন বলতে চায়, এই দুষ্টুমির মতলব তোমার!

হামলা হঠাৎ-হঠাৎই করে বসেন জয়ন্ত বোস। অন্তত তিন বছর আগের আচমকা সেই এক ঘটনার আগে পর্যন্ত ওই রকমই রীতি ছিল তাঁর। যেমন মানুষ তিনি, বাইরের চটকে সব সময়ে চোখের নেশা, মনের নেশা জমত না। আর সে-রকম নেশার খোরাক সব সময় নাগালের মধ্যে মজুত থাকার কথা নয়। তাছাড়া ও-নেশা কখন চড়চড় করে মাথায় উঠে যাবে তা কি আগে থাকতে তিনি জানেন?

আগে যে কাণ্ড হামেশাই করে বসতেন, স্বভাবতই এখন সে সুযোগ ঢের কম। তাছাড়া আরো অনেক নেশা পর পর সার বেঁধে অপেক্ষা করছিল। দিন-রাতের বেশির ভাগ সময় একটা ঝোঁকের মধ্যে কাটছে। আর সামনে যে বসে, না ডাকলে সে-ও চোখের নাগালের মধ্যে বড় একটা আসে না। হঠাৎ-হঠাৎ জয়ন্ত বোস ডেকেছেন ঠিকই। কিন্তু তিন বছরের মধ্যে সে ক'টা দিন বা রাত, হাতে গোনা যায় বোধহয়। ডেকে বাধ্যতা পরখ করেছেন, সহিষ্ণুতা যাচাই করেছেন। তাঁকে অগ্রাহ্য করার মতো মাথায় কিছু খেলছে কিনা তাও খুব স্পষ্ট করে বুঝে নেবার দরকার ছিল। বোঝা গেছে। নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন। বাসনার শয্যায় পুরুষের দাবী প্রায় যথেচ্ছাচারী করে তোলা সত্ত্বেও বিদ্রোহের এতটুকু স্ফুলিঙ্গ চোখে পড়েনি।

কিন্তু আজ অন্য মেজাজে আছেন জয়ন্ত বোস। তেমনি চেয়ে আছেন। লোভ বাড়ছেই। আগে যেমন হত সেই গোছের বে-সামাল লোভ। যাকে দেখছেন তার সেটা বুঝতে পারার কথা। কিন্তু বুঝছে না যে এ-ও জানেন। মুখের দিকে চেয়ে থাকলেও যা বলতে এসেছে তা বলার সুযোগ এবারে পাবে ভাবছে হয়তো। এ জন্যেই আরো মজা লাগছে জয়ন্ত বোসের।

মাস দেড়েক আগের এমনি আর একটা দিনের কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। বেলা তখন আর একটু বেশি। এগারোটা সাড়ে এগারোটা হবে। সেদিন অবশ্য এই মেজাজে ছিলেন না তিনি। ওই মহিলার আচরণে কিছু একটা ব্যতিক্রমের সংশয় উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছল। তার চারদিন আগে ক'দিনের ছুটি কাটিয়ে বড় ছেলে সুবীর দেরাদুনে ফিরে গেছে। সে চলে যাবার পরদিন জয়ন্ত বোস জেনেছেন, তাঁদের দুজনের জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে একটা মোটা অঙ্কের টাকা তাঁর নামে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়েছে, নিচের ব্যাংকে সুবীর আর বাসু দুজনের নামেই আলাদা অ্যাকাউন্ট ছিল। আর দুই ছেলেই নাবালক বলে গার্জেন হিসেবে তাদের মায়ের নাম লেখা ছিল। সুবীর নাকি বছর দেড়েক আগেই সাবালক হয়ে গেছে। তাই গার্জেন হিসেবে নিজের নাম বাতিল করে যশোধরা শুধু বীরু অর্থাৎ সুবীরের নামে নতুন অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছে।

যশোধরার খরচ-পত্রের ব্যাপারে জয়ন্ত বোস কখনো মাথা ঘামান নি। আর সাবালক বড় ছেলের নামে পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা ট্রান্সফার করলেও তাঁর তেমন কিছু আপত্তি হবার কথা নয়। তাঁকে না জানিয়ে কাজটা করা হয়েছে। সংশয়ের আঁচড়টুকুও এই কারণে।

...যশোধরা অবশ্য পরদিনই, অর্থাৎ বীরু চলে যাবার পরেই কথাটা তাঁকে বলেছিল। খটকা বাঁধলে একটা ষষ্ঠ চেতনা যেন আপনা থেকে সজাগ হয়ে ওঠে জয়ন্ত বোসের। নির্লিপ্ততার আড়ালে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। তারপর অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন। যেমন সহজ সাদামাটা, তেমনি। তবু নিস্পৃহ সুরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হঠাৎ এর দরকার হল কেন?

জবাব যা শুনেছিলেন তাতেও কোনো কৃত্রিমতার লেশমাত্র ছিল না।—আর বলো কেন, দেরাদুনের কোর্স শেষ হলেই ছেলে বিলেত যাবে—এসে পর্যন্ত সেই এক কথা, সেখানকার ট্রেনিং কমপ্লিট করতে অনেক খরচ—টাকা ঠিক ঠিক মজুত আছে কিনা—একেবারে নিশ্চিন্ত করে দিলাম।

নিশ্চিন্ত কিছুটা জয়ন্ত বোসও বোধ করছিলেন। কিন্তু কিছুটা'র সঙ্গে আপোস নেই। বলেছিলেন, বীরুর বিলেত যাওয়া ঠিক তাও আমাকে বলোনি, তাছাড়া টাকা-পয়সা ট্রান্সফারের ব্যাপারও আমাকে না জানিয়ে হয়ে গেল...।

—ও মা! যথার্থই থতমত খেতে দেখা গেছল তাকে। —টাকা পয়সার ব্যাপারে কখনো তো তুমি কিছু জিগ্যেস করো না, আমি ভালো বুঝে যা করি তাতেই সায় দাও। সঙ্গে সঙ্গে আরো যেন কিছু মনে পড়েছিল যশোধরার। গলার স্বরেও অনুযোগের আভাস ছিল।—বীরু চলে যাবার আগের দু'দিনের মধ্যে তোমার দেখা পাওয়া গেছল যে বলব! তাছাড়া কাল ও চলে যেতে সমস্ত দিনটাই মন খারাপ ছিল—ও-সব মনেই ছিল না তো বলব কি?...তারপর বিড়ম্বিত নরম গলার প্রশ্ন, তুমি কি সত্যি রাগ করেছ নাকি?

এরপর নিজেরই খারাপ লেগেছিল জয়ন্ত বোসের। একটুতে বেশি-বেশি করা যেন রোগ তাঁর। জোরেই হেসেছিলেন তারপর। বলেছিলেন, না, বরং খুশি হয়েছি. ছেলেই সাবালক হয়নি, তুমিও এতদিনে খানিকটা সাবালিকা হয়েছ।

এর তিন দিন বাদে, অর্থাৎ সেই দেড়মাস আগে এই সকালের মতোই তিন তলা থেকে ফোন এসেছিল। —কিছু পরামর্শ ছিল, ফ্রী আছ?

টেলিফোনে যশোধরার গলার স্বরটুকু নিটোল মিষ্টি। হাতে কিছু কাজ নিয়ে বসেছিলেন জয়ন্ত বোস। কাজের সময় ব্যাঘাত বরদাস্ত হয় না। তবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কতক্ষণ লাগবে?

—বেশি হলে দশ-বারো মিনিট। খুব দরকার...।

—এসো।

...তক্ষুণি এসেছিল। আজকের মতো স্নান সারা হয়নি সেদিন। কপালে তার সিঁথির সিঁদুরও অনেকটা ঘষা মোছা ছিল। পিঠে ছড়ানো কালো চুলের বোঝারও এমন চেকনাই ছিল না সেদিন। এসে দাঁড়ানোর পর জয়ন্ত বোসের চোখের তারায় আজকের মতো প্রগল্‌ভ লোভও চিকিয়ে ওঠেনি।

—বলো।

সবটুকু শোনার সঙ্গে সঙ্গে দেড় মাস আগের সংশয়ের সেই একই আঁচড় দ্বিগুণ দাগ কেটে গেছে। যশোধরার ইচ্ছে, ছোট ছেলের এবার ক্লাসের পরীক্ষা শেষ হলেই তাকে কার্সিয়াং-এ রেখে পড়াবে। সেখান থেকে ভালো মতো সিনিয়র কেমব্রিজ পাস করে বেরুলে ওকে ডাক্তারি পড়ানোর সংকল্প। সেখানকার সব থেকে নামী স্কুলের রেক্টরের সঙ্গে এ-ব্যাপারে যোগাযোগও সারা। যশোধরার লেখা টাইপ করা দুটো চিঠির কপি দেখলেন জয়ন্ত বোস। রেক্টরের দু-দুটো জবাবও। শেষের চিঠিতে ছেলেসহ গার্জেনকে পত্রপাঠ গিয়ে দেখা করার নির্দেশ। দুই-একদিনের মধ্যেই যশোধরার বাসুকে নিয়ে কার্সিয়াং রওনা হওয়ার বাসনা।

না, তখনো কোনো প্রতিকূল সংশয়ের ছায়া ঘন হয়ে ওঠেনি। কারণ, যশোধরার

নিজস্ব জগৎখানায় ওই দুটো ছেলের মতো আর কেউ জুড়ে বসে নেই এ তিনি ভালো করেই জানেন। ছেলেদের ব্যাপারে এত ভাবনা-চিন্তা তিনি অন্তত কোনো বাপ-মায়ের দেখেন নি। আর সব-দিক বিবেচনা করে দেখলে এটা অস্বাভাবিকও কিছু নয়। যত অন্যায় বা অবিচারই করুন জয়ন্ত বোস, বিচারবুদ্ধি খুইয়ে বসেন নি। শুধু একটু অবাক লেগেছিল যশোধরার লেখা চিঠি দু'খানা পড়ে। সহজ ঝরঝরে ইংরেজিতে লেখা বড়সড় চিঠি দুটোই।

—এ চিঠি তোমাকে কে লিখে দিল?

—আমার সব কথা শুনে আর বুঝে নিয়ে ব্রিজেশবাবু লিখে দিলেন।

অর্থাৎ অ্যাটর্নি ব্রিজেশ ধর। এ-লাইনে এমন একটা ঢোঁক গেলা লোক জয়ন্ত বোস আর দেখেননি। কাজ ছাড়া ভালো মদের লোভেও এ-বাড়িতে আসা-যাওয়া তার। আগে বেশি আসত। ইদানীং কম আসছে। কেন, জয়ন্ত বোস তাও আঁচ করতে পারেন। কম আসে নিজের বউয়ের ভয়ে। ওর বউয়ের নাম আরতি। আরতি ধর। চার-পাঁচ মাস আগে জয়ন্ত বোসের সামনেই আরতি এক সন্ধ্যায় ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল ওর ওপর।—কাজ ছাড়া মদের লোভে ফের যদি হ্যাংলার মতো এখানে আসতে দেখি, ভালো হবে না বলে দিলাম!

বেচারা ব্রিজেশ ধর। মিনমিন করে বলেছিল, তু-তুমি এসেছ জানতাম না...।

আরতি আরো জোরে ধমকে উঠেছিল।—আমার কথা হচ্ছে না, আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি! তারপর রাগত মুখে জয়ন্ত বোসের দিকে ফিরেছে, আপনি ওকে অত আসকারা দেন কেন, মাত্রাজ্ঞান থাকে না, আর আমাকে যত ধকল পোহাতে হয়। ক'দিন আগে ডাক্তার ওকে লিভারের ক্ষতির ভয় পর্যন্ত দেখিয়েছে, জানেন?

সেই থেকে কম আসছে। এলে অবশ্য তিন তলায়ও ওঠে। কিন্তু ওকে দিয়ে যশোধরাও দিব্বি এ-সব কাজ করিয়ে নিচ্ছে জানা ছিল না। আরো আশ্চর্য, লোকটা এ-সম্পর্কে তাঁকে কিছুই বলেনি। যশোধরাও না।...ছেলেটার মাত্র বছর নয় বয়েস এখন, এরই মধ্যে তাকেও এখান থেকে সরিয়ে দিতে চায় কেন? বিরস সুরে জয়ন্ত বোস বলেছিলেন, ব্যবস্থা তো সব করেই ফেলেছ, এখন আর আমার সঙ্গে পরামর্শের কি আছে?

এটুকুতেও যশোধরা আহত যেন।—ওদের নিয়ে অত ভাবার সময় তোমার আবার কবে হয়েছে? তা বলে জানতেও চাও না?

—তুমি সত্যি চাইলে আমার সময়ের অভাব খুব হয় না, জানতেও চাই। কিন্তু আমার আপত্তির ভয়ে তুমি আগে কিছু বলো না।

শুনে দু'চোখ বড় বড় যশোধরার। —আপত্তি থাকলে তুমি আগে পরের পরোয়া করার মানুষ!

এটুকু অবশ্য ভালোই লেগেছিল জয়ন্ত বোসের! সহজে অমন সোজা কথা ও-ই বলতে পারে। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এ ছেলেকেও এখনই এখান থেকে সরানো দরকার ভাবছ কেন! বাড়িতে স্কুলের পড়া শেষ করে বড় ডাক্তার হওয়া যায় না?

জবাবে চোখে মুখে নিখাদ ভয়ের ছায়া দেখেছিলেন একটু। —তুমি কি সত্যিই আপত্তি করবে নাকি?

—এটা আমার কথার উত্তর হল না।

যশোধরার বড় বড় চোখ ফ্যাসাদে-পড়া মেয়ের মতোই তাঁর মুখের ওপর স্থির একটু। —কথার সত্যি উত্তর দিলে তোমার ভালো লাগবে না।

বলার এই অকপট রীতিটুকুই জয়ন্ত বোসের পছন্দ। ঠোঁটে হাসির ছোঁয়া লেগেছিল। —তা হলেও সত্যিটাই বলো শুনি।

—তুমি আমাকে যা-ই ভাবো আর যে-ভাবেই রাখো—ওরা তাদের মাকে ভালোবাসে। বাসুটা এরই মধ্যে কত রকমের কথা জিগ্যেস করে, জবাব দিতে গিয়ে আমি ফাঁপরে পড়ে যাই। তাছাড়া বাড়িতে হামেশা যা দেখছে তাও ওর পক্ষে ভালো কি মন্দ তোমার না-জানা না-বোঝার কথা নয়। না-না, আর বেশিদিন আমি ওকে এখানে রাখতে পারব না—লক্ষ্মীটি, তুমি আপত্তি করো না। সকলেই তোমার মতো নয় যে, যে-কোনো অবস্থা থেকে মাথা তুলে দাঁড়াবেই।

স্বার্থে ঘা না পড়লে সোজা যুক্তির কথা অগ্রাহ্য করেন না জয়ন্ত বোস। যা শুনলেন তার যুক্তির দিকটা অস্বীকার করতে পারেন না। যশোধরার প্রতি সুবিচার করেছেন এ তিনি নিজেও ভাবেন না।

আপত্তি করেন নি। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বাসুকে নিয়ে একলাই যাচ্ছ?

জিজ্ঞাসা করার কারণ, এ-সব ব্যাপারে মহিলাকে তেমন চৌকস ভাবেন না। কিন্তু জবাব শুনে কৌতুক বোধ করেছিলেন।

—ব্রিজেশবাবু সঙ্গে যেতে পারেন বলেছিলেন...নেবার দরকার আছে?

এবারে একটু তরল রসিকতাই করে বসেছিলেন জয়ন্ত বোস। —ব্রিজেশবাবুটি ইদানীং তোমার বেশ ভক্ত হয়ে উঠেছেন মনে হচ্ছে?

হাসি ভেঙেছিল যশোধরার মুখেও।—ইদানীং আবার কি, একটু খাতির যত্ন পায় বলে পারলে বরাবরই তো বউদি-বউদি করে আঁচল ধরতে আসে। তোমরা যা-ই বলো বাপু, ভদ্রলোক বেশ ভালো মানুষ।

অ্যাটর্নি ব্রিজেশ ধর বয়েসেও তিন বছরের ছোট হবে যশোধরার থেকে। অবশ্য যশোধরার বয়েস সম্পর্কে ব্রিজেশ ধরের কোনো ধারণাও নিশ্চয় নেই। সে সত্যিকারের ভক্ত হয়ে উঠলে আর যশোধরা তার প্রতি কিছু স্থূল কৃপা বর্ষণ করলেও জয়ন্ত বোস খুশি ছাড়া অখুশি হবার মানুষ নয়। তাতে নিজের বিবেক বাঁচে। কিন্তু সে-রকম যে হবার নয় তাও জানেন। সে রকম আভাস তাহলে তিন বছর আগেই পেতেন।

পরামর্শের সেখানেই শেষ ভেবেছিলেন। তার পরেও বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আর কিছু বলবে?

...মুখে বিড়ম্বনার মিষ্টি ছায়া পড়তে দেখেছিলেন একটু।

—বলব তো, কিন্তু শুনে আবার তুমি কি ভাববে ঠিক নেই। সেবার আগে না জানিয়ে বীরুর নামে টাকা ট্রান্সফার করেছিলাম বলে তো পাঁচ কথা শোনালে...

সঙ্গে সঙ্গে নড়েচড়ে একটু সোজা হয়ে বসেছিলেন জয়ন্ত বোস।—কি ব্যাপার? বাসুর নামেও ট্রান্সফার করেছ নাকি?

—করিনি এখনো, করার কথা ভাবছি। আগেই অস্থির হয়ো না, শুনে নাও। ছেলে দুটোর চিন্তা-ভাবনায় মাথাটা আমার ঠিক থাকে না জানোই তো। আর একবার মাথায় কিছু ঢুকলে রাতে ভালো করে ঘুমোতেও পারি না। বীরুটা দাঁড়িয়েই যাবে ধরে নিচ্ছি,

কিন্তু বাসু একেবারে ছেলেমানুষ, এখন ওর চিন্তা আমাকে পেয়ে বসেছে। কেবলই মনে হয় আমি না থাকলে ওটা ভেসে যাবে—

বাইরে বোঝা না গেলেও চাউনি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল জয়ন্ত বোসের।—ভেসে যাবার হলে তুমি থাকলেও যেতে পারে—তোমার না থাকার সমস্যা আসছে কোত্থেকে?

জেরায় পড়লে বেফাঁস সত্যিটাই মুখে এসে যায় যশোধরার। আর জয়ন্ত বোসও তাই পছন্দ করেন।

—বা রে, মানুষের কিছু ঠিক আছে, না তোমার মতি-গতির কিছু ঠিক আছে! এখন তিন তলায় ঠেলেছ, কোনদিন না বাড়ি থেকেই তাড়িয়ে দাও! আর এটা যদি রোগই ভাবো, সে-ও কি আমার দোষ?

জয়ন্ত বোসের নির্লিপ্ত দুটো চোখ অদূরবর্তিনীর মুখের ওপর বিঁধেছিল।—বাসুর কি ব্যবস্থা চাও?

—বাসুরও স্কুলের পড়া শেষ করে ডাক্তার হওয়া আর বাইরে থেকে ঘুরে আসার জন্য যা লাগবে গিফট ট্যাক্স-ফ্যাক্স দিয়ে সে-টাকাটা এখনই ওর নামে ফিক্সড্ ডিপজিট করে দাও।...আমি হিসেব করে দেখেছি, এক লক্ষ টাকা যদি রাখো, ওর এখনকার খরচা ইন্টারেস্ট থেকেই চলে যাবে, পরে যেমন যেমন লাগবে তুলে নেবে।

হিসেবের সুতো পেলে এর থেকে ঢের বেশি পাকা হিসেব জয়ন্ত বোস করতে পারেন। ভিতর দেখে মন বোঝার হিসেব। যা শুনলেন তার কতটা সত্যি আর কতটা চাপা বিদ্রোহ, অবিশ্বাস, আর ঘৃণা-বিদ্বেষ প্রসূত—সেই হিসেব।...বড় ছেলেকে ঢের আগেই বাইরে পাঠানো হয়েছে। এখন ছোট ছেলেকে সবানো হচ্ছে। যশোধরার পরিস্থিতিতে হয়তো যে-কোনো মায়ের মনেই ছেলেদের নিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভাবা স্বাভাবিক। বড় ছেলের কিছু ব্যবস্থা আগেই করেছে, এখন ছোট ছেলের ব্যবস্থার তাগিদ। কিন্তু এ-সব কিছুই হিসেবের বিষয় নয় জয়ন্ত বোসের। এই চিন্তা সংগোপন বিদ্রোহ আর অবিশ্বাস, ঘৃণা আর বিদ্বেষের সূচনা কিনা সেটাই তাঁর হিসেবের বিষয়।

...ঠিক-ঠিক হিসেব নেবার একটাই স্থূল রাস্তা জানা আছে তাঁর। সেটা জানোয়ারের রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে রমণীর ক্ষেত্রে হিসেবের নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় বলে তাঁর ধারণা।

চুপচাপ আরো খানিক মুখের দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বাসু কোথায়?

—সে-তো কখন স্কুলে চলে গেছে। কেন?

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন জয়ন্ত বোস।—ঘরে গিয়ে বসি চলো।

ভিতরের জানোয়ারটা হঠাৎ ক্ষ্যাপা দাপাদাপি করে উঠেছিল বলেই বাইরের আচরণ আরো ঠাণ্ডা। পিছনে যে আসছে তাকে প্রস্তুতির অবকাশ দিলে হিসেবে গরমিলের সম্ভাবনা। তার থেকে আরো আলোচনার জন্যে অথবা একেবারে চেক লিখে দেবার জন্য ঘরে ডাকা হয়েছে ভাবুক।

শিথিল পায়ে হল্-এর ভিতর দিয়ে নিজের ঘরের দিকে গিয়েছিলেন জয়ন্ত বোস। সামনে মনোহর দাঁড়িয়ে। বাইরে কি একটা দরকারী কাজ সেরে আসতে হুকুম করেছিলেন এখন মনে নেই।...পুরু পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকেছেন। গায়ে তখন পর্যন্ত সকালের স্লিপিং

গাউন চড়ানো। যশোধরা এসে দাঁড়াতে দরজা দুটো ভেজিয়ে দিয়েছিলেন শুধু। হুকুম না পেলে কেউ দরজা ঠেলে ঢুকবে না। যশোধরাকে ও-দিকের চেয়ারের দিকে এগোতে দেখে গায়ের স্লিপিং গাউন খুলতে খুলতে আঙুলের ইশারায় শয্যাটা দেখিয়ে অস্ফুট নির্দেশ দিলেন, ওখানে বোসো।

মতলবখানা কি যশোধরার মাথায় কিছুই ঢোকেনি, মুখের দিকে এক-পলক তাকিয়েই সেটা বুঝে নিয়েছেন। তবে না বসে তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। গাউন ফেলে জয়ন্ত বোস সোজা কাছে এসে সেই অবস্থাতেই অতর্কিত দখলের মধ্যে টেনে এনেছেন তাকে। হঠাৎ এভাবে আক্রান্ত হবার ফলে দু'হাতের লোহার বেষ্টনীর মধ্যে তাকে ধড়ফড় করে উঠতে দেখেছেন। ঠোঁট দুটো বাঁচানোর তাগিদে মুখ সরানোর চেষ্টা। গলার স্বরে অস্ফুট আর্তনাদ।—এ-সময়ে এ সব কি—যাঃ!

...দক্ষ শিকারীর মতোই রমণীর পরিপুষ্ট দেহ পলকে শয্যায় তুলে এনেছেন। জানোয়ারের মতোই গ্রাসের কলাকৌশলবর্জিত স্থূল রাস্তা বেছে নিয়েছেন। সর্বাঙ্গে গ্রাসের থাবা বসিয়েছেন। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রমণীর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন। এই একটা মুহূর্ত যখন সংগোপন বিদ্রোহ বা অবিশ্বাস, ঘৃণা বা বিদ্বেষ দুই চোখে গলগল করে ঠিকরে বেরুনোর কথা।

কিন্তু তা বেরুতে দেখলেন না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত না। আর অব্যাহতি নেই বুঝে হালছাড়া রমণীয় মাধুর্যে অভ্যর্থনার দরজা খুলে দিতে দেখেছেন। যে অভ্যর্থনা অনেক দিনের চেনা। এই রমণীর সমর্পণের প্রতিটি নিবিড় আচরণ তাঁর অনেক কালের জানা। ওই অভ্যর্থনা বা সমর্পণে এতটুকু খাদ মিশলে তিনি টের পেতেন। গ্রহণের রীতিতে এতটুকু ফাঁকি থাকলে তিনি বুঝতে পারতেন।

অভ্যর্থনায় ছলনা ছিল না। সমর্পণে খাদ মেশেনি। গ্রহণে ফাঁকি ছিল না।

সময় কতক্ষণ অচল হয়ে থমকে ছিল তিনি জানেন না। বুকের ওপর থেকে এক সময় তাঁর মাথাটা দু'হাতে ঠেলে তোলা হতে বিস্মৃতির রেশ গেছে। মাথাটা তখনো যশোধরার দু'হাতে ধরা। তার ঠোঁটে হাসি টিপটিপ করছিল, চোখে হাসি চিকচিক করছিল। সংশয়ের ভূতটা মাথা থেকে একেবারে নেমে যাওয়ার ফলে জয়ন্ত বোসের এটুকুও ভারী ভালো লাগছিল। হৃষ্ট মুখে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি দেখছ?

—তোমাকে। হঠাৎ এ-রকম দুষ্টুমিতে পেয়ে বসল কেন?

অকপটে সত্যি জবাবই দিয়েছিলেন জয়ন্ত বোস। বলেছিলেন, বাসুকেও সরিয়ে দিয়ে তার জন্য টাকা চাইতে আমি ভেবেছিলাম, ভিতরে ভিতরে তুমি আমাকে অবিশ্বাস করো আর ঘৃণা করো। ঠিক কিনা যাচাই করে নিলাম।

—ঠিক?

—বোধহয় না।

যশোধরার বড় বড় দু'চোখ তাঁর চোখের ওপর।—তোমাকে অবিশ্বাস করব...আর ঘৃণা করব!

—তাহলে ওরা আমারই ছেলে, ওদের জন্য আমার কোনো দায় নেই ভাবো কেন?

—ভাবি আমার মাথা খারাপ হয় বলে। কিন্তু এখন দেখছি আমার থেকে তোমার বেশি মাথা খারাপ। থাক। বাসুর যা হয় হবে, তোমাকে টাকা দিতে হবে না।

কিন্তু এরপর সেদিন সত্যিকারের উদার হতেই চেয়েছিলেন জয়ন্ত বোস। মানুষের সুসময় দুঃসময়ের ঠিক কিছু নেই। তার জন্যে তিনি পরোয়া না করতে পারেন, অন্য কেউ করলে দোষ দেওয়া যায় না। শয্যা থেকে নেমে এসে দেরাজ খুলে চেকবই বার করে বাসুর নামে এক লক্ষ টাকারই চেক লিখে যশোধারার হাতে দিয়েছিলেন। নগদ এরপর খুব অঢেল কিছু থাকল কিনা তখনকার মতো এ-চিন্তাও মাথায় আসেনি। টাকা তাঁর কাছে স্রোতের জলের মতো। আসে। যায়।

চেয়ারের হাতলে বসে যশোধরার একটু উসখুসানি টের পাচ্ছেন, তবু ইচ্ছে করেই একটু সময় নিচ্ছেন জয়ন্ত বোস। চুরুট টানছেন, আর থেকে থেকে দেখছেন। আজ কোনো সংশয়ের আঁচড় পড়েনি। কোনো যাচাইয়ের প্রশ্নও নেই। কি বলতে আসা এখন পর্যন্ত তাই জানেন না। আজ লোভের দিকটাই বড়। সেদিনের থেকে আজ ঢের বেশি ভালো লাগছে। স্নান সেরে আসার ফলে পিঠে ছড়ানো চকচকে চুলের গোছা খুব শুকনো নয়। টকটকে সিঁদুর টিপ আর সিঁথির আগুনের শিখার মতো সিঁদুরের আঁচড় আপনি চোখ টানে। পরনে দামী পাতলা শাড়ির চওড়া লাল পাড় থেকেও একটু রক্তিম আভা যেন রমণীর শ্যাম অঙ্গ ছুঁয়ে আছে। দু'হাতের ছিলে-কাটা চুড়ি ক'গাছা আর গলার মোটা দানার হার নতুন বানানো কিনা জানেন না। যশোধরার গায়ের রং চাপা বলেই ওগুলো যেন ওই অঙ্গে বেশি ঝকঝক করছে। আগে মাঝে মাঝে জয়ন্ত বোসের মনে হত, কালো না হয়ে ফর্সা হলে যশোধরাকে অতটা মানাত না। অনেক দিন বাদে আজ সেটা বেশি মনে হচ্ছে। না, দেড়মাস আগের সেই একদিনের পরে আর কোনো রমণীর নিরিবিলি সংস্রবে আসেন নি। ...দীপেন গুপ্তের বোন কমল গুপ্ত খুব সম্ভব এখনো হাসপাতালে। সেদিকের প্ল্যান কেমন করে যেন বানচাল হয়ে গেছে সে-আঁচ গেলবারে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে অনেকটা পেয়েই গেছেন। ব্রিজেশ ধরের বউ আরতি ধর মাঝে একবার আপিসে ফোন করে প্রোগ্রাম জানতে চেয়েছিল। ডাকলে আসত। কিন্তু তাঁর তখন মেজাজও ছিল না, ফুরসতও ছিল না। তাছাড়া ওই মহিলার মতিগতি অন্য রকম, কথায় কথায় তার সেই এক জুলুম আর এক বায়না বেড়েই চলেছে। সেই কারণেই মাস দুই হল তাকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলছেন জয়ন্ত বোস। আসলে অতনু-তৃষ্ণা মাথায় চড়ে না বসা পর্যন্ত সদা ব্যস্ত কাজের মানুষ তিনি। কাজ যখন করছেন না তখনো বহু রকমের প্ল্যান মাথায় ঠাসা। কিন্তু সেই তৃষ্ণা একবার পেয়ে বসলে দুর্বার মানুষ তিনি। যেমন আজ। এবং এই মুহূর্তে।

সিঁড়ি থেকেই মাকে ডাকতে ডাকতে বাসু নেমে এলো। স্কুলে যাবার জন্য তৈরি হয়ে নামছে। পিছনে বইয়ের ব্যাগ হাতে রূপা। আর ক'টা দিন পরেই সে-ও দাদার মতো বাইরে পড়তে যাচ্ছে এই গর্বে ন'বছরের ছেলের এখন উনিশ বছরের হাবভাব। কিন্তু হল-এ পা দিয়ে অদূরের 'কা বারান্দায় মা আর বাবাকে কাছাকাছি বসা দেখে লজ্জা-লজ্জা মুখ। এ-রকম দৃশ্য শিগগীর দেখেনি। হল-এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল। না ডাকলে হুট করে কাছে যাওয়া ভদ্রতা নয়, এটুকু জানে।

যশোধরা হাসিমুখে হাত তুলে কাছে ডাকলেন তাকে। কাছে এসে মায়ের দু'গালে দুটো চুমু খেল বাসু। মা-ও তাই করলেন। স্কুলে যাওয়ার আগে এটুকু রোজকার নিয়মের অঙ্গ।

যশোধরা বললেন, বাপিকে আদর করে যা—।

লজ্জা কাটাবার জন্যেই বাসু মুখ খুলল। বলল, স্কুলে যাবার সময় বাপি রোজ বাড়ি থাকে না, আর থাকলেও ডাকে না।

বাবার দু'গালে নিজের গাল ঠেকিয়ে সে গটগট করে ফিরে চলল আবার। রূপা সিঁড়ির কাছে বইয়ের ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে।

একটু বাদেই তাদের আর দেখা গেল না। কিন্তু রূপা ছেলেকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এক্ষুনি আবার ফিরবে জয়ন্ত বোসের সে হিসেব আছে। ওটুকু সময় কাটানোর জন্য যশোধরার দিকে ফিরে হেসেই বললেন, ছেলে বেশ স্মার্ট হয়ে উঠেছে দেখছি।

যশোধরা খুশি মুখে জবাব দিলেন, তোমার ছেলে স্মার্ট হবে না তো কি—গায়ের রংটাই শুধু আমার পেয়ে বসল।

রং ছেড়ে দুই ছেলেরই মুখের আদল যে মায়ের মতো জয়ন্ত বোস সেটা অনেক আগেই লক্ষ্য করে রেখেছেন। তবু নতুন করে ওদের মায়ের রং দেখায় মনোযোগী হলেন যেন। মুখে বুকে সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার। যেন শাড়ি জামা ফুঁড়েই রং দেখছেন। বললেন, তুমি আগে যা ছিলে তার থেকে কিছু ফর্সা হয়েছ।

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। আগে তো বেশ কালোই ছিলেন যশোধরা। এখন যেটুকু, সেটুকু তোয়াজে থাকার ফল।

—থাক, তুমি আর বোলো না, লোকে হাসবে। আমার এক একসময় এমন রাগ হত, ইচ্ছে হত আগুন লাগিয়ে গায়ের চামড়া ফর্সা করে ফেলি। তোমার যত আক্ষেপ তো এইখানে।

শুনতে মজা লাগছে জয়ন্ত বোসের। আক্ষেপের বদলে এই মুহূর্তের মনোভাব যদি ও জানত। ধৈর্য কমে আসছে। সিঁড়ির দিকে চোখ ফেরালেন। ঢিমে পায়ে রূপা তিন তলায় চলে যাচ্ছে।

এবারে নিশ্চিন্ত। খুশি মুখে ঘুরে বসলেন। দু'চোখে হাসি ছড়ালেন একটু। বললেন, তোমার রংয়ের দাম তুমি নিজেই জানো না।

তোষামোদের কথা শুনে যশোধরা লজ্জা পেলেন একটু।—থাক, তোমাকে আর বেশি বলতে হবে না।...কিন্তু আমি আর কতক্ষণ বসে থাকব?

জয়ন্ত বোস গদির চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হাসছেন। চশমার কাচের ও-ধারে দু'চোখ চিকচিক করছে।—আর বসতে হবে না, ঘরে যাই চলো।

মতলব এতক্ষণে বোধগম্য হল যেন যশোধরার। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল সে-ও। গালে রক্তিম আভা ছড়াল। চাপা গলায় বলে উঠলেন, সময় নেই অসময় নেই—কোনো কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকত তোমার। মনোহরটা এদিক-ওদিক ঘুরঘুর করছে—

বিড়ম্বিত টসটসে মুখখানার দিকে চেয়ে মজাই লাগছে জয়ন্ত বোসের। গলা খাটো করে জবাব দিলেন, প্রভুভক্ত কুকুর পাঁচ হাত তফাতে বুক চেপে বসে চার আঙুল জিভ বার করে প্রভু আর প্রভু-পত্নীর বিহার দেখে কত সময়—ও তো ঘরের বাইরে ঘুরঘুর করছে।

—কি যাচ্ছেতাই লোক তুমি, আমি এলাম দুটো দরকারি কথা বলতে—না-না, বোসো—

—তোমার দরকারি কথা মানে, হয় ছেলেদের কথা নয়তো আজেবাজে ভাবনার কথা, পরে শোনা যাবে'খন, এসো—

শশব্যস্তে এবারে বাধাই দিয়ে উঠলেন যশোধরা।—না, চান-টান সেরে এসেছি, এরপর ঠাকুরঘরে যাওয়া আছে—এখন ও-সব হবে-টবে না। তুমি শুনবে তো বোসো, নইলে চলে যাই।

এবারে থমকে তাকালেন জয়ন্ত বোস। এই একজনের কাছ থেকে এরকম বাধা পেতে কখনোই অভ্যস্ত নন। ভুরুর মাঝে ভাঁজ পড়ল সামান্য। কোথায় যেন একটু জোরের দিক দেখছেন।

—ঠাকুরঘর মানে?...তোমার ঠাকুরঘর?

—তুমি তো সব খবরই রাখো, বয়েস হচ্ছে, ঠাকুরঘর থাকবে না? চেয়ে আছেন। বাধা পড়ল বলেই বাসনার আগুন চোখে আরো বেশি জমাট বাঁধছে।—ঠাকুরঘরে যাওয়া আছে বলে তুমি আমার ঘরে যেতে পারছ না?

বিড়ম্বনার মধ্যেই পড়লেন যেন যশোধরা।—কি মুশকিল! বললাম তো না। এমন অবুঝপনা করো তুমি! হেসে ফেলে গলা খাটো করে বললেন, রাগ কোরো না. পরে এসো না-হয়—

—আমি আসব! কোথায়?

—কেন, তুমি এ-বাড়ির তিন তলা চেন না?

—কখন?

—দুপুরে।

—দুপুরে কাজ আছে। বেরুবো।

নাচার যেন যশোধরাই। ওই মুখের দিকে চেয়ে আবারও না হেসে পারলেন না —তাহলে রাতেই এসো, ভালো করে রান্না-বান্না করে রাখব, যত্ন করে খাওয়াব, তারপর না-হয় সেবাদাসীও হব। হল?

কি দেখছেন জয়ন্ত বোস? কাকে দেখছেন? কার কথা শুনছেন? আজ তেইশ বছর বাদে এই একজনকেও আবার নতুন করে দেখতে শুনতে বুঝতে হবে! একসঙ্গে ঠিক এতগুলো কথা আর এই রকম কথা কোনোদিন শুনেছেন? যশোধরাকে কোনোদিনও খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে ভাবেননি তিনি। এখনো যে ভাবছেন তা না। তবে তার সহজ সরল বুদ্ধির আর অকপট কথাবার্তার প্রশংসা অনেক সময়েই মনে মনে করেন, আর করেছেন। কিন্তু এইসব কথা আর কথার জবাবগুলো তীক্ষ্ণবুদ্ধি ইঙ্গিতজ্ঞা মেয়ের মতোই সরস, অনায়াস। যেমনটি দেখলে বা শুনলে লোভ দ্বিগুণ হয়। বাসনা দ্বিগুণ ঝলসে উঠতে চায়। তাই হয়েছে। তাই উঠেছে। এখন জয়ন্ত বোস দুটো কাজ করতে পারেন। ওই রমণী দেহ টেনে হিঁচড়ে নিজের ঘরে নিয়ে যেতে পারেন। ছিঁড়ে-খুঁড়ে যেটুকু বোঝার বুঝে নিতে পারেন। তারপর অনাপোস ভোগ-বিস্মৃতির অতলে টেনে নিয়ে গিয়ে অবাধ্যতার শাস্তি দিতে পারেন। আর তা না হলে ঠাণ্ডা হয়ে আবার ওই চেয়ারে বসে যে দরকারি কথা বলতে এসেছে তা শুনতে পারেন।

প্রথম বাসনাটাই প্রবল। কিন্তু এই ঢাকা-বারান্দার পর হল-ঘর, তারপর তাঁর ঘর।

দিনমানে সত্যিই টেনে-হিঁচড়ে বা আলতো করে তুলে নিয়ে যাওয়া যায় না। ফিরে ওই গদি-আঁটা চেয়ারেই বসলেন আবার।

—বোসো।

এবারে আর হাতলে না বসে যশোধরা সেই চেয়ারটাতেই বসলেন।

চোখে-মুখে একটু নির্লিপ্ত ভাব টেনে আনতে চেষ্টা করলেন জয়ন্ত বোস। এ-রকম একটা অনভ্যস্ত পরাজয়ের পর এটুকু পারাও সহজ নয়। তবু পারলেন। সেই ফাঁকে অদূরবর্তিনীর মুখখানা আর একবার দেখে নিলেন। হঠাৎই মনে হল, তাঁর অগোচরে দীর্ঘকালের কিছু একটা প্রস্তুতির ব্যাপার ঘটে গেছে। আর তাঁর অগোচরেই সেই প্রস্তুতির ফল ধরেছে। এই অবাধ্যতা, এই প্রচ্ছন্ন জোরের আভাস বা এই অনায়াস সরসতার আর কোনো মূল খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি।

—কি বলবে বলো।

যশোধরার মুখে বিব্রত হাসি।—তোমার মুখ দেখে এখন বলতে ভয় করছে।

—খুব ভয় করছে?

—খুব না, একটু একটু।

—তাহলে বলেই ফেলো। ছেলেদের জন্য আরো টাকা চাই, না আরো কিছু ব্যবস্থা চাই?

আমতা আমতা করে যশোধরা বললেন, ছেলেদের নয়, আমার নিজের একটু অন্যরকম ব্যবস্থা দরকার।

চোখ-মুখের নির্লিপ্ত ভাবটুকু ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না আর। দু'দুবার যেমন হয়েছিল তার দ্বিগুণ আঁচড় পড়ল এবার। দু'বারই ঠকেছেন তিনি? দেড় মাস আগের সেই শয্যার হিসেবেও ভুল হয়েছে? সেই অভ্যর্থনা, সেই সমর্পণ, সেই গ্রহণও সত্যি নয়? আন্তরিক নয়? না, রমণীর তেইশ বছরের রীতিনীতি জানা, তাঁর মতো পুরুষের এমন ভুল হতে পারে না। জয়ন্ত বোস চেয়ে আছেন, অপেক্ষা করছেন।

হেসে যশোধরা আর এক প্রসঙ্গে চলে এলেন। বললেন, ওটা সামান্য ব্যাপার, পরে শুনো। মুশকিলের কথাটা শোনো আগে—বীরুটা ভয়ানক ক্ষেপে গিয়ে চিঠি লিখেছে আমাকে, বলেছে, আর কখনো এ-বাড়িতে আসবে না। খামের ওপরেও আমার নাম যশোধরা বোস লেখেনি, লিখেছে যশোধরা রায়—ভাগ্যে মনোহর বা ড্রাইভারের হাতে ওটা পড়েনি!

আলতো কথাগুলো আচমকা মুগুরের ঘা বসিয়ে দিল যেন। এমন যে, বাসনার শেষ তাপটুকুও চোখ থেকে সরে গেল। দেখছেন। দেখছেনই।

—ও জানল কি করে?

—আবার কি করে, আমারই কাণ্ড। মাথার মধ্যে এক-একসময় কি যে হয়। সেদিন মনে হল, ছেলে বড় হয়েছে, তাকে সব জানিয়ে রাখা ভালো। তুমি আমাকে যেভাবে বলেছিলে সেই রকম করেই গুছিয়ে আর বুঝিয়ে লিখেছিলাম—আবার একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে তাও লিখেছিলাম। বোকাটা এমন ক্ষেপে যাবে ভাবিনি—

জয়ন্ত বোসের ফর্সা মুখ রাগে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে একটু। খড়খড়ে চাউনি।—তোমার কপালে সিঁথিতে ও-সব কি?

থতমত খেয়ে যশোধরা নিজের কপালে আর সিঁথিতে আঙুল ছোঁয়ালেন। আঙুলের মাথায় সিঁদুরের দাগ।—কি? সিঁদুর?

—হ্যাঁ। ওগুলো এখনো ওখানে আছে কেন?

যশোধরা জবাব দিলেন না। চেয়ে আছেন। মুখে বেদনার ছায়া।

এবারে গলার স্বর আরো কঠিন জয়ন্ত বোসের। এই স্বরও চেনেন তিনি।

—এখনো ওগুলো মুছে ফেলনি কেন?

যশোধরা এবারে জবাব দিলেন। বললেন, তুমি বলেছিলে আমার বিয়ে হয়েছে জয়ন্ত বোসের সঙ্গে, আর আদালতে ডিভোর্স হয়েছে জিতেন বোসের সঙ্গে। বলেছিলে, আমি যেমন আছি তেমনি থাকব, আর ওগুলোও যেমন আছে তেমনি থাক—বলেছিলে পরে সব ঠিক হয়ে যাবে, না হলেও আমাদের সম্পর্ক ভাঙবে না, যদি—

—হ্যাঁ, বলেছিলাম। বলেছিলাম যদি অনুগত থাকো, যদি বিশ্বাস রাখো। আরও অনেক কিছু বলেছিলাম, আর তুমি তা ভোলোওনি। কিন্তু তাহলে তুমি ছেলেকে ও-সব লিখতে গেলে কেন? তাহলে তোমার মাথার গণ্ডগোল হয় কেন? এর নাম বিশ্বাস? এর নাম অনুগত থাকা?

গলা একটু একটু করে চড়ছিল। মানুষটাকে ক্ষিপ্ত হতে দেখলে যশোধরা চুপ করে থাকেন, চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। এখনো চেয়ে আছেন বটে, কিন্তু চুপ করে থাকলেন না। নরম সুরেই বললেন, তুমি খামোকা রাগ করছ—ছেলে বড় হয়েছে, তিন বছর ধরে ফি বার বাড়ি এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি, তুমি তিন তলায় কেন, দোতলায় ও-রকম কোলাপসিবল গেট কেন—তোমারই ছেলে, হাবা-বোকা নয়, কত আর চোখে ধুলো দেব।

মেজাজী লোকের ভুল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে যেমন হয়, জয়ন্ত বোসের ভিতরটাও তেমনি অসহিষ্ণু। কিন্তু যশোধরার গলায় সত্যিই আপোসের সুর।

—যাক, বলছি তো ছেলেকে লেখা অন্যায় হয়েছে। আমাকে ক্ষমা করো।

বড় ছেলে জেনেছে বলে যে জয়ন্ত বোস উতলা খুব, তা নয়। তাঁর নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে, রাগের এটাই বড় কারণ। এটা বিদ্রোহ বা বিদ্বেষের সূচনা হলে ভাবনারও কারণ। এই ক্ষমা চাওয়া কতটা নির্ভেজাল আর কতটা মেকি তাও যেন ঠাওর করতে পারছেন না। এখনো মনে হচ্ছে, ওই মুখে কৃত্রিমতার ঠাঁই হতে পারে না।

এবারে নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করলেন একটু। ঠাণ্ডা মাথায় কিছু চিন্তা করার সময় এসেছে এটুকু বুঝছেন। আর ঠাণ্ডা মাথায় কাজে এগোলে সত্যিকারের সংকটও হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে পারেন। নিজের ইচ্ছেয় যেমন নিজের দুটো হাত বা পা চলে, যশোধরাকেও তেমনি তাঁর ইচ্ছের অধীনে জেনে অভ্যস্ত এতকাল। সেই অভ্যস্ততায় ঘা পড়েছে। পড়েছে কিনা ওই মুখের দিকে চেয়ে এখনো তা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

—ঠিক আছে।...তোমার নিজের ব্যবস্থার কথা কি বলছিলে?

চেয়ার ছেড়ে যশোধরা এবার কাছে এগিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্রূর অভিলাষ যেন শিরায় শিরায় দাপাদাপি করে গেল জয়ন্ত বোসের। আঁচলের আড়ালে তাঁর হাতের খামটা এতক্ষণ চোখে পড়েনি।

খাম থেকে একটা টাইপ করা চিঠি বার করতে করতে যশোধরা বললেন, তোমার

খুব আপত্তি না হলে এটা সই করে দাও।...তা না হলে আমার একটু অসুবিধে হচ্ছে।

ভুরু কুঁচকে জয়ন্ত বোস চিঠিটা হাতে নিলেন। তাঁরই প্যাডে নিচের ব্যাংকের ম্যানেজারের নামে টাইপ করা চিঠি। সেই চিঠি পড়ে জয়ন্ত বোস স্তম্ভিত। সব সংশয়ের অবসান এবার হয়েই গেল বোধহয়।

...চিঠিতে নিচের ব্যাংকের ম্যানেজারকে তিনিই অর্থাৎ জয়ন্ত বোস নির্দেশ দিচ্ছেন, ব্যাংক থেকে প্রাপ্য মাসিক সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা ভাড়ার চেক আগামী মাস থেকে যেন যশোধরা দেবীর নামে কাটা হয় এবং তাঁর নিজস্ব অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়।

পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিঠিটা ছিঁড়ে কুচিকুচি করে যশোধরার মুখে ছুঁড়ে মারার আক্রোশ কোনোরকমে সামলে নিলেন। অনেক জানার আছে, অনেক বোঝার আছে। অস্ত্রোপচারের ছুরি হাতে নেবার দরকার হলে ঠাণ্ডা মাথায় নিতে হয় এটুকু তাঁর খুব ভালো জানা আছে।

চিঠিটা সামনের টেবিলে ফেলে গদীর চেয়ারে গা ছেড়ে বসলেন। তাকালেন। চাউনিটা খরখরে নয় আর। সোনার পাতে আটকানো চশমার পুরু কাঁচের ও-ধারে দু'চোখ চিকচিক করছে এখন। সামান্য হাসির ছোঁয়াও লেগেছে তাতে। বাইরের বড় কোনো ফয়েসলার মুখোমুখি হলে যেমন হয়।

এটুকুরই ঘায়ে যশোধরা এক পা সরে দাঁড়ালেন—দেখো, তোমার ওই চাউনি আমি চিনি। সই করবে করো, না করবে তো না করো—ভয় দেখিও না।

...হয়তো চেনে। কিন্তু এতকাল বাদে এই রমণীকে তাঁর নতুন করে জানতে হচ্ছে, চিনতে হচ্ছে—এটাই আশ্চর্য।

—যশোধরা দেবী কে?

—থাক। আমি চলি—

সত্যিই যাবার জন্য পা বাড়ালেন।

—দাঁড়াও।

ফিরলেন।

—যশোধরা দেবীর নামে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে?

যশোধরার চোখ দুটো এবারে তাঁর মুখের ওপর হোঁচট খেল একপ্রস্থ। তারপর আস্তে আস্তে বলল, তোমার এমনি অবিশ্বাস এখন যে নিজে বলে নিজেই ভুলে গেছ! তিন বছর আগে তুমি বলোনি কখন কি দরকার হয়, আলাদা একটা অ্যাকাউন্ট খুলে রাখা ভালো? বলোনি?

মনে পড়ল। বলেছিলেন। তখন অনেক রকম দরকার, অনেক রকম সম্ভাবনার কথা মনে এসেছিল। কিন্তু দরকার শেষ পর্যন্ত কিছুই হয়নি।

—বোস নয়, রায় নয়, দেবী কেন?

—সব দিকই বজায় থাকবে বলে।

—তা তোমার অসুবিধে কি হচ্ছে, জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে মাসে আড়াই হাজার করে তুলছ, তাতে চলছে না?

—খুব ভালো চলছে না, দিনকালের খবর তো তুমি রাখো। জয়েন্ট অ্যাকাউন্টও হালকা হয়ে এসেছে, নতুন করে জমা তো কিছু পড়ছে না, কেবল তোলাই হচ্ছে।

সেদিন হীরের সেটটা করতে চল্লিশ হাজারের ওপর খরচ হয়ে গেল—পরে ভাবলাম না গড়ালেই হত।

আবারও চোখে হাসি চিকচিক করছে জয়ন্ত বোসের। যশোধরা এভাবে নিজের ভবিষ্যৎ গোছাতে চাইবে কল্পনা করেননি।

—তোমার আরো বেশি টাকা চাই, না ব্যাংকের সাড়ে পাঁচ হাজার বাড়ি ভাড়াটাই চাই?

—পরেরটা হলেই ভালো হয়, বার বার চাইতে হয় না।

জয়ন্ত বোসের গলার স্বরও মোলায়েম এখন।—কিন্তু ওই সাড়ে পাঁচ হাজার থেকে বাড়ির ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স আর মেইন্টিন্যান্স বাদ দিয়ে মাসে আড়াই হাজারও থাকে না যে সে খবর জানা আছে?

—তোমাকে এ-রকম হিসেব করতে তো কখনো দেখিনি—তোমার না থাকতে পারে, আমার থাকবে না কেন? তোমার ট্যাক্স লেভেল আর আমার ট্যাক্স লেভেল সমান?

জয়ন্ত বোসের আবারও মনে হল, আজ যা দেখছেন, যেমন দেখছেন তা অনেক দিনের নিঃশব্দ প্রস্তুতির ফল।...এ বাড়ির জমিটা যশোধরার নামে কেনা হয়েছিল। কি একটা দরকারি কাজে সে-সময় তিনি দিল্লী চলে গেছলেন। লেন-দেনের ব্যবস্থা সব ঠিকই হয়ে গেছল। যশোধরাকে বলে গেছলেন জমিটা তার নামে কিনে রেজিষ্ট্রি করে নিতে। জয়ন্ত বোস কলকাতায় থাকলেও ওটা স্ত্রীর নামেই কেনা হত। তাই হয়েছে। আর সেই জন্যেই যশোধরা ধরে নিয়েছে, জমি যখন তার নামে, বাড়িও তারই। চোখের হাসি ঠোঁটের দিকে নেমে আসছে এখন।

—বেনামদার বলে একটা কথা আছে তুমি জানো?

অপ্রতিভ মুখ যশোধরার।—সেটা কি ব্যাপার?

—কোর্টে দাঁড়ালেই প্রমাণ হয়ে যাবে তোমার নামে যা কিছু সব আমার—তুমি আমার বেনামদার মাত্র, তার বেশি কিছু নও।

—টাকাটা চাইলাম বলে তুমি কোর্ট পর্যন্ত ভেবে নিলে?

—না। তোমাকে জানিয়ে রাখলাম।...তা অ্যাটর্নি ব্রিজেশ ধর এত সব ভালো ভালো পরামর্শ তোমাকে এমনি দিচ্ছে না, তোমার কাছ থেকেও কিছু পাচ্ছে!

যশোধরা নিরীহ মেয়ের মতোই ভ্যাবাচাকা খেলেন প্রথম। তারপর অনুযোগ ভরা চোখে চেয়ে রইলেন খানিক। ঠোঁটের ফাঁকে হাসি উছলে উঠছে। শেষে বলেই ফেললেন, ব্রিজেশ ধরের বউ তোমার কাছ থেকে যা পায় বা পাচ্ছে সে-রকম কিছু পায় না। জিভও কাটলেন সঙ্গে সঙ্গে।—রাগ করলে?

অদ্ভুতই লাগছে আজ জয়ন্ত বোসের। এমন নির্দয় আকর্ষণ আর বুঝি জীবনে অনুভব করেন নি। দেড়হাতের নাগালের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এখন। হাত দুটোকে বশে রাখার তাড়নায় নিজের চেয়ারের গদি-মোড়া হাতল দুটোকেই দুমড়োতে চাইলেন। কিন্তু চোখের হাসিটুকু তাড়ালেন না। মাথাও নাড়লেন।—না। খুব ভালো লাগছে তোমাকে। একেবারে নতুন লাগছে।...কিন্তু আমি যা করি খোলাখুলিই করি, লুকিয়ে চুরিয়ে নয়।

আপোসের কথা শুনে স্বস্তি বোধ করলেন যেন যশোধরা। হেসেই জবাব দিলেন, তাহলে তুমিও নিশ্চিন্ত থাকো, যেভাবে তুমি তাকাচ্ছ আমার দিকে, এক তুমি ছাড়া আর

কেউ সে-ভাবে আমার দিকে তাকালেও তার মুখ আমি থেতলে দিতে জানি।...এতকাল তোমার সঙ্গে ঘর করছি, বাইরের লোকের পরামর্শ আমার দরকার হয় না। নিজে যা ভালো বুঝি তাই করি।

ইংরেজি কথা বলার স্কুলটুল আছে জয়ন্ত বোস জানেন, কিন্তু বাংলায় এ-রকম কথা বলা শেখানোর ব্যবস্থা কোথাও আছে বলে জানেন না, আজ সকাল থেকে যত কথা শুনলেন, গত ক'মাসের সব কথা একসঙ্গে যোগ করলে এত হবে না হয়তো। আর এ-রকম তো হবেই না।

—ও...তাহলে ভালো বুঝে নিজেই তুমি ব্যাংকের সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা বাড়ি ভাড়াটা চাইছ?

যশোধরা মাথা নাড়লেন। তাই।

—আর তা যদি না দিই তা হলে তুমিই এরপর কোর্টে যাবে?

যশোধরার চাউনি এবারে গভীর একটু। —কেন তুমি এত জেরা করছ? ও-সব আমি কিছু ভাবিনি, আর তুমি দেবে না তাও আশা করছি না।

—কেন আশা করছ না?

—কারণ তোমার ওই মনোহরের মতো আমাকেও তুমি প্রভুভক্ত কুকুর ভাবো সে আমি চাই না। এতকাল তুমি যে-ভাবে খুশি সেইভাবে আমাকে চালিয়েছ, কিন্তু ছেলেরা বড় হচ্ছে, তাদের কাছে আমার কিছু মর্যাদা আছে। বাসু চলে যাবার আগে বীরুকে আমি একবার আসার জন্য লিখব। সে জানে এই সমস্ত বাড়িটাই আমার। আমার বাড়িতে তুমি আছ। বাড়ি কার সে ফয়েসলা ভবিষ্যতে কখনো করা দরকার হবে কিনা সেটা পরের কথা। কিন্তু এখন সে এসে জানবে এতসবের পরেও তার মা নিঃসম্বল করুণার পাত্রী তোমার, এ আমি চাই না!

জয়ন্ত বোসের চেনা জানা আর বোঝা আপাতত শেষ। শুধু তেইশ বছর যাকে চোখের ওপর দেখে আসছেন তার এমন প্রস্তুতি অকল্পনীয় বিস্ময় তাঁর কাছে। এমনটা মাত্র তিন বছরের মধ্যে হতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। কারো শেখানো-পড়ানো ব্যাপার হলে জয়ন্ত বোস অনায়াসে সেটা ধরতে পারতেন। এক ধরনের সহজ সত্তাবোধ অবশ্য বরাবরই লক্ষ্য করেছেন, আর মনে-মুখে খুব একটা তফাৎ লাগেনি কখনো। সেই সহজ সত্তাবোধ এমনিই সহজ অথচ চূড়ান্ত রূপ নিতে পারে! আরো আশ্চর্য, মনে-মুখে এখনো তফাৎ লাগছে না খুব!

সকালে যখন এখানে কাজে আর কাগজ পড়তে বসেন, টেবিলের ওপর লাল আর কালো কালির দুটো কলমও থাকেই। ঝুঁকে টাইপ করা চিঠি-সুদ্ধু ছোট টেবিলটা কাছে টেনে নিলেন। লাল কালির কলমটা খোলাই ছিল। এই এক চিঠির সইয়ে সামনের মাসে ব্যাংকের সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার চেক যেমন যশোধরা দেবীর নিজস্ব অ্যাকাউন্টে জমা হবে, তেমনি যে কোনো দিন আর এক চিঠির সইয়ে সে-ব্যবস্থা বাতিলও করা যাবে। বাতিল যে করবেন তাও নিশ্চিত। কিন্তু আজ সই করবেন, কারণ তিনি বুদ্ধিমান মানুষ। কাগজে-কলমে দু'দুটো চেইন বিজনেসের কাজ এখনো যশোধরা রায়ের নামে চলেছে। আগে চলত যশোধরা বোসের নামে। শুধু ট্যাক্স নয়, আরো অনেক রকমের জটিলতার ব্যাপার জড়ানো এর সঙ্গে। কাগজ-পত্র সামনে ধরে দিয়ে যেমন বলা হয়, যশোধরা

তেমনি সই করে দেয়। অনেক বিল পেমেন্ট চেকও তাকে দিয়ে সই করানো হয়। অবশ্য সব কিছুরই একচ্ছত্র মালিক জয়ন্ত বোস, আর সমস্ত ব্যবসার চেক-বই পাস-বইও তাঁরই কাছে। তবু যেখানে প্রকাশ্যে মালিকানা জাহির করলে অসুবিধে সেখানে এ-রকম ব্যবস্থার প্রয়োজন। যশোধরার একটা চিঠি সই না করে হঠাৎ কোনো ফ্যাসাদে পড়তে চান না। অন্যদিকের সব-কিছুর নিষ্পত্তি হলে তবে ফয়েসলা।

খসখস করে চিঠির নিচে নিজের নাম সই করে দিলেন জয়ন্ত বোস। টাইপ-করা ধপধপে সাদা কাগজের নিচে লাল টকটকে নাম।

ছেলেমানুষের মতোই খুশি হয়ে উঠলেন যশোধরা। ঝুঁকে কাগজটা হাতে নিলেন। —শুধু শুধু এতক্ষণ বকাঝকি করলে, আমি জানতাম তুমি সই করে দেবে। পরক্ষণে হেসে ফেলে গলা খাটো করে বললেন, ও-কি, এ-ভাবে চেয়ে আছ কেন—গিলবে নাকি আমাকে?

জয়ন্ত বোস দেখছেন। দেখছেন দেখছেন দেখছেন।

—অনেক বেলা হয়ে গেল চলি; তুমি রাতে আসছ তাহলে, পছন্দের রান্নাই করে রাখব, দেব'খন।

আলতো করে কথা ক'টা বলেই পিছন ফিরে দ্রুত প্রস্থান।

জয়ন্ত বোস দেখছেন। নির্দয় লোভে আর হিংস্র আক্রোশে চোখ দুটো ধক-ধক করছে।...মাত্র সিঁড়ির কাছাকাছি গেছে। এখনো চকিতে উঠে গিয়ে ওকে ধরতে পারেন। ওখান থেকে তাঁর ঘর কাছে। অনায়াসে টেনে নিয়ে যেতে পারেন।...তারপর দুর্বার দখল নেবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত রমণী অঙ্গ ফালা ফালা করে আরো কত দেখার আছে, দেখে নিতে পারেন।

বসেই রইলেন। সংযমের এমন দুর্ভর শিকলের অভিজ্ঞতাও জীবনে এই প্রথম।

❀

দু'সিঁড়ি ওঠার পর গতি মন্থর যশোধরার। চোখের আড়ালে এসেছেন। ধীরে সুস্থে উঠতে লাগলেন। ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসি ঝুলছে। কিন্তু মাঝের বাঁক ঘুরেই থমকালেন একটু। তিন তলার সিঁড়ির মাথায় রূপা দাঁড়িয়ে। তাঁর কেমন মনে হল ও ঠিক ওইখানেই দাঁড়িয়ে ছিল না এতক্ষণ। চোখাচোখি হতে ভ্রূকুটি করে তাকালেন।—আড়ি পাতছিলি?

রূপা থতমত খেয়ে উঠল বেশ—কিযে বলেন দিদিমণি তার ঠিক নেই! দিন-দুপুরে আবার আড়িপাততে যাব কি!

হাসি চেপে যশোধরা তিন তলায় উঠে গেলেন। ওটা বজ্জাতের শিরোমণি। বোকা সেজে এই রকম মজার কথা বলে।

সোজা নিজের ঘরে। ঠাকুরঘরে ঢোকার তাড়া সত্যিই নেই। চিঠিটা খামে ভরতে ভরতে ড্রেসিং টেবিলের দিকে এগোলেন। ছোট্ট শৌখিন টাইম-পীসটার দিকে চোখ গেল। সবে এগারোটা। দুটো পর্যন্ত সময় আছে। নিজেই গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে চিঠিটা দিয়ে আসবেন। আপাতত ওটা ড্রেসিং টেবিলের ওপরেই পড়ে থাকল।

আয়নায় নিজের দিকে তাকালেন। হাত-খানেক পিছনে সরে এসে আবার তাকালেন। সিঁথির লাল আঁচড়...কপালের সিঁদুরটিপ...চোখ-নাক-মুখ...গলা...বুক...বুক

থেকে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত দু'চোখ নেমে এলো। থমকালেন। আয়নায় দেখলেন ঘরের পর্দা সরিয়ে রূপা গলা বাড়িয়েছে।

পাখাটা একবারে ফুল স্পিডে চালিয়ে দিয়ে নিজের খাটে পা ছড়িয়ে বসলেন। —কি চাই?

রূপা বলল, কোনো দরকার আছে কিনা খোঁজ নিচ্ছিলাম—

—দরকার থাকলে আমি তোকে ডাকতে জানি না? এদিকে আয়—

দিদিমণির ধমক-ধামক ভারী মিষ্টি লাগে রূপার। ওর প্রতি তাঁর ইদানীংয়ের আচার-আচরণ আরো মজার লাগছে। ওকে নিয়ে দিদিমণির মতলব যতটুকু বুঝেছে তা যদি সত্যি হয় তো বিচ্ছিরি লজ্জার কথা। রূপা সবে সাড়ে তিন বছর হল এ-বাড়িতে এসেছে। বাকিটা কাল এই দিদিমণির পায়ে মুখ রেখে অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারে।

কাছে এসে দাঁড়াল।

যশোধরা ঘাড়ের পিছনে দু'হাত নিয়ে নিজের চুলের বোঝার গোছা ধরে পিঠের সমস্ত চুলগুলো একবার ঝাঁকিয়ে নিলেন।—সব ঠিক আছে কিনা দেখ্ তো!

—ও মা, এরই মধ্যে ঠিক থাকবে না তো কি, ওষুধ তো মাত্র সবে পরশু—

—এই! যশোধরা চোখ পাকিয়ে তাকালেন তার দিকে।

রূপা হাঁসফাঁস করে উঠল—মুখ ফসকে বলে ফেলেছি দিদিমণি, আর কক্ষণো ভুল হবে না।

—দেখ্।

পিছনে এসে রূপা দু'হাতে চুলগুলো ফাঁক করে করে দেখতে লাগল। খানিক বাদে বলল, সব একেবারে ভ্রমর কালো গো দিদিমণি, একটাও অন্যরকম নয়।

যশোধরার ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ঝুলছে আবার।

একটু বাদেই সচকিত। একটা পরিচিত হর্ন কানে এলো যেন। ঘড়ির দিকে তাকালেন। সাড়ে এগারোটা। —সাহেবের গাড়ি বেরুলো বোধহয়, বারান্দায় গিয়ে দেখে আয় তো মনোহর চালাচ্ছে না চিমনলাল—

রূপা ছুটে বেরিয়ে গেল। ফিরেও এলো তক্ষুনি। —সাহেব গাড়িতে উঠলেন, চিমন চালাচ্ছে।

এবারে মনে মনে হাসছেন যশোধরা।...যতো দাপাদাপি করেই বেরুক, যন্ত্রনা জুড়োবে না। রাতে ফিরবে। তারপর ঘাড় সোজা করে আজ তিন তলায়ও উঠে আসবে।

রূপা আবার চুলের দিকে হাত বাড়াতে যাচ্ছিল, যশোধরা বাধা দিলেন, থাক, হয়েছে। শোন্, সাহেব আজ রাতে এখানে খেতে পারেন, দুপুরে একবার মনোহরের কাছে যাবি, সাহেব আজকাল নতুন কিছু খাওয়া-দাওয়া পছন্দ করেন কিনা জেনে-শুনে আসবি, আর বিকেলে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবি। বড় করে তাকিয়ে চাপা ধমকের সুরে বললেন, আমার কথা বুঝতে পারছিস?

গম্ভীর দিদিমণির চোখের তারায় হালকা আলো ঠিকরোচ্ছে। রূপা হেসে ফেললে বিপদ। তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল। বুঝতে পেরেছে।

—যা পালা এখন, আমার ঠাকুরঘরে যাওয়া আছে।

রূপা চলে গেল। খাট ছেড়ে যশোধরা আবার আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

মাথায় বজ্রাঘাত যেন মনোহর মাহাতোর। অনেকদিন ধরেই একটা অদেখা বিপদের গন্ধ পাচ্ছিল সে। চোখের অগোচরে সেটা যেন থিতিয়ে থিতিয়ে বড় হয়ে উঠছিল। অনেক মাথা ঘামিয়েও মনোহর হদিস পাচ্ছিল না কি বিপদ বা কেমন বিপদ। আজ অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে গেছে। সব বোঝেনি, সব শোনা যায়নি, কিন্তু যেটুকু শুনেছে আর বুঝেছে তার ধকলেই দিশেহারা।

হল আর ঢাকা বারান্দার ও-ধার জুড়ে লম্বা টানা করিডোর। তিন তলার সিঁড়ির বাঁক থেকে সেটা দেখা যায়। আরো নেমে এলে বা হল-এ দাড়ালে তো দেখা যায়ই। ঢাকা বারান্দার শেষের দিক থেকেও দেখা যায়। কিন্তু সাহেব চেয়ার টেবিলের মাঝামাঝি জায়গায়। উঠে পিছনে সরে না এলে দেখে ফেলার ভয় নেই।

মনোহর একটা ঝাড়ন হাতে সেই করিডোরে চলে এসেছিল। রেলিং পালিশ করেছে, কিন্তু ঢাকা-বারান্দা থেকে সাহেব বা বউদিমণি পিছন দিকে ঘাড় ফেরালে দেখে ফেলতে পারেন সেই ভয়ে রেলিংয়ের চার ভাগের তিন ভাগের বেশি এদিকে আসেনি। করিডোরের দেয়াল পরখ করেছে কোথাও কোনো ময়লার দাগ পড়েছে কিনা। তক-তকে মেঝে থেকে ধুলো-কণা খুঁজে বার করার কাজেও নিবিষ্ট হয়েছে থেকে থেকে। চোখে দেখার উপায় নেই, কিন্তু কান সজাগ। যে মতলবে ওখানে চলে এসেছিল সেটা নিজেও সে গর্হিত ভাবে। কিন্তু অদম্য কৌতূহলে নিজের দুটো পায়ের ওপর বশ ছিল না তার। কাছে পিঠে থাকা তো কর্তব্য তার, সাহেব কখন ডাকেন ঠিক কি। দুজনের চোখের সামনে সঙের মতো হল-এও দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। যখন দাঁড়িয়েছিল, বউদিমণির একবারের তাকানোর অর্থটাও না বোঝার মতো বোকা নয় সে। এখানে থাকলে ডাক শুনলেই ঘুরে হল-এর ভিতর দিয়ে সামনে হাজির হতে পারবে।

তাছাড়া বাড়ির অন্য চাকর ড্রাইভারদের সঙ্গে তো তার তুলনা হয় না। সাহেব আর বউদিমণিকে সে পরম আপনার জন ভাবে। এত আপনার আর তার কে আছে? তাই এই পরিবারের শান্তি নিয়ে তার আশা যেমন, অশান্তি নিয়ে আবার উদ্বেগও তেমনি। আজ তিন তলা থেকে বউদিমণি চান সেরে, চওড়া লালপেড়ে ধপধপে শাড়ি পরে, কপালে আর সিঁথিতে টাটকা সিঁদুর চড়িয়ে মাথা আচড়ানো এক রাশ কালো চুল পিঠে ছড়িয়ে নিচে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে আশাটাই বড় হয়ে উঠেছিল মনোহরের। কেন, তা মনে হলে বিষম লজ্জা। দেড় মাস আগের সেই এক দিন বউদিমণির ওপর সাহেবের গোড়ার মেজাজ দেখে মনোহর প্রথম ঘাবড়েই গেছল। ও তখন হলঘরের মাঝামাঝি জায়গায় ছিল। তারপর সাহেব উঠে এলেন, পিছনে বউদিমণি—হঠাৎ ওকে একটা তুচ্ছ কাজে সাহেব বাইরে পাঠিয়ে দিলেন কেন, তাও মাথায় ঢোকেনি। মিনিট পনেরর মধ্যে ঘুরে এসে দেখে সাহেবের শোবার ঘরের দরজা ভেজানো। তখনো ভেবে পায়নি কি হল। তারও খানিক বাদে দূর থেকে বউদিমণিকে হালকা মুখে বেরিয়ে তিন তলায় উঠে যেতে দেখেছে। তারপর যা তার মনে হয়েছে, লজ্জায় নিজেরই নাক-কান মলেছে অনেকবার। তবু বার বার তার মনে হয়েছে সাহেব তার মরদ বটে একখানা।

আজও বউদিমণিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হয়েছে, সাহেব ঘায়েল হলেন বলে। বউদিমণিকে মনে মনে দেবীই ভাবে সে, কিন্তু সাহেবের কাছে তো আর দেবী নন। বউদিমণির গায়ের রংয়ের খুঁতটা ওর চোখেই পড়ে না। অমন ঢলঢলে চেহারা-পত্তর ও-বয়সে ক'জনের থাকে!

সাহেবের প্রথম চাউনি দেখেই মনে হয়েছিল আজও ভালো শাস্তির দিনই হবে। তারপর বউদিমণির সঙ্গে চোখাচোখি হতে সরে না এসে উপায় কি। যা বোঝানোর বউদিমণি অনেক সময় চোখ তাকিয়েই সেটা বুঝিয়ে দেন। ওকে একরকম সরে যেতেই বলা হয়েছে।

কিন্তু তার পরেই দম বন্ধ মনোহরের। অনেক কথাই অবশ্য শুনতে পায়নি, অনেক কথা অস্পষ্ট শুনেছে, আবার অনেক কথা, বিশেষ করে সাহেবের কথার বেশির ভাগই স্পষ্ট শুনেছে। দুই একবার ওর নিজের নামটাও কানে এসেছে। তখন আবার সাহেবের গলার স্বরও চাপা, আর বউদির গলা তো মাঝে মাঝে খাটো হয়েছে কিন্তু কোনো সময়েই চড়েনি।

চোখে দেখতে না পেলেও গোড়ার দিকের হালকা হাওয়া যে একেবারে উল্টে যাচ্ছে মনোহর সেটুকু আঁচ করতে পেরেছে। কিন্তু পরে যেটুকু বুঝল, অমন সর্বনেশে ব্যাপার ওর কল্পনার মধ্যেও ছিল না।

...সাহেবের সঙ্গে বউদিমণির আদালতে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে? বিয়ে নাকচ হয়ে গেছে? সাহেবের আর এক নাম যে জিতেন বোস সেটাও তার অজানা ছিল না। সেই জন্য দোতলার এই কোলাপসিব্‌ল গেট, সিঁড়ির রেলিং-এ পার্টিশন আর, আর এক তলার নামের প্লেটে সাহেবের নামের পর ফার্স্ট ফ্লোর লেখা! বীরু দাদাবাবুকে বিয়ে নাকচের কথা বউদিমণি লিখেছেন বলে সাহেবের এত রাগ!

বউদিমণির বেশির ভাগ কথাই ভালো শুনতে পায়নি। যেটুকু বোঝার সাহেবের রাগের কথা থেকে বুঝে নিয়েছে। কিন্তু অমন ভালোমানুষ বউদিমণির তেজটুকু আঁচ করেও সে তাজ্জব বনে গেছে। সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার চিঠিতে সাহেবের সই নিয়ে তবে ছাড়লেন।...একেবারে শেষটুকু আর শোনা হয়নি। বউদিমণি এবার তে-তলায় রওনা হবেন মনে হতেই ঝাড়ন হাতে এদিকে চলে এসেছে।

...তারপর সাহেবের থমথমে মুখ দেখে হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি ধরেছে তার। সাহেবকে খাঁচায়-পোরা একটা জ্যান্ত বাঘের মতো মনে হয়েছে। বউদিমণি যখন সিঁড়ির দিকে চলে যাচ্ছিলেন তখন আরো ভয়ের মানুষ মনে হচ্ছিল সাহেবকে। পারলে যেন জল দিয়ে চিবিয়ে খান।

চান টান না করে আধ ঘন্টার মধ্যেই সাহেব বেরিয়ে গেলেন। সাহেবের বাড়িতে খাওয়ার পাট তো এখন একরকম উঠেই গেছে। চানও অনেকদিন সাহেব বাইরেই সারেন। কিন্তু যে মুখ করে বেরিয়ে গেলেন তাতেই যেন দুর্যোগ ভিড় করে আসছে মনোহরের চোখের সামনে।

নিজের স্নান সে সকালেই সেরে রাখে। খানসামা এখনো আছে। ওদের রান্না সে-ই করে। কিন্তু আহার-তৃষ্ণারও তাগিদ নেই আর।

ঢাকা বারান্দার নিচে সাহেবের কাগজপত্র গোছানোর জন্য এগিয়ে এলো। টেবিলের ওপর সেই খোলা বিজ্ঞাপনের পাতাটাতে চোখ গেল। যে-পাতাটা পড়ে সাহেব মিটিমিটি হাসছিলেন আর তারপর ওকে ভোটের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

মন মেজাজ খারাপ সত্ত্বেও মনোহর রীতিমতো অবাক। একটা বিজ্ঞাপনের চারদিকে গোল লাল কালির দাগ। অনেক সময় অনেক রকমের বিজ্ঞাপনে সাহেব লাল কালির

দাগ মেরে রাখেন। কিন্তু এ কেমনধারা বিজ্ঞাপনে লাল দাগ! ইংরেজি কাগজ হলেও বিজ্ঞাপনের বড় বড় হরফ মনোহরের পড়তে বা বুঝতে অসুবিধে হল না।

একগাদা সাধু মহাত্মারা ভোটে জেতার ব্যাপারে ইন্দিরা  কে আশীর্বাদ করছেন। সেইসব সাধু মহাত্মাদের নাম!

সাহেব এর থেকে কি মজা পেলেন মনোহর ভেবে পাচ্ছে না।

ঢিমে-তালে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের ছোট ঘরে এলো যখন বেলা একটা পার। হল্ ছাড়িয়ে পিছনের সেই করিডোরের অন্যদিকে মনোহরের আলাদা ছোট্ট ঘর। এও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সাহেবের সঙ্গে থেকে থেকে তারও ভিন্ন রুচি। একপাশে নেয়ারের খাটিয়া পাতা। তাতে বিছানার ওপর পরিষ্কার রঙিন চাদর পাতা। পায়ের তলায় ছোট আয়না। দেয়ালে দেড়-হাত প্রমাণ আয়না টাঙানো। তার আবার সেলফ আছে। সেখানে চিরুনি গন্ধ তেল ইত্যাদি।

হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছে। এখন পাঁচটা পর্যন্ত টানা ঘুম লাগানো যেতে পারে। কিন্তু মাথায় কেবল সকালের ব্যাপারটাই ঘুরছে।

—মনোহরদা ঘুমালে নাকি গো?

শোয়া থেকে আঁতকে উঠে বসল মনোহর। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রূপা। তার হাসি-হাসি মুখ দেখে খুব একটা দরকারে এসেছে মনে হল না। এ-সময় এখানে ওকে দেখলে কে কি ভেবে বসে থাকবে ঠিক নেই। যদিও দেখার মতো আপাতত কেউ আর দোতলায় নেই। তবু চোখ পাকিয়েই তাকালো মনোহর।

—কি চাই?

রূপা পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে এসেছে। এ-বাড়িতে ও-ই মাঝে মাঝে পান চিবোয়। বউদিমণি ক্বচিৎ কখনো পান খান। তাঁর আসকারাতেই রূপার এত সাহস। ধরাকে সরা দেখে। পান-খাওয়া সেই লাল ঠোঁট টিপে হেসে ঘরের মধ্যে পা ফেলল সে।—এলাম একবারটি তোমার কাছে।

আগে অন্য সব চাকর বেয়ারা ড্রাইভারের মতো রূপাও একটু ভয় করত মনোহরকে, সমীহ করত। কিন্তু আজকাল ওকে দেখলে মনোহরেরই কেমন গোল বেঁধে যায়, ওকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে। আগে মনোহর চোখ পাকিয়ে তাকালে বা কড়া ধমক দিলে ঘুরেফিরে ওর কাছে মাপ চাইতে হত। সেটা দিদিমণির ভয়ে। প্রথমদিকে কর্ত্রীর কাছে ও একবার মনোহরের নামে নালিশ করতে গেছল। বউদিমণি ওকেই উল্টে কষে ধমকে দিয়েছিল।—ফের মনোহরের নামে কিছু বলতে এলে বাড়ি থেকেই তাড়িয়ে দেব!

বউদিমণির আসকারা পেয়ে সেই মেয়ে খাড়াখাড়ি বজ্জাত হয়ে উঠেছে। কোনোদিনই ওকে খুব ভালো মেয়ে ভাবত না মনোহর। বউদিমণির বাপের বাড়ির চেনাজানা ঝিয়ের মেয়ে। বউদিমণির দাদা বেঁচে থাকতে সেখানে মাঝে মাঝে যেতে হত মনোহরকে। বউদিমণিকে নিয়ে যেত। দরকার পড়লে তার ফরমাশ নিয়ে একলাও যেতে হত। এ-বাড়ি আসার আগে সেখানেও দেখেছে রূপাকে। পরে শুনেছে ওর চৌদ্দয় বিয়ে হয়েছিল, ষোলয় বিধবা হয়েছে। আট-ন' বছর নিজের বুড়ী মায়ের সঙ্গে সেখানে কাজ করেছে। তারপর হঠাৎ একদিন এখানে এসে বউদিমণির কাছে কান্নাকাটি করে পড়েছে। ওকে আশ্রয় দিতে হবে। ওকে নাকি মিথ্যে বদনাম দিয়ে বউদিমণির দাদার

বিধবা বউ সেখান থেকে তাড়িয়েছে। মনোহরের ধারণা দাদা মারা যাবার আগেও তাঁর বউয়ের সঙ্গে বউদিমণির বনিবনা ছিল না। সেই কারণেই রূপার আশ্রয় মিলেছে। অথচ দূর থেকে বউদিমণিকে স্বকর্ণে বলতে শুনেছিল, মিথ্যে বদনাম আবার কি, তোর স্বভাব চরিত্র আমার জানা নেই!

রূপা তখন একেবারে বউদিমণির দু'পা জাপটে ধরেছিল।

সেয়ানা মেয়ে সেই থেকে এ-বাড়িতে। এখন আঠাশ-ঊনত্রিশ বয়েস হবে ওর। আগে এ-রকম ছিল না। মনোহরের ধারে-কাছে ঘেঁষতে ভরসা পেত না। কিন্তু গত সাত-আট মাস ধরে বিশেষ করে হাবভাব অন্যরকম দেখছে ওর। বউদিমণিকে তোয়াজ তোষামোদ করে ভালোরকম হাত করেছে বোঝা যায়। মনোহরকে ছাড়া যেমন সাহেবের চলে না, ওকে ছাড়াও তেমনি বউদিমণির চলে না, হাব-ভাব চালচলনে এটা সে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ এ-বাড়িতে ওর আর তার যেন একই রকমের মর্যাদা। মনোহরের আঁতে লাগে। সে একজন জাত-ড্রাইভার। মাস গেলে সাহেব ওঁকে পাঁচশ টাকা মাইনে দেন। তবু মুখ বুঝে সহ্য করতে হয়। বাড়ির কর্ত্রী যদি আসকারা দিয়ে কারো মান বাড়িয়ে দেন সহ্য না করে উপায় কি।

মাস তিন-চার হল রূপার যেন আরো বেশি বাড় বেড়েছে। ঠারে ঠোরে তাকায়। ফিকফিক হাসে। মনোহরের তেতাল্লিশ বছর বয়স এখন, নিজেকে বুড়ো ভাবতে চেষ্টা করে। কিন্তু তবু অস্বস্তি হয়। সেই সঙ্গে রাগও হয় নিজের ওপর। রূপার সাহস যত বাড়ছে, ও যেন কি রকম একটু দুর্বল হয়ে পড়ছে। আরো রাগ এই জন্যে যে, এক-এক সময় তাকাতে ইচ্ছে করে, একটু ভালো করে দেখতে ইচ্ছে করে। সরাসরি তাকায়ও না, দেখেও না। কিন্তু নিজের গোপন ইচ্ছেটা তো টের পায়। ঠাসঠাস করে নিজেকে চড়াতে ইচ্ছে করে তখন। প্রাণপণে নিজের মরা বউ দুর্গার মুখখানা মনে করতে চেষ্টা করে। তবু ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে সে।

বউদিমণি ডাকলে বা অন্য কোনো দরকারে তিন তলায় উঠলেই আগেভাগে রূপা এসে সামনে দাঁড়াবে। যেন ওকে দেখতে বা ওর কাছেই আসা হয়েছে। হাত মুখ নেড়ে যে-ভাবে সামনে এগিয়ে আসে মনোহরের জিভ শুকিয়ে যায়। এ-ক'বছরে ভালো খেয়ে পরে যে হারে তরতাজা হয়ে উঠেছে রূপা, তাও মনোহরের চোখ এড়ায়নি। মনে মনে প্রমাদ গণে মনোহর। বউদিমণির কোনোরকম খারাপ সন্দেহ হলে তার আর গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া উপায় কি! এ-বাড়ি ছেড়ে সে তো স্বর্গে গিয়েও সুখে থাকবে না!

তিন হপ্তা আগে এই নচ্ছাড় মেয়ে যে শয়তানি করে বসেছিল, হঠাৎ মাথাই খারাপ হবার দাখিল মনোহরের। ডাকে বউদিমণির কাছে দেশ অমৃত আরো কি সব সাপ্তাহিক কাগজ আসে। বিকেলে সেদিন তারই একটা পৌঁছে দিতে তিন তলায় উঠেছিল। বউদিমণি গা ধুয়ে বাথরুম থেকে বেরোননি তখনো। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। তারপর দেখল, বারান্দার রেলিংয়ে ঝুঁকে রূপা রাস্তা দেখছে। সেদিকে তাকিয়েই ওকে ডাকবে না কাগজ রেখে চলে যাবে ভাবছিল, ঠিক তক্ষুনি পাজি মেয়ে ঘুরে তাকাল। আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ গোল করে শুধলো, কি মতলব?

গম্ভীর মুখে মনোহর বলল, বউদিমণির কাগজ। দিয়ে দিস—

কাগজটা হাতে নিয়েই রূপা মুখ বাঁকাল। টেনে টেনে যে-কথা বলল মনোহরের

কান-মাথা গরম।—উঁ-উ। পিছন থেকে ড্যাব ড্যাব করে দেখা হচ্ছিল কাগজ! দাঁড়াও তোমার বউদিমণিকে বলছি!

খুব গলা চেপেও বলল না কথাগুলো। ছলাৎ করে মাথায় রক্ত উঠে গেল মনোহরের। চাপা হিস-হিস স্বরে বলে উঠল, মিথ্যুক! গলা টিপে শেষ করে ফেলব!

তক্ষুনি আবার ওদিক থেকে বউদিমণি এসে হাজির। তাকে আসতে দেখে মনোহরের মেজাজ আরো বিগড়ে গেছল। কাণ্ডজ্ঞান খুইয়ে বলে উঠেছিল, ওকে মুখ সামলে কথা বলতে বলে দিন বউদিমণি। নইলে কক্ষনো আমি আর তিন তলায় উঠব না।

বউদিমণি ভুরু কুঁচকে রূপার দিকে তাকিয়েছিলেন।—কি বলেছিস?

দু'দিকে একবার মাথা নেড়ে মিথ্যুক ছুটে চলে গেছে। অর্থাৎ কিছুই বলেনি। ওর হাত থেকে কাগজ নিয়ে বউদিমণি বলেছেন, ওকে আমি খুব বকে দেব'খন, যা—।

বললেন বটে, কিন্তু কোনো গুরুত্ব দিলেন এমন মনে হয়নি মনোহরের। আর বকা-টকা যে হয়নি তাও পরে রূপাকে দেখেই বোঝা গেছে। নইলে ও একটু সমঝে চলত।

ভর দুপুরে, দোতলায় যখন আর জনপ্রাণী নেই, পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে পাজি মেয়ে সোজা তার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। সাহসী জোয়ান লোকটার বুক টিপটিপ করে উঠেছে আর চাউনি দেখে গা শিরশির করছে।

ধমকের সুরেই বলে উঠল, এসেছিস তো দেখতেই পাচ্ছি। কেন? কি চাই?

—বা-ব্বা! আমি কি পেত্নী না শাকচুন্নি যে আমাকে দেখলেই আঁতকে ওঠো? দিদিমণিকে বলিগে যাই তোমার কথা শোনার আগেই মনোহরদা আমাকে ধমকে তাড়িয়ে দিল।

রূপার মুখে দিদিমণি শুনলেই আগে মনোহরের কান কট-কট করত। এখন কিছুটা সয়ে গেছে। বিয়ের পর বউদিমণিকে গোড়ায় মেমসাহেব বলত মনোহর। তখন একদিন ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে মেমসাহেব বলো কেন, মেমসাহেবরা কালো হয় না ফর্সা হয়?

ও ভয়ে ভয়ে জবাব দিয়েছিল, ফর্সা হয়।

—তাহলে আমাকে কালো মেমসাহেব বলবে।

তখন এই রকমই গম্ভীর আর সাদাসিধে রসিকতার ধাত ছিল। মনোহর তার মন বুঝে নিয়ে বউদিমণি ডাকা শুরু করেছিল। আর এই মেয়ে এসেই দিদিমণি দিদিমণি করে গায়ে লেপটে থাকতে চেয়েছে। অথচ অন্য চাকর ড্রাইভাররা এখনো তাঁকে মেমসাহেবই বলে।

মনোহর সচকিত।—বউদিমণি ডেকেছেন আমাকে?

—না, আমাকে পাঠিয়েছেন তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে। দরজার দিক থেকে পাশের দেয়ালের দিকে সরে এলো রূপা।

সত্যি-মিথ্যে ঠাওর করতে পারা গেল না। বউদিমণি না পাঠালে ওর এ-সময় ঘরে এসে ঢোকার সাহস হয় কি করে!—বউদিমণি কি বলেছেন?

—সাহেব যে আজ আমাদের ওখানে রেতে খাবেন গো!

—তোমাদের ওখানে মানে?

—মানে তিন তলায়। দিদিমণি বললেন, মনোহরকে বিকেলে একবার আসতে বলিস। আর বললেন, সাহেব আজকাল কি রকমের খাওয়া-দাওয়া পছন্দ করেন মনোহরের কাছ থেকে বুঝে নিয়ে আয়।

আকাশ থেকেই পড়ল মনোহর। রান্নার ব্যাপারে বউদিমণিকে সাক্ষাৎ দ্রৌপদী ভাবে সে।—আমাকে জিগ্যেস করতে বললেন!

—বললেন তো।

মনোহর ফাঁপরে পড়ল।—আমি কি তিন বছরের মধ্যে সাহেবের খাওয়া-দাওয়া দেখেছি! রাতে পার্টি থাকলে বা লোকজন এলে টেলিফোনে বড় হোটেল থেকে খাবার আনানো হয়। বলগে যা আমি কিচ্ছু জানি না। বিকেলে যাব'খন বলে দিস। হুঁঃ, বউদিমণিকে সাহেবের পছন্দের রান্না বলে দেব আমি!

সঙ্গে সঙ্গে একটা কৌতূহলও চাড়িয়ে উঠল যেন। যে-মূর্তিতে সাহেব বাড়ি ছেড়ে বেরুলেন, রাতে ফিরে এসে তিন তলায় বউদিমণির ওখানে তিনি খেতে উঠবেন! এও ভারি অবিশ্বাস্য ঠেকছে তার কাছে।

—সাহেব রাতে তিন তলায় খাবেন তুই ঠিক জানিস?

—দিদিমণি তো বললেন, খেতে পারেন।

—ঠিক আছে, যা...।

কিন্তু রূপার নড়ার নাম নেই। পান চিবুচ্ছে আর লাল ঠোঁট টিপে টিপে হাসছে। আবার মনোহরের অস্বস্তি।

—সঙের মতো দাঁড়িয়ে রইলি কেন, যা—আমি এখন ঘুমবো।

রয়ে সয়ে রূপা বলল, সকালে সাহেবের সঙ্গে দিদিমণির অতক্ষণ ধরে কি এত কথা হল একটু শুনে যাই।

খাটিয়ার শয্যায় সোজা হয়ে বসল এবার মনোহর।—খুব সাহস বেড়েছে তোর—অ্যাঁ! এত সাহস? দাঁড়া বিকেলে বউদিমণিকে গিয়ে আমি বলছি, এবারে দূর করে তোকে বাড়ি থেকে না তাড়ায় তো কি বললাম—

সঙ্গে সঙ্গে রূপা ফোঁস করে উঠল।—আমাকে তাড়াবে না তোমাকে? তুমি আবার কি বলবে, দিদিমণিকে আমি এক্ষুনি গিয়ে তোমার কীর্তি-কলাপের কথা বলছি, সকাল থেকে দম-বন্ধ করে বসেছিলাম—এবারে বলব।

মনোহর হতচকিত হঠাৎ।—কি বলবি, আমি কি করেছি?

—আমি কি করেছি? সাহেব আর দিদিমণি নিরিবিলিতে বসে কিসের ফয়েসালা করছিলেন তাঁরাই জানেন—আর উনি ওদিকে ঝাড়ন হাতে করে সরু বারান্দার রেলিং হাজার বার করে ঘষছেন তো ঘষছেন —শুধু হাতে বারান্দার দেয়াল ঝাড়ছেন তো ঝাড়ছেন—আর ঢাকা বারান্দার দিকে দু'কান এমন খাড়া, আমি যে দোতলার তিন সিঁড়ি ওপরে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছি এক ঘণ্টার মধ্যে তাও হুঁশ হল না! দিদিমণি ডাকুক, আমিও কাছে [illegible]ব—দেখি তোমার মিথ্যে বলার কত বুকের পাটা!

এমন বিপাকে কি মনোহর কোনোদিন পড়েছে? আচমকা ঘায়ে সে যেন হতভম্ব একেবারে। এই পাজি মেয়েটাকেই আবার নতুন করে দেখছে সে। ইচ্ছে করছে উঠে

গিয়ে গলা টিপে ধরতে। বউদিমণি যদি সত্যিই ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, একটিও মিথ্যে কথা বেরুবে না মুখ দিয়ে।

—ওখানে দাঁড়িয়ে তুই কি করছিলি?

—তোমার কাণ্ড দেখছিলাম, তিন সিঁড়ি ওপরে দাঁড়ালে পার্টিশনের জন্য সাহেব বা দিদিমণি দেখতে পেতেন না—তুমি একবার তাকালেই দেখতে পেতে। কিন্তু তোমার কি তখন আর কোনোদিকে হুঁশ ছিল!

ওকে বোঝানোর শেষ চেষ্টা করল মনোহর—সাহেবের কখন ডাক পড়ে না পড়ে আমার তো কাছাকাছি থাকারই নিয়ম।

দাপটের মানুষটাকে যেন মুঠোর মধ্যে পেয়েছে রূপা। মুখ মচকে জবাব দিল, বেশ, দিদিমণি জিজ্ঞেস করলে এই কথাই তোমাকে বুঝিও।

রূপা দরজার দিকে পা বাড়াল, ব্যস্তসমস্ত মনোহর খাটিয়া ছেড়ে উঠে এলো তাড়াতাড়ি।— রূপা শোন শোন, আমি তোর কি করেছি যে আমার পিছনে এভাবে লেগেছিস তুই? এ-সব কথা মনিবদের কেউ বলে?

রূপা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। মুখের দিকে চেয়ে আছে। একটু গম্ভীর হয়ে তার পাশ কাটিয়ে সোজা এসে খাটিয়ার শয্যায় বসল।—ঠিক আছে, বলব না। ওনাদের কি কথা হল বলে ফেল চটপট!

রাগে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে মনোহরের। চাপা ঝাঁঝে বলে উঠল, ওখানে গিয়ে বসলি, এতটুকু লাজ-লজ্জা নেই তোর! কেউ দেখে ফেললে!

—দেখে ফেললে ভাববে তুমি আদর করে বসতে দিয়েছ। নাও, আর দিক কোরো না—কি কথা হল বলো শুনি—

ও যে এত সাংঘাতিক মেয়ে এ কি ভাবতে পেরেছে মনোহর! হাতি কাদায় পড়লে যে দশা হয় সেই দশা তার এখন। আক্রোশ চেপে ওকে দেখে নিল একবার।

—কাউকে বলবি না?

পান-খাওয়া লাল জিভ কাটল রূপা।—এ-সব কথা মনিবদের বলতে আছে!

—আমার গা ছুঁয়ে, ইয়ে—মা কালীর দিব্বি বল?

রূপা উঠে এসে একটা হাত সোজা তার বাহুর ওপর চালান করল।—এই তোমার গা ছুঁয়ে বললাম, কাউকে বলব না। খাটিয়ায় ফিরে গিয়ে বসল।—আর এই মা-কালীর দিব্বি কাউকে বলব না।

বাহুতে যেন আগুনের ছেঁকা লাগল মনোহরের। দুর্গা চলে যাবার পর থেকে মেয়ের স্পর্শ কাকে বলে জানে না। রাগে মাথার ভিতরটা ওদিকে চিড়বিড় করছে এখনো। একটু সামলে নিয়ে বলল, কি শুনবি, সাহেবের সঙ্গে বউদিমণির ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে!

এবারে রূপার চোখ গোল।—এ আবার কি গোপন কথা—ছাড়াছাড়ি তো তিন বছর আগেই হয়ে গেছে!

—সে রকম ছাড়াছাড়ি নয়, কোর্টে ডিভোর্স হয়, জানিস না!

—ওসব জানি-টানি না, আমি সাদা কথা বুঝি. দোতলায় গেট বসেছে আর দিদিমণি দোতলা ছেড়ে তিন তলায় উঠে গেছেন, তখন থেকেই জানি ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। তা সে নিয়ে কি হল, সাহেবের আবার জোড়া লাগাবার মতলব?

বলেই ফিক করে হেসে ফেলল। মনোহর সমঝে দিল, মুখ সামলে কথা বল, কানে গেলে তোর জিভ টেনে ছিঁড়বে।...বউদিমণি সেই কোর্টের ছাড়াছাড়ির কথা বীরুদাদাকে লিখেছেন, তাই নিয়ে সাহেবের রাগারাগি।

—আ-হা, ছেলের যেন জানতে বুঝতে বাকি ছিল—তাছাড়া নিজের ছেলেকে লিখবে না তো তোমার ছেলেকে লিখতে যাবে?

মনোহর বিরক্ত।—শুনতে হয় মুখ বুজে শুনে যা, ফোড়ন কাটিস কেন?

—আচ্ছা বলো। আর কি?

—নিচের তলার ব্যাংক মাসে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা করে বাড়ি ভাড়া দেয়—সেই টাকা এবার থেকে বউদিমণি নেবার ব্যবস্থা করে গেলেন—

এ খবর শুনে রূপা খুশি।—মাসে সাড়ে পাঁচ হাজার! সাহেব রাজী হলেন?

—হতে হল শেষ পর্যন্ত। আর কিছু নেই—যা ওঠ এবার। খবরদার, যদি কাউকে বলিস তোকে খুন করে এ-বাড়ি ছাড়ব আমি বলে দিলাম।

—উঃ, মুরোদ কত! শরীরে একটা ঝংকার তুলে রূপা খাটিয়া থেকে যেভাবে নামল, ডুরে শাড়ির আঁচলটা কাঁধ থেকে খসে মাটিতে পড়ে গেল। সেটা তুলে বুক বেড়িয়ে পিঠের দিকে ছুঁড়ে মেরে সদর্পে তার কাছে এগিয়ে এলো। প্রায় বুকের কাছে।

মনোহর সভয়ে তিন পা পিছনে সরে গেল। রূপা সঙ্গে সঙ্গে আবার তেমনি কাছে এসে ফুসে উঠল, পেছুও কেন? গায়ে হাত তোলো দেখি কেমন মুরোদ!

নিঃশ্বাসের একটা তপ্ত হল্কা লাগল মনোহরের চোখে মুখে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। সঙ্গে সঙ্গে অনেক দিনের একটা উপোসী যন্ত্রণা বুকের তলায় যেন মোচড় দিয়ে উঠছে। হাত দুটো নিশপিশ করে অবাধ্য হয়ে উঠতে চাইছে।

ছদ্ম-কোপে হিসহিস করে রূপা বলল, আমি ভালো কথার মানুষ, অত মেজাজ দেখিও না—বুঝলে? আদর করে গায়ে হাত তোলার লোভ হয় তো সে কথা বলো—

অতখানি কাছ থেকে কটাক্ষ বাণে আর এক দফা তাকে বিদ্ধ করে পিছন ফিরে বিজয়িনীর মতো ধীরে সুস্থে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

স্থান কাল ভুলে মনোহর হাঁ করে চেয়ে আছে সেইদিকে।

বাইরে পা দিয়েই রূপার পান-খাওয়া মুখ হাসিতে টসটস করে উঠল। খুব লজ্জা করছে। আবার ছুটে গিয়ে দিদিমণিকে একটা গড় করে আসতে ইচ্ছে করছে। আজ ওর এত বুকের পাটা শুধু এই দিদিমণিটির জন্য।

দিদিমণির কয়েকটা ব্যাপার শুধু ও-ই জানে, আর কেউ জানে না। সাহেব না, মনোহর না, কেউ না। তার মধ্যে রূপার চোখে যেটা সব থেকে বড় জিনিস সেটা হল দিদিমণির রাত থাকতে উঠে এক ঘণ্টা ধরে 'একছারছাই' করা। এগুলো করার জন্য মেয়েদের নানা রকমের একছারছাইয়ের ছবি ছাপা দু-তিনটে বইও আছে দিদিমণির। সাড়ে তিন বছর ধরে এখানে আছে, এ-জিনিসটা একদিনও বাদ দিতে দেখেনি দিদিমণিকে। ওর বিশ্বাস অনেক কাল ধরেই দিদিমণি এ-জিনিস করে আসছে। তা না হলে সব্ব অঙ্গে এমন পুরুষ্টু স্বাস্থ্যের জোয়ার নামতে পারে না। তাছাড়া আগে আগে সপ্তাহে দিন দুই দিদিমণি যে ওই ছাপা বই নিয়ে বাইরে যেত, তাতে রূপার ধারণা, রান্না শেখার মতো এসব শেখানোরও স্কুল আছে। আর দিদিমণি সেখানেই যান।

ওই ছাপা বই ক'টা উল্টেপাল্টে দেখার লোভ রূপার অনেক দিনের। দেখা মানে ছবিগুলো দেখা। ওই ছবির মেয়েগুলোর অঙ্গে শুধু আঁটো ইজের আর টাইট কাঁচুলি। শরীর বাঁকানো চোরানো ঘোরানো ফেরানোর হরেকরকম ছবি। দুই একবার দেখেছে রূপা, আরো দেখার লোভ।

মাত্র দু'মাস আগের কথা। দিদিমণি বাড়ি ছিলেন না। বিছানা ঝাড়তে গিয়ে ওই একটা বইও তাঁর বালিশের নিচে পেয়ে গেছল। স্থান কাল ভুলে তাই দেখতে বসে গেছল। নিজেও এক-একবার শুয়ে বসে ওই ছবির মতো করতে চেষ্টা করেছে। সুবিধে হচ্ছে না দেখে শেষে শুধু ছবিই দেখছিল।

...দিদিমণির কাছে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেল। চোরের মুখ করে রূপা বই হাতে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

দিদিমণি কিছু না বলে বিছানায় বসলেন। তারপব সামনের আয়না দিয়ে চোখ বাঁকিয়ে ওকে দেখতে লাগলেন। অপরাধ কতখানি গুরুতর রূপা তখনো ঠাওর করতে পারছিল না। আয়নায় দিদিমণিকে এবারে ভুরু কোঁচকাতে দেখে ওর বুক কাঁপছিল।

—এই! তুই আবার বিয়ে করবি?

মাটি দু'ফাঁক হলে রূপা তার মধ্যে ঢুকে যেতে চাইত। এমন কথা তাকে কে আর কবে জিগেস করেছে! ওই বই হাতে দেখেই এ-ভাবে শুরু করলেন কিনা তাই বা কে জানে! হাঁসফাঁস করে বলে উঠেছিল, এবারের মতো মাপ করে দিন দিদিমণি—আর কক্ষনো এ-বই ছোঁব না।

আয়না দিয়ে নয়, দিদিমণি নিজেই এবার ওর দিকে ফিবে তাকালেন।—বইয়ের কথা তোকে কে জিজ্ঞেস করেছে, বিয়ে করবি কিনা বল—

চার আঙুল জিভ কেটেছিল রূপা। —কি যে বলেন দিদিমণি!

—কি যে বলেন? শুনেই ওদিকে জিভ টসটস করছে। তোর বয়েস কত?

—পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে...

—দেব ধরে এক থাপ্পড়, তোর বয়েস কম হলে তিরিশ।

—না গো দিদিমণি, সত্যি বলচি, আটাশ-উনত্রিশের বেশি নয়।

দিদিমিণির চোখ দুটো হঠাৎ কি রকম ঝক-ঝক করে উঠেছিল, তারপর ঠোঁটে একটু হাসিও ভেঙেছিল।—ঠিক আছে, তোর আমি একটা ভালো বিয়ে দিতে চেষ্টা করব—বর তোর থেকে বয়সে বেশ বড় হবে কিন্তু—

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁসফাঁস করছিল রূপা। দিদিমণি আবার বলেছিলেন, বড় হলেও তোকে অনায়াসে ঢিট করতে পারবে—যেমন পাজি তুই! যা পালা—

সেদিন ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে বেঁচেছিল রূপা। বুকের ভিতরটা ধুকপুক করছিল। প্রথমে বড় মানসের ঠাট্টাই ভেবেছিল সবটা। কিন্তু হাজার হোক মেয়েছেলে তো সে-ও। শেষে ঘুরে ফিরেই মনে হয়েছে, দিদিমণির মনের তলায় অভিসন্ধি কিছু আছে। আরো আগে থাকতেই মনোহরকে কিছু বলা-টলার দরকার হলে ওকে পাঠান দিদিমণি। এরপর যখন পাঠাতেন, এমন ঠাণ্ডা চোখে তাকাতেন ওর দিকে যে লজ্জায় আর আধা-ভয়ে বুকের ভিতরটা গুড়গুড় করত। সে-ভাবটা এখন অবশ্য কেটে গেছে। আর আজ

তো রূপা দিদিমণির সামনেই হেসে ফেলেছিল। বয়সে বেশ বড় লোকটা যে কে দিদিমণি একবারও বলেননি। কিন্তু এটুকুও না বুঝলে রূপার গলায় দড়ি!

❀

আধ মাইল না যেতে আবার গাড়ি ফেরানোর হুকুম শুনে চিমনলাল সামনের আয়নায় সাহেবের মুখখানা একবার দেখে নিতে চেষ্টা করল। বাঁয়ে ঘেঁষে বসার দরুন ভালো দেখা গেল না।

এটা দ্বিতীয় বারের হুকুম। প্রথম বার গাড়ি ডালহৌসির মাঝামাঝি পথ পার হতে বাড়ির দিকে গাড়ি ফেরানোর হুকুম হয়েছিল। সেদিকে আধ মাইল না যেতে আবার তাকে গাড়ি ঘোরাতে বলা হল। অর্থাৎ ডালহৌসির দিকেই যেতে হবে।

সাহেবের এ-রকম মতি-বিভ্রম চিমন আর কখনো দেখেনি।

জয়ন্ত বোস বাড়ির দিকে গাড়ি ফেরাতে বলেছিলেন বাড়িতে ঢুকবেন বলে নয়। হঠাৎ একবার ব্যাংক হয়ে যাবার কথা তাঁর মনে হয়েছিল। তাঁর নিজস্ব অ্যাকাউন্টগুলো আর ব্যবসার অ্যাকাউন্টগুলো কলকাতার বিভিন্ন ব্যাংকে ছড়ানো। ওই ব্যাংকে তাঁর আর যশোধরার নামে একটাই জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট আছে। এখানে এই ব্রাঞ্চ খোলার শুরু থেকেই ছিল সেটা। এ-অ্যাকাউন্ট এ-যাবত তিনি অপারেট করেননি। যশোধরা করেছে, করে আসছে। গত এক-দেড় বছরের মধ্যে এ-অ্যাকাউন্টে বিশেষ কিছু জমা পড়েনি ঠিকই। কিন্তু তার আগে যা ছিল সেই অঙ্কটা লাখ দুইয়ের কম নয় হয়তো। ঠিক মনে পড়ছে না। তার বেশি হওয়াই সম্ভব।...তার থেকে ষাট হাজার টাকা দেড় মাস আগে বড় ছেলের নামে সরিয়ে দিয়েছে। নিজের চল্লিশ হাজার টাকার হীরের সেট গড়ানো হয়েছে বলল। গায়ের সোনার সেট যে-রকম ঝক্-ঝক করছিল, তাও হালের গড়ানো হতে পারে। এ-ছাড়া মাসের খরচের জন্য আড়াই হাজার করে তোলা বরাদ্দ। যশোধরা নিজেই বলেছে, জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট হালকা হয়ে এসেছে।

কি ছিল আর কত দিনের মধ্যে কতটা হালকা হয়েছে জানা দরকার বোধ করেছিলেন হঠাৎ। গেলেই ব্যাংকে ম্যানেজার খাতির করে তাঁর সামনে খাতা খুলে ধরবে। কথার ছলে স্ত্রীর নিজস্ব অ্যাকাউন্টে বা ছেলেদের অ্যাকাউন্টে কত আছে বা ওদের কার নামে কি ফিক্সড ডিপোজিট আছে না আছে তাও দু'মিনিটেই জেনে নিতে পারেন। ম্যানেজার বা ব্যাংকের কেউ ডিভোর্সের খবর রাখে না। টাকা থাকা না থাকাটা বড় কথা নয়। ছেলেদের বঞ্চিত করা কোনোদিন কল্পনার মধ্যেও ছিল না তাঁর, আর নিজেদের ওই জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের দিকেও হয়তো কখনো ফিরে তাকানোর প্রয়োজন বোধ করতেন না। এখনো ব্যাংকে কি আছে কি নেই সেটা সমস্যা নয়। তাঁর প্রতি যশোধরার প্রায়-অস্তিত্বশূন্য নির্ভরতার রকমফের বড় একটা দেখেননি কখনো। এটুকুর ওপর প্রচণ্ড আস্থা ছিল তাঁর। আর ঠিই এই জায়গাটুকুতেই তেমনি প্রচণ্ড একটা ঘা খেয়েছেন যেন আজ।

তিন বছর আগে বরং কিছুটা সতর্ক ছিলেন তিনি। তখন ওর আচরণে এতটুকু তফাৎ দেখলে তাঁর শ্যেনদৃষ্টি এড়াত না। তখন আর তারপরেও বলতে গেলে এই টানা তিন বছরই আরো বাধ্য, আরো নির্ভরশীল, আরো অনুগত মনে হয়েছে তাকে। যেমন

দেখে অভ্যস্ত তিনি তার থেকে বেশি দেখেছিলেন বলে উল্টে বরং মায়া হত অনেক সময়। মনে মনে তার সহিষ্ণুতার প্রশংসা করতেন। সদয় ব্যবহার করতেন।

...এখন দেখছেন অসতর্কতার ফাঁদে ফেলা হয়েছে তাঁকে। যতবার এ-কথা মনে হয়, দু'দিকের চোয়াল কঠিন হয়ে ওঠে। আসলে তিন বছর আগেই বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। তিন বছর আগেই বিশ্বাস আর নির্ভরতায় ফাটল ধরেছে, আনুগত্যের ভিত ধ্বসেছে।

...কিন্তু মাত্র তিন বছরের মধ্যে কোনো মেয়ের সত্তাসুদ্ধ এমন বদলাতে পারে? রূপ না থাকলেও স্বাস্থ্যের আকর্ষণ কম-বেশি বরাবরই ছিল। সে-ও এতটুকু অসাধারণ কিছু ভাবতেন না জয়ন্ত বোস। কিন্তু সেই অতি চেনা একজন কথা-বার্তায় হাব-ভাবে, আচরণে, হাসিতে-ভ্রূভঙ্গীতে, অনায়াস খুশিতে বা অভিমানে নিজেকে এমন লোভনীয় করে তুলতে পারে! এতকাল জয়ন্ত বোস নিজের তাগিদে, নিজের তাড়নায় যখন খুশি দখলের হাত বাড়িয়েছেন। কিন্তু আজ প্রথমেই নিজের অগোচরের কিছু ব্যতিক্রম দেখে যেন হঠাৎ লুব্ধ হয়েছিলেন তিনি। ক্রমে লোভ বাড়ছিল। ভালো লাগছিল। এই ভালো লাগানোর মাধুর্যটুকুই অনাবৃত হচ্ছিল একটু একটু করে।

...আর তেমনি সহজে যশোধরা আজ প্রত্যাখ্যানও করেছে তাঁকে। শুধু তাই নয়, রমণীয় কৌতুকে রাতে তাঁকে তিন তলায় আসতে বলেছে। নিজে আসবে বলেনি, তাঁকে যেতে বলেছে। অবলীলাক্রমে নিজের জোরের দিকটাই দেখিয়ে দিয়ে গেছে। না, রাতের চিন্তা এখন আর জয়ন্ত বোসের মাথায় নেই। তবু রমণীর সেই আমন্ত্রণ, আর হাসি-বিড়ম্বনার বিন্যাস আর টুকরো টুকরো কৌতুক কথা এখনো চোখে লেগে আছে, কানে লেগে আছে।

সে-সব এমনি যে এখানো কৃত্রিম ভাবা শক্ত। মাত্র তিন বছরে সত্তার এমন রূপান্তরও সম্ভব! তিন বছর কেন, মাত্র দেড় মাস আগে এমনি এক সকালের ভোগ-শয্যায় ঠিক এই রমণীর কতটুকু দেখেছিলেন তিনি?

গাড়ি আবার ফেরাতে বললেন। যশোধরা আজই তাঁর সই করা চিঠি নিয়ে ব্যাংকের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করবে। ম্যানেজার একেও খাতির করে। আজই ব্যাংকের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের লেনদেনের হিসেব নিতে যাওয়ার সংকল্প বাতিল করে দিলেন।...তার দরকারও নেই। ইনকাম ট্যাক্সের প্রয়োজনে মাত্র তিন মাস আগে ওই অ্যাকাউন্টের বছরের লেন-দেনের স্টেটমেন্ট পেয়েছেন। অফিসে তার কপি আছে। আর এই তিন মাসের উইথড্রয়ালের খবর মোটামুটি জানাই আছে।

কলকাতার তিন জায়গায় তিন রকমের অফিস তাঁর। একটা ডালহৌসি স্কোয়ারে, একটা পার্ক স্ট্রীটে আর একটা সুদূর দক্ষিণ কলকাতায়। শেষেরটিতে কিছু নিজস্ব জমির ওপর দু-ঘরের অফিস, কারখানা আর গোডাউন। ডালহৌসি আর পার্ক স্ট্রীটের অফিস বলতে বড় বিল্ডিং-এর একখানা করে মাঝারি সাইজের ভাড়া-করা ঘর। দোড়গোড়ায় কোম্পানীর নামে ছোট নেম-প্লেট। ভিতরে পার্টিশনের ছোট দিকে নিজে বসেন, বড় দিকে একজন ক্লার্ক, দুজন অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক আর একজন স্টোনোটাইপিস্ট। অফিসের বড় জাঁকজমক আগেও ছিল না এখনো নেই। কেন নেই সে শুধু তিনিই জানেন। যে অফিসেই আসুন তিনি, কর্মচারীরা তক্ষুনি টেলিফোন করে অন্য দুটো অফিসকে জানিয়ে দেয় সাহেব কোথায় আছেন। দক্ষিণ কলকাতার অফিস বা গোডাউনে সপ্তাহে দুই-

একদিনের বেশি যাওয়ার দরকার হয় না। এই দু-জায়গায় বসেই আরো কিছু ব্যবসার সঙ্গে প্রত্যেক্ষ বা পরোক্ষ যোগ তাঁর।

হুকুম-মতো একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্যাংক স্টেটমেন্টের ফাইল টেবিলে রেখে গেল। যেটি দরকার সেই স্টেটমেন্টের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন জয়ন্ত বোস। বছরের শুরুতে জমার অঙ্ক দু'লক্ষ সাতাশ হাজার। শেষ ব্যালান্স এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার। মাসে আড়াই হাজার টাকা বরাদ্দ খরচ তোলা হলে মাত্র তিরিশ হাজার কম থাকার কথা। অর্থাৎ এক লক্ষ সাতানব্বুই হাজার থাকার কথা। তার মানে সমস্ত বছরে একষট্টি হাজার বাড়তি তোলা হয়েছে। অবশ্য এর মধ্যে তাঁকে বলেই পুরনো গাড়ি বেচে নতুন গাড়ি কেনা হয়েছে। পুরনো গাড়ি বিক্রির টাকা জমা পড়ার কথা, তা পড়েনি।...তিন মাস আগের এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার ব্যালান্সের মধ্যে এখন কত থাকতে পারে মনে মনে একটা হিসেব করে নিলেন জয়ন্ত বোস। বড় ছেলেকে ষাট হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে, আর চল্লিশ হাজার টাকায় হীরের সেট হয়েছে। তাহলে বড় জোর আর ছাব্বিশ হাজার থাকা সম্ভব। কিন্তু জয়ন্ত বোসের ধারণা ছ'হাজারও নেই।

একবার ইচ্ছে হল টেলিফোন তুলে ব্যাংকের ম্যানেজারকে বলে দেয়, রেন্ট চেক কারো নামে ট্রান্সফার করার দরকার নেই, তাঁর সই করা চিঠি যেন ওয়েস্ট পেপার বাসকেটে ফেলে দেওয়া হয়। ক্রুদ্ধ হলে এই গোছের কিছু হেস্তনেস্ত করে ফেলার তাড়না মাথার দিকে ঠেলে ওঠে। কিন্তু এ-রকম কাঁচা কাজ জয়ন্ত বোস কখনো করেন না। দুই-এক মাসের মধ্যে তিনি সবকিছুর ফয়েসলা করে ফেলবেন। শুধু ভবিষ্যৎ চিন্তায় অস্থির হয়েই যশোধরা যদি নিজের বা ছেলেদের সম্বল আলাদা করে ধরে রাখতে চায়, তাহলেও তাকে ক্ষমা করতে আপত্তি নেই তাঁর। ভাবনায়-ভাবনায় মাথা ঠিক থাকছে না, এ-রকম কথা ইদানীং তার মুখ থেকেই দুই একবার শুনেছেন। মনের রোগও রোগই। যদিও মাথা ঠিক রাখার মতো আনুগত্য আর বিশ্বাস কেন যেন তিনি তার কাছ থেকে আশা করেছিলেন। তবু তিন বছর যাবত যে পরিস্থিতির মধ্যে তাকে ফেলে রাখা হয়েছে, অতখানি মনের জোরের অভাব হলে সত্যিই দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু তাঁকে নাকচ করার মতো মনের জোর তাহলে সে পেল কোথায়? এখানেই মিলছে না। আজ আরো অনেক কিছুই মিলছে না। দেখা যাক।

অ্যাটর্নি ব্রিজেশ ধরকে দরকার। একজন অ্যাসিস্ট্যান্টকে বললেন, ফোনে তাকে এখানে ডেকে পাঠাতে। আলমারির লকার থেকে দুটো মোটা চেক বই বার করলেন। দুটো ইউনিটের যাবতীয় চেক জে. রয় সই করে। আগে করত জে. বোস। যশোধরা বোস এখন যশোধরা রায়।

বই দুটো খুলে উল্টে দেখলেন। শীল-এর ওপর অনেকগুলো ব্ল্যাঙ্ক চেক সই করা আছে। কখন দরকার হয় তাই দশ-পনের দিন অন্তর এ-রকম একগাদা করে চেক সই করিয়ে রাখা হয়। পরে তারিখ আর টাকার অঙ্ক বসিয়ে দিলেই হল। কিছুদিনের কাজ চলে যাবার মতো ব্যবস্থা আছে। ইউনিট দুটোর ফাইল বার করলেন। যে-ফাইল যশোধরার কাছে যায় এবং চিঠিপত্র সই হয়ে আসে। যা খুঁজলেন, পেলেন। লেটারহেডের সাদা প্যাডের নিচে জে. রয়-এর সই। হঠাৎ প্রয়োজনের কথা ভেবে এ-রকম কিছু সইও করিয়ে রেখেছিলেন তিনি। এরপর ওই দুটো ইউনিটের সঙ্গে এই নামের অর্থাৎ যশোধরা রায়ের

যোগ থাকবে কি থাকবে না সেটা পরের ব্যাপার! ছেঁটে দেওয়ার দরকার হলে জয়ন্ত বোসকে কিছু করতে হবে না। সই করা লেটার হেড-এ স্বেচ্ছায় ইস্তফার বয়ান টাইপ করে নিলেই হল।

জয়ন্ত বোস বিমনা হয়ে পড়লেন একটু। হয়তো বেশিই ভাবছেন তিনি। তাঁর ব্যবসায় যশোধরার যেটুকু অস্তিত্ব সে-শুধু নামেই। ইনকাম ট্যাক্সের বোঝা কিছু হাল্কা করা, আর কিছু আইনের জটিলতা এড়ানোর এ-রকম কৌশল কে না জানে। যশোধরাও এ-সব নিয়ে কখনো মাথা ঘামায়নি।...আজ তিনি তেতে উঠেছিলেন দুটো কারণে। এক, বড় ছেলেকে চিঠি লেখা হয়েছে। কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে সেটা এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়। কারণ জয়ন্ত বোসের প্ল্যান বরবাদ না হয়ে গেলে কারোই কিছু জানতে বাকি থাকত না। এ-ক্ষেত্রে আরো বছর দুই আড়াই আগেই আর এক মিসেস বোসের পদার্পণ ঘটে যেত। তখন জানাজানি হতই। তা যখন হয়নি, যশোধরা বোকার মতো ও-সব লিখে মাঝখান থেকে ছেলেটার মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ, ব্যাংকের ওই চিঠি সই করিয়ে নিতে আসা। নিজের বা ছেলেদের সংস্থানের জন্য যা করেছে, খোলাখুলিই করেছে। যখন যা করেছে বা করতে চেয়েছে, সোজাসুজি বলেই দিয়েছে। এ-ছাড়া আজ আর যা কিছু দেখেছেন তার সবটুকই পুরুষের কাছে লোভনীয় ব্যাপার। এমন কি, আজ তাকে বাতিল করা আর সরস কৌতুকে রাতে আমন্ত্রণ জানানোর মধ্যেও সত্তার যে স্বতোৎসারিত রূপ দেখেছেন তা কম লোভনীয় নয়। তাহলে হঠাৎ অমন একটা ধাক্কা খেয়ে বসলেন কেন তিনি? বিশ্বাস বা আনুগত্য বা নির্ভরতার ভিত একেবারে ধূলিসাৎ ভাবছেন কেন?

তাহলেও কেন যেন স্বস্তি বোধ করছেন না। আগে থাকতে বিপদের গন্ধ পান তিনি। সম্ভাবনার অনাগত ছায়া দেখেন। এ অস্বাস্তি সেই গোছের।

অ্যাসিস্ট্যান্ট এসে খবর দিল, ব্রিজেশ ধর অফিসে নেই। তার বাড়িতে ফোন করা হয়েছিল। মিসেস ধর ফোন ধরে আছেন, মিস্টার ধর বাড়ি আছেন কি নেই কিছু বলেন না—তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান বিশেষ দরকার।

—ফোন ছেড়ে দিতে বলো। আমি দু'মিনিটের মধ্যে রিং করছি।

অ্যাসিস্ট্যান্ট চলে গেল। ছাদজোড়া পার্টিশনের ও পাশে ফ্রেমে-আটা ঘষা কাচের দরজা টেনে দিলে এ-দিকের বা ও-দিকের কোনো কথা অন্য দিক থেকে শোনা যায় না। ডাইরেক্ট লাইনের রিসিভার তুলে নিয়ে নম্বর ডায়াল করতে লাগলেন। ভুরুর মাঝে বিরক্তির ভাজ একটু। ...লোকটা দিনের বেলাতেই মদে বেহুস হয়ে আছে কিনা কে জানে। আরতি ধরের দরকারি কথা শোনার আগ্রহও খুব নেই। তার দরকারি কথা মানে মান-অভিমানের কথা আর কিছু পরোক্ষ অনুযোগের কথা। ছ'সাত মাস যাবত একটুখানি সবুজ সংকেতের আশায় ছিল। সেটা পেলে ব্রিজেশ ধরের সঙ্গে তার বিচ্ছেদের মামলা এতদিনে হয়তো ফয়েসলার দিকে গড়াত। না, জয়ন্ত বোস কখনো কপটতার আশ্রয় নেননি। কিন্তু নিজের ওপর একটু বেশি আস্থা ছিল আরতি ধরের। ফলে নিজের জালে নিজে জড়িয়েছে। জয়ন্ত বোস নিজের মনোভাব প্রায় স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। এখন হয়তো আর খুব বেশি আশা রাখে না। তা বলে একেবারে হালও ছাড়েনি হয়তো।

ফোনে আরতির সুরেলা গলার সাড়া পেলেন।—আরতি বলছি।

—জয়ন্ত...।

—বুঝেছি। কানের পর্দায় হাল্কা হাসির মৃদু আঘাত। —কি ব্যাপার, বাড়িতে হঠাৎ খানাতল্লাসি?

—ব্রিজেশ কোথায়?

ওদিক থেকে কৌতুক ছোঁয়া বিস্ময়। —আপনার দোতলার সঙ্গে তিন তলার মুখ দেখাদেখি বন্ধ নাকি! যশোধরা রায়ের কি বিশেষ কাজে কাল বিকেলের গাড়িতে সে হন্তদন্ত হয়ে দেরাদুন চলে গেল, আর আপনি কিছু জানেনও না?

অন্য লোকজনের সামনে আরতি ধর তাঁকে 'আপনি' করেই বলে। এখন ডাইরেক্ট টেলিফোনে কথা হচ্ছে জেনেও 'আপনি' করেই বলছে। বিদ্রূপের আভাসও অস্পষ্ট নয়। জয়ন্ত বোস সত্যিই থমকেছেন একটু। দেরাদুনে যশোধরার কি আবার বিশেষ কাজ থাকতে পারে! সেখানে বড়ছেলে বীরু আছে। তার কাছে হঠাৎ ব্রিজেশকে পাঠাতে যাবে কেন? মায়ের চিঠি পেয়ে ছেলে রোগে গেছে, তার মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য হুট করে একজন বাইরের লোককে পাঠিয়ে দেবে যশোধরা? বড় ছেলের সে এমন কিছু অন্তরঙ্গ মানুষ নয়।

ওদিক থেকে আবার একটু হাল্কা হাসি কানে ঘা দিয়ে গেল। —কি হল? বলে দুর্ভাবনায় ফেললাম নাকি?

—না। ব্রিজেশ কেন গেছে জানো?

আপনাদের বাড়ির দলিল-টলিলের কথা কি যেন বলছিল, এর মধ্যে কমল আর সূর্য এসে গেল, তাইতে চাপা পড়ে গেল।

জয়ন্ত বোস উৎসুক একটু, কমল বাড়ি ফিরেছে?

—ও-মা, সে-তো কবেই ফিরেছে, আপনি খবরও রাখেন না! আপনাদের কথা হচ্ছিল—

—আমাদের মানে?

—আপনার আর যশোধরার।

যশোধরার নাম শুনে জয়ন্ত বোস আবার এক প্রস্থ থমকালেন। গত তিন বছরের মধ্যে যশোধরা বলতে গেলে প্রায় অনুপস্থিত এদের কাছে।

সূর্য অর্থাৎ সূর্য রায়ের নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কেন যেন ইলেকশনে ইন্দিরা গান্ধী জেতার ব্যাপারে মহাত্মাদের আশীর্বাদের সেই বড় বিজ্ঞাপনটার কথা মনে পড়ে গেল জয়ন্ত বোসের। সেই সঙ্গে একটু অস্বস্তিও। ওটা নিয়ে এখনো খুব ভালো করে ভাবা হয়নি। কিন্তু ভাবার ব্যাপার আছে।

—কি বলছিল?

—অত জানি না, ঢের হয়েছে, চন্দ্রাবলী হবার বাসনা আর নেই। উৎফুল্ল হাসি।

—বাড়ির দলিলের কথা কি বলছিলে?

পলকা ঝগড়ার সুরে জবাব এলো, আমার হাজব্যাণ্ডের ক্লায়েন্টের খবর আপনাকে আমি দেব কেন মশাই?

—আচ্ছা, আমি এক্ষুনি আসছি।

ওদিকে কৌতুকের সঙ্গে যেন আর এক প্রস্থ বিদ্রূপ ঝরল।—অবলা মহিলা একলা

বাড়িতে...এখনই আসবেন?

জবাব না দিয়ে জয়ন্ত বোস রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। হাতঘড়িতে সাড়ে বারোটা। দেড়টার মধ্যে ফিরতে পারবেন আশা করা যায়। হাতে কাজ খুব বেশি নেই, কিন্তু অনেক ভাবার আছে। একটু আগেও তাঁর চিন্তা যশোধরার স্বপক্ষে যুক্তি খুঁজছিল। এই টেলিফোনের ফলে স্নায়ুগুলো টান-টান হয়ে গেল আবার।

দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে গাড়িটা দেখেছে আরতি ধর। রাস্তার ধারের দোতলার এই ছিমছাম ফ্ল্যাটটা ব্রিজেশ ধর দু'বছর আগে কিনেছিল। দোতলায় উঠে বেল টিপতে হল না, তার আগেই আরতি ধর দরজা খুলে দিল। হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল, আজ অসময়ে বড় ভাগ্য দেখা যাচ্ছে—

তাঁকে বসার জায়গায় নিয়ে এলো। পাশে শোবার ঘর। আরতি ধর সোজা তাঁকেও ও-ঘরে নিয়ে এলেও অবাক হবার কিছু ছিল না।

—বসুন। খেয়ে-পেয়ে আপনি কি শুনতে এলেন ভেবে পাচ্ছি না।

'তুমি' ছেড়ে এখনো 'আপনি'ই বলছে। জয়ন্ত বোস তখনো দাঁড়িয়ে। এক নজর দেখে নিলেন। ঢিলে-ঢালা বেশ-বাস, শাড়ির আঁচলটা আলতো করে কাঁধের ওপর ফেলা। তার আধখানা কাঁধের পাশ দিয়ে অনেকখানি ভেঙে পড়েছে।

আরতি ধরের বয়েস এখন পঁয়ত্রিশ। একুশ বছরে বিয়ে হয়েছিল। ছেলেপুলে হয়নি। আর হবে এমন আশা নেই। ফর্সা রং, কোঁকড়া চুল। বয়েসকালে বেশ সুন্দরীই ছিল, এখনো হেলাফেলার নয়। ঢলঢলে হাসি-হাসি মুখ। গানের গলা ভালো। এখনো চর্চা আছে। গান করার সময় মুখখানা আরো মিষ্টি দেখায়। বিয়ের কিছু দিনের মধ্যেই তার ধারণা হয়েছে কাকা আর কাকিমা তাকে অপাত্রে ফেলে দায় সেরেছে। বোকার মতো তখন আপত্তি করেনি বলেই নিজের রাগ, আর যার ঘরে এসেছে তার ওপর দ্বিগুণ রাগ। সেই রাগ মনে চেপেই শুরু থেকে স্বামীর ওপর দখল নিয়েছে আর তাকে দাবিয়ে রেখেছে। স্বামীর প্রতিষ্ঠার (আরতি ধর যেটা প্রতিষ্ঠা ভাবে না) পিছনে কাকার কিছু অনুগ্রহ ছিল, সেই কারণেও তার ওপর প্রতিপত্তি। স্বামীটিকে খোকার মতো কাজে বা ঘরে বসিয়ে সে নিজের ইচ্ছেমতো চলেছে, ক্লাব-পার্টি করেছে। সিনেমা থিয়েটার জলসায় হানা দিয়েছে। গানের ব্যাপারে সাহায্যের আশা থাকলে কাউকে একটু আধটু প্রশ্রয় দিতেও আপত্তি হয়নি খুব। এমনি করে একাধিক পুরুষের কাছাকাছি এসেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাতিলও করেছে আবার। অনেককে নিয়ে অনেকবার নতুন করে ঘর বাঁধার কথা ভেবেছে। চূড়ান্ত ফয়েসলার কাছাকাছিও এগিয়েছে দুই একবার। তারপর নিজে থেকেই সরে এসেছে। খুব বেশি দিন ভালো লাগার মতো পুরুষ এই বিশ্ব-সংসারে আর নেই-ই যেন। দু'দিন যাকে ভালো লাগে, একটানা দশদিন আর তাকে ভালো লাগে না। স্বভাবে বা আচরণে বা সবদিক মিলিয়ে কিছু না কিছু খুঁত বেরিয়েই পড়ে। আর দেখতে দেখতে সেই খুঁতটাই বড় হয়ে ওঠে। নিজের এই স্বভাব জানে বলেই যত প্রশ্রয়ই দিক, কারো কোনো বড় দখলদারির সম্ভাবনা এড়িয়েই চলত। অপরের কথা ছেড়ে, নিজের ঘরের লোকের দখল নিতে আসাটাও তার মন মেজাজ আর বিবেচনাসাপেক্ষ।

ব্যতিক্রম ঘটে গেছে শুধু এই একজনের বেলায়। আর, তাও প্রায় অবেলায়। বয়েস

যখন বত্রিশ গড়িয়েছে তখন। পুরুষের সন্ধান মিলেছে। কিন্তু তারপরেও সেই পুরুষ দীর্ঘ আড়াই বছরের ওপর দূরের মানুষ। হ্যাঁ, ততদিনে সমস্ত ধৈর্য খুইয়ে বসেছিল আরতি ধর। অঘটন ঘটেই গেছল। সেই অঘটনের বঁড়শি ফেলেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তির দিকে তড়িঘড়ি এগোতে চেয়েছিল সে। তারই জের চলছে এখনো। নিষ্পত্তি হয়নি।

অথচ এই লোকই এখনো একমাত্র প্রবল পুরুষ তার চোখে।

ধার-ধার গলায় আরতি বলল, দয়া করে আশা হয়েছে যখন বসলে খুশি হব। কি আনব, চা কফি না কোলড ড্রিঙ্ক?

জয়ন্ত বোস মৃদু হেসে জবাব দিলেন, কিছু দরকার নেই, তুমি থাকলেই হবে।

—আমি! শব্দ করেই হাসল আরতি।—কত দূরে থাকলে হবে?

—আপাতত যেখানে আছ সেখানেই। খবর কি চটপট বলো দেখি, আমার সত্যি একটু তাড়া আছে।

কাঁধের প্রায় খসে-পড়া আঁচলটা তুলে আবার যথাস্থানে ফেলল আরতি। হাসতে অসুবিধে হলেও হাসছে। —কোনো খবর বলার জন্য আমি কাউকে এখানে ডেকে আনিনি। আর জানলেও আমি বলব এ-রকম আশা করার কারণ কি?

জয়ন্ত বোস কাছে এগিয়ে এলেন। অনায়াসে এবং খুব কাছে। হাত দুটো তার দুই কাঁধে তুলে দিয়ে আঙুলে করে জোরেই চাপ দিলেন একটু। —তুমি না বলতে চাইলেও আমি টেনে বার করতে পারি। তার মুখের সামনে নিজের মুখ নামিয়ে আনলেন একটু। —দেখবে?

তা যে পারে মনে মনে অন্তত স্বীকার না করে উপায় নেই আরতির। আস্তে আস্তে হাতদুটো সরিয়ে দিয়ে নিজেও সরে দাঁড়াল একটু।—দেখে কি লাভ, আজকাল আমাকে এড়িয়ে চলা হচ্ছে সেটা বুঝতে আমার খুব অসুবিধে হয় না। তার থেকে এভাবে আর কতকাল চলতে পারে আমার জেনে নেওয়া ভালো।

জয়ন্ত বোসের বিরক্তি চাপা থাকল না খুব। —ডোন্ট বি সিলি আরতি! ধুপ করে সোফায় বসলেন। —আমি ব্যস্ত ছিলাম, আর এখনো ব্যস্ত আছি। ভুল যদি কোথাও হয়ে থাকে তো সেটা তোমার, আমি কক্ষনো তোমাকে ভুল বোঝাইনি, কোনোরকম ছলচাতুরি করিনি। বরং যেটুকু সতর্ক করা দরকার তোমাকে, তাও করেছিলাম। তবু বলছি, এদিকের ফয়সলা আগে হতে দাও, তারপর দেখছি—

কথাগুলো নির্ভেজাল সত্যি বলেই ভিতরটা চিড়বিড় করে উঠল আরতি ধরের। বরং বিঁধতে পারলে সুবিধা। তবু বোকার মতো রাগ করবে না সে। গলার স্বরে একটু শ্লেষ মাখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আর ফয়েসলার বাকি কি—কমল গুপ্তর আশা এখনো আছে নাকি?

দুর্বল জায়গাতেই ঘা পড়ল একটু। জীবনের দুর্বার অন্ধ আবেগ শেষ পর্যন্ত একটি রমণীর কাছে ব্যাহত হয়েছে। সে কমল গুপ্ত। উদগত অসহিষ্ণুতা ভিতরে ঠেলে দিয়ে মাথা নাড়লেন।—না, নেই। কমল আর সূর্য কেন এসেছিল?

আরতি জবাব দিল, আমার খুড়তুতো বোন আর তার ভাবী বর আসবে তার আবার কেন কি?

—ওরা যশোধরার কথা কি বলছিল?

—ওরা নয়, কমল খুব প্রশংসা করছিল,আর তার সঙ্গে একবার দেখা করার কথা বলছিল, কিন্তু ও-বাড়ি গিয়ে দেখা করার ব্যাপারে সূর্যর আবার আপত্তি।

—কমলের হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে কেন?

—জানি না। যাক, কমলের আশা যদি গিয়েই থাকে তাহলে ফয়েসলার আর বাকি কি—যশোধরার সঙ্গে ডিভোর্স তো তিন বছর আগেই হয়ে গেছে।

এ-প্রসঙ্গটাই বিরক্তিকর এখন। জয়ন্ত বোস স্পষ্ট করে জবাব দিলেন, হলেও সে আমার জীবন থেকে একেবারে সরে যায়নি এখন পর্যন্ত। যাবে কিনা সেটা আমার বিবেচনা। গেলে তোমাকে আমার দরকার হবে, আর তখন নিজেই আমি তোমাকে ডেকে নেব। ফোনে বাড়ির দলিলের কথা কি বলছিলে?

ওই লোকের কাছে তার দাম কতটুকু এই কথাগুলো থেকে আরতি সেটা আবার নতুন করে বুঝে নিল। তার প্রয়োজনে ডাকবে তার আগে নয়। এমন কি, যশোধরার সম্পর্কেও আরো বিবেচনা শেষ হলে, তারপর। রাগে ফর্সা মুখ লাল হবার উপক্রম তার। কিন্তু তাতে লাভ হবে না। যতটুকু চেনার ভালো করেই চিনেছে। এই মুহূর্তে কিছু একটা দুঃসংবাদ দিয়ে এই প্রবল পুরুষকে দিশেহারা করে তুলতে পারলে বরং ভিতরটা ঠাণ্ডা হতে পারে। কাজও হতে পারে।...এই দুপুরে ছুটে এসেছে যখন, দলিলের ব্যাপারটা একেবারে ফেলনা কিছু নয় হয়তো। সাদামাটা ভাবেই জবাব দিল, বাড়ির দলিল আর শ্রীমতী যশোধরার কি উইল আর চিঠিপত্র নিয়ে দেরাদুনে তার বড় ছেলের কাছে যাচ্ছে —এটুকুই শুধু শুনেছি।

এটুকু শোনার ফলেই লোকটার মুখে বিস্ময়ের আঁচড় দেখে আরতি আবার হেসেই বলল, আমি জানতুম দলিল যার নামেই হোক, বাড়ির আসল মালিক জয়ন্ত বোস, সে-কথা বলতে বিজু এমন হাসলে যে গায়ে জ্বালা ধরে যায়। তারপর শুনলাম, বাড়ির ষোল আনাই যশোধরার। মহিলার প্রশংসায় ওই লোক এমন পঞ্চমুখ আজকাল, আমার সন্দেহ হচ্ছে ও তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।...আমার বোধহয় এ-কূল ও-কূল দুকূলই গেল।

স্বামী ব্রিজেশকে বিজু বলে ডাকে আরতি ধর। জয়ন্ত বোস শেষের কথায় কান দিলেন না।—ব্রিজেশ বলল বাড়ির ষোল আনার মালিক যশোধরা?

—বলল তো। ভালো কথা, মাসে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা ব্যাংকে ভাড়ার চেক যশোধরা দেবীর নামে ট্রান্সফারের সেই চিঠি সই হয়ে গেছে?

ভিতরে আর এক দফা নাড়াচাড়া পড়ল জয়ন্ত বোসের। চাউনি স্থির হয়ে আসছে। সে-চিঠির কথাও ব্রিজেশ তোমাকে বলেছে?

ওই মুখের দিকে চেয়ে আরতি এখন আনন্দ পাচ্ছে বেশ। বেশি কিছু জানে না বলেই আফসোস।—বলেনি কিছু, টেবিলের ওপর টাইপ করা চিঠি পড়ে ছিল, নিজেই দেখলাম। যশোধরা দেবীর ওপর বোস সাহেব হঠাৎ এত দরাজ হয়ে উঠলেন কেন, জিজ্ঞাসা করতে বিজু বলল, হয়ে ওঠেননি এখনো—কলে পড়ে হবেন। তারপরেই মিনমিন করে শ্রীমতীর কত প্রশংসা আবার। আমার মনে হচ্ছিল বিজুর মুণ্ডুখানা ওই মহিলা বেশ ঘুরিয়েই দিয়েছে—

গাড়ির পেছনের সীটে জয়ন্ত বোসের শরীরটা স্থাণুর মতো নিশ্চল। কিন্তু মগজে দুটো প্রশ্ন টগবগ করে ফুটছে। এক, কমল গুপ্ত যশোধরার সঙ্গে দেখা করবে ভাবছে আর সূর্য রায় তাতে আপত্তি করছে। দুই, বাড়ির দলিল নিয়ে ব্রিজেশ ধর হঠাৎ দেরাদুনে চলে গেল। কমল বা সূর্যর সঙ্গে দেখা না হলে প্রথম চিন্তার হদিস মেলা সম্ভব নয়। ও চিন্তা আপাতত মাথা থেকে সরিয়ে দিয়ে পরের চিন্তাটা এগিয়ে নিয়ে এলো। ব্রিজেশ অ্যাটর্নি মানুষ, বাড়ির ওই দলিলে বেনামদার মালিকের অধিকার কতটুকু এ তার অন্তত ভালো জানার কথা। ওই জমি বা বাড়ির প্রতিটি কপর্দক কোথা থেকে এসেছে কোর্টে তার ফয়েসলা হতে কতক্ষণ লাগবে? সেটা যশোধরা না বুঝতে পারে, ব্রিজেশ ধর এমন জোর আর এত উৎসাহ পাচ্ছে কোথা থেকে!

হঠাৎ স্নায়ুগুলোর ওপর কিছু একটা সম্ভাবনার ঘা পড়ল যেন। সোজা হয়ে বসলেন। সম্ভাবনাটা তক্ষুনি বাতিল করতে চাইলেন অবশ্য। কারণ বাড়ির ওই জমি কেনা হয়েছিল ন'বছর আগে। তখন তিনি তিন সপ্তাহের জন্য জরুরী কাজে দিল্লি চলে গেছলেন। যাবার আগে সব ব্যবস্থা পাকা করে যশোধরাকে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে গেছলেন। ন'বছর আগে সেই ব্যবস্থার কিছু রকমফের হয়েছে মনে হয় না। তবু ভিতরটা খুঁতখুঁত করে উঠল বলেই গাড়িটা হঠাৎ আর-এক রাস্তায় ঘোরাতে বললেন। আলিপুর রেজিস্ট্রেশান আপিসের দিকে। পকেটের টাকা ছড়ালে দু'দিনের কাজ দু' ঘণ্টায় হয়। আরো বেশি ছড়ালে সকলের হাত আরও দ্রুত নড়ে।

বছর মাস আর সম্ভাব্য সময় বলতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জমির দলিলের রেজিস্ট্রি-করা নকল তাঁর সামনে এনে ধরা হল। তারপর নিজের চোখ দুটোকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না জয়ন্ত বোস। দু' চক্ষু স্থির তাঁর, স্তব্ধ।

...যে দামে ওই জমি কেনার মৌখিক চুক্তি করে গেছলেন তিনি, কার্যত তার থেকে ঢের কমে জমিটা কেনা হয়েছে। কিনেছেন যশোধরার বাবা বিশ্বেশ্বর রায়। জয়ন্ত বোসের শ্বশুর। তার পনের দিন বাদে সেই জমি তিনি নিঃশর্তে একমাত্র মেয়ে অর্থাৎ যশোধরাকে দান করে গেছেন। সেই দান-পত্রে সাক্ষী হিসেবে সই করেছে শ্বশুরের ছেলে আর তার দুজন নিকট আত্মীয়।

...হ্যাঁ, জলের মতো সবই সহজ আর স্পষ্ট এখন। চুক্তির বাদবাকি টাকা জমির মালিককে যশোধরা ব্ল্যাকে দিয়েছে। আর রেজিস্ট্রিতে জমির যে দাম লেখা আছে, সেই টাকা আগে বাপের নামে ব্যাংকে জমা দিয়েছে। সেই টাকায় বিধিবদ্ধভাবে জমি কিনে মেয়ের নামে সেটা দানপত্র করে দিয়েছেন তিনি। তাতেও এতটুকু খুঁত নেই।

শ্বশুর আর জীবিত নেই। তিনি অত টাকাই বা পেলেন কোথায়? ন'বছর বাদে সেই টানা হেঁচড়ার কোনো ফল হবে না। ছা-পোষা উকিল ছিলেন শ্বশুর। দেশের জমি-জমা বিক্রী অথবা সেই গোছের কোনো উপার্জনের নজির দেখিয়ে হয়তো সেদিক থেকেও কোনো গলদ রাখেন নি তিনি।

...কিন্তু ন'বছর আগে যশোধরা ধীরে সুস্থে ঠাণ্ডা মাথায় এ-কাজ করে রেখেছে? ন'বছর আগে? ওর বাবার তখন রোগে ভুগে ভুগে মাথারই ঠিক নেই। তিনি এ পরামর্শ দিতে পারেন না। আর দিলেই বা যশোধরা না চাইলে এমনটা হবে কেন? ওর মা তার ঢের আগেই গত। আর ওর দাদাকে বিয়ের অনেক আগে থেকেই জানতেন জয়ন্ত বোস।

তাঁর মতে সোজা সরল নির্বোধ মানুষ একটা। বোনকে এ-সব প্যাঁচের পরামর্শ দেবার লোকই নয় সে। আর ন'বছর আগে ব্রিজেশ ধরের সঙ্গে আলাপও ছিল না যশোধরার।

তাহলে যা হয়েছে, যশোধরার নিজের বিবেচনা আর বুদ্ধিতেই হয়েছে।...এই বিবেচনা আর বুদ্ধি তার মাথায় এসেছে ন'বছর আগে!

এখন জমি যার, বাড়ি তার। বেনামদারের কোনো প্রশ্ন নেই। কোর্টে দাঁড়িয়ে যশোধরা জোর গলায় এখন বলতে পারে, বিবাহিত জীবনে স্বামীই তাকে ওই বাড়ি করার টাকা দিয়েছে। আইনের চোখে ও-বাড়ির ষোল আনার মালিক যশোধরা নিজে। ইচ্ছে করলে সে-ই বরং যখন-তখন তাকে বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দিতে পাবে। ডিভোর্সের পরে তাঁর আর কোনো আর্জিই টিকবে না।

গাড়ি আবার ডালহৌসির দিকে ছুটেছে। গাড়ি বাড়ির দিকে ফেরানোর হুকুমটা বারবার ঠোঁটের ডগায় এসেও ফিরে গেছে। একজনকেই তিনি দেখতে চান। খুব ভালো করে দেখে নিতে চান। নতুন করে দেখে নিতে চান।

কিন্তু সে-ভাবে দেখার আজ কিছু নেই মনে হতে হুকুমটা দিলেন না। দেখার ছিল ন'বছর আগে। দেখার ছিল তেইশ বছর আগে বিয়ের সময়। দেখার ছিল হয়তো তারও আগে।

...আশ্চর্য!

❀

কত পিছনে চোখ চলে মানুষের?

মনের বিশেষজ্ঞরা বলে, সে-রকম অস্বাভাবিক কিছু ঘটলে ছ'মাস-আটমাসের শিশুরও সত্তার ওপর তার স্থায়ী ছাপ পড়তে পারে। আর তার ফলে নিজের অগোচরে সমস্ত জীবন সে ওই অজানা ছায়ার প্রতিক্রিয়া বহন করতে পারে। মনের বিশেষজ্ঞদের দাবী, সঠিক বিশ্লেষণের সেতু ধরে পিছনের দিকে যাত্রা করলে সেই মানুষকে ওই শিশুর স্তরেও পৌঁছে দেওয়া যায়। আর তখন যা ঘটেছিল সেটা বিস্মরণের পর্দা ঠেলে আপনি বেরিয়ে আসে। সেটা দেখতে বুঝতে বা অনুভব করতে পারলে তবে সেই ছায়ার মুক্তি।

না, জয়ন্ত বোস কোনোদিন কোনো মনের বিশেষজ্ঞের দরজায় হানা দেননি। কিন্তু নিজেই তিনি অনেক পিছনে চলে যেতে পারেন। তখন স্পষ্ট অস্পষ্ট অনেক মুখ দেখতে পান।...খুব চেষ্টা করলে বছর চারেকের একটা ছেলেকেও দেখতে পান তিনি। আর কি করে তখনকার কয়েকটা শব্দ যেন কানে লেগে আছে। অনেকেই বলত, আ-হা, বাপ-মরা ফুটফুটে ছেলেটা...। এর মধ্যে যে-ক'টা মুখ খুব স্পষ্ট, তার একটি মুখ ছেলেটার মায়ের। ওই মুখ কখনো ভারী মিষ্টি আর সদয় লাগত, আবার কখনো কঠিন মনে হত। মুখের দিকে তাকালে তখন ভয়-ভয় করত। মা থাকলে একজন বাবাও থাকার কথা, ছেলেটা সেটা খুব ছেলেবেলা থেকেই জেনেছিল। না, বাবা ডাকার মতো কোনো লোককে সে দেখেইনি।

চার বছরের সেই ছেলেটাকে জিতু বলে ডাকত সকলে। একটা মস্ত দালানের তিন তলায় তকতকে পরিষ্কার একটা ছোট ঘরে মায়ের সঙ্গে থাকত সেই ছেলেটা।...সেই

বাড়ি এখনো আছে, কিন্তু ভাগ-ভাগ হয়ে যাবার ফলে ভিতরের ধাঁচ বদলেছে। মা সক্কাল বেলা উঠে চান সেরে রান্নাঘরে ঢুকত। অনেক বেলায় সেখান থেকে বেরুত। জিতু অনেক সময় সেখানে বসে মায়ের রান্না দেখত। আর ফাঁক পেলে দোতলায় এসে রাঙা মায়ের ঘরে ঢুকত। রাঙা মায়ের এক বছরের ছেলেটাকে তার ভারি ভালো লাগত। রাঙা মা সবসময়েই তার সঙ্গে মিষ্টি করে কথা বলত। দোরগোড়ায় দাঁড়ালেই ঘরে ডাকত।

রাঙা মা! ওই দুটি শব্দ মনে পড়লেই স্নায়ুতে স্নায়ুতে আজও যেন সাড়া জাগে জয়ন্ত বোসের। সেই মুখ আজও স্পষ্ট মনে আছে। ...লালচে মুখ, লালচে চুল। হাসলে মনে হত মুখ দিয়ে আলগা রং ঝরছে। জিতু নামে চার বছরের ছেলেটা কত সময় হাঁ করে সেই মুখখানাও দেখত। ভিতর মহলে রাঙা মা-ই সব। রাঙা মায়ের হুকুম মতো সব হয়।...সেই চার বছর বয়সেই ধু-ধু মনে পড়ে, মায়ের সঙ্গে সেই বড় বাড়িতে এসেছিল। যার সঙ্গে এসেছিল এখানে আসার পরে জেনেছে সে ভজন কাকা। আগেও তাকে দেখেছে কিন্তু নাম জানত না। পরে দেখেছে এ-বাড়ির বুড়োকর্তারা তাকে ভজন বলে ডাকে। বড়বাবু আর রাঙাবাবুও। মা ভজন কাকা বলে ডাকতে বলে দিয়েছিল। বাড়ির সকলের সঙ্গে ভজন কাকার খুব খাতির। বিশেষ করে রাঙাবাবুর সঙ্গে। সেই ভজন কাকা মাকে আর চার বছরের জিতুকে সেই বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। এনে ওদের রাঙা মায়ের হাতে দিয়েছিল। সেই থেকে রাঙা মা-ই ওদের ও-বাড়িতে রেখেছে। তার কথামতো মা রান্নাবান্না করে।

ভজন কাকা যে এত মজার মানুষ ছেলেটা আগে জানত না। প্রায়ই তাকে এ-বাড়ি আসতে দেখত। সকলের তখন খুব আনন্দ। রাঙাবাবু আর রাঙা মায়েরও। রাঙাবাবু কিন্তু রাঙা মায়ের মতো অত রাঙা নয়। ভজন কাকা এলেই বাড়িতে গান-বাজনা শুরু হত।

জয়ন্ত বোসের ও-বাড়ির অনেক কিছু মনে আছে। কারণ জিতু নামে ছেলেটা চার-পাঁচ-ছয়—এই টানা প্রায় তিন বছর তো ও বাড়িতেই কাটিয়েছে। ভজন কাকা যে এ-রকম গাইতে পারে, এখানে আসার আগে তাও জানত না। সে গাইতে বসলে একজন তানপুরা না কি বলে, তাই বাজাত। আর দুজন হারমোনিয়াম আর তবলা বাজাতো। বুড়ো কর্তারা, বড়বাবু আর রাঙাবাবু, রাঙা মা—সক্কলে তার গান শুনত। গান শেষ হতে প্রায়ই রাত হয়ে যেত। আর ভজন কাকাও প্রায়ই এ-বাড়িতে থেকে যেত। কিন্তু গানের সময় ভজন কাকার সেই হাত-মুখ নাড়া দেখে ছেলেটার হাসিই পেয়ে যেত। কিন্তু কেউ হাসছে না দেখে ভয়ে হাসতে পারত না। মায়ের কাছে গিয়ে হেসে গড়ালে মাও ধমকাত। ছ-বছর বয়েসে মা কি কথায় ওকে একদিন বলেছিল, ভজন কাকা বড় গাইয়ে, আর মস্ত বিদ্বান মানুষ। অত লেখা-পড়া করেও শুধু গানবাজনা নিয়ে আছে।

...ছ' বছর বয়েসের চিত্রটা আরো কিছুটা পরিষ্কার। ওই বাড়িটাকে গুপ্ত বাড়ি, জজের বাড়ি আর হাকিমের বাড়ি বলে সকলে। গুপ্ত বাড়ি বোঝে, কিন্তু অন্য দুটো কেন বলে ছেলেটা জানত না। মাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করত। মা বলত, ওই বুড়োদের একজন অর্থাৎ রাঙাবাবুর বাবা বড় হাকিম ছিল। বড় হাকিমকে জজ বলে। তাদের বাড়ি তাই জজের বাড়ি। রাঙাবাবু ছোট হাকিম। পরে সেও জজ হবে।

বাড়িটা ওই দুই বুড়োর পৈতৃক বাড়ি। ওই বুড়োরা দুই ভাই। বুড়োদের বুড়ী দুজনকে ছেলেটা চোখেও দেখেনি। জজ বুড়োর ছেলে বড়বাবু আর রাঙাবাবু। অন্য বুড়োর ছেলে নেই, কতগুলো মেয়ে। সেই মেয়েরা যে যার বাড়িতে থাকে—তাদেরও নাতি নাতনি হয়ে গেছে। পুজোপার্বণ উৎসবে তাদের সক্কলের দেখা মেলে। অতবড় বাড়ি তখন জমজমাট।

জজ বুড়োর বড় ছেলে অর্থাৎ বড়বাবুর বউকে ছেলেটা দেখেনি, কারণ সে নাকি তখন পর্যন্ত বিয়েই করেনি। ছোট ছেলে অর্থাৎ ছোট হাকিম আগে বিয়ে করে রাঙামাকে ঘরে এনেছে। জিতু তখন রাঙা মায়ের কাছে খুব কাজের ছেলে হয়ে উঠেছে। রাঙা মায়ের তো কাজের অন্ত নেই, ও ছাড়া সারাক্ষণ তার ছেলে আগলে রাখে কে? সেই ছেলেরও তখন তিন বছর বয়েস, দুর্দান্ত করে ছুটে ছুটে এখানে ওখানে চলে যায়, ওপর-নিচ করে, জিনিসপত্র ভেঙে তছনছ করে—তাকে আগলে রাখা কম কথা নয়। কাজেই রাঙা মা জিতুর ওপর খুশি। আর ছ'বছরের ছেলেটার কাছে রাঙা মাকে খুশি রাখার থেকে বড় কাজ বুঝি আর কিছু নেই। রাঙা মা যখন স্নান সেরে পুজোর ঘরে গিয়ে পুজোর কাজ করে, তার ছেলেকে নিয়ে জিতু তখন কাছেই বসে থাকে। সেই চিত্রটা ভোলবার নয়। রাঙা মায়ের পরনে লালপেড়ে গরদের শাড়িটা যেন তাঁর গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে যায়। পিঠে ছড়ানো খোলা ভিজে চুল। উপুড় হয়ে বসে যখন চন্দন ঘষে, সব শরীর তখন অল্প অল্প দোলে। জিতু তখন ছেলে আগলানোর কথা অনেক সময় ভুলে যায়। চেয়ে চেয়ে দেখে, চোখে পলক পড়ে না। তখন মনে হত রাঙা মায়ের সকল অঙ্গ দিয়ে যেন রঙ ঝরছে।

জিতুর চোখে ওই রাঙা মায়ের দুটো মূর্তি দাগ কেটে আছে। একখানা স্তব্ধ মূর্তি। আর একখানা একেবারে জ্বলন্ত মূর্তি।

...স্তব্ধ মূর্তি দেখেছিল, তার তিন বছরের ওই দুরন্ত ছেলেটা দু'দিনের ব্যামোয় হুট করে মরে যেতে। রাঙাবাবু তখন আপিসের কাজে কলকাতার বাইরে। একটা শব্দ সেই সময় জিতু ছেলেটার কানে বসে গেছল। ডিপথিরিয়া। ওইতেই ছেলেটা মরে গেল। মরে যাওয়া কাকে বলে জিতু তখনো ভালো জানে না। সেই মরে যাওয়া দেখে তার ছোট্ট বুকটা ভেঙে দুমড়ে যেন একাকার হয়ে গেছল।

আর তার পরেও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত রাঙা মায়ের মুখের দিকে তাকালে ভিতরে কাঁপুনি ধরে যেত যেন। সাদাটে পাথর যেন একখানা। রাতে ঘুম না আসা পর্যন্ত মায়ের বুকে মুখ গুঁজে কেবল রাঙা মায়ের কথাই বলত জিতু। খোকন যে চলে গেল, রাঙা মায়ের কি হবে।

মা বলত, হরি ঠাকুর আবার খোকন দেবে।

হরি ঠাকুর কবে দেবে কি করে দেবে এসব জানতে চাইলে মা বিরক্ত হত। মায়ের কথার অর্থ ঢের পরে বুঝেছিল। রাঙা মা আসলে ওর মায়ের থেকেও বয়সে ছোট। খোকন যখন চলে গেল, মাত্র চব্বিশ বছর বয়েস রাঙা মায়ের।

এর পরেও জিতু রাঙা মায়ের পুজোর কাজের সময় পড়া ফেলে ঠাকুরঘরের সামনে ঘুর ঘুর করত, আর তাকে দেখত। ভারী ইচ্ছে করত, খোকনের মতোই ছুটে গিয়ে রাঙা মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জোর করে তার মুখ থেকে হাসি টেনে বার করে, রঙ টেনে বার করে।

...চার মাস পরের এক সন্ধ্যায় রাঙা মায়ের চোখ দিয়ে আর মুখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুতে দেখেছিল। তাই দেখে জিতু ছেলেটা ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল।

কি-যে ব্যাপার জিতুর মাথায় কিছু ঢোকেনি। সকাল থেকে দেখে মায়ের থমথমে মুখ। চান করল না, রান্নার কাজে গেল না। দুপুরে খেলও না। কেবল ঘরে বসে থাকল। ওকেও তিন তলা থেকে দোতলায় নামতে পর্যন্ত দিল না। আর একজন লোক তাদের দুপুরের খাবারটা ঘরে দিয়ে গেল। মা তখন জিতুকে খেয়ে নিতে বলল।

কি ব্যাপার না বুঝে সমস্ত দিনটা যেন এক দুর্বোধ্য আতঙ্কের মধ্যে কাটল ছেলেটার। দোতলার সিঁড়ির মাঝামাঝি একবার চুপি চুপি এসে রাঙা মায়ের মুখখানা দেখেছিল। রাঙা মা-ও ওকে দেখেছিল। তার চোখে যেন জ্বলন্ত আগুনের ঝাপটা। বিষম ভয়ে জিতু ছুটে আবার তিন তলায় চলে গেছল।

...সন্ধ্যার পরে মা নিঃশব্দে দোতলায় নেমে এসেছিল। রাঙা মা তখনো দোতলার ঠাকুরঘরে দুই বুড়োর রাতের আহ্নিকের আয়োজন করছিল।

দোরগোড়ায় মাকে দেখেই যেন আগুনের মতো ঝলসে উঠেছিল। তারপর গলা দিয়েও চাপা আগুন ছুটেছিল।—আবার তুমি এখানে এসেছ? এই ঠাকুরঘরের দরজায়? এই চরিত্র তোমার, হাতের রান্না খাইয়ে তুমি আমাদের সর্বনাশ করেছ, তারপর আবার এসে তুমি এখানে দাঁড়িয়েছ?

বিড়বিড় করে মা বলতে চেষ্টা করল, ছেলেটা...

শোনার আগেই আবার হিসহিস করে উঠল রাঙা মা, আমি কোনো কথা শুনতে চাই না, দূর হয়ে যাও। কাল সকালে যেন এ বাড়িতে কেউ আর তোমার মুখ না দেখে। যাও—যাও বলছি!

মাথায় বজ্রাঘাত কাকে বলে ছ'বছরের ছেলেটা সেই সন্ধ্যায় অনুভব করেছিল।

রাতে মায়ের মুখের দিকে তাকাতে পারেনি। সাহস করে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে পারেনি। ওকে নিয়ে তিন তলার ঘরে গিয়ে মা দরজা বন্ধ করেছিল। তারপর পাথরের মতো বসেছিল।

সকালে দরজায় বেদম ধাক্কা পড়তে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসেছে। তখন বেশ বেলা। সামনের ছোট খোলা জানলায় তিন চারটে মুখ হুমড়ি খেয়ে আছে। বোকার মতো পিছন ফিরে তাকাতেই এক বীভৎস দৃশ্য দেখে ছেলেটা আর্তনাদ করে উঠল। তারপর দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে এলো। ঘরের বাইরে তিন তলায় বাড়িসুদ্ধু লোক গিসগিস করছে। কারো দিকে না তাকিয়ে ছুটে নিচে নেমে এলো। ওই বীভৎস দৃশ্যটা যেন তাড়া করছে তাকে। দোতলার সিঁড়ির মুখে রাঙা মা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। ওকে দেখল। তারও পাশ কাটিয়ে ছেলেটা ছুটে একেবারে এক তলায় চলে এলো।

...সে দেখেছে, ঘরে নিচু ছাদের লোহার আংটায় দড়ির মতো করে পাকানো একটা শাড়ি, তার এ-মাথাটা গলায় বেঁধে মা মাটি থেকে দু'হাত ওপরে ঝুলছে। মাথার চুল মুখে এসে পড়েছে, তার মধ্যেও বীভৎস কিছু তার চোখে পড়েছে।

বাড়িতে পুলিশের গাড়ি আসতে দেখল। তাদের ওপরে উঠে যেতে দেখল। ছেলেটা বোবার মতো দাঁড়িয়ে। বুকের তলায় ঠক-ঠক কাঁপুনি। তার অনেকক্ষণ বাদে হাসপাতালের গাড়ি এলো। ও-রকম গাড়ি জিতু রাস্তায় দেখেছে আগেও। সেই গাড়ির

লোকেরা একটা পায়া ছাড়া সরু সাদাটে খাটিয়ার মতো জিনিস নিয়ে ওপরে উঠে গেল। তারপর ওতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢাকা একজনকে নিয়ে সেই গাড়িতে তুলে দিল। জিতু জানে তার মাকে নিয়ে চলল তারা।

চলে গেল। এক সময় পুলিশের লোকেরাও চলে গেল। বড়বাবু আর রাঙাবাবুও তাদের সঙ্গে গেল।

ছেলেটা বসে আছে তো বসেই আছে। বেলা গড়িয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ একসময় চমক ভাঙল তার। সামনে দাঁড়িয়ে ভজন কাকা। শুকনো মুখ। কি-রকম যেন ভয়-ভয় চাউনি। চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে?

ছেলেটা জবাব দিতে পারল না। কেঁদে উঠল। ভজন কাকা তাড়াতাড়ি সামনে এগিয়ে গেল। বাড়ির একটা চাকর এদিকে আসছিল। তার সঙ্গে কি কথা বলল। চাকরটা ছুটে আবার ওপরে চলে গেল।

ভজন কাকা আস্তে আস্তে তার সামনে এসে দাঁড়াল। মিনিটখানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখল। হাত ধরে টেনে দাঁড় করালো। —চল।

ওর হাত ধরেই বেরিয়ে এলো। রাস্তায় একটা ট্যাক্সি ধরল।

দু' ঘরের ফ্ল্যাটে ভজন কাকার সঙ্গে চৌদ্দ দিন ছিল। আলাদা শুতে ভয় পায় দেখে ভজন কাকা ওকে নিজের মস্ত খাটে নিয়ে শুয়েছে সেই ক'দিন। ওর খাওয়া-দাওয়ার দিকে চোখ রেখেছে। কিন্তু মায়ের কথা বা গুপ্ত বাড়ির কথা একবারও তোলেনি। ভজন কাকার সেই ঠাণ্ডা মুখ দেখে তখন কেউ ভাবতে পারবে না, হাত-মুখ নেড়ে এই লোকে অমন গান গাইতে পারে। চার-পাঁচ দিনের মধ্যে ভজন কাকা ঘর ছেড়েই বেরোয়নি। তারপর এক-একদিন বেরিয়েছে; ওকে বলে গেছে, ঘর ছেড়ে নড়বি না।

তারপর একদিন ওকে সঙ্গে করে বেরুলো। ওর জন্য অনেকগুলো প্যান্ট আর জামা-টামা কিনল। স্যান্ডাল আর জুতো কিনল। আলাদা বিছানা মশারি চাদর বালিশ গামছা তোয়ালে স্যুটকেস আরো কত কি কিনল। পরদিন ওই সব নিয়ে আর ওকে নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে সেই ট্যাক্সি চলল তো চললই। তারপর গ্রামের মতো একটা জায়গায় এসে গেল তারা। আরো খানিকটা এসে জিতু অবাক। সেখানে দু' দিকে দুটো বেশ বড় দালান। মাঝে মস্ত মাঠ। দালানের ও-পাশে সুন্দর বাগান। একটা দালানে ছোট বড় অনেক ছেলে। কিন্তু ভজন কাকা ওকে নিয়ে এ-দিকের দালানে এলো। পরে জেনেছে এটা স্কুল বাড়ি। আর সাধুর মতো দেখতে যে দু'জন লোকের সঙ্গে কথা কইতে কইতে একটা বড় ঘরে ঢুকে গেল—সেটা আপিস ঘর। সাধুর মতো ওই দুটো লোকের একজনের পরনে গেরুয়া কাপড়, অন্য জনের সাদা। কারো কাছা-টাছা নেই। কিন্তু বেশ মিষ্টি হাসি-হাসি মুখ লোক দুটোর।

কিছু দূরে বসলেও জিতু সব দেখতে পাচ্ছিল। ভজন কাকার সঙ্গে তাদের কি কথা হল। গেরুয়া পরা লোকটা বড় বাঁধানো খাতা খুলে ভজন কাকাকে জিজ্ঞাসা করে করে কি-সব লিখল। ভজন কাকাও কতগুলো ছাপানো কাগজে কি-সব লিখল-টিখল। পকেট থেকে একগোছা নোট বার করে গেরুয়া পরা লোকটির হাতে দিল।

তারপরে সকলে মিলে অন্য দালানের দোতলায় একটা বেশ বড় ঘরে নিয়ে এলো তাকে। সেই ঘরে ওর থেকে সামান্য বড় আরো পাঁচটা ছেলে থাকে, দেখল। সেখানে নেয়ারের খাটিয়ায় যার-যার পরিষ্কার বিছানা, সামনে টেবিল আর চেয়ার। টেবিলে বইখাতা গোছানো। সেই রকমই একটা খাটিয়ার ওপর তার বাঁধা-ছাদা বিছানা আর জিনিসপত্র রাখা হয়েছে।

জিতু নামে ছেলেটা এবারে স্পষ্ট বুঝে নিল, এখানে এই ছেলেদের সঙ্গে তাকে থাকতে হবে। আর আগের ওই দালানটা স্কুল। সেখানে তাকে পড়তে হবে। এ-ঘরে ঢোকার আগেই দেখেছে অন্য ঘরগুলোতেও নানা বয়সের অনেক ছেলে।

ওকে সেখানে রেখে ভজন কাকা চলে গেল। যাবার আগে বলে গেল, এখানে এই সব ছেলেদের সঙ্গে থাকবি, খুব ভালো লাগবে। আর যখন যা দরকার হয়, ওই মহারাজদের কাছে বলবি। তারাও খুব যত্ন করবে দেখিস। আমি মাঝে মাঝে এসে তোকে দেখে যাব।

ক'দিনের মধ্যে সত্যি ভালো লাগতে শুরু করেছিল ওর। সকলে যা করে সে-ও তাই করে। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে আবার রাতে ঘুমনো পর্যন্ত সব-কিছু নিয়মে বাঁধা। লেখা-পড়া খাওয়া-দাওয়া খেলাধুলো—সব। প্রথম দু-তিনদিন একটু অসুবিধে হয়েছিল, তারপরেই সব ঠিক হয়েছে। ভজন কাকা যাদের মহারাজ বলেছিল তারাই মাস্টারমশাই এখানকার। আর তারাও সকলে এখানেই থাকে। দিনকতক না যেতে এরাও বেশ খুশি ওর ওপর। পিঠ চাপড়ে বলেছে, ভেরি ব্রাইট বয়!

এখানে আসার পরে স্কুলের নাম ডাকা থেকে সে বুঝেছে তার আস্ত নাম জিতেন বোস। এ নিয়ে প্রথম দিনই তো ফাঁপরে পড়েছিল। ভজন কাকা চলে যাবার পরে ঘরের সব থেকে বড় ছেলেটা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমার নাম কি?

—জিতু।

—জিতু কি?

ও মাথা নেড়েছিল, আর কি জানে না। ওরা মজা পেয়েছিল। —যিনি তোমাকে রেখে গেলেন, তাঁর নাম কি?

—ভজন কাকা।

ওরা আরো হেসেছে।

তারপর একটানা এগারো বছর কেটেছে সেখানে। স্কুলের কোনো পরীক্ষায় প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হয়নি কখনো। অনায়াসে শিক্ষকদের চোখের মণি হয়ে বসেছে সে। ভজন কাকা মাসে একবার করে আসে। কিন্তু সব মাসে তার সঙ্গে দেখাও হয় না। মহারাজদের সঙ্গে টাকা-পয়সার ব্যাপার মিটিয়ে চলে যায়। বড় হবার পর জিতুর নিজের দু-পাঁচ টাকার দরকার হলে তাও মহারাজদের কাছ থেকে নিতে হয়। অবশ্য সে-টাকাও ভজন কাকারই।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার মাস কয়েক আগে একদিন বড় মহারাজ তাকে ডেকে পাঠিয়ে জানালেন, খুব দুঃখের কথা, তোমার গার্জেন প্রকাশ বোস মারা গেছেন—মারা যাবার আগে তিনি হাসপাতালে ছিলেন, সেখান থেকে খবর এসেছে। তুমি এক্ষুনি চলে যাও।

বড় মহারাজ সঙ্গে কিছু টাকাও দিয়ে দিলেন।

জিতু সেই প্রথম জানল, ভজন কাকার নাম প্রকাশ বোস।

কোথায় হাসপাতাল, কিভাবে যাবে না যাবে কিছুই জানে না। শুনে ক্লাসের বন্ধু শ্রীহরি রায়ও ছুটি নিয়ে তার সঙ্গে এলো। জিতু কাউকে সত্যিকারের বন্ধু ভাবে কি না সন্দেহ, ওর ভিতরটা কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু শ্রীহরি তার বেজায় ভক্ত। বয়সে জিতুর থেকে এক বছরের বড়। ক্লাসের সাদামাটা ছেলে শ্রীহরি। ওর বাপ ভক্ত মানুষ, খুব সাধারণ অবস্থা, মফঃস্বল শহরে মোক্তার থেকে উকিল হয়েছিল। কোনো মহারাজের সঙ্গে চেনা-জানার ফাঁক দিয়ে ছেলেকে এখানে গছিয়ে দিয়েছে। এক ক্লাসে পড়ে, এক ঘরের পাশাপাশি শয্যায় দুজনে শোয়। শ্রীহরি গোপনে ওর অনেক কাজ করে দেয়। বিছানার চাদর বা বালিশের ওযাড় কাচা, টেবিল পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখা, বোতাম ছিঁড়লে নতুন বোতাম লাগানো—এ-সব ও বেশ পারে। তার বদলে জিতু পড়াশুনোর ব্যাপারে ওকে ফাঁক মতো একটু-আধটু সাহায্য করে। শ্রীহরি তাতেই বর্তে যায়।

ভেকেশনের সময় প্রায় সব ছেলেরাই বাড়ি যায়। যাদের একেবারে কেউ নেই, তারাই শুধু থাকে। তখন আশ্রমের কাজ করতে হয় তাদের। কিন্তু আশ্রমের কাজ-টাজ ওর ভালো লাগে না। ওপরের ক্লাসে ওঠার পর ভজন কাকার পারমিশন নিয়ে ছুটি-ছাটায় সে শ্রীহরিদের বাড়ি যেত। শ্রীহরি যেন কৃতার্থ হয়ে যেত তাতে। ওর বাবা-মাও ভালো মানুষ। কেউ নেই জেনে যতটুকু সাধ্য যত্নআত্তি করত। সেখানে খুব যে ভালো লাগত জিতুর তা নয়। ওদেরও বিশেষ করে শ্রীহরির মায়ের ছোঁয়াছানির কড়া বাছ-বিচার। আসলে ওরা চাটুজ্জে বামুন—রায় উপাধি। ওর মা দিন রাতের বেশির ভাগ পুজোর ঘরে কাটাত, জল ঘেঁটে ঘেঁটে হাত-পা হেজে গেছে। জিতু গেলে শ্রীহরির মা যে একটু সন্ত্রস্ত থাকত তা আঁচ করতে পারত। কায়েতের ছেলে, কখন কি ছুঁয়ে ফেলে। তখন কেন যেন বিশ্রী রাগ হয়ে যেত ওর। পুজোর ঘরে কাউকে দেখলেই আর একজনকে মনে পড়ত। রাঙা মাকে। চন্দন ঘষার সময় সর্ব অঙ্গ অল্প অল্প দুলত যার। আলো ছড়াত।

কিন্তু সেই রাঙা মায়ের ওপরেও তখন দুর্জয় রকমের রাগ হত তার। রাঙা মা ওর মাকে ঠাকুরঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল বলে আগুনের মতো ঝলসে উঠেছিল। বলেছিল, তোমার হাতের রান্না খাইয়ে আমাদের সর্বনাশ করেছ—আবার তুমি এখানে এসে দাঁড়িয়েছ?

না, ঠাকুরঘর, পুজো-আর্চা, আশ্রম—এ-সব জিতুর কিছুই ভালো লাগে না। উল্টে এক-ধরনের চাপা আক্রোশে ভিতরে ভিতরে ফুলতে থাকে। অনেকবার ভেবেছে শ্রীহরিদের বাড়ি আর আসবে না, কিন্তু ছুটি এলে শ্রীহরির টানাটানিতে আবার যেতেও হয়।

দুটি নাবালক দেখে হাসপাতালের লোকের চেষ্টায় সৎকার সমিতির গাড়িতে ভজন কাকার মৃতদেহ নিয়ে গেছে। ওরাও সঙ্গে ছিল। চিতা জ্বলে উঠতে বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো একটা চিন্তা জিতুর মাথায় এসেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মুখ মনে পড়েছে। রাঙা মায়ের মুখও।

...ওই যে জ্বলছে লোকটা, সে কে?

...ওই যে পুড়ছে লোকটা—কে সে?

ক্লাসে এ-যাবৎ জিতেন বোস নামে এই ছেলেটা প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হয়নি কখনো। মাস্টার মশাইরা আশা করছে, ম্যাট্রিকে প্রথম দশ জনের মধ্যে ওর নাম থাকবে। জিতু নিজেই জানে খুব দুরাশা নয় সেটা। এত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর এমন মেধা যার, সেই জিতেন বোস কে? রাঁধুনির ছেলে? তা হতে পারে। কিন্তু বাবা কে? মায়ের মতোই অশিক্ষিত কোনো একজন?

ওই জ্বলন্ত আগুন থেকে এক ঝলক আলোর ঘায়ে আচমকা একরাশ অন্ধকার দূর হয়ে গেল যেন।

ভিতরটা আঁতি-পাতি করে খুঁজছে সে।...তিন তলার যে ঘরে থাকত তারা, তার সামনেই ছাদ। গানের আসর শেষ হলে খাওয়া-দাওয়ার পর ভজন কাকা অনেক সময় ছাদে পায়চারি করতে আসত। কেউ না থাকলে মাকেও এক-একসময় গিয়ে দাঁড়াতে দেখেছে। হাসি মুখে ভজন কাকাও এক-একসময় ঘরে উঁকি দিয়েছে। ...সে-ই তো মাকে ও-বাড়িতে নিয়ে এসেছিল, কে কি ভাববে?...আরো মনে পড়ছে জিতুর। যে-দিন সন্ধ্যায় রাঙা মা মাকে বাড়ি থেকে দূর হয়ে যেতে বলল, তার আগের দিনও ভজন'কাকা এসেছিল। গান বাজনার আসর বসেছিল। ভজন কাকা রাতে ওখানেই থেকে গেছল। সকালে উঠে জিতু আর তাকে দেখতে পায়নি। সেই সকাল থেকেই মায়ের অমন থমথমে মুখ। আর সেই সন্ধ্যায় রাঙা মায়ের অমন আগুন-ঝরা মূর্তি। তার পরের সকালে ঘুম ভাঙতে সেই বীভৎস দৃশ্য।

...চিতা জ্বলছিল আর শ্রীহরিটা ফোঁস ফোঁস করে কাঁদছিল। ওর মায়ের আত্মহত্যার গল্প শ্রীহরির কাছে অনেক আগেই করেছিল। রাঙা মায়েব গল্পও। ওই ভজন কাকা ছাড়া জিতুর ত্রিভুবনে আর কেউ নেই. সেই দুঃখে শ্রীহরির কান্না।

কিন্তু ওই আগুনের দিকে চেয়ে জিতুর দু'চোখ ধক-ধক করছিল।

...চিতায় জ্বলছে ওই লোকটাই তার জন্মদাতা।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরেও শ্রীহরি ওকে নিজের বাড়িতে ধরে নিয়ে এলো। তাছাড়া এক-টানা তিনটে মাস কাটবেই বা কি করে। কলেজে আর পড়া হবে কিনা সেটা নির্ভর করছে ম্যাট্রিকের রেজাল্টের ওপর। জিতু আশা করছে হবে।

কিন্তু এই ক'টা মাসের মধ্যে ভিতরে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছে তার, মুখ দেখে কেউ বুঝবে না। লোকে যা-কিছু ভালো বলে তাই দু'পায়ে মাড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করে। কাউকে পুজো-টুজো করতে দেখলে সব লাথি মেরে লণ্ডভণ্ড করে দিতে ইচ্ছে করে। বেশ মাথা খাটিয়ে খুব কঠিন রকমের কিছু অন্যায় করে ফেলতে ইচ্ছে করে। ওর থেকে ছোট, বা সমবয়সী, অথবা দু'পাঁচ বছরের বড় মেয়ে দেখলেও বায়োলজির ছাত্রের মতো ভিতরটা ছিঁড়ে খুঁড়ে দেখে নিতে ইচ্ছে করে। ওর বয়স সতের, কিন্তু সেই রাঙা মায়ের বয়েসটা ওর চোখে এখনো চব্বিশেই আটকে আছে। চন্দন ঘষতে বসলে যার সর্ব অঙ্গ অল্প অল্প দোলে। রঙ ঝরে। চোখ বুজে সেই দৃশ্য এখনো ও দেখে তন্ময় হয়ে। আর একটা লুব্ধ আক্রোশ তখন যেন সেদিকেই সব থেকে বেশি ধেয়ে যায়।

শ্রীহরির বাড়িতে জিতু প্রথম এসেছিল বারো বছর বয়সে। ওর বোনটার তখনো সাত বছর বয়স। কালো মোটাসোটা ফ্রক-পরা মেয়ে। সকলে ধারা বলে ডাকে। দাদা অর্থাৎ শ্রীহরি তার ওপর হম্বিতম্বি করত। ফলে ঠাণ্ডা মেয়েটা তখন বেশি ধারে-কাছে ঘেঁষত না। ওর নাম যে যশোধরা জিতু তাও জানত না।

এবারে এসে দেখল এই মেয়েটাও দিব্বি বড়সড় হয়েছে। তখনো ফ্রক পরে অবশ্য, কিন্তু শরীরের ছাঁদ বদলেছে। জিতুর ব্যাধিগ্রস্ত তীক্ষ্ণ চোখ দুটো ওই বারো বছরের মেয়েটার দিকেও গেছে। আরো সুবিধে যে মেয়েটা বোকা। মাতব্বর দাদা ইদানীং আরো বেশি ধমকায় আর ধুমসি-টুমসি বলে, তাই সরে সরে থাকে। জিতু এখন একটু আধটু পড়াশুনা দেখছে ওর। তাইতে শ্রীহরি মহাখুশি। কিন্তু জিতুর বিবেচনায় পড়াশুনায়ও গবেট মেয়েটা। পড়া না পারলে হঠাৎ দু'আঙুলে গাল টেনে ধরত। মেয়েটার লাগত নিশ্চয়, কিন্তু টুঁ-শব্দটি করত না। এই করেই সাহস বাড়ছিল জিতুর। কারণ শাস্তি দিলেও বাবা-মায়ের কাছে নালিশ যে করে না, তাও বুঝেছে। নালিশ করবে কি, দাদা হল গিয়ে বাবা মায়ের চোখের মণি, সেই দাদার চোখের মণি আবার এই ছেলে। নালিশ করলে দাদাই তো খেয়ে ফেলবে ওকে।

পড়া না পারার অজুহাতে শক্ত করে মেয়েটার বাহু দুটো দু'হাতে চেপে ধরে বলল, দেব হাত দুটো ভেঙে?

ধারা মাথা নাড়ল। —দাও, তাহলে আর পড়তে হবে না।

রাগের ভান করে, আরো জোরে চাপ দিল জিতু।—আর পড়তে হবে না! এখন কেমন লাগছে?

মুখের দিকে চেয়ে মেয়েটা হাসতে চেষ্টা করছে।

জিতুর একটা হাত ওর পিঠে উঠে এলো। খাবলা মেরে খানিকটা চামড়া মাংস দুমড়ে দুমড়ে দিতে লাগল।

—এবার?

দাঁতে করে ঠোঁট চেপে এবারও মাথাই নাড়ল মেয়েটা। অর্থাৎ লাগছে না।

মাথায় যেন শয়তান চেপে আছে জিতুর। ওর ঈষৎ ফোলা বুকের দিকে তাকিয়ে বলল, দেখবি তাহলে লাগে কিনা?

আচমকা ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মেয়েটা ছুটে বেরিয়ে গেল। আর জিতুর মনে হল, সে-ই একটা গণ্ডগোল থেকে পরিত্রাণ পেল।

এই সময়েই ধারার দিক থেকে তার মনোযোগটা অন্য দিকে সরলো। শ্রীহরি এতদিনে একটা গোপন কথা ফাঁস করল। ফলে পাশের দোতলা বাড়ির বছর চৌদ্দর একটা মেয়ের দিকে চোখ গেল তার। ফ্রক ছেড়ে সবে শাড়ি ধরেছে। সুশ্রী চটপটে ছটফটে হাবভাব। মেয়েটাকে জিতু এবারে এসে আগেও লক্ষ্য করেছে। দোতলায় ওই জানালায় এসে দাঁড়ায়। মাঝে মাঝে এ-বাড়ির দিকে হাসি-হাসি মুখে তাকায়।

লজ্জা জলাঞ্জলি দিয়ে শ্রীহরি জানাল, পাস-টাস করে একটু ভালো চাকরি-বাকরি করতে পারলে ওই মেয়েটার সঙ্গে তার বিয়ে হবার কথা। তার দাদুর সঙ্গে ওই মেয়ের দাদুর গলায় গলায় ভাব ছিল নাকি। তারাই আরো পাঁচ বছর আগে ঠিক করে গেছে।

মেয়েটার নাম তন্দ্রা। তন্দ্রা গাঙ্গুলি। এবারে বাবাও নাকি শ্রীহরির মাকে বলেছে, ছেলেটা ভালো পাশ করে চাকরিতে ঢুকলেই তন্দ্রার সঙ্গে তার বিয়ে দেবে।

শুনে হিংসেয় ভিতরটা একেবারে জ্বলে গেছে জিতুর। শ্রীহরির আর ওই মেয়ের দুজনেরই গালে দুটো থাপ্পড় বসাতে ইচ্ছে করেছে। কিন্তু সেটা বুঝতে দেয়নি। ফাঁক মতো রাস্তায় তন্দ্রার ওপর চড়াও হয়ে আলাপ করেছে। শ্রীহরি সঙ্গে ছিল, বন্ধুর মতলব বুঝে সে হাঁসফাঁস করে আগেই পালিয়েছে।

মেয়েটা চৌকস বেশ। ওকে বলেছে, তুমি তো দারুণ ভালো ছেলে শুনেছি।

জিতু বলেছে, এখন খুব খারাপ ছেলে ভাবছ?

মেয়েটা হাসতে লাগল।

জিতু বলল, শ্রীহরিটা একটা ভ্যাবলা। পালালো। ওকে কেমন লাগে?

—বিচ্ছিরি।

—তাহলে বিয়ে হবে কি করে?

এ-বয়েসের এমন ঠোঁট-কাটা ছেলে দেখে অবাক লেগেছে তন্দ্রার। ঠোঁট উল্টে বলেছে, ওকে বিয়ে করতে আমার বয়ে গেছে।

বলে সে-ও পালিয়েছে।

তারপর এ-ক'দিন ধরে রোজই চোখাচোখি হচ্ছে। মেয়েটা দোতলার জানলায় বেশি দাঁড়াচ্ছে। জিতু দেখে। হাসে। শ্রীহরিকে ডেকে দেখায়। দেখেই ও পালায়। দেখেছে শ্রীহরির বোন ধারাও। তন্দ্রাদিকে ও তো কবে থেকেই জানে। বয়সে দু'বছরের বড় হলেও পড়ে মাত্র এক ক্লাস ওপরে। একদিন পিছন ফিরে জিতু দেখে, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ও ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে। দাদা পালাল কেন, আর এদিকের মজাটাই বা কি বুঝতে চেষ্টা করছে।

জিতু ওর দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাতে তবে সরেছে।

এরপর দুই একদিন ধারার সঙ্গেই তন্দ্রা এ-বাড়িতে এসেছে। জিতু বা শ্রীহরিকে তখন যেন চেনেও না। কিন্তু যাবার আগে ফাঁক মতো জিতুর সঙ্গে ঠিক দু-চারটে কথা বলে হাসাহাসি করে গেছে।

মজা হল, ম্যাট্রিক পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুতে। ও-দিক থেকে স্কুলের বড় মহারাজ এই ঠিকানায় টেলিগ্রাম করেছে। এ-দিকে বড় বড় কাগজে ওর ফোটোসুদ্ধু খবর বেরিয়েছে। কাগজ-অলাদের ফোটো নিশ্চয় বড় মহারাজই দিয়েছে। ক্লাসের পরীক্ষায় যারা প্রথম হত, প্রাইজের সময় বড় মহারাজ নিজে তার ছবি তুলত। ওর ছবি তো ফি বছরই তোলা হত।

দ্বিতীয় তৃতীয় নয়, জিতেন বোস একেবারে প্রথম হয়েছে ম্যাট্রিক পরীক্ষায়। ...হ্যাঁ, সেই মফঃস্বল শহরেও একটা সাড়াই পড়ে গেছল। শ্রীহরি দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছে সেটা কিছু নয়, বন্ধুর গর্বে তার মাটিতে পা পড়ে না। সাইকেল নিয়ে ছুটে বেরিয়ে সে চেনা জানা সক্কলকে খবর দিয়েছে। আর তারপর থেকে কতজন যে জিতুকে বাড়িতে এসে দেখে গেছে ঠিক নেই।

এ-দিকে দুটো মেয়ে হাঁ একেবারে। একজন শ্রীহরির বোন ধারা। আর একজন তন্দ্রা। ধারা সামনে থেকে হাঁ করে ওকে নতুন করে দেখেছে আবার। তন্দ্রা দোতলার

জানলা থেকে। তন্দ্রার দেখাটাই মজার ব্যাপার জিতুর কাছে। সে যেন বিশ্বাস করবে কি করবে না ভেবে পাচ্ছিল না।

এরই মধ্যে নিজের কাছেও সে সত্যিই আর একজন। দুপুরের নিরিবিলিতে ধারাকে দিয়েই তন্দ্রাকে চুপি চুপি ডেকে আনিয়েছে। ওদিকে শ্রীহরি সেটা জেনেই অন্য ঘরে গিয়ে সেঁধিয়েছে। তন্দ্রা আসার সঙ্গে সঙ্গে ধারাকেও ঘর থেকে বিদায় করেছে জিতু।

—তখন কি দেখছিলে—দারুণ ভালো ছেলে?

তন্দ্রা হেসে মাথা ঝাঁকাল।—এমন সাংঘাতিক দারুণ, ভাবিনি।

জিতু বলল, কেন, শ্রীহরিও তো পাশ করেছে।

তন্দ্রা ঠোঁট উল্টে দিলে। —হুঃ, কোথায় ফার্স্ট আর কোথায় সেকেন্ড ডিভিশান!

—তাহলেও যার ঘরে আসছ তার একটু প্রশংসা অন্তত তোমার করা উচিত।

—আমার বয়ে গেছে ঘরে আসতে।

—সে কি! এত অপছন্দ! প্রথম হয়ে সাহস বেড়ে গেছে জিতুর। —তাহলে আমাকেই দেখো, একটু-আধটু পছন্দ হয় কিনা।

তন্দ্রা ভেঙচি কেটে পালাতে চাইছে। আর তক্ষুনি দরজার বাইরে ধারার সঙ্গে বড়সড় একটা ধাক্কা খেয়েছে। জিতুর ইচ্ছে করছিল ওকে আবার জোর করেই ধরে নিয়ে আসে। আর ইচ্ছে করছিল, শ্রীহরির মাথাটা গুঁড়িয়ে দিতে। ওর মতো হাঁদাকে কোনো মেয়ের পছন্দ হতে পারে না। তন্দ্রার তো হতেই পারে না। তবু যার যেমন বরাত।

শ্রীহরি বাপের কাছে থেকেই এবারে মফঃস্বল কলেজে ভর্তি হয়েছে। জিতু কলকাতার নাম-করা কলেজে। তাকে কিছু করতে হয়নি। বরং তিন চারটে কলেজ থেকে ডাক এসেছে। জিতু নিজেই কলেজ বাছাই করেছে। পড়া ফ্রী। হস্টেলে থাকা-খাওয়া ফ্রী। তার ওপর স্কলারশিপ তো পাবেই।

ছ'বছরে আই.এ., বি.এ., এম.এ. পাস করেছে। কোনোবারই প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হয়নি। বি.এ.-তে ইকনমিস্-এ ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, এম.এ.-তেও তাই।

এর মধ্যে বড় ছুটি-ছাটায় শ্রীহরির কাছে এসেছে। বি.এ. পাস করেই ও সেখানকার সরকারি স্কুলে মাস্টারি নিয়ে বসেছে। সেটাই ওর কাছে বেশ কাজ। সুবিধে হলে বি.টি. পড়ে নেওয়ার ইচ্ছে। ছুটিতে বন্ধু এলেই সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে।

পাশের বাড়ির তন্দ্রাকে দেখলে জিতুর জ্বলুনি এখন আরো বাড়ে। মেয়েটা তার চোখে আরো লোভনীয় হয়ে উঠেছে। কুড়ির কাছাকাছি বয়েস এখন। ঠাট ঠমক আরো বেড়েছে। একবার আই.এ. ফেল করে পড়া ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। এখন এন্তার নাটক নভেল পড়ে আর সিনেমা দেখে। হ্যাঁ, জিতুর সঙ্গেও সিনেমা দেখতে গেছে। পাশাপাশি বসেছে। অনেক সময়ে গায়ে গা ঠেকেছে, হাতে হাত লেগেছে। আর সারাক্ষণ বসে একটা দুরন্ত ইচ্ছেকে ভিতরে গুঁড়িয়েছে জিতু। না, শ্রীহরি কখনো সঙ্গে আসেনি। নিজে চুপি চুপি টিকিট কিনে ওদের দুজনের দেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছে প্রত্যেকবার। ওর তাইতেই আনন্দ, তাইতেই উদ্দীপনা।

জিতুর এম.এ. পরীক্ষা শেষ হল আর শ্রীহরিরও বিয়ে লাগল। এর মধ্যে শ্রীহরির আক্ষেপ-ভরা এক চিঠিতে জেনেছিল, ওখানে বিয়ে বোধহয় হবে না, কারণ এই বিয়ের

ব্যাপারেই বাবা-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে তন্দ্রা কলকাতায় মামার বাড়ি পালিয়ে গেছে। চিঠি পড়ে জিতুর ভিতরে ভিতরে চাপা উল্লাস। তন্দ্রার মামার বাড়ির ঠিকানা জানা থাকলে ও যে সেখানে ছুটত সন্দেহ নেই।

তার দেড় মাসের মধ্যে এই ডগমগ চিঠি। তন্দ্রাকে তার বাবা মা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরিয়ে এনেছে এবং বিয়েতে রাজী করিয়েছে।

...বন্ধুর বিয়েতে জিতু উপস্থিত ছিল। বিয়ের পরেও কিছুদিন। তখন শ্রীহরির সামনেই তন্দ্রা হাত ধরে টানাটানি করেছে। হ্যাঁচকা টানে কখনো নিজের গায়ের ওপর এনে ফেলেছে। দুজনের এত খাতির দেখে শ্রীহরি বোকাটা মজাই পেয়েছে। জিতু ভ্রূকুটি করে তন্দ্রাকে বলেছে, কলকাতায় তো পালিয়েছিলে আমার খোঁজে, ঠিকানা যোগাড় করে বুদ্ধি করে একখানা চিঠি লিখতে পারোনি? কারো সাধ্য ছিল তোমাকে আবার এখানে ফিরিয়ে নিয়ে আসে!

তন্দ্রা চোখের কোণে তাকে দেখেছে আর মিটিমিটি হেসেছে। আর ওই বোকাটা তখনো হেসেইছে।

নিজে বিয়ে করার পরেই বোনের বিয়ে দেবার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিল শ্রীহরি। মেয়ের অর্থাৎ ধারার বিয়ের কথা ভেবে ওর বাবা মা নাকি চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। মেয়ের এই আঠার চলছে। থার্ড ডিভিশানে ম্যাট্রিক পাশ করার পর আর পড়ানোই গেল না ওকে। পড়াশুনায় মতি নেই, টাকার জোর নেই। মেয়ের গায়ের রঙ কালো। ভাবনা হওয়াই স্বাভাবিক। শ্রীহরি বলেছিল, বাড়ির কাজকর্মে ধারার জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু সেই গুণ ক'জনে আর যাচাই করে।

বন্ধুর একটা খেদের কথায় জিতুর কানের পর্দা চিড়বিড় করে উঠেছিল একেবারে। সে বলেছিল, তুই বামুন হলে যে-ভাবে হোক তোর কাছেই গছাতাম ওকে—

জিতু মনে মনে গাল পেড়েছে, জাতের মাথায় ঝাঁটা। ওর বোনকে মনে ধরলে সেই ঝাঁটাই সে মেরে বসত। সে-রকম কোনো বাসনা মনের কোণেও নেই। তার আপাত মনোযোগ শুধু ওর বউয়ের দিকে। তন্দ্রার সঙ্গে যত হাসি-ঠাট্টা আর ফষ্টি-নষ্টি করুক, ঈর্ষায় ভিতরটা ওর এক-এক সময় হিংস্র হয়ে উঠতে চায়। তাহলেও বয়েস-কালের মেয়ে দেখলে যেমন লক্ষ্য করা স্বভাব, তেমনি ধারাকেও যে লক্ষ্য করেনি তা নয়। চোখের ওপর এই মেয়েটাও বড় হয়ে গেল। রং কালো, কিন্তু বেশ নিটোল স্বাস্থ্য। মুখের শ্রী-ও মন্দ নয়। একপিঠ চুল। বড় হয়েছে সেই জ্ঞানও আছে, এখন আর যখন-তখন সামনে আসে না। ডাকলে আসে অবশ্য। কিন্তু ওকে আর কতটুকুই বা ডাকার দরকার হয় জিতুর। যখন যা দরকার তাও হাতের কাছে মজুত দেখে জিতু।

দিন কতকের মধ্যেই কলকাতায় চলে এসেছে। আসার আগে তন্দ্রা জিজ্ঞাসা করেছিল, আবার কবে আসছ?

হেসে রসিকতাই করেছে জিতু। বলেছে, তুমি সে-ভাবে ডাকলে তো কবেই আসতুম, শ্রীহরিরই বরাত।

তন্দ্রার যে এ-বিয়ে পছন্দ হয়নি জিতু সেটা আঁচ করতে পারে। আর এই গোছের রসিকতার জবাবে ওর চোখের কোণে তাকানো দেখেও বুঝতে পারে।

এবার রোজগারের চিন্তা। এম.এ.-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে এবং প্রথম হয়েছে। হবে জানাই ছিল। কিন্তু এবারে কি?

ইচ্ছে করলেই কলেজে কাজ নিতে পারে। কমপিটিটিভ পরীক্ষায় বসতে পারে। কিন্তু চাকরি করে কে আর কতটুকু বড় হয়। তার এই জীবনটা আর পাঁচটা সাধারণ ছেলের জীবন নয়। এই জীবন নিয়ে অনেক কিছুর ফয়সলা বাকি, নিষ্পত্তি বাকি। কি-রকমের ফয়সলা বা নিষ্পত্তি সে ঠিক জানে না। আপাতত এই দুনিয়াটাকে দু'পায়ে মাড়িয়ে চলার মতো শক্তি চায় সে।

অপ্রত্যাশিত একটা যোগাযোগ ঘটে গেল। সেটা যে এমন লোভনীয় তখনো ভালো করে বোঝেনি। শুধু আশাপ্রদ মনে হয়েছে। কলেজ য়ুনিভার্সিটির নামজাদা ছাত্র সে। ম্যাট্রিক থেকে এম.এ. পর্যন্ত কখনো সেকেন্ড হয়নি এমন আর ক'জন আছে? এম.এ. পাস করার পর খবরের কাগজে তার ছবিসহ ছোটখাটো জীবনীও ছাপা হয়েছিল।

হঠাৎ একটি মাড়োয়ারী ছেলে তার কাছে এসে উপস্থিত। কুড়ি-একুশ বছর বয়েস, সুশ্রী। তার আর্জি তাকে পড়াতে হবে, সে ইকনমিক্স অনার্স-এ বি.এ. পড়ছে। একটু ভালো রেজাল্ট করার ইচ্ছে ইত্যাদি।

চাকরিই যে করবে না, প্রাইভেট টিউশনের কথা তার চিন্তার মধ্যেও নেই। কৌতূহলবশে ছেলেটার পরিচয় নিল। নাম দীপক আগরওয়াল। বাবার নাম মধু আগরওয়াল। বড় ইনজিনিয়ারিং কনসট্রাকশন ফার্মের মালিক ওদের পরিবার। তাছাড়া শেয়ারমার্কেটে বাপের নিজস্ব গদী আছে।

ইনজিনিয়ারিং কনসট্রাকশনের ফার্ম বা নিজস্ব গদী সম্পর্কে জিতুর কোনোরকম ধারণা নেই। তবু কদর বোঝার জন্য জিজ্ঞাসা করল, কত টাকা দেবে?

ছেলেটা পরিষ্কার বাংলা বলে। বিনীত মুখে জবাব দিল, টাকার জন্য অসুবিধে হবে না, আপনি বলুন।

চোখ-কান বুজে জিতু বলে ফেলল, সপ্তাহে দু'দিন দু'ঘণ্টা করে—মাসে আড়াইশ টাকা লাগবে।

সেই দিনে কলেজের মাস্টারের মাইনে হয়তো দেড়শ'র মধ্যে শুরু।

ছেলেটা বলল, সপ্তাহে তিন দিন হলে ভালো হয়।...ঠিক আছে, আমার বাপুজীর সঙ্গে একটু কথা বলে নেবেন চলুন, সঙ্গে গাড়ি আছে, আবার আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাবে।

ও-রকম গাড়িতেও জিতু এর আগে চড়েনি। যেতে যেতেই দ্রুত চিন্তা করে নিয়েছে। সেই রকম কোনো ধনীর বাড়ি আর ধনীর নন্দনই হবে এই ছেলে। যদি আশাপ্রদ মনে হয় তাহলে এই টিউশন দিয়েই জীবন শুরু করতে আপত্তি নেই।

বিশাল চকমিলানো বাড়ি দেখে ভিতরে ভিতরে আরো একটু উত্তেজনা। সামনেই আরো দুটো ওই রকম ঝকঝকে গাড়ি দাঁড়িয়ে। দোতলা তিন তলায় ওঠা নামার জন্য বাড়িতে লিফট। দীপক আগরওয়াল নিজেই লিফট চালিয়ে তাকে বাপের কাছে নিয়ে গেল।

গদী-মোড়া ফরাস বিছানো মস্ত চৌকিতে মধু আগরওয়াল বসে। বছর পঞ্চান্ন বয়েস হবে, কিন্তু বপু দেখলে আরো বেশি মনে হয়। বিনীত ভদ্র অথচ চতুর যে তাও বোঝা

যায়। এ-ও পরিষ্কার বাংলা বলে। পরিচয় এবং ছেলের বক্তব্য শুনে সে-ও বলল, সপ্তাহে দু'দিন আড়াইশ টাকা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে, দীপক তিন দিনের কথা বলছিল।—

মন স্থিরই করে ফেলেছে জিতু। তাই একটা মোক্ষম জবাবই দিয়ে বসল সে। আর তার ফলে কাজও যে কি হল, মুখ দেখে সেটুকুও আঁচ করতে পেরেছে।

বলল, তিন দিন ছেড়ে দরকার পড়লে সপ্তাহে চার পাঁচ ছ'দিনও আমি আসব —দীপকের ভার আমার। কিন্তু তার বদলে আপনি আমার কিছু করবেন।

বুঝেছে তক্ষুণি। তবু না বোঝার ভান করে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি চান বাবুজী?

—আমি আপনার থেকে বয়েসে অনেক ছোট, আমাকে বাবুজী বলবেন না, আপনিও বলবেন না।...আমি ম্যাট্রিক থেকে এম.এ. পর্যন্ত বরাবর ফার্স্ট হয়েছি। ইচ্ছে করলেই ভালো চাকরি করতে পারি কিন্তু গোলামি করার ইচ্ছে নেই। আপনি আমাকে বড় হবার অন্য রাস্তা দেখাবেন।

মুখের দিকে চেয়ে মধু আগরওয়াল মিটি-মিটি হাসতে লাগল। তারপর বলল, ঠিক আছে, আপনিও আমাদের দেখুন, আমরাও আপনাকে দেখি।

ছেলে আছে মাঝখানে। দেখাদেখিটা সহজেই হয়ে গেছে। সপ্তাহে তিনদিন তো বটেই, কোনো কোনো সপ্তাহে চারদিনও আসতে লাগল। আর ছেলের দৌলতেই এ-বাড়িতে তার প্রচুর খাতির। এলেই তার জন্য এক থালা খাবার আসে। পড়িয়ে ফেরার সময় রাত হয় বলে এ-বাড়ির গাড়ি প্রায়ই তাকে মেসে পৌঁছে দেয়। পড়ানোর ব্যাপারে যত্নের এতটুকু ত্রুটি রাখেনি জিতু। কিছুদিন না যেতে ঠিক বুঝে নিয়েছে এখানেই তার ভবিষ্যৎ। আর ছেলেটাও বোধহয় তার মাস্টারের এত প্রতিভা কল্পনা করেনি। খাতির দেখেই বুঝতে পারে আদরের ছেলে, বাবা আর কাকাদের কাছে মাস্টারজীর দারুণ প্রশংসা করে। আগরওয়ালরা তিন ভাই থাকে এ-বাড়িতে। ভিতরে পার্টিশন। এক বাড়িতে যার যার আলাদা সংসার, কিন্তু মিলে-মিশেই থাকে। মেজ ভাইয়ের বড় ভাইয়ের থেকে বেশি মেদবহুল চেহারা। কিন্তু ছোট ভাইটার তুলনা নেই। তাকে দেখলে সময় সময় হাসিই পেয়ে যায় জিতুর। অতবড় থলথলে বপু নিয়ে চলতে ফিরতে হাঁসফাঁস অবস্থা ভদ্রলোকের।

ছাত্রর কাছ থেকে তৃতীয় মাসের মাইনেটা হাত পেতে নিল না জিতু। তাকে বলল, তোমার বাবার সঙ্গে কিছু কথা ছিল।

পড়ানো শেষ হতে সেই রাতেই ছেলে তাকে বাপের কাছে নিয়ে এলো। জিতু বলল, আমার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো কাজ নেই—শেয়ার মার্কেটের ব্যাপারটা আমি একটু দেখতে আর শিখতে চাই।...আর মাসে একশ পঁচিশ টাকার বেশি আমার দরকার হয় না, বাকি টাকাটা আপনি যদি আপনার ইচ্ছে মতো খাটিয়ে দেন—

মধু আগরওয়াল তাকে আবার ভাল করে দেখেছে আর মিটিমিটি হেসেছে। শেষে ছেলেকে বলেছে, মাস্টারের মাইনে থেকে একশ পঁচিশ টাকা করে কেটে রাখতে। জিতুকে বলেছে, ঠিক আছে, কাল বেলা একটায় শেয়ার মার্কেটে এসো, তোমার জন্য কাল আমি গদীতে থাকব।

সেই শুরু। ছ'মাস না যেতে মোটামুটি অনেক কিছুই শিখে আর বুঝে নিয়েছে সে। আর বছর ঘুরতে হাসি মুখে আগরওয়াল থোকে তেরো হাজার টাকা তার হাতে

তুলে দিয়েছে। আর বলেছে, এটা তোমার টাকা, এ নিয়ে সঙ্গে আর কি ব্যবসা করতে পারো দেখো। আমাদের ইনজিনিয়ারিং ফার্ম থেকে অনেকে অনেক রকমের সাব অর্ডার নিয়ে যায়। কয়েক ঘণ্টার জন্য তুমি রোজ সেখানে যাও, দেখে শুনে বুঝে নাও তুমি, নিজে কি করতে পারো। আমি ভাইদের তোমার কথা বলে দিয়েছি।

এরপর জিতু সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ব্যস্ত। ইনজিনিয়ারিং ফার্মে যায়, শেয়ার মার্কেটে যায়,. সন্ধ্যার পর দীপককে পড়াতে যায়। তার পরীক্ষা আসছে, এখন প্রতি সপ্তাহে চারদিন করেই আসছে সে।

কিন্তু মনের তলায় একটা অস্বস্তির ছায়া পড়ছে তার। বিশাল দোতলার পিছনের অংশ দীপকদের। সামনের অংশ সব থেকে ছোট ভাইয়ের। সামনের বারান্দা ধরে পিছনের দিকে চলে যেতে হয়। ...ইদানীং প্রায়ই ওই ছোট ভাইয়ের বউকে সেজেগুজে চুপচাপ ওই বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। বেশ ছিপছিপে চেহারা। ফর্সা গোল মুখ। বয়েস দু-তিন বছরের বড়ই হবে ওর থেকে। ওকে দেখলেই চোখ বাঁকিয়ে তাকায়। কখনো কখনো ভ্রূকুটি করে। ও যেন কিছু একটা অপরাধ করে ফেলেছে। কিংবা এ-ভাবে রোজ আসাটা তার যেন পছন্দ নয়। যাবার সময় রোজই দীপক সঙ্গে থাকে বলে তাকে আর দেখা যায় না।

এই দাঁড়ানো আর তাকানোটাই কেমন লাগতে শুরু করেছে জিতুর। ভ্রূকুটির ফাঁকে চোখে যেন ইদানীং হাসির ঝলকও দেখছে সে। আর নিজের মধ্যেও তখন কি রকম একটা বিশ্রী উপদ্রব শুরু হয়ে যায় তার।...হ্যাঁ, হঠাৎ-হঠাৎ আর-এক তৃষ্ণা যেন পেয়ে বসে থাকে। তখন মাথার ঠিক থাকে না। য়ুনিভার্সিটিতে পড়তেও এ-রকম হয়েছে। সেখানে মনে ধরার মতো কোনো মেয়ে দেখলে তাকে নিয়ে কল্পনায় সর্বনাশের পাতালে পৌঁছুতে চাইত সে। হাতে থোকে টাকা আসার পর ওই উপদ্রবে ভিতরে অস্থির কাণ্ড এক-একসময়।...এক সন্ধ্যায় পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে মেয়েদের আনাগোনা দেখছিল। মাথায় তৃষ্ণার আগুন জ্বলছিল। হঠাৎ একটা লোক এসে পাশে দাঁড়াল তার। তারপর হাসিহাসি মুখে চোখের ইশারায় ডাকল তাকে। কে জানে কেন, জিতু বিমূঢ়ের মতোই অনুসরণ করল তাকে।

সেই থেকে বাসনার এই জগৎটা অল্প-স্বল্প চিনেছে। ভালো কারো সন্ধান চাইলে অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে যায় বটে। তবু জিতু এরপর থেকে অনেকটা নিশ্চিন্ত। দিনের পর দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করেও তার ক্লান্তি নেই, উদ্যম আর উদ্দীপনায় ঘাটতি নেই। কিন্তু হঠাৎ কোনো সন্ধ্যায় সেই তৃষ্ণা মাথার দিকে ধাওয়া করল তো আর অব্যাহতি নেই। তখন মুক্তির পথ না পেলে পরদিন বা তার পরদিনও আর কাজে মন বসবে না। আগে এর জন্যে অনেক ভুগেছে। এখন আর সে ভাবনা নেই বলেই ভিতরের উপদ্রবও অনেক কম।

কিন্তু ওই এক রমণী ভাবিয়ে তুলেছে তাকে। তার ছেলেপুলে নেই। অমন যার স্বামী, না থাকাই স্বাভাবিক। যে পরিবারের সঙ্গে নিজের সমস্ত ভবিষ্যতের যোগ, তাদের কারো অন্তঃপুরে হানা দেবার মতো নির্বোধ লোভ জিতুর নয়। অথচ মহিলা দিনকে দিন যেন যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠছে তার কাছে।

আরো মাস চারেক পরের কথা। মধু আগরওয়ালের পরামর্শ মতো কনসট্রাকশন

ফার্মের কিছু কিছু মাল সরবরাহ করে মন্দ টাকা পাচ্ছে না। দেশ বিভাগের ফলে রিফিউজি আসার হিড়িক এখনো বাড়ছে বই কমছে না। ফলে কলকাতা বাড়ছে, বড় হচ্ছে। নানা জায়গায় রাস্তা হচ্ছে, হাটমেন্ট হচ্ছে, ছোটখাটো সরকারি কনস্ট্রাকশনও চলছে। ছোটখাটো দুই একটা হাটমেন্টের টেন্ডার নিজের নামেই দিয়েছে সে। না, নিজের নামে নয়, জয়ন্ত বোসের নামে। নিজের সমস্ত অতীতটার সঙ্গেই যেন বিরোধ তার। শেয়ার মার্কেট আর আগরওয়ালার ফার্মের সঙ্গে যোগাযোগের পর থেকেই সবার আগে নিজের নামের ওপর ছুরি চালিয়েছে সে। জিতেন বোসের জায়গায় জয়ন্ত বোস হয়েছে। আগরওয়ালাকে বলেছে এও তারই আর একটা নাম। তার সাহায্যে একটা দুটো ছোটখাটো অর্ডার সে পাবে আশা করছে। আর অর্ডার পেলে সাহায্য আরো বেশি দরকার হবে। পরের এই চার-পাঁচ মাসে টিউশনের টাকা সে আর নেয়ই নি। সবটাই শেয়ার মার্কেটে লাগানোর জন্য বড় আগরওয়ালার হাতে তুলে দিচ্ছে। এ-দিকে নিজের বিবেচনায় শেয়ারের তেজী-মন্দী বাজারে গোপনে কিছু টাকা খাটিয়েছিল। গোপনে কারণ ওটা ফাটকার বাজার। কিন্তু তারও সুফল পেতে দেরি হয়নি। হিসেবে বা বিবেচনায় এতটুকু ভুল হয়নি। বেশি লোভ না করে কিছুটা চড়ার মুখেই শেয়ার ছেড়ে দিয়েছে। তাতেও হাজার কয়েক টাকা থোকে হাতে এসেছে।

আগের চারগুণ উদ্যম আর উদ্দীপনা এখন।

...সেদিন সন্ধার পর দুর্যোগ মাথায় করে দীপককে পড়াতে এসেছিল। কিন্তু সেদিন আর ওই মহিলাকে বারান্দায় দেখা গেল না। নিশ্চিন্ত মনে অনেকদিন বাদে বারান্দা পার হল সে। কিন্তু দীপকের পড়ার ঘরে ঢুকে একটি পরিচারিকার মুখে শোনে ছাত্র বা বাড়ির কেউই নেই। কোনো আত্মীয়ার বাড়াবাড়ি অসুখ শুনে সকলে মিলে তাকে দেখতে গেছে। আজ পড়া হবে না।

বাইরে বৃষ্টি। সঙ্গে রেনকোট আছে। জিতু উঠেই পড়ল। কিন্তু বারান্দায় পা দিয়ে অবাক একটু। সমস্ত বারান্দাটাই অন্ধকার। একটাও আলো জ্বলছে না।

অন্ধকারেই এগিয়ে আসছিল। তারপর বিষম চমক।

খপ করে কে তার একটা হাত ধরল। হাতে কাচের চুড়ি ঠেকল। ভাল করে বোঝার আগেই হিড়হিড় করে টেনে তাকে ঘরে এনে ঢোকাল। সেই ঘরও অন্ধকার। হাত ছেড়ে দিল। দরজা বন্ধ করার মৃদু শব্দ কানে এলো।

জিতুর সর্বাঙ্গ অবশ প্রথম। তারপরেই রমণীর নিবিড় স্পর্শের বিদ্যুৎচমক। পায়ের নিচে পুরু গালচে। রমণীর আকর্ষণে পাতালের আমন্ত্রণ।

বিশ্বজগতের সময়ের যন্ত্রটি বুঝি অচল হয়ে রইল খানিকক্ষণ।

উঠেছে। নিজেই দরজা খুলে চোরের মতো নেমে এসেছে জিতু। নিচে আলো। আলোগুলো যেন বিপদের এক একটা লাল সংকেত। কিন্তু বিস্মৃতির জগৎ থেকে তখনো যেন পুরোপুরি ফিরে আসতে পারেনি সে।

পরদিন থেকে বারান্দায় আবার আলো ছিল। রেলিং-এ ওই মহিলাও দাঁড়িয়ে ছিল। আড়চোখে দেখেছে। যেন চেনেও না ভালো করে। কিন্তু পরের পনের-ষোল দিনের মধ্যে আরো দু'বার এই অতি লোভনীয় বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হল তাকে। আগরওয়ালাদের এই ছোট বউটার নাম লীলা। প্রথমবার সে নিজের চাকর পাঠিয়ে

দীপককে খবর দিয়েছে, মাস্টারবাবু সেদিন আসছেন না। ভুলে ফোনটা ছোটবাবুর ঘরে এসে গেছে, তাকে জানাতে বলা হয়েছে।

জিতু যথারীতি এসেছে। লীলা তখন ওই সামনের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। চোখের ইশারায় কাছে আসতে হাত ধরে ঘরে টেনে নিয়েছে। হিন্দীতে বলেছে, তোমার ছাত্রকে বাইরে পাঠানো হয়েছে, সে জানে তুমি আজ আসছ না। চোখ বাঁকিয়ে যেভাবে ওর দিকে তাকিয়েছে বউটা, যেন ওই-ই আসামী। বাসনার তরল আগুনে সেদিনও স্থান-কাল ভুলেছে জিতু। বেরিয়ে আসার আগে লীলা পাঁচ-ছ'দিন পরের একটা তারিখ বলে তাকে হুকুম করেছে, ওইদিন তুমি দীপককে টেলিফোন করে জানাবে পড়াতে আসছ না, তার পরের ব্যবস্থা আমি করে রাখব।

তখন মাথা ঠাণ্ডা জিতুর। ইতস্তত করে বলল, কিন্তু এটা ঠিক হচ্ছে না।

সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝালো চোখ ঝাঁঝালো মুখ বউটার।—আমার খবাব হলে তোমার গর্দান থাকবে?

...ক'টা দিন নিজের সঙ্গে যুঝেছিল জিতু। ছাত্রকে ফোন করবে না-ই ঠিক করেছিল। কিন্তু সেই দিনটা আসতে বাসনার রক্ত আবার মাথায় উঠেছে। ফোন করেছে। তারপর সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় সময় গুনেছে।

তবু বিপদের সংকেতটাই বড় হয়ে উঠল এরপর। মন বলল, এসব কখনো দীর্ঘদিন চাপা থাকে না। এদিকে ওই বড় আগরওয়ালের ওপর তার সমস্ত ভবিষ্যৎ। এবারে নিজের বিবেচনার পথ ধরল সে। মধু আগরওয়ালের কাছ থেকে এ-ক'মাসে যা টাকা জমেছে চেয়ে নিল। সে আলাদা বাসা করবে। তাছাড়া নিজে যে কাজে নেমেছে তার জন্যেও টাকা দরকার। মধু আগরওয়ালের সে তখন অতি বিশ্বস্ত প্রিয়জন। তার প্রাপ্য যোল হাজার টাকা হাতে দিয়ে বলল, টাকার জন্য ভাবনা নেই, আরো দরকার হলে বোলো!

ছাত্রের কাছ থেকে দশদিনের ছুটি নেওয়া হয়েছে। আর তাকে বলে দিয়েছে, এরপর তার বাড়ি এসে পড়তে হবে তাকে। সকাল-সন্ধ্যা খাটুনির পর বাড়ি গিয়ে পড়ানোর ধকল শরীরে পোষাচ্ছে না। নিজের বাড়িতে বরং অনেক বেশি যত্ন নিয়ে আর সময় নিয়ে পড়াতে পারবে।

ছাত্রের রাজী না হয়ে উপায় নেই। এ-রকম প্রতিভার মাস্টার সে আর দেখেনি।

ঘর ভাড়া পাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার নয় তখন পর্যন্ত। প্রথমে দু-ঘরের একটা ফ্ল্যাট নিয়েছিল। সেই সময় মনোহর মাহাতো এসেছিল তার কাছে। আগরওয়ালের ফার্মের একজন বুড়ো কর্মচারীকে লোকের কথা বলে রেখেছিল। সে পাঠিয়েছে। জিতুর পছন্দ হয়েছে। বছর সতেরর চটপটে ছেলে। কাজে প্রচুর উৎসাহ। সাহেবের কখন কি দরকার বুঝে নিতে সাত দিনের বেশি সময় লাগেনি। সাহেবকে গোড়া থেকেই সে জয়ন্ত বোস নামেই জানে। কারণ আগরওয়ালের ফার্মে বা নিজের কনট্রাকটারি ব্যবসায় জিতেন বোস বলে কেউ নেই।

আট-ন'মাসের মধ্যে আবার বাড়ি বদল করেছে। এবারে আর ফ্ল্যাট নয়। তার মতো লোকের সকলের চোখের ওপর থাকা পোষায় না। একটু দূরে দক্ষিণের অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি জায়গায় এল শেপ-এর তিন-ঘর আর একটা হল্-ঘরের একতলা বাড়িই পেয়ে গেছে। ভাড়া তখন মাত্র দু'শ টাকা।

দু'শ টাকা জিতেন বোসের কাছে কিছুই নয়। তার স্থির বিশ্বাস সে টাকার বরাত নিয়ে এসেছে, আর টাকার খেলা দেখাতেও এসেছে। মধু আগরওয়াল এখনো তাকে সব ব্যাপারে সাহায্য করছে। তার বিশ্বাস আর স্নেহে ঘাটতি পড়েনি। দ্বিতীয় কারণ, বেশ ভালো অনার্স পেয়ে বি.এ. পাস করে দীপক আগরওয়াল এখন এম.এ. পড়ছে। এম.এ. পরীক্ষার আগে এই মাস্টারকে সে ছাড়তে রাজী নয়। মধু আগরওয়াল তাকে বলেছিল, ছেলের জন্য এবার থেকে তোমার মাসে চারশ টাকা করে আমার কাছে জমছে আর শেয়ার মার্কেটে খাটছে। এর ওপর এম.এ.-তে ছেলেকে যদি তুমি ফার্স্ট ক্লাস পাইয়ে দিতে পারো, আমি তোমাকে রাজা বানিয়ে দেব।

সেটা খুব অসম্ভব ভাবছে না জিতু। মুখে বলেছে, চেষ্টা করব, কিন্তু ছেলের জন্য আপনার পক্ষপাতিত্ব কেন, আমি আপনার ছেলে নই?

মধু আগরওয়াল খুশিতে গলে গেছে।

বাড়ি বদলাতে হয়েছে জিতু নিজের স্বভাব জানে বলে। তার আচরণে ফ্ল্যাট বাড়িতে অনেকের কৌতূহল। তাই অসুবিধে। ওই ফ্ল্যাটে দু-তিনটে মেয়ের মুখ দেখেছে অনেকেই। রাতে জিতুর সঙ্গে ট্যাক্সি থেকে নেমেছে। ঘণ্টা-দু'ঘণ্টা বাদে আবার চলে যেতেও দেখেছে। মনোহরকে সে বলে রেখেছে, কেউ জিগ্যেস করলে বলে দিবি আমার আত্মীয়। যেটুকু বোঝার মনোহর বুঝে নিয়েছে। তবে এ-রকম আত্মীয় তার কাছে মাসে দু'মাসে একবার এসেছে। দিনের পর দিন কাজে ডুবে থাকার মধ্যেও হঠাৎ কখনো যখন শয়তানের মতো বাসনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—তখন। এ-ছাড়া ছাত্রের বদলে হঠাৎ এক-একদিন ট্যাক্সি করে লীলা আগরওয়াল এসে হাজির হয়েছে। তাই আলাদা বাসা না করে উপায় কি? ফ্ল্যাট বাড়ির অনেকেরই হাব-ভাব সুবিধে লাগছিল না।

তাছাড়া এ-ভাবে থাকবেই বা কেন। রিফিউজি বসবাসের অনেক কনট্রাক্ট সে নিজেই ধরছে এখন। সরকারি দপ্তরের অনেক হোমরাচোমরার সঙ্গে খাতিরও হয়েছে। মধু আগরওয়াল অনেক সাব-কনট্রাক্ট এখন তাকেই দিচ্ছে। ব্যাংকে লাখ টাকার ওপর জমে গেছে এরই মধ্যে। যে-টাকা খাটছে তা ছাড়াও। নিজের গাড়ি হয়েছে, কিন্তু নিজস্ব গ্যারেজ নেই। বারোয়ারি গ্যারেজে গাড়ি থাকে। তাছাড়া পদস্থ লোকজনেরও কিছু আনাগোনা আছে। সত্যিকারের অসুবিধেও অনেক।

আরো দু'বছর পরে। জিতুর বয়েস সাতাশ। মধু আগরওয়াল কথা রেখেছে। শেয়ার মার্কেট থেকে প্রাপ্য আরো সাতষট্টি হাজার টাকা দু'বছরে তার হাতে তুলে দিয়েছে। ব্যবসার অনেক রকমের ফাঁক-ফিকির বেশ যত্ন করে শিখিয়েছে তাকে। সাব-কনট্রাক্ট-এর পরিমাণ বাড়িয়েছে। এক-একটা প্রায় অস্তিত্বশূন্য কোম্পানি থেকে তাদের ইনজিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন ফার্মে অনেক কাঁচা মালও সে-ই সাপ্লাই দিচ্ছে। সেই অস্তিত্বশূন্য কোম্পানির মালিক জয়ন্ত বোস নয়, জিতেন বোস। কোম্পানির এসটাব্লিশমেন্ট আছে, অন্যান্য খরচও আছে খাতাপত্রে। ফলে ইনকামট্যাকসের সুরাহা। আর লাভের টাকাও জিতেন বোস আর জয়ন্ত বোস—এই দুই নামে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। এখন আরো সুবিধে, তার ছাত্র দীপক আগরওয়াল তাদের ফার্মের হোমরাচোমরা ডাইরেক্টর একজন। তাদের সাত পুরুষের মধ্যে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া এম.এ. আর একটিও নেই। এই মাস্টারটির কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই তারও।

পুরনো গাড়ি বেচে জিতু ঝকঝকে নতুন গাড়ি অনেক আগেই কিনেছে। মনোহর মাহাতো এখন সে-গাড়ির পাকা ড্রাইভার।

এই সময় জীবনে আবার এক বড় সন্ধিক্ষণ উপস্থিত।

এতদিনের মধ্যে সে খোঁজ নিক না নিক, চিঠির জবাব দিক না দিক, একটি মাত্র লোক তার খবর নিয়েছে, মাঝে মাঝে চিঠি লিখেছে। সে শ্রীহরি রায়। কলকাতায় এলে জিতুর কাছেই আসে, তার কাছেই থাকে। তবে আসে খুবই কম। এই ক'বছরে হয়তো বার দুই এসেছে। গত দু'বছরের মধ্যে একবারও আসেনি। নতুন বাড়ির ঠিকানা পেয়ে চিঠি লিখেছিল। বন্ধু যত বড় হচ্ছে তার তত আনন্দ।

সেই শ্রীহরি উপস্থিত একদিন। বিষণ্ণ মূর্তি। বাবা-মা দুজনকে নিয়েই বিপদে পড়েছে। বাবার চোখে ছানি। অপারেশনের সময় এগিয়ে এসেছে। মাকে নিয়ে আরো বড় বিপদ। সেখানকার ডাক্তার লিভার ক্যানসার সন্দেহ করছে। দুজনকেই কলকাতায় আনা দরকার, ভালো ডাক্তার দেখানো দরকার। কি করবে ভেবে না পেয়ে শ্রীহরির মাথা খারাপ হওয়ার দাখিল। এদিকে টাকা-পয়সারও জোর নেই তেমন। বোনটার বিয়ের জন্য সামান্য কিছু টাকা বাবা রেখেছিল, এখন তার থেকেই খরচ হয়ে যাচ্ছে। ও-দিকে বাইশ বছর বয়েস হল বোনের, ক'বার ক'জনে দেখে গেল। পছন্দ যদিই বা হল, গায়ের রঙের জন্য টাকার খাঁই বাড়ে। এত-সব ঝামেলায় পড়ে আর কোনো উপায় না দেখে বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছে।

খানিক চুপ করে থেকে জিতু হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, তোর ছেলেপুলে হয়েছে?

—নাঃ। এমনিতেই হিমসিম খাচ্ছি, তার ওপর ঝামেলা বাড়লে তো গেছি।

জিতু হেসে জিজ্ঞাসা করল, ঝামেলার ভয়েই হয়নি নাকি?

একটু লজ্জা পেয়ে শ্রীহরি বলেছে, তা না, হয়নি—হয়নি। তারপর একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, ওখানে আমার বিয়ে করাটা ঠিক হয়নি, বুঝলি...ও ঠিক আমাদের মতো ছা-পোষা ঘরের উপযুক্ত নয়। কেবল ঝগড়া—ভালো লাগে না।

বন্ধুকে জিতু অপছন্দ করে না। তাছাড়া এতদিনের অদর্শনে ওই মেয়েটার জন্য এখন আর বন্ধুকে একটুও ঈর্ষা করে না।

শ্রীহরি বলল, ও-সব যেতে দে, এখন কি করি আমি বল—

—কি আর করবি, আমাদের এখানে নিয়ে আসবি। বাবা-মায়ের চিকিৎসার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না।...কিন্তু তারা তো আবার বামুনের হাতে ছাড়া জলস্পর্শ করবে না।

হাতে চাঁদ পেল শ্রীহরি। —তার আর অসুবিধে কি, বাড়িতে তো বউ আর ধারাই রান্না করে—তারা করবে।

বাবা মা আসবে, মানে বউ আর বোনও আসবে ধরেই নিয়েছে।

—বউকে সুদ্ধু পাঠিয়ে দিবি, তোর অসুবিধে হবে না?

—আমার আবার কি অসুবিধে, দরকার হলে আমি নিজেও রাঁধতে জানি। তাছাড়া বউ না থাকলে ধারা একলা পেরে উঠবে না, মায়ের কাছে রোজ রাতে ওদের একজনকে পালা করে থাকতে হয়। আমি শনি-রোববার আসব, ছুটি-ছাটায় আসব, তখন যতটুকু পারি করব।

তন্দ্রাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে জিতুর মনে হয়েছে ব্যবস্থাটা খুব ভালো হল না। ওর বয়েস এখন চব্বিশ। আগের থেকে চপলতা হয়তো কমেছে, কিন্তু ঠাট-ঠমক বেড়েছে। ছেলেপুলে না হওয়ার দরুন দেহের চটক আরো তাজা লাগছে। গোঁড়া-ঘরের বউ, কিন্তু বাড়িতে পা দিয়েই হাসি চেপে ভুরু কুঁচকে যেভাবে তাকাল জিতুর দিকে, তার অর্থ, ঘুরে ফিরে এই দাঁড়াল শেষে? ধারা কাছে থাকায় ওই ভ্রূকুটির যোগ্য জবাব দেওয়া গেল না।

ধারাকেও লক্ষ্য করে দেখেছে জিতু। হাসি-হাসি মুখ। কিন্তু তেমনি চুপচাপ। নিটোল বাঁধন শরীরের। কালো হলেও কুৎসিত কারো বলার কথা নয়। ওর থেকে দেখতে ঢের খারাপ মেয়ের অনায়াসে বিয়ে হয়ে যায়, কিন্তু এর হচ্ছে না।

শ্রীহরির বাবা-মায়ের ঘটা করেই চিকিৎসা শুরু হয়ে গেল। খরচের ব্যাপারে কিছুমাত্র হাত-টান নেই জিতুর। সমস্ত দিনের জন্য একটা আয়া রেখে দিয়েছে। রাতের নার্সও রাখতে চেয়েছিল। বুড়োবুড়ি দুজনেরই তাতে আপত্তি। ধারা বলেছে, আমি আর বউদি এটুকু পারব। এদিকে কৃতজ্ঞতায় কেঁদে ফেলার দাখিল শ্রীহরির। তার ওপর ধারাকে শুনিয়েই জিতু তাকে বলেছে, তোর বাবা-মায়ের ভাবনা আমি ভাবছি, কলকাতায় এসে এসে তুই তোর বোনের জন্য ভালো ছেলের খোজ কর, খরচের জন্য ভাবতে হবে না।

প্রথম দিন থেকেই গঙ্গাজলে হেঁসেল নিকিয়ে দু'বেলার রান্না আর জলখাবার তন্দ্রা আর ধারাই করেছে। বলা বাহুল্য, জিতু আর মনোহরের খাওয়ার ব্যবস্থাও তাদের সঙ্গেই। প্রথমে তন্দ্রার হাতে জিতু এক হাজার টাকা গছিয়ে দিয়েছে। —খরচ যা লাগে এর থেকে করবে। ফুরোলে আমাকে বলবে।

তন্দ্রা নিতে রাজী হয়নি। জিতু তার হাত টেনে ধরে টাকা গুঁজে দিতে ধারাকে জিজ্ঞাসা করেছে, কি করব?

ধারা সামনে ছিল। সে বলল, না নিলে তো ওঁরই খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে হবে, নিজের সম্বলে তুমি আর কতটুকু করতে পারবে?

এ-রকম সোজা কথা পছন্দ জিতুর। ছদ্ম ঝাঁঝে তন্দ্রা ওকে বলেছে, বোকার মতো নিজেদের হাঁড়ির হাল এ-ভাবে ফাঁস করতে হয়?

দিন কয়েকের মধ্যেই এই লোকের ঐশ্বর্যের আঁচ পেয়েছে তন্দ্রা। তার চোখে একমাত্র কীর্তিমান পুরুষ যেন শুধু সে-ই। কিন্তু সেই পুরুষের লোভের দিকটা আগেও যেন চেনা-চেনা ছিল। এখন আরো বেশি চেনা মনে হয়েছে তার। আভাসে ইঙ্গিতে অনেক রকমের হাসি ঠাট্টা চলে। ফাঁক পেলে হাতে হাত ছোঁয়ায়, ধারা সামনে এসে গেলে সরল কৌতুকে হেসে উঠতে চেষ্টা করে। ফাঁক পেলে তার ঘরে এসে দাঁড়ায়। কটাক্ষ বাড়ছে, ভ্রূভঙ্গি বাড়ছে। ঝাঁঝালো চাপা গলায় একদিন বলেই ফেলল, এমন বিয়ে হওয়ার থেকে তার বিয়ে না-হওয়াই ভালো ছিল।

বাপ-মায়ের সেবা বা রান্না-বান্নার কাজ তন্দ্রার থেকে ধারা অনেক বেশি করে। তবে রাতে পালা করে এক-এক দিন এক-একজন তাদের কাছে থাকে। ফলে ধারা বা তন্দ্রার আলাদা ঘর নেই। একজন রোগীর ঘরে থাকলে অন্যজন পরের ঘরটায় শোয়। এল্-শেপের বাড়ি। তার এক মাথায় জিতুর ঘর আর তারপর হল-ঘর। অন্য দিকে প্রথম

ঘরটা রোগীদের, ও-মাথাটা এক-রাত ধারার আর এক-রাত তন্দ্রার। শনি-রবিবারে শ্রীহরি এলে ধারা বাবা মায়ের ঘরে থাকে। সেই অনুযায়ী পরে আবার ওদের ডিওটিরও অদল-বদল হয়।

...এল-শেপের দরুন জিতুর ঘরের জানলায় দাঁড়ালে দ্বিতীয় বাহুর শেষ ঘরটা অর্থাৎ ধারা বা তন্দ্রার ঘরের জানলা স্পষ্ট দেখা যায়। আর পর্দা সরানো থাকলে ভিতরেও চোখ চলে। ও-ঘর থেকেও তাই। দু'ঘরেরই জানলায় শৌখিন পর্দা। ওটা সরার কথাও নয়। কিন্তু জিতু লক্ষ্য করল, রাতে মাঝে মাঝে ওটা ছ'আঙুল-আট আঙুল সরে যায় ইদানীং। বিশেষ করে যে রাতে তন্দ্রা ও-ঘরে থাকে। নিজের ঘরের আলো নিভিয়ে একটা অদৃশ্য আকর্ষণে জিতু জানলার সামনে না এসে পারে না। তার নিজের জানলার পর্দা অর্ধেকের বেশি গোটানো তখন। তন্দ্রার প্রসাধন দেখে, মাথা আঁচড়ানো দেখে, শুতে যাবার আগে শিথিল বেশবাস দেখে। কিন্তু শুতে চট করে যায় না। জানলার সামনে এসে দাঁড়ায়। এই ঘরের দিকেই চেয়ে থাকে।

জিতুর মাথায় আগুন জ্বলে। এ-আগুন মাথায় একবার জ্বললে সুস্থভাবে কোনো কাজেই আর মন দিতে পারে না। তখন নিজের ওপরেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তন্দ্রার আমন্ত্রণ যেন দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এবার সে স্থিরই করে ফেলল, শ্রীহরি এলে তাকে বলবে বউকে নিয়ে যা। কারণ তন্দ্রা এখন আবার দু'লাইন চার লাইন করে চিঠিও লিখছে তাকে। খামে পুরে তার অনুপস্থিতিতে ঘরে রেখে যায়। একদিন লিখেছিল ম্যাটিনি শো-তে তাকে সিনেমায় নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সেই দিনই হঠাৎ ফাঁক পেয়ে শ্রীহরি এসে হাজির হতে ধারা আর তন্দ্রা দুজনকে নিয়েই সিনেমায় গেছল সে। মুখ দেখেই বোঝা গেছে তন্দ্রার সেটা মনঃপূত হয়নি। হিন্দু কোড ম্যারেজ বিল তখন পাস হবার মুখে। সব কাগজেই এই নিয়ে আলোচনা চলছে তখন। হঠাৎ খাম খুলে এক লাইনের চিরকুট পেল, বিল পাস হলে আমাদের পক্ষে কি আশাপ্রদ সেটা?

...তার মাথা যে ঘুরেছে তন্দ্রা সেটা ধরেই নিয়েছে। কিন্তু শ্রীহরি আসতে গোলমালে কিছুই বলা হল না। সেই রবিবারের সন্ধ্যায় ধারাকে কারা দেখতে আসবে। শ্রীহরি তার ওখান থেকেই এক সুপাত্রের সন্ধান পেয়ে চিঠি লেখালেখি করে সব স্থির করেছে। ছেলে কলকাতায় থাকে। তাই শ্রীহরিই সব থেকে বেশি ব্যস্ত।

যথাসময় পাত্রপক্ষ এলো। দেখে গেল। তন্দ্রা যেটুকু পারে জোর করেই ধারাকে সাজিয়ে দিল। মেয়ে খুব একটা সাজতে চায় না। জিতুর অন্তত মন্দ লাগছিল না দেখতে। আর সেই দিনই সে প্রথম জানল ধারার নাম যশোধরা। ছেলের পক্ষ নাম জিজ্ঞাসা করতে সে ওই নাম বলল। আর জিতুর কেন যেন বেশ মিষ্টি লাগল নামটা।

পাত্রপক্ষ চলে যেতে যে কারণেই হোক জিতুর মনে হল এ-বিয়ে হবে না। ভালো মেয়েটার জন্য একটু দুঃখই হল তার। স্বাস্থ্য চুল আর চোখ দেখলে অপছন্দ হবার কথা নয়। কিন্তু তা আর ক'জন দেখে।

সেই রাতেই শ্রীহরিও বাড়ি চলে গেল। সকালেই তার বিশেষ কি কাজ।

রাত্রি। শোবার আগে জিতু আলো নিভিয়ে জানলার পর্দা সরিয়ে দেখল ও-ঘরের পর্দা ছ'আঙুল সরানো। অর্থাৎ আজ ও-ঘরে তন্দ্রার থাকার পালা। কিন্তু না, ও-ঘরের আয়নার সামনে তন্দ্রা নয়, ধারা দাঁড়িয়ে। ওর যশোধরা নামটা মনে পড়তে আবারও

মিষ্টি লাগল। ধারা থাকলে ও-ঘরের জানলার পর্দা একটুও সরে না। আজ যারা দেখে গেল হয়তো তাদের কথাই ভাবছে। তাই চোখে পড়েনি বা খেয়াল হয়নি। জিতু নিজেই সরে আসছিল। কিন্তু আবার কিছু যেন লক্ষ্য করে দাঁড়িয়েই গেল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিবিড় মনোযোগে ধারা নিজেকেই দেখছে। কি দেখছে? জিতু একটু কৌতুকই বোধ করল। পাত্র-পক্ষের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখছে? নিজেকে বাপ-মা-ভাইয়ের বোঝা ভেবে ঠাণ্ডা মেয়েটা ভিতরে ভিতরে এ-রকম কষ্ট পাচ্ছে?

আয়নায় দেখতে পাচ্ছে না জিতু, মেয়েটাকেই দেখছে।...কাঁধের আঁচলটা খসে মাটিতে পড়ে যেতে ভাবল এবার সরে যাওয়া উচিত। কিন্তু পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে গেল। নিটোল বুকের ওপর দুটো হাত। ব্লাউজটা খুলে নিজের কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে ছুঁড়ে দিল। ফিরে দেখল না মাটিতে পড়ল কি কোথায় পড়ল ওটা। ওটুকু নড়াচড়ায় বুকের বন্ধনীর অন্তিম দশা যেন, আবার হাত ছোঁয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দু'মাথা দু'দিকে ছিটকে সরে গেল। তারপর অঙ্গচ্যুত হল সেটাও। দেহতরঙ্গ আকুলি-বিকুলি করে উঠল একটু।

তারপর স্রস্তবসন নগ্নবক্ষ স্থির নিশ্চল পাথরের মূর্তি একখানা। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি মুহূর্তও থেমে রইল যেন। সেই মূর্তিতে শান্ত প্রাণের সাড়া জাগল তারপর। শাড়ির আঁচল বুক-কাঁধ ঘুরে গলা বেষ্টন করল।

ধারা ফিরল। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে ঝুঁকে মাটি থেকে ব্লাউজটা তুলে নিয়ে আলনায় রাখল। আলো নিভিয়ে দিল।

জিতুর সমস্ত সংযমের বাঁধ একসঙ্গে ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়তে চাইছে। শিরায় শিরায় আগুন জ্বলছে। দস্যুর মতো ওই দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকতে পারছে না। বা ওই রোগীর ঘর থেকে আর একজনকে হিড়হিড় করে টেনে নিজের এই ঘরে নিয়ে আসতে পারছে না। রাত সাড়ে এগারোটা এখন। ছুটে বাইরে বেরিয়ে যাবে তারও উপায় নেই।

পরদিন।

কাজে বেরুবার জন্য তৈরি হয়ে জিতু টেবিলে খেতে বসেছে। স্নায়ুগুলো টান-টান এখনো। রাতে না ঘুমনোর ফলে চোখ লাল।

রান্না যে-ই করুক, তার খাওয়ার সময় তন্দ্রাই সামনে থাকে। খাবার ব্যবস্থা হল ঘরে। আজও সে-ই সামনে। জিতুর দু' চোখ আজ সরাসরি অবাধ্য হয়ে উঠছে। তন্দ্রার চোখে সেটা ধরা পড়ছে না এমন নয়। পড়ছে বলেই আত্মতুষ্টি তার। চোখে নিবিড় কটাক্ষ, ঠোঁটের ফাঁকে প্রশ্রয়।

হালকা ভ্রূকুটি করে সামনে এসে দাঁড়াল।—কিচ্ছু খাচ্ছ না, খিদেটিদে নেই?

মুখ তুলে ঘোলাটে চোখ মেলে তাকাল জিতু। নিজেকে আর খোলসে ঢেকে রাখার ইচ্ছে নেই। অস্ফুট স্বরে জবাব দিল, বেজায় খিদে—

না, জিতুর ভুল হয়নি। শোনামাত্র তন্দ্রার চোখে মুখে প্রত্যাশার আলো ঠিকরোতে দেখল। তবু রমণী চট করে তার ছলাকলা ছাড়ে না। না বোঝার ভান করল।

জিতু তেমনি চেয়ে আছে। কোন খিদে চোখ দিয়েই বুঝিয়ে দিল। তন্দ্রা এ-দিক

ও-দিক তাকাল একবার। তারপর ভাতের বউল থেকে বড় চামচেটা তুলে নিয়ে ছদ্মকোপে মার দেখাল একবার। ওটা রেখে দ্রুত সরে গেল।

খানিক বাদেই ফিরে এলো আবার। জিতুর খাওয়া সারা। মুখ ধোয়াও। চকিতে কাছে এসে চাপা গলায় তন্দ্রা বলল, এখানে কি ছাই দুটো কথা বলার জো আছে—ফিরে এসে চিঠি পাবে।

দ্রুত অন্য ঘরে চলে গেল আবার।

চিঠির জন্য আর ব্যস্ত নয় জিতু। রাত আসুক। এই রাত আর সে ব্যর্থ হতে দেবে না। শয়তানকে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ দিলে বিবেকের প্রশ্রয় নেই তার কাছে। গত রাতে ' ব্যাপারটা অঘটন, ধারা সুযোগ দেয়নি তাকে। তাই আজও তার দিকে চোখ নেই।

রাতে ফিরতে রোজই সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়। আজ ইচ্ছে করেই আরো একটু দেরি করল। সঠিক মুহূর্তটি ছাড়া শয়তানের বিবরে বাস রীতি।

গাড়ি থেকে নেমে মনোহরকে গাড়ি গ্যারাজ করতে বলে দিল। অর্থাৎ তার ছুটি। সোজা নিজের ঘরে চলে এলো। প্রথমেই শয্যার দিকে চোখ গেল। খাটে পরিপাটি করে বিছানা পাতা। আগে মনোহর বিছানা করত। এখন তন্দ্রা বা ধারা করে। বেশির ভাগ তন্দ্রাই করে। জোড়া বালিশের একটা সরাতেই মুখ-বন্ধ খাম চোখে পড়ল। আগের দু-দুটো খাম-বন্ধ চিরকুটও এ জায়গায়ই পেয়েছিল। দৈবাৎ কারো চোখে পড়লেও বন্ধ খাম কারো খোলার সাহস হবে না। আর চোখে পড়বেই বা কার।

"১২টায়"

ছোট্ট কাগজে এর বেশি আর কিছুই লেখা নেই। এর বেশি আর দরকারও নেই। বুদ্ধিমতীর মতো তন্দ্রা এক কথায় সব ক্ষুধার ফয়সলা করে দিয়েছে। কাগজের টুকরোটা একেবারে কুচিকুচি করে পিছনের জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল।

খাবার ডাক পড়ে ন'টায়। রাতে সে তন্দ্রা আর ধারা একসঙ্গেই খেতে বসে। এ-সময় কোনোরকম ইশারার সুযোগ নেই। তবু তন্দ্রার হাসি মুখ আর হাসিমাখা চাউনির জবাবে এক ফাঁকে সামান্য মাথা নেড়ে সে-ও বুঝিয়ে দিয়েছে চিঠি পেয়েছে।

চুপচাপই খাওয়া সেরেছে। নিরীহ মুখে তন্দ্রা একবার জিজ্ঞেস করল, খেতে খেতে ভাবছ কি?

জিতু বলল, একটা বড় ব্যাপারে হাত দিয়েছি। সেটাই মাথায় ঘুরছে।

তন্দ্রা ঠাট্টা করল, মাথা ঘুরছে না তো?

হেসে উঠল। হাসি হাসি মুখে ধারাও তাকাল তার দিকে। কিন্তু জিতু ওর দিকে মুখ ফেরাল না। এমনিতেই গতরাতের চিত্রটা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। সে-ও হঠাৎ কম লোভনীয় মনে হয়নি। কিন্তু মেয়েটা সোজা, সরল, ভালো। ওর দিক থেকে কোনো আমন্ত্রণ নেই। তাই তাকাবে না।

মুখ না তুলে খেতে খেতেই একটু হাসল শুধু।

নিজের ঘরে আসার পর হঠাৎই মনে হল, বারোটায় তন্দ্রা আসবে তার ঘরে, না তাকে যেতে হবে?...সময় বুঝে তন্দ্রার আসাই সুবিধে। আর সবদিক থেকে নিরাপদও। তবু জানলে ভালো হত।

ওই কোণের ঘর ছাড়া রাত দশটার মধ্যে বাড়ির সব আলো নিভে যায়। কোণের ঘরে কোনোদিন সবুজ আলো জ্বলে তারপরেও খানিকক্ষণ, কোনোদিন সাদা আলো জ্বলে, কোনোদিন আবার জ্বলে না।

জিতু একের পর এক সিগারেট খেয়ে চলেছে। অপেক্ষা করছে।

সাড়ে দশটায় উঠে নিজের ঘরের আলো নিভিয়ে জানলার পর্দা সরালো। কিন্তু আজ ও-ঘরের পর্দাও দেখা গেল না। জানলাই বন্ধ। কোনো ফাঁক দিয়ে একটু আলোর রেখাও চোখে পড়ছে না।

আবার অধীর প্রতীক্ষা। কানের কাছটা গরম হয়ে আছে সেই থেকে। ভিতরটা উন্মুখ। প্রায় হিংস্র।

বারোটা বাজল এক সময়। বুকের তলায় একটা মুখ-ঢাকা উল্লাস ধক-ধক করে উঠল। দরজা দুটো খুলে রেখেছে। মুহূর্ত গুনছে।

কিন্তু আরো বিশটা মিনিট কেটে যেতে বুঝল, ভুল হয়েছে। তাকেই যেতে হবে। সেই কারণেই ওই কোণের ঘরের জানলা-টানলাগুলো সব বন্ধ।

খালি পায়ে চুপচাপ বেরিয়ে এলো। হল পেরুলো। ভিতরে সরু বারান্দা ধরে নিঃশব্দে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। একটু ঠেলতে দরজা খুলে গেল। শব্দ না করেই দরজা দুটো বন্ধ করল আবার। সমস্ত ঘর ঘুটঘুটে অন্ধকার। নিজের হাত-পাও দেখা যায় না। দু'দিকের জানলাই বন্ধ। মাথার ওপর পুরোদমে পাখা ঘোরার শব্দ।

পায়ে পায়ে শয্যার দিকে এগিয়ে গেল। কোনো কিছুতে হোঁচট খাওয়ার ভয়। শয্যা...। সন্তর্পণে বসল। হাত বাড়িয়ে রমণী দেহ স্পর্শ করল। সাড়া নেই। ঝুঁকে দেখতে চেষ্টা করল একবার। দেখা গেল না। একখানা হাত কপালের ওপর দিয়ে মাথার পিছনে চলে গেছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের ভারী শব্দ কানে এলো। আশ্চর্য, শুয়ে-শুয়ে শেষে ঘুমিয়েই পড়েছে!

ওই সুপ্ত দেহ আচমকা ছোঁ মেরে গ্রাসের আওতায় নিয়ে আসার লোভ পেয়ে বসল। হাতে নগ্ন বুকের স্পর্শ। হঠাৎ ভয় পেয়ে ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে ওঠার সম্ভাবনায় একটা হাত ওই শায়িত মুখের ওপর রেখে দস্যুর মতোই অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। হ্যাঁ, বিষম চমকেই উঠেছে। গলা দিয়ে একটা গোঁ-গোঁ শব্দ তার মুখ-চাপা হাতে প্রতিহত হয়েছে। শেষে হাত সরিয়ে ফিস ফিস করে শুধু বলেছে, আমি—!

তারপরেই নিজের মুখ দিয়ে ওই মুখ চাপা দিয়েছে। মত্ত উল্লাসে রমণীর নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিতে চেয়েছে। দীর্ঘ সময়ের একটা জমাট বাঁধা যন্ত্রণা যেন সমস্ত অস্তিত্ব ঠেলে মুক্তির পথে ধাওয়া করেছে। সেই অধীরতায় রমণীর কপট বাধা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। এই দেহ-দেউলের সে আজ সহিষ্ণু শিল্পী নয় কোনো, অসহিষ্ণু লুটের দস্যু। তন্দ্রার অনেক দিনের চাওয়া একদিনে মিটিয়ে দেবার তাড়না। তার নগ্ন দেহ এমন নিটোল পুষ্ট ভাবেনি যেন। তাই আরো দীর্ণ-বিদীর্ণ করার তাড়না।...তারপর এই অন্ধকারের থেকেও গাঢ় তিমির বিস্মৃতির সন্ধান।

বিস্মৃতির অতল থেকেই খুব ধীরে জেগে উঠল একসময়। নিজের বুকে আর এক উষ্ণ নগ্ন বক্ষের স্পন্দন বাজছে। সে-ই ঠেলে সরাতে চেষ্টা করছে তাকে।

সরে এলো। পাশে বসল। ঝুঁকে খুব ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, ভয় পেয়েছিলে?

চোখে দেখা যাচ্ছে না। জবাবে আস্তে আস্তে উঠে বসল টের পেল। শাড়ির আঁচলটা টেনে ছাড়িয়ে বুকে জড়ালো। তারপর ওদিকে ঝুঁকল একটু।

পরক্ষণে সবুজ আলোর বেড সুইচটা জ্বলে উঠল।

আর সেই মুহূর্তে নির্মেঘ আকাশ থেকে একটা শব্দশূন্য বাজ যেন ঘরের ছাদ ফুঁড়ে জিতুর মাথার উপর ভাঙল।

তার সামনে শয্যায় বসে ধারা! যশোধরা!

সবুজ আলো জ্বেলে ঘুরে বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়েছে। তার দিকে চেয়েই রইল।

অব্যক্ত বিস্ময়ে অস্ফুট একটা আর্ত স্বর বেরিয়ে এলো জিতুর গলা দিয়ে।—তুমি! তুমি তুমি তুমি...

ধারার দু'চোখ তেমনি অপলক। তেমনি বিস্ফারিত।

সেই মুখের দিকে চেয়ে জিতু খাট থেকে নেমে এলো। —আমি বুঝতে পারিনি, আমি কখনো ভাবিনি তুমি—

এ-ঘরে কথা বলা নিরাপদ নয় মনে হতেই থেমে গেল। বিড় বিড় করে বলল, সম্ভব হলে আমার ঘরে একবার এসো—

নিজের ঘরে চলে এলো। এখনো বিবেকের দংশন কিছু বড় নয়। এ-রকম বিমূঢ় হতচকিত অবস্থায় কখনো পড়েনি। এরপর কি হবে সেটাই চিন্তা। মেয়েটা ও-রকম ঠাণ্ডা আর সাদাসিধে বলেই আরো ভাবনা। লোভে একেবারে অন্ধ না হলে এ-রকম ভুল হবার কথা নয়। গায়ে হাত দিয়েই বোঝা উচিত ছিল। তাছাড়া কোনো মেয়ে কোনো পুরুষকে ঘরে ডেকে এ-ভাবে ঘুমিয়ে পড়ে না। ওই মেয়ের আত্মরক্ষার একটু নির্বাক চেষ্টাও মনে পড়ছে এখন। সেটুকু তন্দ্রার মেয়েলি শয্যারঙ্গ ভেবেছিল।

অনেকক্ষণ পায়চারি করল। অপেক্ষা করল। কেউ এলো না।

শেষ রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। উঠতে বেলা। ঘড়িতে সাড়ে আটটা প্রায়। প্রথমেই রাতের অঘটন মনে পড়ল। হাত মুখ ধুয়ে আসার পরেও কেউ চা নিয়ে আসছে না। আগে তন্দ্রাকে দরকার তার। সবই এখনো হেঁয়ালির মতো লাগছে।

আরো খানিক বাদে চায়ের ট্রে হাতে মনোহর ঘরে ঢুকল। এটাও ব্যতিক্রম এখন।

—চা কে পাঠালে?

—দিদিমণি।

—বউদি কোথায়?

তখন বউদি বলতে তন্দ্রা। মনোহর বলল, তাঁকে তো একটু আগে স্টেশনে ট্রেন ধরিয়ে দিয়ে এলাম।

পট থেকে পেয়ালায় জিতুর আর চা ঢালা হল না।—ট্রেন ধরিয়ে দিয়ে এলি!

—হ্যাঁ সাহেব, দিদিমণি পৌঁছে দিতে বললেন।

জিতু চুপ খানিক। —দিদিমণি কি করছে?

—চা বানিয়ে দিয়ে খাবার টেবিলে বসে আছেন।

—আচ্ছা তাকে একবার ডেকে দে।

পাঁচ-সাত মিনিট বাদে ধারা এলো। মুখের দিকে তাকিয়েই বোঝা গেল সমস্ত রাত ঘুমোয়নি। থমথমে অথচ বিষণ্ণ মূর্তি।

—তোমার বউদি হঠাৎ চলে গেল কেন, তুমি তাকে বলেছ কিছু?

জবাব নেই। চেয়ে আছে।

এবারে একটু অসহিষ্ণুই হয়ে উঠল জিতু।—বলেছ? না কান্নাকাটি করে তাকে বুঝিয়েছ?

এবারও জবাব দিল না। সেও তাকে নতুন করে দেখে নিচ্ছে যেন।

—তুমি এ-ভাবে চুপ করে থাকলে তো আর কোনো কথা হয় না। ...কাল রাতে তোমার মায়ের কাছে কার থাকার কথা ছিল?

—আমার।

—ছিলে না কেন?

আবার একটু চুপ করে থেকে খুব ঠাণ্ডা জবাব দিল, আমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল, বউদিকে মা তাঁর কাছে থাকতে বলেছিল।

জিতু দ্রুত চিন্তা করে নিল একটু। তার মানে তন্দ্রা রাতে জিতুকে তার ঘরে ডাকেনি, নিজে আসার কথা লিখেছিল। সুযোগ মেলেনি, আসেনি। এই জন্যে খবর দেওয়াও খুব একটা দরকার মনে করেনি। কিন্তু তন্দ্রার নিশ্চয় কোনো বিভ্রাটের সম্ভাবনা মাথায় আসেনি। নইলে এ-ভাবে রাগ করে চলে যেত না। গিয়ে শ্রীহরিকেও বলবে নিশ্চয়ই। ভিতরটা তিক্তই হয়ে উঠছে জিতুর।

বলল, আমার ভুল হয়েছে। কি ভুল বুঝতে পারছ?

নিরুত্তর।

—তোমার মাথায় একেবারে আকাশ ভেঙে পড়েছে দেখছি। এখন কি করবে ভাবছ?

তেমনি অপলক চেয়ে থেকে ধারা খুব ঠাণ্ডা গলায় এবারে জবাব দিল, আমার কিছু ভাবার নেই—আজ হোক কাল হোক দাদা বউদি দুজনকেই এখানে নিয়ে আসা উচিত, যাবার আগে বউদি আমার দোষ দিয়ে গেছে, দাদাকেও তাই বলবে। তারা না এলে বাবা-মায়ের খুব অসুবিধে হবে।

এবারে জিতু সচকিত একটু—দুজনকেই আসতে হবে কেন? তুমি কি করবে?

জবাব দিল না।

—কি করতে চাও তুমি?

—এরপর আমার আর বেঁচে থাকাটা আমার বাবা মা-ও চাইবে না।

বিষম চমকেই উঠেছিল জিতু। এই রকম ঠাণ্ডা অথচ কঠিন মুখ সে যেন কবে আরো দেখেছিল! তার মায়ের মুখ। সঙ্গে সঙ্গে শেষের সেই বীভৎস দৃশ্যও চোখের সামনে ভেসে উঠেছে।

না, এই বিয়ে শ্রীহরির বাবা মা বরদাস্ত করেনি। তারা আবার ছেলের কাছে চলে গেছে। শ্রীহরিও ধাক্কা খেয়েছে একটু, কিন্তু সে জানে এছাড়া আর উপায় ছিল না। আর তখন অবস্থা এমনই যে বাবা-মায়ের জন্য বোনের কাছ থেকে হাত পে: টাকাও নিয়েছে।

তিক্ত আর মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত শুধু জিতু বোস। সব থেকে বেশি রাগ এক-একসময় ধারার ওপর। সে আগের থেকেও সহজ, স্বাভাবিক। এই বরাতই যেন বরাদ্দ ছিল তার।

এর আগে বিয়ের কথা জিতু ভাবেনি। বিয়ে কবে করত বা করত কিনা জানে না। ম্যাট্রিক থেকে এম.এ. পর্যন্ত প্রথম হওয়া একটা ঝকঝকে ছেলের এই থার্ড ডিভিশনে পাস করা সাদা-মাটা সোজা-সরল বউ—এ যেন অদৃষ্টের পরিহাস। বিশেষ করে এ-পর্যন্ত যে লোক অদৃষ্ট মানে নি।

রাতের শয্যায় সেই আক্রোশ নিয়েই কাছে এসেছে গোড়ায় গোড়ায়, প্রথম দিনের সেই লুটের প্রবৃত্তিটাই আরো বেপরোয়া করে তুলতে চেয়েছে। কিন্তু রমণীর সহজ অভ্যর্থনায় চিড় খেতে দেখেনি কখনো। উল্টে তার অসহিষ্ণু কাণ্ডকারখানা দেখে যেন কৌতুক বোধ করেছে। বলেছে, বাবা, ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে নাকি আমাকে?

জিতু বুঝতে পারে সে অখুশি নয়। বিঁধতে ছাড়ে না। একদিন ঠেস দিয়ে বলেছিল, গোঁড়া ব্রাহ্মণের মেয়ের চণ্ডালে কোনো আপত্তি আছে বলে তো মনে হয় না।

এ-রকম ঠেস কেন, চোখ বড় করে যশোধরা সেটা বুঝতে চেষ্টা করেছে। তারপর বলেছে, আপত্তির রাস্তা রেখেছিলে?

জিতু সেখানেই থামেনি সেদিন।—আরো জানো? আমার বাপের পর্যন্ত ঠিক নেই জানো?

ধারা ফ্যালফ্যাল করে খানিক চেয়েছিল মুখের দিকে। তারপর হঠাৎ হেসে উঠেছে। —তুমি ঠিক থাকলেই হল।

—আমি ঠিক থাকব। তক্ষুণি একটা চূড়ান্ত ফয়েসলার ঝোঁক চেপেছে মাথায়—আমার চরিত্র জানা নেই তোমার? তোমার আগে আর কোনো মেয়ে আসেনি ভাবছ?

ধারা চেয়েই ছিল। এই লোক যেন ওর কাছে দেখারই মানুষ। তারপর জিজ্ঞাসা করেছে, পরেও আসবে?

জিতু আরো জোর দিয়ে বলেছে, হ্যাঁ আসবে, আমার যখন যাকে মনে ধরবে সে-ই আসবে! আগেও এসেছে, পরেও আসবে—এ তুমি খুব ভালো করে জেনে রেখো।

মিথ্যে আস্ফালন করছে না বোঝাবার জন্যেই রাতে এক-একদিন বাড়ি ফেরেনি। খবরও দেয়নি। গোড়ায় যশোধরা ঠিক বোকার মতো জিজ্ঞাসা করেছে, কোথায় ছিলে?

তাইতেই অসহিষ্ণু।—কেন, তোমার খুব ভাবনা হয়েছিল?

—হলে কি করব?

—খাবে দাবে আর ঘুমোবে! তোমাকে বলেছি না আমার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামালে মুশকিল হবে?

অপরাধীর মতো যশোধরাই চুপ মেরে গেছে। এরপর রাতে না ফিরলেও জিজ্ঞাসা করার সাহস হয়নি।

কিন্তু এ-সবই ঝোঁকের ব্যাপার। নইলে এই সাদাসিধে স্ত্রীটির অনেকগুলো গুণ সে লক্ষ্য করেছে। সব থেকে বড় গুণ সহিষ্ণুতা। কোনো কারণে এতটুকু উষ্মার আঁচ কখনো চোখে পড়েনি। যা বলে শোনে, যা করতে বলা হয়, করে। কোনো ক্ষোভ নেই। প্রতিবাদ তো নেই-ই। এই বাধ্যতা তার স্বভাবে মিশে আছে। ও যেন তার সংসারের আঙিনায় স্বচ্ছ শান্ত দীঘিটির মতো। ঝাঁপিয়ে পড়ো, তোলপাড় করো, তুমি এলে তোমাকে শীতল করা, তোমার তাপ জুড়নো তার কাজ। না এলেও সে আছেই তোমার জন্য।

তিন বছরের মাথায় প্রথম ছেলে এসেছে। এ-সম্ভাবনা জানার সঙ্গে সঙ্গে জিতু

বোস বিরক্ত। আগেই বলে দিয়েছিল ও-সব তার চাই না। বলার অর্থ, আগে থাকতে প্রস্তুত হওয়া বা ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়ও তার নয়, অপর জনের।

তাই জানার পর ভুরু কুঁচকে বলে উঠেছিল, তোমাকে বলেছিলাম না ও-সব আমার চাই না?

কিন্তু জবাবে এই একজন কোনো অজুহাত দেখায়নি। বলেনি, সে গণৎকার নয় যে খিদের মুখে কখন তার কাছেই ছুটে আসা হবে আগে থাকতে জেনে প্রস্তুত হয়ে বসে থাকবে। তার বদলে হাসিমাখা বিড়ম্বিত মুখে যা বলে বসেছিল, শুনে সে-ও হেসেই ফেলেছিল, বলেছিল, তোমার চাই না বলে, আমারও চাই না? আমি কি সে-জন্যে অন্য লোক ধরতে যাব নাকি!

ষোল বছরে জিতু বোস প্রায় মুছে গেছে। ঘরে বাইরে এখন তার সবটাই জয়ন্ত বোস। আর ঘরের মানুষ তেড়ে-ফুঁড়ে বড় হতে থাকলে তার অন্তঃপুরের রমণীটির সঙ্গে বাইরের কিছু মেয়ে পুরুষের যোগও অবধারিত। তাই ধারারও সবটুকুই তখন যশোধরা। জয়ন্ত বোস আর যশোধরা বোস।

জয়ন্ত বোসের কাজের ধারা সুযোগ সুবিধে আর দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রেখে চলেছে। চলছেও। এই চলার পিছনে এখন তাঁর নিজস্ব প্রতিভাই সব।

কখনো দেখা গেছে, বিভিন্ন নামে বেশ কয়েকটি কোম্পানির মালিক তিনি, কখনো বা একটি দুটির। আবার কখনো সাময়িকভাবে একটিরও না। তাঁর প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠান গজায়, প্রয়োজন ফুরোলে উবেও যায়। সেই সব উবে যাওয়া কোম্পানির নামে মালিক কখনো জয়ন্ত বোস, কখনো জিতেন বোস, কখনো ধারা রায়, কখনো যশোধরা বোস, কখনো বা অন্য কোনো বিশ্বস্ত কর্মচারী। এমনি দু-পাঁচজন বিশ্বস্ত কর্মচারী তার বারো মাসের মোটা মাইনে করা লোক। তিনি যে-ভাবে কলকাঠি নাড়েন সেইভাবে উবে যাওয়া প্রতিষ্ঠানের ইনকাম-ট্যাক্সের ঝামেলা সামলায় তারা।

কলকাতা বড় হচ্ছে। চারদিকের দরিদ্র এলাকায় সরকারের লো-কস্ট হাউসিং স্কিম-এর কাজ চলছে। কংগ্রেসে মোটা টাকা চাঁদা দেন। মন্ত্রী পর্যায়ের হোমরা-চোমরাদের সঙ্গে যাঁর খাতির, বিভাগীয় সরকারি অফিসারদের সঙ্গে তাঁর ভাবসাব না থাকার কোনো কারণ নেই। আরো সুবিধে, যার কাছ থেকে সাহায্য পান তাকেও তিনি অখুশি রাখেন না। প্রত্যাশার কিছু বেশিই দেন সর্বদা। অতএব ন্যায্য টেন্ডার ফেললে তাঁর কাজ পেতে অসুবিধে কি? কাজ পাওয়ার পর কোনো ছোট কোম্পানিকে তিনি ইস্পাতের সাব কনট্রাক্ট দিলেন, কাউকে সিমেন্টের, কাউকে বা কাঠের। আসলে ওই সাময়িক প্রতিষ্ঠানগুলোও তাঁরই। ফলে চারটে প্রতিষ্ঠানের ভাগে-ভাগে লাভের অংশও তাঁর কাছেই আসছে শেষ পর্যন্ত। এই আলাদা আলাদা প্রতিষ্ঠানগুলোর যে এসটাব্লিশমেন্ট খরচ তাও শুধু খাতাপত্রেই।

বাড়তি খরচ দেখিয়ে আবার অনেক সময় মোটা-টাকা লোনের জন্য সরকারের দ্বারস্থ হয়েছেন। খাতিরের সরকারি অফিসারই সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছে। টাকার ওপর দখল চাই। সেটা থাকলে আরো বেশি টাকা আসে।

যে কোম্পানির নামে মূল কনট্রাক্ট সেটাকেই দেউলে ঘোষণা করেও এক-আধবার কম লাভ করেননি তিনি। সরকার তখন বাধ্য হয়ে অনেক চড়া মূল্যে অন্য কোম্পানিকে কনট্রাক্ট দিয়েছে। তার আগে সেই অন্য কোম্পানিটির মালিকও তিনিই। ওদিকে সাব-কনট্রাক্টগুলো ঠিকই আছে। ফলে চতুর্বর্গ লাভ।

মস্ত মস্ত দুটো ব্যাংকের সর্বোচ্চ কর্তাদের সঙ্গেও বিশেষ খাতির তাঁর। ব্যাংকের প্রাথমিক লোন পেলে সরকার বহু নির্মাণ কাজে বাড়তি 'ম্যাচিং লোন' দিয়ে থাকেন। ব্যাংকের পদস্থ ব্যক্তিটি ভিন্ন কোনো লোকের নামে জয়ন্ত বোসের সঙ্গে কোনো উদ্যোগে চুক্তিবদ্ধ হলে আর বাধা কোথায়? ব্যাংকের লোন তিনিই মঞ্জুর করলেন। তারপর সরকারি লোন পাওয়ার ব্যবস্থা জয়ন্ত বোস তো করেই রেখেছেন। ফলে শহরতলিতে লো-কস্ট হাউজিং স্কিমের দখল নেবার ব্যাপারে ক'জন আর তাঁদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে? আর, অত লাভই বা আর কে করবে?

মোট কথা যারা জানে জয়ন্ত বোসকে তারা তাঁর অর্থনৈতিক প্রতিভাও এক বাক্যে স্বীকার করে। মানুষটা যেন শূন্য থেকেও টাকা কুড়োতে জানেন। অর্থনৈতিক পরামর্শের প্রয়োজনে বড় বড় শিল্প-সংস্থার হোমরা-চোমরাদের কাছেও বিশেষ কদর তাঁর। সে-রকম দরকার পড়লে অনেকে তাঁর কাছেই আগে ছুটে আসে। এদিকে শেয়ার-মার্কেটেও অনেকের লক্ষ্য-মণি তিনি। সে-ক্ষেত্রে তাঁর আচরণের হদিস পেয়ে বা না পেয়ে কত জন উঠল, কত জন ডুবল। যাবা উঠেছে তারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। যারা ডুবেছে তারা নিজেদের অদৃষ্ট মেনেছে। উদ্ধারের আশায় আবার তারা তাঁর কাছেই ছুটে এসেছে। কিন্তু জয়ন্ত বোস কারও ওপর সদয় নন, কারো ওপর নির্দয় নন! পরামর্শ চাইলে পরামর্শ দেবেন। কিন্তু ভালো-মন্দের দায় তাঁর নয়।

কারও কাছে তিনি বিশ্বাসী দাবী করেন না। কিন্তু ব্যক্তিত্ব এমনই, লোকে বিশ্বাস করতে চায়, বিশ্বাস করে। আশা করে এই লোক সহায় থাকলে ডুবন্ত মানুষও ডাঙা খুঁজে পাবে।

এইভাবেই চলছিল। এইভাবেই চলে যেতে পারত।

কিন্তু সেই চুয়াল্লিশ বছর বয়েসে হঠাৎ যেন জীবনের আর-এক সন্ধিক্ষণে পা দিলেন তিনি। অনেক কিছুই তিনি আগে থাকতে চিন্তা করতে পারেন, ভেবে নিতে পারেন। কিন্তু এবারে সমস্ত চিন্তা-ভাবনার বাইরে কিছু একটা ঘটে গেল।

একটা যোগাযোগ।

কংগ্রেসের কোনো বিশিষ্টজনের চিঠি নিয়ে একজন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলো। দীপেন গুপ্ত। পরনে পাজামা পাঞ্জাবি। বছর তেত্রিশ-চৌত্রিশ বয়েস। মিষ্টি সপ্রতিভ চেহারা।

কংগ্রেসের সেই বিশিষ্টজনের চিঠির মর্ম, সাপ্তাহিক সাহিত্য-পত্র 'নিরালা'র সম্পাদক শ্রীদীপেন গুপ্ত ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বিশেষ স্নেহের পাত্র। তিনি যদি এঁকে একটু সময় দিয়ে সব শোনেন এবং সাহায্য করেন, তাহলে খুশি হবেন।

'নিরালা' কেন, জয়ন্ত বোস ইদানীংকালের কোনো সাহিত্যপত্রের নাম করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। আর সাহিত্যের সঙ্গেও সেই ছাত্র জীবনের পর থেকে কোনোরকম যোগ নেই।

—বলুন কি করতে পারি।

জবাবে দীপেন গুপ্ত দু-তিন সংখ্যার নিরালা বার করে দেখালো তাঁকে। ইদানীং প্রতি সংখ্যায় ছবি দিয়ে একজন করে শিল্পপতির বা বড় ব্যবসায়ীর ব্যক্তিজীবনের পরিচয়সহ একটি করে রচনা ছাপা হচ্ছে। সিরিজটার নাম 'সাফল্যের নেপথ্যে'। এ-ধরনের জিনিস অনেককে প্রেরণা যোগাবে বলে তাদের বিশ্বাস। এই সিরিজে জয়ন্ত বোসের সম্পর্কে লেখার কথা কংগ্রেসের ওই ভদ্রলোক বলেছেন।

সাপ্তাহিক কাগজ ক'টা উল্টে-পাল্টে দেখে নিয়ে জয়ন্ত বোস জিজ্ঞাসা করলেন, শুধু এইটুকু সাহায্য, আর কিছু না?

তাঁর মনে মনে ধারণা, পয়সা খরচ করে এ-রকম প্রচারের জন্য কোনো সম্পাদক কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার চিঠি নিয়ে আসে না।

ধারণা নির্ভুল। দীপেন গুপ্ত জানাল, এবারে কাগজটাকে বড় করার একটা ড্রাইভ নিয়েছে তারা, কংগ্রেস থেকেও উৎসাহ পেয়েছে, সরকারি বিজ্ঞাপনের আশ্বাস মিলেছে। শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীরা এই 'সার্ভিস'টুকুর বিনিময়ে ডোনেশান দিচ্ছেন। কিন্তু ডোনেশানই সব নয়, বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে সাহায্য পাওয়াটাই আসল প্রত্যাশা।

জয়ন্ত বোস বললেন, আমি ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট নই, তেমন বড় ব্যবসায়ীও নই—আমার সম্পর্কে আপনাদের লেখার কিছু নেই। আমার নিজের যা কাজ তাতে বিজ্ঞাপনের বড় একটা দরকারই হয় না। হলেও সাহিত্যপত্রে দেবার প্রশ্ন ওঠে না। ডোনেশান যা পারি দিচ্ছি, তার জন্যে জীবনী ছাপার দরকার নেই...

কিন্তু যে এসেছে সে নাছোড়বান্দা। বলল, আপনি নিজে বিজ্ঞাপন না দিতে পারলেও যারা দেয় তাদের বলে দিতে পারেন। আর জীবনী না ছেপে ডোনেশান নিলে সেটা একেবারে ভিক্ষের মতো হয়ে যাবে। তাই ইন্টারভিউর সময় একটু দিতে হবে।

কিন্তু জয়ন্ত বোসের অত সময় নেই। এ-ব্যাপারে আগ্রহও নেই। তাই দীপেন গুপ্তকে বললেন, যা তারা জানতে চায় তার একটা প্রশ্ন-পত্র বা কোশ্চেনেয়ার পাঠাতে, তিনি টাইপ করা জবাব পাঠিয়ে দেবেন, তার থেকে বাংলায় গুছিয়ে নিতে হবে।

রাজী হয়ে দীপেন গুপ্ত তাঁর একখানা ছবি তুলল, আর হাজার টাকা ডোনেশানের চেক নিয়ে চলে গেল। পরদিনই লোক মারফৎ সেই প্রশ্ন-পত্র এলো। জয়ন্ত বোসও দিন তিনেকের মধ্যে তার জবাব টাইপ করিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

ওপরঅলার কোন চক্রে পা ফেললেন তিনি, তখনও কিছুমাত্র ধারণা নেই তাঁর।

দু'সপ্তাহ বাদে ডাকে 'নিরালা' কাগজ এলো তাঁর কাছে। তাঁর সম্পর্কে যে লিখেছে তার নাম দেখলেন কমল গুপ্ত। লেখাটা ছোটর ওপর বেশ ঝরঝরে আর সুন্দর হয়েছে অস্বীকার করার নয়। বাল্যকালে অনাথ ছিলেন, আর ম্যাট্রিক থেকে এম. এ. পর্যন্ত কখনো প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হননি, সব থেকে এই উচ্ছ্বাস আর শ্রদ্ধাই লেখার মধ্যে বেশি উপচে পড়ছিল। কিন্তু সে শ্রদ্ধা বা উচ্ছ্বাস কোথাও মাত্রা ছাড়ায়নি।

সেই সকাল আর পরদিনের মধ্যে কম করে দশটা টেলিফোন পেলেন তিনি। সকলেই পরিচিত। তাদের কাছেও 'নিরালা' পৌঁছেছে। তিনি যে এত বড় পণ্ডিত আর এমন অবস্থা থেকে এতখানি উঠেছেন, কারও জানা ছিল না। তাই অভিনন্দন।

জয়ন্ত বোসের খুশি একটু হবারই কথা। পরের সপ্তাহে দীপেন গুপ্ত আবার এসে

হাজির হতে তাঁকে একটু বেশি খাতির করলেন জয়ন্ত বোস। চা-টা খাওয়ালেন। দীপেন জানাল, লেখাটা পড়ে অনেকেই খুব খুশি হয়েছে—কোনো ব্যবসায়ী বা শিল্পপতির এ-রকম জীবনী আর ছাপা হয়নি।

এবারেও একটা আর্জি নিয়ে এসেছে দীপেন গুপ্ত। দশ দিন বাদে 'নিরালা' প্রতিষ্ঠার দিন। সেদিন অনেকেই নিরালা অফিসে পায়ের ধুলো দেবেন। কংগ্রেসের অনেক পদস্থ জনেরাও আসবেন। তাঁকেও যেতে হবে। কমল তাঁর কথা বিশেষ করে বলে দিয়েছে, মিসেস বোসকেও নিয়ে আসতে হবে।

জয়ন্ত বোসের মনে পড়ল তাঁর সম্পর্কে যে লিখেছে তার নাম কমল গুপ্ত। জিজ্ঞাসা করলেন, কমল কে?

—আমার বোন। মেয়ে-কলেজের ইংরেজি লেকচারার—খুব ভালো ছাত্রী। আপনার টাইপ-করা জবাব পড়ে সে এত খুশি যে এটা ও নিজেই লিখে দেবে বলল। লেখেও খুব সুন্দর, আপনার ভালো লেগেছে?

ভিতরে ভিতরে বেশ খুশি জয়ন্ত বোস। বললেন, খুব।

কথা দিলেন, যাবেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে সস্ত্রীক নেমন্তন্ন অনেক জায়গায়ই থাকে। কিন্তু কোথাও গেলে একলাই যান তিনি। সেই দিনও আপিসের শেষে একলাই চলে গেলেন। বিকেলের চায়ের নেমন্তন্ন, কিন্তু সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে।

সেখানে কংগ্রেস মহল আর ব্যবসায়ী মহলের অনেকেই পরিচিত তাঁর। কবি সাহিত্যিকও কিছু-কিছু এসেছে, কিন্তু তারা খুব একটা পাত্তা পাচ্ছে না। দীপেন গুপ্ত আর তার ফর্সা রোগা বউ রথী-মহারথীদের নিয়ে ব্যস্ত।

হাসি মুখে সাতাশ-আটাশ বছরের একটি মেয়ে নিজে থেকে এগিয়ে এলো। দু'হাত জুড়ে নমস্কার করে বলল, আমি কমল গুপ্ত। আপনার লাইফ স্কেচ আমিই লিখেছিলাম। অনেকে প্রশংসা করেছে, কিন্তু আসলে বেশির ভাগ জায়গায় আপনার সুন্দর ইংরাজি টুকুরই বাংলা করে দিয়েছি আমি।

এই একজনকে দেখেই হঠাৎ নিজেরই স্নায়ুতে স্নায়ুতে এমন কাড়াকাড়ি পড়ে গেল কেন জয়ন্ত বোসের? এ তিনি কাকে দেখছেন? কাকে দেখে সুপ্ত স্মৃতির দরজায় এমন আচমকা ঘা পড়ল?...কাঁধ পর্যন্ত লালচে চুল, বেশ ফর্সা অথচ ফ্যাকাশে মুখ, লম্বা দোহারা গড়ন। খুব যে সুন্দরী তা নয়, তবে হঠাৎ দেখলে সুন্দরীই মনে হবে। তারপর চোখ মুখ কি-রকম টানধরা মনে হবে। তবু এই মুখ দেখার সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃতির পর্দার ওধারে আর একখানা মুখ অপেক্ষা করছে মনে হয় কেন? সে কার মুখ?

হঠাৎ এমনিই নাড়াচাড়া খেলেন একটা জয়ন্ত বোস যে মুখে কথা সরলো না। হাসতে চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, খুব ভালো লেখা হয়েছে, কিন্তু একটু ত্রুটি থেকে গেছে—আমি যা, আপনার লেখার মধ্যে আমি তার থেকে বড় হয়ে গেছি।

শুনে কমল আরো খুশি হল। বলল, ম্যাট্রিক থেকে এম.এ. পর্যন্ত ফার্স্ট এমন একজনকে আমি এই প্রথম দেখলাম। লেখার আগে আমার নিজেরই একবার আপনার কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে করছিল।...এ-রকম কেরিয়ার—আপনি ব্যবসায় ঢুকে পড়লেন কি করে? ছেলেবেলার অবস্থার শোধ নেবার জন্য?

জয়ন্ত বোস হাসলেন। জবাব দেবার থেকে দেখতে ইচ্ছে করছে বেশি। জবাবও দিতে হল। বললেন, ঠিক জানি না, বরাবর ঝোঁকের বশে চলি, ফার্স্ট-টার্স্টগুলো ঝোঁকের মাথায় হয়েছি, আবার চাকরিতে না গিয়ে ব্যবসার মধ্যেও ঝোঁকের মাথায়ই ঢুকে পড়েছি।

এই জবাবও ভালো লেগেছে বুঝতে পারছেন। কিন্তু এর ফাঁকে দ্রুত মগজ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন তিনি।...এ-ও গুপ্ত...কমল গুপ্ত।...এর দাদা দীপেন গুপ্ত। বুকের তলায় একটা আবিষ্কারের মতোই কিছু যেন দাপা-দাপি করে উঠল। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি জজের বাড়ির মেয়ে?

কমল গুপ্ত ভাবল হয়তো দাদার মুখে শুনেছে। হেসেই বলল, আগে ও-বাড়িটা জজের বাড়িই বলত সকলে—আমার দাদু আর বাবা দুজনেই জজ ছিলেন।

—কি নাম? বাইরে শান্ত কিন্তু ভিতরে শান্ত থাকা সহজ হচ্ছে না।

কমল গুপ্ত নাম বলল। আর সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের মুখখানা এমন বদলে গেল কেন বুঝল না।

প্রশ্ন শুনে আরো একটু অবাক। —বাবা বেঁচে নেই?

—না, অনেক দিন গত হয়েছেন।

—আপনার মা?

—তিনি বাবারও আগে গেছেন। আপনি চিনতেন নাকি তাঁদের?

খুব চেষ্টা করে নিজেকে আত্মস্থ করলেন জয়ন্ত বোস। চোখে চোখ রেখে একটু হেসে জবাব দিলেন, পরে বলব।

হাব-ভাবের এই পরিবর্তনের কারণ বুঝল না কমল গুপ্ত। বাবার কাছে বা বাড়িতে এর আগে এঁকে কখনো দেখেছে মনে পড়ছে না। দাদার নির্দেশে সে তাঁকে প্রেস আর অফিস দেখাল। ছোট ব্যাপার, দেখানোর মতো নেই কিছুই। তখনো কমলের অস্বাভাবিক লাগল একটু। ভদ্রলোক তাকেই যেন বার বার ভালো করে দেখে নিচ্ছেন। অথচ এ-যে কোনোরকম লোভের দেখা নয় তাও বুঝতে পারে।

এরপর আরো তিন জনের সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিল। একজন সূর্য রায়। নির্লিপ্ত গোছের গম্ভীর মূর্তি। বছর একত্রিশ বত্রিশ বয়েস। সাদা-মাটা বেশ-বাস। এর সঙ্গে পরিচয় করানোর ফাঁকে একটু পক্ষপাতিত্ব আর একটু খোঁচাও অনুভব করলেন জয়ন্ত বোস।

কমল হাসি চেপে বলল, ইনি সূর্য রায়, আপনাব মতো না হলেও ভালো স্কলার একজন। কলেজের মাস্টারির মতো বাজে কাজ ছেড়ে এখন বেশির ভাগ সময় জেলে থাকা পছন্দ করেন। আপনারা কংগ্রেসের ভক্ত, কিন্তু ইনি নিজেকে কংগ্রেসের পয়লা নম্বরের শত্রু ভাবেন। সেই জন্যেই আমার সঙ্গে বনিবনা কম।

এটুকু থেকেই জয়ন্ত বোস পক্ষপাতিত্বের ইঙ্গিতটুকু পেয়ে গেছেন। কিন্তু সেটুকু যেন তাঁর কাম্য নয়। আর তাঁর সঙ্গে কমল গুপ্তর প্রশংসা ভরা ফিরিস্তি শুনে সূর্য রায়ের তেমন আগ্রহ দেখা গেল না। আনুষ্ঠানিক ভদ্রতাটুকু মাত্র।

আর যে দুজনের সঙ্গে পরিচয়, তাদের একজন ব্রিজেশ ধর, অন্যজন আরতি ধর।

—আমার দিদি আরতি ধর, ভালো গান করেন, আর ইনি ভগ্নীপতি ব্রিজেশ ধর, অ্যাটর্নি।

ব্রিজেশ ধরকে ছেড়ে আরতি ধরকে ভালো করে দেখে নিলেন জয়ন্ত বোস। দু'বোনের চেহারায় একটুও মিল নেই। জিগ্যেস করলেন, আপনার নিজের বোন?

—জ্যাঠতুত বোন।

সমাধান পাওয়ার মতো করে সামান্য মাথা নাড়লেন জয়ন্ত বোস। অনেকটা আপন মনেই বিড়বিড় করে বললেন, বড়বাবু...মানে রাঙাবাবুর দাদার মেয়ে...।

পাশ থেকে কমল গুপ্তর কানে গেছে। সে সত্যিকারের অবাক এবার। —হ্যাঁ, আমার বাবাকে রাঙাবাবু আর জেঠুকে বড়বাবু বলেই তো ডাকত সকলে—আপনি জানলেন কি করে?

জয়ন্ত বোস আত্মস্থ হলেন আবার। একটু হেসে হাত তুলে অভ্যাগতদের দিকে এগিয়ে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসলেন। মনে মনে একটু হিসেব কষে নিলেন, বড়বাবুর তখন পর্যন্ত বিয়েই হয়নি...তাই তার মেয়ে দীপেনেরও ছোট।

কমল গুপ্ত ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না ব্যাপারখানা কি। অন্য পরিচিত অভ্যাগতদের সঙ্গে দু'দশ কথার পরেই ভদ্রলোক যেন অন্য চিন্তায় তন্ময়। সেই তন্ময়তার ফাঁকে নিবিষ্ট চিত্তে শুধু ওকেই দেখে চলেছেন। যতবার সেদিকে মুখ ফিরিয়েছে, তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে। কিন্তু তার পরেও যেন খুব সচেতন নন ভদ্রলোক।

...অভ্যাগতরা একে একে বিদায় নিচ্ছেন। কিন্তু উনি বসেই আছেন। খানিক আগে সূর্য রায় উঠে চলে গেল। তার কাজ আছে। যাবার আগে ইশারায় কমলকে বাইরে ডাকল। সেখান থেকেও কমল ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছে ওই ভদ্রলোক তার দিকেই চেয়ে আছেন। ঘাড় ফিরিয়েছে কারণ, তাঁর সম্পর্কেই পলকা ঠাট্টা করছিল সূর্য। বলেছে, তোমার ওই অগাধ-পণ্ডিত ব্যবসায়ীটির খুব মনে ধরেছে তোমাকে, চোখ আর ফেরাতেই পারছে না—

ঝাঝাল শ্লেষে কমল বলেছে, মনে তো কত জনেরই ধরে—তোমার হিংসে হয়?

—হিংসে ঠিক না...ভাবনা হয়। একদিকে ভদ্রলোকের এত বিদ্যে, এত টাকা, অন্যদিকে তোমার এত শ্রদ্ধা ভক্তি—আর দীপুদা তো ছোরা হাতে নিয়ে ফিল্ডে নেমেছে,...যাক, চলি—.

সূর্যর অর্ধেক কথা পেটে থাকে, অর্ধেক মুখে। কমলের সেটাই যেন সব থেকে অসহ্য। আসলে ঠাণ্ডা মাথায় এই লোককে সে বেশিক্ষণ বরদাস্তই করতে পারে না।

—পার্টি অফিসে যাচ্ছ?

—হ্যাঁ।

—যাও। বাজে ভাবনা মাথায় নিয়ে গাড়ি চাপা পড়ো না—কত বড় বড় দায়িত্ব তোমার মাথায়!

ঝটকা মেরে চলে এসেছিল। ঘরে পা দিতেই ওই জয়ন্ত বোসের সঙ্গে চোখাচোখি আবার।...মানুষটার হাব-ভাব খুব স্বাভাবিক লাগছে না ঠিকই। সোজা এগিয়ে তাঁর পাশের খালি চেয়ারটাতে বসল।

জয়ন্ত বোস নিজের মধ্যে ফিরে এলেন আবার। একটু উসখুস করে বললেন, এবারে উঠব—

কমল মনে করিয়ে দিল, পরে কি বলবেন বলেছিলেন...?

—হ্যাঁ, আসুন। উঠে পড়লেন।

কোথায় যেতে হবে কমল ঠিক বুঝল না। পরমুহূর্তেই সেটা পরিষ্কার হল। দু'পা এগিয়ে জয়ন্ত বোস দীপেনের হাত নিজের হাতে নিয়ে জোরেই ঝাঁকালেন। —উইশ ইউ ভেরি ভেরি গুড্ লাক। উইল সি ইউ এগেইন। মিস গুপ্তকে আমি বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছি—

কমল এক্ষুণি বাড়ি ফেরার কথা ভাবছিল না। কিন্তু এই লোকের কাছে তার ভাবাভাবিটা যেন কোনো ব্যাপার নয়। নিজের প্রখর ব্যক্তিত্ববোধ নিজের কাছেই একটা রোগের মতো কমলের। বাড়ির লোকের কাছেও। কিন্তু এই মুহূর্তে কৌতূহলটাই বড়।

দীপেন ধরে নিল, কমলই তাঁকে অনুরোধ করেছে। খুশি হয়ে বলল, এঃ, আমি থাকতে পারছি না, কিন্তু পরে আর একদিন আপনাকে আসতে হবে।

হাসিমুখে মাথা ঝাঁকিয়ে একবার শুধু ফিরে তাকালেন কমলের দিকে। অর্থাৎ যাওয়া যাক,—

গাড়িতে বসে কমল বলল, আপনাকে ধন্যবাদ, কিন্তু মিছিমিছি কষ্ট করলেন—

জয়ন্ত বোস ঘাড় ফিরিয়ে সোজা তাকালেন তার দিকে।—আমি কখনো মিছিমিছি কষ্ট করি না। ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন কোন দিকে যেতে হবে।

—আপনি আমাদের বাড়ি চেনেন?

আবছা অন্ধকারে সামান্য মাথা নেড়ে জয়ন্ত বোস পকেট থেকে সিগার কেস বার করলেন। আজকাল এতেই অভ্যস্ত।

চুরুট ঠোঁটে আটকাবার সঙ্গে সঙ্গে কমল যেন ফ্যাসাদে পড়ল একটু। সিগার ছেড়ে সিগারেটের ধোঁয়াও বরদাস্ত করতে পারে না। মাথা ঘোরে, গা ঘুলোয়। বলেই ফেলল, ওটা এক্ষুনি না ধরালে আপনার খুব অসুবিধে হবে?

চুরুট সহ দু'চোখ তার মুখের ওপর থমকাল। চুরুট নামিয়ে কোটের পকেটে রাখলেন।—আই অ্যাম স্যরি।

এবারে কিছু শুনবে আশা করছে কমল গুপ্ত। কিন্তু ভদ্রলোক কোণে ঠেস দিয়ে বসলেন। কিন্তু একটি কথাও বললেন না। এক-একবার মুখ ঘুরিয়ে তাকে দেখলেন শুধু। আর টুকটাক ড্রাইভারকে নির্দেশ দিচ্ছেন কোন রাস্তায় যেতে হবে।

সত্যিই বাড়ির দরজায় এনে গাড়ি দাঁড় করালেন। নিজেই আগে নামলেন। কমল পরে। সে নামতে কোনো আমন্ত্রণের অপেক্ষা না রেখে বাড়ির দিকে এগোলেন।

ঢোকার আগে গোটা বাড়িটা একবার মুখ উঁচিয়ে দেখে নিলেন।

এক তলায় বসার ঘর। কমল অবাক। সেদিকে একবার তাকিয়ে ভদ্রলোক সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠছেন। কি যে ব্যাপার কিছু বুঝতেই পারছে না। অগত্যা সে-ও পিছনে পিছনে উঠতে লাগল।

দোতলার বারান্দায় উঠে বারান্দার বাঁ দিকে এগিয়ে কোণের ঘরটার সামনে [illegible]। তারপর দরজা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিলেন। অপ্রত্যাশিত কিছু দেখলেন যেন।

[illegible] দিকে তাকালেন।

[illegible] পুজোর কাজ করতেন, তার এই হাল এখন।

[illegible] সময় পর্যন্ত ওটা পুজোর ঘরই ছিল। এখন ওটা তারই

শোবার ঘর। তার মা যে বাড়িসুদ্ধু লোকের রাঙা মা-ই ছিল তাই বা ইনি জানলেন কি করে! জ্ঞান বয়সে এ-লোককে আজই প্রথম দেখছে সে। আর মা-ও কখনো এঁর কথা বলেনি।

—আপনি আমার মাকে চিনতেন? দেখেছেন?

আঙুল তুলে সামনের সিঁড়িটা দেখালেন জয়ন্ত বোস। —ছ'বছর বয়সে তাঁকে শেষবার দেখেছি...ওইখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন...

সিঁড়ির দিকে এগোলেন। আর কত অবাক হবে কমল গুপ্ত? ধীর পায়ে ভদ্রলোক এবার সিঁড়ি ধরে তিন তলায় উঠছেন! অগত্যা সে-ও অনুসরণ করল। বাধা দেবার মতো করে একবার বলল, তিনতলায় আলো নেই, অন্ধকার।

কিন্তু কানেও গেল না হয়তো। উঠে গেলেন। সামনে ছাদ। পাশের ভাঙা-চোরা ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর জঞ্জাল বোঝাই ভিতরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলেন।

পাশে নির্বাক কমল গুপ্ত।

আস্তে আস্তে তার দিকে ফিরলেন। বললেন, ওই ঘরে ছ'বছরের একটা ছেলে থাকত। তার নাম জিতু। জিতেন বোস...

বারো মাস প্রায় স্নায়ুর গণ্ডগোলে ভোগে কমল গুপ্ত। সেই স্নায়ুতে হঠাৎ যেন বেশি নাড়াচাড়া পড়ছে। —জিতু...জিতেন বোস কে?

—জয়ন্ত বোস।

—আপনি এই বাড়িতে থাকতেন? এই ঘরে?

অন্ধকারে আর একটু সামনে এসে মাথা নাড়লেন। কিন্তু আকাশের জ্যোৎস্নায় তাঁর চোখ মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে! বললেন, আর আমার মা থাকত...

—তিনি কোথায়?

—ঘরের ওই কড়িকাঠে তাকে ঝুলতে দেখে আমি ছুটে পালিয়েছিলাম...একেবারে নিচে...তারপর আর আসিনি।

কমল গুপ্ত আঁতকে উঠল। গায়ে কাঁটা দিল। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে। এ-রকম গভীর দুটো চোখও আর বুঝি দেখেনি।

তার পরেই আড়ষ্ট একেবারে।

জয়ন্ত বোস আরো এগিয়ে এসেছেন। খুব কাছে। তাঁর দুটো হাত ওর কাঁধে উঠে এসেছে। আরো একটু সামনে ঝুঁকেছেন। চুরুটের গন্ধ মেশানো একটা তপ্ত নিঃশ্বাস মুখে লাগল। কমল গুপ্তর স্নায়ুগুলো বশে থাকে না বলে মেজাজও কারণে অকারণে চড়ে যায়। দাদা বউদিরা তাকে ভয়ই করে। কিন্তু এই মুহূর্তে সর্বাঙ্গ অবশ যেন তার। এই নির্জনে এ-রকম পরিবেশে লোকটা কি করতে যাচ্ছে ভেবে পাচ্ছে না।

—তুমি রাঙা মায়ের মেয়ে!...তুমি তাহলে সেই রাঙা মায়ের মেয়ে! তোমার সেই তিন বছরের দাদা সুমু হঠাৎ মারা যাবার পর এই এক বাড়ি লোকের মধ্যে আমার চোখে শুধু দুজনের অস্তিত্ব ছিল। একজন আমার মা, আর একজন রাঙা মা। তা-ও রাঙা মায়ের কাছে মা কিছুই নয়।...সেই রাঙা মায়ের মেয়ে তুমি তাহলে?

কথাগুলোর ফাঁকে পরিস্থিতি ভুলে, পরিবেশ ভুলে, কাঁধের হাত দুটো ভুলে, চুরুটের গন্ধ মেশানো তপ্ত নিঃশ্বাস ভুলে আবার লোকটাকেই দেখছে কমল।

—সেই রাঙা মাকে আমি আবার দেখছি। তোমার দাদার 'নিরালা' অফিসে তোমাকে দেখেই আবার সেই রাঙা মাকে দেখেছি আমি—কাউকে বলে দিতে হয়নি!

কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। গভীর দুটো চোখ ওর মুখের ওপর আটকে থাকল আরো একটু।

—পারহ্যাপস আই হ্যাভ অ্যানয়েড ইউ...আই অ্যাম স্যরি। আবার দেখা হবে—গুড নাইট!

লম্বা পা ফেলে সিঁড়ির দিকে এগোলেন। সিঁড়িতে তাঁর ভারী পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। কমল হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে।

মাঝে একটা দিন বাদ দিয়ে সন্ধ্যায় বোনকে নিয়ে দীপেন গুপ্ত তাঁর বাড়ি এলো। টেলিফোনে আগেই জানিয়ে রেখেছিল তারা আসছে।

জয়ন্ত বোস যেন জানতেন এই চুয়াল্লিশ বছর বয়সে আবার নতুন কিছু ঘটতে যাচ্ছে। তাঁর জীবনে যশোধরার পদক্ষেপ আজই কেন যেন সব থেকে বেশি অবাঞ্ছিত মনে হল তাঁর।

দুজনকেই সাদর আপ্যায়ন জানালেন, এসো, এসো—তোমাদের জন্য অপেক্ষাই করছিলাম।

আজ তিনি আর-এক মানুষ। ভিতরটা সেদিন প্রচণ্ড নাড়াচাড়া খাওয়ার ফলে নিজের বশে ছিলেন না। এখনো কমলকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরটা শান্ত নয় খুব। কিন্তু আজ নিজের ওপর দখল আছে।

হাসি-ভরাট চোখ তুলে কমলকে দেখে নিলেন একবার। তারপর দীপেনের দিকে ফিরে বললেন, আমার সেদিনের পাগলামির কথা শুনে আর না এসে থাকতে পারলে না বুঝি?

এ-রকম একজন বিরাট লোকের অন্তরঙ্গ হতে পেরে দীপেন গুপ্ত মনে মনে খুশি। জবাব দিল, কমল তো সবেতে বেশি ভাবে, দুদিন ধরে ভাবনায় অস্থির একেবারে। ...আমাদের বাবা-মা বা পরিবারের কেউ আপনাদের ওপর বড় রকমের অবিচার কিছু করেছিলেন কিনা, কমলের কেবল সেই চিন্তা আর অস্বস্তি, আমারও তাই।

কমলের দিকে চোখ ফিরিয়ে অল্প অল্প হাসলেন জয়ন্ত বোস। মাথাও নাড়লেন। —বড় রকমের কেন, কোনোদিন কোনোরকম অবিচারই তাঁরা করেন নি। বরং তাঁদের কাছ থেকে আমরা অনেক পেয়েছি।

দ্বিধা কাটিয়ে কমল বলল, আপনার মায়ের সম্পর্কে সেদিন যা বলে এসেছিলেন তাইতে...

—আমার মায়ের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তাঁর নিজের। এর সঙ্গে আর কেউ জড়িয়ে নেই।

রাত পোহালে যে রাঙা মা তার মাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছিল, রাঙা-মার তখনকার সেই আগুন-পানা মুখ এখনো চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু সেটুকু তিনি আর ব্যক্ত করলেন না। বরং যা বললে সব মায়ের মেয়েই খুশি হবে সে-

রকম কথাই শোনালেন। —তোমাদের মা দোতলার ওই কোণের ঘরে বসে তোমাদের দুই বুড়ো দাদুর পুজোর কাজ করতেন। আমি তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু তাঁকেই দেখতাম, চোখ ফেরাতে পারতাম না। ঘরের সব দেব-দেবীর থেকে ওঁকে বেশি সুন্দর মনে হত, আর তাদের থেকে ওঁর বেশি শক্তি ভাবতাম।

এই মেয়ে উপুড় হয়ে পুজোর সাজ করতে বসলে কতটা সেই রাঙা মায়ের মতো হবে কল্পনায় তাও যেন এই ফাঁকে দেখে নিলেন জয়ন্ত বোস।

কমল গুপ্ত মাকে হারিয়েছে বারো বছর বয়সে। দু'চোখ আর দু'কান ভরে এই স্তুতির কথাগুলো শুনল। তারপর বলল, নিশ্চিন্ত হলাম, আমার সত্যি খুব ভাবনা হয়েছিল।

লোভীর মতো এই মুখখানা বার বার আজও দেখতে ইচ্ছে করছে। গত আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে তাঁর ভিতরে কি যে আলোড়ন চলেছে, এই মুখ দেখে কেউ কল্পনা করতে পারবে না।

বোতাম টিপতে মনোহর হাজির। —বউদিমণি কোথায়?

মনোহর জানাল, সন্ধ্যের আগেই তিনি বেরিয়েছেন একটু। জয়ন্ত বোস সেটা জানতেন, তবু ভব্যতার দায়ে জিজ্ঞাসা করেছেন। ভালো করে চা জলখাবার আনতে হুকুম করলেন মনোহরকে।

কমল আপত্তি করল। এখান থেকে তার আর এক জায়গায় যেতে হবে। জয়ন্ত বোস সে-কথায় কান দিলেন না। বললেন, দেরি হবে না, আমার গাড়ি তোমাকে পৌঁছে দেবে'খন। দীপেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার তাড়া নেই তো?

দীপেন তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল। নেই। এমন একটা জবর যোগাযোগ তার কাছে হেলাফেরার ব্যাপার নয়।

জয়ন্ত বোস বললেন, আই অ্যাম অল ফ্রী ফর ইউ দিস ইভনিং। কমলের দিকে ফিরলেন আবার, তোমারও না গেলেই নয়?

—না...যাব বলে দিয়েছি।

বোনের এ-রকম বোকামি দীপেনের পছন্দ হল না। সে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাবি, সূর্যর ওখানে?

কমল সামান্য মাথা নাড়ল কি নাড়ল না। আব তাই দেখেই সে আর টেলিফোনে যাওয়া নাকচ করার প্রস্তাব দিতে সাহস করল না।

চা জলখাবার দেখে কমলের চক্ষুস্থির। আলাদা প্লেটে নিজের জন্য সামান্যই তুলে নিল সে। খাওয়ার ফাঁকে দীপেন একটি মজার ব্যাপার শোনাল জয়ন্তদাকে। এরই মধ্যে সে দাদা সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছে। বলল, আপনার সম্পর্কে 'নিরালা'র আর্টিকল পড়ে বছর মিলিয়ে ম্যাট্রিক থেকে এম.এ. পর্যন্ত গেজেট বার করে বসেছিল সূর্য—সূর্য রায়কে তো আপনি সেদিন দেখেছেন? ...আর তারপর তো সেই সব গেজেট নিয়ে ট্যাক্সি চেপে আমাদের বাড়ি এসে হাজির। সে-সে বছরে ম্যাট্রিক আর আই.এ.-তে যে ফার্স্ট হয়েছিল গেজেটে তার নাম জিতেন বোস, আর তারপর ইকনমিকস অনার্সে বি.এ. আর এম.এ.-তে যে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল তার নামও তাই। আমিও অবাক হয়ে গেছলাম, কমলের মুখে সব শোনার পর আমি আর সূর্য দুজনেই হাঁ। নিজের আসল নামটা সেদিন কমলকে বলে না এলে কি বিচ্ছিরি ব্যাপার হত বলুন তো? আরো যদি কেউ আবার

গেজেট বার করে বসে সে-জন্যে আপনার আসল নামটা 'নিরালা'র পরের সংখ্যায় ছেপে দেব ঠিক করেছি।

জয়ন্ত বোস হাসছেন বটে, কিন্তু সূর্য রায়ের গেজেট বার করে বসার কথা শুনে ভিতরে খুশি নন।

প্রশংসার সুরে দীপেন আবার বলল, কমলের আর্টিকল-এ ডেট-ফেটগুলো দেখেও অত খেয়াল করিনি—আপনি কম করে দশ বছরের বড় আমার থেকে, কিন্তু দেখে আপনাকে আমি নিজের সমবয়সী ভেবে বসেছিলাম! এতবড় ব্যবসা চালিয়ে এ-রকম স্বাস্থ্য রাখলেন কি করে দাদা?

জয়ন্ত বোস হাসছেন। এবারে অখুশি নন। কমলকে এক পলক দেখে নিয়ে বললেন, মনের বয়েসটা এক জায়গায় থেমে আছে বলেই হয়তো কম দেখায়।

ঘড়ি দেখে কমল উঠে দাঁড়াল।—এবার যেতে হবে।

মনোহরকে ডেকে জয়ন্ত বোস হুকুম করলেন, গাড়ি বার করে ইনি যেখানে যাবেন পৌঁছে দিয়ে আয়। দীপেনকে বললেন, তুমি বোসো একটু, আমি একে এগিয়ে দিয়ে আসি।

কমলকে সঙ্গে করে হলঘর পেরিয়ে পাশাপাশি সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মৃদু স্বরে বললেন, গেস ইউ আর এনগেজড অ্যান্ড দ্যাট লাকি ম্যান ইজ সূর্য রায়।

কমল থতমত খেল একটু, তারপর হেসে ফেলল। —ঠিক তা নয়...বিয়ে হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে।

শোনামাত্র জয়ন্ত বোস মনে মনে বললেন, তাহলে আর হবে না। যেন তাঁর সিদ্ধান্তের ওপরেই সব-কিছুর নির্ভর।

ওকে গাড়িতে তুলে দিয়ে ফিরলেন আবার। দোতলায় পা দিয়ে দেখেন যশোধরা তার ঘরের সামনে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। কখন ফিরেছে জয়ন্ত বোস জানেন না। সোজা বসার ঘরের দিকেই এগোলেন তিনি। মুখ আপনা থেকেই কঠিন হয়ে উঠল একটু। কমল গুপ্তর সঙ্গে সূর্য রায় কেন, কোনো রায়ের বিয়ে আর হবে না এটা যদি স্থির সিদ্ধান্ত হয়, অদূর ভবিষ্যতে তাহলে ঘরের এই একজনের সঙ্গেও অকরুণ ফয়েসলার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে—এও তেমনিই ঠিক।

ঘরে ঢুকে সোজা দীপেনের দিকে তাকালেন। মুখ দেখে ভিতরের চরিত্রও তিনি কিছুটা আঁচ করতে পারেন বলে বিশ্বাস। —লাইক্ এনি ড্রিংক?

দীপেনের মুখখানা কাঁচুমাচু, কিন্তু চোখে আনন্দের আভাস। বড়লোকের বাড়ি, ভালো জিনিস মেলার সম্ভাবনা। মুখে বলল, এই মাত্র তো অনেক কিছু খেলাম।

—কাম অন। ওই ঘরের ভিতর দিয়ে তাকে আর-এক ঘরে নিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনোহরের ডাক পড়ল। সাহেবের চোখের ইশারায় সে তার কতর্ব্য বুঝে নিল।

কাচের আলমারিতে সারি সারি বিলিতি বোতল সাজানো। রকমারি জিনিস। দীপেন গুপ্তর দু'চোখ চকচক করছে।

জয়ন্ত বোস বললেন, আমার নিজের এসব বিশেষ চলে না, স্বাস্থ্যে কুলোয় না, কিন্তু পাঁচজনের জন্যে রাখতে হয়।...তোমাকে কম্পানি দেবার জন্য একটা নিচ্ছি, ইউ গো অ্যাজ ইউ লাইক।

বোতল গেলাস সোডা আর ডিসে কিছু স্ন্যাকস সাজিয়ে দিয়ে মনোহর ঘরের বাইরে মোতায়েন থাকল।

জয়ন্ত বোস প্রথমেই এবার দীপেনের স্বার্থের প্রসঙ্গ তুললেন। —তোমার 'নিরালা'র তো ভালো প্রসপেক্ট মনে হচ্ছে, কেমন চলছে? সার্কুলেশন কত?

দু-চার ঢোঁক জঠরে চালান দেবার পর দীপেনের ঠিকই মনে হল এই একজনের কাছে কিছু গোপন করলে নিজেই ঠকবে। জবাব দিল, সপ্তাহে আট হাজার লোকে জানে, কিন্তু আসলে চার হাজারও নয় এখন। ...যে-রকম খুনে রাজনীতি চলেছে ক'বছর ধরে, লোকে আর এসবে মাথা দেবে কি করে! গত দু'বছরে তো পড়ে পড়ে মার খেয়েছি, কোনো বিজ্ঞাপন ছিল না, কংগ্রেস এখন অজয় মুখুজ্জের সঙ্গে কোয়ালিশন মিনিস্ট্রি করতে সামান্য সুবিধে হয়েছে, তবে ক'দিন টিকবে কে জানে।

—তোমার প্রেসের অবস্থাও তো খুব ভালো দেখলাম না, নিজের প্রেস?

—হ্যাঁ। বাবা করে দিয়েছিলেন। সেই থেকে ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট তো আর হয়ই-নি বলতে গেলে। একেবারে একা যুদ্ধ করে চলেছি, অথচ একটু সুযোগ সুবিধে পেলে সব-কিছু অনেক বড় হতে পারত...।

খুব ঠাণ্ডা নিশ্চয়তার সুরে জয়ন্ত বোস বললেন, সুযোগ সুবিধে পাবে, আর অনেক বড়ও হবে...কোনো ছোট ব্যাপারের মধ্যে আমি থাকি না। একটা কনস্ট্রাকটিভ প্রোগ্রাম করে আমাকে দাও, তারপর আবার ডিসকাশনে বসব।

আনন্দে মুখে কথা সরে না দীপেনের। সেই ফাঁকে প্রথম দফার গেলাস খালি তার। বেল্ টিপতে মনোহর এসে আবার তার গেলাস ভরে দিয়ে গেল।

—এবারে বাড়ির কথা বলো। তোমার স্ত্রীকে তো সেদিন দেখলাম, ছেলেপুলে কি?

—দুটি ছেলে। দুটোই ছোট—

—বাড়ির ওই পোরশান তোমার আর কমলের?

—হ্যাঁ। পিছনের পোরশান আরতির। ওটা সে ভাড়া দিয়েছে।

দীপেনের গেলাস আরো দু'বার ভরাট হবার ফাঁকে দেড় ঘণ্টা কাবার। তার মধ্যে বেশির ভাগ সময় কমলের প্রসঙ্গে কথা হয়েছে। দীপেনের মেজাজ তখন হাওয়ায় ভাসছে। এক কথা জিজ্ঞাসা করলে অন্তরঙ্গ আবেগে বহু কথা বলেছে। জয়ন্ত বোসের যা জানার আগ্রহ, জানা হয়েছে।

—কমলও বরাবর ভালো ছাত্রী ছিল। মা-বাবা দুজনেই মারা যেতে মেয়েটার মেজাজ-টেজাজ কি-রকম যেন হয়ে গেল। বাবার আদরে আদরে আগেও বেশ একরোখা ছিল। ইংরেজিতে ভালো অনার্স পেয়ে বি.এ. পাস করেছিল, এম.এ.-তেও ভালো রেজাল্ট করেছিল। দীপেন তখন ওর বিয়ের চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু তার আগে থেকে ওই সূর্যর সঙ্গে ভাব। সূর্য তখন কংগ্রেস করত। একটা প্রাইভেট কলেজের মাস্টারিতে ঢুকেছিল। কংগ্রেসের সঙ্গে বনিবনা না হতে দল ছেড়ে সে কংগ্রেসের শত্রু হয়ে বসল। তাই নিয়ে কমলের সঙ্গেও খিটিরমিটির বেধে গেল। এরপর চাকরি খুইয়ে সূর্য গেল জেলে, আর কমল নার্সিংহোমে।

—নার্সিংহোমে?

আলোচনার প্রসঙ্গ আবার বাঁক নিল।

—কমলের নার্ভ-টার্ভগুলো সর্বদা হাই-স্ট্রং। ভেবে ভেবে তুচ্ছ ব্যাপারগুলোও বড় করে তোলে। ফলে মেজাজ চড়েই থাকে। ওর বউদি তো ওকে ভয়ই করে, এমন কি দীপেনের বাচ্চা ছেলে দুটোও পিসির কাছে ঘেঁষে না। এদিকে রাতে ঘুম হয় না বলে ঘুমের ওষুধ খাওয়ারও কামাই নেই। এর ওপর সূর্যর সঙ্গে দেখা হলে দশ মিনিটের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি। মেয়েটা ওকে ছাড়তেও পারে না, আবার বরদাস্তও করতে পারে না। নার্ভ ব্রেকডাউন হবে না তো কি?

সূর্য জেলে যেতে তিনদিনের মধ্যে ওর নার্ভের এমন অবস্থা যে ডাক্তারের পরামর্শে নার্সিং হোমে নিয়ে যেতে হল। ...কেবল একবার নাকি? এ পর্যন্ত আরো দু'বার এই একই ব্যাপারে বিশদিন একমাস করে কমল হাসপাতালে থেকেছে। এক-একবার ক্যাবিনে থাকার খরচ কম নয়। বাবা ওর বিয়ের জন্য ভালো টাকাই রেখে গেছল, সে টাকা ওর নামেই আছে। তার থেকে কম করে কয়েক হাজার ওই হাসপাতালেই গেছে।

—সূর্য ওকে বিয়ে করছে না কেন?

—সূর্য বিয়ে করছে না, না কমল বিয়ে করছে না, কে জানে! মনে হয় কমলই বিয়ে করছে না, তবে সূর্যও কারো মন বুঝে চলার ছেলে নয়। তা ছাড়া ওর আছে কি যে'হুট করে বিয়ে করে বসবে! এক-একসময় তো মনে হয় কমল ওর মুখ দেখতেও চায় না। আবার নিজের নার্ভের অবস্থা জানে বলেই হয়তো অন্যত্র বিয়ে করবে কি করবে না ঠিক করে উঠতে পারে না।

খুব একটা তাড়াহুড়োর ব্যাপার কিছু নেই জয়ন্ত বোস বুঝে নিয়েছেন। কিন্তু ভিতরটা খুব শান্ত থাকছে না তাঁর। ভালো করে কাজ-কর্মেও মন দিতে পারছেন না। এ-রকম একটা আবেগ তাঁর মধ্যে জমাট বেঁধে ছিল নিজেও জানতেন না। এই আবেগের ফল শুভ হতে পারে না তিনি জানেন। কিন্তু এর ওপর তার কোনো হাত নেই। শুভ হোক আর অশুভ হোক, সেটা ভবিতব্য।

নতুন আশায় আর উদ্দীপনায় দীপেন গুপ্ত বাতাসে ভাসছে। ছ'মাসের মধ্যে তার দপ্তর আর প্রেসের ভোল বদলেছে। জলজ্যান্ত এক গৌরী সেনের নাগাল পেয়েছে আর তাকে ঠেকায় কে? জয়ন্ত বোসের পরামর্শ মতো 'নিরালা'য় শিল্প বাণিজ্য বিভাগের পত্তন হয়েছে। আর তারপর থেকে বড় বড় বিজ্ঞাপন যেন সেধে আসছে। পিছন থেকে কলকাঠি কে নাড়ছে তা অবশ্যই জানে। জানে কমল গুপ্তও। কিন্তু সে মুখে কিছু বলে না। দীপেন গুপ্ত প্রায়ই সন্ধ্যার পর এ-বাড়ি ছুটে আসে। প্রাণের কৃতজ্ঞতা উজাড় করে বিলিতি বোতলের রঙিন নেশায় টইটম্বুর হয়ে ফেরে।

কমল গুপ্ত একদিন অভিযোগ করেছিল, আপনার ওখানে গেলে দাদা বড় বেশি ড্রিংক করে ফেরে—

—দ্যাটস্ ব্যাড়। হি সুড'ন্ট।

—আপনি তাহলে অত-সব ঘরে মজুত রাখেন কেন? নিজে তো তেমন খান না শুনি।

জয়ন্ত বোস সকৌতুকে তার দিকে চেয়ে ছিলেন খানিক। ও-ভাবে চেয়ে থাকলে কমল গুপ্ত অস্বস্তি বোধ করে। মানুষটা যেন তাকে ছাড়িয়ে আর কিছু দেখেন। আর

কাউকে দেখেন। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'লিপ সার্ভিস' কাকে বলে জানো?

কমল গুপ্ত ইংরেজির ভালো ছাত্রী, কলেজে ইংরেজি পড়ায়। না জানার কারণ নেই। প্রশ্নটাই যা দুর্বোধ্য।

—আন্তরিকতাশূন্য সেবা?

হৃষ্ট মুখে মাথা নাড়লেন জয়ন্ত বোস। বললেন, এটা আন্তরিকতাশূন্য যুগ, হৃদয়শূন্য সমাজ। এ যুগে আর সমাজে অন্তরশূন্য সেবার কদর বেশি। আমি এই সেবার যোগানদার। সবটুকুই নিজের স্বার্থে করি, কিন্তু লোকে উল্টো ভাবে।

—কিন্তু দাদাকে দাঁড় করানোর মধ্যে আপনার কি স্বার্থ?

জবাবে জয়ন্ত বোসের চকচকে দু'চোখ আবার তার মুখের ওপর আটকে ছিল খানিক।—স্বার্থ তুমি। দীপেনের 'নিরালা' বড় হলে তুমি খুশি হবে, আর তুমি খুশি হলেই যেন আমার সেই রাঙা মা খুশি হবেন। রাঙা মায়ের ওপর আমার যত টান তত আক্রোশ—

কমল সচকিত একটু।—আক্রোশ কেন?

—আই ডোন্ট নো—তোমাকে দেখার পর তাঁকে খুশি করার জন্য আবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক জব্দ করার জন্য একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে ইচ্ছে করে আমার। এটা একটা বিপজ্জনক মজার রোগ বলতে পারো।

এ-সব কথা শুনেও কমল ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করে কেমন। আবার অভিভূতও হয়। ওই চাউনি বা এই গোছের অকপট আবেগের যেন একটা স্পর্শ আছে। ইচ্ছে করলেই এর থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

জয়ন্ত বোসের বাড়িতে এসে যশোধরাকে মাত্র একদিন দেখেছে, একদিনই কথা হয়েছে। আর সেদিনও স্ত্রীর সম্পর্কে মানুষটার সাদাসিধে মন্তব্য শুনে ভিতরে ভিতরে কেন যেন একটু বিচলিত হয়েছে।

কমল বাড়িতে গৃহিণীর খোঁজ করতে জয়ন্ত বোস যশোধরাকে ঘরে ডেকে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, খুব ছেলেবেলায় মায়ের সঙ্গে আমি যে বাড়িতে থাকতুম, সেই বাড়ির মেয়ে—

এমন জাঁদরেল পুরুষের স্ত্রী এরকম সাদামাটা হবে কমল ভাবেনি। যশোধরা সকৌতুকে নিরীক্ষণ করেছেন ওকে একটু। তারপর স্বামীর দিকে ফিরে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেছেন, তোমার রাঙা মায়ের মেয়ে?

জয়ন্ত বোস থমকেছেন একটু। রাঙা মায়ের গল্প যশোধরার কাছে কখনো করেছেন বলে মনে পড়ছে না। মাথা নেড়েছেন, অর্থাৎ তাই। তারপর জিজ্ঞাসা করেছেন, রাঙা মায়ের কথা তুমি জানলে কি করে?

—ও মা, দাদার কাছে কত শুনেছি! ছেলেবেলায় হস্টেলে এসে দিন-রাত দাদার কাছে তো তুমি কেবল রাঙা মায়ের গল্পই করতে! দাদা বলত, রাঙা মায়ের কাছ-ছাড়া না হলে তুমি অন্য মানুষ হতে।

যশোধরাকে খুব খুশি চিত্তে ঘরে ডাকেননি তিনি। কিন্তু এ-কথাগুলো শোনার পর মনে মনে অখুশি নন। অলক্ষ্য কিছু সুপারিশের কাজ হল যেন।

অভ্যস্ত সৌজন্যে কমল উঠে দাঁড়িয়েছিল। অন্তরঙ্গ হাসিমুখে যশোধরা তাকে হাত ধরে বসিয়েছেন। সরল কৌতূহলে বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। একরাশ জলখাবার এনে জোর করে অনেকটা খাইয়েছেন। আর তারপর কলেজের মাস্টারি করে শুনে থতমত খেয়ে বলেছেন, এই জন্যেই আমি যত বেশি কথা বলছি উনি তত চুপ—

উনি বলতে জয়ন্ত বোস। তিনি চুপচাপই ছিলেন।

একটু বাদে কাজের অজুহাতে যশোধরা উঠে চলে গেছেন। কমল বলেছে, আপনার স্ত্রীকে খুব ভালো লাগল।

জবাবে যা শুনল তাতেও অস্বস্তি। চুপচাপ আবার একটু মুখের দিকে চেয়ে থেকে ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত সুরে জয়ন্ত বোস বলেছেন, সী ইজ সিম্পল, তাই অনেকেরই ভালো লাগে, বাট আনফরচুনেটলি আই অ্যাম ডিফারেন্ট, আমার জীবনে তাঁর খুব একটা অস্তিত্ব নেই, সেটা তিনিও জানেন..ইট্ মে লাস্ট...ইট্ মে নট্...

কমল গুপ্ত এ-প্রসঙ্গে আর কথা বাড়ায়নি। বেশিক্ষণ আর বসেও থাকতে পারেনি। ওই চাউনির স্পর্শ যেন আরো বেশি ছেঁকে ধরেছে তাকে।

শুধু দীপেন গুপ্ত নয়, ওদের জ্যাঠতুতো বোন আরতি আর ব্রিজেশ ধরকেও অনায়াসে কাছে টেনে নিয়েছেন জয়ন্ত বোস। ব্রিজেশ ধর তখন উঠতি অ্যাটর্নি। পেশার দিক থেকে এটা তার কাছে লোভনীয় যোগাযোগ। প্রথমে দীপেন ওদের নিয়ে এসেছে। অন্তরঙ্গ অভ্যর্থনা মেলার ফলে নিজেরাই তারপর যাতায়াত শুরু করেছে। আরতির গানের গলা সত্যিই ভালো, দীপেনের উৎসাহে শুরু থেকেই গানের আসর জমেছে। আরতি ধর কমলের মতো নয়, তার ঠোঁটে যেমন হাসি, প্রত্যাশার উক্তিও তেমনি সাদাসাপটা। দু-চার সন্ধ্যা গানের আসর জমে ওঠার পরেই হাসিমাখা অনুযোগের সুরে বলেছে, আপনার কাছে রাঙা মায়ের মেয়েই সব—আমরা কিছু না।

জয়ন্ত বোসও হালকা প্রতিবাদ করেছেন, রাঙা মায়ের ভাসুর-ঝিও আমার কাছে কম নয়, কি করতে হবে বলো।

—আপনি গানের এত প্রশংসা করলে কি হবে—কোথাও তো সেরকম পাত্তা পাই না। ধরা-করার লোক না থাকলে আজকাল কিছু হয়?

এর পর অনায়াসে ছোট বৃত্ত থেকে বড় বৃত্তে পা ফেলতে পেরেছে আরতি ধর। ছ'মাসের মধ্যে তার একাধিক গান রেকর্ড হয়েছে, অভিজাত মহলের গানের আসরে তার ডাক পড়েছে। যোগ্য মর্যাদাও মিলেছে।

অতএব আরতি ধরের বিবেচনায় এই মানুষ শক্তির প্রতীক। খুশি এবং অনুগত ব্রিজেশ ধরও। এই লোকের আইনগত অনেক কাজ এখন তার দপ্তরে আসছে। আর প্রাপ্য টাকা-পয়সা মিটিয়ে দেবার ব্যাপারেও এই মানুষ অনুদার নন। ফলে এই ব্যক্তিত্বের কাছে সর্বদাই তার মাথা নিচু।

কিন্তু প্রবল পুরুষটি এক দুর্বোধ্য সমস্যার মতো হয়ে উঠেছেন শুধু কমল গুপ্তর কাছে। যে ব্যক্তিত্ব নিয়ে কাছে এসে দাঁড়ান, চাইলেই তাঁকে ঠেলে সরানো যায় না। কারণ, আসাটা ছ'বছরের শিশুর কোনো অতি প্রিয় হারানো জনের কাছে আসার তাগিদের

মতোই। কমল ভেবে পায় না এ-রকম কেন হয়। ভিতরে ভিতরে একটু চাপা উদ্বেগও আছে। ভদ্রলোকের মা এই বাড়িতেই আত্মহত্যা করেছেন। তারপর ছ'বছরের এক শিশুকে এখানকার আশ্রয় ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে।...অথচ ভদ্রলোক বলেছেন, তার মা বা আর কেউ তাঁদের ওপর কোনো অবিচার করেনি। তাহলে এ-রকম হয় কি করে? রাঙা মায়ের প্রতি মানুষটার যত আকর্ষণ, ততখানি অভিমানও পুঞ্জীভূত কিনা, তাও বুঝতে পারে না।

জয়ন্ত বোসের আচরণে রাখা-ঢাকা ব্যাপার নেই কিছু। নিজের কাজে মন দিতে না পারলে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন। তারপর হঠাৎ টেলিফোন তুলে নেন। খুব দেখতে ইচ্ছে করছে, তুমি আসবে না আমি যাব?

এই ইচ্ছে নাকচ করা সহজ নয়। ওধার থেকে কমল হেসেই জিজ্ঞাসা করে, আমাকে না আপনার রাঙা মাকে?

—তোমাকে দেখলে তবে তাঁকে দেখা যায়।

কমল আসে না বড় একটা। তাঁকেই যেতে হয়। এসে বড় জোর দশ-পনের মিনিট বসেন। উচ্ছ্বাস নেই, মুখে বেশি কথা নেই। অস্বস্তি কাটানোর জন্য কথা তখন কমলকেই বেশি বলতে হয়। তিনি শোনেন, হাসেন অল্প-অল্প। তারই ফাঁকে হঠাৎ যেন কোন অতীতে উধাও হয়ে যান। আত্মস্থ হয়ে হেসেও ওঠেন আবার। তারপর উঠে চলে যান। আসাটা যেমন নিজের খেয়ালে, হঠাৎ উঠে চলে যাওয়াটাও তেমনি নিজের খেয়ালে। এরই মধ্যে কোনো কোনো দিন সূর্য রায় এসে উপস্থিত হয়। এই মানুষ তখনো বিরক্তি গোপন করতে পারেন না। সে আসার দু-পাঁচ মিনিটের মধ্যে উঠে চলে যান। ফলে কমল গুপ্তর অস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে। তার ওপর সূর্য রায় টিকাটিপ্পনী কাটতে ছাড়ে না। সামান্য থেকে কখনো কখনো তুমুল ঝগড়া হয়ে যায় দুজনের। মনের তলায় একটা অজানা অস্বস্তি সত্ত্বেও জয়ন্ত বোসকে কখনো ছোট করে দেখতে পারে না কমল গুপ্ত। বরং মনে হয় ওই প্রবল ব্যক্তিত্বের মধ্যে সত্যিই যেন এক তৃষ্ণার্ত ছ'বছরের শিশু আশ্রয় নিয়ে বসে আছে। তাই সূর্য রায়ের আচরণও তার বরদাস্ত হয় না। নাক উঁচু সূর্য রায়ের কাছে এসব লোকের এতটুকু বাড়তি কদর নেই। শুধু জয়ন্ত বোস কেন, কমল জানে দলের হোমরা-চোমরাদের ছাড়া তেমন সম্মানের চোখে এরা কাউকেই দেখে না।

একদিন ওদের দুজনের এক তুমুল ঝগড়ার খবর কানে এলো জয়ন্ত বোসের। এলো দীপেন গুপ্তর মারফৎ। দীপেন খোলাখুলি কিছু বলতে চায় নি। কথায় কথায় বিরক্ত মুখে আভাস শুধু দিয়েছিল। জয়ন্ত বোস জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কমলের খবর কি? জবাবে দীপেন বলেছিল, আছে এক-রকম, মনে শান্তি নেই...সূর্যটা বড় বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করেছে, ও-সব নোংরা কথা আপনার শুনে কাজ নেই দাদা—কমলের সঙ্গে আজ তুমুল হয়ে গেছে।

জয়ন্ত বোসের স্নায়ু সজাগ। তক্ষুনি মনে হল, সূর্যর বাড়াবাড়ি বা নোংরা কথা বা তুমুল হওয়ার সঙ্গে তিনিও যুক্ত। তখনই ফিরে আর কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। সুরা-মাহাত্ম্য ভালোই জানেন। সদয় মুখে 'নিরালা'র খোঁজখবর নিলেন, আরতি আর

ব্রিজেশ ধরের কুশল বার্তা নিলেন। দীপেনের তৃতীয় গেলাসের পর চতুর্থ গেলাস হাজির হতে হালকা কৌতুকে সূর্য আর কমলের তুমুলের প্রসঙ্গে ফিরলেন আবার।

দীপেনের বুকের তলায় তখন খোলা সমুদ্রের ঢেউ। সেই ঢেউ সগর্জনে সূর্য রায়ের মাথার ওপর ভেঙে পড়তে চাইল। তার এত দুঃসাহস যে দাদার মতো অর্থাৎ জয়ন্ত বোসের মতো মানুষের মধ্যেও খারাপ অভিসন্ধি দেখে, তাঁর এত টানের পিছনে মতলব খোঁজে। এতবড় বুকের পাটা ওর যে কমলের মুখের ওপর বলে কিনা তোমার রাঙা মায়ের ওপর ভদ্রলোকের অত টান ইডিপাস কমপ্লেক্স গোছের ব্যাপার, সেটা এখন আরো জোরালো হয়ে তাঁর মেয়ের দিকে গড়িয়েছে। কমল এরপর বাড়ি থেকে প্রায় অপমান করেই তাড়িয়েছে তাকে। কিন্তু দীপেনের ধারণা আবার ঠিক একদিন এসে হাজির হবে সে, কারণ লোকটার মান অপমান জ্ঞানও নেই।

জয়ন্ত বোসের মুখে কৌতুকের ছায়া। কিন্তু মনে মনে ওই সূর্য রায়ের প্রশংসাই করছিলেন তিনি। কমলকে ওই সব কথা যখন বলেছে, মাথায় সাদা পদার্থ কিছু আছে বলতে হবে।

কথায় কথায় দীপেন আরো বলর্ল, এমনিতেই কমলের মেজাজপত্র ভালো নয়, খুব আশা করেছিল বাইরে যাওয়ার স্কলারশিপটা ও পাবে, তার জন্য ধরা-করাও কম করেনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেল না।...পেলে ভালো হত, দেড়-দু'বছরের জন্য বাইরে চলে গেলে বোনের সূর্য-জ্বরটা হয়তো ছেড়ে যেত। আর নার্ভ-টার্ভগুলোও হয়তো ইমপ্রুভ করত।

নিজের অগোচরে কোন ইন্ধন জুগিয়ে বসল তার ধারণা নেই। ভিতরটা এবারে সত্যিই উৎসুক হয়ে উঠল জয়ন্ত বোসের।—বাইরে যাওয়ার স্কলারশিপ মানে কোথায় যাওয়ার?

—কেমব্রিজ।

—কি স্কলারশিপ?

—হায়ার এডুকেশনের জন্য সব খরচ-খরচা দিয়ে মাঝে মাঝে এক-আধজনকে তো পাঠানো হয়—সেই গোছের কি একটা চেষ্টা করছিল।

—কলেজের চাকরি ছেড়ে দিত?

—তা কেন, হায়ার এডুকেশন লীভ-এ যেত, তাছাড়া এক্সচেঞ্জ অ্যারেঞ্জমেন্টও হয়, এ-দেশ থেকে একজন গেল, তার বদলে ও-দেশ থেকেও একজন এলো।

জয়ন্ত বোসের মাথায় দ্রুত কিছু চিন্তা খেলে গেল।—কমলের যাবার ইচ্ছে খুব?

—খুব। হবে ভেবে ও তো পা বাড়িয়েই ছিল।

আর কথা বাড়ালেন না জয়ন্ত বোস। দীপেনকে বিদায় দিয়ে ঘরের এ-মাথা ও-মাথা পায়চারি করে নিলেন খানিক। ঠোঁটে হাসি, চোখের কোণেও হাসি চিকচিক করছে। কমলের সূর্য-জ্বর ছাড়ানোর একটা ভালো দাওয়াইয়ের সন্ধান দিয়ে গেল দীপেন গুপ্ত। এ-দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করাটা তাঁর কাছে জল-ভাত ব্যাপার। এক অভিজাত আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ক্লাবের এখানকার শাখার তিনি একজন গণ্যমান্য সভ্য। সেবা আর শিক্ষার খাতেও এই ক্লাব বছরে বহু টাকা খরচ করে থাকে। আর উচ্চ শিক্ষার

জন্যও এই ক্লাবের দাক্ষিণ্যে অনেকেরই বাইরে থেকে ঘুরে আসার নজির আছে। ক্লাবের সকলের সঙ্গেই তাঁর বিশেষ খাতির। একটু তৎপর হলে এ-ব্যবস্থা তিনি অনায়াসে করতে পারবেন।

কমলের সূর্য-জ্বর ছাড়ানোর জন্যেই শুধু নয়, জয়ন্ত বোসের নিজেরও কিছুটা ঢালা সুস্থ অবকাশ দরকার। সেই গোড়া থেকে অর্থাৎ কমলকে দেখার পর থেকেই ভিতরটা তাঁর সুস্থ নেই। নিজের কাজ-কর্মেও ভালো করে মন দিতে পারছেন না। মনের এই অবস্থার সঙ্গে কোনোকালে আপোস নেই তাঁর। তড়িঘড়ি কিছু একটা করে বসার বাসনা। কিন্তু সেটা যে চরম নির্বুদ্ধিতা হবে তাও বেশ বোঝেন। রাঙা মায়ের ওই মেয়ের ধাত আলাদা। তার থেকে তাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করার যে সুযোগ যেচে এসেছে সেটা আঁকড়ে ধরাই বুদ্ধিমানের কাজ।

ক্লাবের স্থানীয় প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলে এক সপ্তাহের মধ্যেই ব্যবস্থা মোটামুটি পাকা করে ফেললেন। ইতিমধ্যে দীপেনের মুখে আরো একটা সুখবর পেলেন। জয়ন্ত বোসের বিবেচনায় এও সুখবরই। সূর্য রায় পশ্চিম বাংলা ছেড়ে উধাও হয়ে গেছে কোথায়। কমলকে নাকি জানিয়ে গেছে মাস ছয়েকের আগে ফিরবে না।

দীপেন বলেছে লোকটা এই রকমই খামখেয়ালি। কিন্তু জয়ন্ত বোস তা ভাবেন না। তাঁর ধারণা, হঠাৎ এভাবে উধাও হবার কারণ দেশের, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি। অনেক দিন আগেই এখানে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হয়েছে। দিল্লীর মদত পেয়ে স্থানীয় কংগ্রেস জোরদার হয়ে উঠেছে। বিপক্ষ দলের অনেককে ধরে ধরে বিনা বিচারে জেলে-পোরা হচ্ছে। সূর্য রায়ও হয়তো সেই কারণে গা-ঢাকা দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেছে।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার আরো দুটো বছরও কাটল। জয়ন্ত বোসের বয়স এখন সাতচল্লিশ। কিন্তু শেষের ক'টা দিন আবার সাতাশ বছরের ছেলের মতোই অধীর উন্মুখ তিনি।

কেমব্রিজের ডিপ্লোমা পাবার পর কমল গুপ্ত মাস কতক বিদেশে চাকরি করেছে। তারপর কয়েকটি দেশ দেখা সেরে আবার কলকাতার মাটিতে পা ফেলেছে।

দু'বছর আগে তার দু'চোখে কৃতজ্ঞতা উপচে পড়তে দেখেছিলেন জয়ন্ত বোস। রওনা হবার আগে পর্যন্ত কমল গুপ্ত যেন এই ভাগ্য বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি। বিদেশ থেকে দু-তিন মাস অন্তর একখানা করে চিঠি লিখত, তারও প্রতিটিতে কৃতজ্ঞতার ছোঁয়া লেগে থাকত। শেষের দিকের একটা চিঠিতে লিখেছিল, আপনার মতো এ-রকম মানুষ আমি সত্যি আর দেখিনি।

এ-ধরনের চিঠি পেলে জয়ন্ত বোস খুব যে খুশি হতেন তা নয়। এসব লিখে কমল গুপ্তর যেন কিছু একটা সংশয় কাটানোর চেষ্টা। শেষের দিকের ওই চিঠির জবাবে তিনি লিখেছিলেন, আমি কেমন মানুষ ঠিক-ঠিক জানতে রাঙা মায়ের মেয়ের আরো কিছু বাকি। তার আগে ও-দেশের বাস্তব মানুষগুলোকে একটু দেখে আসতে চেষ্টা করো, তাতে আর কিছু না হোক নিজের স্নায়ুর ওপর দখল বাড়বে।

কিন্তু দু'বছর বাদে কমল গুপ্তকে দেখে জয়ন্ত বোসের প্রথমেই মনে হয়েছে, যে

গেছল সে-ই ফিরে এসেছে, খুব একটা তফাৎ হয়নি। তবে স্বাস্থ্য কিছু ফিরেছে, মুখের ফ্যাকাশে ভাব গিয়ে বেশ তাজা দেখাচ্ছে।

বাড়িতে পা দিয়েই সূর্য রায়ের খবর শুনেছে কমল। জয়ন্ত বোস বলেননি, তার দাদার মুখে শুনেছে। পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের জোরালো শাসনের সূচনা তার বিদেশ যাত্রার আগের ব্যাপার। আজ দেড় মাস হল সূর্য রায় জেলে। কমল ফিরে আসছে বলে দীপেন আগেভাগে তাকে আর চিঠি লিখে কিছু জানায়নি।

কমলের ফর্সা মুখে বিরক্তির ছায়া লক্ষ্য করেছেন জয়ন্ত বোস। ও বলেছে, জানা কথাই তো, এতদিন বাইরে ছিল, সেটাই আশ্চর্য।...কোথায় আছে?

দীপেন জানে না, কোথায় বা কোন জেলে আছে। এখন আটক হওয়ার মানেই বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের ব্যাপার। জয়ন্ত বোস বলেছেন, কোথায় আছে জেনে দিতে পারি, খবর নেব?

কমল বলেছে, থাক, কি হবে জেনে!

সেই দিন। কমল গুপ্ত কি জানত এই সন্ধ্যায় কিছু একটা ঘটে যাবে? নইলে টেলিফোনটা পেয়েই সে এমন চমকে উঠেছিল কেন? ভাদ্রের শেষ সেটা। সমস্ত দিন গুমোট গরম গেছে। বিকেলে ঝিরঝির বাতাস বইছিল। কিন্তু সেই বাতাসে কি আসন্ন কিছুর কানাকানি ছিল? ষড়যন্ত্র ছিল?

বউদি তখন ছেলেপুলে নিয়ে 'নিরালা' আপিসে। প্রায় রোজ বিকেলেই যায়। দাদাকে একটু-আধটু সাহায্য করে। কমল গা ধুয়ে সামান্য প্রসাধন সেরে ফুল-স্পিড পাখার নিচে বসেছিল। ভাবছিল, ছাদের খোলা হাওয়ায় একটু হেঁটে আসবে।

টেলিফোন।

—কি করছ?

—কিছু না। বসেছিলাম...

—আমি আসছি।

মুখ দিয়ে কেন যেন অসত্য উক্তি বেরিয়ে এলো, একটু বেরুব ভাবছিলাম...।

—কোথায়?

কমল নিরুত্তর।

ওদিক থেকে ভারী গলার আবার দুটো কথা, আমি আসছি। রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ।

এই ক'দিনের মধ্যে জয়ন্ত বোস আরো এসেছেন, বসে থেকেছেন খানিক, কমল কিছু জিজ্ঞাসা করলে টুকটাক জবাব দিয়েছেন। তারপর উঠে চলে গেছেন এক সময়। অনেকটা আগের মতোই। কিন্তু আগের থেকে তফাৎ যে কত, কমল গুপ্ত সেটা অনুভব করতে পারে শুধু। তার নিজের দুটো চোখের ভিতর দিয়ে ওই মানুষের একটু একটু করে হারিয়ে যাওয়াটা যেন একটা স্পর্শের মতো ছেঁকে ধরে থাকে তাকে। চেষ্টা করেও কমল নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে না। চেষ্টা করার শক্তিটুকুও যেন দিনে দিনে কমে আসছে তার।

জয়ন্ত বোস এলেন। বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠল বলেই মুখে একটা কঠিন আবরণ নেমে এলো কমল গুপ্তর। নিজের দুটো চোখের ভিতর দিয়ে এই লোকের হারিয়ে যাওয়াটা আজ সে বরদাস্ত করতে চায় না।

জয়ন্ত বোসের চাউনি তেমনি গভীর তেমনি নিঃসংকোচ। জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় বেরুবে ভাবছিলে?

চেয়ে আছে কমলও। কিছু বুঝতে দেবার জন্য মুখ দিয়ে এবার সত্যি কথাই বেরুলো।—কোথাও না।

জয়ন্ত বোসের চুরুট-খাওয়া ঠোঁটের ফাঁকে হাসির মতো দেখা গেল একটু। আবার মিলিয়েও গেল। চাউনি আরো গভীর। বললেন, আই নো, তোমার অস্বস্তি আমি বুঝতে পারি, বাট আই কান্ট হেলপ!

ঘরের চারদিকে তাকালেন। পায়চারি করলেন একটু। তারপর কি মনে হতে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা এই ঘরটাকে ঠিক রাঙা মায়ের আগের সেই পুজোর ঘরের মতো করে সাজিয়ে রাখা যায় না?

সত্যিই ছ'বছরের ছেলের আকৃতি দেখছে কি না কমল জানে না।—আপনি পুজো আর্চা পছন্দ করেন?

—একেবারে না। কিন্তু এই ঘর আছে অথচ সেই ছবিটা নেই—এ আমার ভালো লাগে না।

কমল হাসল এবার।—সেই ছবি পেতে হলে তো ঠাকুরঘর সাজিয়ে আপনার রাঙা মায়ের মতো আমাকে আবার পুজোর সাজ করতে বসতে হয়!

জয়ন্ত বোস জবাব দিলেন না। কিন্তু তাঁর চোখে মুখে সেই দৃশ্য দেখার লোলুপতাই দেখল যেন কমল গুপ্ত।

চুপ করে তেমনি আরো খানিক চেয়ে থেকে অস্ফুট গম্ভীর স্বরে জয়ন্ত বোস ডাকলেন, এসো—

কোথায় যেতে হবে কমল বুঝল না। ধীর পায়ে তাঁকে ঘর থেকে বেরুতে দেখল। পায়ে পায়ে কমল দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।...সিঁড়ির দিকে এগোতে দেখল। তারপর তিন তলার সিঁড়ি ধরে ছাদের দিকে।

কমল কি করবে চট করে ভেবে পেল না। ছাদের ওই ভাঙাচোরা ঘরটার সঙ্গে অনেক দিন একটা রহস্যের যোগ খুঁজেছে সে। এক মহিলার আত্মঘাতিনী হবার সঙ্গে আর ছ'বছরের একটা ছেলের এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সঙ্গে তার মায়ের কোনো সম্পর্কই নেই, ভদ্রলোক বললেও ভিতর থেকে সেটা সে মেনে নিতে পারছে না।

আজ সেই রহস্য অনাবৃত হবে?

পায়ে পায়ে সে-ও ছাদে না উঠে এসে পারল না। একটা অমোঘ আকর্ষণে কেউ যেন টেনে নিয়ে গেল তাকে।

...জয়ন্ত বোস ওই ভাঙা পড়ো ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে। আকাশ ভরা জ্যোৎস্না। তাঁর থমথমে মুখ দেখা যাচ্ছে। নিঃশব্দে এগিয়ে কমল তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

একটু বাদে জয়ন্ত বোস ফিরলেন। মৃদু গম্ভীর স্বরে বললেন, এ-ঘরটাকেও ঠিক

আগের সেই চেহারায় ফিরিয়ে আনা যেতে পারে—আমার সব মনে আছে।

কেন যেন অস্বস্তি বাড়ছেই কমল গুপ্তর। সহজ মুখে সেটুকু ঝেড়ে ফেলার তাগিদ। বলল, চেহারা ফিরলেও আর তো কিছু ফিরবে না—

কথাগুলো যেন একটা ভিতরের আকৃতি দিয়ে নাকচ করলেন জয়ন্ত বোস।—সব ফিরবে। তুমি বললেই সব ফিরবে!

চাঁদের আলোয় মানুষটার মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সেই মুখের দিকে চেয়ে কি জবাব দেবে কমল ভেবে পেল না। ভিতর থেকে এখনো সহজ হবার তাগিদ। বলল, এ-বাড়ির অর্ধেক আমার, বাকিটা দাদার—শুধু আমি চাইলেই হবে কি করে?

তেমনি চাপা অথচ গভীর আবেগে জয়ন্ত বোস বলে উঠলেন, এ-বাড়ির যা কিছু সব রাঙা মায়ের, তাই রাঙা মায়ের মেয়ে ছাড়া এতে আর কারো কোনো ভাগ থাকবে না—সে ব্যবস্থাও হবে, আর তার জন্য তোমার এতটুকু খেদ যাতে না থাকে সেই ব্যবস্থাও হবে। তুমি চাইলেই সব হবে।...কিন্তু আমার কি হবে?

বড়সড় একটা ধাক্কা খেল যেন কমল। মানুষটার আকৃতিভরা মুখ আরো সামনে ঝুঁকেছে। নিজের অগোচরে কমল একটু পিছিয়ে যেতে চাইল। পারা গেল না। দুটো হাত তার দুই কাঁধের উপর উঠে এসেছে। মুখ আরো সামনে ঝুঁকেছে। কাঁধের ওপর হাতের আঙুলগুলো আরো একটু চেপে বসেছে। সেই অবুঝ আবেগ এখন চশমার ওধারের দুই চোখে উপচে উঠেছে। বলে উঠলেন, এই তিন বছর তুমি আমার ভাবনা চিন্তা কেড়ে নিয়েছ, বাইরে পাঠিয়েও তোমাকে একটা মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারিনি, আমার রাতের ঘুম গেছে, দিনের কাজ গেছে—এখন তুমি বলো আমার কি হবে?

স্নায়ু যেমনই হোক নিজের মেজাজী ব্যক্তিত্বের ওপর আস্থা ছিল কমলের। কিন্তু এই মুহূর্তে হঠাৎ যেন ভয়ানক অসহায় মনে হল নিজেকে। এই সান্নিধ্য, কাঁধের ওপর দুটো চাপ-ধরা হাতের স্পর্শ, চুরুটের গন্ধ-ছোঁয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের স্পর্শ আর সব থেকে বেশি ওই দুটো আকৃতিমাখা চোখের স্পর্শ যেন সর্বাঙ্গ ছেঁকে ধরছে তাকে। প্রাণপণে নিজেকে টেনে তোলার চেষ্টা। তবু ওই দুটো চোখ থেকে নিজের চোখ সরানো যাচ্ছে না।

—আপনি কি চান?

—আমি তোমাকে চাই। আমি রাঙা মায়ের মেয়েকে চাই। তোমাকে দেখার পর থেকেই আমি জানি শুধু তোমাকে ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু আমার চাইবার নেই!

—কিন্তু আপনার সংসার আছে, স্ত্রী আছে ছেলে আছে—

উষ্ণ পুরু দুই ঠোঁটের অবরোধে কথা থেমে গেল। কাঁধের দু'হাত পিঠ বেষ্টন করে বুকের ওপর টেনে নিয়ে এলো তাকে। প্রাণপণে বাধা দিতে চাইল কমল গুপ্ত, কিন্তু নিবিড় আকর্ষণে আর উষ্ণ-ঘন দুই ঠোঁটের নিবিড় তাড়নায় এক পুরুষ যেন সত্তাসুদ্ধু দখল করে নিচ্ছে। তার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসছে।

আস্তে আস্তে মুখ তুললেন জয়ন্ত বোস একসময়। বাহুর আকর্ষণ তেমনি অটুট। ঈষৎ অসহিষ্ণু চাপা গলায় বলে উঠলেন, আমার কেউ নেই, আমার কিচ্ছু নেই! সেই ছ'বছর বয়েস থেকে আমি একলা একটা কবরের তলায় সেঁধিয়ে ছিলাম—তুমি আমাকে

টেনে তুলেছ। তুমি বললেই যারা আছে তারা আর থাকবে না—সেটা যাতে সহজ হয়, অসুন্দরও না হয়, তাও দেখব—তুমি বলো, তুমি কথা দাও। সে ইয়েস!

ঠোঁটের ওপর আবার সেই উষ্ণ-ঘন সব-খোয়ানো স্পর্শ। এমনি অবুঝ অমোঘ আকর্ষণেই মানুষটা যেন কথা টেনে বার করে নেবে!

...সে ইয়েস—

...সে ইয়েস!

...সে ইয়েস!

ওই একই দুটো কথার ফাঁকে ফাঁকে মানুষটা তাকে বার বার স্বীকৃতি আদায়ের কোন অতল বিস্মৃতির মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে জানে না। এর থেকে কমল গুপ্তর আর বুঝি নিষ্কৃতি নেই।

...সে ইয়েস!

কমল গুপ্ত কি হ্যাঁ বলেছে? মাথা নেড়ে সায় দিয়েছে? জানে না কি করেছে।

বাহুর বাঁধন ঢিলে হল আস্তে আস্তে।

জয়ন্ত বোস সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। বুক ঠেলে বড় একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো, অস্ফুট স্বরে বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ...।

নিজের দুটো পায়ের ওপর আর দাঁড়িয়ে থাকাও সহজ হচ্ছে না কমল গুপ্তর। ওই লোকই এক হাতে তাকে আগলে নিয়ে সিঁড়ি ধরে দোতলায় নেমে এসেছে। তেমনি করেই ঘরে নিয়ে এসেছে। বিছানায় বসিয়ে দিয়েছে। কমল গুপ্তর সর্বাঙ্গ কাঁপছে থর থর করে। শরীরটা বিছানায় এলিয়ে পড়তে চাইছে।

ওই দুর্বার পুরুষ সামনে দাঁড়িয়ে। অপলক দুই চোখ কমল গুপ্তর মুখের ওপর। ঘরের খোলা দরজা দুটো এবারে বন্ধ হবে কিনা কমল জানে না। হলেও তার যেন কিছুই করার নেই। মৃত্যুর মতোই যেন একটা রুদ্ধ প্রতীক্ষা নিয়ে সে-ও চেয়েই আছে।

—ডোন্ট বি অ্যাফরেড।...অ্যান্ড ডোন্ট ওয়ারি।

জয়ন্ত বোস ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

একজন বিশ্বস্ত উকিলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তিন দিনের মধ্যে যশোধরাকে ঘরে ডেকে খুব ঠাণ্ডা মাথায় নিজের বক্তব্য জানিয়ে দিলেন জয়ন্ত বোস। যশোধরার বুঝতে সময় লেগেছিল। বোঝার পর ঘরের সাদা আলোয় সমস্ত মুখ কিছুক্ষণের জন্য অন্তত বিবর্ণ হয়ে গেছল। সেই সময়টুকুর জন্যেই অস্বস্তি বোধ করেছিলেন জয়ন্ত বোস, আবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন। এতকাল বাদে এই মহিলার ওপর তিনি সুবিচার করছেন না, এ তাঁর থেকে ভালো আর কেউ জানে না। এই কারণেই অস্বস্তি। আবার যা বলছেন তার অন্যথা হবার নয় বলেই অসহিষ্ণুতা।

সাদাসাপটা বক্তব্য তাঁর। তিনি অন্যত্র বিয়ে করতে যাচ্ছেন। তাই ডিভোর্স চান। উকিলের সঙ্গে সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। শিগগীরই স্যুট ফাইল করা হবে। এটা যত সহজে আর বিনা বাধায় হয়ে যায় দুজনার পক্ষে তত মঙ্গল। কারণ সে-ক্ষেত্রে যশোধরা বা ছেলেদের সমস্ত দায়দায়িত্ব তাঁরই। যশোধরা ঠিক থাকলে কেউ কোনোরকম ব্যতিক্রম

টেরও পাবে না। কেবল তিন তলায় তার জন্য পৃথক বাসের ব্যবস্থা করতে হবে। যে আসছে এ-বাড়িতে তার এ-ব্যবস্থা পছন্দ না হলেও যশোধরাকে কোনোরকম অসুবিধেয় পড়তে হবে না, সে-ক্ষেত্রে জয়ন্ত বোসই অন্যত্র চলে যাবেন। কিন্তু সে সবই পরের কথা। ডিভোর্স স্যুট ফাইল করা হবে জয়ন্ত বোসের টালিগঞ্জের ব্যবসা-বাড়ির ঠিকানা থেকে। বিচ্ছেদের কারণ হিসেবে তাতে স্ত্রীর বিরুদ্ধে অনেকগুলো অভিযোগও থাকবে। তা ভিন্ন ডিভোর্স হয় না বলেই সেটা করতে হবে। যশোধরার তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই, এমন কি সে সব পড়ে দুঃখ পাওয়ারও দরকার নেই। কোর্ট থেকে ডাক পড়লে হাজিরা দেবার দরকার নেই। মুখ বুজে চুপচাপ ঘরে বসে থাকলেই ফুরিয়ে গেল। ...তবে যশোধরা যদি কনটেস্ট করতে চায় সেটা আলাদা কথা।

সব শোনা আর বোঝার পরেও যশোধরা নির্বাক। জয়ন্ত বোস তাতেও অসহিষ্ণু। বললেন, শোনো, এটা চুপ করে থাকার বা কোনোরকম মান অভিমান নিয়ে বসে থাকার সময় নয়। যা হতে যাচ্ছে আর হবে তাই তোমাকে জানালাম। এখন তোমার কিছু বলার বা করার আছে কিনা সে-ও আমার স্পষ্ট করে বুঝে নেওয়া দরকার।

তবু চুপচাপ যশোধরা খানিক চেয়ে চেয়ে দেখেছিলেন মানুষটাকে। তারপর ফিরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এতকাল দেখার পর আমার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?

—তোমার সম্পর্কে আমার ধারণা বদলাবার কোনো কারণ ঘটে নি। সবটাই আমার নিজের চরিত্রের দোষ, স্বভাবের দোষ। এর ওপর আমার কোনো হাত নেই। তুমি যা ছিলে তাই আছ, আর তেমনি থাকবে বলেই তোমাকে আমি এ-বাড়ি থেকে সরাবার কথা ভাবছি না। কাগজে কলমের ডিভোর্সটুকু শুধু মেনে নিলে আর কোনো ব্যাপারে তোমাকে এতটুকু ডিসটার্ব করার আমার ইচ্ছে নেই। আমি বরং চাই এটুকু মেনে নিয়ে তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকো।

ধাক্কাটা সামলে নিয়েছেন যশোধরা। জিজ্ঞাসা করেছেন, বাসু না হয় ছোট, কিন্তু বীরু বড় হয়েছে—সে জানবে না?

—এর মধ্যে লুকোচুরির ব্যাপার কিছু নেই, যখন সময় হবে তখন জানবে, এখন জানানোর দরকার কি? তাছাড়া সে এটা কতটা সহজভাবে নেবে তাও তোমার ওপর নির্ভর করে। তুমি এটা বড় কিছু অঘটন না ভাবলে সে ভাবতে যাবে কেন?...আমার মধ্যে রাখা-ঢাকার ব্যাপারে কিছু নেই বলেই আর একটা সম্ভাবনার কথাও তোমাকে খোলাখুলি বলতে পারি। ডিভোর্সের পর তোমার জায়গায় যে আসছে, তার সম্পর্কে আমার ধারণা খুব যদি ভুল না হয়...আমার জীবনে সে চিরকাল থেকে যাবে মনে হয় না। সব কিছুই একটা সাময়িক ব্যাপারও হতে পারে। তাই যদি হয় তো মাঝের এ-সময়টা তুমি নিজের সঙ্গে একটু অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারলে পরেও কোনো সমস্যা থাকবে না। তখন সবই ঠিক হয়ে যাবে।

আবার একটু সময় নিয়ে যশোধরা জিজ্ঞাসা করলেন, কে আসছে, তোমার সেই রাঙা মায়ের মেয়ে?

নিজের ভিতরটাই আপাতত সুস্থির নয় জয়ন্ত বোসের, তাই এটুকুতেও বিরক্তি। বললেন, কে আসছে না আসছে সেটা তোমার ভাবনা নয়, তোমার কিছু বলার থাকে তো বলো।

মুখের দিকে চেয়ে থেকে যশোধরা আস্তে আস্তে জবাব দিলেন, তোমার কথার ওপরে আমি কোনোদিনই কিছু বলিনি—

—তাহলে তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকবে?

—তুমি যেমন রাখবে তেমনি থাকব।

যশোধরার অনুগত দিকটা তিনি চেনেন। কিন্তু এমন ধাক্কাও এ-ভাবে সামলে নেবে ভাবেননি। ফলে একটা সংকল্পবদ্ধ কঠিন মনোভাব নিয়েই ঘরে ডেকেছিলেন তাকে। তাই নিজেরই অস্বস্তি এখন একটু। মায়াই হচ্ছে। কিন্তু অমোঘ ভবিতব্যই একটা লক্ষ্যের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাঁকে। এর ওপর সত্যিই যেন তাঁর কোনো হাত নেই।

দোতলা আর তিন তলার মাঝে পার্টিশন বসল। এতটুকু আপত্তি না জানিয়ে যশোধরা তিন তলায় উঠে গেলেন। যথা সময়ে ডিভোর্স স্যুট ফাইল করা হল। তখনো তাঁর মুখে এতটুকু বিদ্রোহ বা অবাধ্যতার আভাস দেখলেন না জয়ন্ত বোস।

তবু সে-সময়ের আইন অনুযায়ী চূড়ান্ত ফয়েসলার ব্যাপারে গোল একটু বাঁধলই। জয়ন্ত বোসের তরফে অ্যাডভোকেট ঠিক করে দিয়েছিল অ্যাটর্নি ব্রিজেশ ধর। সে তখন একান্ত বিশ্বস্ত পাত্র তাঁর। আর তার স্ত্রী আরতি ধরের তো কথাই নেই, ঠাট্টার ছলে নিজের মুখেই জয়ন্ত বোসকে যখন তখন বলে, বোনের অর্থাৎ কমল গুপ্তর ভাগ্য দেখে তার হিংসে হয়।

কিন্তু চার মাস বাদে আদালতের রায় বেরুতে দেখা গেল এক বছরের জুডিসিয়াল সেপারেশন অর্থাৎ সাময়িক বিচ্ছেদের অনুমোদন মিলেছে। এই এক বছরের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বোঝাপড়া না হলে এবং বিচ্ছেদ অটুট থাকলে তখন আবার ডিভোর্সের প্রশ্ন।

মেজাজ সত্যিই বিগড়েছিল জয়ন্ত বোসের। অ্যাডভোকেটের তৎপরতা আর বিচক্ষণতার অভাবেই এমনটা হল বলে তাঁর ধারণা। নইলে পয়সা ঢাললে কি না হয়।

কিন্তু এখন একটা বছর অপেক্ষা করা ছাড়া আর করার কিছু নেই। ভিতরে ভিতরে আরো অসহিষ্ণু। কারণ, তাঁর মনে হয়েছে একটা বছর পিছিয়ে গেল বলে কমল যেন স্বস্তি বোধ করেছে। এই একটা বছরের মধ্যে নিরিবিলিতে দেখাশুনার সুযোগও সে যেন এড়িয়ে চলেছে। আর তার স্নায়ুর ওপর দিয়ে যে বেশ একটা ধকল চলেছে তাও তিনি অনুভব করতে পারেন।

বছর ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে আবার আদালতে ডিভোর্স চেয়েছেন জয়ন্ত বোস। এবারে আর কোনো অসুবিধে হয়নি। বিচ্ছেদ শেষ। কিন্তু কমলের তখন স্নায়ুর অবস্থা আরো খারাপ। সে স্পষ্ট বলেছে, তার কিছু সময় দরকার।

ভিতরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেও বাইরে সেটা প্রকাশ করলে ফল ভালো হবে না এটুকু বোঝার বুদ্ধি জয়ন্ত বোসের আছে। দরদমাখা সুরেই জিজ্ঞাসা করেছেন, কেন সময় দরকার?

কমল জবাব দেয়নি।

জয়ন্ত বোস জিজ্ঞাসা করেছেন, কত সময় দরকার?

কমলের সমস্ত মুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। তার মধ্যে যে অবিশ্রান্ত কিছু বোঝাপড়া চলেছে তাও জয়ন্ত বোস অনুভব করতে পারেন।

কমল জবাব দিয়েছে, আমি জানি না, আমার মাথার কিছু ঠিক নেই এখন। সময় হলে আমি নিজেই আপনাকে বলব।

—এমন কি হতে পারে যে তোমার সময় আর হলই না?

কমলের দ্বিধাভরা দুই চোখ তাঁর মুখের ওপর উঠে এসেছে। তারপর বলেছে, আমি সে-রকম কিছু এখনো ভাবছি না। আপনি অপরাধ নেবেন না, আমার ভিতরটা সত্যি এখন সুস্থ নয়।

সুস্থ যে নয় কিছুদিনের মধ্যে তার আরো প্রমাণ পেলেন জয়ন্ত বোস। রাজস্থানের কোন এক কলেজে চাকরি যোগাড় করে সেখানে চলে গেছে কমল। বাড়িতে বলে গেছে চেঞ্জে যাচ্ছে। সেখান থেকে দীপেনকে চিঠি লিখেছে। এক বছরের কড়ারে সে এখানে এসেছে। এই একটা বছর নিরিবিলিতে থাকতে চায়।

এই নিরিবিলিতে থাকতে চাওয়ার অর্থ জয়ন্ত বোস বুঝেছেন। নিজের সঙ্গেই স্নায়ুর যুদ্ধ চলেছে তাঁর। আর যে কারণেই হোক এখন হয়তো সরে দাঁড়াবার পথ খুঁজছে। তাঁর ঐশ্বর্যের প্রতি এই মেয়ের আকর্ষণ তেমন কখনো দেখেননি। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আর যে মোহের জাল বিস্তার করেছিলেন তিনি, ওই মেয়ের হয়তো সেটাই এখন ছিঁড়েখুঁড়ে বেরুনোর চেষ্টা।

দীপেনের কাছ থেকে জয়পুরের ঠিকানা নিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হবার বাসনাটাই প্রবল হল প্রথম। কিন্তু পরে সে-চিন্তা বাতিল করলেন। স্নায়ুর রোগটাই যদি বড় হয়ে থাকে তো স্বাভাবিক স্বাধীনতার মধ্যে সেটা সুস্থ করে তোলার মতো অবকাশ দেওয়াই ভালো। সে-ক্ষেত্রে হুট করে তাঁর ওখানে গিয়ে উপস্থিত হবার ফল বিপরীত হতে পারে।

দীপেনের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে জয়ন্ত বোস একখানা আন্তরিক চিঠি লিখলেন শুধু। আর লিখলেন রাঙা মায়ের মেয়ের মুখে শুধু একটু তাজা হাসি দেখার জন্য নিজের সব স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে সমস্ত জীবন অপেক্ষা করে থাকতেও তাঁর আপত্তি নেই।

সেই চিঠিরও জবাব এলো না দেখে জয়ন্ত বোস ভিতরে ভিতরে সন্দিগ্ধ, অসহিষ্ণু। কিন্তু বাইরে নির্লিপ্ত।

পরের এই বছরটার শেষের দিকে নিজের সংকল্প মতোই কিছু কাজ করেছেন। মোটা টাকায় দীপেনের বাড়ির অংশ কিনে নেবার প্রস্তাব পাকা করেছেন। টাকার অঙ্ক আর পরের প্রস্তাব শুনে দীপেন আনন্দে লাফিয়ে উঠেছে। চুক্তির থেকে আগাম টাকা দিয়ে পাশের জমিসহ 'নিরালা' অফিস দীপেনের নামে কিনেই দিয়েছেন জয়ন্ত বোস। 'নিরালা' অফিসের ওপর এখন দোতলা উঠছে, সেটা দীপেনের বসতবাড়ি হবে। 'নিরালা'র এক তলার পরিসরও এখন দ্বিগুণ। জয়ন্ত বোসের ফার্মই এই কাজ করে দিচ্ছে। বাড়ি বিক্রির দলিল রেডি, সই-সাবুদ বাকি শুধু। গোটা বাড়িটাই এরপর কমলের হবে।

কমলকে আপাতত কিছুই জানাতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন জয়ন্ত বোস। একটা মস্ত 'সারপ্রাইজ' হিসেবে ওই উপহার তার কাছে আসুক এটাই কাম্য।

এই একটা বছরও গড়ালো। অর্থাৎ কমল গুপ্ত বিলেত থেকে ফেরার পরেও দু'বছর

চার মাস পরে। জয়ন্ত বোসের বয়স এখন উনপঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। তাঁর এই দীর্ঘ ছ'বছরের প্রতীক্ষার ওপর শেষ ঘা পড়ল এবার।

প্রথমে সে-রকম মন দেননি বলেই ব্যাপারটা বুঝে ওঠেননি। দীপেন গুপ্তর হাব-ভাব কি-রকম সশঙ্ক। মুখ শুকনো ফ্যাকাশে। 'নিরালা'র ওপর সবে তখন দোতলা উঠছে। পৈতৃক বাড়ির অংশ বিক্রির দলিল সই-সাবুদ সেরে ফেলতে চায় সে। টাকাটা হাতে পেয়ে জয়ন্ত বোসের প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে দোতলাটা তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতে চায়। কারণ এখন পর্যন্ত তো সবটাই ধারে কাজ করে দিচ্ছেন জয়ন্ত বোস।

কমলের কথা উঠলেই বিরক্তির একশেষ। বলে, ওর মাথার ঠিক নেই, আপনার মতো মানুষের কদর বুঝলে ওর বর্তে যাওয়ার কথা—ওই সূর্য রায়ই ওর মাথাটা চিবিয়ে খেয়ে রেখেছে—ওকে এত সময় দিয়ে আপনি ভালো করেননি দাদা।

জয়ন্ত বোসও আর সময় না দেবার জন্যেই মনে মনে প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। কমল রাজস্থান থেকে ফিরতে দেরি করলে তিনি নিজেই সেখানে যাবেন ভাবছিলেন।

এমন দিনে ব্যাপারটা ফাঁস করে দিল ব্রিজেশ ধরের বউ আরতি ধর। গত ছ'মাস ধরেই তার হাব-ভাব আবার অন্যরকম। জয়ন্ত বোসের বাড়িতে আনাগোনা বেড়েছে। নিজের বাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়ে আপ্যায়নের ছলে একখানা লোভনীয় টোপের মতো নিজেকে সামনে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। বাসনার তাড়না জয়ন্ত বোস কখনো অনুভব করেননি এমন নয়। কিন্তু নিজেকে সংযত রেখেছেন।

কথায় কথায় হেসে হেসে তখনই আরতি একদিন বলেছিল, আপনি যে আশায় বসে আছেন সে-গুড়ে বালি, কমল কোনোদিন আপনার ঘরে আসবে না, এ আপনি জেনে রেখে দিতে পারেন।

জয়ন্ত বোস জেরা করেও এমন ধারণার কোনো সদুত্তর পাননি। সবটাই মেয়েলি ঈর্ষা আর মেয়েলি ছলাকলা ধরে নিয়েছিলেন।

ছ'মাস বাদে আবার ওই আরতি ধরের কাছেই প্রথম ধাক্কাটা খেয়েছেন তিনি। আগের মতোই হেসে হেসে জিজ্ঞাসা করল, কমলের সঙ্গে ফয়েসলা হয়ে গেল না এখনো কিছু বাকি আছে?

আরতি ধরের অভিলাষ ভালোই জানেন জয়ন্ত বোস। জবাব দিলেন, ফয়েসলার আর কি আছে, সে কি শিগগীরই আসছে নাকি?

শুনে আরতি আকাশ থেকে পড়ল একেবারে—ও মা, কমল তো দু'মাস ধরেই কলকাতায়, আপনি সে-খবরও রাখেন না!

কয়েক পলকের জন্য জয়ন্ত বোস হতচকিত। মুখের দিকে চেয়ে সত্যি মিথ্যে বুঝতে পারেন। আরতির চোখে-মুখে নতুন খুশির ঢল।

—তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—তিন চারদিন আগেও তো দেখা হল, কথা হল—

—কি বলেছে?

—এ সম্বন্ধে খোলখুলি কিছু কথা হয়নি, তবে এটুকু বোঝা গেছে এ-বিয়ের চিন্তা সে মাথা থেকে বাতিল করেছে। ছ'মাস আগে যখন পাঁচ-সাত দিনের জন্য কলকাতায়

এসেছিল, তখনই আমি যা বোঝার বুঝে নিয়েছিলাম, আপনাকে বলেওছিলাম—

আরতি ধরের মুখখানাই ফালা ফালা করে দেখছেন জয়ন্ত বোস।...ছ'মাস আগে সত্যিই বলেছিল বটে। আর দু'মাস হল কমল কলকাতায় বসে আছে তাও গোপন তাঁর কাছে।...এ-জন্যেই দীপেনের বসত বাড়ির দলিল সই-সাবুদ করে নেওয়ার তাড়া, টাকা হাতে পাবার চেষ্টা। আর এ কারণেই দুশ্চিন্তায় ইদানীং সর্বদা শুকনো মুখ তার।

আরতির চটুল অভ্যর্থনা আপাতত বাতিল করে জয়ন্ত বোস সোজা চলে এসেছেন দীপেন গুপ্তর 'নিরালা' আপিসে। তাঁর সেই মুখের দিকে চেয়ে দীপেন চমকে উঠেছে। তাছাড়া নিজে আজকাল সচরাচর আসেনও না, তাকেই যেতে হয়।

দীপেনের বউ আর ছেলে দুটো ঘরে ছিল। জয়ন্ত বোস বললেন, তোমার সঙ্গে দরকারী কথা আছে, এদের যেতে বলো।

বলার দরকার হল না। পাংশু মুখে দীপেনের বউ ছেলেদের নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চশমার ওধারের দুটো চোখ দীপেনের মুখের ওপর এঁটে বসল।—ছ'মাস আগে কমল কলকাতায় এসেছিল, আমাকে বলোনি কেন?

ঠোঁটে শুকনো জিভ ঘষে দীপেন জবাব দিল, কমল বলতে বারণ করেছিল...

—আর দু'মাস ধরে যে সে এখানে বসে আছে তাও জানাতে বারণ করেছে?

অসহায় আকুতি ঝরল দীপেনের মুখে, আপনি বিশ্বাস করুন দাদা, আমি ওকে কতভাবে বোঝাচ্ছি ঠিক নেই—

এই মুখের দিকে চেয়ে অবিশ্বাস করার কিছু নেই। একটু চুপ করে থেকে জয়ন্ত বোস জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার এই বাড়ির ব্যাপার কমলকে বলেছ?

—এখানে কনসট্রাকশন হচ্ছে দেখেছে, আর কিছু তাকে এখনো বলিনি...আপনি নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু এখন কি হবে দাদা?

জয়ন্ত বোস সাফ জবাব দিলেন, কি আর হবে, এরপর তোমাদের ও বাড়ির শেয়ার ট্রান্সফারের প্রশ্ন ওঠে না—এখানে যা-কিছু হয়েছে সবটাই ধারে হয়েছে—যত তাড়াতাড়ি পারো শোধ করে দেবে। খুব বেশি সময় তোমাকে আমি দিতে পারব মনে হয় না...আচ্ছা, গুড নাইট।

দীপেনের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়াটা জয়ন্ত বোস দেখেও দেখলেন না।

নিজেকে প্রস্তুত করতে সময় লাগল একটু কমল গুপ্তর। নীচের বসার ঘরে অপেক্ষা করছেন জয়ন্ত বোস। এতকাল সোজা ওপরে উঠে এসেছেন। খবর পাঠানো এই প্রথম। আর এই কারণেই কমল স্বস্তি বোধ করেছে একটু।

এলো। জয়ন্ত বোস ঘরে পায়চারি করছিলেন। থমকে দাঁড়ালেন। দেখলেন। হাসলেন একটু।—বোসো।

কমল বসল।

সোফাটা সামনে টেনে জয়ন্ত বোসও বসলেন। বললেন, তোমার শরীর তো একটুও সারেনি দেখছি, আরো বরং খারাপ হয়েছে...মন স্থির তো করেই ফেলেছ শুনলাম, তাহলে এই হাল কেন?

জবাব না দিয়ে কমল মুখের দিকে চেয়ে রইল শুধু। সোফা ছেড়ে জয়ন্ত বোস ঘরে পায়চারি করে নিলেন একদফা। তারপর সামনে এসে দাঁড়ালেন।—আমাকে তুমি জানোয়ার গোছের কিছু ঠাওরে বসে আছ বোধহয়?

কমলের ফ্যাকাশে মুখের ঠোঁট দুটো নড়ল একটু। অস্ফুট স্বরে বলল, না।

—তাহলে তোমার এত ভয় কেন? এত অশান্তি কেন?

কমল নিরুত্তর।

—সূর্য রায়ের জন্য?

কমল এবারে মাথা নাড়ল। মৃদু স্বরে বলল, না...। সে আমার জীবনে কখনো আসবে কিনা জানি না। কিন্তু আপনি আমাকে দয়া করে ক্ষমা করবেন, আর কিছু জিগ্যেস করবেন না।

জয়ন্ত বোস আবার একটু খুঁটিয়ে দেখে নিলেন তাকে। বললেন, বেশ জিগ্যেস করব না, তোমার মত যদি আবার বদলায় আমাকে জানিও. আমি সব মিলিয়ে ছ'বছর অপেক্ষা করছি, আরো না-হয় করব। কিন্তু একটা কথা, রাঙা মায়ের মেয়েকে আমি রাঙা মায়ের মতোই দেখতে চাই, এখন যে-রকম দেখছি সে-রকম নয়। সুস্থ হয়ে যা বলার খোলাখুলি বলার মতো মনের জোর দেখলে আমি খুশি হব। গুড নাইট!

এরপর দীপেন গুপ্ত বাড়ি বয়ে অনেক বার দেখা করতে এসেছে। জয়ন্ত বোস দেখা করেননি। কোনো বাধা না মেনে আরতি ধর বেপরোয়ার মতোই কাছে আসার ফাঁদ পেতেছে। আর দীপেনের সম্পর্কে সেও সুপারিশ করেছে। জয়ন্ত বোস কানে তোলেননি।

তারপর দীপেনের বউ প্রমীলা গুপ্ত বাড়ি এসে ধর্ণা দিয়েছে। ওই রোগাটে উতলা পাংশু বউটাকে দেখে জয়ন্ত বোস অস্বস্তি বোধ করেছেন আবার বিরক্তও হয়েছেন। ভেবে দেখার নাম করে দু'দিন তাকে ফিরিয়েছেন। দিন কতক বাদে আবার এসে হাজির সে। কাঁদছে। তার বক্তব্য, বাড়ির ব্যাপার সব শোনার পর কমল আবার বেশি রকম অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে গেছে। আর তার স্বামীও পাগলের মতো হয়ে গিয়ে শুধু বলছে, আত্মহত্যা করা ছাড়া আর তার কোনো উপায় নেই। এ অবস্থায় প্রমীলা গুপ্ত কি করবে?

আত্মহত্যার কথা শুনলেই অসহিষ্ণু অস্বস্তিতে ভিতর ছেয়ে যায় জয়ন্ত বোসের। সামনে যেন এই রোগা বউটারই মৃত মুখ দেখছেন তিনি।

রাগত মুখে বলে উঠলেন, ওর মতো ইডিয়েটের আত্মহত্যা ঢের আগেই করা উচিত ছিল। যাক, তোমার অত উতলা হবার দরকার নেই, আমি ভেবে দেখছি কি করা যায়।

প্রমীলা গুপ্ত যাবার আগে কমল কোন হাসপাতালের কোথায় আছে জেনে নিলেন।

...তিন মাস আগে মনোহরকে নিয়ে সেই বিকেলেই তিনি হাসপাতালে এসেছেন। কমলের সঙ্গে দেখা করেছেন। চুপচাপ পাশে বসে অনেকক্ষণ তাকে দেখেছেন। কিন্তু কমল আর এক দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে। এমন কি হাত বাড়িয়ে ফুলের তোড়াটা পর্যন্ত নেয়নি। পাশে রাখতে হয়েছে।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে জয়ন্ত বোস বললেন, তুমি হঠাৎ এত অসুস্থ হয়ে পড়েছ আমি জানতাম না।

কমল গুপ্ত জবাব দিল না। ফিরে তাকাল না।

জয়ন্ত বোস আবার বললেন, শরীরটাকে এ-ভাবে মাটি করছ কেন?

এবারে কমল ফিরে তাকাল। খরখরে মুখ। তপ্ত চাউনি।—আপনি দাদার এতবড় সর্বনাশ কেন করলেন?

মৃদু স্বরেই জয়ন্ত বোস বললেন, উত্তেজনা ভালো নয়, কিছু ভেব না, তুমি সুস্থ হয়ে উঠলেই দেখবে কারো কোনো সর্বনাশ হয়নি। তাছাড়া আমি কি-জন্য কি করতে চেয়েছিলাম আশা করি তাও তুমি শুনেছ...

তেমনি ধারালো চাপা গলায় কমল বলল, হ্যাঁ শুনেছি, কিন্তু অনেক পরে। তার আগে নতুন বাড়ি তোলার ব্যাপারে দাদাকে আপনি গলা-কাটা ধার-দেনার তলায় ফেলেছেন—এখন তাকে আপনি সে-টাকা শোধ করতে বলেছেন। দাদা পাগলের মতো হয়ে গিয়ে আমার হাতে-পায়ে ধরছে, আমাকে রাজী করাতে চায়। আপনারও বোধহয় সেই ইচ্ছে?

একটু চুপ করে থেকে জয়ন্ত বোস জবাব দিলেন, তুমি আমাকে কি ভেবেছ বুঝতেই পারছি। শোনো, তোমাকে চাওয়াটা আমার একটা রোগের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার কারণ যে শুধু তুমি নও এ একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে। তার পিছনে একটা মস্ত অতীত জড়িয়ে আছে। আমার অবস্থার মানুষ যে-কোনো একটি মেয়ের জন্য দু'লাখ টাকায় কোনো বাড়ির অংশ কিনতে চাইবে না। বাট্ প্লীজ্ কমল, এখন এ-সব কথা থাক, আমি বলছি তোমার কোনো দুর্ভাবনার কারণ নেই।

কিন্তু কমল গুপ্তর উত্তেজনা বাড়তেই থাকল। বলল, দুর্ভাবনার জন্যেই আমি অসুস্থ, আপনি বললেই সেটা চলে যাবে না। আপনি না এলে আমি নিজেই হয়তো সব কথা শেষ করার জন্য আপনাকে ডেকে পাঠাতাম। আপনার অঢেল টাকা, আমার মতো মেয়ে আপনার কাছে কিছু নয়—আপনার রোগের সঙ্গে মস্ত অতীত জড়িয়ে আছে সেটা জানতে বুঝতে আমার অসুবিধে হয়নি। তাই আমি সরে এলেও আপনাকে আমি কক্ষনো ছোট ভাবিনি—

কথার মাঝখানে ঈষৎ কৌতুকে জয়ন্ত বোস বাধা দিলেন, আমার অতীত সম্পর্কে তোমার সব জানা-বোঝা হয়ে গেছে? তাই সরে এসেছ?

—হ্যাঁ, তাই। সে-কথা থাক। আমাকে চাওয়াটা আপনার রোগ হতে পারে কিন্তু দাদার মাথায় এতবড় বিপদ আপনি চাপিয়ে দিলেন কেন? এই লোভের ফাঁদে আপনি তাকে কেন ফেললেন? আপনি কি ভেবেছেন এই করলে আমি সুড় সুড় করে গিয়ে আপনার রোগের বলি হব?

জয়ন্ত বোস চেয়ে আছেন। এই তপ্ত মুখের দিকে চেয়ে কেন যেন আর রাঙা মাকে দেখতে পাচ্ছেন না। বুক ঠেলে কোনো চাপা আবেগ বেরিয়ে আসতে চাইছে না। এ যেন শুধুই বিপাকের খাঁচায় পোরা ক্রুদ্ধ তপ্ত রমণীর মুখ একখানা।

আরো ঝাঁঝালো গলায় কমল বলে উঠল, যাক, এই বিপদের ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গোটা বাড়িটা কিনে নেবার অফার এক রকম যেচে এসেছে। দরকার হলে অনায়াসে এখন দাদার ঋণ শোধ করা যাবে—এখন আপনি কি চান তাই বলুন।

মুখের দিকে চেয়ে জয়ন্ত বোস এবারে হাসছেন অল্প অল্প। বললেন, তুমি সরে যাওয়ার পরেও আমাকে যখন ছোট ভাবনি, এখনো অত ছোট ভেব না। রাঙা মায়ের বাড়ি যেমন আছে তেমনি থাক, তোমার দাদার সব দেনা সাত দিনের মধ্যে শোধ হয়ে যাবে।—ওই জমি আর বিল্ডিং আমার নামে ট্রান্সফার করে নিলেই ফুরিয়ে গেল—দীপেন তার 'নিরালা' নিয়ে যেমন ছিল তেমনি থাকবে।

আবারও হাসিই পাচ্ছিল জয়ন্ত বোসের। এতটা উদারতা বিশ্বাস করতে পারছে না বোধহয়। তেমনি টান-ধরা ফ্যাকাশে মুখ, খরখরে চাউনি। রাঙা মায়ের সঙ্গে কোথাও মিল নেই। তার সেই তপ্ত ক্রুদ্ধমূর্তি জয়ন্ত বোসের আজও মনে আছে।

উঠে চলে এসেছেন। সোজা এসে গাড়িতে উঠে বসেছেন। ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে দোতলার বারান্দার কার্নিশে দাঁড়িয়ে ঝাঁঝালো চোখে কমল গুপ্ত তাঁকে দেখছে, সেটা মনোহর মাহাতো লক্ষ্য করছিল, কিন্তু তিনি কোনোদিকে ফিরেও তাকান নি। অনেক দিনের, অনেক কালের একটা ঘোর কেটে যাচ্ছে যেন। কিন্তু ভিতরটা এখনো তার মধ্যেই ঢুকে পড়তে চাইছে।

তারপর...!

তারপর তিন মাস বাদে পর পর অনেকগুলো অবিশ্বাস্য ধাক্কা নিয়ে আজকের এই দিনটা উপস্থিত তাঁর জীবনে। এর প্রত্যেকটির সঙ্গে যশোধরার যোগ।

জীবনের এতগুলো বছর ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলেন তিনি? চোখের সামনে সর্বদা ওই জলজ্যান্ত রমণীকে দেখেও তার ভিতর-বার কিছুই চিনলেন না, কিছুই জানলেন না?

...ন'বছর আগে তাঁর অনুপস্থিতিতে লেখাপড়ায় কম দাম দেখিয়ে বাপের নামে ওই জমি কিনিয়ে তারপর নিজের নামে সেটা দান-পত্র করিয়েছে। এখন জমি যার বাড়ি তার। সেই জোরেই সে আজ এসে ব্যাংকের সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা ভাড়া নিজের নামে নেবার ব্যবস্থা করেছে।

...তাঁকে বোকা বানিয়ে দুই ছেলের ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্ত করার মতোই টাকা পৃথক করে নিয়েছে, সেই সঙ্গে নিজেদের জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট ফাঁকা করে নিজের ব্যবস্থাও আরো পাকাপোক্ত করেছে।

...এই সকালে যশোধরার অনেক দিনের—অনেক অনেক দিনের নিঃশব্দ প্রস্তুতির ফল দেখেছেন তিনি। সকালের সেই মূর্তি চোখে ভাসছে। স্নান সেরে পিঠে আধা-শুকনো চুলের বোঝা ছড়িয়ে চেয়ারের হাতলের ওপর একটু বেঁকে-চুরে বসা, সর্বাঙ্গে পরনের টকটকে চওড়া লালপেড়ে শাড়ির আর কপালে আর সিঁথির সিঁদুরের জ্বলজ্বলে আভা...এই সব-কিছুর মধ্যে লোভের আমন্ত্রণ ছিল...আর ভিতরে ভিতরে নাকচ করার সংকল্প ছিল। এ-ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। আজ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ইঙ্গিতজ্ঞা মেয়ের মতোই অনায়াস সরস তার আচরণ, তার কথা আর কথার জবাব। যেমনটি দেখলে আর শুনলে লোভ দ্বিগুণ হয়, বাসনা দ্বিগুণ ঝলসে ওঠে। সেই লোভ আর বাসনা ছড়িয়ে দিয়ে যশোধরা

বিজয়িনীর মতোই তিন তলায় উঠে চলে গেছে। তখনো অতটা তিনি বুঝতে পারেননি। এখন পারছেন।

ঘুরে ফিরে আবার সেই কথাই মনে এলো তাঁর। চোখের ওপর ছিল, কিন্তু ওই রমণীকে তিনি আগে দেখেননি। দেখার ছিল ন'বছর আগে বাড়ির জমি কেনার সময়। দেখার ছিল তেইশ বছর আগে বিয়ের সময়। দেখার ছিল হয়তো আরও আগে।

কি মনে পড়তে সচকিত আবার।...কমল আর সূর্য রায় আরতি ধরের বাড়ি গেছল। লোকসভার ইলেকশনের মুখে বহু লোকই জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। সূর্য রায়ের ছাড়া পাওয়াও স্বাভাবিকই। কিন্তু আরতির ওখানে যশোধরার প্রসঙ্গ ওঠার কারণ কি থাকতে পারে? শুধু তাই নয়, কমল নাকি যশোধরার সঙ্গে দেখাও করতে চেয়েছিল আর যশোধরার খুব প্রশংসাও করেছিল।

...হাসপাতালে কমল বলেছিল, তাঁর রোগের সঙ্গে যে অতীত জড়িয়ে আছে সেটা ওর জানতে বুঝতে বাকি নেই।

...কেন বলেছিল? যশোধরার সম্পর্কে তাঁর নিজের তাহলে আরো কত জানতে বুঝতে বাকি?

রাত সাড়ে সাতটা। কর্মচারীরা চলে গেছে। জয়ন্ত বোস উঠলেন।

জজের বাড়ি।

গাড়ি থেকে নেমে জয়ন্ত বোস বসার ঘরের দিকে এগোলেন। তারপর দরজা পর্যন্ত না গিয়ে দাঁড়ালেন একটু। যে সম্ভাবনার কথা মনে হয়েছিল, তাই। সূর্য রায়ের চড়া গলা শোনা যাচ্ছে। কমলের বিরক্তিমাখা জোরালো প্রতিবাদও।

দাঁড়িয়ে শুনলেন একটু। সূর্য রায় সাময়িকভাবে এই বাড়ির এক-তলার দুটো ঘর তাদের পার্টির আপিস ঘর হিসেবে ব্যবহার করতে চায়, ইলেকশনের মৌসুমে তাদের ঘর খুব দরকার এখন, কিন্তু সুবিধে মতো জায়গা পাচ্ছে না। এর জন্য কিছু ভাড়া গুনতেও রাজী তারা। কমল সোজাসুজি আপত্তি জানাচ্ছে, দাদা রাজী হলেও সে রাজী হবে না। এ-সব ঝামেলা সে বরদাস্ত করবে না—করবেই না।

জয়ন্ত বোস ঘরে ঢুকলেন। কমল আর সূর্য রায় থমকে তাকাল।

কমলের পাশের সোফায় বসলেন জয়ন্ত বোস। সহজ অন্তরঙ্গ সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, শরীর ভালো তো এখন?

জবাব না দিয়ে কমল সামান্য মাথা নাড়ল। তিন মাস বাদে এই লোকের পদার্পণের কারণ আঁচ করতে চেষ্টা করছে।

সূর্য রায়ের দিকে ফিরলেন জয়ন্ত বোস।—কি খবর, ইলেকশন নিয়ে খুব ব্যস্ত?

পাল্টা ব্যঙ্গস্বরে সূর্য রায় বলল, একটু। আপনারা কি খুব চিন্তিত?

জয়ন্ত বোস পকেট থেকে একটা চুরুট বার করে ঠোঁটে ঝোলাবার আগে কমলের সঙ্গে চোখাচোখি হতে সেটা আবার পকেটে রেখে দিলেন। তারপর সূর্য রায়ের উদ্দেশে নিস্পৃহ সুরে বললেন, না, ইন্দিরা গান্ধীর দিন ফুরিয়েছে বোঝাই যায়।

এমন একটা সুনিশ্চিত মন্তব্য দুজনের কেউ আশা করেনি। সূর্য রায় স্বভাবতই উৎসুক একটু।—কি রকম?

—এবারের বাতাস তাই বলছে, তোমরা পলিটিক্স করো, তোমাদের তো আরো ভালো বোঝা উচিত। তাছাড়া, ভিতরে এতটুকু জোর থাকলে ইলেকশনে সাধু-সন্ন্যাসীদের জেতার আশীর্বাদ ফলাও করে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় না।

সাধু-সন্ন্যাসীদের ওই আশীর্বাদের বিজ্ঞাপন এদের দুজনের চোখেও পড়েছে। কিন্তু কমল ও-ভাবে কিছু চিন্তা করেনি। সূর্য রায় কড়া রাজনীতির মানুষ, এ-কথা শুনে তার শুধু কান জুড়ালো না, মজাও লাগল। তবু স্বভাবসুলভ টিপ্পনীর সুরে বলে উঠল, আপনাদের সামনে তো তাহলে ঘোর দুর্দিন!

জয়ন্ত বোস হাসছেন। জবাব দিলেন, আমরা 'লিপ সার্ভিসের' মানুষ, যে-ই আসুক আমাদের কি সমস্যা!...কমল লিপ সার্ভিসের বাংলা বলেছিল, আন্তরিকতাশূন্য সেবা। সমাজের কাঠামোটাই এর ওপর যতদিন দাঁড়িয়ে আছে ততদিন অন্তত সকলেই আমাদের চাইবে।...বাইরে থেকে পার্টির আপিস নিয়ে তোমাদের ঝগড়া কানে এলো। 'নিরালা' আপিসের দোতলাটা তো আমার খালিই পড়ে আছে, ইচ্ছে করলে সেখানে তোমাদের আপিস বসাতে পারো।

পার্টির স্বার্থে সূর্য রায়ের লাজ-লজ্জা নেই। অতবড় একটা জায়গা দখলের মধ্যে পাওয়া কল্পনার বাইরে। তবু জিজ্ঞাসা করল, লিপ সার্ভিস?

জয়ন্ত বোস মাথা নাড়লেন। বললেন, আমার দিক থেকে তাই—তোমাদের দিক থেকে কি সে তোমরা ভাববে!

অদ্ভুত মানুষটার উদারতার দিকটাও সূর্য রায় শুনেছে। দীপেন গুপ্তর ঋণ মকুব করে নিজের টাকায় ওই বিশাল দালান তুলেছে। বিনা ভাড়ায় সমস্ত এক তলা জুড়ে এখনো তার 'নিরালা' আপিস চলছে। উৎসুক মুখে সামনে ঝুঁকল।—ও তো মস্ত ব্যাপার, ভাড়া কত নেবেন?

—ভাড়া যা সেটা দেওয়ার সাধ্যে তোমাদের কুলোবে না। খুব দরকার থাকে এসে ঢুকে পড়ো, একটা চিঠি পাঠাও, আমি পারমিশন দিয়ে দিচ্ছি।

সূর্য রায় উৎফুল্ল।—পাকা কথা?

—পাক্কা।

হাসি মুখে কমলকে একবার দেখে নিলেন। সূর্যর দিকেই ফিরলেন আবার।—জেল থেকে বেরিয়ে শুধু পলিটিক্সই করছ, না এই মহিলার দিকেও নজর-টজর রাখছ একটু?

যে উপকারই পাক, সূর্য রায় লোকটার ঠোঁট কাটা। ফস করে জবাব দিল, অত সময় এখন আর পাচ্ছি কোথায়, ইলেকশন তো এসেই গেল, আপনি সময়ে একটু উদার হলে আমিও নজর দেবার একটু সময় পেতাম।

—কি রকম?

—কমলের ধারণা, আপনি চেষ্টা করলে দু'আড়াই বছর আগেই আমি জেল থেকে ছাড়া পেতাম—ওপর মহলে তখন নাকি আপনার এমনই প্রতিপত্তি।

জয়ন্ত বোসের ভিতরটা সজাগ তক্ষুনি। প্রসঙ্গ ঘোরাবার সুযোগ পেলেন। কমলের দিকে ফিরে হাল্কা গাম্ভীর্যে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মাথায় এ-ধারণা যিনি ঢুকিয়েছেন তাঁর নাম বোধহয় যশোধরা?

অস্ফুট স্বরে কমল বলল, এর মধ্যে আবার তাঁকে কেন?

জয়ন্ত বোসের ঠোঁটে হাসি, কিন্তু চাউনি তীক্ষ্ণ।—আরতি বলছিল, তুমি নাকি তাঁর খুব প্রশংসা করছিলে।...আর তিন মাস আগে হাসপাতালে থাকতে তুমি বলেছিলে, আমার রোগের সঙ্গে যে অতীত জড়িয়ে আছে সেটা তোমার জানতে বুঝতে বাকি নেই। আমার কাছ থেকে সরে আসার মতো জানা-বোঝার সাহায্যটুকু তোমাকে তাহলে তিনিই করেছেন ধরে নিতে পারি?

গম্ভীর মুখে কমল বলল, এ-সব আলোচনা আমি আর আপনার সঙ্গে করতে চাই না।

হাসিতে দু'চোখ চিকচিক করছে জয়ন্ত বোসের।—করলে তাঁর আমার দুজনের পক্ষেই হয়তো ভালো হত...

রুক্ষ স্বরে কমল বলে উঠল, কেন, আপনি তাঁর কি ক্ষতি করবেন?

—আমি নিজে সেধে কারো কোনো ক্ষতি করি না। ক্ষতি যার হয় সে নিজেই তার রাস্তা করে নেয়।

এ-কথাগুলো সূর্য রায়ের বরদাস্ত হল না। বলল, কিন্তু কমলের একটু ক্ষতি আপনি করতে যাচ্ছিলেন। এ-বাড়ির ঘনিষ্ঠ কোনো পুরুষের সঙ্গে আপনার মায়ের কিছু সংস্রব ছিল যা আপনার রাঙা মা সহ্য করেননি। তিনি আপনার মাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সেই রাতেই তিন তলার ওই ঘরে আপনার মা আত্মহত্যা করেন, আর সেই ছ'বছর বয়সে আপনি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যান। সেই ঘা আপনার শুকোয়নি, আর সেই আক্রোশেই রাঙা মায়ের মেয়ের ওপর আপনার এত টান। অস্বীকার করতে পারেন?

কমলের মুখে অস্বস্তি। জবাব না দিয়ে জয়ন্ত বোস হালকা মন্তব্য করলেন, যশোধরা কি বলেছেন বোঝা গেল—

সহজে বিরত হবার মানুষ সূর্য রায় নয়। বলল, বোঝা গেলেও আপনার প্রতি তার শ্রদ্ধার অভাব দেখা যায়নি। সবটাই আপনার একটা ইনজিওরড় ইমোশনের রোগ বলেই তিনি বিশ্বাস করেন। আই থিংক, শী ইজ় এ গ্রেট লেডি।

মুখে একটু হাসি ছড়িয়েই উঠে দাঁড়ালেন জয়ন্ত বোস। —বেশ, তোমাদের কমপ্লিমেন্ট তাঁকে জানাব। উইস ইউ ভেরি ভেরি গুড় লাক্—

দু'পা এগিয়েও কমলের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন আবার। —আর একটা ছোট্ট কথা জানতে বাকি। হাসপাতালে তুমি বলেছিলে, বাড়ি নিয়ে তোমার দাদার সেই বিপদের কথা জানাজানি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের এ-বাড়ি কিনে নেবার অফার যেচে এসেছিল...সেই অফারও বোধহয় ওই গ্রেট লেডিই দিয়েছিলেন?

জবাব না দিয়ে কমল অন্য দিকে মুখ ফেরাল।

—থ্যাংক ইউ। লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন জয়ন্ত বোস।

বাড়ি ফিরলেন রাত সাড়ে ন'টার পরে। আরো খানিক আগে ফিরতে পারতেন। গাড়ি থামিয়ে একটা ফাঁকা মাঠের বেঞ্চিতে কিছুক্ষণ বসেছিলেন তিনি। যশোধরার সঙ্গে শেষ হিসেবের চিত্রটা একটু ভেবে নেবার চেষ্টা।

ভাবা গেল না।...যশোধরার যন্ত্রণাকাতর মুখ এ যাবত খুব কি একটা দেখেছেন তিনি? চিন্তা করতে লাগলেন।...দু' যুগ আগে লোভ আর ভুলের বিপর্যয়ে ওই রমণীর কুমারী দেহের ওপর দখল নিয়ে বসার পরেও সেই মুখে যা দেখেছিলেন সেটাও ঠিক যন্ত্রণা নয়। অস্বস্তিকর একটা স্তব্ধতা দেখেছিলেন...যন্ত্রণার কিছু ছায়া একবারই ওই মুখে পড়তে দেখেছিলেন।...আচমকা সেই ডিভোর্সের প্রস্তাব শোনার পর। কিন্তু তাও সামলে নিতে খুব একটা সময় লেগেছে মনে হয়নি। জয়ন্ত বোস তখন ভেবেছিলেন নিজেকে যোগ্য দোসর মনে করে না বলেই ভবিতব্য মেনে নিয়েছে।...এমন একজনকে তাহলে হাড়-পাঁজর গুঁড়িয়ে দেবার মতো কোন যন্ত্রণার গহ্বরে ঠেলে দিতে পারেন তিনি?

হদিস মিলল না। সে যা-হয় হবে, যেমন হবার হবে। তার আগে যোশোধরাকে আর একবার খুব ভালো করে দেখে নেওয়ার তাগিদ।

দোতলায় উঠলেই বিনীতবদন মনোহর মাহোতো সামনে এসে দাঁড়ায়। তারপর ছায়ার মতো পিছনে পিছনে ঘরে এসে গায়ের কোট আর জুতো মোজা খুলে নেয়। আজ এদিক-এদিক তাকিয়ে জয়ন্ত বোস তাকে দেখতে পেলেন না।

কোটটা খুলে একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। অসহিষ্ণু বিরক্তিতে বেল টিপতে যে লোকটা সামান্য পর্দা ঠেলে মুখ বাড়াল সে মনোহর নয়। আর একটা বেয়ারা। না ডাকলে যে কখনো ধারে কাছেও আসে না। দোতলার বাতাসটাই হঠাৎ কেমন অস্বাভাবিক লাগল জয়ন্ত বোসের।

—মনোহর!

ভয়ে ভয়ে লোকটা বলল, সে নেই সাব—

—নেই? এবারে বিরক্তির থেকে বিস্ময় বেশি।

লোকটা আবার ভয়ে ভয়ে জানাল মেমসাহেব তাকে ক'দিনের জন্য ছুটি দিয়ে দিয়েছেন।

জয়ন্ত বোসের ফর্সা মুখে কঠিন আঁচড়ে পড়তে লাগল। সামনে পেলে মনোহরের মাথাটা কাঁধ থেকে খসিয়ে দিতেন তিনি।

মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য চুপচাপ বসলেন একটু। তারপর নিজেই জুতো মোজা খুলে বাথরুমে ঢুকে গেলেন। ঠাণ্ডা জলেই স্নান সারলেন বেশ করে। মাথায় বুরুশ চালাতে চালাতে নিজের মুখখানাই আগে ভালো করে দেখে নিলেন। এই মুখ দেখেই যেন চমকে না ওঠে যশোধরা।

এক সিঁড়ি এক সিঁড়ি করে তিন তলায় উঠে এলেন।

নিজের ঘরের দরজার সামনেই যশোধরা দাঁড়িয়ে। সামনে এগোবার ফাঁকে যেটুকু দেখার পলকের মধ্যেই দেখে নিচ্ছেন জয়ন্ত বোস। সবল হাসি-ছোঁয়া মুখ। সকালের মতোই বেশ-বাস। পরনে চওড়া টকটকে লালপেড়ে সাদা জমিনের পাতলা দামী শাড়ি। গায়ে ধপধপে সাদা ব্লাউজ। কপালে সিঁদুর টিপ, সিঁথিতে জ্বলজ্বলে লাল শিখা। সব মিলিয়ে সকালের মতোই একটা লালচে আভা ওই শামলা রমণীদেহকে ঘিরে আছে। চোখাচোখি হতে দরজার কাছে দাঁড়িয়েই হাসল একটু। ঝকঝকে দাঁতের আভাস মিলিয়ে গেল। মাথার মস্ত খোঁপাটা সামান্য ভেঙে কাঁধের দিকে নেমে এসেছে।

জয়ন্ত বোস পায়ে পায়ে কাছে এলেন। দাঁড়ালেন।

চোখে চোখ একটু রেখে ফেলেও সামলে নিতে চেষ্টা করলেন যশোধরা।—কি দেখছ, সকালের মতো নয়?

অর্থাৎ সকালের পাগলামোর চেষ্টা দেখে এখনো সেই রকমই সাজসজ্জা করে বসে আছে এবং এখন বাসনা পূর্ণ করতে তার আপত্তি হবে না। চেষ্টা করলে জয়ন্ত বোস কি একটু হাসতে পারেন না? খুব মৃদু গলায় বললেন, সকালের থেকেও ভালো—

লজ্জার ছোঁয়াটুকুও একেবারে নিখাদ যেন।—যে-রকম করছ আজকাল, তোমার চোখ আবার খারাপ হল কিনা কে জানে, দেখাও ভালো করে। পরক্ষণে গলার সুরে অভিমানের ছোঁয়া লাগিয়ে বলল, সকালের রাগে আক্কেল দেবার জন্যেই বুঝি আজ আরো দেরিতে ফেরা হল?...বাপি আজ ওপরে খেতে আসবে বলে বাসুটা জেগে থাকতে চেষ্টা করে করে শেষে ঘুমিয়েই পড়ল।

জয়ন্ত বোস দেখছেন। আরো দেখার লোভ তাঁর।—আমার জন্যে তুমি অপেক্ষা করে বসেছিলে?

পাল্টা ভ্রূ-ভঙ্গি করে যশোধরা জবাব দিলেন, অপেক্ষা আজ করছি, জীবনটাই তো অপেক্ষার মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। এসো, ঘরে এসো—

নিজেই আগে ঘরে ঢুকে গেলেন যশোধরা। পিছনে জয়ন্ত বোস এলেন। আরো আত্মস্থ হবার জন্যেই সাজানো ঘরটা দেখে নিলেন একবার। শৌখিন খাটে পরিপাটি শয্যা বিছানো। সেদিকে এগিয়ে যশোধরা বললেন, বোসো।

শয্যার কাছে এগিয়ে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়ালেন জয়ন্ত বোস। বসলেন না।

—মনোহর কোথায়?

—ও মা, বলতেই ভুলে গেছি। বিড়ম্বনা মাখানো রাগত মুখ যশোধরার। —প্রথমে ভেবেছিলাম বাড়ি থেকে তাড়িয়েই দেব দুটোকে, তারপর ভাবলাম ওদের আর কি দোষ, যেমন মনিব আমরা, তেমনি তো হবে সব—

এখনো চোখে পলক পড়ছে না জয়ন্ত বোসের। কার—কার কথা বলছ?

—কার আবার, তোমার ওই আদরের মনোহর আর রূপার! তুমি তো নিজেকে নিয়েই আছ—ক'মাস ধরে ফাঁক পেলেই কেবল ফষ্টি-নষ্টি দুজনের। আজ বাড়াবাড়ি ধরা পড়ে যেতে ঘাড় ধরে দুটোকে কালীঘাটে পাঠিয়েছি বিয়ে করে আসতে, আর তারপর বউ নিয়ে মনোহরকে দিন কতকের জন্য দেশে চলে যেতে বলেছি। মুখে হাসি ভাঙল একটু, তোমার ভয়ে তাও কি মনোহর সহজে যেতে রাজী হয়! শেষে আমার মেজাজ দেখে ঘাবড়েছে। ওকে বলেছি ফিরে এলে সাহেব যদি তোকে তাড়িয়েই দেয়, বউ নিয়ে না হয় আমার কাছেই থেকে যাবি—যা।

যা বোঝার সবটুকুই বুঝতে পারছেন জয়ন্ত বোস। তবু দেখা কি শেষ হবে না তাঁর?

চোখে চোখ রেখে যশোধরা হেসে ফেললেন। —ও-ভাবে দেখছ কি? আজ আমার অবস্থাখানা কি হবে বুঝতেই পারছি...আগে খেয়ে দেয়ে নেবে তো না কি?

জয়ন্ত বোস মাথা নাড়লেন, হবে, সব হবে। ব্রিজেশ ধরকে হঠাৎ দেরাদুনে পাঠালে কেন?

—ছেলেকে একটু বোঝানোর জন্য, তোমারই ছেলে, রাগলে তো আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না—

—তুমি বললে আর ব্রিজেশ ধর ছুটল, কতটুকু প্রশ্রয়ের আশা তাকে দিয়েছ?...নাকি আমার শেষ দেখার জন্য প্রশ্রয়ের আর বাকি নেই কিছু?

যশোধরা থমকাল এবার একটু। এ-সব কথা শুনলে সোজা সরল মেয়ে যেমন রেগে যায় সেই গোছের মুখ।—দেখো, অসভ্যের মতো কথা বোলো না বলছি! সঙ্গে সঙ্গে আবার হাসিও এসে গেল যেন একটু।—প্রশ্রয়ের লোভ অবশ্য তার একটু ছিল মিথ্যে বলব না, বয়েসে যে আমি ওর থেকে বড় সে-তো জানে না। তোমার ওপর রাগের শোধটা আমার ওপর দিয়ে নেবার লোভ হতেই পারে—পরে আমি তাকে বেশ করে বুঝিয়ে দিয়েছি, সে তার বউটিকে শুধু নির্ঝঞ্ঝাটে ফিরে পেতে পারে—এখন সে যা করছে সেই আশাতেই করছে—এদিকে বীরুটা ঠাণ্ডা না হওয়ার জন্য আমার দুশ্চিন্তার শেষ নেই।

একটা পাশবিক অত্যাচারের আগুন মাথার দিকে ঠেলে উঠছে জয়ন্ত বোসের। তারপর? তারপর ওই সুঠাম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের একটি একটি করে ছিঁড়ে নিয়ে আসবেন? নাকি গলায় দু'হাতের দশ আঙুল সাঁড়াশির মতো বসিয়ে তিলে তিলে শ্বাস রোধ করে সব শেষ করে দেবেন? নাকি তারও আগে আরো একটু দেখবেন?

—দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে এ-বাড়ির জমির দলিলসুদ্ধু তাকে দেখাতে পাঠিয়েছে, যে জমি তোমার, বাড়ি তোমার, এখানকার যা-কিছু সব তোমার—তাই না?

নিরুপায় মুখ যেন যশোধরার, আবার একই সঙ্গে সেই মুখে হাসির ফাটল।—স-ব, তুমি সুদ্ধু যে সে আর লজ্জার মাথা খেয়ে ছেলেকে বলে পাঠাই কি করে!...কিন্তু তুমিও তো কম লোক নও, জমির ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত খুঁড়ে বার করে ফেললে! জানলে কি করে?

এবারে হাত দুটো আর বসে থাকল না জয়ন্ত বোসের। যশোধরার দুই কাঁধে উঠে এলো। মাথাটা তাঁর মুখের ওপর সামনে ঝুঁকল একটু। গম্ভীর হিসহিস শব্দ বার হল গলা দিয়ে, বললেন, আমি আরো অনেক খুঁড়েছি, অনেক জেনেছি—বুঝলে?

কথা শেষ হওয়ার আগেই আচমকা প্রবল ধাক্কায় হাত-পা ছড়িয়ে শয্যার ওপর ছিটকে পড়লেন যশোধরা। পুরু গদির ওপর শয্যা বিছানো না থাকলে প্রচণ্ড আঘাত লাগার কথা। না, এর জন্য যশোধরা আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। বড় বড় দুটো দম নিয়ে আর ফেলে বড় বড় চোখ করে তাকালেন মানুষটার দিকে।

জয়ন্ত বোস নিজের অগোচরেই শয্যায় বসেছেন, মুখের ওপর বুকের ওপর ঝুঁকেছেন। কতটা ভয় পেল দেখছেন। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, ন'বছর আগেই তাহলে তুমি ভবিষ্যৎ আঁচ করে সবদিক গোছাতে লেগে গেছ—কেমন?

জবাব না দিয়ে তেমনি ডাগর চোখ মেলে যশোধরা চেয়ে আছেন।

—দেখছ কি? এত সরল তুমি যে কিছুই বুঝছ না—কেমন?...জমি বাড়ি নিজের

নামে করেছ, ছেলেদের তফাতে রেখে ব্যাংকের থেকে টাকা সরিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ পাকা করেছ, আর বাকি টাকা নিজের অ্যাকাউন্টে নিয়েছ, প্ল্যান করে মনোহরকে সরিয়েছ, কমল গুপ্তকে বলেছ ইচ্ছে করলেই সূর্য রায়কে আমি জেল থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারতুম, বলেছ, সবটাই আমার রোগ—মায়ের সঙ্গে পরপুরুষের সংস্রব ধরা পড়ার ফলে রাঙা মা তাকে বাড়ি থেকে তাড়াতে চেয়েছিল। আর আমাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল—সেই আক্রোশেই রাঙা মায়ের মেয়ের ওপর আমার এত টান—ধার দেনায় তলিয়ে ওর দাদাকে নিয়ে বিপাকে পড়েছিল বলে উদার হয়ে বাড়ি কেনার অফারও দিয়ে এসেছ—তারপর?...তারপর কি?

তীব্র বিদ্বেষে আর সাদাটে রাগে বুকের ওপর আর মুখের ওপর আরো ঝুঁকে পড়েছে লোকটা। তেমনি অপলক চোখে দেখে নিচ্ছেন যশোধরাও। তারপর দুই বাহুতে জড়িয়ে তাঁকে নিজের বুকের ওপরেই টেনে নিলেন তিনি। খুব সহজ হালকা সুরে বললেন, তারপর এই—।

হাত দুটো মুচড়ে সরিয়ে দিলেন জয়ন্ত বোস। সামান্য উঠেও ঝুঁকে থাকলেন তেমনি। চিড়বিড় করে বলে উঠলেন, তোমার হাড় পাঁজর সব আমিই গুঁড়িয়ে দিতে জানি—এর পরেও ছেনালিতে ভুলব ভাবো?

এক ঝলক রক্ত উঠে এলো যশোধরার মুখে। —ছেনালি!

আরো তপ্ত ব্যঙ্গ ঝরল জয়ন্ত বোসের গলা দিয়ে।—তাহলে কি? ভালোবাসা?

যশোধরা শুয়ে আছেন, চোখে চোখ মিলে আছে। একটি একটি করে বললেন, অনেক বিদ্যা আর অনেক বুদ্ধির বড়াই তোমার...কিন্তু ভালোবাসা কাকে বলে জানো? ছ'বছর বয়েস থেকে রোগ আঁকড়ে পড়ে আছ, কিছু দেখার ক্ষমতা আছে? কিছু বোঝার ক্ষমতা আছে?

এই মুখ হঠাৎ একটু অন্য রকম দেখছেন জয়ন্ত বোস। বিকৃত শ্লেষে জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে তুমি যা-কিছু করেছ, আমাকে ভালোবেসে করেছ?

—হ্যাঁ। প্রত্যেকটা কাজ তোমাকে ষোল আনা করে পাব বলে করেছি। আর তা না পেলে সব-দিক থেকে তোমাকে একেবারে খাক করে দিয়েই নিজের কাছে টেনে আনব বলে করেছি। সেই বারো বছর বয়সে তুমি আমার সর্বনাশের রাস্তা করেছ, আর তারপর বামুনের মেয়ে হয়েও প্রথম শিবপুজো করতে বসে তোমাকেই চেয়েছি—আমি ভালোবাসব না তোমাকে, ভালোবাসবে ওই কমল গুপ্ত?

হ্যাঁ, এই মুখ এই চাউনি এই কথা-বার্তা অদ্ভুতই লাগছে জয়ন্ত বোসের। ভিতরে যত আক্রোশই থাক, এমনটা কখনো দেখেননি। এখন আর অতটা ঝুঁকে নেই, জিজ্ঞাসা করলেন, বারো বছর বয়সে তোমার কি সর্বনাশ করেছি?

—পড়াবার সময় শাসনের নাম করে গাল টেনে বুকে পিঠে হাত দিয়ে মজা পাওনি? তোমার চরিত্রখানা তখন থেকেই জানি না আমি? মাটির মানুষ দাদা, তা বউয়ের সর্বনাশ করতে উঠে পড়ে লেগেছিলে, তার কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে আনার জন্যে মেয়ে হয়েও কি না করেছি আমি—ভাবলে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করে।

রাগ বলে এবার কি অবাক হওয়ার পালা জয়ন্ত বোসের? আরো একটু সোজা

হয়ে বসলেন।—আমাকে তুমি ছিনিয়ে এনেছ? লজ্জায় তোমার মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করে?

—না তো কি? বউদির ঘরের পর্দা সরানো থাকত আর তুমি নিজের ঘর অন্ধকার করে জানলায় দাঁড়িয়ে তার রূপ গিলতে, মনে নেই? তোমার মুণ্ডু ঘোরানোর জন্যে লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে জানলার পর্দা সরিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বুকের কাপড় সরালাম, জামাটামাগুলো খুলে দাঁড়িয়ে থাকলাম, তোমার চোখ কতখানি ভরেছিল তাও বোঝা গেল। কিন্তু তার ফলে বউদির সর্বনাশটাই মাথায় ডবল চেপে বসল তোমার। কিন্তু অত সাহস যে তার নেই সেটা তোমার জানা ছিল না। তার একরাশ লেখা সেই ইনেনো-বিনেনো চিঠি তোমার বালিশের তলা থেকে সরিয়ে ঠিক যা তুমি চাও প্রাণের দায়ে সেই একটি কথাই লিখে রেখে এলাম। আমি জানতুম, ভিতরের যে অবস্থা তোমার, ওই '১২ টায়' পড়েই মাথা ঘুরে যাবে আর কোনো বিচার বিবেচনা থাকবে না। কি মারাত্মক দশা হলে কোনো কুমারী মেয়ে ও-ভাবে নিজেকে বলি দিয়েও সব কিছুর ফয়েসলা করতে চায় সে-সম্বন্ধে তোমার কোনো ধারণা আছে? এর পরেও তুমি অন্য মেয়ে ঘরে আনবে আর আমি তাই দেখব চেয়ে চেয়ে? এর পরেও নিজের এই প্রাণটা থাকতে আমি তোমাকে ছেড়ে দেব?

নিজের অগোচরে জয়ন্ত বোস এবারে প্রায় সোজা হয়ে বসেছেন। হতভম্ব বিমূঢ়ের মতো ওই শয্যা-লগ্ন রমণীকে দেখছেন। দেখছেন দেখছেন দেখছেন। তিনি কি স্বপ্ন দেখছেন? স্বপ্নের ঘোরে শুনছেন কিছু? তা নয়। রমণীয় ওই দুটো কালো চোখের গভীরে বুঝি ডুবে যাচ্ছেন তিনি। যা শুনলেন তার প্রতিটি অক্ষর সত্যি। সত্যি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এ তাঁর থেকে বেশি আর কে উপলব্ধি করতে পারে এখন?

আস্তে আস্তে সামনে ঝুঁকলেন। এই দেখার আর শেষ নেই যেন। সেই কবে কোন যুগ থেকে নিজের তৈরি একটা কাঁচ-ঘরের মধ্যে আটকে ছিলেন যেন তিনি। সেটা ভেঙে যাচ্ছে।...ভেঙে গেল।

চেয়ে আছেন যশোধরাও। চাউনিটা নরম এখন। দু'হাত বাড়িয়ে আস্তে আস্তে আবার তাঁকে বুকের ওপর টেনে আনলেন। বললেন, লক্ষ্মীটি রাগ কোরো না, যা করেছি তাতে নিজেরও বড় কষ্ট হয়েছে। এই জমি বাড়ি ঘর টাকা পয়সা সুবীর বাসু মনোহর—সব তোমার। তুমি শুধু আমার থাকো,-আমি আর কিচ্ছু চাইব না।

দুই কনুইয়ের ওপর ভর করে জয়ন্ত বোস আবারও মুখ তুললেন একটু। দু'চোখ ভরে দেখাটাই আর যেন শেষ হচ্ছে না তাঁর। ওই দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ ছ'বছর বয়সের সেই এক মায়ের মুখখানা চোখে ভেসে উঠল একবার। যে মুখ শাসনের সময় নির্মম, বুকে টেনে নেবার সময় তেমনি নরম।

ব্যগ্র দুই হাতে যশোধরাকে আঁকড়ে ধরে ওই বুকেই মুখ গুঁজলেন আবার। সব-কিছুর সঙ্গে আত্মার দোসর লাভের স্পর্শটুকুও জীবনে এই বুঝি প্রথম পেলেন জয়ন্ত বোস।

---

# চাঁদের কাছাকাছি

অনন্যরূপকার
উত্তমকুমারকে

ক্যানটিনের দুজন সার্ভিস বয় মাঝারি টেবিলে খাবারের ডিশগুলো সাজিয়ে দিয়ে গেল। সেই ফাঁকে ধর্মেন্দ্র চৌধুরি তাঁর গোল চোখ দুটি প্রসারিত করে প্রত্যেকটা ডিশ যাচাই করে নিলেন। গরম জিনিসগুলো থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছে। বেশ একটু সুঘ্রাণ বেরুচ্ছে। ফলে মুহূর্তের মধ্যে রসনা সিক্ত ধর্মেন্দ্রবাবুর। দস্তুরমতো ক্ষুধার্ত তিনি। কিন্তু খিদের মুখে খুব বেশি আইটেম তাঁর পছন্দ নয়। পরিমাণ দেহানুপাতে হলেই হল। সেই রকমই অর্ডার দিয়েছেন। একটা বড় ডিশে ফুল প্লেট ফ্রাইড রাইস, এটা ফুরলে আরো আধা ডিশ মজুত থাকার কথা তাঁর জন্যে।...দু'প্লেট অর্থাৎ চারখানা বড় বড় ফিসফ্রাই উইথ সালাড। এক ডিশ অর্থাৎ দুটো মিট্-ডেভিল চপ উইথ গ্রেভি। চপের সাইজের দরুন ডেভিল শব্দটা জোড়া হয়েছে বলে অনুমান। একটা আস্ত মুরগির রোস্ট আর একটা পুডিং।

ব্যস, এতেই রাতটা কেটে যাবে কোনরকমে। আগে থাকতে অর্ডার দিলে স্টেশনের এই ক্যানটিনে তোফা খাবার মেলে এ খবরটা ধর্মেন্দ্রবাবু বাইবেই পেয়েছিলেন। সন্ধ্যায় গাড়ি, কিন্তু কোনোরকম সংশয়ের মধ্যে থাকতে চান না বলে এমন বিজই প্রোগ্রামের মধ্যেও একটু সময় করে সকাল এগারোটায় এসে অর্ডার প্লেস করে কিছু অ্যাডভান্স দিয়ে গেছলেন।

ডিশ সাজিয়ে বেয়ারা দুটো ঠিক-হ্যায় গোছের অনুমোদনের আশায় তাঁর মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু ধর্মেন্দ্র চৌধুরির রসনা সিক্ত, সামনের ওপরের দিকের নকল দাঁত দুটো হাত-ব্যাগের কেসে, এখনো লাগানো হয়নি। মুখ খুললে পাছে বিপত্তি কিছু ঘটে এই আশংকায় থলথলে গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লেন শুধু। অর্থাৎ ঠিক আছে, তোমরা বাছারা এখন বিদেয় হতে পারো।

বেয়ারা দুটো চলে যেতে ধর্মেন্দ্রবাবু মাটি থেকে হোয়াট নট গোছের ব্যাগটা তুলে নিয়ে অদূরের চেয়ারে-বসা তিন মূর্তির দিকে চোখ রেখে ওটার গহ্বরে হাত ঢোকালেন। ওই তিনজনকে লক্ষ্য করার কারণ আছে। সেই তখন থেকে নিচু গলায় ফিসফিস গুজগুজ করছে। মাঝে মাঝে হাসাহাসিও করছে অবশ্য। কিন্তু ক্যানটিন-ঘরে কেউ ঢুকলে তিনজনেই একসঙ্গে সচকিত হয়ে তাকে লক্ষ্য করছে। দরজা দিয়ে প্ল্যাটফর্মের লোকজনের আনাগোনার প্রতিও নজর রাখছে তারা বোঝা যায়। মোট কথা চেহারা তিনজনেরই বেশ ভব্য সুশ্রী হলেও ওদের হাব-ভাব-আচরণ সে-রকম সুবিধের ঠেকছিল না ধর্মেন্দ্রবাবুর। এত বড় হলের মধ্যে একটা নিরিবিলি কোণ বেছে বসেছিলেন, কিন্তু সামনের এই তিনজনের দলটিরও যেন নিরিবিলি দরকার। খাচ্ছে তো টোস্ট আর চা। চেয়ার নিয়ে বসার আগে ধর্মেন্দ্রবাবুকেও তিন জোড়া চোখ দিয়ে বেশ করে মাপজোক করে নিয়েছিল ওরা।...না, চেহারা দিয়ে আজকাল কারু ভেতর বোঝা যায় না। অনেক দেখে ধর্মেন্দ্রবাবু এটুকু সার জেনেছেন।

...ওদের মধ্যে বয়স্ক লোকটির তো বেশ সুন্দর চেহারাই বলতে হবে। বয়স্ক বলতে বছর বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ হবে। বাকি দুজন আড়াআড়ি বসেছে, ওই লোকটিই ধর্মেন্দ্রবাবুর মুখোমুখি। পরনে ধোপদুরস্ত পাজামা আর আদ্দির পাঞ্জাবি। পায়ে শৌখিন চপ্পল। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, গায়ের রং ফর্সা, হাসি-হাসি মুখখানা যেমন সরল, তেমনি মিষ্টি। কিন্তু ধর্মেন্দ্রবাবুর বয়েসও আটান্ন এখন। অনেক দেখা আছে, অনেক জানা আছে।

কোন একজন বিলিতি কবি যেন বলেছিল, ফুলের মতো দেখতে হলেও ভিতরে সাপ লুকনো থাকতে পারে।

ধর্মেন্দ্রবাবুর খাবার আসতে সামনের ওই মাঝ-বয়সী সুন্দর লোকটিই প্রথমে বিস্ফারিত নেত্রে ভোজ্যপদার্থগুলো দেখেছে, তারপর বাকি দুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তারাও ঘাড় ফিরিয়ে এদিকেই চেয়ে আছে। অতএব দাঁতের খোঁজে ব্যাগে হাত ঢোকালেও ধর্মেন্দ্রবাবুর গম্ভীর চোখ দুটো তাদের দিকেই। তাঁর খাবারের দিকে লোকগুলোর এই মনোযোগ বিরক্তির কারণ।

হাতে উঠে এলো সাবানের কেস্। খুলতে গিয়ে বিরক্ত হয়ে কেসসুদ্ধ হাতটা আবার ভিতরে ঢোকালেন ধর্মেন্দ্রবাবু। নকল দাঁতের কেস ব্যাগের কোথায় থাকে জানাই আছে, একবারেই হাতে উঠে আসার কথা।

দৃষ্টি এখনো ওই সামনের তিনজনের দিকেই।...ওরা তিনজন নিচু গলায় কথাবার্তা কইলেও মাঝে মাঝে নিজেদের অগোচরেই হয়তো গলার স্বর স্বাভাবিক হয়ে উঠছিল। তখন দু-চারটে করে কথা ধর্মেন্দ্রবাবুর কানে আসছিল।...অল্পবয়সী ছেলে দুটি সুন্দরপানা বয়স্কজনকে চান্দা বলে ডাকছিল। কলকাতায় ছেলে-ছোকরাদের গলাকাটা চাঁদার জুলুমে মন-মেজাজ বছরে বারকয়েক তিরিক্ষি থাকে ধর্মেন্দ্রবাবুর, ফলে ওই শব্দটাই কর্ণশূল তার। চান্দা নামও তাঁর কানে আদৌ মধু ছড়ায়নি। ছদ্মনাম হওয়া বিচিত্র নয়, কোনো বাঙালীর চান্দা নাম এযাবৎ তিনি শোনেননি।

ব্যাগের গহ্বর থেকে এবারে হাতে উঠে এলো শেভিং সেটটা।

এবারে নিজের ওপরেই ক্রুদ্ধ ধর্মেন্দ্রবাবু। খাওয়ার সময় ব্যাগটা যেন তাঁর সঙ্গে রসিকতা শুরু করেছে।

বিশাল থলথলে শরীর নিয়ে একঝটকায় উঠে দাড়ালেন। তারপর ব্যাগ চেয়ারে রেখে (কারণ খাবারের ডিশের আধিক্য হেতু টেবিলের ওপরে জায়গা নেই) সরোষে সেটার মধ্যে হাত ঢোকালেন, এবারে চোখ দুটোও ব্যাগের গহ্বরেই। ব্যাগের তৃতীয় দফা রসিকতা বরদাস্ত করবেন না।

কিন্তু নকল দাঁতের ছোট কেস এবারেও উদ্ধার হল না, ব্যাগটার চার কোণে খাবলা খাবলা করে খুঁজতে লাগলেন তিনি। রাগে আর বিরক্তিতে মুখ লাল হয়ে উঠছে। আশ্চর্য, গেল কোথায় দাঁতের কেসটা! ওটা না পেলে সমস্ত খাওয়াটাই মাটি। ক'দিনের জন্যে মাটি কে জানে! কোথায় রাখলেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদে এমন ভুল তো তাঁর কক্ষনো হয় না!

রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন ধর্মেন্দ্রবাবু। বড় একটা তিক্ত নিঃশ্বাসও ছাড়লেন। সামনের ওই তিনজোড়া কৌতূহলী চোখ আবার তাঁর মুখের ওপর। এবারে রাগের মাথায় ব্যাগটাই মাটিতে উপুড় করতে যাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু তার আগেই একটা ডিশের ফাঁকে চোখ গেল। কেসটা টেবিলের ওপরেই পড়ে আছে, গেলাস আর ডিশের আড়ালে। এবারে মনে পড়ল খাবার আনার হুকুম দিয়েই দাঁতের কেস্‌ব্যাগ থেকে বার করে টেবিলে রেখেছিলেন বটে। অযথা সময় নষ্ট করতে চাননি। তারপর বেয়ারা দুটোর আহাম্মকিতে এই কাণ্ড।

ব্যাগ মাটিতে ফেলে ধুপ করে আবার চেয়ার নিলেন। ওদের দেখিয়েই কেস্

থেকে দাঁত দুটো তুলে নিয়ে পরলেন।...সব চেয়ে আছে যেন পাগল দেখছে একটা।

রুষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আহারে মন দিলেন তিনি। ফ্রাইয়ে একটা বড়সড় কামড় বসাতে গিয়ে কি মনে পড়তে অপ্রস্তুত। চার আঙুল জিভ কেটে ফ্রাই ডিশে রেখে বিড়বিড় করে সব ক'টা ডিশই আগে ভগবানের নামে উৎসর্গ করে নিলেন। তারপর আবার ওই সামনের বয়স্ক লোকটির সঙ্গে চোখোচোখি। সে যেন মজা দেখছে।

একটু বাদে শুনলেন, বয়কে ডেকে তিনটে ওমলেটের অর্ডার দিল ওরা। এই টেবিলে এত সব ভোজ্যপদার্থ দেখেই হয়তো লোভ সামলাতে পারছে না। ধর্মেন্দ্রবাবুর ধারণা পকেটের জোর থাকলে ডিমের ওমলেট কেউ অর্ডার দেয় না।

...খাবার আসার আগে টুকটাক আরো কিছু কথাবার্তা কানে গেছল তাঁর। এটুকু বুঝেছেন, দিল্লীর যাত্রী ওরা। দিল্লীর গাড়ি আসার সময় হয়ে এলো। এরা খসলে বাঁচেন, ধীরে-সুস্থে খাওয়া যাবে।

আবার নিচু গলায় আলোচনায় মগ্ন হল ওরা। তার মধ্যে হঠাৎ শোনা গেল একজন হেসে বলছে, তোমার শান্তিকুঞ্জে টাকা চান্দা, একটা তোলপাড় কাণ্ড হয়ে যাবে—

দ্বিতীয় জন সমঝে দিল তাকে, এই আস্তে! কোনো কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকত!

মাথা নিচু করে তিনজনে আবার ফিসফিস করতে লাগল। হাসাহাসিও চলছে অল্প-স্বল্প।

ওদিক থেকে দিল্লীর গাড়ি এসে ঢুকল এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে, আর এদিক থেকে এদের টেবিলে ওমলেট এলো।

ধর্মেন্দ্রবাবু এবারে বেশ অবাক। ফ্রাই চিবুতে চিবুতে মুখ তুলে তাকালেন। ট্রেনে ওঠা-নামার ব্যস্ততায় লোকজনের ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু টেবিলের এই তিনজন এক-আধ বার জানলা দিয়ে সেই দৃশ্য দেখেও ধীরেসুস্থে ওমলেট ভাঙছে আর হাসিমুখে গল্প করছে। হাতে যেন অঢেল সময় এদের, ব্যস্ততার কোনো কারণ নেই।

ওকে শুনিয়ে দিল্লী যাওয়ার কথাবার্তা হচ্ছিল সেও ভাঁওতা নাকি রে বাবা! ফ্রাই চিবুতে চিবুতে ধর্মেন্দ্রবাবু ঘোরালো চোখে তাকালেন আবার। সঙ্গে বিছানা নেই কারো, একটা মাত্র আনকোরা নতুন স্যুটকেস ওদের একজনের চেয়ারের পাশে। ওমলেট মুখে পুরতে পুরতে ওই সুন্দর মুখ চান্দাবাবু আবার চোখ তুলে তাকাল তাঁর দিকে। তারপর দৃষ্টিটা মুখের ওপর থমকেই রইল খানিক। মাথা নিচু করে আবার সঙ্গীদের খুব নিচু গলায় কি বলতে লাগল সে। মনে হল তাঁর সম্পর্কেই সঙ্গীদের বলছে কিছু।

ধর্মেন্দ্রবাবুর মনে ভয়-ডরের বালাই বিশেষ নেই। ওই হাতব্যাগে এমন জিনিস সর্বক্ষণ সঙ্গে থাকে তাঁর যা দেখলে লোকের পিলে চমকে যাবে। তবু অস্বস্তি একটু। কি মতলব সভ্যভব্য চেহারার লোক তিনটের কে জানে! সঙ্গে বেশি টাকা থাকলে সেই সব লোকেরা নাকি গন্ধ পায়।...হাজার চারেক নগদ টাকা আছে তাঁর সঙ্গে। খুব বেশি নয়, কিন্তু একেবারে কমই বা কি! তাছাড়া বিপদ তো আর টাকার অঙ্ক ধরে আসে না, বিপদ ঘটে গেলে পরে টাকার হিসেব।

কিন্তু আবারও দিল্লী যাত্রার কথাটাই কানে এলো তাঁর। দিল্লীতে পৌঁছেই চান্দার কি করা উচিত সেই মন্তব্য শোনা গেল। অল্পবয়সী সঙ্গীদুটোর একজন বলছে অন্য জন সায় দিচ্ছে।

অতএব ধর্মেন্দ্রবাবু একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবলেন, দিল্লীর ওই ট্রেনটার হয়তো আধ ঘণ্টা-পঁয়ত্রিশ মিনিটের স্টপেজ এখানে, তাই লোক তিনটের তাড়া নেই।

কিন্তু তার পরেই বিস্ময়ে হতবাক তিনি, একটা হুইসিল কানে এলো এবং তার কয়েক মুহূর্ত বাদে ট্রেনটা নড়েচড়ে উঠল। ওরা তিনজন মাথা নিচু করে গুজ-গুজ করছে আবার। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে সে খেয়ালও নেই!

আর মুখ বুজে বসে থাকতে পারলেন না ধর্মেন্দ্রবাবু। কোনরকমে মুখের ফ্রাই জঠরে চালান দিয়ে বলে উঠলেন, আপনারা যাবেন কোথায় মশাইরা, দিল্লী দিল্লী করছেন— ঈশ্বরের আশীর্বাদে দিল্লীর গাড়ি যে ছেড়ে চলল!

সঙ্গে সঙ্গে তিন গলার অস্ফুট আর্তনাদ একটা। তার পরেই হুটোপুটি কাণ্ড। একজন একটা পাঁচ টাকার নোট টেবিলে ফেলল, তারপর তিনজনে একসঙ্গে হুড়মুড় করে ছুটে বেরুলো। সেই ব্যস্ততার ধাক্কায় দু'তিনটে চেয়ার ধরাশায়ী।

গাড়ির মোশন তখন সামান্য বেড়েছে।

এদিক থেকে ধর্মেন্দ্রবাবু আবার চিৎকার করে উঠলেন, মশাইরা, আপনাদের স্যুটকেস পড়ে থাকল যে!

তিনজনেই থমকালো। তিনজনেই আবার একসঙ্গে ছুটে এলো ক্যানটিনে। দিশেহারা ভাব। সব থেকে কম বয়েস যার সে স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে আবার ছুট লাগালো। তার পিছনে পরের অন্য জন। শেষে সুন্দর মুখ চান্দা।

ট্রেনের গতি তখন মন্দ নয়। খাওয়া ফেলে উত্তেজনায় ধর্মেন্দ্রবাবুও দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে তিনজনেই ছুটেছে।...প্রথমে খালি হাতের কমবয়েসী লোকটা একটা কামরার হ্যান্ডেল ধরে উঠে পড়তে পারল। তার দুটো কামরা পরে স্যুটকেস হাতে লোকটাও তৃতীয় কামরার হ্যান্ডেল ধরে ঝুলে পড়ল, এবং তক্ষুনি বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্যে ভিতরের একজন যাত্রী তাকে টেনে নিল। তৃতীয় লোক অর্থাৎ চান্দার ট্রেনের সঙ্গে খানিকটা ছোটাই সার। গাড়ির গতি তখন আরো বেশি। সে পিছিয়ে পড়তে লাগল। শেষে দুই কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েই গেল সে। আর ছোটা বৃথা। একটু বাদে ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে চলে গেল। বিমূঢ় চোখে সেই চলন্ত গাড়ির দিকে চেয়ে লোকটা হাঁপাতে লাগল।

ক্যানটিনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ধর্মেন্দ্রবাবু দৃশ্যটা দেখছেন। উঠতে চেষ্টা করলে মারাই পড়ত লোকটা।

পরক্ষণে অবাক তিনি।

ওই চান্দা লোকটা, যে গাড়ি ফেল করল, দুই কোমরে হাত দিয়ে সে হাসতে শুরু করেছে। এতটা দূর থেকেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন হাসির দমকে লোকটা বেঁকেচুরে যাচ্ছে একেবারে! স্টেশনের অন্য লোকেরাও ঈষৎ বিস্ময়ে সেই হাসি দেখছে।

কিন্তু লোকটার হাসি আর থামেই না।

হাসতে হাসতেই ফিরল সে। দূর থেকে ধর্মেন্দ্রবাবুর সঙ্গে চোখোচোখি হল তার।

তখনো বেদম হাসছে। হাসতে হাসতেই এদিকে অর্থাৎ ক্যানটিনের দিকে পা বাড়ালো সে। হাসির দমকে তার ফর্সা মুখ টকটকে লাল।

অত হাসির তাৎপর্য বুঝতে না পেরে বিস্মিত ধর্মেন্দ্রবাবু আবার খাবারের টেবিলে এসে বসে তিন নম্বর ফ্রাই হাতে তুলে নিলেন। ট্রেন ফেল করার পর এত হাসি আসে কোত্থেকে ভেবে পাচ্ছেন না।

চান্দা অর্থাৎ সেই সুন্দর মুখ লোকটা ঘরে ঢুকল। নিঃশব্দ হাসির দমকে সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ এখনো। এবারে ধর্মেন্দ্রবাবুর সামনের চেয়ারটা টেনে বসে পড়ে আবার হাসতে শুরু করল সে। মনের সাধে একটু হাসার জন্যেই চেয়ারে বসা হল।

বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকালেন ধর্মেন্দ্রবাবু। মুখ বুজে এত হাসি বরদাস্ত করতে পারলেন না। বলে উঠলেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদে ট্রেনটা এভাবে মিস্ করে অত হাসিব কি হল মশাই?

অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে লোকটা বলল, না হেসে থাকি কি করে বলুন, দিল্লী যাচ্ছিলাম তো আমি একা, ওরা আমাকে সী-অফ করতে এসেছিল, একসাইটমেন্টের মাথায় ওরাই উঠে চলে গেল, আমি পড়ে থাকলাম!

আবারও হাসি।

ওদিকে ভালোরকমের একটা বিষম খেলেন ধর্মেন্দ্রবাবুও। তাঁরও আচমকা হাসি পেয়ে গেছল। তাড়াতাড়ি জল খেয়ে সংকট মোচন করলেন।

লোকটা এবারে ধর্মেন্দ্রবাবুর মুখখানা ভালো করে দেখে নিল। তারপর সামনের খাবারের ডিশগুলো পরখ করে নিল একবার। হাসি মিলিয়ে এসেছে। হাসলে মুখখানা আরো সুন্দর দেখায়, ধর্মেন্দ্রবাবু অস্বীকার করতে পারেন না।

কিন্তু লোকটার কাণ্ড দেখে তিনি অবাক। ডেভিলের ডিশটা দিব্বি সামনে টেনে নিয়ে খাওয়া শুরু করল। যেন ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিল ওটা।

রাগ চেপে ধর্মেন্দ্রবাবু জোরে হাঁক দিল, বোয়—!

বয় ছুটে এলো।

রাগতমুখে ধর্মেন্দ্রবাবু হুকুম করলেন, অওর এক প্লেট ডেভিল!

খেতে খেতে লোকটা নিজের মনে হাসছে। যাত্রার বিভ্রাটের কথা স্মরণ করে কি এ-ভাবে আর একজনের খাদ্যের ওপর চড়াও হতে পেরে সে-ই জানে। আর এক প্লেট ডেভিল এলো। ধর্মেন্দ্রবাবু তাড়াতাড়ি ডিশটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে বাঁ হাতে সেটাও একটু ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করে ডান হাতে একটা চপের আধখানায় কামড় বসিয়ে ওই পদার্থটির ওপর দখল ঘোষণা করে রাখলেন। তারপর সামনে তাকালেন। আর কোনো ডিশ খোয়া যাবার সম্ভাবনা আছে কিনা বোঝার চেষ্টা।

লোকটা সকৌতুকে তাঁকেই দেখছে।—আপনি খুব ভগবানভক্ত বুঝি?

ধর্মেন্দ্রবাবু জবাব দিলেন, বুদ্ধিমান মানুষমাত্রেই ওই ভদ্রলোকের ভক্ত।

লোকটা মাথা নেড়ে সায় দিল, বলল, আমি যাচাই করে দেখেছি, ওই ভদ্রলোকের ভক্ত হলে আজকাল খাওয়া-দাওয়া ভালো জোটে। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে হাসছে অল্প অল্প আর ভাবছে কিছু। বলল, দেয়ার কিচেন ইজ দেয়ার শ্রাইন, দি কুক দেয়ার প্রিস্ট, দি টেবল দেয়ার অলটার অ্যান্ড দেয়ার বেলি দেয়ার গড!

রাগে মুখ লাল ধর্মেন্দ্রবাবুর, চাপা ঝাঁজে বলে উঠলেন, চেনা নেই জানা নেই ঈশ্বরের আশীর্বাদে এসে বসে গিয়ে দিব্বি তো সাঁটছেন মশাই, এ-সব কথার মানে?

—সহজ মানেটা বুঝলেন না? কৌতুক কথা যেন। লোকটার মুখে হাসি ছড়াচ্ছে আবার।—মানে, ভক্তদের কাছে রান্নাঘর হল ঠাকুরঘর, রাঁধুনি তাদের পুরোহিত, খাবার টেবিল তাদের পুজোর বেদী আর তাদের এই পেট হল গিয়ে ভগবান।

—থাক থাক, আর বাংলা করে বোঝাতে হবে না। গলার স্বর বেশি মাত্রায় চড়ল ধর্মেন্দ্রবাবুর।—ওটুকু জ্ঞানবুদ্ধি আমার আছে।...ঈশ্বরের আশীর্বাদে আপনাদের মত লোকেরাই নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে-থাকা গাড়ি ফেল করে, বুঝলেন? ভগবান নিয়ে ঠাট্টা-মসকরা, ভয়-ডর নেই!

লোকটা খানিক ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। চাউনিটা হঠাৎ প্রখর কেমন। নিজের অগোচরেই যেন ভিতর থেকে কথাগুলো উঠে এলো আবার।—আই ফিয়ার গড, অ্যান্ড নেক্সট টু গড আই চিফলি ফিয়ার হিম, হু ফিয়ার্স হিম নট! আমি তোমারে ডরাই প্রভু, আর শুধু তারেই ডরি, তোমাতে যার শংকা নেই কভু।

খাওয়া ভুলে ধর্মেন্দ্রবাবু হাঁ করে লোকটাকে দেখলেন খানিক। তারপরেই খালি বাটিতে এঁটো হাতটা একটু ধুয়ে পকেট থেকে কলম আর নোটবই বার করলেন।—কি বললেন, ওই ইংরেজিটা আর একবার বলুন দেখি মশাই—

লোকটা এবারে জোরে হেসে উঠল, কেন? আর পাঁচজনের কাছে ভক্তি জাহির করবেন? ও আমার কথা নয় মশাই, সাডির কথা, দ্যাট গ্রেট সাডি—

বলতে বলতে পিছন ফিরে তাকাল সে। একসঙ্গে অনেকগুলো লোক ক্যানটিনে ঢুকছে। ধর্মেন্দ্রবাবু স্পষ্ট দেখলেন, মানুষটার চোখে-মুখে অস্বস্তির ছায়া পড়তে লাগল। আর তারপরেই সে উঠে অন্য দরজা দিয়ে হনহন করে বেরিয়ে গেল। তার ডিশে তখনো আধখানা ডেভিল পড়ে আছে।

স্বল্পক্ষণের দেখা ওই অপরিচিত মানুষটাকে হঠাৎ কেন যে একটু ভালো লেগে গেছল ধর্মেন্দ্রবাবু জানেন না। অবশ্য ভালো লাগার মতোই মিষ্টি মুখ আর মিষ্টি হাসি। কিন্তু ধর্মেন্দ্রবাবুর পোড়-খাওয়া চোখে ও-সব ভালো লাগার বস্তু নয়। উল্টে ওই গোছের মিষ্টি মুখ আর মিষ্টি হাসির প্রতি সন্দিগ্ধ তিনি। কিন্তু এ লোকটার ক্ষেত্রে অন্যরকম হল। বসে থাকলে হয়তো এরপর তার জন্যেও আর একটা রোস্টের অর্ডার দিতেন তিনি।

ধর্মেন্দ্রবাবু নিজের বার্থ ধীরে-সুস্থে দখল করে জাঁকিয়ে বসেছেন। দু' বার্থের একটা কুপেই পেয়েছেন তিনি। ওপরের বার্থটা এখন পর্যন্ত খালি। এরপর সামনের কোনো স্টেশন থেকে কেউ উঠবে কিনা জানেন না। এসময়ে এ গাড়িটাতে ভিড় তেমন হয় না, তার ওপর বর্ষাকাল। আর যদি কেউ না এসে পড়ে তো তোফা আরামে এক ঘুমে রাত কাটিয়ে দেবেন। ট্রেনে যাতায়াতে সহযাত্রী খুব একটা পছন্দ করেন না তিনি।

গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা বেজে উঠল। ধর্মেন্দ্রবাবু উঠে এসে করিডোরের জানলা দিয়ে ছাড়ন্ত প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকালেন। তারপরেই হতবাক তিনি। একটা লোক হন্তদন্ত হয়ে গাড়ির কামরা দেখতে দেখতে আসছে। সেই চান্দা, চান্দাবাবু। আগের কামরাটায় উঠতে

চেষ্টা করল, পারল না। তারপর এ কামরা পেরুতে গিয়েও জানলায় ধর্মেন্দ্রবাবুকে দেখে থমকে দাঁড়াল।—মিস্টার গড-ইটার যে! ভালোই হল, আপনার কম্পার্টমেন্টেই ওঠা যাক—

অনুমতির অপেক্ষা না রেখে পাশের দরজা দিয়ে উঠে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনও ছাড়ল। ও-দিকে গড-ইটার শোনামাত্র ধর্মেন্দ্রবাবুর মেজাজ বিগড়লো। জানলা ছেড়ে করিডোরে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

লোকটা হাসিমুখে এগিয়ে এলো। চেনা মুখ দেখেই খুশি যেন। আরো খুশি, কুপের খালি বার্থ দেখে। বলে উঠল, বাঃ, পিছনে এত ভিড় আর আপনার ঘব খালি!

ধুপ্ করে বসে পড়ল। উঃ হাঁপিয়ে গেছি, এ গাড়িটাও ফেল করার দাখিল হয়েছিল।

সত্যিই কপাল ঘামছে লোকটার। গম্ভীবমুখে ধর্মেন্দ্রবাবু তাঁর পাশে বসে লোকটার মুখোমুখি হলেন। বললেন, যাচ্ছিলেন দিল্লী, হঠাৎ এ গাড়িতে উঠে মশাই চললেন কোথায়?

—কেন, এ গাড়ি তো কলকাতায় যাচ্ছে শুনলাম, যাচ্ছে না?

—যাচ্ছে। ধর্মেন্দ্রবাবুর গোল দুই চোখ তার মুখের ওপর এঁটে বসতে লাগল।- -কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদে আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

—কোথায় আবার, কলকাতায়! উঃ, সেই চার বচ্ছব আগে কলকাতায় গেছলাম —আমার কাছে দিল্লী কলকাতা সব সমান, বুঝলেন? বরং দিল্লীর থেকে কলকাতা ভালো।

রাগে বিদ্রূপই করে উঠলেন ধর্মেন্দ্রবাবু, বললেন, চমৎকার বুঝলাম— আরো একটু বুঝতে বাকি, সঙ্গের স্যুটকেস তো দিল্লীর গাড়িতে, হাতেও কুটোটি নেই, ঝাড়া হাত-পায়ে কলকাতায় চললেন, সেখানে কি আপনার শ্বশুরবাড়ি?

লোকটা হাসছে। সেই বকমই সুন্দর হাসি। হাসলে গলা দিয়ে শব্দ বেরোয় না তাও লক্ষ্য করেছেন ধর্মেন্দ্রবাবু। জবাব দিল, না মশাই, শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আমাকে দেখলে ভূত দেখে!... যাক, খাওয়া ছেড়ে মানুষের জন্যেও আপনার একটু দরদ আর ভাবনা-চিন্তা আছে দেখে খুশি হলাম মিস্টার—

বাধা দিয়ে ধর্মেন্দ্রবাবু সরোষে বলে উঠলেন, চৌধুরি, ডি. চৌধুরি, ধর্মেন্দ্র চৌধুরি!

নীরব হাসিতে মুখ ভবাট আবাব।—ধর্মেন্দ্র চৌধুরি! নামটা আপনাকে চমৎকার মানিয়েছে...রিয়েলি!

তিক্তমুখে ধর্মেন্দ্রবাবু ব্যঙ্গ করে উঠলেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদে আপনার নামটিও আপনাকে চমৎকার মানিয়েছে মিস্টার চান্দাবাবু...রিয়েলি!

হাসি মিলিয়ে যেতে লাগল। চোখ-মুখে সন্দিগ্ধ ভাব।—এই নামটা আপনি কোত্থেকে জানলেন?

আপনার যে বন্ধুরা দিল্লীর গাড়িতে উঠে গেলেন তাদের মুখ থেকেই, ক্যানটিনে।

আবার সেই হাসি,—তাই বলুন। আমার নাম চন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ মুখার্জি, কিন্তু সেই নাম আমি সুদ্ধু ভুলে গেছি, এখানে সক্কলে ডাকে চাঁদ মুখার্জি, ওই ছোটদের মুখে চান্দুদা থেকে চান্দা হয়ে গেছি।...বড় ভালোবাসে ওরা আমাকে...ছোঁড়াদুটো পরের স্টেশনে নেমে ফিরে আসবে নিশ্চয়, কিন্তু আমাব শান্তিকুঞ্জে ততক্ষণে অশান্তির ঝড় উঠে যাবে একেবারে।

সেই ঝড়টা কল্পনা করেই লোকটা মিটিমিটি হাসতে লাগল বোধ হয়।

কিন্তু হাসুক আর যা-ই করুক, ধর্মেন্দ্রবাবু এবারে একটু খোঁজখবর নেওয়া দরকার বোধ করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, শান্তিকুঞ্জ বলতে...আপনি যেখানে থাকেন?

চাঁদ মুখার্জি মাথা নেড়ে সায় দিল।—আমি থাকি আর আমার সিলেক্‌টেড জনাকয়েক থাকে।

—শান্তিকুঞ্জ কোথায়?

কোথায় আবার, ওই এলাহাবাদেই।—

—এলাহাবাদে আমি বছরে এক-আধবার আসব এবার থেকে...এলাহাবাদের কোথায়?

প্রশ্নটা পছন্দ হল না মনে হল, ভুরু কুঁচকে বাইরের দিকে চেয়ে অল্প অল্প শিস দিতে লাগল। শ্রান্ত বোঝা যায়, কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম শুকোয়নি তখনো।

একটু অপেক্ষা করে ধর্মেন্দ্রবাবু আবার জিগ্যেস করলেন, এটা আপনার কর্মস্থল বোধহয়?

শিস দেওয়া বন্ধ হল। একটা বিরক্তিসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

ধর্মেন্দ্রবাবু তবু আশা করলেন জবাব পাবেন। কিন্তু পেলেন না। ফলে তিনিও চটছেন মনে মনে।—আপনার আত্মীয়-পরিজনও সব এখানেই থাকেন?

—এত খোঁজে আপনার দরকার কি মশাই? মেয়ের বিয়ে-টিয়ে দেবার ইচ্ছে আমার সঙ্গে? মুখ লাল করে চাঁদ মুখার্জি ঝাঁজিয়ে উঠল এবার।

ধর্মেন্দ্রবাবু থমকালেন একদফা। তারপর রাগ আরো চড়ে গেল। বলে উঠলেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদে সে সখও মেটেনি বুঝি, তা বয়েস কত হল, আর সে-সময় আছে?

চেয়ে আছেন। দেখছেন, লোকটার রাগতে সময় লাগে না, হাসতেও না। লালচে মুখে হাসির মিশেল। জবাব দিল, বয়েস বিয়াল্লিশ, কিন্তু হলে কি হবে, চেহারাখানা দেখছেন তো মশাই, শান্তিকুঞ্জে পালানোর আগে পর্যন্ত ধাড়ি মেয়েগুলো জ্বালিয়ে মেরেছে একেবারে, একবার তো প্রায় ফেঁসেই গেছলাম—

ফেঁসে যাওয়ার চিন্তাটা মনে পড়ছে বলেই যেন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল।—বেজায় গরম লাগছে, চান করব, একটা পরিষ্কার তোয়ালে-টোয়ালে কিছু বার করুন তো—

গায়ের জামাটা খুলে হ্যাঙারে টাঙালো। ঘুরে দেখে ভদ্রলোক চুপচাপ্ মুখের দিকে চেয়ে বসে আছেন।

—কি হল, একটা তোয়ালে-টোয়ালে দেবেন কিছু?

জামা খোলার ফলে পরনে এখন শুধু গেঞ্জি আর পাজামা। তবু লোকটার কোমরের কাছটা একবার ভালো করে দেখে নিলেন ধর্মেন্দ্রবাবু। বিপজ্জনক কিছু থাকলে ওখানেই থাকার কথা। নেই। উঠে ব্যাগ থেকে তোয়ালে বার করে দিলেন।

তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে চলে গেল। ধর্মেন্দ্রবাবু উঠলেন তক্ষুনি। লোকটার ঝোলানো জামার পকেট দুটো বাইরে থেকে টিপে দেখে নিলেন। না, রুমাল আর কিছু খুচরো পয়সা ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব নেই। স্বস্থানে ফিরে এসে বসলেন আবার। মন অবশ্য বলছে, লোকটা উচ্চশিক্ষিত আর ভয়ানক খামখেয়ালি। কিন্তু দিনকালের দরুন অজ্ঞাত সংশয়ও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে আবার। দিল্লী যেতে যেতে এ-ভাবে কেউ কলকাতা

রওনা হতে পারে ভাবা যায় না। দলের লোক অন্য কম্পার্টমেন্টে ঘাপটি মেরে বসে আছে কিনা তাই বা কে বলতে পারে! যদিও এ সংশয় বাতিল করতেই ইচ্ছে করছে তাঁর। তবু সাবধানের মার নেই।

বেশ করে স্নান করে পরিতুষ্ট মুখে বাথরুম থেকে বার হল চাঁদ মুখার্জি। হৃষ্ট সুরে মন্তব্য করল, খাসা চান করা গেল মশাই, আপনাকে পেয়ে আমার বেশ লাভ হল, ইউ আর ওয়ান অফ গড্‌স্ গুড্ মেন।

পয়সা হওয়ার পর থেকে অনেক প্রশংসার কথা শুনে আসছেন ধর্মেন্দ্রবাবু, কিন্তু এই মুখের এ-কথাগুলো কেন শুনতে এত ভালো লাগল জানেন না।

—চিরুনিটা দিন তো!

আয়নার সামনে চিরুনি নামিয়েই রেখেছিলেন। ইশারায় দেখিয়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল একজন। কন্ডাক্টর গার্ড। ধর্মেন্দ্রবাবু নিজের টিকিট বার করে তার হাতে দিলেন। কর্তব্য সেরে গার্ড টিকিট তাঁর হাতে ফেরৎ দিয়ে দ্বিতীয় যাত্রীর দিকে তাকাল।

চাঁদ মুখার্জি পরিপাটি করে মাথা আঁচড়াচ্ছে আর আয়নার ভিতর দিয়ে আগন্তুককে দেখছে। আয়নায় চোখোচোখি হতে ঝকমকে কয়েকটা দাঁত বার করে হাসল একটু।

কন্ডাক্টর গার্ড চেষ্টা করেও হেসে উঠতে পারল না। কারণ এই কুপের দ্বিতীয় প্যাসেঞ্জারটি প্রত্যাশিত নয়। সংশয় মেশানো নরম গলায় জিগ্যেস করল, আপকো হিঁয়াই রিজারভেশন হ্যায় জী?

—হামকো হিয়া কুছ নহীঁ হ্যায় জী। মাথা আঁচড়ানো বন্ধ করে ঝোলানো জামার বুক পকেট থেকে একখানা টিকিট বার করে তার হাতে দিল।—সিরেফ ইয়ে হ্যায়।

আবার মাথা আঁচড়াতে লাগল।

টিকিট দেখে কন্ডাক্টর গার্ডের চক্ষু স্থির। কলকাতার গাড়িতে দিল্লীর টিকিটের যাত্রী! মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে আয়নার ভিতর দিয়ে আবার তার সঙ্গে চোখোচোখি হতে চাঁদ মুখার্জি আর এক দফা মুচকি হেসে তাকে খুশি করতে চাইল।

কন্ডাক্টর গার্ড গম্ভীর।—ইয়ে তো দিল্লী যানেওয়ালী টিকিট হ্যায় সাব—

চিরুনি রেখে চাঁদ মুখার্জি তার মুখোমুখি দাঁড়াল।—জী সাব, ম্যায় ভি দিল্লী যানেওয়ালা থা, মগর আপকা গাড়ি মুঝে ছোড় কর্ চলি গয়ি তো হাম ইহাঁহি চলে আয়ে, উ সাব উইটনেস হ্যায়, পুঁছ লিজিয়ে—

আঙুল তুলে ধর্মেন্দ্রবাবুকে দেখিয়ে দিল।

গার্ডের মুখ লাল।...তো দিল্লীকা থার্ডক্লাস টিকিট লে কর্ আপ কলকাত্তা যানেওয়ালী ফার্স্টক্লাসমে চলে আয়ে?

চোস্ত হিন্দিতে গার্ড আর লোকটায় বাদানুবাদ শুনছেন ধর্মেন্দ্র চৌধুরি।

চাঁদ মুখার্জি অম্লানবদনে জবাব দিল, জী হাঁ। আপকা থার্ডক্লাস্ কম্পার্টমেন্ট বহুত-ই থার্ডরেট হ্যায়, গায়ে-ভয়েসকে তরহ্ একহি কামরেমে সব ঘুসতে হ্যায়। ম্যায় শোচতা আপকা রেলওয়ে মিনিস্টারকো লিখুঙ্গা—

রাগতমুখে গার্ডও এবার ব্যঙ্গ করে উঠল।—বহুত্ আচ্ছা, তব তো লিখনেকে লিয়ে নেক্সট স্টেশন পর আপকো জরুর উতরনা হোগা—

—জী নহীঁ, উতরনেকো কোই বাত নহীঁ, এ টিকিটকা কিরায়ামে হাম যেতনা দূর চল্ সাক্তা চলেঙ্গে। উসকো বাদ আপ উতার দেনা।

কন্ডাক্টর ঝাঁজিয়ে উঠল, বাট ইটস এ টিকেট ফর ডেললি!

চাঁদ মুখার্জির গলায় ডবল ঝাঁজ।—ডেললি অর জাহান্নম, হোয়াটস দ্যাট টু ইউ? জাস্ট টেল্ মি হাউ ফার আই ক্যান ট্র্যাভেল ফর হোয়াট আই হ্যাভ পেড অ্যান্ড গেট আউট!

আরক্তবদন গার্ড এবার ধর্মেন্দ্র চৌধুরির দিকে তাকাল।—জেন্টলম্যান, হোয়াই আরনট্ ইউ অবজেকটিং, ইজ হি ইওর ফ্রেন্ড?

এবারের জবাবটি চাঁদ মুখার্জিই আগেভাগে দিয়ে বসল। হেসে বলল, নট অবজেক্টিং বিকজ হি ইজ এ গুড ম্যান—এ গুড ম্যান ইজ কাইন্ডার ইভন টু হিজ এনিমি দ্যান ব্যাড মেন টু দেয়ার ফ্রেন্ডস!

বাক্য শুনে ধর্মেন্দ্র চৌধুরি দু' চোখ ডবল গোল করে দেখছেন তাকে।

কন্ডাক্টর গার্ড আবার তার শিকারের মুখোমুখি ঘুরল।—কাহাঁ যানে মাঙতা আপ, কলকাত্তা?

—জি হাঁ।

—উহাঁ রহতেঁ আপ?

—কেয়া?

—কাহাঁ ধাম আপকা, কলকাত্তা?

—ধাম! চাঁদ মুখার্জি হেসে উঠল। তারপর যে কথাগুলো বলে গেল, ধর্মেন্দ্র চৌধুরি নিজের কান দুটোকেই যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না। টেনে টেনে বিশুদ্ধ সংস্কৃত বলছে চাঁদ মুখার্জি :

> ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ
> যদগত্বা ন নিবর্তন্তে তৎ ধাম পরমং মম।

ব্যাখ্যাও বাদ গেল না, তেমনি টেনে টেনে বলে গেল, চন্দ্র সূর্য আর আগুন যা প্রকাশে অসমর্থ, যে আশ্রয়ে গেলে জীব আর ফিরে আসে না, সেই আশ্রয় আমার পরম ধাম। গার্ডের মুখের কাছে আঙুল নাড়ল।—লেকিন মিলতে নহীঁ।

যথার্থই হতভম্ব ধর্মেন্দ্র চৌধুরি। আজ আট বছর যাবৎ নৈমিত্তিক গীতা পড়ছেন তিনি। এ যে গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোক! এই লোকটা গীতাও গুলে খেয়েছে নাকি! কন্ডাক্টরকে ছেড়ে হাঁ করে চাঁদ মুখার্জিকেই দেখছেন তিনি।

কিন্তু গীতার মর্ম নিয়ে মাথা ঘামানোর পাত্র নয় কন্ডাক্টর গার্ড। কি করবে ভেবে না পেয়ে সরোষে অ্যালার্ম চেনটার দিকে তাকাল একবার। তারপর অনুচ্চ শান্ত গলায় বলল, আচ্ছা, স্টেশন আনে দিজিয়ে—

অর্থাৎ এ-রকম কেস্ সে দেখে অভ্যস্ত এবং স্টেশন এলে ভালোরকমই ফয়সলা করে ছাড়বে।

টাকার মুখ দেখার পর থেকে এক খাওয়ার ব্যাপার ভিন্ন অন্য কিছুতে বড় একটা

অহেতুক ঝোঁক চাপে না ধর্মেন্দ্র চৌধুরীর। কিন্তু কন্ডাক্টর গার্ড দরজার দিকে পা বাড়াবার আগেই মাথার মধ্যে কিছু একটা ওলট-পালট হয়ে গেল। ফিরে ডেকে বললেন তাকে, লিসন, মিস্টার কন্ডাক্টর!

লোকটা ঘুরে দাঁড়াল।

ঝাঁজালো গলায় জগাখিচুড়ি হিন্দির ঝাপটা মারলেন ধর্মেন্দ্র চৌধুরি।—তুম গোসা কাহে করতা হ্যায়, ঈশ্বরকো আশীর্বাদে তুমকো গোঁসার কওন ধার-ধারতা? রুপয়া বুঝকে নিয়ে কলকাত্তার রিসিট দে দো—

বক্তব্য বোধগম্য হবার পর কিছু প্রাপ্তির আশা কন্ডাক্টর গার্ডের। মোলায়েম গলায় বলল, লেকিন উনকো রিজারভেশান হ্যায় নহী...হাম বন্দোবস্ত কর দেনে সাকতা—

—ভু! ছোটখাট একটা গর্জন করে উঠল চাদ মুখার্জি। লোকটার ওপর ঝাঁপিয়েই পড়ে বুঝি।

ধমকের ঘায়ে লোকটা ধর্মেন্দ্রবাবুর পাশে বসে পড়ে রিসিট বই বার করল। ধর্মেন্দ্রবাবু টাকা বার করলেন। রিসিট লেখা হতে চাদ মুখার্জি সেটা নিল, ওদিকে টাকা গোনার পর কন্ডাক্টর গার্ডের মুখ বেজার। তার কিছু বক্তব্য আছে। কিন্তু বলার চেষ্টা করার আগেই চাদ মুখার্জির সঙ্গে চোখোচোখি হতে উঠে দাঁড়াতে হল। আঙুল তুলে সে তাকে দরজা দেখাচ্ছে।

ভরসা না পেয়ে উঠে চলেই গেল কন্ডাক্টর গার্ড। রিসিটটা ভাঁজ করে ঝোলানো জামার পকেটে রাখতে রাখতে বিরক্তির সুরে চাঁদ মুখার্জি বলল, টাকাই যদি দেবেন এত বকানোর কি দরকার ছিল, আগে বার করে দিলেই পারতেন—

ধর্মেন্দ্রবাবু ড্যাব ড্যাব করে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন খানিক। তারপর বড় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে জবাব দিলেন, আমার ঘাট হয়েছে বাবা, তোমার পাল্লায় পড়ে আমার ভালোই লাভ হচ্ছে, ঈশ্বরের আশীর্বাদে আরো কত বাকি আছে কে জানে! তুমি বয়সে ছোট অনেক, তুমি করে বললে আপত্তি হবে না তো?

চাদ মুখার্জি পাশে বসল। ভুরু কুঁচকে তাকাল একটু।—কেন তুমি করে বলবেন, ওই টাকা কটা দিলেন বলে? কলকাতা গিয়ে ও টাকা আপনাকে আমি শোধ করে দেব।

—ও...আমার ভু-ভুল হয়েছে, আপনি-আজ্ঞেই করব তাহলে!

—না...ঠিক আছে, আপনি পুরুষ মানুষ যখন তুমি করেই বলুন, আপত্তি হবে না—

—তার মানে?

—মানে মেয়েরা পাঁচ-সাত দিনের আলাপের পরেই তুমি চালাতে চায় আর ভারি বিরক্ত করে।

ধর্মেন্দ্রবাবু আবার একটা বড় নিঃশ্বাস ফেললেন, যাক, পুরুষ হয়ে জন্মেছি আমার বাপের ভাগ্যি! তা ঈশ্বরের আশীর্বাদে তোমার পেটে আর কি কি আছে বাবা?

—পেটে? ওই চা, টোস্ট আর ওমলেট খেয়েছিলাম, আর আপনার সঙ্গে যা একটু—

—হা ভগবান! বলি বাংলা ইংরেজি হিন্দি আর সংস্কৃত তো দেখলাম, এছাড়া আর কি আছে?

—ও...! চাঁদ মুখার্জির হাসি মুখ।—আপনি বেশ মজার লোক তো...রাশিয়ান শিখেছিলাম, চর্চার অভাবে ভুলে-টুলে গেছি, এখন বলতে চেষ্টা করলে আপনার ওই হিন্দির মতো শোনাবে—

বলতে বলতে বড়-সড় হাই তুলল একটা।

ধর্মেন্দ্রবাবু জিগ্যেস করলেন, ঘুম পাচ্ছে?

—হ্যাঁ, সমস্ত দিন ধকল গেছে, তা ছাড়া সকাল-সকাল শুয়ে পড়া অভ্যেস—

—তাহলে আর কি, মাথায় উঠে পড়ো।

—মাথায়! ও...আপার বার্থ-এ। ওপরের বার্থ-টা একনজর দেখে নিল।—কিন্তু শুধু গদিটার ওপর শুই কি করে, বাড়তি চাদর-টাদর থাকে তো দিন না...বালিশও তো দুটো আছে দেখছি আপনার—

চমৎকৃত হয়ে ধর্মেন্দ্রবাবু বলে উঠলেন, হ্যাঁ বাবা দিচ্ছি, তোমার জন্যে আজ আমার সব কিছুই বাড়তি...ঈশ্বরের আশীর্বাদে এরপর আমি সুদ্ধ না বাড়তি হয়ে যাই!

খোলা হোল্ড-অল-এর তলা থেকে একটা রঙিন চাদর টেনে বার করলেন।—এই নাও, আমিই পেতে দেব, না কষ্ট করে নিজেই পেতে নিতে পারবে?

বিব্রত মুখে জবাব দিল, কোনদিন তো নিজে এ-সব করি নি, তবু পারব বোধহয়...দিন।

ধর্মেন্দ্রবাবু থমকে তাকালেন মুখের দিকে। চাদরটা হাতে দিতে গিয়েও দিলেন না। নিজেই উঠে অসহিষ্ণু হাতে ওপরের বার্থ-এ চাদরটা বিছিয়ে দিলেন। নিজের একটা বালিশও তুলে নিয়ে ধুপ করে ফেললেন সেখানে। তারপর গোল দুই চোখ সুন্দর মুখখানার ওপর বিঁধিয়ে দিলেন।—বলি ঘরে তো বউ নেই, এত সামলায় কে?

ধর্মেন্দ্রবাবু নিজেই হতভম্ব আবার। লোকটার মুখভাব বদলাচ্ছে। ফর্সা মুখে কঠিন রেখা পড়ছে। তীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ চাউনি তাঁর মুখের ওপর এঁটে বসছে।

—কি হল আবার? না জিগ্যেস করে পারলেন না।

—আপনি কে?

—আমি! ধর্মেন্দ্র চৌধুরিই জলের তলায় যেন।... বা রে, এত সবের পর এতক্ষণ বাদে আমি কে!

—আমার ঘরে বউ নেই আপনি জানলেন কি করে? লোকটার গলার স্বরও চাপা কিন্তু কঠিন।

ধর্মেন্দ্রবাবু হাঁ কয়েক পলক। জবাব দিলেন, কথাটা তোমার ওই শ্রীমুখ থেকেই ফস্‌কে বেরিয়েছিল—

—আমি বলেছিলাম! সংশয় দূর হল না।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বলেছিলে, শান্তিকুঞ্জে না কোন কুঞ্জে পালানোর আগে ধাড়ি-ধাড়ি মেয়েগুলো জ্বালিয়ে মেরেছে, আর বলেছিলে একবার প্রায় ফেঁসেই গেছলে—

নিঃশব্দ হাসিতে মুখখানা ভরাট হল আবার, নিশ্চিন্ত।—তাহলে ঠিক আছে।

—না বাবা, ঠিকের আর একটু বাকি আছে। রাগ চেপে ধর্মেন্দ্রবাবু খুব মোলায়েম করে বললেন, নির্ভয়ে একটা কথা জিগ্যেস করব?

—মেয়েঘটিত?

—না, পুরুষঘটিত।

—তা হলে করুন।

আঙুলে করে নিজের মাথাটা দেখালেন ধর্মেন্দ্রবাবু। বলি এ জায়গাটার সব কিছু ঠিক আছে তো?

এবারে যথার্থই বিস্মিত চাঁদ মুখার্জি। ধর্মেন্দ্রবাবুর মাথাটাই ভালো করে পরখ করছে। এ-রকম কোনো সম্ভাবনার কথা মনেও আসেনি যেন। বলল, কি—কি মুশকিল, নিজের মাথা নিজে জানেন না! ক-কদিন ধরে এরকম সন্দেহ হচ্ছে?

আর রাগ সামলানো সম্ভব হল না। বিড়বিড় করে ধর্মেন্দ্রবাবু বলে উঠলেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমার সবই ঠিক আছে, আমি মহাশয়ের মাথার খবর নিচ্ছি!

—ও...! হাসতে লাগল।—ঈশ্বরের আশীর্বাদে কারো মাথারই সব ঠিক নেই, বুঝলেন? কোনো না কোনো পয়েন্ট-এ সক্কলের মাথাই বিগড়য়, আমারও অমন গোটাকয়েক পয়েন্ট আছে অবশ্য, যেমন কারো ভণ্ডামি দেখলে আমি ক্ষেপে যাই—

—ভ-ভণ্ডামি দেখলে?

—হ্যাঁ, তবে আপনার কোনো ভয় নেই, ওই শানু-দুলালকে মানে স্টেশনে যারা আমাকে তুলে দিতে এসেছিল, ওদের কথা দিয়েছি আর ক্ষেপব না, শুধু দেখেই যাব, ভুলে-টুলে গেলে আমাকে মনে করিয়ে দেবেন তো?

—দেব দেব—। থমকে ঢোক গিললেন ধর্মেন্দ্র চৌধুরি।—দেব মানে, এই রাতের পর তোমার সঙ্গে আর তো আমার দেখাই হচ্ছে না!...তা তোমার ক্ষেপে যাওয়ার গোটাকয়েক পয়েন্টের মধ্যে একটা বললে, আর কি কি পয়েন্ট?

চাঁদ মুখার্জির হাই উঠল আবার। বাক্যালাপ সংক্ষেপে শেষ করতে চাইল।—ও-সব মেয়েদের ব্যাপারে...আপনার শুনে লাভ নেই...এবারে শুয়ে পড়া যাক, কি বলেন?

উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল।

একটা রুষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিজের শয্যা টান করে নিলেন ধর্মেন্দ্রবাবু। তারপর ব্যাগটা টেনে নিয়ে সামনের দাঁত দুটো খুলে কেস-এ রাখলেন। তারপর সহযাত্রীকে দেখানোর উদ্দেশেই যে বস্তুটি বার করলেন ব্যাগ থেকে, সেটার দিকে চোখ পড়তেই দুই চক্ষু বিস্ফারিত চাঁদ মুখার্জির।

—ওটা...ওটা আবার কি মশাই?

লোকটার মুখে-চোখে ভয়ের ছাপ দেখে এবারে যেন মজাই পেলেন ধর্মেন্দ্রবাবু। ওই ব্যাগের মধ্যে সর্বদাই একটা খাপে মোড়া রিভলভার বহন করে থাকেন তিনি! বে-আইনি নয়, লাইসেন্স আছে। ট্রেনে যাতায়াতে খাপ থেকে সেই রিভলভার বার করে বালিশের নিচে রাখেন। দিনকাল এমনিই যে, এটা ছাড়া নিশ্চিন্ত বোধ করেন না।

মিটিমিটি হাসছেন ধর্মেন্দ্রবাবু। খাপ থেকে চকচকে ছোট্ট রিভলভারটা বার করে সামনে ধরলেন। বললেন, অত ভয়ের কি আছে—এটা চিনতে পারছ না?

সভয়ে দু'পা সরে গেল চাঁদ মুখার্জি।—রি-রিভলভার কেন? আপনি কি ডাকাত-টাকাত নাকি?

—তার থেকে একটু ওপরে, আমি ডাকাতের যম। ঈশ্বরের আশীর্বাদে এটা সব সময় আমার সঙ্গে থাকে—

দু'চোখ টান করে ওটার দিকে চেয়ে চাঁদ মুখার্জি বিড়বিড় করে বলল, রিভলভার সঙ্গে থাকে...এ আবার কেমন ধারা আশীর্বাদ ঈশ্বরের...ওটা লক-টক্ করা আছে তো?

—সব ঠিক আছে, আর না বকিয়ে চটপট্ ওপরে উঠে পড়ো তো চাঁদ, শুয়ে লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘুমিয়ে পড়ো—

আর একটি কথা না বলে চাঁদ মুখার্জি সত্যিই ওপরের বার্থ-এ উঠে সটান শুয়ে পড়ল। কিন্তু মুখ দেখলেই বোঝা যায় ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছে সে।

ধর্মেন্দ্রবাবু বন্ধ দরজাটা একবার ভালো করে দেখে নিলেন, তারপর আলো নিভিয়ে নিজের শয্যায় বসলেন। রিভলভার বালিশের নিচে।

সোজা হয়ে বসে দু'হাত জুড়ে প্রাক-নিদ্রার প্রার্থনায় মনোনিবেশ করলেন তিনি।

আবছা অন্ধকারে সামান্য গলা বাড়িয়ে ওপর থেকে চাঁদ মুখার্জি নিরীক্ষণ করছে তাঁকে।

একটু বাদে ধর্মেন্দ্রবাবু মধুসূদন-দুর্গা-শ্রীহরি স্মরণ করে শুয়ে পড়লেন।

গাড়ি বেগে ছুটেছে।

খানিক বাদে ওপর থেকে আবার গলা বাড়ালো চাঁদ মুখার্জি।—ঘুমুলেন নাকি?

—না, কেন?

—এমনি...খোঁজ করছিলাম...।

আবার নীরব খানিকক্ষণ। তারপর আবারও গলা বাড়ালো ওপর থেকে।—একটা কথা, আপনি রাত্রিতে স্বপ্ন-টপ্ন দেখেন না তো মশাই?

—কেন?

—ঘুমের মধ্যে ডাকাতের স্বপ্নটপ্ন দেখে যদি ওই রিভলভার তুলে ঝেড়ে বসেন?

চাপা ঝাঁজে তলা থেকে ধর্মেন্দ্রবাবু জবাব দিলেন, এমনিতে স্বপ্ন দেখি না, তবে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটলে দেখতেও পারি।

ওপর থেকে চাঁদ মুখার্জির ব্যস্ত গলা।—ব্যাঘাত ঘটিয়ে কাজ নেই তাহলে, ঘুমোন আপনি, মধুসূদন দুর্গা শ্রীহরি—

যাঁকে ঘুমুতে বলা হল তিনি কিছুটা নিশ্চিন্ত মনে চোখ বুজলেন। কিন্তু চাঁদ মুখার্জির চোখে ঘুম নেই। সে এপাশ-ওপাশ করছে আর মাঝে মাঝে গলা বাড়িয়ে আবছা অন্ধকার ফুঁড়ে নিচের মানুষটাকে দেখতে চেষ্টা করছে। বালিশের নিচের ওই ভয়ংকর কালো বস্তুটাই অস্বস্তির কারণ।

নিচের লোকের ভারি নিঃশ্বাস ক্রমে গাঢ়তর হতে থাকল। শেষে নাকের গর্জন শুরু হল। চাঁদ মুখার্জি কান পেতে শুনছে আর অপেক্ষা করছে যেন। শয্যা ছেড়ে আবার নিচের দিকে ঝুঁকল। অন্ধকারে একহাতে চেনটা ধরে পেটের প্রায় আধখানা নিচে ঝুলিয়ে দিল চাঁদ মুখার্জি। তারপরেই যে বস্তুটার দরুন অস্বস্তি সেটা তার হাতে উঠে এলো।

কিন্তু নিজের বালিশের তলায়ও ওটা রাখা গেল না। মাথার চাপে আচমকা কি বিভ্রাট ঘটে যায় ঠিক কি। মাথার ওপরে ছোট মাল রাখার তারের তাকটার ওপর তুলে দিল হাতের জিনিসটা। তারপর গায়ের গেঞ্জিটা খুলে তাই দিয়ে মুখের ঘাম মুছে সেটা ওই জিনিসটার ওপর ফেলে দিল। নিশ্চিন্ত। গেঞ্জির তলায় কি আছে কেউ দেখতে পাবে না, বুঝতেও পারবে না।

এক হ্যাঁচকা টানে মাথার বালিশটা সরে যেতে ধড়মড় করে উঠে বসল চাঁদ মুখার্জি। পরক্ষণে ধর্মেন্দ্রবাবুর মুখের দিকে চেয়ে ঘাবড়েই গেল। সকাল হয়েছে আরো বোধহয় ঘণ্টাখানেক আগে। ভোরের বাতাসে ঘুমের মধ্যেও শীত-শীত করছিল চাঁদ মুখার্জির। কিন্তু ধর্মেন্দ্রবাবুর ভারী মুখ ঘামে ভিজে জবজব করছে। একহাতে ওপরের বাঙ্কের শেকল ধরে ঝুলে আছেন। চোখে-মুখে একটা দিশেহারা আতঙ্ক ভাব। সাংঘাতিক কিছুই ঘটে গেছে যেন। চাঁদ মুখার্জির বালিশ সরানোর পর তেমনি অসহিষ্ণু ক্ষিপ্র হাতে চাদরের আধখানাও তুলে ফেললেন।

—যা খুঁজছেন, নেই! সেই অবস্থাতেই ওপরের বসা মানুষের মুখটাকে যেন নিজের গোল দুই চোখের গহ্বরে টেনে নিতে চাইলেন তিনি।

হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছে চাঁদ মুখার্জিও। এভাবে টানা-হেঁচড়ার ফলে ঘুমের অবসাদ ছুটে গেছে। তবু বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত। কি হতে পারে ভেবে না পেয়ে জিগ্যেস করল, এরকম করছেন কেন, খিদে পেয়েছে নাকি?

তার মুখের ওপর ধর্মেন্দ্রবাবু ডান হাতের আঙুল দিয়ে রিভলভারের ট্রিগার টানলেন বার দুই, সেই সঙ্গে আর্ত গর্জন।—কোথায়?

এবারে ব্যাপার বোধগম্য হল। একটু সরে এসে হাত উঁচিয়ে তারের সেলফ থেকে সন্তর্পণে গেঞ্জি সমেত বস্তুটা নামালো।

হারানিধি হাতে পেয়ে ধর্মেন্দ্র চৌধুরি ঝুপ করে নিচে নেমে ধপ করে নিজের বার্থ-এ বসে পড়লেন। হাঁপাচ্ছেন তখনো। ভয়ানক একটা ফাঁড়া কাটল যেন। গেঞ্জি গায়ে পরে চাঁদ মুখার্জি নেমে আসতে আসতে বলল, চোর-ডাকাতের সুবিধের জন্যে এ জিনিস আর বালিশের নিচে রেখে ঘুমুবেন না—

পাশে বসতে গেল। কিন্তু তার আগেই ভদ্রলোকের শরীরের সব রক্ত মাথায় উঠল। রিভলভারটা তার দিকে বাগিয়ে ধরে চিৎকার করে উঠলেন, গেট আউট! গেট আউট, আমার চোখের সুমুখ থেকে দূর হয়ে যাও, নইলে তোমাকে আমি খুন করব!

সভয়ে দু'পা পিছিয়ে গেল চাঁদ মুখার্জি।—মা-মাথা খারাপ নাকি! চলন্ত ট্রেনে কোথায় গেট আউট হব? রিভলভার সরান, ওসব ইয়ারকি আমার ভালো লাগে না, কলকাতায় পৌঁছে আমি আপনার লাইসেন্স কেড়ে নেবার জন্যে চিঠি লিখব!

## দুই

দক্ষিণ কলকাতার এক অভিজাত এলাকায় বেশ বড়সড় একটা বাংলো প্যাটার্নের একতলা বাড়ি। বাড়িটার আকার সিকিভাগ চাঁদের মাথার মতো ঘোরানো। সামনে ছোট একটু বাগানের মতো। বছর দুই আগেও বাড়িটার চকমকে রূপ দেখেছে আশপাশের মানুষেরা। সামনের বাগানটুকুর তকতকে শোভা দেখেছে। আর ওই বাড়িতে হামেশাই গাড়ি-হাঁকানো হোমরাচোমরা জনদের আনাগোনা দেখেছে।

বাড়িটা আগে যেমন পাড়া-পড়শীদের চোখ টানত এখন আর ততো টানে না। দু'বছরের সংস্কারের অভাবে আগের তুলনায় মলিন দশা। মালির পরিচর্যার অভাবে সামনের বাগানটুকুর এলোমেলো দশা। কিন্তু এ বাড়ির কথা উঠলে এখনো ঠোঁট-কাটা

দু'দশজন কু-কথা বলতে ছাড়ে না। বলে, ওই বাড়ির চটক দেখিয়েই ভদ্রলোক ফেঁসেছে, আর তারপর চালাক হয়েছে, এখনো ওই বাড়ি ঝাড়া-মোছা করলে কোন্ না লাখ দেড়-দুই বেরুবে!

ভদ্রলোক বলতে বাড়ির মালিক সত্যশরণ রায়। বেসরকারী কলেজের সাধারণ মাস্টার ছিলেন একসময়। আর তার আগে থেকেই রাজনীতির মাঠে সক্রিয়ভাবে নেমে পড়েছিলেন। দিন কতক জেলও খেটেছিলেন শোনা যায়। বছর আড়াই আগেও তাঁর ভাগ্যের ছক তুঙ্গ দশায় জ্বলজ্বল করছিল। প্রথমে ছোট মন্ত্রী, পরে বড় মন্ত্রী হয়েছেন। এখানকার এই জমিটা বহুকাল আগে ঠাকুরদার আমলে কেনা ছিল। আর বেশ বড়সড় একটা বস্তি গজিয়ে উঠেছিল এখানে। সবে তখন পাড়ার চেহারাখানা অভিজাত গোছের হয়ে উঠছিল। তার মধ্যে এই বস্তি অনেকের চোখে একটা দগদগে ঘায়ের মতো।

ছোট মিনিস্টার থাকাকালীনই ইচ্ছে করলে সত্যশরণ রায় ওই বস্তি উচ্ছেদ করে নিজের জমি অনায়াসে দখল করতে পারতেন। কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো তা করেননি। বড় মন্ত্রী হবার আগেই আইনমাফিক বস্তি উচ্ছেদের মহড়া শুরু হয়ে গেছে। তারপর নিজের জমি দখলদারির ব্যাপারে আর একটুও বেগ পেতে হয়নি। ফুল মিনিস্টার হবার ছ'মাসের মধ্যে এই বাড়ি শুরু করেছিলেন। দেখতে দেখতে শেষও হয়েছে। মাগগি বাজারে ইট সিমেন্ট চুন সুরকি কাঠ লোহার অঢেল আমদানি দেখেছে পড়শীরা। তখনো চোখ টাটিয়েছে হয়তো অনেকের, কিন্তু মুখে রা কাটবে কে?

তারপর এই বাড়িতে গৃহপ্রবেশের সেই ধুমধামও সকলেরই মনে আছে। এখানকার নেতা-স্থানীয় সকলেরই পদার্পণ ঘটেছে সেই শুভ দিনটিতে। আরো বহু নামীজনের আর গুণীজনেরও শুভাগমন ঘটেছে।

তারপর...ফুরাল দিন কখন নাহি জানি।

বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ একটা দুর্নীতিপরায়ণতার ধুয়া উঠল কোথা থেকে। খবরের কাগজে টিকা-টিপ্পনী শুরু হল। অ্যাসেমব্লিতে আর মাঠে ময়দানে বিপক্ষ দলের প্রতিবাদ আর তদন্তের দাবির সুর চড়তে লাগল। জনা-কতকের সঙ্গে সত্যশরণ রায়ের নামটাও জড়িয়ে গেল কেমন করে। ভিতরের শত্রুদের করসাজিও হতে পারে। মানুষটা ভিতরে ভিতরে একটু নিরীহ গোছের বলে অনেক বিশ্বস্ত জন অনেক কিছু আদায় করে ছেড়েছে বটে তাঁর কাছ থেকে। এমন কি গুডস ট্রান্সপোর্টের শাঁসালো লাইসেন্স বার করে দেওয়ার সহায়তা করে নিজের বড় সম্বন্ধী ধর্মেন্দ্র চৌধুরিরও অনেককালের দুঃখ ঘুচিয়েছেন। এখন তাঁর হেপাজতের ছ-সাতখানা বড় ট্রাক মাল নিয়ে হামেশাই দিক্‌বিদিকে ছোটাছুটি করছে। এ-রকম নিতান্ত আপনার যোগ্যজনদের একটু-আধটু দেখাশুনা সকলেই করে থাকে। কিন্তু শুধু সত্যশরণ রায় এবং আর জনাকয়েকের বেলাতেই এই সব কিছু দুর্নীতিজনিত অপরাধের নজির হয়ে দাঁড়াল। এমন কি এই বাড়িটাও।

সত্যশরণবাবু ভিতরে ভিতরে দমে গেলেন এবং বাইরে মেজাজে ফুটতে লাগলেন। খবরের কাগজে জোরালো স্টেটমেন্ট দিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সমস্ত অভিযোগ খণ্ডন করলেন। পৈতৃক জমিতে বাড়ি তোলার টাকা আমদানীর একটা জোরদার উৎসও দেখালেন। আর তারপর, যে দেশবাসীর সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন সেই

দেশবাসীর কান বিষনোর অভিমানে কাজে ইস্তফা দিয়ে সোজা মন্ত্রিত্বের গদি ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন। এমন তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে তাঁর মুরুব্বিরা অনেকে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু জোর গলায় তিনি তখন সাধারণ নাগরিকের মতোই দেশসেবা-ব্রত গ্রহণের সদিচ্ছা ঘোষণা করেছেন।

এতে সাময়িক সুফল অবশ্যই হয়েছে। সমস্ত কাগজেই তাঁর প্রশংসার ফিরিস্তি বেরিয়েছে। কিন্তু রাজনীতির প্রথম সারি থেকে সরে আসার দরুন ক্রমশ যে জ্যোতিশূন্য হয়ে পড়বেন তিনি, জানা কথাই। এখন তাঁকে সব থেকে বেশি নির্বোধ ভাবেন তাঁর ঘরের স্ত্রী কল্পনা দেবী। অবশ্য সেই দুঃসময়ে তাঁরও মুখ শুকিয়ে আমসি। কিন্তু তা বলে সাততাড়াতাড়ি গদি ছাড়ার পরামর্শ তিনি দেননি। অন্য ক'জনের নামের অভিযোগ তো কর্তাদের ইচ্ছেয় বেশ সহজেই নাকচ হয়ে ধামাচাপা পড়ে গেল। দুরবস্থা আর কাকে বলে!

চালু সরকারের হোমরাচোমরা জনদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগাযোগ এখনো অবশ্যই আছে সত্যশরণবাবুর। কিন্তু এখন নিজের গরজে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়। তাদের মারফৎ কাজকর্ম জুটিয়ে রোজগারও যে একেবারে না হয় এমন নয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সে রোজগার যেমন যৎসামান্য, তেমনি অনিশ্চিত। তাঁর সুদিনের অধ্যায়ে খরচের হাতখানা গৃহিণী কল্পনা দেবী এমনই করে ফেলেছেন যে, সে হাত সঙ্কুচিত হবার আশা সত্যশরণবাবু রাখেন না। আর মেয়েটা যেন মায়ের ওপর দিয়ে যায়। নিজেদের গাড়ি বেচে দিতে হয়েছিল বলে মেয়ে তো নাওয়া-খাওয়া ছেড়েছিল। বাসে কলেজে যাবে? ট্রামে? কলেজের ছেলে-মেয়েদের কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে?

শেষে মামার অর্থাৎ ধর্মেন্দ্র চৌধুরির মধ্যস্থতায় মান বেঁচেছে। তাঁর ফয়সলায় ভাগ্নি আর তার মা তাঁর গাড়িখানা এখনো নিজেদের গাড়ির মতোই ব্যবহার করতে পারছে। শুধু গাড়ি নয়, স্ত্রী আর মেয়ের শাড়ি গয়না প্রসাধন সিনেমা থিয়েটার ক্লাব পার্টির মান রক্ষার দায়েও ভদ্রলোকের হিমসিম অবস্থা। চার ভাগের তিন ভাগ দায় এখন সামলে চলেছেন বলতে গেলে ওই ধর্মেন্দ্র চৌধুরি। ভগবান-ভীরু ওই মানুষটাকে সততার অপবাদ এই ব্যাপারে অন্তত কেউ দেবে না। সেই শাঁসালো লাইসেন্স পাওয়ার আগেই তিনি বোন আর ভগ্নিপতির কাছে ঘোষণা করেছিলেন, আসল লাভের চার আনা তাঁদের দেবেন। তাই দিয়ে চলেছেন। তাছাড়া গোড়ার দিকে ট্রাক কেনার ব্যাপারে নামমাত্র সুদে সরকারী মূলধন সংগ্রহও এই ভগ্নিপতির কল্যাণেই হয়েছিল। সেই কৃতজ্ঞতাও আছে।

না, চার আনা লাভের অংশ পাওয়ার ব্যাপারে দাদাকে অবিশ্বাস করেন না কল্পনা দেবী, কিন্তু সেই পাওনাটা যথা-বিধি লেখা-পড়া করা নেই বলে ভিতরে ভিতরে একটু খুঁত-খুঁতুনি আছে। দাদা যতদিন আছেন ঠিক আছে, বোনকে ভালোবাসেন তিনি আর ভাগ্নি তো তাঁর চোখের মণি, কিন্তু ভগবান না করুন, দাদার হঠাৎ কিছু একটা হয়ে বসলে, তখন? যে দু'দুটো দুর্দান্ত ছেলে দাদার, ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে গেলে পিসী হলেও বুক কাঁপে। ওদের বাপই ভয়ে অস্থির, পিসী কোন্ ছার! ওই হাড়পাজি ছেলেদুটোর কত যে তোয়াজ করেন কল্পনা দেবী ঠিক নেই, ওদের সেই কোন্ যুগের মরা মায়ের কথা স্মরণ করে চোখে আঁচল তোলেন আর সঙ্গে সঙ্গে বাঁদরদুটো দুড়দাড় পালায়। কান্না-টান্না ওরা ঠিক হজম করতে পারে না।...বাপের ব্যবসার চার আনা অংশ কাগজে-

কলমে লেখাপড়া হয়ে না থাকলে ভবিষ্যতে ওই ছেলেরা এক পয়সাও ঠেকাবে! চার আনা কেন, দাদার কাছ থেকে মনে মনে ছ'আনাই আশা করেন কল্পনা দেবী, ভাগ্নিকে মেয়ের মতো ভালোবাসে যখন তার নামে দু'আনা অন্তত লিখে দেওয়া উচিত। কিন্তু হাজার ইচ্ছে থাকলেও এখন পর্যন্ত দাদাকে এসব কথা বলে উঠতে পারেননি তিনি। আর সেই কারণেও স্বামীর ওপর রাগ তাঁর। একটু বুদ্ধি খাটিয়ে তাঁরই এই ব্যাপারটার ফয়সলা করে নেওয়া উচিত।

চায়ের টেবিলে বসে মন দিয়ে কাগজ পড়ছিলেন সত্যশরণবাবু। পর-পর তিন কাপ চা-সহযোগে দু'খানা কাগজ আদ্যোপান্ত পড়ে ওঠা অনেক দিনের অভ্যাস। আজও কোথায় কি ঘটল, কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ রটল, বা কোন নেতা কি নিয়ে বক্তৃতা ঝাড়ল এসবে অনেক রস পান তিনি।

আর সকালের এই চায়ের আসরে বসেই স্বামীর কানে সংসারের যাবতীয় সমস্যা আর তার সমাধানের প্রসঙ্গ তুলে থাকেন কল্পনা দেবী। দরকার মতো আবেদন-নিবেদন করেন, আবার প্রয়োজনে মুখঝামটাও দেন। স্বামীটি বাইরে গম্ভীর গোছের হলেও ভিতরে ভিতরে তেমন সরল যে নন সেটা তার মন্ত্রিত্ব ছাড়ার কালেই টের পেয়েছেন কল্পনা দেবী, এখন তো ভালোরকমই পাচ্ছেন।

আজও নৈমিত্তিক সমস্যা থেকে অন্য প্রসঙ্গে পা বাড়িয়েছিলেন তিনি। নৈমিত্তিক সমস্যা বলতে, মাসের বরাদ্দ খরচের টাকায় আর কুলিয়ে উঠছে না, চাল ডাল তেল নুন মশলার সব কিছু আগুন দাম হয়ে গেল, যেমন কপাল, এসব তুচ্ছ ব্যাপারেও মাথা গরম হওয়ার দাখিল এখন। তার ওপর আর এক ব্যাপার তো এসেই গেল, তাঁদের বিয়ের পঁচিশ বছর পূর্ণ হতে মাঝে মাত্র আর দেড় মাস বাকি। অন্যান্যবার থেকে এবারে অন্যরকম একটু কিছু তো করতেই হবে, আর গণ্যমান্য জনদেরও সকলকে ডাকতেই হবে। আর ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই মন্ত্রিদের সকলকে যেভাবে হোক ধরে আনার চেষ্টা করা উচিত। সেভাবে না ডাকলে তারা আসবে কেন, গত দু'বছরে তো ডাকাই হয়নি তাদের। —তাছাড়া ওই উপলক্ষে আমাকে কি দেবে না দেবে তুমিই জানো, সেজন্যে ভাবি না, কিন্তু মেয়েটা বায়না ধরেছে তার একখানা ভালো শাড়ি আর সর্বদা পরার মতো সরু একছড়া হার চাই। না দিলে এবারে আর ওকে ঠাণ্ডা রাখা যাবে না। ওদিকে আমোদিনীর পর্যন্ত এবারে একখানা ভালো শাড়ি না হলে মন উঠবে না, আমাকে আগে থাকতেই শুনিয়ে রেখেছে।

আমোদিনী হল এ বাড়ির আয়া। ঝি বললে তার মেজাজ বিগড়য়। বছর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিরিশের নিঃসন্তান বিধবা রমণী। দেখতে মোটামুটি ভদ্র। অনেক কাল আছে এই বাড়িতে, কম করে চৌদ্দ বছর হবে। বাড়ির একমাত্র মেয়ে স্বপ্নার তখন সাত বছর বয়েস। তার দাবিও উপেক্ষার ব্যাপার নয়।

খবরের কাগজের আড়ালে সত্যশরণবাবুর সামনাসামনি মুখ দেখা যাচ্ছিল না। কানের দু'পাশের কাঁচা-পাকা চুলের খানিকটা অংশ শুধু দেখা যাচ্ছিল। এই পাক ধরেছে মাত্র দু'বছরের মধ্যে। এখন তাঁর বয়েস পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই। আর কল্পনা দেবীর তেতাল্লিশ।

আর মেয়ে স্বপ্নার একুশ। কল্পনা দেবীর ধারণা এখনো নিজেকে তেত্রিশ বলে চালিয়ে দেওয়া যায়, আর মেয়েকে তো পনের-ষোলর চোখে দেখেন। ভদ্রলোকের কানের দু'পাশের ওই পাকধরা চুল মা-মেয়ে দুজনেরই চক্ষুশূল। প্রায়ই তারা ওই দুটো দিকে কলপ লাগানোর কথা বলে।

কল্পনা দেবীর খেদ বা প্রস্তাবনা ভদ্রলোকের কানে যাচ্ছে কিনা বোঝার উপায় নেই। একমনে কাগজ পড়ে চলেছেন তিনি। তবু স্ত্রীর মুখের কামাই নেই, কারণ তিনি ঠিকই জানেন কানে যাচ্ছে। ওদিকে মেয়ে স্বপ্না এসে বারকয়েক ঘুর-ঘুর করে গেল। মনে মনে বিরক্ত, মায়েরও থামার নাম নেই, বাবারও কাগজ পড়ার বিরাম নেই। আজ মাথায় এসেছে কলেজ যাবে না, সেই কারণেই রঞ্জনকে টেলিফোন করা জরুরী দরকার তার। টেলিফোনটা এখন আবার এইখানে হাটের মধ্যে। আরো দুটো প্লাগ পয়েন্ট আছে টেলিফোনের, একটা বাবার আর সকলের বসার ঘরে, আর একটা ওর ঘরে। ওর ঘরেরটা আগে ছিল না, আড়াই বছর আগে জোরজবরদস্তি করে করিয়ে নিয়েছে। তখন অনেক কিছু করা সহজ ছিল, কারণ বাবা ঢের বেশি উদার ছিল তখন। এখন তো সামনাসামনি চারবার ডায়েল ঘোরাতে দেখলে বা দশ মিনিটের বেশি কথা বলতে দেখলেই রেগে যায়। মন্ত্রিত্ব যাবার ক'দিনের মধ্যেই সরকারী টেলিফোন হাওয়া, এখন এই একটাই ভরসা। তার ফলে যত অসুবিধে স্বপ্নার। ওই এক টেলিফোনের ওপরেই বাবা মা মামা সকলের হামলা। এখন একটু বেশি সময় ধরে টেলিফোন করলেই বাবার লেকচার শুরু হয়, টেলিফোনটা একটা এমারজেন্সির ব্যাপার এটা শিখবি কবে?

একটু ফাঁক পেলে টেলিফোনটা নিজের ঘরে সরিয়ে নেবার মতলবে আনাগোনা করছিল সে, বাবার কাগজ পড়ার ফাঁকে পারা যেত, কিন্তু মা মুখোমুখি বসে। খট করে বলে বসবে, আবার টেলিফোন নিয়ে চললি কোথায়?

যাক, আমোদিনীর কল্যাণে মায়ের বচন বন্ধ হল আপাতত। দরজার কাছে এসে সে ডাকল, দিদিমণি শোনো তো একটু—

কর্তার মাস্টারির আমলে দিদিমণি ডাকত, এখনো তাই ডাকে। মন্ত্রিত্বের আমলে সকলের সামনে এই ডাকটা খুব পছন্দ করতেন না কল্পনা দেবী, এখন আবার কান-সওয়া হয়ে গেছে। ওর হাব-ভাব চাল-চলনের অনেক কিছুই পছন্দ নয়, কিন্তু সবই বরদাস্ত করতে হয়—কারণ সুপটু হাতে সংসারটা বলতে গেলে ও-ই চালিয়ে যাচ্ছে। স্বামীর ছোট-বড় মন্ত্রিত্বের আমলে কল্পনা দেবীরও কি ফুরসৎ ছিল? সভা-সমিতি, পারিতোষিক বিতরণ, উদ্বোধন, ভিত্তিস্থাপন ইত্যাদি ইত্যাদি তো লেগেই ছিল, স্বামীর গর্বে গরবিনী হয়ে কোনখানে বা না যেতেন তিনি? অতএব সংসারের ব্যাপারে তাঁর শুধু সুপারভিশন, হাতে-কলমে সব কিছু আমোদিনীকেই করতে হত। এখনো করছে। ওর একটু পায়াভারি হবে সে আর আশ্চর্য কি!

ভিতরের ঘরে উঠে এলেন কল্পনা দেবী। আমোদিনী বিরক্তমুখে জানান দিল, সরষের তেল ফুরিয়েছে, টাকা বার করো।

চোখ কপালে তুললেন কল্পনা দেবী। ঝাঁজালো সুরে বললেন, এরই মধ্যে তেল ফুরলো, কত তেল ঢালিস তুই! এই সেদিন না তিন কেজির টিন নিয়ে এলি একটা?

তক্ষুনি একটা হাত কপালে উঠল আমোদিনীরও।—হায়রে কপাল, দিনে দিনে কি

নজর হল গো তোমার দিদি, তেল কি আমি নিজের পায়ে মাখি না নিজের গলায় ঢালি! রান্নার একটু ইদিক-ওদিক হলে তো কারো মুখে উঠবে না, আর সেদিন বলতেও ছ'দিন হয়ে গেল!

এক কথা বললে ও ওই রকম পাঁচ কথা শোনাবে। বাক্যব্যয় না করে কল্পনা দেবী ব্যাগের সন্ধানে স্বামীর পকেটে হাত ঢোকালেন। মাসের শেষে খরচের টাকা প্রায় শেষ। এক কেজি তেলের দাম দিয়ে ব্যাগটা পকেটে সবে রেখেছেন, কোথা থেকে ব্যস্তমুখে মেয়ে এগিয়ে এলো।

—বাবার পকেট থেকে সরালে নাকি কিছু?

কল্পনা ধমকে উঠলেন, মেয়ের কথার ছিরি দেখ না, না নিলে আসবে কোত্থেকে?

—বেশ করেছ। আমাকে দশটা টাকা দাও দেখি!

—কেন? তোর এক্ষুনি দশ টাকা কিসের দরকার?

মেয়ের চোখে-মুখে বিরক্তি।... বা রে, আজ তিনটের শোয় সিনেমা যাব ঠিক করলাম না!

—কখন ঠিক করলি, কার সঙ্গে? আর সিনেমা দেখতে দশ টাকাই বা লাগবে কেন?

ব্যস, মেয়ের মেজাজ চড়ল তক্ষুনি। সর্বাঙ্গে একটা রাগের তরঙ্গ তুলে ঝংকার দিয়ে উঠল, বাবারে বাবারে বাবা, কিছু চাইলেই আজকাল কেবল হিসেব আর হিসেব, মামা এখানে থাকলে তোমাদের কাছে কিছু চাইতেও ঘেন্না করে—

সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মেজাজও তপ্ত। হিসেব মোটামুটি তাঁকে সত্যিই রাখতে হয় আজকাল।—একদিন দু'দিন পরে পরেই পাঁচ টাকা দশ টাকা করে নিচ্ছিস, আর কিছু চাইতে ঘেন্না করে তোর? সপ্তাহে তিনটে করে সিনেমা দেখারই বা কি দরকার?

সামান্য গলা নামিয়ে মেয়ে জবাব দিল, তুমি কোনো কোনো সপ্তাহে চারটেও দেখো!

—কি বললি? আমি সপ্তাহে চারটে ছেড়ে সাতটা দেখব, তোর তাতে কি? আমার মতো মাথায় ভাবনার পাহাড় বয়ে বেড়াস. তুই যে আমার সঙ্গে তুলনা দিতে এসেছিস? মেয়ের গানের মাস্টার, নাচের মাস্টার, দু'বছর ধরে বি. এ. পরীক্ষায় ফেল করছেন তার মাস্টার, খরচের অন্ত নেই, আমি ক'টা সিনেমা দেখে ক'টাকা খরচ করি তার হিসেব নিতে এসেছে! রাগ করেই আবার স্বামীর জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে ব্যাগ বার করলেন কল্পনা দেবী। একটা দশ টাকার নোট মেয়ের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ব্যাগ যথাস্থানে রেখে দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

পিছন থেকে মা-কে একটা ভেঙচি কেটে এবং হাসি চেপে স্বপ্না মাটি থেকে দশ টাকার নোটটা কুড়িয়ে নিল।

মানুষটা তখনো কাগজ নিয়ে তন্ময় হয়ে বসে আছে দেখে কল্পনা ভিতরে ভিতরে বিরক্ত। কাগজটা এখন টেবিলের ওপর নেমে এসেছে এবং তিনি তার ওপর ঝুঁকে পড়েছেন। কিছু একটা বিশেষ খবরই হবে।

—তোমার আর চা চাই নাকি?

কাগজের ওপর চোখ রেখে সত্যশরণ জবাব দিলেন, না, একটা কাঁচি।

—কাঁচি! কাঁচি কি হবে?

—দরকার আছে।

ঘর থেকে কাঁচি এনে দিলেন। সেটা হাতে নিয়ে সত্যশরণ কচকচ করে কাগজের দরকারী খবরের অংশ কেটে বার করলেন। তারপর সেটা সযত্নে ভাঁজ করতে লাগলেন।

সেই ছোট মন্ত্রী থাকাকালীন প্রায় রোজই তাঁকে কাগজের কাটিং রাখতে দেখতেন কল্পনা। তিন-চারটে ফাইলই হয়ে গেছল এই করে। কিন্তু বছর কতকের মধ্যে আর এ-রকম আগ্রহ দেখেন নি। কাটিং-এর ফাইল তখন জঞ্জাল হয়ে পড়ে আছে। তাই ঈষৎ উৎসুক তিনিও। জিগ্যেস করলেন, কাটিং রাখছ যে, কি এমন জরুরী খবর?

—জরুরী নয়, সাংঘাতিক খবর।

—কি?

হাতের কাছে দ্বিতীয় কাগজটা টেনে নিয়ে সত্যশরণ জবাব দিলেন, এটা একটা কোর্ট-কেস। বেশ থ্রিলিং। স্ত্রী স্বামীর নামে ফৌজদারি নালিশ করেছে।

—সে আবার কি? কেন?

জবাবটা এবারে একটু ধীরে সুস্থে দিলেন সত্যশরণ। বললেন, স্বামী হাতের কাছের ভারি পেপারওয়েট তুলে তার ওই স্ত্রীর মাথায় এমন মেরে বসেছিল যে, মাথা ফেটে দু'ফাঁক। মাস দুই বাদে হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই স্ত্রী নালিশ ঠুকেছে।

—বেশ করেছে। কল্পনার উষ্ণ মন্তব্য।—স্বামীটা কি গুণ্ডা মাতাল নাকি?

—না, বেশ নিরীহ, শিক্ষিত সভ্যভব্য। হঠাৎ রাগ হয়ে গেল, তাই—

—কেন? এ-রকম হঠাৎ রাগ হয়ে গেল কেন? কথাবার্তার ধরন দেখে ভিতরে ভিতরে কেমন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন কল্পনা।

দ্বিতীয় কাগজে চোখ রেখে সত্যশরণ বললেন, স্ত্রী যখন-তখন স্বামীর জামার পকেটে হাত ঢোকাত, তাই...।

কল্পনা থমকালেন এক দফা। ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন।—তা তুমি এই কাটিং ভাঁজ করে রাখছ কেন?

তখনো কাগজের দিকে চোখ সত্যশরণের।—আমি এটা আমার জামার পকেটে রেখে দেব—তাই।

স্বামীকে হাসতে দেখলে কল্পনা বিষম রেগে উঠতেন। কিন্তু অতিরিক্ত গম্ভীর দেখে নিজেই হেসে উঠলেন। সদ্য সদ্য বারো আর দশে বাইশ টাকা সরিয়েছেন তার পকেট থেকে সেটা টের পেয়েছে নিশ্চয়। বললেন, কি-যে ঠাট্টা করো সব সময়, ভালো লাগে না...তোমার আর কি, আমার বলে চিন্তায় চিন্তায় ঘুম নেই চোখে!

দ্বিতীয় দফা কাগজের পাতা ওলটাতে ওলটাতে সত্যশরণ বললেন, আর কত ঘুম দরকার, সাতটা সাড়ে সাতটার আগে তো ঘুম থেকে ওঠো না—

—সে তো প্রায়রাতে ঘুমের ওষুধ খাই বলে। নিজের বক্তব্যে ফিরে আসার চেষ্টা কল্পনার।—যাক, অতক্ষণ ধরে যে বকর-বকর করে গেলাম, কিছু কানে ঢুকেছে, না ঢোকে নি?

—ঢুকেছে।

—কি বলো তো?

—আমোদিনীর ভালো শাড়ি চাই।

—বাঃ! আধাআধি মেজাজ চড়ল।—অত কথার মধ্যে শুধু ওই কথাটা তোমার কানে ঢুকল!

—ও না হলে সংসার অচল তাই ওর কথাটাই মনে আছে বোধ হয়, আর কি বলছিলে বলো—

বলা মাথায় উঠল কল্পনার।—কি? আমোদিনী ছাড়া সংসার অচল আর আমরা সংসারের কেউ না? সংসারের কোনো কাজে লাগি না? বেশ, থাকো তুমি তাহলে ওকে নিয়ে, আমরা মা-মেয়ে যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব—

ওদিকে আড়াল থেকে সকলের কথায় কান পাতার স্বভাব আমোদিনীর। ভজুকে তেল আনতে পাঠিয়ে সে তার জায়গামতো দাঁড়িয়ে কর্তাগিন্নির নরম-গরম কথা-বার্তার রসাস্বাদন করছিল। এ নতুন কিছু নয়। কিন্তু এ-রকম কথা কানে গেলে লজ্জা না হয় কার, আমোদিনী দু' আঙুল জিভ কাটল।

—কি মুশকিল! সামাল দেবার চেষ্টায় এদিকে ডবল বিরক্ত সত্যশরণ।—তোমাদেরটা তো মনে আছেই, সে আর বলার কি আছে, এবারের ইমপরট্যান্ট অকেশনে আমোদিনীর কথাও ভুললে চলবে না তাই বলছিলে না তুমি?

বে-গতিক দেখলে পরোক্ষে হার মেনে এইভাবে একজন আর একজনকে দাবড়ানি দিয়ে ঠাণ্ডা করে থাকেন তাঁরা। কল্পনাও ঠাণ্ডা হলেন একটু।—তাহলে এত যে সব বলে গেলাম, কোনো কথার জবাব দিচ্ছ না কেন?...দু-পাঁচ বছরের ব্যাপার তো নয়, পঁচিশ বছরের ব্যাপার!

—পঁচিশ বছরের কি ব্যাপার যেন?

—বেশ, কোন্ রাজ্যে থাকো তুমি? আমাদের পঁচিশ বছরের বিবাহ-বার্ষিকী, ট্যুয়েন্টি ফিফথ ম্যারেজ অ্যানিভারসারি, কানে ঢুকেছে?

মাথা নাড়ালেন—ঢুকেছে। কাগজের দিকে চোখ।—কবে?

—এসেই তো গেল, আর দেড়মাসও পুরো নেই।

ঈষৎ অন্তরঙ্গ আগ্রহে কল্পনা আবার বললেন, এবারে বিশেষ ব্যবস্থা তো একটু কিছু করতে হবে, সকলে বেশ অবাক হবে এ-রকম নতুন কি করা যায় বলো তো?

—তুমি বলো।

—বাঃ, সবই আমি বলব আমি করব আমি ভাবব, কেন, তুমি নতুন কিছু একটু ভাবতে পারো না?

অতএব সত্যশরণ ভাবতে লাগলেন। স্বামীর চিন্তাচ্ছন্ন মুখ দেখে কল্পনা রায় আশান্বিত।

নতুন কিছুই মাথায় এলো সত্যশরণের। কিন্তু স্ত্রীর সেটা পছন্দ হবে কিনা সেই সংশয়। তবু বলেই ফেললেন, পঁচিশ মিনিটের নীরবতা পালন করলে কেমন হয়?

কথাগুলো চট করে মাথায় ঢুকল না, কল্পনা রায় বিমূঢ় নেত্রে চেয়ে রইলেন।

কিন্তু পরক্ষণে তার অগ্ন্যুৎপাদনের মুখেই মেয়ের উল্লাসভরা গলা চায়ের টেবিলে আছড়ে পড়ল।—হুররে! মামাজী আ গিয়া! মা, মামা এসে গেছে! সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর দিয়ে বারান্দার দিকে ছুটতে দেখা গেল তাকে।

স্বামীর দিকে একদফা দুই চোখের আগুন ছড়িয়ে কল্পনাও মাথায় শাড়ির আঁচলটা

তুলে দিয়ে চায়ের টেবিল ছেড়ে বাইরের দিকে এগোলেন। রাজনীতি করা লোকগুলোর কথা-বার্তায় এমনিই জিলিপির প্যাঁচ বটে! কিন্তু দাদা এলেন পাঁচ-ছ'দিন বাদে, ঝগড়ার ব্যাপারটা আপাতত স্থগিত না রেখে উপায় কি!

জানলা দিয়ে ফটকের সামনে ট্যাক্সি দাঁড়াতে দেখে আর সেই ট্যাক্সিতে মামাকে দেখেই স্বপ্না সানন্দে ছুটে বেরিয়ে এসেছে। মামা ট্যাক্সি থেকে নামার পরেও গাড়িতে আর কেউ আছে কি নেই চোখে পড়ল না। দু'হাতে মামার একখানা মোটা হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলে উঠল, ঈশ্বরের আশীর্বাদে তুমি তাহলে ছ'দিনের মধ্যেই ফিরে এলে মামা। উঃ, ক'টা দিন যেন কয় সপ্তাহ! সত্যি—তুমি না থাকলে কি যে বিচ্ছিরি লাগে মামা!

কিন্তু মামার মুখখানা সে রকম আনন্দে উদ্ভাসিত দেখল না স্বপ্না। বরং বেশ গম্ভীর। আর তক্ষুনি চোখে পড়ল মামার অসহিষ্ণু চাউনিটা ট্যাক্সির ভিতরের আর একজনের মুখের ওপর চড়াও হয়ে আছে। একেবারে অচেনা একজন। সেই একজনের ড্যাবডেবে দুই চোখ আবার স্বপ্নার মুখের ওপর।

মামার গুরুগম্ভীর বিরক্তিমাখা ডাক কানে আসতে স্বপ্না আরো অবাক।--কি হে চাঁদবাবু, ট্যাক্সিতে আরো হাওয়া খাবেন, না কি দয়া করে অবতরণ করে তারপর আমার ভাগ্নিকে অবলোকন করবেন?

ব্যস্ত মুখে চাঁদ মুখার্জি নেমে এলো। ওদিকে ভজু ছুটে এসে মামাবাবুর স্যুটকেস আর হোল্ড-অল হাতে কাঁধে তুলে নিয়েছে। মামার একখানা বাহু স্বপ্নার দুই হাতে, অপরিচিত লোকটাকে আর একবার ভালো করে দেখে নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়ে ফিসফিস করে জিগ্যেস করল, কে মামা?

ধর্মেন্দ্র চৌধুরির নীরস জবাবে চাপাচুপি নেই। প্রায় ধমকের সুরেই বলে উঠলেন, কে মুখ দেখে বুঝতে পারলি না? এলাহাবাদের চাঁদবাবু, তোর এই মামার হাড়ে বাতাস লাগানোর মতো মানুষও ঈশ্বরের আশীর্বাদে আছে এ খবর তোদের জানা ছিল? এবারে ভালো করে দেখে নে—

স্বপ্না সভয়ে আর একবার পিছন ফিরে তাকাল। লোকটা ঠিক দু' পা ব্যবধান রেখে ওরই পিছনে পিছনে আসছে। মুখখানা ফর্সা আর সুন্দর, কিছু বয়েস হয়েছে, পরনের পাজামাটা দস্তুরমতো দুমড়নো ময়লা আর জামাটা তেমনি ধপধপে ফর্সা। চোখোচোখি হতেই লোকটা মজা করে হাসার মতো হাসল একটু। স্বপ্না বিরক্ত হবে কি হবে না ভেবে না পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে নিল। এই মামাবাবুর মতো জাঁদরেল মানুষের হাড়ে বাতাস লাগাতে পারে কি করে ভেবে পেল না। আর সে রকম লোকই যদি হবে তো তাকে বাড়িতে টেনে নিয়ে এলো কেন।

সামনের বারান্দায় মা আর বাবা দাঁড়িয়ে। আগন্তুক দেখে তাঁরাও অবাক একটু। মামাকে নিয়ে স্বপ্না বারান্দায় উঠল। পিছনে পিছনে লোকটাও।

বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে ধর্মেন্দ্রবাবু সকলকে দেখে নিলেন একবার। এমন কি একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে চাঁদ মুখার্জিকেও। তারপর এখানকার সকলের উদ্দেশ্যেই যতটা সম্ভব মেলায়েম সুরে জিগ্যেস করলেন, খবর ভালো তো সব?

কল্পনা মাথা নাড়লেন, ভালো।—তোমার খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হয় নি তো? ভালো ছিলে?

এক হাতের চারটে আঙুল আর এক হাতের আধখানা আঙুল তুলে দেখালেন ধর্মেন্দ্রবাবু। তারপর চাপা অসহিষ্ণু সুরে জবাব দিলেন, ছ'দিনের মধ্যে সাড়ে চারটা দিন ভালো ছিলাম, আর শেষের দেড়টা দিন কেমন ছিলাম ইনি জানেন।

গোল দুই চোখ আগন্তুকের দিকে ফেরালেন।

বাকি তিন জোড়া চোখও তার দিকে ধাওয়া করতে চাঁদ মুখার্জির মুখে অপ্রস্তুত হাসি একটু। বলল, শেষের দেড় দিনও আমি তো বেশ ভালো দেখলাম...

বিস্মিত সত্যশরণ আর এক নজর তাকে দেখে নিয়ে ধর্মেন্দ্রবাবুকেই জিগ্যেস করলেন, ইনি...?

—ইনি আমার সঙ্গে এলেন।...হাঁ করে দেখছ কি, ইনি নিজের ইচ্ছেয় দয়া করে এলেন আমার সঙ্গে, এই সোজা কথাটা বুঝতে এত অসুবিধে হচ্ছে?

স্বপ্না আর তার মা বিস্ময়ে নির্বাক। সত্যশরণ থতমত খেলেন একটু।—ইনি কোথা থেকে এলেন?

এলাহাবাদ স্টেশন থেকে আমার গাড়ির কুপেতে, তারপর হাওড়া স্টেশনে, তারপর এই এইখানে! ঘোরালো চোখে ধর্মেন্দ্রবাবু চাঁদ মুখার্জির দিকে তাকালেন।—ইনি আমার ভগ্নিপতি, নাম সত্যশরণ রায়, এঁর এখানে আমি থাকি, এরপর যা বোঝাপড়া করার এঁর সঙ্গে কারো, আমি আর কিছুতে নেই। আর মনে রেখো ইনি একজন এক্স-মিনিস্টার—

ফ্যালফ্যালে দৃষ্টিটা একবার সত্যশরণের মুখের ওপর বুলিয়ে নিল চাঁদ মুখার্জি। —এক্স কেন?

—এক্স কেন সে খোঁজে তোমার দরকার কি? ধর্মেন্দ্রেবাবু তিক্ত-বিরক্ত।—এঁর কিছু প্রতাপ আছে, সেটুকু দয়া করে মনে রাখলেই আমরা বাধিত হবো।

চাঁদ মুখার্জি ভালো মুখ করে মাথা নাড়ল, মনে রাখবে।

সত্যশরণ এবং তাঁর স্ত্রী এটুকুই শুধু বুঝে নিলেন, অযাচিতভাবে লোকটা দাদার সঙ্গে জুটে গেছে, কিন্তু অজানা অচেনা একটা লোক সেই এলাহাবাদ থেকে কলকাতার এই বাড়ি পর্যন্ত সঙ্গ নেয় কি করে ভেবে পেলেন না। সত্যশরণ আহ্বান জানালেন, ভিতরে আসুন দাদা—

বারান্দায় মাঝের ঘরটাই বসার ঘর। বড়সড় ঘর এবং এখনো বেশ সৌখিনভাবে সাজানো। সেই ঘরে এসে ছদ্ম আপ্যায়নের সুরে ধর্মেন্দ্রবাবু বললেন, বোসো চাঁদ, তুমি এইখানেই বোসো, আমরা ভিতরে গিয়ে একটু কথাবার্তা বলি, কেমন?

তার অনুমোদনের অপেক্ষা যেন। চাঁদ মুখার্জির দুচোখ কৌতুকে চিকিয়ে উঠল। ঠোঁটের হাসিও গোপন থাকল না। অন্য সকলের উদ্দেশ্যে বলল, উনি আপনাদের বেশ ঘাবড়ে দিয়েছেন দেখছি। কিন্তু ভাববেন না, আমি একজন সাদামাটা ভালো লোক, আর একজন ভালো লোকের সঙ্গ পেয়ে এখানেই চলে এলাম।...অনেকদিন আসিনি, বলতে গেলে কলকাতা প্রায় নতুন হয়ে গেছে আমার কাছে।

কথাগুলো শোনার ছলে সত্যশরণ ভালো করে আর এক দফা নিরীক্ষণ করলেন

লোকটাকে। সামনের সোফাটা দেখিয়ে বললেন, বসুন।

তারপর চোখের ইশারায় ধর্মেন্দ্রবাবুকে ভিতরে ডাকলেন।

চাঁদ মুখার্জি কল্পনার দিকে চেয়ে বলল, চিনি বেশি, দুধ বেশি, লিকার স্ট্রং—চট করে এক পেয়ালা চা পাঠিয়ে দিন, মাথাটা বেজায় ধরে আছে।

ধুপ করে সোফায় বসে পড়ল। আর একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করে অন্য সকলে ভিতরের দিকে পা বাড়ালো। স্বপ্নাও এতক্ষণ কৌতুকমাখা গাম্ভীর্যে অজানা লোকটাকে দেখছিল। হঠাৎ কি মনে পড়তে সে সবার আগে ভিতরে ছুটল। ওঁরা ভিতরে গিয়ে জাঁকিয়ে বসলে টেলিফোন সরানো মুশকিল হবে। সকাল থেকে এই রকমই একটু ফাঁক খুঁজছিল সে। রঞ্জনকে টেলিফোন করার কথা সেই সকাল থেকে ভাবছে।

মামা আর বাবা-মায়ের অন্যমনস্কতার ফাঁকে ফোনটা আঁচলে চাপা দিয়ে স্বপ্না বসার ঘরের পরের ঘরটায় ঢুকল। এটাই তার নিজের ঘর। পরিপাটি করে সাজানো। এক কোণে চমৎকার ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসার কুশন, তার ওপর এমব্রয়ডারি করা ঢাকনা। পাশে ছোট্ট আলনা। অন্যদিকের দেয়ালঘেঁষা ছোট খাটে সুবিন্যস্ত শয্যা। দু'দিকের দেয়ালে দুটো টিউব লাইট। একটার নিচে পড়ার টেবিল চেয়ার। তার পাশে দেয়াল-তাকে সারিসারি বই ঠাসা। নিচের তাকে পড়ার বই কিছু। ওপরের তাকটা গল্প-উপন্যাসে ভরাট। শয্যার এ-পাশে দরজা, তার ওধারে অ্যাটাচড বাথ। সেখানেও শাওয়ার, বেসিন, বাথটাব আছে।

এ সবই স্বপ্নার বাবার সুদিনের নজির।

ফোনটা পড়ার টেবিলে রেখে সেও টেবিলের এক ধারে গ্যাঁট হয়ে বসে নম্বর ডায়েল করতে লাগল। এখন আধঘণ্টা ধরে রঞ্জনের সঙ্গে কথা বললেও কেউ বাধা দিতে আসবে না।

একলা ঘরে সোফায় বসে লম্বা দুটো হাই তুলল চাঁদ মুখার্জি। ভালো লাগছে না, বেশ করে চান করতে পারলে হত। সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল। ঘরের দেয়ালে কিছু কিছু ছবি টাঙানো। ঘুরে ঘুরে সেগুলো দেখতে লাগল। মুখে বিরক্তির ছায়া। পরিবেশটা কেমন যেন কৃত্রিম মনে হল তার।

অন্দরের দিকে দু'পা এগোতে পাশে একটা দরজা দেখতে পেল। পুরু পর্দা টাঙানো সামনে। পর্দা সরিয়ে বন্ধ দরজা একটু ঠেলতেই সে দুটো নিঃশব্দে খুলে গেল। আর তেমনি নিঃশব্দে পর্দার এধারে এসে দাঁড়াল চাঁদ মুখার্জি। এ ঘরের দৃশ্যটা ভালোই লাগল তার। ফোন-কানে সুশ্রী মেয়েটা আধখানা বেঁকেচুরে টেবিলের এক ধারে বসেছে। আর হাসছে খুব। কথা কানে আসতে আরো চমৎকৃত।

...দেখো, আমি রেগে গেলে রক্ষা থাকবে না বলছি, কলেজ কামাই করছি কি ঘরে বসে তোমার মুখ দেখার জন্যে!

...কি বললে? অসুবিধে? তোমার অসুবিধে আমার জানা নেই ভেবেছ? সকালে মায়ের কাছ থেকে দশ টাকা আদায় করে রেখেছি, কিছু ভাবনা নেই তোমার টিকিট আমিই কেটে রাখব...যতো সব দেউলে নিয়ে কারবার আমার...তাছাড়া মামা এসে গেছে বুঝলে...হ্যাঁ, এই একটু আগে এলো...তার কাছ থেকেও কোন্ না দশ পাঁচটাকা খসানো

যাবে...আর শোনো খুব একটা মজা হয়েছে...সেই এলাহাবাদ থেকে একটা অজানা অচেনা লোক মামার সঙ্গ ধরে একেবারে এই বাড়ি পর্যন্ত এসে হাজির হয়েছে...মামার মেজাজ একেবারে ভিসুভিয়াস...মা-বাবার সামনেই লোকটা এমন ড্যাব-ড্যাব করে তাকাচ্ছিল না আমার দিকে।

পিছনে পর্দার গা ঘেঁষে চাঁদ মুখার্জির সমস্ত মুখ নীরব হাসিতে ভরাট।

...কি বলছ? দেখতে? একেবারে যাকে বলে রাজপুত্তুরের মতো। মুখে দুষ্টু হাসি স্বপ্নার। যেমন চেহারা তেমনি স্বাস্থ্য তেমনি গায়ের রং আর তেমনি পোশাক-আশাক, সব কিছু দিয়ে যেন জ্যোতি বেরুচ্ছে একটা।

ওই কথা শোনার পর নিজের পাঞ্জাবি আর পা-জামার দিকে একনজর তাকিয়ে চাঁদ মুখার্জির চোখ দুটো যেন ধাক্কা খেল একপ্রস্থ। মেয়েটা বলে কি!

...অ্যাঁ? বয়েস? ওদিক-ফেরা স্বপ্নার মুখের দুষ্টু হাসি আরো একটু প্রসারিত। নিরীহ গলায় বলছে, তা তেইশ-চব্বিশ হবে বোধ হয়...

পিছনে চাঁদ মুখার্জি আবার একপ্রস্থ ধাক্কা খেল।

ওদিকে কর্ত্রীর নির্দেশমতো আমোদিনী ট্রে-তে সৌখিন ছোট কেটলি, বিস্কুটের ডিস আর চায়ের পেয়ালা বসিয়ে ঘরে ঢুকে দেখে কেউ নেই। বিমূঢ় মুখে এদিক-ওদিক তাকাতে খুকুমণির ঘরের পর্দার নিচে পা'দুটো দেখে আঁৎকে উঠল। ছেলেবেলায় স্বপ্নাকে খুকু বলে ডাকত, এখন খুকুমণি বলতে হয়। স্বপ্না এই নিয়ে অনেক রাগ করেছে, কিন্তু ও বেচারিই বা কি করবে, মা আর মেয়ে দুজনকেই দিদিমণি বলে কি করে!

আঁৎকে ওঠার কারণ, চা বানাবার ফাঁকে ওর কান দুটো খাড়াই ছিল। মামাবাবু আর দিদিমণির কথা-বার্তা সবই কানে এসেছিল। কি-ভাবে লোকটা দিল্লীর গাড়ি ফেল করে মামাবাবুর কামরায় এসে উঠেছে, টিকিট চেকারকে নাজেহাল করেছে, মামাবাবুর ঘুমের ফাঁকে বালিশের তলা থেকে রিভলভার সরিয়ে রেখেছে, সেই সব বৃত্তান্ত শুনে আমোদিনী থ' মেরে গেছল। তারপর বাবুর মন্তব্য শুনে গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। বাবু বলছেন, অজানা অচেনা একটা লোককে ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়া গুনে এভাবে নিয়ে এসে ভালো করেন নি দাদা, আমার বিশ্বাস ওই সব দলের পাণ্ডা-গুণ্ডা কেউ হবে, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ওইভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, আর, কিছু একটা মতলব নিয়েই কলকাতায় এসেছে।

কি সর্বনাশ। দিদিমণির চাপা ত্রাস। মুখ দেখে তো একেবারে গো-বেচারা মনে হয়।

আরে না-না, ভয়ের কিছু হলে ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমার মনে ঠিক ডাক দিত...এমন সব কাণ্ড-মাণ্ড করল যে উল্টে ভালোই লেগে গেল...আর খুব লেখাপড়া-জানা ছেলে বুঝলি..ইংরেজি, বাংলা ছেড়ে গীতা-উপনিষদ পর্যন্ত পড়া আছে...আবার রাশিয়ানও শিখেছিল শুনলাম। মামাবাবুর ভয় কাটানোর চেষ্টা।

কি বলেন দাদা ঠিক নেই। বাবুর দুশ্চিন্তা-ভার গলা, ও-সব দলের আসল লোকেরা ওমনি উচ্চশিক্ষিতই হয়ে থাকে, আর এমনিতে তাদের দেখলে মনে হবে ভাজা মাছখানা উল্টে খেতে জানে না। গা-ঢাকা দেবার মতলব না থাকলে দিল্লীর ট্রেন মিস করে

এ-ভাবে সে কলকাতা আসতে যাবে কেন, তার তো ঘরে ফিরে যাবার কথা! আমার বদ্ধ ধারণা, সাংঘাতিক কোন লোক হবে—

দিদিমণিও তক্ষুনি সায় দিয়ে বলেছে, তাছাড়া আর কি, তুমি দুটো লেখাপড়ার বুলি শুনেই ভুলে গেলে দাদা, আনন্দমঠের ভবানন্দ আর তার সন্তানের দল মুখ্য ছিল, না দেবী চৌধুরাণীর ভবানী পাঠক মুখ্য ছিল, না কি পথের দাবীর সব্যসাচী মুখ্য ছিল? আমার তো গায়ের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে, এতক্ষণে কি ওর দলবলেরও জানতে বাকি আছে কোথায় এসে উঠেছে! ভালো চাও তো চুপচাপ তোমরা পুলিশে খবর দিয়ে রাখো একটা, আর ননী-মাখনকেও খবর দিয়ে এনে রাখো।

এ-সব শোনার পর মামাবাবুও ঘাবড়ে গেছেন মনে হয়েছে আমোদিনীর। তার গায়ে কাঁটা দেবে না তো কি, মামাবাবুর ওই দুই ছেলে ননী মাখনকে বাড়িতে এনে রাখা মানেই তো বড় রকম একটা দাঙ্গার জন্য প্রস্তুত হওয়া। ওই দুই ছেলের ভয়ে বউ-মরা মামাবাবুর নিজের বাড়ি ছেড়ে এ-বাড়িতে বাস, আর ওদের ভয়েই সর্বদা সঙ্গে রিভলভার। থানা-পুলিসের বড় বড় লোকদের সঙ্গে এ-বাড়ির বাবুর ভাব-সাব আছে বলেই ওই দুই দস্যি আজও জেলের বাইরে। জেল ছেড়ে এত দিনে ওদের আরো কি হয়ে যেত ঠিক নেই।

গালে হাত দিয়ে বসে সামনে চায়ের ট্রে রেখে আসন্ন বিপদের কথাই ভাবছিল আমোদিনী। তার একটু সাহস-টাহস আছে, কিন্তু সত্যিকারের স্বদেশী ডাকাতের পাল্লায় পড়লে মেয়েছেলের সাহস আর কোন কাজে লাগবে? দিদিমণি এসে চাপা তর্জন করে উঠতে চমক ভেঙেছে।—এখনো তুই গালে হাত দিয়ে বসে আছিস, চা নিয়ে গেলি না? শিগগীর যা বলছি!

এ-হেন লোকের সামনে চায়ের ট্রে হাতে উপস্থিত হওয়াও সহজ নয়। একবুক অস্বস্তি নিয়ে বাইরের ঘরে ঢুকেছিল। ঘর ফাঁকা দেখে অবাক, তারপর পর্দার ওধারে খুকুমণির ঘরে পায়ের নিচের দিকটা দেখে চক্ষুস্থির। কি করছে ওখানে দাঁড়িয়ে? খুকুমণিও তো ওই ঘরেই ফোন নিয়ে বসেছিল জানে। এখন কি করছে, লোকটাকে দেখে নি নাকি, নাকি ভিরমি খেয়ে পড়ে আছে!

ট্রে-হাতে পায়ে পায়ে ওই দরজার গায়ে পর্দার পিছনে এসে দাঁড়াল আমোদিনী। আরও বিমূঢ় সে।...টেলিফোনে খুকুমণির গলা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

কোমর একটু ধরে যাবার ফলে এবার গোটাগুটি টেবিলে বসে আলাপচারীর বিষয়বস্তু বদলেছে স্বপ্না।

...তারপর তোমার লেখা কদ্দুর এগলো বলো, শিখা এখন কি করছে, তার পিছনে ক'টা ছেলে ঘুরছে এখন' মাত্র তিনজন...ধোৎ, কোনো কাজের না...ওর মতো মেয়ের পিছনে অন্তত তেরোটা ছেলের ঘোরা উচিত, তাছাড়া অমন একটা নাচ-গান-জানা মেয়েকে তুমি শুধু কলকাতাতেই আটকে রেখেছ কেন, কলমের খোঁচায় ইংলন্ড আমেরিকা অস্ট্রেলিয়ায় ঘুরিয়ে আনো না, তাতে তো আর তোমার পয়সা লাগছে না ...অ্যাঁ? কি বললে? কি বললে? শেষে অ্যাকসিডেন্টে মেয়েটার নাচের পা নষ্ট হয়ে যাবে! আর সব থেকে বিলাসী ছেলেটাই তখন তার মধ্যে আসল সৌন্দর্য খুঁজে পাবে? ... এ-তো মায়ের প্ল্যান! মা বলেছিল!...এই করলে আমি তোমার দুটো পা আস্ত রাখব

তাহলে? তুমি একটা আহাম্মক, তুমি একটা রাসকেল, আমাকে ছেড়ে মায়ের তোষামোদ! ভেবেছ এই করে সুরাহা হবে? ওই রাস্তা ধরলে তোমার উপন্যাসের ম্যানাসক্রিপ্ট আমি পুড়িয়ে ফেলব, তোমাকে আমি বাড়ি থেকে বার করে দেব, তোমাকে—তোমাকে আমি ডিভোর্স করব!

শেষের ক্রুদ্ধ ডিভোর্স শব্দটা কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে মগজে যেন আচমকা সজোর একটা হাতুড়ির ঘা পড়ল চাঁদ মুখার্জির। মাথাটা ঘুরতে লাগল বনবন করে, ঘরবাড়ি দুলতে লাগল। সামনে মেয়েটা ফোনে আর কি বলছে না বলছে কানে আসছে না।

নিজের অগোচরেই কয়েক পা এগিয়ে এসেছে সে। মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। অস্বাভাবিক ক্রুদ্ধ লালচে মুখ। স্বপ্নার সামনের আয়নায় ওই মুখের দুটো চোখ যেন বিদ্ধ করছে তাকে।

কিন্তু স্বপ্না তখনো ফোনে ফুঁসেই চলেছে।—এত সাহস তোমার, এই করে তুমি কাজ হাসিল করবে ভাবো! তোমাকে আমি, তোমাকে, তোমাকে, তো...তো আ-আপনি! আয়নার ভিতর দিয়ে স্বপ্নার দুই চোখ ওই মূর্তির ওপর গিয়ে পড়তে কথার তালগোল পাকিয়ে গেল। বড়সড় একটা ঝাঁকুনি খেয়ে টেবিল থেকে মাটিতে নেমে দাঁড়াল, ঘুরে ওই গনগনে লাল মুখ দেখে আরো ঘাবড়ে গেল।

—আ-আপনি এখানে কেন?

জবাবে চাঁদ মুখার্জি আরো কয়েক পা এগিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়াল—কার সঙ্গে কথা বলছ?

—র-রঞ্জনের সঙ্গে। ঘাবড়ে গিয়ে স্বপ্না টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখল।

—তোমার নাম কি? গলার স্বর কঠিন চাঁদ মুখার্জির। চাউনিটাও।

—আমার? আমার নাম স্বপ্না। স্বপ্না রায়—

—কতদিন বিয়ে হয়েছে তোমার?

—বি-বিয়ে! আ-আ-আমার! বিয়ে তো হয় নি—

—বিয়ে না হলে তুমি কাকে ডিভোর্স করবে বলে শাসাচ্ছ?

—ওই র-রঞ্জনকে, আ-আমার অবাধ্য হয়ে মায়ের কথায় একটা মেয়ের পা নষ্ট করে দেবে বলছিল—

চাঁদ মুখার্জি ঝাঁঝিয়ে উঠল, রঞ্জনের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে?

দিশেহারা অবস্থা স্বপ্নার।—না, হব-হব করছে, না—মানে দেখা হলেই ও বিয়ের কথা বলে—

আরো তপ্ত গলার স্বর চাঁদ মুখার্জির।—তাহলে বিয়ের আগে তুমি ডিভোর্সের কথা বলছ কি করে?

—না, মানে, বিয়ের পরেই, আ-আপনি এখানে কেন? স্বপ্না ভয় সামলে নিয়েছে একটু।—আপনি এ-ঘরে কেন? আমি বিয়ের আগে ডিভোর্স করি বা পরে করি তাতে আপনার কি?

বলতে বলতে পাশ কাটিয়ে সবেগে দরজার দিকে ছুটল সে। পরমুহূর্তে পর্দার ওধারে আমোদিনীর সঙ্গে বড়-সড় কলিশন একটা। তার হাতের ট্রে ছিটকে মাটিতে

পড়ে পট আর পেয়ালা ডিশ ঝনঝন শব্দে ভাঙল। আর কলিশনের ফলে আমোদিনীও ধরাশায়ী। স্বপ্নার মাথাও সজোরে ঠুকে গেছে।

ওদিক থেকে কল্পনা আর সত্যশরণ ছুটে এলেন। তাঁদের পেছনে ধর্মেন্দ্রবাবু। ব্যাপার দেখে চক্ষুস্থির সকলের।

পর্দা ঠেলে চাঁদ মুখার্জিও এ-ঘরে এসে দাঁড়াল। দৃশ্য দেখে সেও হতভম্ব একটু। কিন্তু আমোদিনীর চোখে চোখ পড়তে হাসি পেয়ে গেল তার। হাত-পা ছড়িয়ে সে তখনো মেঝেতে বসে। চাঁদ মুখার্জি বলল, চায়ের বারোটা বেজে গেল দেখছি, হাত থেকে ফেলে তুমিই ভাঙলে বুঝি?

আমোদিনী শশব্যস্তে মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এবার। —আ-আপনার জন্যেই তো...

পাশে বাবা মা আর মামাবাবু, স্বপ্নারও সাহস ফিরে এসেছে। সে একটু জোর দিয়ে বলে উঠল, দেখ মা, আমার কপালটা কি জোর ঠুকে গেছে, টনটন করছে এখনো, টেলিফোনে কথা কইছি, হঠাৎ দেখি উনি পিছনে দাঁড়িয়ে কটমট করে আমার দিকে চেয়ে আছেন—

চাঁদ মুখার্জির হাসিমাখা চোখ প্রথমে স্বপ্নার এবং পরে বাকি সকলের মুখের ওপর চক্কর খেল একপ্রস্থ। বাড়ির কর্তা সত্যশরণ তীক্ষ্ণচোখে পর্যবেক্ষণ করছেন তাকে। কল্পনা রায় একবার স্বামীকে দেখছেন, একবার তাকে। আর ধর্মেন্দ্র চৌধুরিরও গোল দুই চোখ তারই মুখের ওপর আটকে আছে। দু'চোখ বুজে নিজের মাথাটাই একবার জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে নিল চাঁদ মুখার্জি। তারপর ধর্মেন্দ্রবাবুর দিকে চেয়ে বলে উঠল, কোথায় যে এলাম কিছু বুঝতেই পারছি না, ও-ঘরে গিয়ে শুনলাম আপনার ভাগ্নি বিয়ের আগেই কাকে ডিভোর্স করছে, আমি ও-ঘরে গেলাম বলে এ এ-ঘরে পেয়ালা প্লেট ভাঙছে, আর আপনারা এমন চেয়ে আছেন সকলে যেন আমি চিড়িয়াখানার জীব একটা। যাক, এবার আমায় বেশ করে চানের ব্যবস্থা করুন দেখি একটু, কান মাথা গরম হয়ে গেছে।

আবার নতুন করে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল ধর্মেন্দ্রবাবুর। বিদ্রূপের সুরে বলে উঠলেন, চান করবে এখন তুমি, বেশ করে চানের ব্যবস্থা করতে হবে তোমার, তা ব্যবস্থাটা একেবারে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে হলে কেমন হয়?

ভুরু কুঁচকে তাকাল চাঁদ মুখার্জি।—শ্বশুরবাড়ি গিয়ে মানে...কার শ্বশুরবাড়ি?

—তোমার—তোমার! বুঝতে কষ্ট হচ্ছে?

—আমার শ্বশুরবাড়ি...এখানে! সঙ্গে সঙ্গে মুখে লালের আভা ছড়ালো, গলার স্বরও উষ্ণ।—দেখুন মশাই, আই ডোন্ট লাইক শ্বশুরবাড়ি অ্যান্ড আই ডোন্ট লাইক শ্বশুরবাড়ি নিয়ে ইয়ার্কি-ঠাট্টা, হেল উইথ শ্বশুরবাড়ি!

তার ওপর দিয়ে ডবল গলা চড়ল ধর্মেন্দ্র চৌধুরির।—শাট আপ! ঈশ্বরের আশীর্বাদে ওই শ্বশুরবাড়ির হেল-এর দিকেই পা বাড়িয়েছ, আমার ধৈর্যের শেষ মাথায় এসে দাঁড়িয়েছ তুমি, বুঝলে?

কোঁচকানো ভুরু একটু একটু করে সোজা হল চাঁদ মুখার্জির। মুখে হাসি ছড়াতে লাগল। টেনে টেনে বলল, ইমপেশান্স ড্রাইজ দি ব্লাড সুনার দ্যান এইজ অর সরো!

সত্যশরণ রায় ইংরেজির ছাত্র, কলেজেও ইংরেজি পড়িয়েছেন একসময়। ইংরেজি বুলিটা যেন তার তীক্ষ্ণ দুটো কানেই ধাক্কা দিল হঠাৎ। কোনো মনীষীর বিখ্যাত উক্তি,

কার ঠিক মনে পড়ছে না। রাগ বা দুশ্চিন্তা ভুলে লোকটার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি।

তাঁর এই পরিবর্তন মেয়ে আর স্ত্রীর চক্ষুও এড়ালো না।

ধর্মেন্দ্র চৌধুরি এরপর কি বলতেন বা কি করতেন তিনিই জানেন, তার আগেই দেয়ালঘড়িতে ঢং করে শব্দ হল একটা, চাঁদ মুখার্জির দৃষ্টিও সঙ্গে সঙ্গে সেই দিকে ফিরল। —কি মুশকিল, সাড়ে দশটা বেজে গেল! আমার যে আবার এক জায়গায় যাবার কথা —কলেজ স্ট্রীটে—কতদূর এখান থেকে বলুন তো?

শোনামাত্র ধর্মেন্দ্র চৌধুরি চোখের ধার নরম করে অমায়িক আগ্রহে বললেন, কলেজ স্ট্রীট যাবে? এতক্ষণ বলো নি কেন, কাছেই—ঈশ্বরের আশীর্বাদে ছ'সাত মাইলের মধ্যেই, চলো চলো, তোমাকে ট্রামে বা বাসে তুলে দিয়ে আসি।

চাঁদ মুখার্জি ভাবল একটু।—চানটা করে যেতে পারলেই ভালো হত, সকালে চান না হলে আমার মেজাজ ঠিক থাকে না...কিন্তু ওদিকে আবার দেরি হয়ে যাবে, তাই চলুন, চান-টান পরে হবে'খন—

ধর্মেন্দ্র চৌধুরি সাগ্রহে এগিয়ে এসে হাত ধরে টানলেন, হ্যাঁ বাবা, পরেই হবে'খন, মেজাজ এমনিতেই বেশ ঠাণ্ডা আছে তোমার এখন, চলো—

হিড়হিড় করে বাইরে টেনে নিয়ে আসতে লাগলেন তাকে। চাঁদ মুখার্জি ঘাড় ফিরিয়ে সকলের দিকে তাকাল একবার। মুখগুলোকে দেখে সে যেন বেশ কৌতুক বোধ করছে।

একেবারে বাস আর ট্রাম স্টপে এসে ধর্মেন্দ্র চৌধুরি হাত ছাড়লেন তার। কিন্তু সব ক'টা ট্রাম আর বাসেই ঝুলতে ঝুলতে লোক যাচ্ছে। ধর্মেন্দ্রবাবু তাকে পর পর ক'টা ট্রাম আর বাসে ঠেলে তুলতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু চাঁদ মুখার্জির অভ্যাস নেই, উঠতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে সভয়ে ফিরে এসে তাঁর গায়েই ঠোক্কর খাচ্ছে আবার। তিক্ত বিরক্ত হয়ে তিনি বলে উঠলেন, ঠেলে-ঠুলে উঠে এর মধ্যেই জায়গা করে নিতে হবে...হাওয়া খাওয়ার মতো জায়গা পাবে ভেবেছ? এবারে উঠবে তো ওঠো, নয়তো চললাম আমি।

এটুকু ধকলেই ঘামছে চাঁদ মুখার্জিও। রেগেও গেছে।—দেখুন একে চান হয় নি, তার মধ্যে মাথা গরম করে দেবেন না! আমাকে কি জানোয়ার পেয়েছেন?

হাল ছাড়া গলায় ধর্মেন্দ্র চৌধুরি বললেন, আরে বাবা, এরা কি সব জানোয়ার?

যুক্তি দিয়ে বোঝালে না বোঝার মানুষ নয় চাঁদ মুখার্জি। আবার একটা ভিড়ের ঠাসাঠাসি বাসের দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল, না, মানুষের মতোই তো...

কথা ফুরোবার আগেই মুশকিল আসান যেন। একটা খালি ট্যাক্সি যাত্রীর আশায় পাশে এসে দাঁড়াল। হাতে চাঁদ পেল যেন চাঁদ মুখার্জি। একমুখ হেসে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে উঠে বসল।

স্টার্ট দেওয়াই ছিল, কিন্তু ওটা নড়ার আগে ধর্মেন্দ্রবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, কি মুশকিল! থামো থামো—হুট করে উঠে যে বসলে টাকা আছে তোমার সঙ্গে?

চাঁদ মুখার্জিও সচেতন তখনি। এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে নিয়ে বলল, তাই তো...দিন, দশটা টাকা বার করুন চট করে...আঃ, হাঁ করে দেখছেন কি—দিন না!

অগত্যা গোমড়া মুখে পকেট থেকে একটা দশটাকার নোট বার করে দিলেন তিনি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চাঁদ মুখার্জি বলল, ঈশ্বরের আশীর্বাদে আপনি বেশ ভালো লোক —সব শোধ করে দেব, কোনো চিন্তা নেই।

ট্যাক্সি চলে গেল। ধর্মেন্দ্রবাবু পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছতে লাগলেন।

## তিন

ট্যাক্সি থেকে নেমে চাঁদ মুখার্জি বিমূঢ় চোখে এদিক-ওদিকে তাকাচ্ছে। মাঝারি গোছের দোকানটা উঠে গেল কোথায় ভেবে পাচ্ছে না।

কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা কোনদিনই ছিল না চাঁদ মুখার্জি। বরাবর বাইরে থেকেছে, বাইরেই ছাত্রজীবন আর কর্মজীবনের কিছুকাল কেটেছে। কিন্তু কলকাতায় এই মহল্লায় পাঁচ বছর আগেও মাঝে মাঝে আসতে হত, বছরে একবার দু'বার তো বটেই। ফলে এদিকটার সবটাই চেনা জানা, কিন্তু পরিচিত সেই ছোট-খাট প্রকাশকের দোকানটা গেল কোথায়!

হঠাৎ সামনের বাড়িটারই দোতলার দিকে চোখ পড়তে সেখানে হালফাশানের বিরাট সাইনবোর্ড চোখে পড়ল। চাকলাদার অ্যান্ড সন্স—পাবলিশার্স কলেজ বুকস। সাইনবোর্ড সংলগ্ন ঝকঝকে দোতলাটার দিকে চেয়ে চোখে যেন ধাঁধা লাগল চাঁদ মুখার্জির। নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল, কি জানি রে বাবা, এ দোকান আবার এত বড় হয়ে গেল কবে!

পায়ে পায়ে ভিতরে ঢুকল। দোতলায় উঠে গেল। হালফ্যাশানের পাবলিশিং হাউস। পাইকারী ডিলারদের ভিড়, খুচরো ক্রেতার ভিড়। কর্মচারীরা কেউ বিশাল বিশাল আলমারি থেকে বই বার করছে, কেউ ক্যাশমেমো কাটছে, কেউ প্যাকেট বাঁধছে। কেউ বা খদ্দেরের কথা শুনছে।

কাছে গিয়ে দাঁড়াতে একজন জিগ্যেস করল, কি চাই?

চারদিক একবার দেখে নিয়ে চাঁদ মুখার্জি জিগ্যেস করল, চাকলাদার...মানে দোকানের মালিক কোথায়?

এই মূর্তির লোক সরাসরি মালিকের খোঁজ করছে এটা খুব পছন্দ হল না ওই লোকটার। পিছন ফিরে তাকাতে কাউন্টারের ওদিক থেকে অল্পবয়সী একটি ছেলে এগিয়ে এলো। বলল, কি দরকার আপনার বলুন?

চাঁদ মুখার্জি বিরক্ত।—আমি চাকলাদার অ্যান্ড সনস-এর চাকলাদারকে চাইছি, সনস নয়।

ছেলেটা আঙুল তুলে অন্যদিক দেখিয়ে দিল, ওই অফিসের দিকে যান।

কাউন্টার ঘুরে নির্দেশমতো চলল। একটা ছোট ঘরের সামনে টুল পেতে বেয়ারা বসে। দরজার গায়ে লেখা 'প্রোপ্রাইটার'। ঢুকতে যাবে, আবার বাধা। বেয়ারা টুলে বসেই স্লিপের প্যাড এগিয়ে দিল।

—কি?

—স্লিপ লিখিয়ে।

কেন যে রাগ হয়ে গেল হঠাৎ চাঁদ মুখার্জি জানে না। খপ্ করে তার কাঁধের কাছের মোটা জামাটা ধরে টেনে তুলল। ঝাঁঝালো স্বরে বলল, তুম স্লিপ বন্ যাও, আও—

বেয়ারাটাকে সুদ্ধ ঠেলে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। সামনের মস্ত টেবিলের ওধারে মালিক বসে। প্রবীণ মানুষ। তাকে বলল, কি মশাই, মস্ত ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছেন আপনি এখন, কেমন? বেয়ারা দরজার কাছে বসে স্লিপ হাঁকবে, তারপর আপনার দয়া হলে দেখা হবে, এত বড় অবস্থা আপনার এখন!

ভদ্রলোক বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত। তার পরেই শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল একেবারে। এমন বেশভূষায় এই লোককে দেখবেন কল্পনা করতে পারেন নি যেন।—কি আশ্চর্য, আপনি! ইয়ে বসুন বসুন, এই তুম যাও!

শেষের নির্দেশ বেয়ারাকে। এই জামা-কাপড়ের একটা লোককে মালিক এতখানি সম্মান করছে দেখে সে অবাক মুখে বেরিয়ে এলো। নীরস বিদ্রূপের সুরে চাঁদ মুখার্জি বলল, যাক, চিনতে পেরেছেন তাহলে...

অমায়িক হেসে প্রবীণ ভদ্রলোক বললেন, চিনতে পারবো না কেন...আপনি হঠাৎ এ-ভাবে আসবেন! স্টেশন থেকে সরাসরি নাকি?

—প্রায়।

ব্যস্তমুখে মালিক বেল টিপতে বেয়ারা এলো আবার। তার হুকুমে সে ছোট মালিকদের ডাকতে ছুটল।—তারপর বলুন, কেমন আছেন এখন?

—খুব ভালো। চাঁদ মুখার্জির বিরস জবাব।

আগের সেই ছেলেটি এবং সঙ্গে আর একজন ঘরে ঢুকতে তাদের বাবা হেসে বললেন, চিনতে পেরেছিস? ডক্টর মুখার্জি, প্রণাম কর, প্রণাম কর—

তারাও অবাক হয়ে একসঙ্গে প্রণাম করতে ঝুকল। বড় মালিক বললেন, চট করে কফি আর ভালো খাবার-টাবার কিছু আনতে বল—

—কিচ্ছু দরকার নেই। মুখখানা তেতেই আছে চাঁদ মুখার্জির।—আমি আপনার সঙ্গে পাকা ফয়সলা করে ফেলতে এসেছি, আমার দু'বারের কন্ট্রাক্ট পাঁচ বছর আগেই শেষ হয়েছে, এখন এই পাঁচ বছর ধরে আপনি বিনা কন্ট্রাক্টে কাজ করে চলেছেন, এই পাঁচ বছরে কোন বই কি বিক্রী হয়েছে আর কি স্টক আছে সব বুঝিয়ে দিন।

ছেলে দুটি দাঁড়িয়ে। প্রবীণ চাকলাদার ফ্যাসাদে পড়লেন যেন।

—তা দিচ্ছি, কিন্তু আপনি হঠাৎ এ-ভাবে কথা বলছেন কেন...আমাদের দিক থেকে কোনো ত্রুটি হয়েছে?

—প্রথম পাঁচ বছর হয় নি, তখন আপনার ব্যবসা এত বড় হয়ে ওঠেনি, পরের এই পাঁচ বছরে আপনি একটা স্টেটমেন্ট পাঠান নি, একটা পয়সাও ছোঁয়ান নি, হিসেবপত্র করতে বলুন, আমি সব বই তুলে নেব।

ছেলে দুটোর ভ্যাবাচাকা খাওয়া মূর্তি। ভদ্রলোক আঁৎকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। —সে-কি মশাই! সে-সময় আপনাকে তিনখানা চিঠি লেখার পর আপনি একখানা চিঠিরও জবাব দিলেন না। তার আগে একবার শুধু লিখেছিলেন কাজ যেমন চলছে চলুক, আপনি অসুস্থ, ভালো হয়ে আপনি কলকাতায় এসে সব রেগুলারাইজ করে নেবেন...তার পরেও, আচ্ছা দাঁড়ান—

ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে পিছনের সেল্‌ফ থেকে ফাইল টেনে নিলেন একটা। সেটা খুলে সামনে ধরলেন, এই দেখুন, আমাদের পর-পর তিনখানা চিঠি, আর এই আপনার জবাব।

চিঠি ক'খানার ওপরে চোখ বুলিয়ে নিল চাঁদ মুখার্জি। নিজের চিঠিটার নিচে সই দেখে বলল, আমারই তো লেখা দেখছি...

সিনিয়র চাকলাদার বললেন, তার পরেও আপনার খবর না পেয়ে ভাবলাম চিকিৎসার জন্যে আপনি হয়তো বাইরে-টাইরে চলে গেছেন—

ফাইলটা সামনে টেনে দিয়ে চাঁদ মুখার্জি বলল, আমি অনেকদিন এ ঠিকানায় থাকি না, খোঁজ পাবেন কি করে! তপ্ত ভাবটা কেটেছে—এক পেয়ালা চা আনতে বলুন।

ছেলেদের একজন ছুটল সঙ্গে সঙ্গে।

—বইয়ের বিক্রি কেমন?

—খুব ভালো, খুব ভালো। আপনার লজিক আর ফিলসফির বই তো এখানে ছেড়ে বাইরেরও বহু কলেজ আর ইউনিভার্সিটিতে চলছে, সোসিওলজির ক্যারিকুলাম তো এদিকে বড় একটা নেই, ওটা বাইরের ওপরেই ভরসা, তাও ভালোই চলছে, এই পাঁচ বছরে ধরুন গিয়ে বার তিনেক রিপ্রিন্ট হয়েছে।

—লজিক আর ফিলসফি?

—ও দুটো ছ' সাত বার হবে, তাই না! ছেলের দিকে তাকাতে সে মাথা নেড়ে সায় দিল।

—ওগুলো প্রত্যেকবার পাঁচ হাজার করে ছেপেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

চা এলো। বড় বড় সন্দেশের ডিসও। চায়ের পেয়ালা তুলে নিয়ে চাঁদ মুখার্জি বড় করে চুমুক দিল একটা। তারপর একটু ভেবে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, আমার কি পাওনা হয়েছে দেখুন, আর পাঁচ বছরের স্টেটমেন্ট দিতে বলুন—

মেজাজ ঠাণ্ডা দেখে প্রবীণ ব্যবসায়ী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন একটা। হৃষ্টমুখে ড্রয়ার থেকে চেকবই বার করতে করতে বললেন, ফি বছরের স্টেটমেন্ট আমাদের করাই থাকে, এখন আপনার কতো চাই বলুন!

চায়ের পেয়ালা খালি করে চাঁদ মুখার্জি ঠাণ্ডা জবাব দিল, আগে সবসুদ্ধ কত পাওনা হয়েছে দেখুন।

অগত্যা বাপের ইশারায় আবার এক ছেলে ছুটে বেরিয়ে তক্ষুনি স্টেটমেন্টের ফাইল নিয়ে এলো। তারপর হিসেব করে দেখা গেল, পাঁচ বছরে ফিলসপি বই থেকে তার পাওনা হয়েছে উনচল্লিশ হাজার, লজিক বই থেকে চুয়াল্লিশ হাজার আর সোসিওলজি বই থেকে একুশ হাজার—মোট এক লাখ চার হাজার টাকা। গত পাঁচ বছরের আপটুডেট হিসেব।

চাঁদ মুখার্জি বলল, পঁচাত্তর দিয়ে দিন।

চোখ বড় বড় করে ফেললেন ভদ্রলোক।—পঁচাত্তর মানে...

—পঁচাত্তর মানে পঁচাত্তর হাজার।

—একসঙ্গে এত টাকা নেবেন!

—তাতে আপনার লোকশান কি, এই ক'বছরের ইনটারেস্ট তো আপনার পুরো লাভ হয়েছে। তাড়াতাড়ি করুন—

নিরুপায় ভদ্রলোক পঁচাত্তর হাজারেরই চেক লিখলেন। বর্তমানে সব থেকে দামী অথরের মেজাজ সুবিধের ঠেকছে না। সঙ্গে কোন বইয়ের দরুন কত টাকা দেওয়া হল তারও একটা স্টেটমেন্ট সই করে দিলেন।

সে দুটো হাতে নিয়ে চাঁদ মুখার্জি প্রথমে অবাক এবং পরে উষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল মালিকের দিকে। চেকটা আলাদা করে সামনে ধরল, এর নাম টাকা? মশাই আপনি কি রসিকতা করছেন আমার সঙ্গে? হাতে একটা পয়সা নেই, আপনার চেক ধুয়ে আমি জল খাব?

মালিকের চোখ-মুখের অবস্থা আরো দেখার মতো।—পঁচাত্তর হাজার টাকা আপনাকে আমি ক্যাশ দেব কোত্থেকে, ব্যাঙ্কে তো চেক জমা দিতেই হবে!

বিরক্তিতে চাঁদ মুখার্জি তেতে উঠল আরো। ঝাঁজালো গলায় বলল, শুনছেন তো আমার টাকার দরকার এক্ষুনি, আর এখানে কি আমার অ্যাকাউন্টস আছে যে জমা দেব! আপনার ব্যাঙ্ক কতদুর এখান থেকে?

—এই কাছেই, পাঁচ-সাত মিনিটের পথ।

চেকটা তার সামনে ছুঁড়ে দিল চাঁদ মুখার্জি।—বেয়ারার করে দিয়ে টাকাটা আনিয়ে দিন এক্ষুনি, আমি ঘড়ি ধরে আর আধঘণ্টা বসব।

—এত টাকা সব ক্যাশে নেবেন? যা দিনকাল...

—দিনকাল যাই হোক তাতে আপনার কি, আপনি তো আর রিসিট না নিয়ে টাকা দিচ্ছেন না! তাড়াতাড়ি করুন, আমার এখনো সকালের চানটা পর্যন্ত হয় নি।

প্রৌঢ় চাকলাদার হাঁ করে চেয়ে রইলেন খানিক। তিনি ভেবে পাচ্ছেন না মানুষটার মেজাজ গত পাঁচ বছরের মধ্যে এত তিরিক্ষি হয়ে গেল কেমন করে! এই অথরের সঙ্গে তার স্ত্রীর বড় রকমের একটা গণ্ডগোল অবশ্য কানে এসেছিল। সেদিক থেকেই কোনো অঘটন ঘটে গেছে কিনা বুঝে উঠলেন না। সাহস করে কিছু জিগ্যেসও করতে পারলেন না।

বললেন, ঠিক আছে, দিচ্ছি টাকা আনিয়ে।

## চার

লোকটা চলে যাবার পরেও কল্পনা দেবী খুব সুস্থির বোধ করছিলেন না। তাকে ছেড়ে দাদা ফিরে আসার পরেও না। বলেছেন, চান পরে হবে'খন বলে গেছে, এই চানের দোহাই দিয়েই আবার ফিরে আসবে না তার ঠিক কি...

একটু ভেবে ধর্মেন্দ্র চৌধুরি বলেছেন, আসা সহজ নয় অবশ্য, বাবুর ট্রাম-বাসের ভিড় বরদাস্ত হয় না...যেতেই দশ টাকার মধ্যে সাত-আট টাকা ট্যাক্সি ভাড়া লেগে যাবে, তবে বলাও যায় না, একটু সাবধান হওয়া দরকার।

চিন্তাচ্ছন্ন মুখে সত্যশরণ মন্তব্য করেছেন, কিন্তু লোকটা ঠিক জায়গামতো ওরকম ইংরেজি বলল কি করে।

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে ধর্মেন্দ্র চৌধুরি জবাব দিলেন, আরে বাবা সকালে তাহলে শুনলে কি, দেড় দিন ধরে অমন ইংরেজি বাংলা সংস্কৃত হিন্দি অনেক কিছু ঠেসেছে আমার মাথায়, শুনলে লিখে রাখতে ইচ্ছে করে এমন, ঈশ্বরের আশীর্বাদে ওই করেই তো ঘায়েল করেছে আমাকে।

কল্পনা রায়ও স্বামীর ওপর বিরক্ত।—ওই ইংরেজি বুলি শুনেই তোমার মাথা ঘুরে গেল! তুমিই না বলছিল ওই দলের পাণ্ডারা উচ্চশিক্ষিত হয়!

—তা বটে।

স্বপ্না আরো দুশ্চিন্তার ইন্ধন জোগালো। চোখ বড় বড় করে বলল, আমার দিকে কিভাবে যে তাকাচ্ছিল না মা, যেন গিলে খাবে, টকটকে লাল মুখ!

ওদিক থেকে আমোদিনী জানান দিল, আমারও কোমরের হাড় নড়ে গেছে গো দিদিমণি!

কল্পনা রায় কবিতা লিখতেন। স্বামীর সুদিনের সময় তাঁর বহু কবিতা ছাপাও হয়েছে। কাগজওয়ালাদের নিস্পৃহতায় এই দু'বছর ধরে সেই উৎসাহে একটু ভাঁটা পড়েছে। এখন অবসর সময় কাটে ডিটেকটিভ নভেল পড়ে। ফলে তাঁর কল্পনার ধার আরো বেড়েছে বই কমে নি। ফলে সহজেই মাথা গরম হয়। তিনি সাদাসাপটা রায় দিয়েছেন, না বাপু, কিছু বিশ্বাস নেই, ঘরদোরের ভিতর পর্যন্ত দেখে গেছে, এখানেও দলবল থাকতে পারে—দুপুরে এসে হাজির হবে কিনা ঠিক কি. কেউ বাড়ি থেকে বেড়িও না...আর স্বপ্না, তুই ননী-মাখনকে একটা টেলিফোন করে দে তো, ওরা এসে গেলে অনেকটা নিশ্চিন্তি—

গোমড়ামুখ করে ধর্মেন্দ্রবাবু বাধা দিতে চেষ্টা করেছেন, তাহলে তো আবার আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়!

বিরক্তি সত্ত্বেও মুখে স্নেহ ঝরল কল্পনা দেবীর।—দুধের দুটো ছেলে তোমার, কি যে বলো দাদা ঠিক নেই। আমি ওদের সামলাব'খন, ওদের জন্যে কিছু ভাবতে হবে না।

অতএব দুপুরের লাঞ্চ-টেবিলে ননী-মাখনও এই বাড়িতেই। ষণ্ডামার্কা দুই ছেলে, কাঁধ পর্যন্ত ঝাকড়া চুল। একজনের বয়েস চব্বিশ, একজনের বাইশ। পিসী তাদের তোয়াজ করে খাওয়াচ্ছেন আর তারা বিরক্ত মুখ করে খাচ্ছে। বাপ আড়চোখে লক্ষ্য করছে তাদের।

পিসী মোলায়েম করে বললেন, পেট ভরে খা তোরা, কিছু ফেলিস না বাবারা।

ননী বলল, মাংসই নেই, খাব কি দিয়ে!

পিসী তাড়াতাড়ি বললেন. বিপদের দিন, বুঝতেই তো পারছিস, রাতে মাংস এনে খাওয়াব'খন তোদের—

মাখন বলে উঠল, এই মেরেছে, আবার রাতেও ডিউটি দিতে হবে নাকি।

তোয়াজের সুরে পিসী বললেন, একটা দিন থেকেই যা বাবারা, ওই সব লোকের মতি-গতি কে জানে—দিনে আসে কি রাতে আসে তাব কিছু ঠিক আছে!

মাছের মুড়োটার ওপর দখল নিয়ে ননী জিগ্যেস করল, এলে আলুর দম বানাতে হবে, কি আলুকাবলি?

কি বলতে চায় ঠাওর করতে না পেরে স্বপ্না সত্রাসে তাকাল তাদের দিকে। সত্যশরণ বললেন, না, একলা এলে হঠাৎ কিছু করতে হবে না, শুধু ওয়াচ করতে হবে...ওই ইংরেজি লাইনটা যে কার কিছুতে মনে আসছে না।

কল্পনা সরোষে তাকালেন স্বামীর দিকে।

খাওয়া-দাওয়া চুকল। ননী-মাখনের এখন দুপুর কাটে কি করে! এক প্যাকেট তাস অবশ্য সঙ্গে এনেছে। বসার ঘরে গা এলিয়ে দু'জনে দুটো সিগারেট টানছে। খুশি মুখ নয় কারো, কারণ পকেট দুজনেরই প্রায় খালি।

মাখন বলল, বাবা এসেছে কিন্তু আমাদের খবর দেওয়া হয়নি, পাছে টাকা চাই।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ননী মন্তব্য করল, আগেকার রাজারাজড়ারা এই জন্যেই বাপকে মেরে সিংহাসন দখল করত। ইতিহাসে পড়িস নি—

সিগারেট অ্যাসট্রেতে গুঁজে উঠে দাঁড়াল, চল কিছু আদায় করে নিয়ে আসি।

আরাম করে শয্যায় শরীর সমর্পণের তোড়জোড় করছিলেন ধর্মেন্দ্র চৌধুরি। দুই মূর্তিকে একসঙ্গে ঘরে ঢুকতে দেখে সোজা হয়ে বসলেন।—এ সময়ে যে বাবারা?

ননী জানান দিল, কিছু টাকা চাই।

—টাকা। যেন টাকা কি বস্তু তাই জানেন না ভদ্রলোক।—এখন টাকা কেন? ঈশ্বরের আশীর্বাদে এ মাসের টাকা ছেড়ে তিন মাসের টাকা তো আগাম দেওয়া হয়ে গেছে!

মাখন জবাব দিল, ঈশ্বরের আশীর্বাদে সে টাকা খরচও হয়ে গেছে।...তুমি আমাদের একধার থেকে বঞ্চিত করে চলেছ বাবা, নেহাৎ বাবা বলে খাতির করে কিছু বলি না আমরা। তুমি টাকা দিলে এই দশা হয় আমাদের, ব্যবসায়ে তোমার মতো আমরাও লাল হয়ে যেতে পারতুম—তখন আর দিনরাত টাকা-টাকা করে ঘুরতে হত না!

ধর্মেন্দ্রবাবু বললেন, লাল তো এমনিই হয়ে আছ বাবারা, আর বেশি লাল হওয়ার কি দরকার! তা বাড়ি পাহারা দিতে এসেছ, এখন টাকা কেন?

বিরক্তমুখে ননী বলল, বসে বসে তো হাই উঠবে, পাহারা দেব কি, নাও দুজনের দু'শ টাকা বার করো।

বাইরে থেকে কল্পনা ঘরে ঢুকছিলেন। ওদের দেখে আর কথা কানে যেতে চুপিসাড়ে পালিয়ে বাঁচলেন। এদিকে কথা না বাড়িয়ে দুজনের হাতে দু'শ টাকা দিয়ে অব্যাহতি পেলেন ধর্মেন্দ্র চৌধুরি।

টাকা গুনতে গুনতে ননী আর মাখন বেরিয়ে এলো। ননী বলল, আগে চল, টাকাগুলো ভাঙিয়ে আর কিছু খুচরো করে এনে তারপর তে-তাসে বসা যাক।

স্বপ্না দেয়াল-তাক থেকে মোটাসোটা একটা উপন্যাস টেনে বার করছে। রঞ্জনের আসতে দেরি আছে, সময় কাটাতে হবে। তাছাড়া উপন্যাসের নায়িকা খোঁড়া হয়ে যাবে শুনে বেজায় রাগও হয়েছে। ওর মতো ছেলেকে হয়তো বিয়ে করাই সম্ভব হবে না, মায়ের পরামর্শটা বেশি হল, নামী লেখকের এই মোটা উপন্যাসটা খানিকটা পড়া হলে হয়তো লেখার গুণাগুণ সম্পর্কে কিছু লেকচারও দেওয়ার সুবিধে হবে রঞ্জনকে।

—খুকুমণি, মা ডাকছেন তোমাকে। দরজার বাইরে আমোদিনীর গলা।

বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে বই হাতে স্বপ্না বেরিয়ে এলো। তার পাশেরটা মায়ের ঘর।

সে ঘরের পর্দা ঠেলে দেখে বাবা শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। ঘোরানো বারান্দা ধরে এদিকে চলল। বসার ঘরের ও-দিকেরটা অতিথি-অভ্যাগতদের জন্যে নির্দিষ্ট। তার পরেরটায় মামাবাবু থাকেন। তারও পরেরটা মায়ের নিজস্ব ঘর। সেখানেও শয্যা পাতা একটা। এ-ঘরে শুয়ে বসে মা একসময় অনেক কবিতা লিখেছেন। এখনো এখানেই শুয়ে বই-টই পড়েন। তাঁর কাছে মহিলা অভ্যাগত এলেও এই ঘরে বসানো হত।

মা শয্যায় আধশোয়া, হাতে ডিটেকটিভ নভেল। গম্ভীর মুখ।

—কি? স্বপ্না এগিয়ে এলো।

—বোস্। আরো গম্ভীর তিনি।

ব্যাপার না বুঝে স্বপ্না সামনেই বসল। কল্পনা জিগোস করলেন, ওটা কি বই?

—উপন্যাস। ডাকছিলে কেন?

হাতের বইটা পাশে রাখলেন কল্পনা।—ওই যে চাঁদ মুখার্জি না কি নাম—তখন বলল, টেলিফোনে তুই কাকে ডিভোর্স করার কথা বলছিলি...কি ব্যাপার?

ভুরু কুঁচকে মেয়ের দিকে তাকালেন কল্পনা দেবী।—অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে স্বপ্না জবাব দিল, রেগে গিয়ে রঞ্জনকে বলছিলাম, তুমি শিখা সেনের পা খোঁড়া করে দিতে বলেছ কেন?

—আমার ইমেজিনেশন আছে তাই বলেছি। ওই চমকের মধ্য দিয়ে নায়কের হৃদয়খানা বেরিয়ে আসবে, বাজারে হুলস্থূল পড়ে যাবে।

—ছাই হবে, মড়াকান্না উঠবে।

—যা বুঝিস না তা নিয়ে কথা বলিস না। কিন্তু শিখার বিয়ে হল কার সঙ্গে যে ডিভোর্সের কথা উঠছে!

রাগতমুখে স্বপ্না বলে উঠল, শিখার নয়, আমি আমার কথাই বলেছি। আজ দু'বছর ধরে কতবার আমি রঞ্জনকেই বিয়ে করব ভেবেছি ঠিক নেই, বুঝলে?

আধশোয়া থেকে উঠে বসলেন কল্পনা। এমন তাজ্জব কথা আর বুঝি শোনেন নি। তার সেই মুখের দিকে চেয়ে স্বপ্না হঠাৎ হেসে উঠল। হাসি বাড়তেই থাকল।

বাড়ির ফটকে নিঃশব্দে একটা ট্যাক্সি থেমেছে। কেউ লক্ষ্য করল না। প্যাসেঞ্জারের কাছ থেকে একটা আস্ত দশ টাকার নোট পেয়ে ট্যাক্সিওলা সেলাম ঠুকল। চাঁদ মুখার্জি ভিতরে ঢুকে দাওয়ায় এসে উঠল, তার হাতে বড়সড় প্যাকেট একটা।

বাইরের ঘরে ঢুকে থমকে তাকাল। টেবিলের মুখোমুখি ঝুঁকে বসে দুটো ছেলে ফ্ল্যাশ খেলছে। দুজনের মুখের সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর আচ্ছন্ন। পাশের অ্যাশপটে কতগুলো খাওয়া সিগারেট গোঁজা। ননী মাখন দুজনারই পাশে কতগুলো করে টাকা আর খুচরো সিকি আধুলি। সেই রকমই কিছু দান উঠেছে বোধ হয়, তিনটে করে তাস হাতে, বোর্ডে পয়সা ফেলে চলেছে দুজনেই। স্থান-কাল বিস্মৃত।

অদূরে দাঁড়িয়ে চাঁদ মুখার্জি দেখল কয়েক নিমেষ। তারপর নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে পর্দার ও-ধারের দরজা ঠেলে স্বপ্নার ঘরে ঢুকল। কার ঘর ওটা তখনো ধারণা নেই অবশ্য। আশা করল সেখানে বাড়ির কাউকে দেখতে পাবে।

ঘরে কেউ নেই। শ্রান্ত দৃষ্টি মেলে শূন্য ঘরের এদিক-ওদিক তাকাল খানিক। হাতের

প্যাকেটটা টেবিলের ওপর রাখল। দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে একশ' টাকার বাণ্ডিলগুলো বার করল। কোথায় রাখা যেতে পারে ভেবে না পেয়ে চারদিকে চেয়ে দেখে নিল একবার। দেয়ালের গায়ে বইয়ের তাকটাই পছন্দ হল। গোটাকতক বই টেনে তার পিছনে নোটের বাণ্ডিলগুলো ফেলে দিয়ে আবার বইগুলো যথাস্থানে ঠেলে দিল। তারপর জামার বোতাম খুলতে লাগল। প্রচণ্ড গরম লাগছে।

আমোদিনী তার খুপরি ঘরে মাদুর পেতে বসে এক বাণ্ডিল সিনেমার প্যামপ্লেট বই নিয়ে বসেছে। এগুলো জমায় সে। নিজে কেনে। দিদিমণি খ্বা খুকুমণি সিনেমায় গেলে তাদেরও বই আনতে বলে দেয়। অবসর সময়ে তন্ময় হয়ে নায়ক-নায়িকাদের ছবি দেখে। দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

ধর্মেন্দ্র চৌধুরি আর সত্যশরণ রায় তাঁদের ঘরে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন।

ননী মাখন ফ্ল্যাশের তন্ময়তায় স্থানকাল ভুলে আছে।

কেবল একটা ঘরেই মেজাজ ক্রমশ চড়ছে দুজনার। মা-মেয়ের। কল্পনা আর স্বপ্নার।

কল্পনা ঝাঁজিয়ে উঠলেন, চাল নেই চুলো নেই, একটা চাকরি পর্যন্ত করে না—ওরকম একটা ছেলেকে বিয়ে করার কথা তোর মাথায় আসে কি করে! তোর কি মাথা একেবারেই গেছে? ওর সঙ্গে সুপ্রকাশ দত্তর ছেলের তুলনা!

স্বপ্না মুখঝামটা দিল, চাকরি তো রঞ্জন করত, তোমার লেকচারের চোটে ছেড়েছে। তুমিই তো পই-পই করে বলেছ, চাকরি করে লেখক হওয়া যায় না, লেখকের মতো লেখক হতে হলে সব ছেড়েছুড়ে শুধু ওই লেখার কাঁটা-পথেই ফুল ফুটিয়ে যেতে হবে। তোমাকে খুশি করার জন্যই ও চাকরিটা ছেড়ে বসল, বুঝলে? চাকরি করলে কোনো দিকে কোনো আশাই নেই—

—আ-হা, কি একখানা চাকরি, মাস গেলে চারশ' টাকাও মাইনে পেত না, তাও তোর বাবা জুটিয়ে দিয়েছিল বলে—সেই ছেলের এত লোভ! তোকে বিয়ে করতে চায়!

স্বপ্না গজগজ করে উঠল, কেন, তার বাবাও তো বাবার কতকালের বন্ধু, বাবা মিনিস্টার না হলে অবস্থাও সমান সমান ছিল, দুজনেই মাস্টার। যাক, তুমি কিছু ভেবো না, শিখা সেনের পা খোঁড়া করলে আমি তাকে বাতিল করে দেব!

রাগে ফুঁসে উঠলেন কল্পনা রায়, এ-কথা শুনলে খোঁড়া করবে কেন, বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে শিখা সেনকে! বলি তোর কি এতটুকু ভবিষ্যৎ-চিন্তা নেই, এতটুকু আক্কেল নেই? কোথায় সুপ্রকাশ দত্ত একটা মিলিয়নেয়ার লোক, তার কত বাড়ি কত গাড়ি কত প্রতাপ, এই বিয়েটা ঘটানোর জন্যে তোর বাবা ভদ্রলোককে কতরকমভাবে খুশি করে চলেছে, কত প্ল্যান আঁটছে, আর তুই কিনা রঞ্জনের মতো একটা ছেলেকে বিয়ে করার কথা ভাবিস! সুপ্রকাশ দত্তর ছেলের সঙ্গে রঞ্জনের তুলনা!

—তবে আর কি, অত টাকা আর বাড়ি-গাড়ি যখন ছেলের বদলে ওই সুপ্রকাশ দত্তর সঙ্গেই আমার বিয়ে দিয়ে দাও! মোট কথা, ওঁর ছেলেকে আমার ভালো লাগে না!

—কেন? কল্পনা ভুরু কোঁচকালেন, বিলাসের তো তোকে ভালো লাগে...তুই নিজেই তো একদিন বলেছিলি, তোর বাবা সে-কথা শুনে কত খুশি!

স্বপ্না বিরক্ত হয়ে ঝাঁজিয়ে উঠল, বিলাসের ভালো লাগে তাতে আমার কি? টাকার

জোরে তার আরো কত মেয়েকে ভালো লাগতে পারে, তখন? রঞ্জন তার বড়লোক প্রাণের বন্ধুকে বাড়ি এনে আলাপ করিয়ে দিলে, একমাস না যেতে সে রঞ্জনকে ঠেলে সরিয়ে আমাকে গিলতে চায়, আর তোমরাও তাই দেখে ধেই-ধেই করে নাচছ!

কল্পনা থমকে তাকালেন মেয়ের দিকে।—তুই তাহলে রঞ্জনকেই বিয়ে করবি ঠিক করেছিস?

—অনেকবার ভেবেছি বিয়ে করব, অনেকবার ভেবেছি করব না...তবে বিলাস দত্তর থেকে ওকেই আমার বেশি ভালো লাগে।

হালছাড়া চোখে মেয়ের দিকে খানিক চেয়ে রইলেন কল্পনা। তারপর একটু ধরা গলায় বললেন, মিনিস্ট্রি ছেড়ে আসার পর থেকে তোর বাবার হার্টের যা অবস্থা, সাবধান, এ-কথা যেন তাকে ঘুণাক্ষরেও বলিস না।...তোর মামারও ইচ্ছে সুপ্রকাশ দত্তর ছেলের সঙ্গেই তোর বিয়ে হোক, তাকেও বলিস না, রেগেমেগে তাহলে হয়তো আমাদের চার আনা অংশ বন্ধ করে দেবে। ওই ননী-মাখনের কানে গেলেও রক্ষা নেই...তোর বাবা আর মামার সায় পেলে তারা হয়তো একটা রক্তারক্তি কাণ্ড করে বসবে।...আর ওই আমোদিনীও যেন না শোনে কিছু, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ কানে ঢি-ঢি পড়ে যাবে।...এক আমাকে যা বলেছিস, বলেছিস...তাতে খুব একটা ক্ষতি হবে না, কারণ বিলাসের সঙ্গে তোর বিয়ে না হয়ে রঞ্জনের সঙ্গে বিয়ে হলে আমি তো আত্মহত্যাই করব।

আর সহ্য হল না স্বপ্নার। মোটা বই হাতে এক ঝটকায় উঠে গনগনে মুখে নিজের ঘরে চলল। ভিতরে ঢুকেই দেখে টেবিলের সামনের চেয়ারটাতে রঞ্জন বসে আছে। সমূহ রাগটা গিয়ে পড়ল ওরই ওপর।

বছর পঁচিশ বয়েস, একটু কালোর ওপর মিষ্টি চেহারা ছেলেটার। একমুখ হেসে বলল, একটু আগেই চলে এলাম—

স্বপ্না ঝাঁজিয়ে উঠল, সগগে তুললে আমাকে, কি দরকার ছিল আসার?

রঞ্জন মিত্তির হকচকিয়ে গেল, ক্যা-কেন...তুমিই তো টেলিফোনে আসতে বললে!

—আমি যা বলি তুমি তাই করো, কেমন? ঠিক আছে, এখন বলছি বেরিয়ে যাও!

—বে-বেরিয়ে যাব! চেষ্টা করে গলায় একটু জোর টেনে আনল রঞ্জন।—দেখো, আমারও মান-অপমান বলে কিছু আছে, তুমি যখন যেরকম খুশি ব্যবহার করবে?

—বেশ করব। তুমি কি করবে?

—আমি...মানে...দোষ হলে ক্ষমা চাইব...না হলে, ইয়ে—যাকে বলে রে-রেগেই যাব!

স্বপ্না আরো বেশি ঝাঁজিয়ে উঠল, দোষ হয়েছে! তুমি মা-কে বিয়ে করতে যাচ্ছ না আমাকে?

—অ্যাঁ! মা-মা-কে কেন...তোমাকেই তো!

—শিখা সেনকে তাহলে খোঁড়া বানাচ্ছ কেন?

—খোঁড়া বানাব না তাহলে, চীন জাপান রাশিয়া ইংল্যান্ড আমেরিকা কামসকাটকা সর্বত্র একেবারে ঘূর্ণিপাকের মতো নাচিয়ে বেড়াব।

—ঠিক আছে। তবু বেরিয়ে যাও!

—কেন, আবার কি হল?

—আবার কি হল! প্রাণের বন্ধু ওই মিলিয়নেয়ারের ছেলে বিলাস দত্তর সঙ্গে খুব আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে না? এখন মা তার দিকে, মামা তার দিকে, বাবা তার দিকে, আমি কি করব!

খাবি খেতে খেতে রঞ্জন মিত্তির বলল, কিন্তু সেদিন তো তুমি বললে, তুমি যা করবে তাই হবে—

মুখ মচকে স্বপ্না বলল, তখন কি আমি জানি, মা একেবারে আত্মহত্যা করে বসবে!

চেয়ার ছেড়ে আঁৎকে উঠে দাঁড়াল রঞ্জন, কি বললে? আত্মহত্যা! কবে?

—করেনি, করবে বলেছে। বোসো। একটুতেই অত ঘাবড়ে যেও না, ভেবে-চিন্তে একটা রাস্তা বার করতে হবে...এক কাজ করো, তোমার শিখা সেনের মাকে এনে আমার মা-বাবার মতো এই বিয়েটিয়ের ব্যাপারেও বসিয়ে দাও, আর বিলাসের মতও একজন কাউকে নিয়ে এসো—

উৎসাহিত হয়ে রঞ্জন বলল, আছেই তো একজন, কেন, দীপঙ্কর চাল্লুস?

—ঠিক আছে, ওর সামনে টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে স্বপ্না চিন্তাচ্ছন্ন একটু। প্ল্যান মাথায় এসে গেছে। বলল, শিখা তার মাকে বলুক মায়ের আত্মহত্যা সে চায় না, কিন্তু দীপঙ্করকে বিয়ে করতে হলে সে আত্মহত্যা করবে।

একগাল হেসে রঞ্জন বলল, ওয়ান্ডারফুল!

খুশি হয়ে স্বপ্না বলল, মাথায় না ঢোকালে কিছুই তো ঢোকে না তোমার, যে-ভাবে হোক চটপট বইটা ছেপে বার করে নাম করে ফেলো, নইলে কিস্‌সু আশা নেই তোমার, সর্দারি করে আগের ওই 'বাস্তব দুনিয়া' বার করেই নিজের নাম ডুবিয়েছ, সব আশা এখন এই উপন্যাসটা।

বলতে বলতে হাতের মোটা বইটা তাকে রাখার জন্যে সেখানকার দুটো বই ফাঁক করতেই আচমকা ইলেকট্রিক শকের মতো একটা ধাক্কা খেয়ে হাতটা সরিয়ে নিল। তারপর দুই চোখ বড় বড় করে ওই ফাঁকের দিকে তাকাল। না, ভুল দেখছে না, নোটের পাঁজা। পরক্ষণেই খাবলা মেরে একসঙ্গে চার-পাঁচটা বই টেনে টেবিলের ওপর ফেলল। তারপর দুই চক্ষু বিস্ফারিত।

নোট, নোট, পাঁজা পাঁজ নোট, সব একশ' টাকার নোট!

রঞ্জনের দু'চোখ তখনো স্বপ্নার সুচারু দেহ-সৌষ্ঠবের প্রতি নিবিষ্ট। ওদিকে কি ব্যাপার ঘটেছে কিছুই জানে না। এত কাছে ও-ভাবে সামনে ঝুঁকে দাঁড়ানোর ফলে একটা সুললিত স্পর্শ আর ঘ্রাণ ওর চোখে-নাকে লাগছে।

খপ করে দু'হাতে নোটের তাড়াগুলো টেনে নামালো স্বপ্না। স্বপ্ন না সত্যি, বুঝতে পারছে না। একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছ'টা সাত্টা, আর আধখানা!

হঠাৎ চোখের সামনে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা দেখে রঞ্জনও এবার তড়িৎস্পৃষ্টের মতো একটা ঝাঁকুনি খেয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর দু'চোখ ঠিকরে পড়ছে তারও।

দম বন্ধ হবার দাখিল স্বপ্নার।

প্রত্যেকটা বাণ্ডিলের প্রথম আর শেষের নম্বর দেখছে। একশ' করে আছে, তার মানে এক-একটায় দশ হাজার—সাতটায় সাত দশং সত্তর হাজার। আর ছোটটায়! আটচল্লিশখানা, তার মানে চার হাজার আটশ', সব মিলিয়ে চুয়াত্তর হাজার আটশ'।

নোটের বাণ্ডিলগুলো দু'হাতে বুকে তুলে নিয়ে প্রথমে রঞ্জনের দিকে, তারপর দিশেহারা বিস্ময়ে ঘরের চারদিকে তাকাল। নিজের খাটের দিকে চোখ পড়তে সর্বাঙ্গ হিম তার, দুই চক্ষু স্থির। খাটের বাজুর ওপর একটা পাঞ্জাবি ঝুলছে, সেই কাজ-করা পাঞ্জাবি, সকালের সেই লোকটা এই পাঞ্জাবি পরে এসেছিল। রঞ্জনের ভেবাচাকা খাওয়া মূর্তির দিকে চেয়ে অস্ফুট স্বরে বলল, কি সর্বনাশ!

কাছে এসে পাঞ্জাবিটা ভালো করে দেখল একবার। তারপর সত্রাসে ছুটে দরজার বাইরে এলো।

—মা! বাবা! মামা! ননীদা, মাখনদা! শিগ্গীর এসো! শিগ্গীর!

একটা আর্তনাদ ঝিমুনো বাড়িটার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। নীরবতা খানখান হয়ে গেল।

ও-পাশের ঘরে ননী-মাখনের মনোযোগে ছেদ পড়ল এতক্ষণে। মাখন হাতের তাস নিয়ে উঠতে গেল। বিরক্ত ননী বাধা দিল। —বোস, এ বাজিটা হয়ে যাক, মেয়েছেলে অমন হিস্টিরিয়ার মতো চেঁচিয়েই থাকে, আমরা বসে আছি এখানে, কি আবার হবে!

এ বাজিটা তার জেতার আশা। বোর্ডে অনেকগুলো আধুলি আর টাকা পড়েছে। ওই টাকাগুলো পাওয়ার আশা মাখনেরও, সে বসে পড়ল।

ততক্ষণে কল্পনা আর আমোদিনী ছুটে এসেছে। এদিক থেকে সত্যশরণও। থপথপ করে এগিয়ে আসছেন ধর্মেন্দ্র চৌধুরিও।

আর্তনাদ করেই স্বপ্না আবার ঘরে ছুটে এসেছে। বসে পড়ে খাটের নিচে আর আনাচকানাচ দেখছে। উত্তেজনায় সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ তার।

—কি হল? কি হয়েছে? এ-রকম চেঁচিয়ে উঠলি কেন? ডাকলি কেন?

একসঙ্গে বাবা জিগ্যেস করছেন, মা জিগ্যেস করছেন, মামা জিগ্যেস করছেন।

স্বপ্না উঠে দাঁড়াল। কাঁপছে ঠক ঠক করে। ঘামছে। জবাব দিল, টা-টা-টা-কা!

—টাকা! টাকা কি-রে? আবার সমবেত প্রশ্ন। রঞ্জনের বিহ্বল মুখের ওপর চোখ গেল সকলের।

—হ্যাঁ। টা-টা টাকা, এই যে!

দু'হাত সামনে মেলে নোটের পাঁজাগুলো দেখালো স্বপ্না।

একসঙ্গে এতগুলো টাকাই যেন মুগুরের মতো ঘা বসিয়ে দিল সকলের মাথায়। ওদিকে খুকুমণির হাতে অত টাকা দেখে আমোদিনীর দু'চোখও ঠিকরে বেরুচ্ছে।

সত্যশরণের প্রথম বাকস্ফুরণ হল।—এত টাকা তুই কোথায় পেলি?

—পে-পেলাম...ওই বইগুলোর ওধারে...চুয়াত্তর হাজার আ-ট শ'! থরথর করে কাঁপছে স্বপ্না।—আর ও-ও-ওই দেখো—

টাকা-ধরা দু'হাত বাড়িয়ে খাটের বাজুর ওপরের নক্সাকরা এলোমেলো পাঞ্জাবিটা দেখালো সে। প্রথমে দুর্বোধ্য ঠেকল সকলেরই, তারপর একসঙ্গে চমক। কল্পনা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে জামাটা তুলে ধরলেন, তাঁরও গলা দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এলো একটা।—সর্বনাশ! সে-ই এসেছিল, সে-ই এসেছে! অ্যাঁ! এখন কি করব আমরা, কার সর্বনাশ করে এত টাকা নিয়ে এসেছে! ওরে ননী-মাখন, কোথায় তোরা!

ভয়ে দিশেহারা স্বপ্না টাকাগুলো প্রথমে মায়ের হাতে দিতে গেল, তারপর বাবার

হাতে, কিন্তু তাঁদের হাত বাড়ানো বৃথা, কারণ শেষ পর্যন্ত স্বপ্না টাকাগুলো দিল মামার হাতে।

পিসীর চিৎকার কানে যেতে তাস ফেলে ননী মাখন হাজির এবার।—এত চেঁচামেচি কিসের!

ওদের দেখেই ধর্মেন্দ্র চৌধুরি টাকার বাণ্ডিলগুলো জামার দুই পকেটে রেখে পরনের লুঙ্গিটা তার ওপর দিয়ে জড়ালেন। কল্পনা বলে উঠলেন, সকালের সেই লোক কখন কোথা দিয়ে এসেছে তোরা দেখলিও না? কোথা থেকে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা ডাকাতি করে এনেছে—

ননী মাখন একসঙ্গে লাফিয়ে উঠল, কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা! ননী জিগ্যেস করল, কোথায় সে-টাকা?

মাখন জিগ্যেস করল, কত টাকা?

স্বপ্না বলল, চুয়াত্তর হাজার আটশ'—বই রাখতে গিয়ে ওগুলোর পিছনে পেলাম।

দু'জনে একসঙ্গে ছেঁকে ধরল তাকে।—কোথায়—কোথায় টাকাগুলো? কি করলি?

—মামার কাছে।

ওরা ঘুরে মামার দিকে অর্থাৎ তাদের বাবার দিকে তাকাল। চোখে-মুখে রাজ্যের বিরক্তি। স্বপ্নাকে লক্ষ্য করেই ননী বলল, অতগুলো টাকা সাত-তাড়াতাড়ি বাবাকে দিতে গেলি কেন, পাহারা তো আমরা দিচ্ছিলাম—

ছেলে দুটোর অপ্রসন্ন কড়া চাউনি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার আশায় ধর্মেন্দ্রবাবু বললেন, টাকা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে শিগগীর দেখ কোথায় গেল লোকটা, সকলের সাড়া পেয়ে বাড়িতেই নিশ্চয় ঘাপটি মেরে আছে কোথাও! এত টাকা আর জামা রেখে যাবে কোথায়?

কল্পনা বলে উঠলেন, তাই তো! তাই তো! টাকা আর জামা রেখে সে কি আর বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে! আমরা এখন কি করব! যেখানেই থাক, ও কি খালি হাতে আছে!

শোনামাত্র ডাকাত ধরার জন্যে ননী মাখন ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

ধর্মেন্দ্র চৌধুরিও ঘামছেন। সত্যশরণকে বললেন, তুমি থানায় ফোন করো শিগগীর, আমি রিভলভারটা নিয়ে আসি—

ব্যস্তসমস্ত হয়ে সত্যশরণ ফোন তুলে নিলেন। ধর্মেন্দ্রবাবু রিভলভার আনতে ছুটলেন।

ঘর-সংলগ্ন বাথ-এর দেওয়াল ছাদ পর্যন্ত ঠেকেনি। ওপরটা ফাঁকা।

চারভাগের তিনভাগ জলে ভরাট বাথ-টবে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে চাঁদ মুখার্জি। ভিতরের এ গণ্ডগোল চেঁচামেচি কথাবার্তা সবই তার কানে আসছে। নিঃশব্দ হাসিতে টকটকে রক্তবর্ণ মুখ।

সজোরে দরজা খুলে গেল। ভিতরে উঁকি দিয়েই দু'চোখ কপালে স্বপ্নার। জলের তলায় লালমুখ লোকটা চোখ বড় বড় করে চেয়ে আছে তার দিকে। জানান দেবার আগে দুই ঠোঁটে কাঁপুনি। আর্তনাদই করে উঠল তারপর।—এই যে...এ-এ-এইখানে! বাথটাবে শুয়ে চান করছে!

রিভলভার উঁচিয়ে প্রথমেই ধর্মেন্দ্র চৌধুরি ভিতরে ঢুকলেন, তাঁর পিছনে সত্যশরণ, তাঁর পিছনে কল্পনা আর রঞ্জন। নীরব হাসিতে তখনো মুখ লাল চাঁদ মুখার্জির।

—ওঠো! উঠে এসো বলছি! গলা কাঁপছে ধর্মেন্দ্র চৌধুরির, ন-ইলে ঈ-ঈশ্বরের আশীর্বাদে গুলি করব আমি! এই গুলি করে ফেললাম প্রায়, উঠে এসো বলছি!

অগত্যা .বাথ-টাব ছেড়ে উঠে আসতে হল। দু'হাত কোমরে তুলে চাঁদ মুখার্জি সবক'টা মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল একবার। একসঙ্গে এতগুলো লোকের এমন মাথা খারাপ হতে আর বুঝি দেখেনি।

—বাইরে যান।

রিভলভার বাগিয়ে ধরেই এক পা পিছু হটলেন ধর্মেন্দ্রবাবু। —বা-বাইরে যাব মানে!

পাশ থেকে কাগজে মোড়া প্যাকেটটা টেনে নিল চাঁদ মুখার্জি। খুলতে দেখা গেল ওর মধ্যে জামা আর পাজামা। সেগুলো দেখিয়ে মুখভঙ্গি করল একটু। অর্থাৎ এগুলো ব্যবহারের জন্যেই সকলের বাইরে যাওয়া দরকার।

বাইরে এসে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল সকলে। একটু বাদে নতুন পোশাকে চাঁদ মুখার্জি এ-ঘরে এলো। আবার এক নজরে দেখল সকলকে। স্বপ্নার দিকে তাকাল।—চিরুনি!

স্বপ্না প্রথমে থতমত খেল, তারপর কি চায় বুঝে ছুটে চিরুনি এনে হাতে দিল। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়াতে লাগল চাঁদ মুখার্জি। সেই আয়নায় ননী-মাখনের দিকে চোখ পড়ল এবার। বাড়ির সর্বত্র এমন কি ছাতেও খোঁজা শেষ করে এইমাত্র ঘরে ঢুকেই হতভম্ব তারা। আয়নার ভিতর দিয়ে চোখাচোখি হতে একটু হাস্যকর মুখভঙ্গি করল চাঁদ মুখার্জি।

ঝাঁপিয়ে পড়বে কিনা না বুঝে মাখন দাদার দিকে তাকাল একবার।

—পাউডার! মাথা আঁচড়ানো শেষ। আয়নার ভিতর দিয়ে স্বপ্নার দিকে চোখ চাঁদ মুখার্জির।

—এই-এই যে! ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গিয়ে স্বপ্না ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার থেকে পাউডার কেস বার করে দিল।

মুখে একপ্রস্থ পাউডার বুলিয়ে নিয়ে এবারে ধীরেসুস্থে ধর্মেন্দ্র চৌধুরির সামনে এসে দাঁড়াল চাঁদ মুখার্জি। ভদ্রলোক তখনো রিভলভার হাতে প্রস্তুত।

—টাকাটা দিন।

—টা-টাকা মা-নে কার টাকা?

—আমার।

থানা পাঁচ-সাত মিনিটের পথ মাত্র। পাঁচ-ছ'জন সশস্ত্র লোক নিয়ে স্বয়ং থানা-অফিসার এসে হাজির। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে ঘরে ঢুকল তারা।

চাঁদ মুখার্জি তাদের দেখল কি দেখল না। ধর্মেন্দ্র চৌধুরিকে ঝাঁজালো তাগিদ দিল, আঃ, বার করুন টাকা! আপনার কাছে আমি জানি—

আবার লুঙ্গির ওপর থেকে জামা টেনে তুলে দু'পকেটের নোটের বাণ্ডিল বার করে তার হাতে দিলেন ধর্মেন্দ্র চৌধুরি। পুলিস এসে গেছে যখন এত ঘাবড়াবার কিছু নেই। অত টাকা দেখে ননী-মাখনের দু'চোখ ঠিকরে পড়ার দাখিল। ও. সি. এবং পুলিসের আরো কারো কারো কোমরের রিভলভারে হাত।

সত্যশরণ ও. সি.কে সমস্ত কেসটা সংক্ষেপে বোঝানোর উদ্দেশ্যে বললেন, এই লোক আমার এই বড় সম্বন্ধীর সঙ্গে সন্দেহজনকভাবে এলাহাবাদ থেকে আজ কলকাতায় এসেছে, সঙ্গে একটা টাকাও ছিল না, এঁরই টাকায় এসেছে, তারপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এত টাকা নিয়ে ফিরে এসেছে! আমার মনে হয়...

তাঁকে থামিয়ে ও. সি. সম্ভাব্য আসামীর দিকে ফিরে কঠিন স্বরে জিগ্যেস করলেন, কি নাম?

—চাঁদ মুখার্জি।

—ওখানে কত টাকা?

—পঁচাত্তর হাজার ছিল। দু'শ ভাঙিয়েছি। এখানে চুয়াত্তর হাজার আটশ' আছে, ভাঙানো দু'শর বেশির ভাগ ওই জামার পকেটে আছে।

—এ টাকা কোথায় পেলেন?

জবাব না দিয়ে চাঁদ মুখার্জি বইয়ের তাকের দিকে এগিয়ে গেল। পাবলিশারের সই করা টাকার স্টেটমেন্ট ওটার ওপরেই পড়েছিল। সেটা এনে ও. সি.-র হাতে দিল।

ও. সি. পড়ে অবাক। ডক্টর চন্দ্রনাথ মুখার্জি কে?

—আমি।

—তবে যে বললেন, চাঁদ মুখার্জি?

—চন্দ্রনাথ ছিলাম। চাঁদে এসে ঠেকেছি।

স্টেটমেন্টটা আবার একটু দেখে নিলেন ও. সি.। গলার স্বর একটু বদলে জিগ্যেস করলেন, লজিক, ফিলসপি আর সোসিওলজি —এই তিনখানা বই আপনার লেখা?

সবিনয়ে মাথা সামনের দিকে নোয়ালো চাঁদ মুখার্জি, অর্থাৎ ওই তিনখানা বই অধমেরই লেখা বটে।

স্বপ্না সবিস্ময়ে বলে উঠল, ডক্টর সি. এন. মুখার্জির লজিক তো আমরা হায়ার সেকেন্ডারিতে পড়েছি! এখন বি. এ-তে তাঁর ফিলসফিও পড়ছি!

গম্ভীর মুখে ও. সি টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন। এত সহজে বিশ্বাস করার পাত্র নন তাঁরা। রিসিভার তুলে স্টেটমেন্টের নম্বর মিলিয়ে নম্বর ডায়েল করলেন।

—হ্যালো! চাকলাদার অ্যান্ড সনস? ওদিকে মালিক চাকলাদার সাড়া দিয়েছেন।

—ও. সি. সাউথ দিস সাইড—ডক্টর চন্দ্রনাথ মুখার্জি নামে আপনার কোনো অথরকে আজ আপনি পঁচাত্তর হাজার টাকা দিয়েছেন?

ওদিকের জবাব, আজ্ঞে হ্যাঁ, কেন, কি হয়েছে?

—এত টাকা ক্যাশ দিয়েছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, উনিই যে জোর করে ক্যাশ করিয়ে নিলেন!

—ভদ্রলোকের চেহারা কেমন বলুন তো?

ওদিক থেকে চেহারার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে চাঁদ মুখার্জির। আর ও. সি. তার মুখের দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে মিলিয়ে নিচ্ছেন। মিলছেও। আপনার এই ডক্টর মুখার্জি এলাহাবাদে থাকেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, চাকলাদার ব্যাকুল, টাকাগুলো আছে, না গেছে?

—আছে। রিসিভার নামিয়ে রেখে বড় করে একটা দম ফেললেন ও. সি.। সকলের দিকে তাকালেন একপ্রস্থ. পরে চাঁদ মুখার্জির দিকে।—সরি!

দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

চাঁদ মুখার্জির কৌতুকমাখা চোখও সকলের মুখের ওপর ঘুরল এক চক্কর। ভেরি, ভেরি সরি!

বিমূঢ় সকলেই।

গম্ভীর মুখে চাঁদ মুখার্জি ছোট বাণ্ডিলের নোট থেকে দু'খানা একশ' টাকার নোট ধর্মেন্দ্র চৌধুরির দিকে বাড়িয়ে দিল। বলল, ধরুন—আপনার কত খরচ হয়েছে নিয়ে নিন। নিন—নিন—আমি কারো কাছে ধার রাখি না।

টাকা নিতে হল। অমায়িক একটু হাসতে চেষ্টা করে বললেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদে ডাকাত থেকে ডক্টর হয়ে গেলে—

তাঁর রসিকতায় কান না দিয়ে বাকি টাকাগুলো নিয়ে চাঁদ মুখার্জি সকলের মুখের দিকে তাকাল। তারপর স্বপ্নাকে ডাকল, এই মেয়ে, এদিকে এসো—

স্বপ্না শশব্যস্তে এগিয়ে আসতে টাকাগুলো সব তার হাতে দিয়ে বলল, এগুলো তোমার কাছে রাখো, আর কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করো আমার, বেজায় খিদে পেয়েছে...তারপর আবার বেরিয়ে একটা হোটেল-টোটেল দেখে নিতে হবে...যা ব্যাপার দেখছি, এখানে আমার থাকা পোষাবে না।

ধর্মেন্দ্র চৌধুরি আর সত্যশরণ মুখ-চাওয়া চাওয়ি করলে। স্বপ্নার ব্যতিব্যস্ত দুই চোখ মায়ের দিকে, কারণ ওর কাছে খেতে চাওয়া হয়েছে। এবারে কল্পনা রায় হাঁসফাঁস করে বলে উঠলেন, আমি এখুনি খাওয়ার ব্যবস্থা করছি...আমাদের ভুল হয়ে গেছে ভাই, ভয়ানক ভুল হয়ে গেছে...আপনি এতবড় একজন গুণী মানুষ কি করে জানব...আর বই লিখে এত টাকা পাওয়া যায় তাই বা কে জানত! কি লজ্জা কি লজ্জা, এমন সুন্দর মুখখানা তাকে কিনা সকলে ডাকাত ভেবেছে, আর কখনো এরকম ভুল হবে না ভাই, এসেছেন যখন আপনাকে এখানেই থাকতে হবে।

ধর্মেন্দ্র চৌধুরি নিজের স্বভাবে ফিরেছেন এবার। এগিয়ে এসে রিভলভার তাক করলেন, যাবে মানে! আমার বিভলভার আছে না! হা-হা শব্দে হেসে উঠলেন, আরে, ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমি কি এরকম একটা ভুল করতে পারি, নইলে আমার মতো লোক গাঁটের পয়সা ভেঙে ওকে নিয়ে আসে!

সত্যশরণ এগিয়ে এসে হাত ধরলেন, আপনি আমাদের সম্মানিত অতিথি, যা হয়েছে ক্ষমা করে দিন।

হাসিমুখে এগিয়ে এলো ননী আর মাখনও। হেসে হেসে মাখন বলল, আপনাকে ডাকাত ভেবে পিসী আমাদের পাহারা দেবার জন্যে ধরে এনেছিল।

চাঁদ মুখার্জি হাসছে মিটিমিটি।—তোমরা?

ধর্মেন্দ্র চৌধুরি বললেন, ওরা আমার দুটি রত্ন, ননী-মাখন।

চাঁদ মুখার্জি ওদের মাথা দুটো ধরে হঠাৎ ঠুকে দিল একটু। খাশা, ননী-মাখন!

সকলকে হেসে উঠতে দেখে রাগতে গিয়ে ননী আর মাখনও হেসেই উঠল। এত টাকার জোর যার তার ওপর ওরা বোকার মতো রাগ করে না। দরজার সামনে আমোদিনীর মুখেও হাসি ধরে না।

ব্যস্তসমস্ত পায়ে কল্পনা খাবার ব্যবস্থা করতে গেলেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত রঞ্জনই শুধু নির্বাক মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিল। স্বপ্নার সকালের টেলিফোনের সেই আগন্তুক সেটা অনেকক্ষণ বুঝেছে। চেহারা-পত্রের যে বর্ণনা শুনেছিল তার সঙ্গে কিছুটা মিললেও বয়েস আদৌ মিলছে না। হাঁ করে সে চাঁদ মুখার্জিকেই দেখছিল এতক্ষণ। চোখ দুটো এবার স্বপ্নার দিকে ফেরালো।

স্বপ্নার বিস্ময়-ভরা আর খুশিমাখা দৃষ্টিও এই মুহূর্তে তার দিকেই। সকলের চোখ বাঁচিয়ে স্বপ্না তাকে একটা ভেঙচি কেটে উঠল।

## পাঁচ

এ-বাড়িতে চাঁদ মুখার্জির বিপরীত খাতির এখন। তাকে নিয়ে কল্পনা ব্যস্ত, সত্যশরণও ব্যস্ত। আর স্বপ্নার আর ধর্মেন্দ্র চৌধুরির তো কথাই নেই। এমন কি, আমোদিনীও এসে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খোঁজ নিয়ে যায়, চা বা অন্য কিছু লাগবে কি না।

নিজেদের মধ্যেও কথা হয় তাকে নিয়ে। প্রায় পঁচাত্তর হাজার টাকা বাড়িতে মেয়ের হেপাজতে রাখার জন্য দুশ্চিন্তার অন্ত নেই সত্যশরণের। চাঁদ মুখার্জিকে টাকাটা ব্যাঙ্কে রেখে আসতে অনুরোধও করেছিলেন। চাঁদ মুখার্জির নিশ্চিন্ত জবাব, কখন হুট করে চলে যাব ঠিক নেই, আবার ব্যাঙ্কে যাও, একাউন্ট করো, টাকার ভাবনা আপনাকে কে ভাবতে বলেছে!

ধর্মেন্দ্র চৌধুরি বোন আর ভগ্নিপতিকে বলেছেন, মানুষটার সরল বিশ্বাস আর অন্তঃকরণ দেখো...নিশ্চিন্ত মনে পঁচাত্তর হাজার টাকা ওর কাছে দিয়ে দিলে...এ টাকা যে ইচ্ছে করলেই মেরে দেওয়া যায় এ ভাবনাও মাথায় আসে না।

কল্পনা বলে উঠেছেন, এর মতো একজন নিজে সেধে বাড়িতে এসেছে, মহা ভাগ্য আমাদের। স্বপ্নাটার সঙ্গে তো এই তিনদিনের মধ্যেই নিজের বোনের মতো ব্যবহার করছে।

ওদিকে স্বপ্না মন দিয়ে নতুন হিসেবের খাতা খুলেছে একটা। একটাকা দামের পাতলা বাঁধানো খাতা। যত্ন করে খাতার ওপরে লিখেছে, চান্দার টাকার হিসেব। পিছন থেকে খুব চুপিসাড়ে তার খোঁপাটা খুলে দিচ্ছে চাঁদ মুখার্জি।

—আঃ! স্বপ্না বিরক্ত।—তোমার কাজ করছি আর তুমিই জ্বালাতন করছ! লিখছে, মোট জমা চুয়াত্তর হাজার আটশ' টাকা, শোনো, যখন যেমন টাকা নেবে তুমি, তারিখ দিয়ে লিখে রাখব, বুঝলে?

চান্দা মাথা নাড়ল, বুঝেছে—

—আচ্ছা চান্দা, গলার স্বরে কৌতূহল উপচে উঠল স্বপ্নার, একবারে তুমি পঁচাত্তর হাজার টাকা ঘরে এনে ফেলো, তোমার আরো ঢের টাকা আছে, না?

—আছে। তুই নিবি কিছু?

—আমি নিতে যাব কেন? ইস, আমার যদি এর সিকির সিকিও থাকত!

—থাকলে কি হত?

—রঞ্জনকে দিতাম। মাত্র চার হাজারের জন্যে বেচারার এত ভালো বইখানা ছাপা হচ্ছে না, সর্বস্ব দিয়ে আগে কি যে এক ছাইয়ের বাস্তব দুনিয়া ছেপে বসল, এখন কোনো পাবলিশার আর ফিরেই তাকায় না।

চাঁদ মুখার্জি জিগ্যেস করল, এটা কোন বই, যাতে নায়িকার পা খোঁড়া করে দিতে যাচ্ছিল?

—ইস, খোঁড়া করলে ওর পা আমি আস্ত রাখতুম! মা যত সব উদ্ভট চিন্তা ওর মাথায় ঢোকায়, আর তুই-ই বা কেমন বাপু, মা হল গিয়ে কবি-মানুষ, কত রকমের থট-ওয়েভ তার মাথায় ঘোরে ফেরে, তা বলে তুমি তার কথায় নাচবে?

চাঁদ মুখার্জি ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করেছে, তোর মা কবি বুঝি?

—কবি বলে কবি, বাবা মিনিস্টার থাকতে সব কাগজ ভয়ে ভয়ে মায়ের কবিতা ছাপত, বাবা আর কিছুদিন মিনিস্টার থাকলে এতদিনে মায়ের কবিতার বইও বেরিয়ে যেত!

রঞ্জন মিত্তিরের সঙ্গেও ভাব-সাব হয়েছে চাঁদ মুখার্জির। তার পড়ার জন্যে এক কপি 'বাস্তব দুনিয়া' নিয়ে আসতে স্বপ্না ওর ওপরে রেগেই গেছল। ঝংকার দিয়ে বলে উঠেছে, নিজের বইয়ের ওপর দরদ দেখে বাঁচি না, ওটা পড়ে কি চান্দার ইম্‌প্রেশন একটুও ভালো হবে তোমার ওপর!

আবেদনের সুরে রঞ্জন বলেছে, কাল চান্দা নিজেই এক কপি আনতে বললেন যে...!

—বলছেন তবে আর কি, লোকে নিজের দুর্বলতা একটু রেখেঢেকে চলে, তুমি তার উল্টো। ও বই তোমাকে পড়তে হবে না চান্দা, এ মরছে, ও কাটছে, সে ধুঁকছে, কেবল সমস্যা আর সমস্যা, আনন্দ নেই হাসি নেই, এ সব বই কখনো চলে বাজারে, তুমিই বলো চান্দা?

চাঁদ মুখার্জি কৌতুক বোধ করেছে, সত্যি কথা লিখবে না তাহলে?

—সত্যি কথা পড়তে হলে লোকে খবরের কাগজ পড়বে, গল্প উপন্যাস পড়ার দরকার কি?

চাঁদ মুখার্জি জবাব হাতড়ে পায়নি। তবু রঞ্জনের প্রতি মমতাবশতই বইখানা রেখেছে।

এতগুলো নগদ টাকা ঘরে, সত্যশরণের খুঁতখুঁতুনি এখনো যায়নি। তিনি দিনকালের হাল জানেন। সেদিন সন্ধ্যায়ও এই কথাই তুললেন, বললেন, তুমি এক কাজ করো ভায়া, রাতে আমার ভালো ঘুম হচ্ছে না, টাকাগুলো ব্যাঙ্কেই রাখো, দরকার মতো বেয়ারার চেক দেবে। স্বপ্না আধঘণ্টার মধ্যে তুলে এনে দেবে।

পরোক্ষ সায় দিয়ে ধর্মেন্দ্রি চৌধুরি বললেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমি থাকলে এ-বাড়িতে চোর-ডাকাত ঢুকবে-টুকবে না, আমার সে-ভয় কম অবশ্য, কিন্তু আমার চিন্তা নিজের ছেলে দুটোকে নিয়েই, তারা কি এখনো রয়টারের কাজ শেষ করতে বাকি রেখেছে! পঁচাত্তর হাজার টাকা এতক্ষণে কতজনের কানে চলে গেছে তার ঠিক কি!

কল্পনা বললেন, ছেলে দুটোর সম্পর্কে তুমি খামোখা যা-তা বোলো না দাদা। যার টাকা সে ভাবছে না, তোমরা ভেবে অস্থির! শেষের অনুযোগ স্বামীর প্রতি।

বিরক্ত-মুখ করে সত্যশরণ বললেন, তুমি তো বাক্সে টাকা রাখতে পারলেই খুশি।

—তা যা-ই বলো, বাক্সে অনেক নগদ টাকা থাকলে ভালোই লাগে বাপু।

টাকার প্রসঙ্গটা কেমন ছোঁয়াচে সকৌতুকে সেটাই লক্ষ্য করছিল চাঁদ মুখার্জি। এবারে সত্যশরণ তার দিকে চেয়ে টিপ্পনীর সুরে বললেন, আমার স্ত্রী রাতে ঘুমিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখেন, বুঝলে!

চাঁদ মুখার্জি আলতো করে বলে ফেলল, আপনি ভাগ্যবান, আমার স্ত্রী দিনের বেলা জেগে জেগেই ওই স্বপ্ন দেখত।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের অন্য সকলে সচকিত একটু। ধর্মেন্দ্রবাবু, সত্যশরণ, কল্পনা এমন কি স্বপ্নাও। লোকটার ঘরের খবর শোনার আগ্রহ সকলেরই। ধর্মেন্দ্রবাবুই সে চেষ্টায় এগোলেন।—দেখত কি রকম...এখন দেখে না?

প্রশ্নটা কানে ঢোকার আগেই অন্যমনস্ক চাঁদ মুখার্জি। মাথার মধ্যে যন্ত্রণা হচ্ছে একটু, ঘর-বাড়িগুলো দুলছে অল্প অল্প। একটা দূরের দৃশ্য কাছে এগিয়ে আসছে।

...একটি সুন্দরী বিবাহিতা রমণী উগ্র রোষে অসহিষ্ণু পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে এসে এক-পাঁজা টাকা তার গায়ের ওপর ছুঁড়ে মেরে বলে উঠল, আমি তোমার কাছে দশ হাজার চেয়েছিলাম, আর তুমি এতদিনে দু'হাজার দেখাতে এসেছ!

...চাঁদ মুখার্জি বলছে, না থাকলে চুরি করে আনব না ডাকাতি করে আনব?

...কেন, থাকে না কেন? বিয়ের আগে তুমি নিজের মুখে বলোনি তোমার কোনো অভাব নেই?

...অভাব ছিল না, কিন্তু সেটা বুঝতে পারার মতো বিবেচনাও আমার তখন ছিল না।

...রমণী ঝলসে উঠল, গলা দিয়েও আগুন ঠিকরলো তার।—তোমাকে সাত-তাড়াতাড়ি বিয়ে করাটাই আমার বোকামি হয়েছে, তোমার তুলনায় তোমার বন্ধু স্বর্গ, বুঝলে?

দেখা গেল, বন্ধুটি ও-ঘরেই ঢুকতে যাচ্ছিল, স্বামী-স্ত্রীর কথা কানে যেতে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। চাঁদ মুখার্জি জবাব দিল, তোমার বোকামিটা আমার চোখেও একটু দেরিতে ধরা পড়েছে।

আত্মস্থ হল চাঁদ মুখার্জি। ঘরের সকলে তার দিকে চেয়ে আছে। ধর্মেন্দ্রবাবু বলছেন, কি হল হে, বউয়ের কথায় একেবারে চুপ মেরে গেলে যে!

চাঁদ মুখার্জি অসহিষ্ণু জবাব দিল, বউ নেই।

সকলেই ধাক্কা খেল একটু। ধর্মেন্দ্রবাবু বললেন, এঃ, এরই মধ্যে মারা গেছে!

—মারা গেছে কি জাহান্নমে গেছে সে খোঁজে আপনার কি দরকার?

মুখ লাল করে উঠে এসেছে চাঁদ মুখার্জি।

এমন একজন খামখেয়ালি গুণী মানুষের পদার্পণ বাড়িতে আর ঘটেছে বলে ভাবেন না কল্পনা। ধর্মেন্দ্রবাবু আর তাঁর ভাগ্নিটিরও এই ধারণা। কখন আবার বলবে, চললাম, এই চিন্তা তাদের। সেই কারণে গুণী মানুষটাকে আনন্দে রাখার তাগিদ। সেই তাগিদে নিজেদের ক্লাবে নিয়ে এসেছেন তাকে। শহরের গণ্যমান্য অভিজাতদের সমাবেশ সেখানে। মেয়ে-পুরুষের জমজমাট পরিবেশ। এখানে মিলিয়নেয়ার সুপ্রকাশ দত্ত আর তার ছেলে বিলাস দত্তকে দেখেছে চাঁদ মুখার্জি। ইমপোর্ট এক্সপোর্টের বিরাট কারবারী সুপ্রকাশ দত্ত। সত্যশরণ হাসিমুখে গল্প জুড়েছেন তাঁর সঙ্গে আর কল্পনা সস্নেহে বিলাসের গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

চাপা রাগে স্বপ্না চুপিচুপি চাঁদ মুখার্জিকে বলেছে, বাবা মা দুজনেই কেমন তেল

দিচ্ছে দেখো চান্দা, বাবা যখন মিনিস্টার ছিল ওই লোকটাই তখন বাবাকে তোয়াজ তোষামোদ করে কত কাজ বাগিয়েছে।

এখানে চুরুটমুখে আর একটি পবিচিত মানুষ দেখেছে চাঁদ মুখার্জি। প্রদীপ ঘোষ। সত্যশরণের বাড়িতে তার আনাগোনা আছে। ও-বাড়ির সকলের সঙ্গেই খাতির, এমন কি আমোদিনীব সঙ্গেও তাকে হেসে কথাবার্তা বলতে দেখেছে। চাঁদ মুখার্জিব সঙ্গেও তার আলাপ করিয়ে দেওযা হযেছিল। একসময় কলেজেব মাস্টাব ছিল, এখন কিছুই না শুনে সাদামাটা আলাপই করেছে, কোনোরকম বাড়তি আগ্রহ দেখা যায়নি তার। এখনো একবার মাথা নেড়ে চাঁদ মুখার্জির পাশ কাটিয়ে সে তাড়াতাড়ি মিলিয়নেয়ার সুপ্রকাশ দত্তর দিকে এগিয়ে গেছে। নিজেব দামী লাইটার জ্বেলে তার হাতের সিগারেট ধরিয়ে দিল।

হাঁ করে সকলের দিকে চেয়ে চাঁদ মুখার্জি যেন এক ভিন্ন জগতেব মানুষ দেখে গেছে।

পরে কল্পনা জিগ্যেস কবেছেন, আমাদেব ক্লাব কেমন লাগল চাদ ভাই?

—বেশ সুন্দব কলেব মানুষেব মতো।

—সে আবার কি। কল্পনা থতমত খেযেছেন।

—মানে.. কেউ যেন পিছন থেকে দম দিচ্ছে, আর সকলে ঘুরছে ফিরছে হাসছে কথা কইছে।

আব ঘাঁটানো সমীচীন বোধ কবেননি কল্পনা।

হ্যাঁ, এখানে এসে দেখাব নেশায পেযেছে চাঁদ মুখার্জিকে। সে যেন এতকাল নিজেব জগতে বিচ্ছিন্ন ছিল, এত যে মজাদাব দেখাব জিনিস আছে চাবদিকে জানতই না। বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকতে চায না, বেরুবাব ঝোঁক, দেখাব ঝোঁক। সঙ্গী পেলেই বেরিয়ে পড়ে, ধর্মেন্দ্র চৌধুবিব সঙ্গে বাজাবে আসে, স্বপ্না আব বঞ্জনেব সঙ্গে বেড়ায়, এমন কি ননী মাখন ডাকলেও সানন্দে ওদেব সঙ্গে বাস্তায টহল দেয, মিটিং শুনতে যায।

ধর্মেন্দ্র চৌধুবি তিবিশ টাকা কিলোব বাজাবের সেবা চিংড়ি কেনেন, আব পাশের দুঃস্থ ক্রেতা লোলুপদৃষ্টিতে সেই দিকে চেযে থাকে। চাঁদ মুখার্জি দুজনকেই দেখে।

—শালা। মেরে একেবারে বস্তা বানিযে দেব, ওজনে ঠকাচ্ছ। এক কিলোয় দেড়শ' গ্রাম পটল কম!

—মারুন না শালাকে, মুখে বলছেন কেন! ওইদিকে শুরু হয়ে গেল পটলওলাকে ধবে ক্রেতাদের মাব। সেই ফাকে সমস্ত পটল লুঠ হয়ে গেল তার। লুটের লোভে আরও অনেকে ছুটে আসছে। পটলওলা কাঁদছে। চাঁদ মুখার্জি দেখছে।

স্বপ্না আর রঞ্জনেব সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে চাঁদ মুখার্জি ভিড়েব বাসেই উঠে পড়েছে দেখার লোভে, চাপাচাপিতে হিমসিম খাচ্ছে সে। তাবই মধ্যে শুরু হযে গেল হট্টগোল। এক যাত্রী আর একজনকে কনুইযেব গুঁতো মেরেছে। বচসা থেকে চলতি বাসেই হাতাহাতি, মাবামাবি। বাস থামতে গলদঘর্ম হয়ে নেমে এলো তাবা। সেই অবসরে চাঁদ মুখার্জির মানিব্যাগ উধাও। বাসটা চলে যাচ্ছে। চাঁদ মুখার্জি হাঁ করে চেয়ে আছে সেইদিকে। পরে মানিব্যাগ খোয়া গেছে শুনে স্বপ্না আব রঞ্জনেব ক্ষোভের শেষ নেই। কিন্তু চাঁদ মুখার্জি হাসছে নিঃশব্দে।

ননী-মাখনের সঙ্গে মিটিং দেখতে এসেছে চাঁদ মুখার্জি। অবাক বিস্ময়ে নেতার বক্তৃতা শুনছে সে।

'...বিপক্ষের চাঁইরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছেন, চারদিকে কেবল নৈরাজ্যই দেখছেন তাঁরা। কিন্তু কেন নৈরাজ্য? আমাদের উদার সরকারের পরামর্শমতো আপনারা জনপ্রতিরোধ গড়ে তুলুন, নৈরাজ্য রামরাজ্য হতে ক'টা দিন সময় লাগতে পারে তাহলে?

'...বস্ত্র, চাল, ডাল, তেল, নুন, চিনির আগুন দাম কেন? আমাদের জনপ্রিয় সরকার কি প্রতিকারের পথ আপনাদের দেখান নি? জনপ্রতিরোধ গড়ে তুলে ওই উঠতি আগুনে জল ঢালুন! কেন আপনারা সহ্য করেন?

'...ট্রেনে ডাকাতি, রাহাজানি, সরকার তার কি করবে? যাত্রীর বদলে সব কামরায় সশস্ত্র প্রহরী তুলবে? সরকার তো এই মোকাবিলার ভার আপনাদের হাতেই তুলে দিয়েছেন, আপনারা জনপ্রতিরোধ গড়ে তুললে দুষ্টের দমন করতে আর ক'দিন লাগে? সংখ্যায় আপনাদের তুলনায় কত তারা?

'...কালো টাকা আর মজুতদারীর রাজত্ব চলেছে? আমাদের জনপ্রিয় উদার সরকার কি তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বলেন নি আপনাদের? আপনাদের কি এই জনপ্রিয় সবকার জনপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে বলেন নি?'

মাথা ঝিমঝিম করেছে চাঁদ মুখার্জির, বেরিয়ে এসে বেঁচেছে। ননী বলল, সুন্দর বক্তৃতা করছে ভদ্রলোক, চলে এলেন কেন—আপনার ভালো লাগল না?

...না, ইয়ে ভালোই, কিন্তু সব কিছুর জন্যেই যদি জনপ্রতিরোধ দরকার, তাহলে সরকার কি করবে?

মাখন অবাক। অত শিক্ষিত লোকের মুখে এই প্রশ্ন আশা করেনি যেন।—কেন? অ্যাডভাইস দেবে! জনতার হাতে অ্যাকশনের ভার দিচ্ছে, এর থেকে উদার গণতন্ত্র আর কি হতে পারে!

চাঁদ মুখার্জি হাঁ করে ওদেরই দেখছে।

দিন দুই হল আবার ওদের হাত থেকেই সভয়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে তাকে। সেদিন এসে সোৎসাহে ওরা একটা ব্যবসার প্রস্তাব দিয়েছিল তাকে। ননী বলেছে, চান্দা, কি আপনি অতগুলো টাকা ঘরে আটকে নিয়ে বসে আছেন, কিছু ছাড়ুন না, দারুণ একটা বিজনেস প্ল্যান আমাদের মাথায় ঘুরছে. আপনি শুধু টাকা ফেলেই খালাস, ব্যবসার অর্ধেক লাভ আপনার, বাকি অর্ধেক আমাদের, দেখতে দেখতে লাল হয়ে যাবেন।

—কিসের ব্যবসা? চাঁদ মুখার্জি উৎসুক।

—হাড়ের। মাখন সোৎসাহে বলে উঠেছে।—যা একখানা প্ল্যান ঘুরছে না আমাদের মাথায়! কেবল কিছু ক্যাপিটালের অভাব!

চাঁদ মুখার্জি হকচকিয়ে গেছে। জিগ্যেস করল, হাড়ের মানে, কিসের হাড়ের?

ননী জবাব দিয়েছে, সব রকমের হাড়ের, জীবজন্তুর হাড়, মানুষের হাড়, কি ডিম্যান্ড বাজারে আপনি জানেন না।...জীবজন্তুর হাড় ধাপায় লোক লাগালেই পেয়ে যাব, অবশ্য মানুষের হাড়েরই ডিম্যান্ড সব থেকে বেশি, কিন্তু টাকা ঢাললে কি না হয়, একদিকে ডোমেদের সঙ্গে অ্যারেঞ্জমেন্ট করব, অন্যদিকে হাসপতালের সঙ্গে। তাছাড়া নেহাৎ

অভাব হলে দু'একটাকে খতম করেও হাড় সংগ্রহ করা কঠিন নয় আজকের দিনে।
সেই থেকে ওদের দেখলেই গা-ঢাকা দেবার চেষ্টা চাঁদ মুখার্জির। ওরা তার দিকে তাকালেই মনে হয়, তার দেহের হাড় ক'টার ওপরেও বুঝি চোখ আছে ওদের।

দুপুরে খাবার টেবিলে সত্যশরণ বা ধর্মেন্দ্র চৌধুরি উপস্থিত ছিলেন না। কল্পনা বলেন, খেয়ে-দেয়ে আবার এক্ষুনি কোথাও বেরুচ্ছ না তো চাঁদ ভাই?
মুখে খাবার, চাঁদ মুখার্জি মাথা নাড়ল, বেরুচ্ছে না। কল্পনা বললেন, রাণীর আজ স্কুল নেই, দুপুরের দিকে আসবে বলে রেখেছে। তোমার গল্প শুনে আলাপ করার খুব ইচ্ছে, কিন্তু তোমার তো দেখাই পাওয়া যায় না, ক'দিন এসে ফিরে গেছে।
চাঁদ মুখার্জি সচকিত হয়ে জিগ্যেস করল, রাণী কে?
কল্পনা দেবী সোৎসাহে জানিয়ে দিলেন, আমার খুড়তুতো বোন রাণী চৌধুরি, স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মিসট্রেস—নিজে সেধে কারো সঙ্গে বড় একটা আলাপ করতে চায় না, আমাদের মুখে তোমার কাণ্ডমাণ্ড শুনে হেসে বাঁচে না—
চাঁদ মুখার্জি অস্বস্তি বোধ করছে।—ইয়ে, মানে উনি বিবাহিত তো?
প্রশ্ন শুনে স্বপ্না হাসল মুখ টিপে। কল্পনা একটা বড় নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, সে-কপাল আর হল কই, পড়াশুনায় ভালো, দেখতেও সুশ্রী, কিন্তু তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছর বয়েস হয়ে গেল, বিয়ের নামে খড়্গহস্ত। গলা একটু খাটো করে কল্পনা বললেন, আসলে ব্যাপার কি জানো, সেই বাইশ-তেইশ বছর বয়সে এক ছেলে বিশ্বাসঘাতকতা করে চলে গেল, সেই রাগ আজও সব ছেলের ওপর। বিয়েতে রাজি হলে ওই প্রদীপ ঘোষ তো হাঁ করেই আছে, কবেই বিয়ে হয়ে যেত, কিন্তু মেয়ে বিয়ে করবেই না, ওর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এখন বিলেত যাবে, আরো পড়াশুনা করবে, সেই জন্যেই টাকা জমাচ্ছে, কিন্তু প্রাইভেট স্কুলের তো চাকরি, নিজের খরচা চালিয়ে কত আর জমাতে পারে! তোমার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে বিকেলের দিকে আসে আর তুমিও থাকো না—আজ বলল, দুপুরে আসবে, তুমি থেকো কিন্তু।
ঢক ঢক করে এক গেলাস জল খেয়ে গলা ভেজালো চাঁদ মুখার্জি।—আচ্ছা, আচ্ছা।
নিজের ঘরে চলে এলো।
একটু বাদে স্বপ্না ঘরে ঢুকে দেখে সে পাঞ্জাবি গায়ে চড়াচ্ছে।
—এ কি চান্দা, এ-সময়ে কোথায় চললে?
কিছু একটা চুরি ধরা পড়ার মুখ চাদ মুখার্জির।—এই ইয়ে, একটা পান খেয়ে আসি।
স্বপ্না বাধা দিতে চেষ্টা করল।—তার জন্যে তোমার যাওয়ার দরকার কি, আমোদিনী এনে দিক।
—না না, আমিই যাই, খাওয়ার পর দু'পা হাঁটা ভালো, যাব আর আসব, বুঝলি!
বেরিয়ে গেল। পিছন থেকে স্বপ্না বলল, আমার জন্যেও একটা মিঠে পান এনো কিন্তু।
কানে গেল কি গেল না। চাঁদ মুখার্জি দ্রুত সরে পড়ছে।
তাকে ঘরে না দেখে কল্পনা মেয়েকে জিগ্যেস করলেন, কোথায় গেল?

—পান খেতে।

—তোর মাসি এক্ষুনি আবার ফোন করল, কি কাজে আটকে গেছে, চারটের আগে আসতে পারছে না, তুই যেন হুট করে ওকে নিয়ে বেরিয়ে যাস না আবার।

ওদিকে পান খাবার নাম করে চাঁদ মুখার্জি হনহন করে ট্রামরাস্তায় চলে এলো। তারপর স্বস্তি। বড় বাঁচা বেঁচেছে যেন। দু'দিকের দোকানপাঠ মানুষ-জন দেখতে দেখতে নিরুদ্দিষ্টের মতো হেঁটে চলল সে।

ঘড়িতে যখন চারটে বাজে, পা আর চলছে না। এবারে নিশ্চিন্তে ফেরা যেতে পারে ভাবল। আলাপ করার জন্যে তিন ঘণ্টা ধরে কেউ আর বসে নেই নিশ্চয়। কম করে চার-পাঁচ মাইল পথ হেঁটেছে সে। এবারে সামনেই একটা ট্রাম পেয়ে উঠে পড়ল চাঁদ মুখার্জি। অফিস-ফেরতের ভিড় শুরু হয়নি তখনো, ট্রাম কিছুটা খালি। বসারও জায়গা পেয়ে খুশি।

কিন্তু মিনিট দশেকের মধ্যেই সচকিত একটু। পাশের খালি জায়গায় এক মহিলা এসে বসল। ছোট বটুয়া থেকে কনডাক্টরকে টিকিটের পয়সা দিল। একজন পুরুষের পাশে নিঃসংকোচে এভাবে বসে পড়াটা একটু অবাক ব্যাপারই যেন। চাঁদ মুখার্জি আর একটু জানলা ঘেঁষে বসে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকে দেখতে লাগল।

চোখোচোখি হতে মহিলার মুখে বিরক্তির ছায়া। ভ্রূ কুঁচকে অন্যদিকে ঘাড় ফেরালো সে। চাঁদ মুখার্জি দেখছেই তাকে।

গন্তব্যস্থল এসে গেছে খেয়াল নেই। মহিলাও উঠতে মনে হল এই স্টপেই তারও নামার কথা। মহিলা চলেছে, চাঁদ মুখার্জিও পিছনে চলেছে। একই পথ।

বাড়ির ফটকের সামনে মহিলা ঘুরে দাঁড়াল। হঠাৎ পিছনে চাঁদ মুখার্জিও থমকে দাঁড়াল ভ্যাবাচাকা খেয়ে।

—কি মতলব? রুক্ষ রূঢ় প্রশ্ন মহিলার।

—কা-কার?

—আপনি আমাকে ফলো করছেন কেন?

—আ-আমি ফলো করছি! আপনিই তো সেই ট্রাম থেকে আমাকে ফলো করছেন!

—মগের মুলুক পেয়েছেন, কেমন? আপনি পিছন পিছন এই বাড়ির গেটে এসেছেন কেন?

—কি মুশকিল, আপনি আগে আগে আসছেন, আমি পিছনে না এসে করব কি!

—কেন আসছেন? মহিলা আরো ক্রুদ্ধ।—এখানে আপনার কি দরকার?

—দ-দরকার মানে! এ-বাড়িতেই তো আমি থাকি!

মহিলা মুখের দিকে চেয়ে থমকালো একদফা। কি মনে হতে ভয়ানক অপ্রস্তুত। —আপনি কি ডক্টর মুখার্জি নাকি?

—অ্যাঁ! ইয়ে মানে সেইরকমই তো—কিন্তু আপনাদের ওই চিকিৎসা-চিকিৎসার ডাক্তার নই।

হেসে অপ্রস্তুতের ভাবটা সামলে নিতে চেষ্টা করল মহিলা, আপ্যায়নের সুরে আমন্ত্রণ জানাল, আসুন, আসুন...আমার ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেছে...আগে দেখিনি তো, তাই চিনতে পারিনি। এটা আমার বোনের বাড়ি, আসুন—

চাঁদ মুখার্জির চক্ষু কপালে, আপনিই কি সেই চৌধুরাণী বোন নাকি?

—আমার নাম রাণী চৌধুরী, আমি তো আপনার সঙ্গে আলাপ করব বলেই এসেছি, দিদি কিছু বলেনি আপনাকে?

অস্ফুট স্বগতোক্তি বেরিয়ে এলো গলা দিয়ে, এই খেয়েছে! তারপর বলল, আপনার তো সেই দুপুরে আসার কথা ছিল!

—হ্যাঁ, ফোনে তো জানিয়ে দিয়েছি এসময় আসব, দাঁড়িয়ে গেলেন কেন, আসুন!

অগত্যা একসঙ্গেই বাড়িতে এসে উঠতে হল।

চায়ের টেবিল হাসিখুশিতে মুখর। ছদ্ম কোপের সুরে কল্পনা বললেন, পান খেতে বেরিয়ে চার ঘণ্টা টহল দিয়ে এলে, রাণী যদি দুপুরে এসেই ফিরে যেত!

চাঁদ মুখার্জি বলল, বরাত—

সত্যশরণ হাসিমুখে বললেন, বরাতই তো ভায়া, রাণীকে একেবারে সঙ্গে নিয়েই ফিরলে!

ধর্মেন্দ্র চৌধুরি মন্তব্য করলেন, সমস্ত যোগাযোগই ঈশ্বরের আশীর্বাদে হয়, বুঝলে, নইলে তুমি যাচ্ছ দিল্লী, আমার সঙ্গে যোগাযোগে এসে হাজির হলে কলকাতায়।

পর্দার ও-ধারে ড্রইংরুমে আর একজনের আবির্ভাব। চুরুটমুখে প্রদীপ ঘোষ। ওদিক থেকে আমোদিনী তাকে দেখতে পেয়ে একটু কাছে এসে হাসি চেপে সোজা ভিতরে চলে যেতে ইশারা করল। পর্দা সরিয়ে লোকটি খুশির পরিবেশটি দেখে তেমন খুশি হতে পারল না, রাণী চৌধুরির পাশের চেয়ারে ওই উটকো লোকটাকে বসে থাকতে দেখে।

ধর্মেন্দ্র চৌধুরি দরাজ অভ্যর্থনা জানালেন, আরে এসো, প্রদীপ এসো, ঈশ্বরের আশীর্বাদে আসর জম-জমাট। ঠিক সময়ে এসেছ, মাংসের সিঙ্গারা হাই ক্লাস!

স্বপ্না কৌতুকে মুখ মচকে একবার প্রদীপ ঘোষের দিকে আর একবার মাসির দিকে তাকাল। চান্দার দিকে চোখ পড়তে ফিক করে হেসে ফেলল।

প্রদীপ ঘোষ চেয়ার নিল, আমোদিনী তার খাবারের ডিশ সামনে এনে রাখল। ধর্মেন্দ্রবাবু বললেন, চাঁদ কিন্তু ফিলসপি আর সোসিওলজি দু' সাবজেক্টে এম. এ. ফার্স্ট ক্লাস, জানিস তো রাণী?

হাসিমুখে রাণী চৌধুরি মাথা নাড়ল।—শুনেছি। ওঁর লজিক বই আমাদের স্কুলেও পড়ানো হয়।

সত্যশরণ শালীর গুণ ব্যাখ্যা করলেন, বললেন. রাণী হিস্ট্রিতে এম. এ.।

চাঁদ মুখার্জি আলতো করেই বলে বসল, All history is a lie.

সকলই ধাক্কা খেল একটু, রাণী চৌধুরি সব থেকে বেশি। ভব্য গাম্ভীর্যে জিগ্যেস করল, তার মানে?

চাঁদ মুখার্জি ব্যাখ্যা দিল, বলছিলাম, সমস্ত ইতিহাস হল একখানা মিথ্যের জাহাজ।

রাণীর গলার স্বরে সামান্য উষ্ণ আভাস।—তা তো বুঝেছি, কিন্তু মিথ্যে কেন বলছেন?

—Because the men who make history have no time to write it—ইতিহাসের নিয়ামকদের ইতিহাস লেখার সময় কোথায়?

রাণী চৌধুরি এবারে যথার্থই উত্তপ্ত।—তহলে যে ইতিহাস আমরা পাই সেগুলো কি?

চাঁদ মুখার্জি নির্লিপ্ত জবাব দিল, A fable agreed upon where truth is very liable to be left-handed.

রাণী চৌধুরি থমকে মুখ লাল করে চেয়ে রইল তার দিকে। কথাগুলো শুনে শুধু সত্যশরণ মুগ্ধ। প্রদীপ ঘোষ ছাড়া আর সকলের মুখে বিড়ম্বনার ছায়া। এদিক থেকে চুরুট হাতে প্রদীপ ঘোষ চাপা ব্যঙ্গস্বরে বলল, এ-রকম তো সব-কিছুকেই বিকৃত করা যায়, আপনার সাবজেক্ট সোসালিজম তাহলে কি স্বর্গরাজ্য? ইউটোপিয়া?

চাঁদ মুখার্জি অম্লানবদনে মাথা নাড়ল।—না, আমাদের সোসালিজম হল ফিলসফি অফ ফেলিওর, আমাদের লাইন বেঁধে অর্থাৎ কিউ করে দাঁড়াতে শিখিয়েছে, তাই আমাদের সোসালিজম ইউটোপিয়া নয়, কিউটোপিয়া!

শুধু প্রদীপ ঘোষ ছাড়া সকলেই সমস্বরে হেসে উঠল। এমন কি রাণী চৌধুরিও। রাগের বদলে এখন মুগ্ধ চোখে মানুষটাকে দেখছে সে।

সেটুকু লক্ষ্য করে প্রদীপ ঘোষ আরো গম্ভীর। তার ওপর আবার ধর্মেন্দ্র চৌধুরি ফোড়ন কাটলেন, তুমি এমন একজন পলিটিক্স ভক্ত কনট্রাক্টর, তোমাকেও দিল তো জব্দ করে!

প্রদীপ ঘোষের কান সেদিকে নেই। সে আর একটা রুক্ষদৃষ্টি নিক্ষেপ করল চাঁদ মুখার্জির দিকে।

## ছয়

পর্দার আড়ালে আড়িপাতার ফলে যে কথাগুলো কানে গেল আমোদিনীর, তার দুই চক্ষু গোল। স্বামী-স্ত্রী অর্থাৎ সত্যশরণ আর কল্পনার মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল। আমোদিনী কি কাজে ঢুকতে গিয়েও ঢোকেনি, তার আগেই দিদিমণির প্রস্তাব কানে এসেছে। দিদিমণি বলেছেন, চাঁদ মুখার্জির সঙ্গে রাণীর বিয়ের চেষ্টায় এগোলে কেমন হয়, এ-রকম ছেলে তো সচরাচর মেলে না, ওকে দেখলেই আত্মীয় ভাবতে ইচ্ছে করে, আর রাণীরও যে বেশ পছন্দ তাকে সে-সম্বন্ধেও দিদিমণির একটুও সন্দেহ নেই, নইলে ওর মতো মেয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে পাঁচদিন আসে এখানে! গেল সপ্তাহে কতদিন এসেছে দিদিমণি হিসেব করে বুঝিয়ে দিলেন।

কর্তাবাবু প্রস্তাব শুনে অবাক প্রথমে। বলেছেন, একমাত্র বিলেত যাওয়া ছাড়া রাণীর মাথায় আর কিছু আছে নাকি! এ ছাড়া আর কিছু চায় বলে তো জানতুম না!

গিন্নি জবাব দিয়েছেন, পছন্দসই মানুষ দেখেনি একটাও তাই বিলেত-বিলেত করেছে, এখন যদি আমরা এগিয়ে আনতে পারি ব্যাপারটা, ঠিক রাজী হয়ে যাবে দেখো। আমার মন বলছে রাণীর এবারে একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

কিন্তু কর্তার সংশয় কাটেনি, বলেছেন, এদিকেরই বা আমরা কতটুকু জানি, বিয়ে হয়েছিল বলেছে; তার কি ব্যাপার কিছুই তো জানি না।

. গিন্নি সমস্ত সংশয় বাতিল করতে চেয়েছেন। জোর দিয়ে বলেছেন, সে-সব কাটান-কোটান হয়ে গেছে তুমি নিশ্চিন্ত থাক, তা না হলে এমন সোনার চাঁদ ছেলে চাকরি-বাকরি ছেড়ে বাউণ্ডুলের মতো ঘুরে বেড়ায়?

শোনার পর সংকট যেন আমোদিনীরই। অনেকদিন ধরেই প্রদীপ ঘোষের কাছ থেকে দু'এক টাকা করে পেয়ে আসছে আমোদিনী। তার বদলে তাকে আশার সমাচার শোনাতে হয় যেমন, দিদিমণি তার সঙ্গেই বোনের বিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত। কর্তাবাবুরও অমত নেই। কবে এ সম্পর্কে কি কথা হল না হল আমোদিনী তা গড়গড় করে বানিয়ে বলে যায়। কিভাবে তাঁরা ছোটদিকে (রাণীকে) বোঝাতে চেষ্টা করছেন না করছেন সেই কথাও বলে। ছোটদির মাথা থেকে বিলেত যাওয়ার ভূতটাকে সরাতে পারলেই যে এ-বিয়েতে রাজী হয়ে যাবে সেই আশ্বাসও দেয়। তার মধ্যে কিনা এই প্রস্তাব!

প্রদীপ ঘোষ কনট্রাক্টর। বড় পরিবারের নেহাৎ দুরবস্থার মানুষ ছিল একসময়। এখন মোটামুটি সচ্ছল অবস্থা বলা যেতে পারে। কিন্তু এই অবস্থাটুকুতে এসে পৌঁছানোর ফাঁকে জীবনের আটত্রিশটা বছর কেটে গেছে। একসময় তার প্রধান মুরুব্বি ছিল সত্যশরণ রায়। দুর্দিনে তিনি নিজে সাহায্য করেছেন, আর পোলিটিক্যাল সার্কেলের আর পাঁচজন পদস্থ মানুষের সঙ্গেও যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন। ফলে দস্তুরমতো রাজনীতিভক্ত হয়ে পড়েছে প্রদীপ ঘোষ। হবে না কেন, এরই ফলে অনেক গণ্যমান্য মানুষের সঙ্গে পরিচয় তার, যারা তাকে কাজ দেয়, কাজ পেতে সাহায্য করে। পয়সাওলা ব্যবসায়ীর সঙ্গে সর্বদাই যোগাযোগ রাখতে চেষ্টা করে, অমায়িক অথচ কেতাদুরস্ত তোষামোদে তাদের খুশি রাখে। এক সময় দরিদ্র ছিল, সে লজ্জা ঢাকার তাগিদে সর্বদাই বেশ একটা উঁচুদরের মানুষের মতো চাল-চলন হাব-ভাব আর পোশাক-আশাক তার। মুখে একটা মোটা চুরুট লেগেই আছে। কারো হাতে সিগারেট দেখলেই নিজের দামী লাইটার জ্বেলে সেটা ধরাতে সাহায্য করে।

আজ প্রায় দু'বছর হয়ে গেল মনে মনে রাণী চৌধুরিকে বিয়ে করার আশা পোষণ করছে। তার প্রথম কারণ মহিলা দেখতে শুনতে মন্দ নয়, চাকরি করে, এম. এ. পাস, আর এক্স-মিনিস্টারের শালী। দ্বিতীয় কারণ, বয়েস হয়ে গেল, এরপর আর কবে করবে বিয়ে! কিন্তু মুখ ফুটে আজও সত্যশরণ বা কল্পনার কাছে কথাটা তুলতে পারেনি। কারণ, রাণীর মন বোঝা ভার। একবার যদি মুখের ওপর না বলে দেয় তাহলে তো হয়েই গেল। ও-মেয়ে দিবারাত্র শুধু বিলেতের স্বপ্নই দেখছে। বিয়েতে রাজী হলে প্রদীপ ঘোষ তাকে কিছু টাকাও না দিতে পারে এমন নয়।...বিলেত-ফেরৎ স্ত্রী, ভাবতে মন্দ লাগে না, উঁচু মহলের পাঁচজনকে বলার মতো ব্যাপার। রাণীকে এবার এই প্রস্তাবটা দেবে বলেই ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হচ্ছে সে।

আমোদিনীর কাছে শুনেছে রাণীর এখানে আনাগোনা বেড়েছে। ফলে তারও আসাটা না বেড়ে উপায় কি! ওই উটকো লোকটা এসে তার মাথার যন্ত্রণা ধরিয়ে দিয়েছে। যেরকম মুগ্ধ দৃষ্টিতে রাণী সেদিন দেখছিল লোকটাকে, প্রদীপ ঘোষ তারপর থেকে দুশ্চিন্তার লবণ-সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে।

সেদিন বাইরের ঘরে পা দিতেই আমোদিনীর সঙ্গে দেখা। মুখ গম্ভীর আমোদিনীর। ইশারায় বসতে বলল।

—কি ব্যাপার, খবর আছে নাকি কিছু?

আমোদিনী চট করে বেরিয়ে গিয়ে চারদিক দেখে নিয়ে আবার ঘরে ঢুকল। প্রাপ্তিযোগ ঘুচতে চলেছে, তারও মেজাজ ভালো নয়। বলল, ব্যাপার কঠিন, ছোটদি

এয়েছেন, মায়ের ঘরে কথা কইছেন।

—ব্যা-ব্যাপার কঠিন কেন?

আমোদিনী চুপ।

—এই, এই দুটো টাকা নাও, জল খেও।

আমোদিনী বলল, আজ পাঁচটা টাকাই দিন, আর দিতে হবে না।

প্রদীপ ঘোষের খুশি মুখ।—ঠাট্টা করছ তাহলে, খবর ভালো বলো...এই নাও, পাঁচটা টাকাই নাও।...ইয়ে, ওই উনি মানে তোমার ছোটদি এসেছেন নাকি?

—হ্যাঁ, দিদিমণি তাঁকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গেছেন...বিয়ের কথাই কইবেন হয়তো।

বসা থেকে উঠে দাঁড়াল প্রদীপ ঘোষ।—বলো কি! উৎফুল্ল মুখ, কি জানো বলো না সব, বিয়ের কথা বলবেন তুমি জানলে কি করে?

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল আমোদিনী।—শুনেছিলাম। ওই ডাকাত বাবুর সঙ্গে বিয়ের কথা বলবেন বোধহয়...।

হাঁ করে খানিক মুখের দিকে চেয়ে থেকে প্রদীপ ঘোষ ধুপ করে আবার সোফায় বসে পড়ল।—পাখাটা খোলো।

আমোদিনী বলল, লোডশেডিং। হাতপাখা এনে দেব?

—না থাক। মেজাজ চড়ল একটু, ইয়ে তোমার ছোটদিকে একবার খবর দিতে পারো?

—দিদিমণি যে ঘরের দরজা বন্ধ করে কথা কইছেন তাঁর সঙ্গে, খবর দিই কি করে, বসুন খানিক।

কল্পনা সত্যিই বিয়ের প্রসঙ্গই তুলেছেন বোনের কাছে। মিষ্টি করে বলছেন, শোন, তোর মত না নিয়ে তো আমরা কোনো চেষ্টায় এগোতে পারি না, তোর অত লজ্জার কি হল, তুই কিছু জানিস এও তো চাঁদুকে টের পেতে দেব না!

মুখ লাল করে রাণী বলল, না না দিদি, এ ভারি লজ্জার কথা হবে, কি ভাবতে কি ভাববেন উনি ঠিক নেই, আমি বাপু এখন বিলেত যাওয়া ছাড়া আর কিছু চাইনে জীবনে—

—এ তোর মিথ্যে কথা, চাঁদুর মতো ছেলেকে কোনো মেয়ের ভালো না লেগে পারে না, তাছাড়া বিয়ে হলে তোর বিলেত যাওয়া আটকাচ্ছে কে? টাকার তো অভাব নেই ওর, হয়তো একসঙ্গেই যাবি দুজনে।

রাণীর চোখে-মুখে সুখ-কল্পনার শিহরণ খেলে গেল একপ্রস্থ। মুখে বলল, যা-ই করো দিদি,আমাকে কোনো কিছুর মধ্যে জড়িয়ে লজ্জায় ফেলো না বলে দিলাম। আমার তাহলে এ-বাড়িতে আসাই বন্ধ হয়ে যাবে।

—না না, তুই কিছু ভাবিস না, আমি বুঝে-শুনেই এগোবো, তুইও তো একটা ফেলনা মেয়ে নয় রে!

খুশিতে হেসে উঠল রাণী।—যাই, স্বপ্নাটা কি করছে দেখিগে—

—বোস বোস, এখন যেতে হবে না। চাঁদুকে বলে কয়ে ওর পিছনে লাগিয়েছি।

বুঝিয়ে শুনিয়ে যদি সুপ্রকাশ দত্তর ওই ছেলেটাকে বিয়ে করতে রাজী করাতে পারে। চাঁদুর কথা মেয়েটা খুব শোনে—

স্বপ্নার ঘরে চাঁদ মুখার্জির বোঝানোর চেষ্টটা যে কোন্ দিকে গড়াচ্ছে জানলে অত খুশিমুখ দেখা যেত না কল্পনার।

—তুই তাহলে সুপ্রকাশ দত্তর ছেলে বিলাস দত্তকে বিয়ে করছিস না? চাঁদ মুখার্জি যেন শেষবারের মতো বুঝে নিতে চাইছে।

—না, কক্ষনো না। স্বপ্নার সাফ জবাব।

—রঞ্জন মিত্তিরকে বিয়ে করছিস?

—এখন পর্যন্ত সেই রকমই ইচ্ছে।

মিষ্টি রাগত মুখখানা লক্ষ্য করছে চাঁদ মুখার্জি। জিগ্যেস করল, সে প্রোপোজ করেছে?

—আজ পর্যন্ত কম করে দশবার করেছে।

—দশবার কেন?

স্বপ্না জবাব দিল, আমার ভালো মুডে যখন বিয়ের কথা বলে আমি রাজী হয়ে যাই। আবার ওর ওপর রেগে গেলেই সেটা বাতিল করে দিই। তাই আমার ভালো মেজাজের সময় ওকে আবার প্রোপোজ করতে হয়।

—এই করে দশবার হয়েছে?

—তার বেশি ছাড়া কম নয়।

—তাই তাকে বিয়ে করতে পারিস ভাবিস কেন, সে তোর খুব বাধ্য বলে?

—হ্যাঁ। যখন অবাধ্য হয়, রাগ হয়।

—তোর কথা শোনে?

—শোনে। যখন শোনে না তখন রাগ হয়।

—তুই উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে?

—হ্যাঁ। যখন ওঠে-বসে না তখন রাগ হয়।

—তুই মেজাজ খারাপ করলে চুপ করে থাকে?

—থাকে। যখন থাকে না তখন রাগ হয়।

চাঁদ মুখার্জি ভাবল একটু।—তুই তাহলে বেশ পছন্দসই একটা কুকুরকে বিয়ে করিস না কেন, একমাত্র ওই জীবটিই তো সর্বদা মনিবের বাধ্য, কথা শোনে, কথা-মতো ওঠে-বসে, মেজাজ খারাপ করলে চুপ করে থাকে।

শুনে স্বপ্না প্রথমে হাঁ, পরে হি-হি করে হেসে উঠল।—তুমি এমন যাচ্ছেতাই কথা বলো চান্দা, কুকুরকে বিয়ে!

—না তো কি, একটা ছেলে যদি হয় সে মাঝে মাঝে অবাধ্য হবে, কথা শুনবে না, উল্টে রাগও করবে।

—রঞ্জনের ওপর আর তাহলে অত রাগ-টাগ করব না বলছ?

—না।

—ঠিক আছে। ওর সঙ্গেই বিয়েটা যাতে হয় তুমি চেষ্টা করবে তো?

—কি করে করব, কেন ওকে পছন্দ তোর তাই তো বলতে পারলি না!

স্বপ্না বলল, আসলে ব্যাপার কি জানো, রঞ্জন চারশ' টাকা মাইনের চাকরি করত, কিন্তু ওই মাইনের ছেলের সঙ্গে মা কক্ষনো আমার বিয়ে দেবে না বুঝেই চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে বসল।...তাছাড়া ওকে আমার ভালও লাগে, বুঝলে চান্দা?

হাসছে চাঁদ মুখার্জিও।—বুঝলাম।

—কিন্তু রাগ হবে না কেন তুমিই বলো চান্দা, কেন ও তার বড়লোক বন্ধুকে এনে আমার সঙ্গে ভাব করাতে গেল! এখন সে-ই তাকে ঠেলে সরাচ্ছে। ওই বিলাস দত্ত এক-একদিন গাড়ি হাঁকিয়ে এসে হাজির হয়, বেড়াতে নিয়ে যাবে আমাকে, মা অমনি তাড়া দেয়, যা-যা, এসেছে যখন বেড়িয়ে আয়! কি মনে পড়তে খিলখিল করে হেসে উঠল।—একদিন কি হয়েছে জানো, বিলাস দত্তর গাড়িতে তার পাশে বসে সবে রওনা হয়েছি, বেরিয়েই দেখি রঞ্জন আসছে। আমাদের দেখে তার সে যা মুখ না!

আবার হেসে উঠল।

হাসতে গিয়েও চাঁদ মুখার্জি হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল কেমন। চোখে ঝাপসা দেখতে লাগল, ঘর-বাড়ি দুলতে লাগল, কানের ভিতরে বাজতে থাকল কি, তারপরেই একটা দৃশ্য ভেসে উঠল চোখের সামনে।

...বাড়ির দরজায় ঝকঝকে গাড়িটা সবে স্টার্ট দিয়েছে। ড্রাইভারের আসনে গাড়ির মালিক স্বয়ং আর তার পাশে সেই সুন্দরী বিবাহিত রমণী। দুজনেই হাসিখুশি। চাঁদ মুখার্জি কলেজ থেকে ফিরছে তখন। তাকে দেখে গাড়ি থামিয়ে বন্ধু জিগ্যেস করল, এত দেরি যে?

—ছুটির পর একটু লাইব্রেরিতে ছিলাম।

বন্ধু হেসে উঠল, আবার এখন গিয়ে বই নিয়ে বোসো তাহলে, কাল তো আবার ছাত্র ঠ্যাঙাতে হবে, আমি এই ফাঁকে তোমার বউকে নিয়ে লম্বা হাওয়া খেয়ে আসি।

রসিকতা শুনে রমণী হাসছে। গাড়িটা ধুলো উড়িয়ে চলে যাচ্ছে, চাঁদ মুখার্জি চেয়ে আছে সেইদিকে।

হাসি-হাসি মুখে রঞ্জন ঘরে ঢুকতে চমক ভাঙল। আত্মস্থ হয়ে চাঁদ মুখার্জি ডাকল, এসো, তোমার কথাই হচ্ছিল!

রঞ্জন উৎসুক, আমার কি কথা?

স্বপ্না বলল, তুমি একটা বুদ্ধু সেই কথা।

আহতমুখে রঞ্জন বলল, দেখো চান্দা, ও আমাকে যা মুখে আসে তাই বলে—

চাঁদ মুখার্জি চোখ রাঙালো, এই মেয়ে, একটু আগে তোর সঙ্গে আমার কি কথা হল?

স্বপ্না ফোঁস করে উঠল, তা বলে বুদ্ধু-টুদ্ধুও বলব না! আগে তো ইডিয়েট রাসকেল বলতাম—

রঞ্জনই বলল, না, বুদ্ধু-টুদ্ধু বললে আমার অত গায়ে লাগে না।

এবারে চাঁদ মুখার্জি প্রসঙ্গ ঘোরালো।—শোনো হে রঞ্জন মাস্টার, তোমার বাস্তব দুনিয়া পড়লাম, আমার খুব ভালো লেগেছে।.

—বলেন কি! আনন্দে আপ্লুত রঞ্জন মিত্তির, আমার চেনা-পরিচিতদের মধ্যে তো একজনের ভালো লাগেনি ও বই!

স্বপ্না টিপ্পনী কাটল, চান্দা তোমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে তাও বুঝতে পারছ না হাঁদারাম!

—এই! হাঁদারাম বলাটা বুদ্ধুর থেকেও খারাপ। রঞ্জনের দিকে ফিরল চাঁদ মুখার্জি, ভালো যাদের লাগেনি তারা বাতাসে ওড়ে, কারো দিকে না তাকিয়ে তুমি চালিয়ে যাও।

স্বপ্না সোৎসাহে বলে উঠল, এবারের ফেরারী বাতাস যা হয়েছে না চান্দা, ওয়ান্ডারফুল, কিন্তু ছাপবে কে, ওই বাস্তব দুনিয়া ওকে ফতুর করে দিয়েছে। হাঁদারাম বলব না তো কি, বইটা ছাপার আগে যদি আমাকে একবার দেখাতো!

চাঁদ মুখার্জি ভাবল একটু। জিগোস করল, এ বইটা ছাপতে কত টাকা লাগবে?

রঞ্জন একটু হিসেব করে বলল, সবসুদ্ধ হাজার চারেক—

স্বপ্নার দিকে ফিরল চাঁদ মুখার্জি, আচ্ছা, চার হাজার টাকা তুই ওকে দিয়ে দে!

দু' চোখ কপালে স্বপ্নার—তোমার টাকা থেকে?

—হ্যাঁ।

রঞ্জনও বিহ্বল খানিক। মুখে কারো কথা সরে না। শেষে স্বপ্না বলল, এ বইটা, মানে ফেরারী বাতাস তুমি তাহলে একবার পড়ে দেখো—

—কিছু দরকার নেই, একটা ভাত টিপলেই হাঁড়ির চাল বোঝা যায়, তাই টাকটা দিয়ে দিস। খুব তাড়াতাড়ি বই বার হওয়া চাই।

রঞ্জনের মুখে কথা সরে না। আবেগ দমন করতে চেষ্টা করে বলল, আমার এক বন্ধুর প্রেস আছে, বললে পনের দিনের মধ্যে বই ছেপে বার করে দেবে।

আনন্দের আতিশয্যে স্বপ্না লাফিয়ে উঠল, চান্দাকে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, তুমি কি যে ভালো না, কি বলব! এ বই হিট করলে মা-বাবারও মত বদলে যাবে, করবেই হিট, তুমি দেখে নিও চান্দা!

উদ্দীপনা-ভরা দু'খানা কাঁচা মুখ দেখে চাঁদ মুখার্জিও কম খুশি নয়।

বাড়িঘরদোর সব অন্ধকারে ছেয়ে গেল। এখনো আলোর দেখা নেই। চাঁদ মুখার্জি আবার অন্ধকার বরদাস্ত করতে পারে না তেমন। ওদের বসতে বলে সে সব ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

কিন্তু বারান্দাটাও ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। কোনদিক থেকে আমোদিনীর গলা শোনা গেল, এক ফোঁটা কেরোসিন নেই ঘরে, হ্যাজাক জ্বালব কি—

অন্ধকারেই কল্পনার গলা শোনা গেল, মোমবাতি জ্বাল না!

—মোমবাতি কি আছে, কালকের লোডশেডিং-এই তিনটে মোমবাতি খতম!

আন্দাজে পাশের ঘরে অর্থাৎ বসার ঘরে পা দিল চাঁদ মুখার্জি। চুরুটের আলোয় দেখল, অন্ধকারে ভূতের মতো বসে আছে প্রদীপ ঘোষ। কেউ ঘরে ঢুকেছে টের পেয়ে লাইটার জ্বালল। চাঁদ মুখার্জিকে দেখামাত্র থমথমে মুখ। বলল, একবার রাণীকে ডেকে দেবেন কাইন্ডলি?

—হ্যাঁ, ইয়ে দেখছি। ভিতরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এদিকে আসছে কে। কল্পনার গলা।—সেই দুপুর থেকে লোডশেডিং আরম্ভ হয়েছে, এখনো শেষ হওয়ার নাম নেই, একটা আলো পর্যন্ত জ্বালা গেল না।...কে? চাঁদ ভাই নাকি? তুমি অন্ধকারে কি ক'চ্ছ? স্বপ্না কোথায়? বলতে বলতে স্বপ্নার ঘরের দিকে পা বাড়ালেন তিনি।

—এই...দিদি শুনুন, বলছিলাম স্বপ্না ও-ঘরে ...মানে গল্প করছে।

—এই অন্ধকারে কার সঙ্গে গল্প করছে! গলার স্বরে স্পষ্ট বিরক্তি।

—বি-বিলাসের সঙ্গে। চাঁদ মুখার্জি তাড়াতাড়ি বলল, বাড়ি তো অন্ধকার, তাতে আর কি হয়েছে, করুক না গল্প।

অন্ধকারে একমুখ হাসি কল্পনার। অস্ফুটস্বরে বললেন, বিলাস কখন এসেছে আমি তো টের পাইনি!...আচ্ছা করুক গল্প, আমি দেখি একটা আলোর ব্যবস্থা করতে পারি কিনা। যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন, তুমি একলা দাঁড়িয়ে কেন, ওই ও-দিকের ঘরে চলে যাও, রাণী বসে আছে, তোমার খোঁজ করছিল—

অন্যদিকে চলে গেলেন। চাঁদ মুখার্জি নিজের মনেই বলল, অন্ধকারে খোঁজ করছে...কি বিপদ...

পরক্ষণে চমকে উঠল। বিপদ অর্থাৎ রমণীমূর্তি তাঁর পিছনেই দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলল, ইয়ে, ব-বসার ঘরে প্রদীপবাবু ডাকছেন—

বলতে বলতে পাশ কাটিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কিন্তু কয়েক পা এগোতেই আঁৎকে উঠল আবার, অন্ধকারে কার সঙ্গে ধাক্কাই লেগে গেল!

—উঃ। লা-লাগল নাকি? আমি রাণী—

—চৌধুরাণী! নিজের অগোচরেই গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো চাদ মুখার্জির, যাঃ কলা --প্রদীপ ঘোষের ঘরে তাহলে কাকে পাঠালাম!

রাণী জিগ্যেস করল, কি হয়েছে?

—না, কিছু না, আপনাকে ওই ব-বসার ঘরে ডাকছেন, না না, বসার ঘরে নয়, ওই একেবারে কোণের ঘরে সত্যশরণবাবু ডাকছিলেন, যান, খুব দরকার—

কিছু না বুঝে রাণী এগোলো।

বসার ঘরে শ্রীমতীকে দেখেই অনুচ্চ গম্ভীরমুখে প্রদীপ ঘোষ বলল, এদিকে এসো, দু-একটা কথা ছিল। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে তার, গলার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই উঠে একখানা হাত ধরে সোফার দিকে টেনে নিয়ে এলো, অন্ধকারে হোঁচট খাবে, বোসো।

শ্রীমতী ধপ করে সোফায় বসে পড়ল।

সামনে ঝুঁকে প্রদীপ ঘোষ বলল, আজ দু'বছর ধরে আমি এখানে কেন আসছি, আসলে কার জন্যে আসছি তোমার অন্তত না বোঝার কথা নয়, আজ এই অন্ধকারেই এর ফয়সলা হয়ে যাক, সব বুঝেও এ-রকম চুপ করে থেকো না, যা-হোক কিছু বলো।

শ্রীমতী হতভম্ব প্রথম, তারপর অন্ধকারে একেবারে কুঁকড়ে যেতে লাগল। এই নীরবতার দরুন সাহস পেয়ে প্রদীপ ঘোষ তার সামনে মেঝেতে হাঁটুর ওপর বসে পড়ে দুটো হাত আঁকড়ে ধরল তার। বলে উঠল, আমাকে তুমি বাতিল কোরো না, আমাকে তুমি গ্রহণ করো, আমি যে এই আশায় দিন গুনছি!

স্বপ্নার ঘরে রঞ্জনের একটা বড় রকমের দুষ্টুমি সারার ইচ্ছে। স্বপ্না বাধা দিচ্ছে, অস্ফুট তর্জন করছে, কিন্তু অন্ধকারে আর একটু আগের আনন্দে রঞ্জনের বেপরোয়া সাহস এখন।

শয্যার সামনে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল রাণী। সঙ্গে সঙ্গে একখানা হাত তাকে ধরে শয্যায় টেনে নিল। আঁৎকে ওঠার আগেই জামাইবাবুর গলা কানে এলো তার।—চমকে উঠলে কেন, বোসো, ওই চাঁদ মুখার্জি আসার পর থেকে তো আমার কাছে এসে একটু বসারও সময় হয় না তোমার, আজ অন্ধকারে কি ভাগ্যি!

রাণী ভয়ে কাঠ হঠাৎ। একটা হাত তাকে বেষ্টন করে আছে। গলার স্বর আরো গাঢ়—আমার ভিতরটাও যে ঠিক এমনি অন্ধকারে ডুবে আছে সে কি তুমিও টের পাওনি কখনো, মন দিয়ে বোঝো, এ তো তবু আলো জ্বলবে, কিন্তু আমার কি আশা?

আলো জ্বলে উঠল।

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত বাড়িটা আলোয় ঝলমল করে উঠল।

শোয়া থেকে ছিটকে উঠে বসলেন সত্যশরণ।—তুমি! তুমি! কি আশ্চর্য, আ-আমি ভেবেছিলাম—

রাণী উঠে দরজার দিকে ছুটল।

আলোর ধাক্কা খেয়ে স্বপ্নাকে ছেড়ে দু' পা সরে দাঁড়াল রঞ্জন, তারপর দরজার দিকে ছুট।

তড়িতাহতের মতো উঠে দাঁড়াল প্রদীপ ঘোষ। বিস্ময়ে দু'চোখ ঠিকরে বেরুচ্ছে। —তুমি। তুমি মানে, তুমি কেন?

ভ্যাবাচাকা খেয়ে আমোদিনীও উঠে অন্দরের দিকে ছুটল সেই মুহূর্তে ধর্মেন্দ্র চৌধুরির বাইরের ঘরে পদার্পণ। তাঁকে প্রায় ধাক্কা মেরেই প্রদীপ ঘোষ বেরিয়ে গেল। একটু আগে রঞ্জনকেও ওভাবে চলে যেতে দেখেছেন। ভিতরের বারান্দায় এসে দেখেন রাণী একদিকে দ্রুত চলে যাচ্ছে, আমোদিনী অন্যদিকে।

বিমূঢ় ধর্মেন্দ্রবাবু চাদ মুখার্জির দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, কি ব্যাপার, এ রকম ছোটাছুটি লেগে গেল কেন?

বোকা-বোকা মুখে তার দিকে চেয়ে চাঁদ মুখার্জি বলল, ওয়ান সিঙ্গল লাইট টেক্‌স অ্যাওয়ে মেনি সীনস!

দরাজ হেসে ধর্মেন্দ্র চৌধুরি বললেন, বাঃ খাসা! ঈশ্বরের আশীর্বাদে সরস্বতী ঠাকরোন তো দেখি সর্বদাই তোমার জিভের ডগায় বসে!

## সাত

দু'দিন ধরে কল্পনার মেজাজ বেজায় খারাপ লক্ষ্য করছে চাঁদ মুখার্জি। সত্যশরণও অতিরিক্ত গম্ভীর। দুজনের মধ্যে বেশ ভালোরকম মন-কষাকষি চলছে বুঝতে পারছে।

সেদিন বারান্দায় দাঁড়াতে ওদের ঘর থেকে একটা চাপা বচসা কানে এলো।

এতদিন এত কিছু হয়েছে, এবারে পঁচিশ বছর, সকলে আশা করছে কত বড় ব্যাপার না জানি হবে, এরপর আমাদের আর মান-সম্ভ্রম থাকবে! কল্পনার অসহিষ্ণু গলা।

—তুমি তো আছ তোমার মান-সম্ভ্রম নিয়ে। এ ব্যাপার করতে গেলে তিন হাজার টাকা খরচ। তিন হাজার ছেড়ে তিনশ' টাকা খরচ করারও সময় নয় আমার এখন, বুঝলে? সত্যশরণের পাল্টা জবাব।

এ-ঘরে চাঁদ মুখার্জি স্বপ্নাকে জিগ্যেস করল, তোর বাবার আর মায়ের মধ্যে কি হয়েছে রে?

—বাবা ফায়ার! মা ডবল ফায়ার! স্বপ্নার সাদাসাপটা জবাব।

—ফায়ার কেন?

আজ তো মঙ্গলবার, সামনের মঙ্গলবারে বাবা মায়ের পঁচিশ বছরের বিয়ের তারিখ। এবারে মায়ের একটু বেশি ঘটা করার ইচ্ছে, বাবা বলছে টাকা নেই, কিছুই হবে না। সত্যি চান্দা, আমারও কি যে খারাপ লাগছে না...প্রত্যেক বারে আগে থাকতে সুন্দর কার্ড ছাপিয়ে কম করে একশ' লোককে নেমন্তন্ন করা হয়, গান-বাজনা হয়, নাচ হয়, কত বড় বড় লোকেরা আসে আর কি খাওয়া-দাওয়ার ধুম! মায়ের রাগ হবে না তো কি!

চাঁদ মুখার্জি শুনছে। শুনতে শুনতে বিমনা হয়ে পড়ছে। কানে মাথায় সেই যন্ত্রণার শব্দ। চোখের সামনে একটা পুরনো ছবি ভেসে উঠছে।

...দুটো মালা হাতে করে চুপি চুপি ঘরে ঢুকছে চাদ মুখার্জি। দুষ্টু মিষ্টি হাসি। ঘরে ঢুকে দেখে কেউ নেই। এদিক-ওদিক খুঁজল, কেউ নেই।

...সন্ধ্যা পেরুলো। রাত হল। সামনে মালা দুটো পড়ে আছে, চাদ মুখার্জি চুপচাপ বসে। উঠল। সামনের টেবিলে স্ত্রীর ফোটো। সামনে এসে দাঁড়াল।—কি গো? আজকের এই দিনটাও তোমার ভুল হয়ে গেল?

...রাত বাড়ছে। ঘড়িতে এগারোটা। বাইরে মোটরের হর্ন শোনা গেল। চাদ মুখার্জি মালা দুটো নিয়ে ছিঁড়ে জানলা দিয়ে ফেলে দিল।

—কি ভাবছ চান্দা?

চমক ভেঙে আত্মস্থ হল চাদ মুখার্জি।—না, আমারও তোর বাবা মায়ের পঁচিশ বছরের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি দেখতে খুব ইচ্ছে করছে।

ঠোঁট উল্টে স্বপ্না জবাব দিল, কি করে দেখবে, হবেই না বোধহয় এবারে কিচ্ছু, সত্যি ভাবতেও এত খারাপ লাগছে! ও-কি, কোথায় যাচ্ছ?

—ঘুরে আসছি। জামা গায়ে গলিয়ে চাঁদ মুখার্জি ততক্ষণে বাইরে পা বাড়িয়েছে। কি মনে পড়তে থমকে দাঁড়াল। পকেট হাতড়ে একবার দেখে নিল।—এই, শ'দুই টাকা দে তো আমাকে!

স্বপ্না তক্ষুনি দু'শ টাকা আর সেই সঙ্গে খাতা নিয়ে এলো। খাতায় টাকার অঙ্ক বসানোর আগেই টাকা তুলে নিয়ে চাঁদ মুখার্জি বেরিয়ে গেল।

দু'দিন পরে। বাইরের ঘরে বসে কাগজ পড়ছিলেন ধর্মেন্দ্র চৌধুরি আর সত্যশরণ। ভিতরের চায়ের টেবিল সেই থেকে স্বপ্না আর চাঁদ মুখার্জি দখল করে বসে আছে। নিরিবিলিতে কাগজ দু'খানা পড়ে উঠতে না পারলে সত্যশরণের মন ভরে না। তাই এ-ঘরে উঠে এসেছেন। ধর্মেন্দ্রবাবু কাগজের বড় হেডলাইনগুলো পড়েন শুধু। তাঁর অত খুঁটিয়ে পড়বার ধৈর্য নেই।

বড়সড় একটা প্যাকেট হাতে একজন অপরিচিত লোক ঘরে ঢুকল। মিসেস কল্পনা রায়ের খোঁজ করল সে। তাঁর নামে প্যাকেট।

সত্যশরণ চেঁচিয়ে আমোদিনীকে ডাকলেন। কল্পনাও ভিতরের বারান্দায় ছিলেন। সরাসরি তাঁকে ডাকতে পারলেন না, কারণ দু'দিন ধরে বাক্যালাপ বন্ধ। আমোদিনী আসতে তাকে খবর দিতে বললেন। হঠাৎ স্ত্রীর নামে কোথা থেকে কি প্যাকেট এলো ভেবে না পেয়ে ভিতরে ভিতরে কৌতূহল বোধ করছেন। কিন্তু স্ত্রী আসতেই নিস্পৃহ মুখে কাগজের দিকে চোখ ফেরালেন। গোল গোল চোখ মেলে ধর্মেন্দ্রবাবু অবশ্যই পর্যবেক্ষণরত।

প্যাকেট হাতে নিয়ে অবাক কল্পনা রায়ও। উল্টে-পাল্টে দেখল একবার।—এ কোত্থেকে এলো? কে পাঠালো?

বাহক লোকটি আঙুল তুলে প্যাকেটের গায়ে একটা ছাপা নাম দেখাল। ওমুক প্রিন্টার্স অ্যান্ড স্টেশনার্স। লোকটা প্রাপ্তির সই নেবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে খেয়াল নেই কল্পনার, তাড়াতাড়ি প্যাকেটা খুলে ফেললেন।

পরের মুহূর্তে বিস্ময়ে হতবাক সে। একরাশ দামী আইভরি ফিনিসড় কার্ড। আর সেই কার্ডে সোনালী কালিতে তাঁদেরই পঁচিশ বছরের বিবাহ বার্ষিকীর আমন্ত্রণ-পত্র ছাপা! দেখে যেন বিশ্বাস হয় না কল্পনার। এত দামী আর এমন সুন্দর কার্ড আর কোন বছর ছাপানো হয়নি। একখানা কার্ড পড়া শেষ হতে কল্পনা স্বামীর দিকে ফিরলেন, এ-কি কাণ্ড! চোখে-মুখে আনন্দ উপচে পড়ছে।

ব্যাপার সঠিক না বুঝে সত্যশরণ হাত বাড়িয়ে স্ত্রীর হাত থেকে কার্ডখানা নিলেন। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই মেজাজ বিগড়লো তার। কিন্তু স্ত্রীর চোখে-মুখে নির্ভেজাল বিস্ময় দেখে তিনিও অবাক।—তুমি ছাপতে দাওনি!

—দেখো, চালাকি কোরো না, নিজে এই কাণ্ড করে এখন এ-ভাবে চেয়ে আছ কেন, সত্যিই তুমি ছাপতে দাওনি নাকি!

—না! গলার স্বরে বিরক্তি চাপা থাকল না খুব।

কল্পনা কিছু ভেবে না পেয়ে দাদার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। উদগত চাপা আনন্দে বলে উঠল, দাদা, এ তোমার কাণ্ড তাহলে?

—কাণ্ডখানা কি আমি তো তাই বুঝতে পারছি না! উঠে বোনের হাতে খোলা প্যাকেট বাক্স থেকে একটা কার্ড তুলে নিয়ে পড়লেন ধর্মেন্দ্র চৌধুরি।—এ-তো তোদের বিয়ের বার্ষিকীর নেমন্তন্নের চিঠি দেখছি, তোরা ছাপতে না দিলে কে দিলে! এই এক-একটা কার্ড ছাপতেই তো কত লেগেছে ঠিক নেই, ঈশ্বরের আশীর্বাদে এরকম রসিকতা তো আমি কক্ষনো করি না!

তাঁর কথা শুনে কল্পনা আবার বিভ্রান্ত।

লোকটা রিসিট সই করিয়ে নেবার জন্য দাঁড়িয়ে তখনো, সত্যশরণ তাকেই জিগ্যেস করলেন, এই কার্ড ছাপানোর অর্ডার কে দিয়েছে?

লোকটা জানালো সে বাহক মাত্র।

—বিল কোথায়?

লোকটা আবার জানালো, সবকিছুর পুরো পেমেন্ট করা আছে, এখন রিসিটটা সই করে দিলেই সে বিদায় হতে পারে।

কল্পনা সই করে দিতে লোকটা চলে গেল। সত্যশরণ হাঁক দিলেন, স্বপ্না!

যথার্থই বিরক্ত তিনি। এ-রকম কার্ড পাঠানো মানেই বড় ব্যাপারের প্রতিশ্রুতি!

কাণ্ড দেখে স্বপ্নাও প্রথমে আনন্দে আটখানা, পরে বাবার কথা শুনে হাঁ। বাবা মা মামা কেউ ছাপতে দেয়নি তবে এ কার্ড এলো কোত্থেকে!

কিছু ভেবে না পেয়ে কল্পনা বললেন, ননী মাখন ফাজলামো করল না তো?

ধর্মেন্দ্রবাবু বললেন, কি যে বলিস ঠিক নেই, ও-রকম নির্ভুল ইংরেজি ওরা লিখবে! তাছাড়া এমন বাজে খরচ করে ফাজলামো করার মতো বোকা নয় ওরা।

হঠাৎ স্বপ্নারই কেমন সন্দেহ হল। চান্দা এই বার্ষিকীর অনুষ্ঠান সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল, আর ওকে বলেছিল, উৎসব ঠিক হবে দেখে নিস।

—দাঁড়াও তো! ছুটে বেরিয়ে গেল, আর পরক্ষণে চাঁদ মুখার্জিকে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলো। কার্ডের বাক্স তাকে দেখিয়ে জিগ্যেস করল, এ কার কাণ্ড?

একটা কার্ড তুলে নিয়ে চাঁদ মুখার্জি ভালো করে দেখল। তারপর মন্তব্য করল, ভালোই করেছে...!

ধর্মেন্দ্রবাবু বলে উঠলেন, তা তো করেছে, কিন্তু করালো কে?

—আমি।

সত্যশরণ বিরক্তি চেপে রাখতে পারলেন না আর।—তুমি করেছ মানে? আমরা কি করব না করব না জেনে তুমি কাউকে কিছু জিগ্যেস না করে কার্ড ছাপতে দিয়ে দিলে?

চাঁদ মুখার্জি তপ্ত চোখে তাকাল তার দিকে।—অত জোরে কথা কইছেন কেন? আপনারা কিছুই করবেন না, শুধু যেখানে দরকার নেমন্তন্নর চিঠি পাঠিয়ে দেবেন। যা করার আমি করব আর স্বপ্না করবে আর ধর্মেন্দ্রবাবু করবেন। কল্পনার দিকে চোখ পড়তে হাসি পেয়ে গেল, এ-ভাবে চেয়ে আছেন কেন?—একটা বিয়ের বার্ষিকীর দিনে আমি বড় রকমের ধাক্কা খেয়েছিলাম, সেই থেকে একটা জাঁক-জমকের বিয়ের বার্ষিকী দেখার ইচ্ছে আমার। স্বপ্না, হাজার তিনেক টাকা মামাবাবুর হাতে দিবি, ঈশ্বরের আশীর্বাদে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা তিনি ভালো বোঝেন, আর ডেকোরেশন-টেকরেশনের ভার সব তোর।

ধর্মেন্দ্র চৌধুরি বা তার বোনের মুখে কথা সরে না। স্বপ্না আনন্দমেশানো অস্বস্তি নিয়ে বাবার মুখখানা দেখছে। কিন্তু সত্যশরণ এও পছন্দ করছেন না। তেমনি ধমকের সুরেই বললেন, কি অন্যায় কথা, তুমি মাঝখান থেকে এতগুলো টাকা খরচ করতে যাবে কেন?

চাঁদ মুখার্জি খানিক থমকে চেয়ে রইল তার দিকে। ফর্সা মুখ লাল হতে থাকল। তারপর স্বপ্নার দিকে ফিরল, শোন, আমি আজ এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।

ঘর ছেড়ে প্রস্থানের উপক্রম করতে স্বপ্না তার হাত ধরে ফেলল। পরিস্থিতি সামলালেন ধর্মেন্দ্র চৌধুরি। হেসে উঠে ভগ্নিপতিকে চোখ রাঙালেন, দেখো, তোমার মিনিস্টারি মেজাজ এখানে চলবে না। চাঁদ মুখার্জির দিকে ফিরলেন, ঘাট হয়েছে আমাদের বাবা দুর্বাসা, তোমার হুকুম মতোই সব হবে। চড়া গলায় ভাগ্নিকে বললেন, এই, টাকা বার কর, পরের টাকা খরচ করতে ঈশ্বরের আশীর্বাদে বড় সুখ!

সেই রাত

উৎসবের ঘটা দেখে চাঁদ মুখার্জি যেমন খুশি তেমনি অবাক। খুশি এই কারণে যে, সত্যিই দেখার মতো হয়েছে উৎসবের পরিবেশ। রঙ-বেরঙের আলোয় বাড়িটা ঝলমল করছে। ফুল আর ফুলগাছ দিয়ে ঘরের শ্রী ফিরিয়েছে ননী মাখন। ওদেরও ভিতরে ভিতরে এত রস আছে চাঁদ মুখার্জির জানা ছিল না। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারের সমস্ত ভার ধর্মেন্দ্র চৌধুরি সানন্দে নিজের হাতে নিয়েছেন। আর অবাক চাঁদ মুখার্জি, অভ্যাগত-অভ্যাগতাদের হাব-ভাব-আচরণ লক্ষ্য করে। আবার তার সেই এক কথাই মনে হচ্ছে, সে যেন এই সব মানুষদের কাছে থেকে দীর্ঘকাল ধরে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল, এরা সকলেই যেন এক ভিন্ন জাতের মানুষ, আর অনেকখানি সেই কলের মানুষ।

সকৌতুকে অভ্যাগতদের বেশ খুঁচিয়ে লক্ষ্য করে চলেছে চাঁদ মুখার্জি। যারা আসছে তাদের অনেকের সঙ্গেই তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিচ্ছে বাড়ির মানুষেরা। এ-বাড়িতে সেও যে মস্ত গুণীমানী লোক একজন সেটাই বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা। কিন্তু তার হাব-ভাব দেখে ওই আমন্ত্রিতজনেরা তেমন উৎসাহ বোধ করছে না। আলাপের ব্যাপারে কিছুমাত্র আগ্রহ নেই চাঁদ মুখার্জির। নীরব কৌতুক আর কৌতূহল নিয়ে এই মেয়েপুরুষদের দেখেই চলেছে শুধু। এমন কি এই উৎসবের প্রধান জুটি যে দুজন, সেই কল্পনা রায় আর সত্যশরণ রায়ও যেন কৃত্রিম মুখোশ পরে আছেন দুটো।

...স্বপ্নার নাচ ভালো লাগছে, কিন্তু তার নাচের সঙ্গে গান করছেন যে শিল্পীটি তাঁর নাচের তালে সুর মেলাবার অঙ্গভঙ্গি দেখে হাসিই পাচ্ছে চাঁদ মুখার্জির।

একজন লম্বা শৌখিন মানুষ লম্বা লম্বা কথা বলছে সকলের সঙ্গে। তার কথায় কথায় বিলেত এসে পড়ছে, জার্মানী এসে পড়ছে, আমেরিকা এসে পড়ছে। কোথায় কি রকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল সে-কথা শুনছে অনেকে। তার সঙ্গে আলাপ করাতে নিয়ে এলেন ধর্মেন্দ্রবাবু, মিস্টার মৌলিক, ওমুক প্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান, পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরেছেন, আর ইনি ডক্টর মুখার্জি, মস্ত একজন—

মিস্টার মৌলিক হাত বাড়িয়েছেন, দু'হাত জুড়ে কপালে ঠেকিয়েছে চাঁদ মুখার্জি, বোকা-বোকা হাসিমুখে বলেছে, আমার দৌড় এলাহাবাদ থেকে কলকাতা পর্যন্ত!

মিস্টার মৌলিক থতমত খেয়ে প্রস্থান করেছেন। ধর্মেন্দ্রবাবু চাপা অনুযোগ করেছেন, তুমি একটা আস্ত বেরসিক—

চাঁদ মুখার্জি বলল, কেন, উনি কবে চাঁদে যাচ্ছেন জিগ্যেস করলাম না বলে?

আর একটি ফিটফাট ভদ্রলোককে দেখা গেল ঘুরে ঘুরে সকলের কুশল-সংবাদ নিচ্ছে, কিন্তু ভালো করে জবাব শোনার আগেই আর একজনের দিকে ছুটছে।

একজন আধবয়সী ভদ্রলোক কেবল নিজের শরীরের অবস্থার কথা বলে চলেছেন সকলের সঙ্গে। কবে ব্লাডপ্রেসার কত উঠেছিল, কবে পালস বীট ফেল করছিল, কোন কোন ট্র্যাংকুলাইজারে কি-রকম ঘুম হয় তাঁর। বলার মধ্যে গলদ থাকলে তাঁর স্ত্রীটি আবার তক্ষুনি সংশোধন করে দিচ্ছেন।

এক দম্পতিকে লক্ষ্য করল, স্ত্রীটি স্বামী-গরবিনী। শাড়িটা সুন্দর? তাহলে ওঁকে বলো, নিজে পছন্দ করে কিনেছেন আর আজ ওঁর জুলুমেই এটা এখানে পরে আসা। ...সামনের সপ্তাহে ক্লাবে আসব কি করে ভাই, ওঁর টুর প্রোগ্রাম পড়েছে দিল্লীতে, উনি একা যাবেন! তাহলেই হয়েছে, চোখে সর্ষেফুল দেখবেন একেবারে। উচ্ছল হাসি।

কল্পনা রায়ের কিছু কবি আর কিছু লেখক-বন্ধুও এসেছে। বিচ্ছিন্ন থাকার চেষ্টায় তারা বিশিষ্ট। রঞ্জন মিত্তির তাদের কাছেই ঘুর-ঘুর করছে। মিলিয়নেয়ার সুপ্রকাশ দত্তর ছেলে বিলাস দত্তর সঙ্গ এড়াবার জন্যে স্বপ্নাও সেই দিকেই ঘেঁষেছে বেশি, রঞ্জনের পাশে থেকে কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। এই পালিয়ে বেড়ানোর কৌতুকটাও মন্দ জমে ওঠে নি। স্বপ্না বিলাসের কাছ থেকে পালাচ্ছে, চৌধুরাণী অর্থাৎ রাণী চৌধুরী চুরুটমুখে প্রদীপ ঘোষকে এড়িয়ে ঘুরে ফিরে চাঁদ মুখার্জির দিকেই আসছে। বেগতিক দেখে চাঁদ মুখার্জি অকারণ ব্যস্ততায় এক-একজন অপরিচিতের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে।

—এই যে চাঁদ ভাই, আলাপ করিয়ে দিই, ইন ডক্টর চন্দ্রনাথ মুখার্জি, আমার ছোট ভাই বলতে পারেন, বিরাট স্কলার। ভ্রাতৃগর্বে উদ্ভাসিত মুখ কল্পনা রায়ের।—আর ইনি মস্ত স্পেশ্যালিস্ট ডক্টর সোম, এঁকে ডাক্তারী শাস্ত্রের একেবারে শেষ কথা বলতে পারো—

নমস্কার-বিনিময় সেরে চাঁদ মুখার্জি উৎসুক আগ্রহে জিগ্যেস করল, ইনি কোন সাইডের স্পেশ্যালিস্ট দিদি, রাইট সাইড না লেফট সাইডের?

কল্পনার বিড়ম্বিত মুখ।—তার মানে?

—আজকাল স্পেশ্যালাইজেশন তো অনেক দূর এগিয়েছে শুনি, রাইট ল্যাং লেফট লাংয়ের স্পেশ্যালিস্ট, ডান হাত বা হাতের স্পেশ্যালিস্ট, শরীরের ওপরের ভাগের স্পেশ্যালিস্ট, নিচের ভাগের স্পেশ্যালিস্ট—

ডাক্তার ভদ্রলোক মানে মানে সরে পড়লেন। কল্পনা ভ্রূকুটি করে বললেন, কি ছেলে বলো তো তুমি!

আর-একদিকে চলে গেলেন। পাশে রাণী চৌধুরি দাঁড়িয়ে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই লোককেই দেখছে সে। চোখোচোখি হতে চাঁদ মুখার্জির অন্যদিকে সরার তাড়া।

তার দেখার মজা আরো বাড়ল পোলিটিক্যাল সার্কেলের হোমরা-চোমরারা আসতে। ওদের সঙ্গে মিলিয়নেয়ার সুপ্রকাশ দত্তও এসেছেন। চুরুটমুখে ব্যস্তসমস্ত প্রদীপ ঘোষ নিজের লাইটার জ্বেলে তাঁদের সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছেন। সত্যশরণ এবং কল্পনা রায়ও এখন সেদিকেই বিশেষ ব্যস্ত।

এক সময় চাঁদ মুখার্জিকে সেদিকে দেখে কি কুক্ষণে আবার এই গণ্যমান্যজনদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে গেলেন সত্যশরণ। একদিকে ডক্টর চন্দ্রনাথ মুখার্জি, ডবল এম. এ., মস্ত অথর, এলাহাবাদের বাসিন্দা, অন্যদিকে কেউ মিনিস্টার, কেউ ডেপুটি, কেউ বা অমুক নেতা, অমুক এম.এল.এ.! সৌজন্য-বিনিময়ের পর তাঁদের একজন জিগ্যেস করলেন, ইউ. পি'র পোলিটিক্যাল অ্যাটমসফিয়ার কেমন এখন?

চাঁদ মুখার্জি নিরীহমুখে জবাব দিল, এক রকমই ব্যাপার চলেছে সর্বত্র, শিকার ধরার জন্যে শাসকরা সেখানেও লো-জাম্প প্র্যাকটিস চালিয়েছেন।

কথাটা এমনই যে, খট করে কানে বিঁধল সকলের। এমন কি মিলিয়নেয়ার সুপ্রকাশ দত্তরও। সত্যশরণ আর কল্পনা রায়ের সশঙ্ক চাউনি, প্রদীপ ঘোষের চোখে-মুখে বিরক্তি। রাণী চৌধুরিও অদূরে দাঁড়িয়ে কান পেতে আছে।

একজন জিগ্যেস করলেন, লো জাম্প প্র্যাকটিস...ব্যাপারটা কি?

তেমনি নিরীহ মূর্তি চাঁদ মুখার্জির।—একবার এক সিংহ শিকার ধরার জন্যে প্রচণ্ড বিক্রমে মাথা লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিয়েছিল। বেগতিক দেখে শিকার টুক করে মাথা নিচু করে বসে পড়তে সিংহ সাঁ করে ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। রাশভারী সিংহ তখন শিকার ছেড়ে লো-জাম্প প্র্যাকটিস করতে লাগল। আমাদের শাসকরাও শিকার মানে কালোবাজারী, মজুতদার মুনাফাখোর, ভেজালদারের টুঁটি লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিলেই তারাও টুক করে বসে গিয়ে অব্যাহতি পায় দেখে এঁরাও এখন লো-জাম্প প্র্যাকটিস করছেন —তারপর ওই সব শিকার ধরে ধরে টিট করবেন।

কেউ কেউ হাসছে অবশ্য, কিন্তু বেশির ভাগের মুখ গম্ভীর। কল্পনা আর সত্যশরণ রায় কি বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। রাণী চৌধুরিরও বুকের ভেতরটা গুরগুর করছে।

মিলিয়নেয়ার সুপ্রকাশ দত্ত এগিয়ে এলেন।—তার মানে আজকের দিনের এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আপনার কাছে হাস্যকর।

নীরব হাসিতে মুখখানা ভরাট হয়ে গেল চাঁদ মুখার্জির, জবাব দিল, আমার কথা ছেড়ে দিন, আমার কাছে মিলিয়নেয়ার আরো হাস্যকর।

পোলিটিক্যাল সার্কেলের ভদ্রলোকেরা উসখুস করে উঠলেন এবার। সত্যশরণ, কল্পনা, ধর্মেন্দ্রবাবু প্রমাদ গনছেন। বাপের পাশে দাঁড়িয়ে বিলাস গম্ভীর চোখে লোকটাকে দেখছে। রাণী চৌধুরি স্বপ্নার হাত ধরেছে, ওদের মুখেও শঙ্কার ছায়া।

সুপ্রকাশ দত্ত ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইলেন একটু।—মিলিয়নেয়ার আরো হাস্যকর কিরকম?

চাঁদ মুখার্জি যেন বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেল।—না, আমি খারাপ কিছু বলছি না...ভালই। মিলিয়নেয়ার এয়ারকনডিশন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এয়ারকনডিশন গাড়িতে চেপে তাঁর আপিসে আসেন। সেখান তাঁর এয়ারকনডিশন ঘরে বসে লাঞ্চ পর্যন্ত কাজ সেরে আবার এয়ারকনডিশন গাড়িতে চড়ে এয়ারকনডিশন রেস্তরাঁয় লাঞ্চ খেতে যান, তারপর আবার এয়ারকনডিশন আপিস-ঘরে বিকেল পর্যন্ত কাজ করে সন্ধ্যায় এয়ারকনডিশন ক্লাবে আসেন। সকলের মুখগুলো একবার দেখে নিয়ে চাঁদ মুখার্জি উপসংহার টানল।—সেখানে এসে মিলিয়নেয়ার একটুখানি শরীরের ঘাম ছোটানোর জন্যে বাষ্পঘর মানে স্টিমরুমে গিয়ে ঢোকেন।

পোলিটিক্যাল সার্কেলের লোকেরাও এবার হেসে উঠলেন দেখে সুপ্রকাশ দত্তরও হাসি-হাসি মুখ। কিন্তু মুখখানা লাল তাঁর। এদিকে মাসির হাতে বড় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে স্বপ্না সানন্দে ফিসফিস করে বলল, মিলিয়নেয়ারের ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ের বারোটা বাজিয়ে দিল চান্দা, বাবা-মায়ের মুখখানা দেখো!

এরপর ফাঁক পেয়ে রাণী চৌধুরি সোজা একখানা হাত ধরে চাঁদ মুখার্জিকে অন্য একদিকে টেনে নিয়ে চলল। খুশিমুখে বলল, খুব হয়েছে, এরপর একটা বিপদ বাধাবেন আপনি, আপনার নিশ্চয় খিদে পেয়েছে, আসুন আমি খেতে দিচ্ছি।

ওদিক থেকে দৃশ্যটা দেখে প্রদীপ ঘোষের চোখে যেন হুল ফুটছে।

এক জায়গায় তাকে বসিয়ে বড় বড় দুটো ডিশ ভরতি ভালো ভালো খাবার সাজিয়ে দিল রাণী চৌধুরি। আর চাঁদ মুখার্জিও নির্বিবাদে খেতে বসে গেল। রমনীটি পাশে বসে এটুকুই যা অস্বস্তি।

পছন্দসই খাবার, আয়েস করেই খাচ্ছিল।

ঘুরে-ফিরে প্রদীপ ঘোষ এসে হাজির সেখানে। একটু লক্ষ্য করে টিপ্পনীর সুরে বলল, বড় স্কলারের ভালো ভালো খাবারও বেশ ভালোই চলে দেখছি।

খেতে খেতে চাঁদ মুখার্জি জবাব দিল, কেন, ভালো ভালো খাবারগুলো কি শুধু মুখ্যুদের জন্যে নাকি!

প্রদীপ ঘোষের দ্রুত প্রস্থান। হাসি চেপে রাণী চৌধুরি দু'চোখ ভরে ওই লোককেই দেখছে।

চাঁদ মুখার্জি ঘুরে তাকাতে চোখোচোখি হল। আর সঙ্গে সঙ্গে গলায় খাবার আটকে যেতে কেশে উঠল।

—আ-হা, কি হল? রাণী চৌধুরি ব্যস্ত।

—আ-আপনাকে দেখে বিষম খেলাম।

তিনদিনের মধ্যে স্বপ্না আবার একটা বড় রকমের উত্তেজনার খোরাক পেল। রঞ্জন মিত্তিরের 'ফেরারী বাতাস' বেরিয়েছে। ঝকঝকে তকতকে ছাপা বাঁধাই, আর তেমনি গেটআপ। বইটা ওর নামেই উৎসর্গ করেছে রঞ্জন। এই দুষ্টুমিটুকু না জানিয়ে করেছে। আগে থেকে না জানার ফলে আনন্দের মাত্রা অবশ্যই বেড়েছে স্বপ্নার। প্রথম দফায় রঞ্জন একসঙ্গে পাঁচখানা ফেরারী বাতাস ওর হাতে তুলে দিয়েছে। সেই বই হাতে নিয়ে স্বপ্না খুশিতে আনন্দে লাফালাফি ছোটাছুটি করেছে খানিক। নতুন বইয়ের গন্ধ শুঁকেছে বার বার।

বই হাতে নেবার পর স্বপ্নার ব্যবসার মাথা খুলে গেছে। একখানা বই নিজে রেখেছে, একখানা চান্দাকে দিয়েছে। বাকী তিনখানার মধ্যে দু'খানা বাবা-মা আর মাসিকে বেচে যোল টাকা আদায় করেছে। বইয়ের দাম আট টাকা। আর বাকি একটা মামাকে গছিয়েছে। তারপর বিক্রীর প্রথম চব্বিশ টাকা রঞ্জনের হাতে তুলে দিয়েছে।

এর ছেলেমানুষি আনন্দ আর উত্তেজনা দেখে চাঁদ মুখার্জি সত্যিই খুশি। কিন্তু ওদের দুজনের তাগিদ সত্ত্বেও বইটা আর পড়ে উঠতে পারছে না। দু-পাঁচ পাতা পড়তে না পড়তে হাই ওঠে। পাঁচ দিনে তিরিশ পাতাও এগোতে পারল না। এদিকে স্বপ্নার মা দু'বার পড়ে ফেলেছে, বইটা তাঁর মতে চমৎকার হয়েছে! বাবা একবার পড়ে মন্তব্য করেছেন, ভালোই হয়েছে।

কিন্তু যার মতামতের জন্যে উদগ্রীব স্বপ্না আর রঞ্জন, সেই চান্দা একটি কথাও বলে না। বলবে কি, পড়াই শেষ করে উঠতে পারল না এখনো! আরো তিনদিন অপেক্ষা করার পর স্বপ্না বইসুদ্ধু চান্দাকে তার ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। —শেষ হলে তবে বেরুতে পাবে, তার আগে নয়।

অগত্যা সিরিয়াসলি 'ফেরারী বাতাস' শেষ করতে বসল চাঁদ মুখার্জি। শেষ করলও বটে। কিন্তু তারপর হাসবে কি রাগবে ভেবে পেল না। থোক টাকাগুলোই একেবারে জলাঞ্জলি গেছে ভাবল। বইয়ের নায়ক-নায়িকারা সব মটির ওপর দিয়ে হাঁটছে কি বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে, কে জানে! বাস্তব দুনিয়া লেখার পর এমন হাস্যকর অবাস্তব কাহিনী লিখে উঠল কি করে ছেলেটা? চাঁদ মুখার্জির সত্যিই দুঃখু হল আর সেই কারণে রাগও হল।

বই শেষ হওয়ার পর ডগমগ প্রত্যাশা নিয়ে ওরা যখন সামনে এলো, চাঁদ মুখার্জি ভিতরে ভিতরে বিরক্তই একটু। রঞ্জনকে বলল, এটা কি একটা উপন্যাস হয়েছে, এ-রকম লেখার বুদ্ধি তোমাকে কে দিল?

বুদ্ধিটা অনেকখানি স্বপ্না সরবরাহ করেছে, তাই কথা শুনে দুজনেই তাজ্জব ওরা। চান্দা যা বলছে স্বপ্না যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না।

চাঁদ মুখার্জি গম্ভীর মন্তব্য করল, এর থেকে তোমার 'বাস্তব দুনিয়া' অনেক ভালো ছিল, এটা একেবারে ইর্‌্যাশানাল—

স্বপ্নার রাগই হয়ে গেল, বলে উঠল, র‌্যাশানাল লেখার ফল তো দেখাই গেছে, বাস্তব দুনিয়া বিক্রীই হল না!

চাঁদ মুখার্জি বলল, এটা আরো হবে না!

—তুমি বলো কি চান্দা! চান্দাকে জব্দ করার মতো অস্ত্র হাতে পেয়েছে যেন এবার স্বপ্না।—এই দশ দিনে আমি আর রঞ্জন আমাদের সার্কেলে বিক্রী করেছি একশ' পঁচাত্তরখানা বই, আর যে পাবলিশারকে এজেন্সি দেওয়া হয়েছে সে বিক্রী করেছে সাড়ে তিনশ', হাজার কপির মধ্যে পাঁচশ' পঁচিশ উঠে গেছে, পাবলিশার বলছে একমাসের মধ্যেই বই আবার রিপ্রিন্ট হবে। এবারে নিজের খরচে বাইশ শ' ছাপার প্রস্তাবও দিয়েছে তারা, আমি রঞ্জনকে বারণ করে দিয়েছি, বলেছি, নিজেরাই রিপ্রিন্ট করব, আর তুমি বলছ কিনা বিক্রি হবে না! ওদের কমিশন বাদ দিলেও আমাদের খরচ প্রায় উঠে এসেছে সে খবর রাখো?

এবারে চাঁদ মুখার্জি সত্যি হাঁ একেবারে। স্বপ্না যে বাজে কথা বলছে না সেটা তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

—বলিস কি রে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তুমি যে কোন জগতে বাস করছ চান্দা তা তুমিই জানো। আমরা যাদের বই বেচেছি তাদের অনেকের কাছে ফের গিয়ে মতামত নিয়েছি, প্রত্যেকের মুখে কত প্রশংসা, আর তুমি এই কথা বলছ!

সত্যি কে-যে কোন জগতে বাস করছে চাঁদ মুখার্জি ভেবে পাচ্ছে না। স্বপ্না যে মিথ্যে বড়াই করে নি সেটা বোঝা গেল আরো দিন দশেক বাদে। এই ক'দিনে পাবলিশার আরো তিনশ' বই বেচে দিয়েছে আর জানিয়েছে এক্ষুনি রিপ্রিন্ট-এ না পাঠালে বাজারে বই চালু থাকবে না। এবারে বাইশ শ' ছাপার ইচ্ছে ওদের, তাতে ছাপার খরচ নেমে আসে, বিক্রী হলে লাভ বেশি। প্রথম এডিশনে যা লাভ আসছে তার সঙ্গে আর মাত্র দেড় হাজার দিলেই বাইশ শ' বই ছাপা হতে পারে। কারণ নতুন করে আর ব্লক বা আর্টিস্ট খরচাও নেই।

এ-বই এত বিক্রী হতে পারে কি করে সে বিস্ময়ের ঘোর এখনো কাটেনি চাঁদ মুখার্জির। স্বপ্নাকে সে আরো দেড় হাজার টাকা নিয়ে নিতে বলেছে। দ্বিগুণ উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে ওরা আবার 'ফেরারী বাতাস' নতুন করে ছাপার ব্যাপারে লেগে গেছে।

## আট

বোনের চাপা আগ্রহ ঠিকই টের পাচ্ছেন কল্পনা রায়। এতদিন পর্যন্ত ওই বোনের শুধু বিলেত যাওয়া ধ্যানজ্ঞান ছিল,আর খরচের বাইরে প্রতিটি কপর্দক জমিয়ে চলেছিল সেই দিকে লক্ষ্য রেখে। সেই বোন নিজের ওখানে দু'দিন চাঁদ মুখার্জিকে চায়ের নেমন্তন্ন করেছে। তার ওখানে বলতে ওয়ারকিং গার্লস হোস্টেলে। কিন্তু একটা না একটা অজুহাত দেখিয়ে চাঁদ মুখার্জি সেই নেমন্তন্ন দু'দিনই নাকচ করেছে। এতদিনে মতি ফিরেছে বোনের, পারলে কল্পনা তক্ষুনি বিয়েটা লাগিয়ে দেন। চাঁদ মুখার্জির এই গোছের নিস্পৃহতা দেখে ভিতরে ভিতরে তিনি বেশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন। সেই কারণে নিজের মেয়ের ওপরেও তেতে আছেন, কার না কার বই নিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে, এদিকে একটু চোখ দিলে ও-ই চাঁদ ভাইকে মাসির ওখানে ধরে নিয়ে যেতে পারে বলে বিশ্বাস। আভাসে ইঙ্গিতে মেয়েকে ক'দিন বলেছেনও সে-কথা। কিন্তু মেয়ের সেদিকে কান দেবার সময় নেই। রাণী আর চাঁদ ভাইকে কি করে একটু কাছাকাছি এনে দেওয়া যায় এটাই এখন চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে কল্পনার।

এরই মধ্যে চাঁদ মুখার্জি একদিন নিছক কৌতুকের বশে এক কাণ্ড করে বসল, আর মেয়ে স্বপ্না তখন তার পুরো সুযোগটাই নিল। সিনেমা দেখার নামে স্বপ্নার সময়ের অভাব হয় না, তখন সব কাজ একদিকে আর সিনেমা একদিকে। অনেকদিন বাদে ভালো একটা বাংলা সিনেমা এসেছে। ভালো ছবির প্রতি দুর্বলতা কল্পনারও আছে। মেয়েকে বলে রাখলেন, হুট করে গিয়ে দেখে আসিস না ছবিটা, আমিও যাব।

মেয়ে তক্ষুনি হাত বাড়াল, টাকা দাও, টিকিট নিয়ে আসি, চান্দাও যাবে তো আমাদের সঙ্গে?

একটা মতলব এলো কল্পনার মাথায়। কিন্তু মেয়ের কাছে তক্ষুনি সেটা ফাস না করে বললেন, যাবে কিনা জিগ্যেস করে আয়।

একটু বাদে স্বপ্না রাগ করেই ফিরে এলো, তোমার আমার টাকাই দাও, বাবু যাবেন না!

মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে কল্পনা জিগ্যেস করলেন, ঝগড়া করে এলি বুঝি?

—করব না তো কি, এতো করে সাধলাম, কিছুতে যাবে না, সিনেমা দেখতে গেলে তার মাথা ঝিমঝিম করে নাকি! আমিও বলে এলাম তিনদিনের মধ্যে তার সঙ্গে আর কোথাও বেরুচ্ছি না।

কল্পনা বললেন, আমার দুজনেই চলে যাব, ছেলেটা একলা থাকবে ...এক কাজ কর না...তোর মাসিকে একটা খবর দে না, চলে আসবে'খন?

মায়ের উৎসুক মুখের দিকে চেয়ে স্বপ্না হেসে ফেলল, আচ্ছা দেব'খন, কিন্তু চান্দা আগে থেকে জানত পারলে ঠিক বাড়ি থেকে পালাবে!

হাসলেন কল্পনা, আগে থেকে জানতে দিবি কেন বোকা মেয়ে, বরং এমন কিছু ব্যবস্থা করে যা যাতে বাড়ি থাকে।

সমস্যাটা এখন যেন কল্পনারই বেশি। মুখে না বললেও যেদিনই বুঝেছেন এই লোকটাকে বিয়ে করতে রাণীর আপত্তি নেই সেই দিন থেকে ধরে নিয়েছেন বিয়েটা

হয়েই গেছে। আর বোনের সঙ্গেও সেইভাবেই কথা বলেছেন, হাসি-ঠাট্টা করেছেন, যার ফলে বোনের মনেও খুব একটা সংশয় নেই। সেও এখন একটা পাকাপাকি কিছু শোনার অপেক্ষাতেই আছে মনে মনে।

কিন্তু ছবির দু'খানা টিকিট কেটে আনার পর চাঁদ মুখার্জিই খেয়াল আর কৌতুকের বশে এক কাণ্ড করে বসল। টিকিট দুটো এনে স্বপ্না নিজের টেবিলের ওপর পেপারওয়েট চাপা দিয়ে রেখেছিল। খানিক বাদে স্বপ্নার খোঁজে এসে ঘরে ওকে দেখল না, টেবিলের ওপরে চাপা দেওয়া টিকিট দুটো চোখে পড়ল। তক্ষুনি মেয়েটার রাগ আর অভিমান মনে পড়ল চাঁদ মুখার্জির, সে যাবে না বলাতে যথার্থই চটে আছে।

হাসছে মিটিমিটি। দুটো টিকিটের থেকে একটা টিকিট তুলে নিয়ে জামার পকেটে পুরল, বাকি টিকিটটা তেমনি চাপা দিয়ে বেরিয়ে এলো।

খানিক বাদেই স্বপ্নার চেঁচামেচি কানে এলো তার।—আর একখানা টিকিট গেল কোথায়? চাপা দেওয়া ছিল, দুটো টিকিটের মধ্যে একটা আছে আর একটা যাবে কোথায়? মায়ের কথা শুনে আরো রেগে গেল, কারণ মা বলছে, নিশ্চয় তুই দুটো ভেবে একটাই রেখেছিস, আর একটা অন্য কোথাও পড়ে-টড়ে গেছে। কিন্তু স্বপ্নার স্পষ্ট মনে আছে দুটো টিকিটই টেবিলে চাপা দিয়ে রেখেছে। আমোদিনীকে গিয়ে চেপে ধরল সে, নিশ্চয় ওই নিয়েছে! ফলে আমোদিনীর ডবল গলা, টিকিট চুরি করে সে মা-মেয়ের একজনের পাশে বসে সিনেমা দেখবে আর সেটা কেউ টের পাবে না, সে কি এই বুদ্ধি নিয়ে এতকাল ধরে এ বাড়িতে টিকে আছে!

অকাট্য যুক্তি। স্বপ্না চুপ।

এদিকের ঘরে চাঁদ মুখার্জি শুনছে সব আর হাসছে। স্বপ্না ঘরে ঢুকতেই গম্ভীর। —এত চেঁচামেচি কিসের?

—দেখো না, টিকিট দুটো এনে টেবিলে চাপা দিয়ে রাখলাম, তার মধ্যে—

বলতে বলতে স্বপ্নার দু'চোখ বেশ একটা হোঁচট খেল যেন। চান্দার পাতলা জামার ভিতর দিয়ে লাল ও কি ফুটে বেরিয়েছে' উল্টে ভাঁজ করার ফলে ছাপার দিকটাও চোখে পড়েছে। সে বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত।

সেদিকে খেয়াল না করে চাঁদ মুখার্জি জিগ্যেস করল, তার মধ্যে কি?

—তা-তার মধ্যে একটা টিকিট হাওয়া!

—সে কি রে! তেমনি গম্ভীর, তুই তা হলে দুটো টিকিটের দাম দিয়ে একটা টিকিট নিয়েছিস ভুল করে!

স্বপ্না ততক্ষণে সামলে নিয়েছে আর দুষ্ট বুদ্ধিও মাথায় এসে গেছে। বলল, তাই হবে হয়তো...আমার যে কি হয়েছে মাথাটার না!

বলতে বলতে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। তারপর এক ছুটে মায়ের কাছে। তার মাথাটা টেনে নিয়ে কানে কানে বলল কিছু। সঙ্গে সঙ্গে মায়েরও একমুখ হাসি। মাথা নাড়লেন।

একটু বাদে স্বপ্না আবার চান্দার ঘরে এলো। সে ততক্ষণে ওপরের পকেট থেকে টিকিটটা সরিয়ে ব্যাগে পুরেছে। জিগ্যেস করল, তাহলে কি ঠিক হল, সিনেমা যাওয়া হচ্ছে না!

—মায়ের হচ্ছে না, আমার হচ্ছে। একটা টিকিট নষ্ট করে কি হবে, নিজেই দেখে আসি। মা মাসির সঙ্গে পরে দেখে নেবে'খন। এখন তো আর চেষ্টা করলেও টিকিট পাওয়া যাবে না।

চাঁদ মুখার্জি সায় দিয়ে বলল, সেই ভালো, টিকিট নষ্ট করে কি হবে, তুই দেখে আয়—

যথাসময়ের একটু আগেই প্রস্তুত হয়ে স্বপ্না আবার তার ঘরে এলো।—চলি চান্দা, তুমি একা-একা ঘরের কড়িকাঠ গোনো—

—আমার সময় ঠিক কেটে যাবে, তা তুই এতো আগে বেরুচ্ছিস?

স্বপ্না বলল, দুটো মেয়েকে দু'খানা ফেরারী বাতাস গছিয়ে টাকা নিয়ে তারপর সিনেমায় যাব, ততক্ষণে শো আরম্ভ হয়ে না গেলে বাঁচি!

অন্ধকার ঘর। নিউজ রিলও প্রায় শেষ হয়েছে। টর্চ হাতে দরজার লোক কাউকে সিট দেখিয়ে দিতে এলেই চাঁদ মুখার্জি সাগ্রহে ঘুরে তাকাচ্ছে। শেষের দিকের নিউজ রিলে এলাহাবাদের কি একটা অধিবেশন দেখানো হচ্ছে, উৎসুকনেত্রে চাঁদ মুখার্জি সেদিকে মন দিয়েছিল।

হঠাৎ পাশের সিট দখল হল অনুভব করে চাঁদ মুখার্জি ঘুরে তাকাল। তারপরেই একখানা হাতে পার্শ্ববর্তিনীর বাহু বেষ্টন করে ছদ্ম রাগে চাপা তর্জন করে উঠল, একটু সময়-জ্ঞান যদি থাকে, এত দেরি করে!

ভেবেছিল মেয়েটা চমকে উঠবে আর বিস্ময়ে হাবুডুবুই খাবে। চমকেই উঠল আর হাবুডুবুই খাচ্ছে। সেটুকু অনুভব করে চাঁদ মুখার্জি তার কাঁধে আরো একটু চাপ দিয়ে বলল, কেমন জব্দ!

মেয়েটা শশব্যস্তে ঘাড় ফিরিয়ে এদিক-ওদিক কি দেখছে চাঁদ মুখার্জি বুঝল না। খুব জব্দ আর অবাক হয়েছে ভেবে হাসছে নিঃশব্দে।

নিউজ রিল শেষ হল। আলো জ্বলল।

আর তারপর মারাত্মক রকম চমকে উঠল চাঁদ মুখার্জি নিজেই। তখনো একহাত কাঁধ বেষ্টন করে আছে যার সে স্বপ্না নয়, চৌধুরাণী রাণী চৌধুরি।

আঁৎকে হাতটা তুলে নিল।—আ-আপনি...কি আশ্চর্য, স্বপ্না কোথায়?

তখনো মুখ লাল রাণী চৌধুরির, বিস্ময় মাখা দুই চোখে আনন্দের ছটা। চাপা গলায় বলল, গায়ে হাত পড়তে আমিও প্রথমে ঘাবড়ে গেছলাম, শেষে ফিরে দেখি আপনি। পাজি মেয়ে শেষ সময়ে টিকিট গছিয়ে দিয়ে বলল, শিগগীর ছোটো মাসি, মা তোমার জন্যে হল-এ বসে আছে!...আপনি আসবেন ভাবতে পারি নি।

—আ-আমি নিজের দোষেই এসে গেছি। খাবি খাওয়ার দাখিল তার। পাশে আইসক্রিম লিমনেডওলা এসে দাঁড়িয়েছিল। চাঁদ মুখার্জি তাড়াতাড়ি একটা ঠাণ্ডা কোকাকোলা তুলে নিয়ে ঢকঢক করে গলায় ঢালতে লাগল। ভিতরে ভিতরে কাঁপুনি শুরু হয়েছে তার।

অস্বস্তি লক্ষ্য করে রাণী চৌধুরি জিগ্যেস করল, নিজের দোষে এসে গেছেন কি রকম?

—দুটো টিকিটের একটা টিকিট চুরি করেছিলাম, তোমার মানে আপনার দিদিরই

আসার কথা ছিল স্বপ্নার সঙ্গে।

একটু পাশে ঝুঁকে আরো চাপা গলায় রাণী বলল, তোমার মানে আপনার নয়, তোমার মানে তোমার!

কপাল দিয়ে ঘাম ছোটার উপক্রম চাঁদ মুখার্জির। রাণী আবার মিষ্টি করে বলল, এসে গেছেন যখন কি আব করা যাবে, দেখুন বসে।

আলো নিভতে থাকল আবার। ছবি শুরু হল। পাশের লোকটা দস্তুরমতো উসখুস করছে রাণী টের পাচ্ছে আর ততো বেশি মজা লাগছে তার।

বইয়ের শুরুতেই বেশ একটা জমাটি প্রেমের সিন আছে। নায়ক শুয়ে, নায়িকা তার বুকের ওপর আধ-শোয়া। নায়কের বুকে নায়িকা নিজের থুতনি ঘষছে, আর আধো-আধো কথা বলছে।

সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরনো বিস্মৃতিব আওয়াজটা কানে আসছে চাঁদ মুখার্জির। চোখের সামনে পর্দার ছবি ঝাপসা হয়ে আসছে।

...আস্তে আস্তে সেখানে ভেসে উঠল একটা ইংরেজি ছবি। দর্শকের আসনে চাঁদ মুখার্জির পাশে আর এক রমণী, তার স্ত্রী। ছবিতে দুটি শ্বেতাঙ্গ মেয়ে-পুরুষের ঝাঁঝালো বাসনাতপ্ত প্রেম শুরু হয়েছে। সেখানে নায়িকা শয়ান, আর নায়ক যেন তাকে খুবলে খেতে চায়। বাধা দেবার ছলে নায়িকা তার উদগ্র কামনা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। গম্ভীর চোখে চাঁদ মুখার্জি ঈষৎ ঘাড় ফিরিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকাল। স্ত্রী তন্ময় হয়ে প্রেমের দৃশ্য দেখছে।

একটু বাদে স্ত্রীও ফিরে তাকাল তার দিকে। ফিসফিস অনুযোগের সুরে বলল, কি সুন্দর দেখো তো, ওই রকম প্রেম আমাদের মধ্যেও তো হতে পারে!

চাপা বিরক্তির সুরে চাঁদ মুখার্জির জবাব, ওইরকম প্রেম করার জন্যে প্রোডিউসারের কাছ থেকে ওরা বহু টাকা পায়—বুঝলে?

বিস্মৃতির ঘোর কেটে গেল। সামনে আবার বাংলা ছবির দৃশ্য।

ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছে চাঁদ মুখার্জি। কিছুতে মন দিতে পারা যাচ্ছে না। শেষে পাশের দিকে তাকাল।

রাণী জিগ্যেস করল, কি হল?

—মাথাটা ভয়ানক ঝিমঝিম করছে, একটুও ভাল লাগছে না। আমি উঠে পড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে রাণীও উঠে দাঁড়াল।—চলুন তাহলে।

নিঃশব্দে হল ছেড়ে বেরিয়ে এলো তারা। রাণী তার লালচে মুখ দেখে জিগ্যেস করল, সিনেমা দেখার অভ্যাস নেই বুঝি?

—একদম না, আমি বাড়ি যাই, আ-আপনি?

রাণী ভ্রূকুটি করল।—ফের আপনি?

—আ-আপনি মানে তুমি—

হেসে রাণী বলল, এখন বাড়ি গিয়ে কি হবে, খিদে পেয়েছে, চলুন আজ আপনাকে আমি কিছু খাওয়াব।

—কিন্তু আমার তো একটুও খিদে পায়নি।

—ঠিক পেয়েছে, আসুন।

তাকে টেনে নিয়ে একটা বাছাই করা রেস্তরাঁয় এসে উঠল। কোণের একটা কেবিনে মুখোমুখি বসল দুজনে। বয় এলো। মেনুকার্ডে চোখ বুলিয়ে রাণী জিগ্যেস করল, কি খাবেন বলুন—

—আ-আমার মানে এত পেট বোঝাই যে খাবি খাচ্ছি, আপনি মানে তুমি খান—

হাসি চেপে রাণী দু'প্লেট খাবারের অর্ডার দিল। বয় চলে যেতে হাসিমুখে সোজা চেয়েই রইল তার দিকে।

ফলে একটা হাসার চেষ্টায় কপালে ঘাম দেখা দিল চাঁদ মুখার্জির। টেবিল থেকে গেলাসটা তুলে নিয়ে ঢকঢক করে জল খেয়ে নিল।

—কি ব্যাপার, তখন কোকাকোলা খেলেন এখন আবার এত জল খাচ্ছেন কেন?

—তেষ্টায় গলা একেবারে কা-কা-ঠ।

বয় দু'প্লেট খাবার দিয়ে গেল। চাঁদ মুখার্জি তক্ষুনি গোগ্রাসে খেতে শুরু করে দিল। রাণী তাই দেখে অবাক।—আপনার না একটুও খিদে পায়নি বলছিলেন?

—খাবার দেখে খিদে পেয়ে গেল।

রাণী হাসছে।—আপনি আচ্ছা মজার মানুষ!

সে-ও খাচ্ছে অল্প অল্প করে, আর থেকে থেকে সকৌতুকে লক্ষ্য করছে লোকটাকে। ভালো লাগছে। এ যেন তারই দিন আজ।

—আচ্ছা, আপনার তো যথেষ্ট বয়েস হয়েছে?

প্রশ্নটা না বুঝেই আশান্বিত মুখে চাঁদ মুখার্জি তাড়াতাড়ি জবাব দিল, তা তো হয়েইছে, বয়েসের কি আর গাছ-পাথর আছে—

—আর আমারও তো বেশ বয়েস হয়েছে। মুখের দিকে চেয়ে রাণী হাসছে অল্প অল্প।—একটা ব্যাপার আমরা নিজেরাই যদি খোলাখুলি ফয়সলা করে নিই, কেমন হয়?

—বে-বেশ হয়, খোলাখুলি কথাই আমি পছন্দ করি।

তবু দ্বিধা আর লজ্জা সামলে রাণী বলল, আমাকে আর আপনাকে নিয়ে দিদির মাথায় একটা মতলব ঘুরছে আপনি জানেন নিশ্চয়, দিদির ধারণা, আমার মত হলে আপনারও বিয়েতে অমত হবে না—

—বিয়ে!...মা-মানে আমার সঙ্গে তোমার মানে আপনার, না আপনার মানে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে! কিন্তু আপনি মানে তুমি তো বিলেত যাওয়ার জন্যে দিন গুনছো শুনলাম—

সলজ্জ হেসে রাণী বলল, হ্যাঁ, এতদিন শুধু এই চিন্তাই করেছি, দুটো বছর সেখানে থেকে আরো একটু পড়াশুনা করে আসব, কিন্তু তার বদলে এখন এ-ই যদি হয় আমার খুব আপত্তি নেই, বিলেত যাওয়া পরেও হতে পারবে।

—না না না, তা কখনো হয়! আগে বিলেত পরে বিয়ে, বি-বিলেত-ফেরৎ মেয়ে আমার সা-সাংঘাতিক পছন্দ, আপনি মানে তুমি বিলেত যাচ্ছ শুনেই আমার কি-যে ভালো লেগেছিল ঠিক নেই, আগে বিলেত তারপর অন্য কথা—

ঈষৎ বিমূঢ়মুখে রাণী বলল, কিন্তু তার তো ঢের দেরি এখনো...টাকা-পয়সা জমবে তার পর তো...

—টাকা! বিলেত যাওয়া আবার টাকার জন্যে আটকায় নাকি! কত টাকা জমেছে আর কত বাকি?

—জমেছে হাজার বারো, যাতায়াত তারপর বছর-দুই থাকা, কম করে আরো হাজার ষোলো লাগবে—

—কুড়ি হাজারই ধরো, একটু বেশিই থাকা ভালো। ঠিক আছে, আজই স্বপ্নাকে বলছি, কুড়ি হাজার দিয়ে দেবে, আপনি মানে তুমি চটপট ছুটি নিয়ে পাসপোর্ট ভিসা সব করে নাও, মোট কথা আর সময় নষ্ট না করে চটপট সব ব্যবস্থা করে ফেলা দরকার!

তার আগ্রহ দেখে ভালো লাগছে রাণীর, নতুন করে আবার একটা উদ্দীপনা বোধ করছে। তবু দ্বিধা, বলল, কিন্তু আপনার টাকা আমি নেব কোন অধিকারে?

—বাঃ, কোন অধিকারে মানে! আমার টাকাই তো নেবে, আমার নেবে না তো কার নেবে, আ-আমিই তো একমাত্র আপনার লোক!

রাণীর মুখে রক্তিম ছটা।—সত্যি?

কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ঘনঘন দু'বার মাথা নাড়ল চাঁদ মুখার্জি।—সত্যি।

—আর এই দু'বছর তুমি কি করবে?

—তু-তুমি মানে আমি! (এই খেয়েছে আপনি ছেড়ে এখন তুমি!) আ-আমি মানে আমি অপেক্ষা করব আর হা-হাওয়া খাব!

লজ্জায় মাথা একটু নুয়ে আছে রাণীর, কিন্তু দু'চোখ ভরে মানুষটাকে দেখছে।

রাণীকে সঙ্গে করে ট্যাক্সি থেকে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ঢুকল চাঁদ মুখার্জি। বাইরের ঘরে ধর্মেন্দ্রবাবু, কল্পনা, স্বপ্না আর রঞ্জন বসে। তারাও হাসিখুশি। এখানেও যে একটা আনন্দের কারণ কিছু ঘটেছে নিজের ব্যস্ততায় চাঁদ মুখার্জির সেটা চোখে পড়ল না। ঘরে ঢুকেই হুকুম করল, স্বপ্না, আমার কি টাকা আছে তোর কাছে নিয়ে আয় তো, জলদি!

সকলেই ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল একটু। কল্পনা জিগ্যেস করল, কি ব্যাপার?

—আঃ, এত ব্যস্ত হবার কি আছে! রাণীর সলজ্জ ভ্রূকুটি।

তার আরক্ত মুখের দিকে চোখ গেল সকলের। চাঁদ মুখার্জি বলল, ব্যস্ত হব না বলো কি! বিলেত কি এখানে নাকি যে, ব্যস্ত হব না! স্বপ্না শিগগীর!

স্বপ্না টাকা আনতে ছুটল। রাণীকে তুমি বলাটা লক্ষ্য করেছে কল্পনা। তাড়াতাড়ি কাছে টেনে ফিসফিস করে কি জিগ্যেস করলেন তিনি। আরো আরক্তমুখে রাণী মাথা নাড়ল। অস্ফুট স্বরে বলল, আগে বিলেত, তার আগে কোনো কথা নয়...তুমি কিছু ভেব না দিদি, টাকাটা এখন নিতে পারি।

কল্পনা আনন্দে আটখানা।

ধর্মেন্দ্রবাবু ড্যাবড্যাব করে দেখছেন তাদের।—ঈশ্বরের আশীর্বাদে ব্যাপারখানা কি?

জবাব দেবার আগেই স্বপ্না টাকার থলে আর তার হিসেবের খাতা নিয়ে এলো। টাকা হাতে দিয়ে খাতা খুলে বলল, শোনো চান্দা, চুয়াত্তর হাজার আটশ' টাকা তুমি রেখেছিলে, তার মধ্যে এ পর্যন্ত ছ'শ টাকা ক্যাশ তুমি নিজে নিয়েছ। বিয়ের অ্যানিভার্সারির জন্যে নিয়েছ তিন হাজার পাঁচশ' আর রঞ্জনকে দু'বারে দিয়েছ সাড়ে পাঁচ হাজার। সব মিলিয়ে হল গিয়ে, মোট হল গিয়ে ন'হাজার ছ'শ, আর তোমার থাকল গিয়ে পঁয়ষট্টি হাজার দু'শ।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। চাঁদ মুখার্জি ততক্ষণে দুটো দশ হাজার টাকার বাণ্ডিল বার করে রাণীর দিকে ধরেছে—এই বিশ হাজার ধরো।

লজ্জায় সংকোচে রাণী দিদিকে ঠেলে দিল। কল্পনাই টাকাটা নিল তার হাত থেকে।

এদিকের সুখবরটা স্বপ্না আর চেপে বসে থাকতে পারল না। বলে উঠল, চান্দা, তুমি তো খুব বলেছিলে, এদিকে যে কি কাণ্ড হয়ে গেছে জানো না! রঞ্জনের 'ফেরারী বাতাস' আজ সিনেমায় কনট্রাক্ট হয়ে গেল, একজন প্রোডিউসার নিজে সেধে এসে আজই ফিল্ম-রাইট কিনে নিলো—ছ' হাজারের কনট্রাক্ট, থোক তিন হাজার টাকা আগাম দিয়েছে রঞ্জনকে। এখন কেমন?

আনন্দে বিগলিত মুখ রঞ্জনেরও। চাঁদ মুখার্জি সত্যিকারের বিস্ময় নিয়েই দুজনকে দেখতে লাগল। তারপর বলল, সত্যি, আমারই কি রকম গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে সব!

তারপরেই কিছু একটা মাথায় এলো তার। টাকার থলে খুলে আরো দুটো বাণ্ডিল অর্থাৎ বিশ হাজার টাকা বার করে স্বপ্নার দিকে বাড়িয়ে ধরল, ধর।

—কি হবে? স্বপ্না এবং অন্য সকলেও অবাক।

—রঞ্জন এবার থেকে পাবলিশার হবে। নিজের বই নিজে ছাপবে। তুই বুঝেশুনে দরকার মতো টাকা দিবি, আর নিজেও দেখাশুনা করবি। স্বপ্নার হাত টেনে নিয়ে টাকাগুলো ধরিয়ে দিয়ে গম্ভীর মুখে রঞ্জনের দিকে ফিরল চাঁদ মুখার্জি।—শোনো রঞ্জন, পাবলিশার হয়ে প্রথমেই তোমার শাশুড়ীর কবিতার বই ছাপবে...যা ব্যাপার এখানকার, কবিতার বইও ঠিকই কাটবে...।

বিমূঢ়মুখে কল্পনা বললেন, শাশুড়ীর কবিতার বই!

—হ্যাঁ, আপনার! আর শুনুন।

থলে থেকে টাকাগুলো উপুড় করে কোলের ওপর ঢালল। পঁচিশ হাজার দু'শ আছে। তার থেকে পঁচিশ হাজারই তুলে নিয়ে কল্পনার হাতে গুঁজে দিল। বলল, স্বপ্না আর রঞ্জনের বিয়েতে এ টাকা খরচ করবেন, স্বপ্নার চান্দা দিচ্ছে, আপনার লজ্জা কি—রাখুন। খুব চটপট ওদের বিয়ে দেবেন, বুঝলেন?

আনন্দে উদ্ভাসিত সকলের চোখ-মুখ। ধর্মেন্দ্রবাবুরই শুধু দু'চোখ ঠিকরে পড়ার দাখিল।

নিশ্চিন্ত খুশিমুখে চাঁদ মুখার্জি বাকি টাকাটা পকেটে পুরতে পুরতে বলল, এ দু'শ টাকা আমার।

স্বপ্না আর রঞ্জনের মুখের দিকে চেয়ে তার চোখের পলক পড়ে না। উল্লাসে ডগমগ দুটি কাঁচা মুখ।

হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করছে চাঁদ মুখার্জি। কানে মাথায় সেই বিস্মৃতির আহ্বান। ঘরবাড়ি দুলতে লাগল। চোখে ঝাপসা দেখতে লাগল। একটা দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

...কোর্ট-বিচারক রায় পড়লেন। একদিকে চাঁদ মুখার্জি দাঁড়িয়ে। অন্যদিকে সেই বন্ধুর পাশে তার স্ত্রী। স্ত্রীর কপালে সিঁথিতে সিঁদুর, মাথায় ঘোমটা।...ঘোমটা খসে পড়ল। সিঁদুরের দাগ মুছে গেল। চাঁদ মুখার্জির দিকে জ্বলন্ত একটা দৃষ্টি হেনে সে বন্ধুর সঙ্গে চলে যাচ্ছে।

দৃশ্যটা মুছে গেল। তার সামনে কাঁচা দুটো হাসিমাখা মুখ। রঞ্জনের আর স্বপ্নার।

চেয়ে আছে। দৃশ্যটা বদলাতে লাগল। স্বপ্নার সলাজ মুখ, মাথায় ঘোমটা উঠল, কপালে সিঁথিতে সিঁদুরচিহ্ন পড়ল। এ-দৃশ্যও মুছে গেল।

সকলে হাসিমুখে চেয়ে আছে চাঁদ মুখার্জির দিকে। চাঁদ মুখার্জির দু'চোখ অদ্ভুত চিকচিক করছে। স্বপ্নাকে বলল, একটা শর্ত, রঞ্জনকে কখনো ঠকাবি না, ঠিক?

স্বপ্না রাঙামুখে মাথা নাড়ল, ঠিক।

চাঁদ মুখার্জি রঞ্জনের দিকে ফিরল।—আর তুমিও কখনো তোমার কোনো বন্ধুর সঙ্গে ওর বেশি আলাপ করিয়ে দেবে না, মনে থাকবে?

রঞ্জন মাথা নুইয়ে ঘাড় দোলালো। মনে থাকবে।

এতক্ষণে ধর্মেন্দ্রবাবুর মুখে কথা সরলো। চাঁদ মুখার্জির কাছে এসে বলে উঠলেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদে এ আমি কাকে ধরে এনেছিলাম! তুমি কোন্ জগতের মানুষ হে!

হাসছে চাঁদ মুখার্জিও। বলল, আমিও আপনাদের দেখে সেই কথাই ভাবছি।

ধর্মেন্দ্রবাবু বললেন, এ রকম দিন আর হয় না, কাল সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সেলিব্রেট করা যাক, এবারের সমস্ত খরচ আমার।

সকলে একসঙ্গে সায় দিল, সব থেকে বেশি সরবে আনন্দ প্রকাশ করল স্বপ্না। বলে উঠল, ঈশ্বরের আশীর্বাদে মামার জয় হোক! চাঁদ মুখার্জিকে ধরে এক ধাক্কা। —কথা বলছ না কেন চান্দা, সমস্ত দিন কি মজা হবে কাল!

চাঁদ মুখার্জি আবারও ওদের দিকে চেয়ে হাসছে। চোখদুটো তেমনি চিকচিক করছে।

পরদিন চা খেয়ে স্নান-টান সেরে সকলের বেরিয়ে পড়ার কথা। প্রথমে রাণীকে তুলে নেওয়া হবে, তারপর রঞ্জনকে, তারপর রাত পর্যন্ত হৈ-হুল্লোড় ফুর্তি আর বড় হোটেলে খাওয়া-দাওয়ার প্রোগ্রাম।

চান্দাকে চায়ের টেবিলে ডাকতে এসে স্বপ্না দেখে চান্দা তার ঘরে নেই।

এ-ঘর ও-ঘরেও খুঁজে পেল না। অবাকমুখে মাকে জিগ্যেস করল, চান্দা গেল কোথায়?

আরো আধঘণ্টা যায়, একঘণ্টা যায়, সে নিপাত্তা। ঘরে তার জামাও টাঙানো নেই, পায়ের জুতোও চোখে পড়ল না। কল্পনা বললেন, নিশ্চয় আগেভাগে গিয়ে রাণীর ওখানে বসে আছে। কিন্তু তার ওখানে তো টেলিফোন নেই, খবর নেবে কি করে? আরো খানিক বাদেই রাণীরই টেলিফোন এলো, দেরি দেখে সে দোকান থেকে ফোনে খোঁজ নিচ্ছে।

কল্পনা অবাক, সে কি রে, তোর ওখানে যায়নি!

রাণী আরো অবাক।—আমার এখানে আসবেন কেন, একসঙ্গেই সব আসার কথা তো!

—বাড়িতেও তো নেই, গেল কোথায় ছেলেটা! পাশে স্বপ্না উদগ্রীব মুখে দাঁড়িয়ে।

ট্রেন ছুটেছে।

একটা ফার্স্ট ক্লাস কুপের নিচের বার্থে চাঁদ মুখার্জি বসে আছে। সমস্ত মুখে নীরব হাসি চুয়ে চুয়ে পড়ছে।

পরদিন এলাহাবাদ স্টেশনে গাড়ি থামল।

চাঁদ মুখার্জি নেমে হন্তদন্ত হয়ে বাইরে ছুটল। তার যেন কোথাও যাবার তাড়া।

ট্যাক্সি মস্ত একটা কম্পাউন্ডের দিকে এগোচ্ছে। যতো এগোচ্ছে ততো একটা বিশাল প্রাসাদোপম বাড়ির মাথায় চাঁদোয়া সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে। ধাতুর মস্ত মস্ত অক্ষরে লেখা, মেন্টাল হসপিটাল।

ফটকের ভিতরে ট্যাক্সি ঢুকে গেল। যে বাগানঘেরা একতলা ছোট্ট বিচ্ছিন্ন অংশটার সামনে ট্যাক্সি দাঁড়াল, তার দেয়ালের গায়ে লেখা 'শান্তিকুঞ্জ'।

নেমে ট্যাক্সির ভাড়া মেটানোর ফাঁকে এদিক-ওদিক থেকে ক'জন ডাক্তার আর নার্স ছুটে এলেন। লোকটাকে ট্যাক্সির মধ্যেই-লক্ষ্য করেছেন তাঁরা, আর এমনই মুখ একখানা যে, দেখার সঙ্গে সঙ্গেই চিনেছে। ডাক্তাররা বলে উঠলেন, আপনি ফিরে এসেছেন! কোথায় ছিলেন এ দু'মাস? কেমন ছিলেন? আমরা তো ভাবনায় চিন্তায় দিশেহারা!

হাসিমুখে চাঁদ মুখার্জি বলল, সব শুনবেন, আগে আমাকে হাত-পা ছড়িয়ে একটু ঠাণ্ডা হতে দিন।

ভিতর থেকে তার সেই দুই সঙ্গী শানু আর দুলাল এবং আরো জনাকয়েক সোল্লাসে ছুটে এসে জাপটে ধরল তাকে।—চান্দা চান্দা, তুমি এসে গেছ! তুমি ছিলে না, তোমার শান্তিকুঞ্জ যে মরুভূমি হয়ে গেছল চান্দা, তুমি আবার এসেছ তাহলে!

আনন্দে উত্তেজনায় হিড়হিড় করে ভিতরে টেনে নিয়ে গেল তারা। একটা ঘরে ঢুকে শানু বলল, এই দেখো, তোমার ঘর ঠিক তেমনিই রেখেছি আমরা!

চাঁদ মুখার্জি জুতোসুদ্ধুই তাড়াতাড়ি তার শয্যায় হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে লম্বা একটা শান্তির নিশ্বাস ছাড়ল, আঃ!

সকলেই সামনে ঝুঁকে পড়ল। দুলাল জিগ্যেস করল, এতদিন কেমন ছিলে চান্দা? কোথায় ছিলে?

—ছিলাম ভালোই! তবে একেবারে আস্ত একটা পাগলের দুনিয়ায় গিয়ে পড়েছিলাম, বুঝলি! সমস্ত মুখে হাসি ছড়াচ্ছে।

শুনে ওরা সকলে বিস্ফারিত।

# আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

## পঞ্চদশ খণ্ড

### গ্রন্থ-পরিচিতি

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলীর পঞ্চদশ খণ্ড সাতখানি জনপ্রিয় উপন্যাসের সমাহার। যেমন—'আমি সে ও সখা', 'যার যেথা ঘর', 'দিনকাল', 'সেই অবেলায়', 'মেঘের মিনার', 'বাসকশয়ন' এবং 'চাঁদের কাছাকাছি'।

'আমি সে ও সখা' উপন্যাসটি ইংরেজি সত্তরের দশকে একটি শারদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে এর প্রথম আত্মপ্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৩৩৮। প্রকাশক : অরুণা প্রকাশনী। চলচ্চিত্র হিসেবেও কাহিনীটি অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছিল। বিখ্যাত হিন্দী ছায়াছবি 'বেমিসাল' এই উপন্যাসটিরই চিত্ররূপ।

'যার যেথা ঘর' লেখকের অপর একটি বিখ্যাত জনপ্রিয় উপন্যাস। খুব সম্ভবত তৎকালীন শারদীয় 'বেতার জগৎ'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তক আকারে অরুণা প্রকাশনী থেকে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে এটি প্রকাশিত হয়।

রচনাবলীর অন্যতম উপন্যাস 'দিনকাল'। তৎকালীন কোনও একটি বিশিষ্ট শারদ-সংখ্যায় এটির আত্মপ্রকাশ। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় বৈশাখ, ১৩৩৭। প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং।

পঞ্চদশ খণ্ডের 'সেই অবেলায়' বাংলা ১৩৩৭ সালে শারদীয় প্রসাদ পত্রিকায় উপন্যাস হিসেবে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে এটির প্রথম প্রকাশ ১৩৩০ সালের বৈশাখ মাসে। প্রকাশক : সংস্থার পক্ষ থেকে এটি প্রকাশ করা হয়।

সংকলনের অন্যতম সংযোজন 'মেঘের মিনার'। উপন্যাস হিসেবে শারদীয় প্রসাদ-এ ১৩৩৯ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রথম আত্মপ্রকাশ বৈশাখ, ১৩৩৮। প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং।

'বাসকশয়ন' লেখকের অন্যতম জনপ্রিয় উপন্যাস। তৎকালীন এক বিশিষ্ট শারদ সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে উপন্যাসটির প্রকাশনা করেন দে'জ পাবলিশিং ; ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে।

পঞ্চদশ খণ্ডের সংযোজনায় রয়েছে সাহিত্যিকের সিরিও-কমিক গ্রন্থ 'চাঁদের কাছাকাছি'। এক শারদ পত্রিকায় উপন্যাস হিসেবে এর প্রথম আত্মপ্রকাশ। গ্রন্থাকারে বইটি প্রকাশ করেন রবীন্দ্র লাইব্রেরী ; বৈশাখ, ১৩৩২ সালে। চলচ্চিত্র হিসেবেও এই কাহিনীটি চিত্রায়িত হয়।

সাত-সাতটি বিভিন্ন স্বাদের বিভিন্ন রসের কাহিনীতে সমৃদ্ধ আশুতোষ রচনাবলীর এই পঞ্চদশতম খণ্ড। পাঠককুলের কাছে এটি আদরণীয় হবে নিশ্চয়ই।